সংখ্যা - ৯ - ১২

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত
সম্পাদিত।

—:০:—

একাদশ খণ্ড
১৩২২ —

—:০:—

ঢাকা;
উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ২৷৶০ দুই টাকা দশ আনা।

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখক ও লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
অন্তর্হিত আনন্দ	কুমারী যামিনী সেন এম, বি	৩৭৯
অন্বেষণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৭৭
অবরোধ (নাটক)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১১,৭২,১০৬,১৪২,১২২,২৮২
অবসর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী	৯
অভিযুক্ত (কবিতা)	শ্রীমতী আবোদিনী ঘোষ	২০০
অম্বা	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৪২
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন (নাট্য)	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি এল	২০৬
আরকিউস	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সী	১৪৩
আপেক্ষ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	২৮০
আয়েষা	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সরকার	৩১০
ইউরোপে যুদ্ধাগ্রাম		৪৭
৺উপেন্দ্রকিশোর	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৩৮
কবেগো জগতস্বামি (কবিতা)	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	৩৫০
কি সে ? (কবিতা)	শ্রীমতী আবোদিনী ঘোষ	৩৭৭
কুমারী মারগারেট কলিন্স		৮৮
কুমারী মাকফারসন্		৫৪
কেতাবের ভাষা ও কথা কওয়ার ভাষা	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এল	২২
কৃতজ্ঞতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী	৩৬৬
গৃহ পরিষদ	...	৬
চয়ন	৯৯, ৮৮, ১১৮ ১৭৩, ২০৮, ২৪৮, ২৯৬, ৩৪০,	
চীন রমণীর জাগরণ		১৪৮
ছেলেদের বিচারালয়		২৪৬
জাপানী রমণী		৫৪
ট্রিভেন্দ্রাম রাজকলেজ ও বালিকাবিদ্যালয় ...		২০০
ঢেঁকী তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সরকার	২৫
তুমি ও আমি (কবিতা)	শ্রীমতী হেমলতাবালা দত্ত	৩২০
দম্পতী যুগল	শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রলাল চৌধুরী	২০১
দোক্তা	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস সি,	১৮২
নাকাল (গল্প) ...	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সী ...	৩৮
নারী (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত প্রিয়ম্বদত সরকার	১৪৪
নারী ও ধর্ম্ম		১০২
নারী জাতির উচ্চ শিক্ষা ...	শ্রীযুক্ত কালিচরণ দাস	৭১

বিষয়	লেখক ও লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
নারীর অধিকার		৩৪৩
নারী-শিক্ষ		২৯১
নোটের তাড়া	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস সি	৩২৮
পরমেশ্বরের সিংহাসন সমীপে	কুমারী যামিনী সেন এম্, বি	২৮১
পরলোকে আত্মার গতিবিধি		৩৩, ৭৭, ১৪১, ১৭৯
পরাভব (কবিতা)	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	৯৪
পায়ের কাঁটা (গল্প)	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস সি	৮২, ১০০
প্রধানে সফল		১৯৮
প্রবাসী বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৮
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রভূষণ গুহ	১৭১
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ধর্ম্ম	শ্রীমতী মহম্মদেছা খাতুন	৪০৪
মরুভূমিতে তিনটী স্বপ্ন	কুমারী যামিনী সেন এম, বি	২৫৩
মেরী সিকোল		১৫০
যোসলেম বীরাঙ্গনা		৩৪৬
বাঙ্গল নিশায়	শ্রীমতী—.	১৭২
বিচিত্র বিবাহ		৫৬৭
বিধবাদের শিক্ষা	শ্রীমতী কামিনী রায় বি. এ	১৯
বিবিধ প্রসঙ্গ	১, ৪৯, ৯৭, ১৪৪, ২২৪, ২৭৩, ৩৭৭	
বিষ্ণুপ্রিয়া (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৬৫
বীর-বিক্রম (নাটক)	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ ৩৩, ৪৯, ১০৫, ১৬০	
বুদ্ধ	কুমারী নিরুপমা দেবী	৩৫১
রাজা রামমোহন রায়	শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ	২৪১
রায় মহাশয় (নক্সা)	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল	৬৪
শারদ প্রভাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	২০৬
শিল্পী (গল্প)	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সী	৯৪
শ্যামনগরের জমিদার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল	২৩১,২৮৬
শ্রাবণ ধারা (কবিতা)	কুমারী নিরুপমা দেবী	১৭৮
শ্রীমতী হিব্যানস		১০
শ্বশুর ও পুত্রবধূ	শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রলাল চৌধুরী	১৬৭
স্বাস্থ্যোন্নতি	যুক্ত নীলরতন সরকার এম, এ এম ডি ...	১৫৭
স্বর্গীয়া শিবসুন্দরী দেবী		১১১

১৩২১ সনের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের

সভাপতি-পঞ্চক

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় সিউড়ীর মহারাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (Tennyson.)

মর্ম্মানুবাদ :- স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not will not retreat a single inch——and I will be heard." (William Lloyd Garrison)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অসমঝীয় হইব। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ | বৈশাখ, ১৩২২ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষা

মানুষ নগ্ন, দুর্ব্বল, শক্তিহীন-অবস্থায় জগতে আসে। তার যা কিছু মহত্ব, তাহা ভবিষ্যতে মহৎ হওয়ার সম্ভাবনামাত্র। প্রত্যেক শিশুর জন্মকাল মানুষের আদিম অবস্থা। এই অবস্থা হ'তে কেহ কেহ ৬০।৭০ বছরেও বেশী দূর অগ্রসর হয় না। জ্ঞান বৃদ্ধিতে পশু বা শিশুই থেকে যায়। জীবন্ত বীজকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হলে, সফল ক'রে তুল্‌তে চলে, তার ভিতরের জীবনটিকে বাহিরের আবেষ্টনকারী নানা শক্তির অবাধ আলিঙ্গন দিতে হয়। যেমন বীজ ভাল হওয়া চাই, তেমনি ক্ষেত্র উর্ব্বর, এবং সেই সঙ্গে সময় মত রোদ বৃষ্টি ও ছায়া, জলও পাওয়া চাই। মানব-শিশুর মধ্যে জীবন্ত বীজ আছে, তাকে উন্নত জ্ঞান, উন্নত ভাব, উন্নত কাজের মধ্যে রাখ, সে জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মী হ'য়ে উঠ্‌বে। দুজন কি দশ জন বিখ্যাত লোকের দ্বারে এ ব্যবস্থা হয় না। গ্রামের, নগরের, দেশের অধিকাংশ লোক যদি, জ্ঞানে, চিন্তায়, আকাঙ্ক্ষায়, কাজে উন্নত হয়, মহৎ হয়, তা হলেই সেই অনুকূল আবেষ্টন তৈরি হয়, যার মধ্যে থেকে মানুষ-বীজ মহৎ হ'য়ে উঠে। শিক্ষার কাজ —প্রত্যেক জ্ঞানহীন দুর্ব্বল মানুষকে, অর্থাৎ আদিম অবস্থায় অবস্থিত মানব-শিশুকে মানবজাতির এত দিনকার জ্ঞান-সম্পদ দিয়ে শক্তিশালী করা। শিক্ষা, কেবল কয়েকটি বিদ্যালয়ে লাভ হয় না। দেশের যত লোক শিক্ষিত হবে, ততই এই আবহাওয়া তৈরি হবে। এজন্য নরনারী সকলের সমানভাবে শিক্ষা লাভ আবশ্যক। নারীগণ শিক্ষিত না হ'লে গৃহের ও সমাজের হাওয়া বিশুদ্ধ, উন্নত ও পুষ্টিকর হওয়া অসম্ভব।

কত পরিবারে দেখা যায় কর্ত্তা এবং কর্ত্তার বড় বড় ছেলেরা শিক্ষিত, বেশ ভাল লোক, উন্নত আকাঙ্ক্ষা মনে আছে: তাঁদের ইচ্ছা পরিবার মধ্যে স্নান আহার নিদ্রা, সন্তান পালন, সন্তান শিক্ষা, এবং সামাজিক ক্রিয়া কলাপ, সবই উন্নত আধুনিক প্রণালীতে হয়: কোন কুসংস্কার, কুপ্রথা গৃহে স্থান না পায়; কিন্তু মহিলাদের—জননী ও ভগ্নীদের (দাস দাসীদের তো কথাই নাই) অজ্ঞতা, মূর্খতা, এবং জনসমাজে স্বাধীন গতিবিধির অভাব, তাঁহাদিগকে পুরুষদের সকল রকম আকাঙ্ক্ষার বিঘ্ন স্বরূপ ক'রে রেখেছে, এবং এজন্য দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকিত হ'য়ে রয়েছে। তাই এখনও কবির সঙ্গে বল্‌তে হয়—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগে না।"

নারীশক্তি

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হ'তে জগতে আর শান্তি নাই। সমস্ত পৃথিবীময় যেন আগুন লেগেছে। কেবল ধ্বংস, রক্তপাত, হাহাকার। কিন্তু অন্য দিকে, মহৎ সেবারও নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে। নানা স্থানে নানা দেশের মেয়েরা শান্তি আনবার যে চেষ্টা করছেন, তা বিস্ময়কর। ইংলণ্ডে "মহিলা শান্তি সমিতি" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তাঁরা বক্তৃতা করে, পত্র লিখে, বই ছাপিয়ে বিতরণ ক'রে, এবং আরও নানা উপায়ে, নারীর কর্ত্তব্য, উন্নত অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে নারীজাতিকে এক মহাভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রবার চেষ্টা করছেন। এই সভার সভ্য হ'তে হ'লে দুটি বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত হ'তে হয়—১ম—যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা, এবং ২য়—শান্তি স্থাপনের জন্য কিছু চেষ্টা করা। অধিকাংশ লোক যুদ্ধের নামে ভয় পায়, যুদ্ধ না হওয়াই ভাল ব'লে মনে করে, কিন্তু সেই সঙ্গেই মনকে প্রবোধ দেয় যে যুদ্ধ অনিবার্য্য, একবারে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল মহামনা মহিলা এই সভা ক'রেছেন, তাঁরা জোরের সঙ্গে মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য নয়: নারীজাতি জগতের মা, তাদের প্রধান কাজ জীবন রক্ষা, তার জন্য প্রাণপণ করা। নারীজাতি কোন দেশে এ কাজের ভার ভাল ক'রে বহন করে না, তাই জগতে যুদ্ধ সম্ভব। এতদিন যে সভ্যতার রাজত্ব ছিল, যে সমাজবিধি, রাজনীতি, সমাজ এবং দেশ রক্ষা ও প্রতিপালন ক'রতো, তাতো এক রকম নারী-বর্জ্জিত, নারীশক্তি বর্জ্জিত। দেশ, সমাজ, রাজ্য, শিক্ষা, সভ্যতা—সবই যেন মা-হারা হ'য়েছিল, এখনও র'য়েছে তাই সকল জায়গায় এত সহজেই মারামারি সম্ভব হয়। এই যুদ্ধ মাতৃহীন-সভ্যতাকে চূর্ণ ক'রে ফেল্‌ছে। যুদ্ধের পর আবার সব দেশে নূতন করে জীবনের কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে। এইবার মেয়েদের স্থান মেয়েদের নিতে হ'বে,—জগতের, দেশের, রাজ্যের, সমাজের মা হ'য়ে তাদের বস্‌তে হবে; রমণী সকল জাতির গর্ভধারিণী, ধাত্রী, পালনকর্ত্রী; এ পর্য্যন্ত তার কাজ কেবল সূতিকা গৃহেই আবদ্ধ ছিল; এখন আর তা কর্‌লে চল্‌বে না; যে জীবন নারী আপনার রক্ত দিয়ে, শক্তি দিয়ে জগতে আনে ও ফুটিয়ে তোলে সেই অমূল্য জীবন রক্ষার জন্যও সে দায়ী; সে জীবন যাতে রক্ষা পায়, সার্থক হয়, পরিপূর্ণ হয়, অকালে খড় কুটার মত ধ্বংস না হয়, সে জন্য শক্তি ব্যয় না করলে, মার কাজ অপূর্ণ থেকে যায়। সকল দেশের নারীদের মনে এই মহৎ দায়িত্ব-বোধ জাগিয়ে তোলাই প্রকৃত শান্তির পথ। এই কাজের জন্যই এই সভার জন্ম।

রুশ রমণী

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হ'তে রুশ রমণীগণ দেশের প্রকৃত মাতার কাজ কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন। তার ফলে রাশিয়ার অনেক নগর, কয়েক মাসের মধ্যে স্বর্গে পরিণত হ'য়েছে। নগরে নগরে রমণীগণ রাজবিধির সাহায্যে মদের দোকান উঠিয়ে দিয়েছেন, বিবিধ পাপের পথে জাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়েছেন; তার ফলে, অনেক নগরের অর্দ্ধেক পুলিশ কমিয়ে দিতে হ'য়েছে, যারা আছে তাদেরও কোন কাজ নাই, এবং জেলখানাও প্রায় শূন্য হ'য়ে পড়েছে। যারা নিঃসম্বল ছিল তাদের হাতে দু পয়সা হ'য়েছে, গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা

নিজের গ্রামের উন্নতি করবার চেষ্টা করছে, কাঠের ঘরে আগুন লাগা অর্দ্ধেক কমে গিয়েছে, সকলেই ভাল খায় ভাল পরে; ঝগড়া নাই, অশ্লীল গান নাই,—চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে। এই ভয়ানক যুদ্ধের সময় এমন শান্তি কি বিস্ময়কর! এ ব্যাপারের মূল নারীশক্তি।

আন্তর্জাতিক নারী-সম্মিলন

প্রায় একমাস পূর্ব্বে লণ্ডনে ইংরাজ, বেলজিয়ান্, জার্ম্মান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সদাশয় মহিলাগণের একটি সভা হ'য়েছিল। জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য নারীগণ কি করতে পারেন সে বিষয়ে পরামর্শ করাই এই সভার লক্ষ্য।

মানবজাতি, সকল দেশে, সকল কালে কেবল পুরুষদের হাতে র'য়েছে; তার ফলে, কত ধর্ম্মতত্ত্ব, কত সাধু জীবন, কত শাস্ত্র, কোথায় তলিয়ে গেল, দিন দিন শিক্ষা ও সভ্যতার নামে যেন বর্ব্বরতাই বেড়ে যাচ্ছে। কেবল পুরুষ-শক্তির যথেষ্ট পরীক্ষা হ'য়েছে। এখন পুরুষ ও রমণী উভয় শক্তি এক ক'রে নূতন ভাবে মানব-জাতির শাসন ও পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে দাঁড়াবার প্রথম ধাপ শান্তি স্থাপনের সূচনা। শান্তি স্থাপন নারীরই কাজ। তাই বিভিন্ন জাতীয় মহিলাগণ সে দিন পরামর্শ করেছেন—শান্তি স্থাপনের জন্য কাজে কি করা যায়,—নারীগণ কি কি উপায় অবলম্বন করতে পারেন—কি ভাবে শান্তি স্থাপিত হ'লে তা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। যুদ্ধলিপ্ত সকল দেশের রাজ-সরকারে এই সভা হতে পত্র লিখে জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে, কোন্ দেশ কি কি সর্ত্তে সন্ধি করতে রাজী আছেন; এই সংবাদ এই সভা জানতে চান। সেই পত্রে এই কয়েকটি সর্ত্তও সকল রাজশক্তিকে জানান হ'য়েছে:—

(১) ভবিষ্যতে সকল আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা সালিসি দ্বারা হবে।

(২) সকল জাতির অপর দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ সঙ্ঘ-সাধারণের মতানুসারে স্থির হবে। পুরুষ ও নারীর অধিকার এবিষয়ে সমান হবে।

(৩) অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রাজ্যের কোন অংশ অপর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

সবশেষে এই সভা জানাইয়াছেন যে যুদ্ধের কুফল ও দুঃখ যাতনা মেয়েদের জীবনকে যেমন কঠিন আঘাত করে, তেমন পুরুষদের করে না; সুতরাং শান্তি স্থাপনের জন্য যত পরামর্শ-সভা হবে, তার মধ্যে মেয়েদের যেন স্থান থাকে।

এই সভার কাজ চালাবার জন্য একদিনের সভাতেই ৩,৫০০৲ টাকা চাঁদা উঠেছে। ইংরাজ, জাপান, বেলজিয়ান্, ফরাসী মহিলাগণ এ সভার যোগ দিয়ে কাজ আরম্ভ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে, এ সভার উদ্যোগে, এই বৈশাখ মাসে হেগ নগরে একটি আন্তর্জাতিক মহা-নারী-সম্মিলনী হবে।

মাতৃচর্য্যা

ইংলণ্ডের সহৃদয় মহিলাদের চেষ্টায়, সহস্র-সহস্রহীন প্রসূতিদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৫০০ পরিচর্য্যালয় খোলা হ'য়েছে—এবং প্রতি সপ্তাহে ৪।৫টি করে নূতন আশ্রম খোলা হচ্ছে। এই সব আশ্রমের সূচনা হয় এইরূপে:—ইংলণ্ডের পাঠশালার পরীক্ষ ছাত্রদের স্বাস্থ্য সন্তোষজনক নয় দেখে, কয়েকজন মহিলা ও মহিলা-ডাক্তার তার কারণ অনুসন্ধান ক'রতে আরম্ভ করেন। দারিদ্র্য এবং মাতার সন্তানপালন বিষয়ে অজ্ঞতাই গরিব-শিশুদের দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ ব'লে তাঁরা নির্দ্ধারণ করেন। ছেলেদের শরীর সুস্থ সবল না হ'লে, তাদের পড়াশুনা ভাল হবে না, এবং তারা বড় হ'য়ে কদাচিৎ শক্তিশালী পুরুষ এবং নারীও হ'তে পারবে না। শরীর সুস্থ না হ'লে সবই বৃথা। কোন জাতির শক্তি ও গৌরব তো দু' দশ জন বড়লোক নয়, সর্ব্বসাধারণ। সুতরাং লক্ষ লক্ষ গরীব শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা দেশের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য, গরিব মায়ের জন্য কি করা যায়, কেমন করে গর্ভাবস্থায় তাঁদের সেবা যত্ন ঔষধপত্র দিয়ে সাহায্য করা যায়, প্রসবের সময় এবং তারপর শিশুপালনের সময়, কি রকম ক'রে তাদের সাহায্য করা যায়—এই চিন্তার ফলে স্থানে স্থানে "মাতৃশিক্ষা-কেন্দ্র" খোলা হয়। এই সব কেন্দ্রে সন্তান-পালন, শরীর-পালন,

রোগীর সেবা, রান্না প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং আবশ্যক মত ডাক্তার ও ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এইসব কেন্দ্রের কাজ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে—আরও যাবে,—যুদ্ধের শেষে দেশের পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাবে: এখন যারা শিশু অথবা যারা এখন জন্মাবে তাদের রক্ষা করতে না পারলে, ভবিষ্যতে দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত শোচনীয় হবে। এই ভেবে, চিন্তাশীল ইংরাজ নরনারী মাত্রেই শিশু-রক্ষায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন, গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি বড় বড় অর্থশালী ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে সাহায্য করছেন। এ কাজটা এখন তত বড় ব'লে মনে হচ্ছে না, কিন্তু এরই উপর ইংরাজ-জাতির শক্তি নির্ভর করবে। হায়! আমাদের দরিদ্র দেশে এমন কত আয়োজনের আবশ্যক! এক কলিকাতা মহানগরীতেই আলো বাতাস, খাদ্য ঔষধ, জামাকাপড়ের অভাবে প্রতি বছর শত শত শিশু প্রাণত্যাগ করে। গ্রাম দেশের ত কথাই নাই।

ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রম

"বঙ্গীয় অবনত জাতির উন্নতি বিধায়িনী সমিতি", "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সমিতি" ও "ঢাকা বিধবাশ্রম"—এই তিনটী প্রতিষ্ঠানের জন্মদান ক্ষুদ্র ভারত-মহিলার জীবনের বিশেষ ঘটনা। আমাদের অনেক পাঠক পাঠিকার আশীর্ব্বাদ ও সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিপুষ্ট করিতেছে। এই জন্য ভারত-মহিলার মাঝে মাঝে আমরা এই প্রতিষ্ঠান তিনটীর উন্নতি অবনতির আলোচনা করিয়া থাকি। গত চৈত্র মাসের পত্রিকায় হিন্দু বিধবাশ্রমের বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের নূতন পাঠিকা ভগিনীদের মধ্যে কেহ যদি এই আশ্রমের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহেন পত্র লিখিলে আমরা তাঁহাদিগকে মুদ্রিত রিপোর্ট পাঠাইয়া দিব।

কলিকাতার ৮টী মহিলা সমিতির পরিচালিকাগণের আহ্বানে সেদিন কলিকাতার মেরী কার্পেণ্টার হলে ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মহিলাগণ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন:—সঙ্গীত সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী (জষ্টিস্ চৌধুরীর পত্নী) ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি. এ; মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী সরলা রায় (ডাঃ পি কে, রায় মহাশয়ের পত্নী) ও শ্রীমতী অমলা দত্ত (ব্যারিষ্টার কে, দি, দত্ত মহাশয়ের পত্নী); মহিলা শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, করুণা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি. এ, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস, ভারত-মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বি,-এ, শ্রীমতী কুসুমকুমারী মৈত্র, (শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পত্নী) ও শ্রীমতী সুবালা হালদার (ডাক্তার হীরালাল হালদারের পত্নী), সঙ্গীত সম্মিলনীর পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রমদা চৌধুরী (মিসেস বি, এল, চৌধুরী) ও ভগিনী সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক (ডাক্তার ডি, এন মল্লিকের পত্নী)। বলা বাহুল্য, অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশ্রমের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু- হিন্দু বিধবাদিগের অবস্থা ও ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রমের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী, শ্রীমতী কামিনী রায় বি. এ, মহোদয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সভাস্থলে পাঠ করিবার জন্য যে অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। সমবেত মহিলাগণ আশ্রমের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনেকে আশ্রমের সাহায্যার্থে অর্থ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত মহিলা সমিতিগুলির কর্ত্রীগণের কৃপা-দৃষ্টি ও সমবেত মহিলাগণের সহানুভূতি লাভ দরিদ্র বিধবাশ্রমের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আশ্রম যে ইঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে তাহার বহু কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাজসাহীতে "উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন" এবং ২৩। এপ্রিল শুড্‌ক্রাইডের ছুটির

সময়, বর্দ্ধমানে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা করেন। সভাপতি হইয়াছিলেন "নবুজ-পত্রের" সম্পাদক, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। প্রায় দেড় শত প্রতিনিধি নানা স্থান হইতে আসিয়াছিলেন; এবং প্রায় দেড় হাজার দর্শক টিকিট কিনিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; মহিলাদের স্থানও একবারে পূর্ণ হইয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধির আতিথ্যস্বীকারের সকল ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রধান সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। একজন প্রধান সভাপতি ভিন্ন এক এক বিষয়ে এক এক জন স্বতন্ত্র সভাপতি ছিলেন:—সাহিত্য-শাখার — শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং, দর্শন-শাখার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, ইতিহাস শাখার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়, বিজ্ঞান-শাখার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়—সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বহু লেখক এই সকল শাখা সভায় অনেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়দের অভিভাষণ অতি সারবান কথায় পরিপূর্ণ। প্রধান সভাপতি মহাশয় প্রধানতঃ প্রাচীন বঙ্গ গৌরব-স্থল ২০টি বিষয়ের আলোচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ইংরাজী ও সংস্কৃতের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষাকে সহজ, সরল ও মিষ্ট ক'রে তুলতে হবে।

ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—ইতিহাস কাব্য নয়। ইতিহাস সত্যাশ্রয়। সত্য, প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, গ্রহণ করিতে হইবে। সত্য ইতিহাস জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান।

দর্শন শাখার সভাপতি দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন—দর্শন সত্য দেখিবার শক্তি। সহজ সরল ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ রচিত না হইলে দেশের একটা মহা অভাব দূর হইবে না।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বলিয়াছেন—বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যয়সাধ্য। অন্নচিন্তা না করিয়া ক'জন জ্ঞান-চর্চ্চা করিতে পারে? দু'চার জন বিজ্ঞানবিৎ হইলেই দেশ উঠবে না। বিজ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গে ধনবৃদ্ধির উপায় থাকা চাই।

লর্ড রবার্টসের পত্র

মুহাধীর লর্ড রবার্টস্ ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে দু'দিনের অসুখে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ তাহা জানেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সময় লর্ড কার্জনকে একখানি পত্রে কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন, তা সকলেরই চিন্তার বিষয়। সেই কয়টিলি এই:—"পঞ্চাশ বৎসর আমরা পারিবারিক ঈশ্বর অর্চনা রক্ষা করেছি। এই প্রার্থনার সময় পরিবারের সকলে যে ভাবে একত্র হয়, অন্য কোন কারণে তেমন হয় না। পরিবারের অনেকেই নানা কারণে হয়ত একবারও নিজে নিজে প্রার্থনা করতে পারে না, কিন্তু এই ব্যবস্থা থাকায় একবার ভগবানের নাম করবার বিশেষ সুযোগ তারা পায়। এইজন্য পারিবারিক প্রার্থনার ব্যবস্থা সযত্নে রক্ষা করেছি। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হ'তে প্রতিদিনের প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে আমি কিছু বলি; তারপর সাধারণত একটি প্রার্থনা পাঠ করি। এইরূপে দেখেছি, কী-চাকরেরাও ফ্রান্সে কোথায় কি হচ্ছে সে বিষয় চিন্তা করছে। এই প্রার্থনায় আসবার জন্য আমরা কখনও আদেশ দিই নাই,—যার ইচ্ছা সে আসবে, এই নিয়ম; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখেছি, ঘণ্টা দিবা মাত্র দাসদাসী সকলেই যথাসময়ে উপস্থিত হ'য়েছে।"

প্রার্থনায় বিশ্বাস ও অনুরাগ না থাকলে লর্ড রবার্টসের ন্যায় ব্যক্তি সমস্ত ব্যস্ততা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে

এমন ক'রে নিত্য-নিয়মিত রূপে কী-চাকরদের পর্য্যন্ত নিয়ে ভগবানের অর্চ্চনা কর্‌বার সময় পেতেন না। এইরূপ চরিত্রই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জাতির পরম সম্পদ ও মহাশক্তি। এ শক্তির সাধনের স্থান—গৃহ, পরিবার, এবং এর ভর্ত্রী নারী গৃহিণী, রমণী। এ দেশের গৃহে গৃহে কবে এমন প্রাধান্য দেওয়া প্রার্থনা স্থান পাবে?

চাঁদপুরে অগ্নিকষ্ট

পেটের আলার মত জ্বালা আর নাই। চাঁদপুরে শত শত নরনারী, শিশু বৃদ্ধ যুবা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। দেশের জননী ও ভগিনীগণ এ সময় কি নীরব থাকিবেন? বুভুক্ষুরাও যে তাঁদেরই সন্তান, তাঁদেরই ভাই-বোন! নানা স্থান হ'তে সহৃদয় ব্যক্তিগণ সাহায্য পাঠাচ্ছেন, অর্থ সংগ্রহ ক'রে পাঠাচ্ছেন। ভারত-মহিলার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় ঢাকা সহর হইতে অন্নক্লিষ্টদের সাহায্যের জন্য আজ পর্য্যন্ত ৭৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন, আরও সংগ্রহ করিতেছেন। ভারত-মহিলার গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণও চাঁদপুর অন্নকষ্ট নিবারিণী সমিতির সম্পাদক আমাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে বি, এ, মহাশয়ের নিকট অর্থ প্রেরণ করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন। তাঁহার ঠিকানা:—পোঃ বাবুরহাট (ত্রিপুরা)। আমাদের নিকট টাকা পাঠাইলে আমরাও যথাস্থানে পাঠাইতে পারি।

প্রশ্ন ও উত্তর

ভারত-মহিলার পাঠকপাঠিকাগণ সন্তান পালন, সন্তান-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, গৃহধর্ম্মপালন, রোগীর সেবা প্রভৃতি মহিলাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন অথবা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা তাহা মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিব। পাঠকপাঠিকাদিগের সহিত চিন্তার বিনিময় করিতে পারিলে, তাঁহাদের চিন্তার অংশ লাভ করিতে পারিলে, ভারত-মহিলা আরও তাঁহাদের মনের মত হইতে পারিবে।

গৃহ-পরিবার

নারীর অধিকার

জাতীয় মহত্বের ভিত্তি গৃহ,—এক একটি পরিবার। স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং প্রকৃত মানুষ তৈরি কর্‌তে পারে না। দেশের উন্নতির মূল গৃহের মধ্যে। পরিবার যদি ভাল হয়, গৃহের মধ্যে যদি সত্য-নিষ্ঠা, পরস্পরের প্রতি প্রেম, ভগবানে ভক্তি, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা থাকে, তাহলে গৃহের ছেলেমেয়েরা ভাল মানুষ হয়। ভাল মানুষ দিয়েই দেশের উন্নতি এবং জাতির গৌরব।

গৃহের প্রধান ব্যক্তি পরিবারের কর্ত্তা ও গৃহিণী, স্বামী ও স্ত্রী, মা ও বাবা। তাঁরা যেমন হবেন, পরিবারটি প্রধানতঃ তেমনিই হবে; ছেলেপিলেরা তেমনি হবে। সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীর ভাল হওয়া সকলের মূলে। আবার তার মূলে বিবাহ। একটি ভাল কন্যার সঙ্গে যদি একজন ভাল যুবকের বিয়ে হয়, তা হলে, পরে তাদের সম্বন্ধ ও ব্যবহার ভাল হবে, এবং সবই ভাল হবে আশা করা যায়। ভাল আমের আঁঠি ভাল স্থানে লাগাও, সেই আঁঠির গাছ ভাল হবে, তার আমও মিষ্টি হবে।

যে সব ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে, বড় হ'য়ে, নিজেরা চিন্তা ক'রে, বন্ধুভাবে পাঁচ জনের সঙ্গে মিলেমিশে, পরিচয়ের পরে একজনকে জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনীরূপে বরণ করে, তাদের দায়িত্ব খুব বেশী। দু এক ঘণ্টার আলাপ বন্ধুতা এক জিনিষ, আর সমস্ত জীবনে সুখ দুঃখ খুঁটিনাটি এক সঙ্গে বহন করা এক জিনিষ। একথা মনে রেখে স্বামী-স্ত্রী নির্ব্বাচন করতে হয়।

যে সব ছেলে মেয়ের বিয়ে অভিভাবকেরা স্থির করেন, তাদেরও জীবনের এত বড় ঘটনাটা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করতে হয়। ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান অভিভাবকদের কর্ত্তব্য যে মেয়ে বা ছেলের অবস্থা প্রভৃতি সব বুঝে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের পতি বা পত্নী নির্ণয় করেন, এবং ছেলে মেয়েদের সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলেন। বিবাহ কি ব্যাপার সে বোধ

যার হয় নাই, তার বিয়ে দেওয়া পাপ। এ পাপ এ দেশে হ'তে দিন দিন উঠে যাচ্ছে। এখন অনেক মেয়েরাও বয়স্কা হ'য়েই বিয়ে করে। স্বামী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মেয়েদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। এটাকে জীবনের সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক কাজ মনে করা উচিত।

বিবাহের পর আর পতি পত্নীর দোষগুণের বিচার করা কর্ত্তব্য নয়। তখন প্রধান কর্ত্তব্য, দুইজনের মধ্যে সম্বন্ধের গভীরতা সাধন। সংসারের আয় ব্যয় নানা প্রকার কর্ত্তব্য, সুখ দুঃখ সমাজ ও ধর্ম্ম সকল বিষয়ে কথা বলা, পরামর্শ করা, পরস্পরের ভার ভাগ করে বহন করা,—এইরূপে দুই জীবনের সংমিশ্রণ সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ একটি প্রধান ব্রত। বিবাহ-প্রতিজ্ঞাই এই ব্রত কাঁধে চাপিয়ে দেয়। এ ব্রত পালন পরিবারের সকল কল্যাণের মূল, গৃহের সকল সুখশান্তির মূল।

কিন্তু সকল বিষয়েই যে পতি-পত্নীর একমত হবে, কোন বিষয়ে দুজনের মত ও কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র হবে না, এমন মনে করা ঠিক নয়। দুজন মানুষ তো দুজনই থাকবে; পরিবারের মঙ্গল সাধনে দুজনেরই এক লক্ষ্য এক আকাঙ্ক্ষা হ'লেও, দুজনের কাজ বা প্রণালী সব সময় এক হওয়া সম্ভব নয়। দুজনের নানা বিষয়ে রুচিও বিভিন্ন হ'তে পারে। এই যে কাজের প্রণালীর বা রুচির বিভিন্নতা, এ যেন উভয়ের মিলনের পথে বাধা না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যতটা সম্ভব, নিজের নিজের রুচিই বদলাতে চেষ্টা করতে হয়, অপরের রুচি বদলাবার দাবি করতে হয় না। পতি ও পত্নী উভয়েই পরস্পরকে স্বাধীনতা দিয়ে নিজেই অধীন হ'তে চাইবেন, এই হ'ল মিলনের সঙ্কেত। "উনি ওঁর মতে চলুন আমি আমার মতে চলি" এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল, মিলনের পথে মহা বিঘ্ন।

পতি ও পত্নী—দুজনের কাজ দুরকম তো হবেই। পতির কাজ বাহিরে—স্কুলে কি অফিসে; আর পত্নীর কাজ গৃহের ভিতরে। সংসারের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে কত রকম কাজ, কত রকম লোক, কত অবস্থার মধ্যে পতিকে চ'লতে হবে,—কত ভাবনা, দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম, কত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চলতে হবে, কত দৌড়া-দৌড়ি করতে হবে,—কতক্ষণ পত্নীর সঙ্গ ছেড়ে দূরে বাহিরে থাকতে হবে। কিন্তু, পত্নী তাঁর গৃহের রাণী। গৃহেও সংগ্রাম, পরিশ্রম, কত রকম লোকের সঙ্গে কারবার আছে. সে সবই গৃহিণীকে করতে হবে,—সর্ব্বোপরি গৃহিণীর মহৎ অধিকার—এই গৃহকে শান্তির স্থান করা। একজন মহাপণ্ডিত এক দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে কত সংগ্রামের মধ্যে থাকতে হ'ত; তিনি একদিন বলেছিলেন, "আমার বাড়ীতে পা দিলেই আমার সকল ভাবনা চিন্তা দূর হয়।" এমন শান্তিপূর্ণ গৃহরচনার সুযোগ পত্নীর উচ্চ অধিকার। বুদ্ধিমতী পত্নী বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের কোন রকম দুশ্চিন্তা ভাবনা গৃহে আসতে দেন না। যদি পতি কোন প্রকার অশান্তির বোঝা বহন করে আনেন, তা হ'লে পত্নীর কর্ত্তব্য আনন্দের সঙ্গে সেই বোঝা উভয়ে ভাগ করে বহন করা। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব পতির মনের ভার দূর করবার চেষ্টা করা উচিত।

তাই ব'লে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে গৃহের যা কিছু সবই পত্নীই করবেন, বা গৃহকে পতির আনন্দ সম্ভোগের স্থান করে রাখাই পত্নীর একমাত্র কাজ। তা হতেই পারে না। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি দুজনের মনোযোগ, চেষ্টা, এবং প্রেম ছাড়া সুখী পরিবার হয় না। গৃহ কেবল কর্ত্তব্য সম্পাদনের স্থান নয়, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রে গেলেই গৃহ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় না। গৃহের মধ্যে আনন্দের সংস্থান করতে না পারলে, সে গৃহ গৃহই নয়। পরিবারের সুব্যবস্থার শেষ নাই। কি করে গৃহ পরিবার আরও সুন্দর হয়, আরও সুখশান্তির আলয় হয়—এ চিন্তা একদিনের জন্যও পতি-পত্নীর মন হ'তে দূরে রাখা উচিত নয়। গৃহ সম্বন্ধে 'আর পারা যায় না' মনে করাই সকল অশান্তির কারণ। তোমার গৃহে যদি শান্তি আনন্দ না থাকে তুমি অপরকে আনন্দ দিতে পারবে কিনা সন্দেহ! জনসমাজের সেবার জন্য, দীন দুঃখীর কল্যাণ সাধনার্থে অনেক সময়, চিন্তা ও

পরিশ্রম আবশ্যক, কিন্তু সে জন্য আপনার সন্তানের কল্যাণ, সুব্যবস্থা ও আনন্দবিধান কখন ও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

গৃহের সুখশান্তি বিধানের জন্য পতি-পত্নী উভয়েই দায়ী; কিন্তু তবুও, গৃহের আনন্দ শান্তি বিধানে পত্নীর সুযোগ ও অধিকার অনেক বেশী, দায়িত্বও গুরুতর।

একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার প্রথম বয়সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি এক আফিসের কেরাণীর কাজ করতেন। একদিন আফিসে গিয়ে শুনলেন যে অন্যান্য অনেক কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁরও কাজ গিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বিষণ্ণ মনে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। তাঁর মুখ দেখেই পত্নী বুঝতে পারলেন, বিশেষ কিছু হ'য়েছে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি পত্নীকে বল্লেন—"আমার কাজ গিয়েছে!" পত্নী নীরবে অপর গৃহে গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে একটি আলো, দোয়াত কলম ও কাগজ এনে স্বামীর সাম্নে রেখে, তাঁর কাঁধে একখানি হাত দিয়ে হেসে বল্লেন, "তুমি ভাব্‌ছ কেন? বেশ হ'য়েছে, এই নাও, এইবার বই লেখায় মন দাও।" এই কথায়, পত্নীর এই ব্যবহারে, এই আশায়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তিনি আলো দেখতে পেলেন। এই ঘটনার ফলে তিনি জগতে অমর হয়ে গেলেন।

পতির সকল ভার বহনে প্রস্তুত সহধর্ম্মিণী পত্নীর শক্তি এমনি অসাধারণ। জীবনে কত দুরবস্থা আসে, কত বিপদ আসে, যে অবস্থায় একাকী সব ভার বহন করা কোন ব্যক্তির পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু সেইরূপ অবস্থায় পত্নীর সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভের পরিবর্ত্তে যদি কেবলই তাঁর মনে হয়, "এ অবস্থায় আমার স্ত্রীকে কি বল্‌বো, তাকে কি করে সামলাব," তা হ'লে সংগ্রাম অতি তীব্র হয়। দুঃখে দুরবস্থায় যখন পতি বিব্রত, তখন স্ত্রীর উৎসাহপূর্ণ মৃদু হাসি, "কোন ভয় নাই" "সব ঠিক হয়ে যাবে," এই রকম দু একটি সাহসের কথা অমৃত-তুল্য। পত্নীর একবিন্দু প্রেম, আশা, উৎসাহ, পতির কঠোর সংগ্রামে যেমন মহৌষধ, তেমনি তার অভাব অতি তীব্র বিষ।

পতির কঠোর সংগ্রামময় জীবনে প্রেম আনন্দ ও উৎসাহ বর্ষণ করা পত্নীর প্রধান কাজ। এক ভদ্রলোক দুরবস্থায় প'ড়ে, একদিন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে ব'লেছিলেন—"আমার ফোড়া হ'লে আমার স্ত্রী প্রাণ দিয়ে সেবা করবেন, কিন্তু তার চেয়েও যে যন্ত্রণার ব্যাধি আছে দুশ্চিন্তা, সে রোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি নাই, সে যাতনা তিনি আরও বাড়িয়ে দেন।" দুশ্চিন্তার মত কষ্টকর ব্যাধি আর নাই। পতি জীবনের শক্তি ক্ষয় ক'রে গৃহের জন্য পরিশ্রম করেন, পত্নীর কর্ত্তব্য গৃহকে এমন ক'রে রাখা যে পতি যেন গৃহে এসে সকল রকমে শান্তি পান, আরাম পান; চিন্তাভার বহনের একজন সহৃদয় সঙ্গী পান। সহানুভূতি, সমবেদনা আবশ্যক হয় না, এমন সময় পরিবারে কখনও আসে না। একটা ছোট কথায় বুকের বোঝা নেমে যায়; আবার, একটি কথার অভাবে বুক ভেঙ্গে যায়। বুকের বোঝা ছড়াবার জায়গা গৃহ। তা না হ'লে গৃহ বৃথা।

গৃহকে দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, বিরক্তি প্রভৃতি তিক্ত বিষয় হ'তে মুক্ত রাখা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ছোট খাট রুচির পার্থক্য, মতভেদের সংগ্রাম, সন্দেহের গ্লানি, স্বার্থপরতার কাঁজ গৃহিণীকে সাম্‌লাতে হবে, এ সবে অস্থির হওয়ার অধিকার গৃহিণীর নাই। পতির সঙ্গে যেখানে মতভেদ উপস্থিত হবে, সেখানে পথ ছেড়ে দেওয়াই ভাল,—শুধু পাপ করবার বেলা ছাড়া।

সংসার সংগ্রামে, বিষয় কর্ম্মে, পুরুষ মানুষকে সমস্ত দিন শত প্রকার চিন্তা ভাবনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকতে হয়; পত্নীর কর্ত্তব্য, পতির অবস্থা বুঝে, তাঁর সকল উত্তেজনা সাম্‌লিয়ে নিয়ে, শান্ত করা। তোমার শান্তিপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে তুমি তাঁকে টেনে নাও, তাঁর সকল ভার তোমার কাঁধে নাও, তুমিই তাঁকে সকল রকম পরামর্শ দাও, তাঁর সব ভার টেনে নিয়ে বিশ্রাম ও আনন্দ দাও। এজন্য অনেক ধৈর্য্য ও চিন্তা আবশ্যক। পত্নীর পক্ষে এ অতি পবিত্র কর্ত্তব্য।

পতি যা খুব ভালবাসেন, তা অতি সামান্য হ'লেও তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া পত্নীর কর্ত্তব্য। যাঁরা তাঁর প্রিয়, তাঁদিগকে তোমারও প্রিয় কর। পাঁচ জনের সঙ্গে না মিশ্‌লে, পাঁচ বাড়ী যাওয়া আসা না

থাকলে, কোন্ পরিবার ঠিক থাকতে পারে না। সমাজের সঙ্গে পরিবার যারা, পতি পত্নী উভয়কেই এক সঙ্গে এবং স্বতন্ত্র ভাবে অপর লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, নতুবা নিজেদের জীবনই শুষ্ক হ'য়ে যাবে। সমাজের ছোট বড়, জ্ঞানী গুণী মহৎ লোকদের জন্য, প্রতিবেশীদের জন্য গৃহের দ্বার সর্ব্বদা খোলা রাখবে। সমাজে যে স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তোমাদের যোগ রাখা আবশ্যক। সমাজের ভাল মন্দ সকলেরই জন্য: আমরা সকলেই সমাজের অঙ্গ।

গৃহই ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র। প্রকৃত ধর্ম্ম কোন মন্দিরে লাভ হয় না। সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থভাব, সেবা প্রভৃতি দেবগুণের সাধন পরিবার মধ্যেই হয়। মানুষ বড় হ'লেই জাতি বড় হয়; এই সব গুণ থাকলেই মানুষ বড় হয়; পরিবার ভাল হলেই মানুষ এইসব গুণ লাভ করতে পারে, এবং গৃহিণী ভাল হ'লেই পরিবার—গৃহ ভাল হওয়া সম্ভব। গৃহ পরিবারের এবং মানব সমাজের কেন্দ্র গৃহিণী। এ কথা তাঁর কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

সহিষ্ণুতার মত গুণ আর নাই। একবার আমেরিকার সেনাপতি মহাত্মা লিংকলনের এক বন্ধু তাঁদের ঘরে কি রকম রং দেওয়া হবে তাই নিয়ে ঝগড়া ক'রেছিলেন। স্ত্রী বলেন লাল রং—স্বামী বলেন সাদা রং। লিংকলন তাই শুনে বন্ধুকে বল্লেন—রংএর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবে? এ সামান্য ব্যাপার মিটমাট ক'রে ফেল।" পর দিন তিনি এসে বল্লেন—"আমি ছেড়ে দিয়েছি—লাল রং দিতে বলেছি।" ছোট খাট ব্যাপারে মতভেদ হ'লে ছেড়ে দিতে হয়—পরাজয় স্বীকারেই মহত্ব।

গৃহিণী সর্ব্বদা মনে রাখবেন, গৃহের প্রধান লক্ষ্য শান্তি, আনন্দ, প্রেম ও মহত্ব বিতরণ করা, এই সকল সদ্‌গুণ ফুটিয়ে তোলা। আর সবই অবান্তর।

এইরূপে প্রেম ও সহিষ্ণুতার দ্বারা, পরস্পরের কাছে আত্ম সমর্পণের দ্বারা পরস্পরের কল্যাণ চিন্তা দ্বারা, এবং সর্ব্বোপরি গৃহিণীর সহিষ্ণু প্রেমানন্দ ও উৎসাহের দ্বারা আদর্শ গৃহ, পরিবার, গঠিত হয়।

অবসর

এই অবসর!
শুভ্র এ জীবন মন, শুভ্র এ অন্তর!
আবর্জ্জনা দূরে ঠেলি, কনক চরণ ফেলি,
সাজ গো হৃদয় মাঝে তুমি নিরন্তর,
হে মোর সুন্দর,
এই অবসর!

২

এই অবসর!
বিরহ-বিধুর হিয়া আঁখি কর নত!
পূরিত বেদনায়, পূর্ণ যে বক্ষ হায়;—
অনন্ত আজি মোর মরম-ভিতর
এসো মনোহর,
এই অবসর!

৩

এই অবসর!
সন্ধ্যা ধীরে আসে নেমে ধরণী ধূসর,
কোলাহল নাহি আর, সুপ্তি-মৌন চারিধার,
অবসর চিতে, ওগো, শান্তি-সহচর,
কর তুমি ভর,
এই অবসর!

৪

এই অবসর!
বাধা যদি থাকে কিছু, ওগো বজ্রধর,
হান তবে হান বাজ, দূর করি দাও আজ,—
জীর্ণ জীর্ণ চিত্ত তুমি হউক জর্জ্জর,
নীরব নীথর!
এই অবসর!

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

শ্রীমতী হিম্যান্স্

ইংরাজ কবিদের মধ্যে মিসেস্ হিম্যান্সের স্থান অতি উচ্চে। আরও বহু ইংরাজ-মহিলা কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু হিম্যান্সের কবিতা প্রসিদ্ধ কবিদের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়া, উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। রবার্ট বাইরণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, লংফেলো, বিসপ হিবর প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও লেখকগণ তাঁর কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তাঁর কবিতায় কোন শ্রেষ্ঠতর কবির ছায়া ছিল না; তার সবটাই তাঁর নিজস্ব; এই জন্যই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকলের প্রশংসা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

মিসেস্ হিম্যান্সের প্রকৃত নাম ফেলিসিয়া ডোরোথী ব্রাউন্। তাঁর পিতা ব্রাউন্ সাহেব লিভারপুল নগরের একজন খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। সেখানে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ সেপ্টেম্বর ফেলিসিয়ার জন্ম হয়। অতি বাল্যকালেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধি ও স্মৃতি দুই প্রবর ছিল বলিয়া, বাল্যকালেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাঠ শেষ করিয়া অনেক বই পড়িতেন। এইরূপে এত শীঘ্র উন্নতি করিয়াছিলেন যে ছয় বৎসর বয়সের সময়, মহাকবি সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। অতি শীঘ্র তিনি গান বাজনা, ও ভাষা শিক্ষা করিতে পারিতেন। সেই বয়সেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন, এবং তাঁর পিতা সেগুলি ছাপিতেন। একজন একবার এই কবিতাগুলির তীব্র সমালোচনা করায় ফেলিসিয়ার মনে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে সেই জন্য তাঁর জ্বর হইয়াছিল। কিন্তু তবুও তিনি কবিতা রচনা ছাড়িতে পারেন নাই।

তাঁর দুই ভাই স্পেনের যুদ্ধে সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধের সময় "ইংলণ্ড ও স্পেন" শীর্ষক কবিতা লিখিয়া তিনি প্রশংসা লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। পর বৎসর ক্যাপ্টেন হিম্যান্সের সঙ্গে ব্রাউন পরিবারের পরিচয় হয়। ফেলিসিয়ার রূপ ও গুণ দেখিয়া ক্যাপ্টেন্ মুগ্ধ হ'ন এবং বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন্‌কে শীঘ্রই যুদ্ধে যাইতে হইল, বিবাহ আর হইল না। তাঁর মাতাপিতার ইচ্ছা ছিল না, যে এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ হয়, সুতরাং তাঁহারা এই ঘটনায় সুখী হইলেন। অতঃপর ব্রাউন পরিবার অন্যত্র গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ফেলিসিয়া দুই বৎসর স্পেন ও পর্টুগিজ ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং "পারিবারিক প্রেম" শীর্ষক কবিতাগুলি রচনা করিলেন। প্রায় তিন বৎসর পরে ক্যাপ্টেন্ হিম্যান্স্ ফিরিয়া আসিলেন, এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বিবাহ হইল। সেই হইতে ফেলিসিয়া ডোরোথী ব্রাউন "মিসেস্ হিম্যান্স্" নামে বিখ্যাত।

বিবাহের পর ৭ বৎসরের মধ্যে তাঁর পাঁচটি সন্তান হয়, এবং তিনি বহু কবিতা প্রকাশ করিয়া, ইংরাজী সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। যখন সর্ব্বত্র তাঁর প্রশংসা, সেই সময় ক্যাপ্টেন্ হিম্যান্স্, কি জানি কেন, জল বায়ু পরিবর্ত্তনের অছিলায় পত্নী হইতে বহু দূর গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ পত্নী ভরণপোষণের দাবী করেন, একটা হৈ চৈ করেন, কিন্তু ফেলিসিয়া সেরূপ কিছুই করিলেন না। তিনি নীরবে আপনার দুঃখ বহন করিয়া সন্তানদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং এ বিষয়ে সর্ব্বদা দূরস্থ স্বামীর সঙ্গে পত্রদ্বারা পরামর্শ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর অন্যায় আচরণের কথা প্রকাশ করিলে, সমস্ত ইংলণ্ডের সহানুভূতি লাভ করিতেন। তখন সর্ব্বত্র তিনি পূজিতা। কিন্তু তিনি যেমন নীরবে ভালবাসিয়াছিলেন, তেমনি নীরবে ক্ষমা করিলেন, গৃহের ও সন্তানদের মধ্যে অশান্তি আসিতে দিলেন না, সুগভীর প্রেমে তিনি যেন বেদনা-স্পর্শে আরও মহিমান্বিত হইয়া উঠিলেন।

এই ঘটনার পর, আরও সতের বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি অসংখ্য অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা লিখিয়া ইংরাজী সাহিত্য পরিপুষ্ট করেন। দিন দিন তাঁর যশ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

হইতে থাকে। মহাকবি ষ্ট ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুরূপে পরিগণিত হ'ন। একবার তাঁর খুব অসুখ হয়, তখন একজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসিয়া বলেন,—"আমি অবিশ্বাসী ছিলাম, আপনার "ন্যাস্টিক" নামক কবিতা পাঠ করিয়া আমি বিশ্বাসী হইয়াছি।" এই কথায় তিনি আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন—এবং বলিয়াছিলেন, ইহাই তাঁর কবিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

তিনি যেমন রূপবতী ও কোমল-হৃদয়া ছিলেন, তেমনি তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধও অসাধারণ ছিল। বৃক্ষে লতায়, আকাশে, পাহাড়ে সমুদ্রে, পুষ্পে, মানব-সমাজে যাহা কিছু সুন্দর তাহা যেন তিনি সমস্ত দেহ মন দিয়া পান করিতেন। বসন্তের সৌন্দর্য্য সম্ভারে তিনি তন্ময় হইয়া ইহ জগৎ ভুলিয়া যাইতেন।

তাঁর অতি প্রিয় বসন্তকালে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, তিনি শান্তভাবে পরলোক গমন করেন।

অবরোধ *

ভ্যালেন্সিয়া পর্ব্বতময় রাজ্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সম্ভারে চির-রমণীয়; সেখানে নির্ঝরের নির্ম্মল জলে এবং উন্মুক্ত উষাও বায়ুতে নব-জীবন, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি যেন স্বভাবতই সঞ্চরণ করে। বসন্ত সমাগমে ভ্যালেন্সিয়া নন্দন-কাননে পরিণত হয়। অধিবাসীগণ সৌর্য্য বীর্য্য আনন্দে নিত্য-নবোৎসবে দিন অতিবাহিত করে। দুর্ব্বলতা, নিরানন্দ, পরাজয়, মহামারী কাকে বলে, তা যেন সে দেশের লোক জানে না।

এবারও যথাসময়ে বসন্ত সমাগত। বৃক্ষলতা নব পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। পর্ব্বত-শিখর-স্পর্শী নীল আকাশ লঘু কুয়াশার চঞ্চল নৃত্যে সদা বিচিত্র। এবারও বিহঙ্গ-কাকলিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত; পর্ব্বতগাত্রে শত শত উৎস-উৎসারিত, শত শত কলনাদিনী নদী তল রজত-রেখার ন্যায় প্রবাহিত; সঙ্গে সঙ্গে শাবকসহ পার্ব্বত্য পশু সকল ক্রীড়া-রত।

কিন্তু এ সবই বৃথা। বিশ্বপতির এত আনন্দ এত সৌন্দর্য্য বৃথা, যদি তাঁর আদরের মানুষ ইহা সম্ভোগ না করিল। এবার ভ্যালেন্সিয়াবাসীগণ শত্রুর আক্রমণে বিপর্য্যস্ত।

আবদুল্লা নামক মুরজাতীয় মুসলমান রাজা নগর অবরোধ করিয়াছেন। রাণী, এক কন্যা এবং দুই পুত্র-সহ রাজা দুর্গপ্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিয়াছে। রাত্রেও শত্রুর আক্রমণ-ভয়। এ অবস্থায়, কে বসন্তের শোভা সম্ভোগ করিবে?

দিবা অবসানে, অস্তগমনোন্মুখ রবি-কিরণে উদ্ভাসিত, সুগন্ধ বায়ু-সেবিত, পার্ব্বত্য-শোভা-পরিবেষ্টিত, সুসজ্জিত প্রাসাদপ্রকোষ্ঠে রাজকুমারী জিমেনা সুমিষ্ট বেহালা বাজাইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ আর গান জমাট বাঁধিতেছে না! জিমেনা অষ্টাদশ বর্ষীয়া,— সুন্দরী, — সুপাত্রিকা; দেহ স্বাস্থ্য-লাবণ্যে উজ্জ্বল। কিন্তু আজ তার কণ্ঠস্বরে তেজ নাই, বেহালার শব্দে যেন ঝঙ্কার নাই,—দুই আওয়াজ যেন আজ কিছুতেই মিশিতেছে না! জিমেনা বার বার সঙ্গীত-স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বার বার গাহিতে লাগিল—

কে তুমি এসেছ রক্ত-সিক্ত কৃপাণ ধরিয়া করে,
শুষ্ক বদন মলিন বসন কপালে ঘর্ম্ম ঝরে?
কোথা হ'তে এলে ওগো সুন্দর, ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্র,
শত্রুর রুধিরে এসেছ কি ধুয়ে জাতীয় সমর-ক্ষেত্র?
শুভ্র-বরণ, পীত-নয়ন, শিরেতে শিখীর পাখা,
পুষ্প-কোমল বজ্র-কঠিন দুই ভাব মুখে মাখা,
বুঝা মহাবীর, দেখেছ কি তাতে? তার কি হয়নি শেষ?
কি বলিলে তুমি? স্বকাজ সাধিয়া, গিয়েছে বীরের দেশ!
রমণীর প্রেম, নারীর হৃদয় কেবলি যাতনা তরে?
ধিক্ ধিক্ বৃথা জীবন যৌবন রমণী শরীরে ধরে?

জিমেনার সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হয়। আজ সুন্দর শুভ্র সন্ধ্যা-সমাগমে তার সঙ্গীত জমিতেছিল না; সে নিজেই তা বুঝিয়া কাতর হইতেছিল। এমন সময় রাণী

* শ্রীমতী হিম্যান্সের Siege of Valencia অবলম্বনে লিখিত।

এল্‌মিনা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—ইয়া মা, তোমার গান কেন আজ এমন হ'চ্ছে? যেন মলয় পবনের মত তোমার গান আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে চারিদিক আমোদিত করত; আজ কেন সে গানে যেন প্রাণ নাই? তোমার সে গান কোথা গেল?

জিমেনা। মা, আজ কি আর সেদিন আছে? আজ পর্ব্বতের খোলা হাওয়া অবরুদ্ধ। এখন এই ঘর বাড়ী সবই যেন জেলখানার মত মনে হয়।

এল্‌মিনা। হায়! হায়! তোমার প্রাণ চায় পর্ব্বতের খোলা হাওয়ার মত স্বাধীন ভাবে তুমি ঘুরে বেড়াবে। ভাইদের সঙ্গে পর্ব্বতের নদীর মত পাহাড়ে পাহাড়ে নেচে ছুটে বেড়াবে! হায়! হায়! আমরা যে একবারে এই নগরে অবরুদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। চারিদিকে অগণ্য শত্রু সৈন্য! কি হবে, কি জানি!

জিমেনা। না মা, দুঃখ করো না। আমি বীরের সন্তান, এ শিক্ষা আমার দরকার। বসন্তের শোভা ও সঙ্গীত আনন্দের দিকে মনকে টান্‌ছে, কিন্তু জাতীয় গৌরবের চিন্তার কাছে এ সবই তুচ্ছ! এ যে বড় উঠেছে, এর গর্জ্জনে সকল আনন্দধ্বনি ডুবে গিয়েছে,—ভালই হয়েছে। আমি বীরের মেয়ে, মৃত্যুর ভেরী-নিনাদ যেন শুন্‌তে পাই!

এলমিনা। হা আমার কপাল! তোমার মত সোনার চাঁদ এই কড় তুফানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা কর্‌বে! আমার জন্য একটুও ভাবি না। তোরা মা আমার নদীর পুঁটুল, তোদের আনন্দে হেসে খেলে নেচে বেড়াবার সময়, এখন কি তোদের সংসারের কড় তুফানে পড়বার সময়? কি দুর্দ্দিন!

জিমেনা। দুর্দ্দিন কি মা! গৌরবের দিন! এই বিপদে সকলেই কর্ত্তব্য সাধনে উঠে প'ড়ে লেগেছে। যুবকগণ এখন কেবল হেসে খেলে বেড়াচ্ছে না; মেয়েদেরও এখন বীরদের সহায় হ'য়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিপদ ও সংগ্রামের অগ্নিকুণ্ড হ'তেই শক্তি ও জাতীয় জীবন জেগে উঠে, শুধু আনন্দের মধ্যে তো শক্তি জাগে না!

এলমিনা। একি তোমার মনের কথা? এসব চিন্তা কোথা হ'তে তোমার মনে এল? কি গম্ভীর ভাবে তোমার মনে লুকান আছে যে এমন ক'রে কথা ব'লছ!

জিমেনা। তুমি জান না এখন আমার কি আছে মা!

এলমিনা। নগরে কি বিষাক্ত বাতাস বইতে আরম্ভ ক'রেছে, কি বিষ ঢুকেছে! সুস্থ সবল নগরবাসীরা জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছে, দলে দলে মরে যাচ্ছে; সেই বাতাসে আমার সোনার প্রতিমা তুমি, তোমার চাঁদমুখে কালিমা পড়েছে! রোগ আর মৃত্যুর মধ্যে ঘুরে ঘুরে তোমার চেহারা, তোমার দৃষ্টি কেমন কেমন হ'য়েছে; তুমি এত গম্ভীর, এত স্থির, এত নীরব হয়ে প'ড়েছ, যে,—মা আমার,—তোর পানে চাইতে আমার বুক ফেটে যায়!

জিমেনা। আমার জন্যে কেন এত ভাব মা! দেশের এই দুর্দ্দিনে কি হেসে খেলে দিন কাটান যায়? নগরের চারিদিকে শত্রু, রাত্রি শেষ হ'তে না হ'তে সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, তাদের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়; তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় শত শত বীর প্রাণত্যাগ করে; তারপর আত্মীয় বন্ধুদের কান্না, আর তাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া,—এই তো রোজ ঘট্‌ছে; এর মধ্যে কি আনন্দে থাকা যায় মা! যখন পাখীর গানে ঘুম ভাঙ্গত, গাছে গাছে কচিপাতা মলয় বাতাসের সঙ্গে নেচে গান ক'রত, শুনে মন মুগ্ধ হ'ত, সে দিন তো আর নাই!—ও মা, বাবা আস্‌ছেন; আর আমার কথা ব'লো না; বাবার কর্ত্তব্য কত গুরুতর, বাবার মাথায় কত চিন্তা, কত ভার; দেশরক্ষার পবিত্র ব্রতে তিনি সকলের নেতা; আমাদের ছোট সুখ দুঃখের কথা ব'লে তাঁহার মনে ব্যথা দিও না মা!

জিমেনা এই কথা বলিতে বলিতে রাজা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী এক মুহূর্ত্তে সকল বিষাদ অন্তরে দমন ক'রে, উঠে দাঁড়ালেন।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; পূর্ণচন্দ্রের ম্লান আভা উন্মুক্ত বাতায়ন পথে গৃহে প্রবেশ ক'রেছে; দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছে; কিন্তু সবই যেন প্রাণহীন।

৺ মিসেস্ হিম্যান্স্

ভারত-মহিলা প্রেস, ঢাকা

কেবল প্রাচীরে বিলম্বিত বীর পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্রই যেন তীব্র দৃষ্টিতে জীবন্ততর হ'য়ে উঠেছে। রাজা গম্ভীর ভাবে গৃহে পদার্পণ করেই চিত্রের দিকে চাহিলেন। রাজ্ঞী কন্যাসহ অগ্রসর হ'য়ে, রাজার হাত ধ'রে বলিলেন—

এস এস, বোসো: সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পরে এখন তো তোমার বিশ্রামের সময় হ'য়েছে! এখন তোমার বর্ম্ম খোল: সকলের বিশ্রামের সময় আছে, তোমার নাই!

রাজা। সন্ধ্যার সময় পরিশ্রান্ত কৃষক তার কুটীরে বিশ্রাম করে, তার বাগানে ছেলেরা খেলা করে, সে আনন্দে তা দেখে, তার সে সময় আছে। কিন্তু আমি সমস্ত নগরবাসীর অধিপতি, সকলের রক্ষক ও নেতা, আজ মাতৃভূমি বিপন্ন,—আমাদের জাতীয় জীবন-তরী আজ ডুবোনে পড়েছে, আমি যাকি, আমার কি আর বিশ্রামের সময় আছে? আমার দিন রাত নাই।

জিমেনা। বাবা, এরবৎ এনে দিই, বড় ক্লান্ত হ'য়েছ! আমার বেহালা বাজাই, একটু বসে শোন। তুমি তো আমার বেহালা বাজান শুনতে খুব ভালবাস!

রাজা। উদ্দীপনার গান গাইতে পার তো গাও। এমন গান গাও যাতে জীবনের সকল দুর্ব্বলতা, ক্ষীণ মায়াময়তা, ভয় ভাবনা দূরে দূর করে দিয়ে, হৃদয় মনকে মহাভাবে মাতিয়ে দিতে পারে। মন-গলান কোমল গান এখন শুনবার সময় নয়!

জিমেনা। তাই গাব। ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্ব-পিতামহগণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে যে বিজয় সঙ্গীত গেয়ে যুদ্ধে যুদ্ধে ধ্বনি তুলেছিলেন, যে গানের প্রতিধ্বনি এখনও গাছে পাহাড়ে যেন লেগা রয়েছে, সেই বীর-গাথা গাব! তুমি পূজ্য-পাদ পূর্ব্ব-পুরুষ মহাত্মা সিডের সমর সঙ্গীত শুনবে?

রাজা। ওঃ! ও কার নাম করলে? ও নাম শুনলে যে মরা মানুষ বেঁচে উঠে! মহাত্মা সিড্! তাঁরই যশোগাথা গাও। এমন দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষের দিকে যারা ফিরে চাইতে পারে, তারা প্রাণ থাকতে শত্রুকে দেশে পদার্পণ করতে দিতে পারে না পূর্ব্বপুরুষদের গৃহ বিদেশীর পদস্পর্শে কলঙ্কিত হ'তে দিতে পারে না; কোনমতেই হীনতা স্বীকার করতে পারে না!—

রাজ্ঞী। একি! আমার শরীর-মন যে কেমন করছে! আমার বুক যে কাঁপছে! এমন হ'চ্ছে কেন?

রাজা। বীরকন্যা তুমি, অধীর হ'য়ো না: বংশ-গৌরব স্মরণ ক'রে স্থির হও,—বুক বাঁধ। পূর্ব্বপুরুষদের পানে চেয়ে দেখ,—দেখ তাঁরা জলে স্থলে স্বদেশের মাটি তাঁদের পবিত্র রক্ত দিয়ে ধুয়ে পুণ্যতীর্থে পরিণত ক'রে গিয়েছেন; তাঁদের পানে চাইলে তুচ্ছ ভয় ভাবনা ডুবে যায়, মহৎ উদ্দীপনায় হৃদয় পূর্ণ হয়। ধর্ম্মের পতাকা হাতে ধ'রে যখন তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, প্রচণ্ড শত্রুর আক্রমণে, নির্য্যাতনে, অস্ত্রে কি আগুনে, কিছুতেই ভীত হ'ন নাই। সে বীরত্ব, সে প্রাণদান দেখে শত্রুগণ ভীত। অনিষ্ঠা অসত্য পাপের শক্তির কাছে ধর্ম্মপ্রাণ জীবনের সে কি নির্য্যাতন! জগতে এখন তাঁরা ধর্ম্মবীর (Martyr)। কিন্তু ভগবান তাঁর বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানদের রক্তপাত হ'তে দিয়েছিলেন, তাঁদের রক্ত যেন চেয়েছিলেন! কিন্তু, হায়! তাঁদের প্রিয় যারা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যারা, তাদের তো চান নাই?—

রাজ্ঞী। তুমি কি বলছ? তুমি কি কিছু জান? আমার মুখে যে কথা আসছে না! ওগো, আমার বাছারা কোথায়? তুমি কি তাদের কথা বলছ?

রাজা। সন্তানের কথা মার চেয়ে কে বেশী জানে?

রাজ্ঞী। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি খুলে বল: আমার যে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে? আমি সব সইতে পারব। আমার বাছারা কোথায় বল?

রাজা। দূর সেনাপতি শিবিরে!

এই কথা শুনিবা মাত্র রাজ্ঞী অজ্ঞান হওয়ার মত পার্শ্বস্থ কৌচে বসে পড়লেন। রাজা অন্য আসনে উপবেশন করলেন। জিমেনা মার পাশে বসে, সস্নেহে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বলিল,—"মা, মা, ধৈর্য্য ধর, ভাইদের কোন অমঙ্গল হয় নি, তাঁরা বেঁচে আছে!"

রাজ্ঞী পাগলের মত রাজার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যই কি তারা প্রাণে আছে?"

রাজা। এলভিরা, তাঁরা বেঁচে আছে।

রাজার মনে তখন কি ঝড় বহিতেছিল! একদিকে

জাতীয় সম্বৎ, অপর দিকে বালক পুত্রদ্বয় শত্রু-শিবিরে, সম্মুখে পত্নীর এই অবস্থা!

পুত্র-স্নেহ, পত্নী-প্রেম, জাতীয় গৌরব, হৃদয়ের তিন দিক হ'তে যেন তাঁর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। "সব যাবে! প্রাণ যাবে, মান যাবে, যাক্! পত্নী ও পুত্রকন্যাগণও যাবে? আমার আগেই তারা শত্রুর হাতে প্রাণত্যাগ করবে,—এও সইতে হবে?" রাজা এইরূপ চিন্তায় অস্থির—কিন্তু নীরব।

রাণী গম্ভীরভাবে, চক্ষু মুদ্রিত ক'রে, নীরবে ভাবছেন পুত্রদ্বয়ের কথা;—"এখন তাদের কি অবস্থা? তারা বন্দী! তারা বন্দী! তারা বন্দী! তারা কোথায়? আমার বুক খালি!—" এইরূপ চিন্তায় ক্ষণকাল মগ্ন থেকে, রাণী হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন—

"বেঁচে আছে; কিন্তু বন্দী শত্রুর শিবিরে, অপরাধীর মত অবরুদ্ধ! বাতাসের মত যারা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত, আমার বুকে যারা বিশ্রাম ক'রত, আমার সেই নয়নমণিরা মুরের হাতে বন্দী? ওঃ একি হ'ল?"

রাজা। হায়, রাণী, কি আর ব'লবো? নির্ভীক আলফো যুদ্ধ দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়েছিল, আজ প্রাতঃকালে বেড়াতে গিয়ে, আর থাকতে পারে নাই, দুই ভাই মিলে মহা উৎসাহে যুদ্ধ দেখতে গিয়েছিল। শত্রুর গুপ্ত-চর তাদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রেছে।

রাণী। আর ব'লো না, ব'লো না!—কখন তাদের উদ্ধারের জন্য কর পাঠাবে?

রাজা। তাদের উদ্ধারের জন্য কর? তারা যা চায় তা যে বড় দুর্মূল্য?

রাণী। কি!—দুর্মূল্য? আমাদের ঐশ্বর্য্য সম্পদ দিলে একজন রাজাকে উদ্ধার করা যায়, আর আমার ছেলেরা বন্দী থাকবে? ঐশ্বর্য্য সম্পদ যা কিছু আছে, সব নিয়ে যাও, তুচ্ছ ধূলি মুষ্টির মত সব ফেলে দিচ্ছি! তুমিই বল—রাজ-ঐশ্বর্য্য শিরস্ত্রাণের পালকের মত অসার—অনায়াসে রাখা যায় আবার ফেলেও দেওয়া যায়। তুমি তো জান, আমি অনায়াসে কৃষকের পর্ণ কুটীরে গিয়ে বাস করতে পারি, যদি আমার প্রাণ-ধনদের কাছে পাই।

জিমেনা। বাবা, আমাদের জন্যে একটুও ভেবোনা; আমরা পরিব হ'য়ে সুখে থাকব, যদি তাদের পাই। আমরা সত্য সত্যই সব সইতে পারব; বাবা, সেজন্য একটুও ভেবো না!

রাজা। অপমান সইতে পারবে?

জিমেনা। তেমন বংশে তো জন্মি নি?

রাজা। ঠিক্ বলেছ। এ মহত্ত্ব জ্ঞানে দৃঢ় থাক, মা আমার! রাণী, পৃথিবীর ধনরত্ন, মণিমুক্তা দিয়ে, যদি তাদের পাওয়া যেত, তা হ'লে এখনি সর্ব্বস্ব দিয়ে তাদের বন্ধনমুক্ত ক'রে এনে দিতাম। কিন্তু জগতে যে তার চেয়েও মূল্যবান বস্তু আছে। কলঙ্ক-কালিমা গায়ে মেখে, যদি জীবন ও স্বাধীনতা পেতে হয়, সে জীবন ও মুক্তি কে চায়? এ অবস্থায়, বিশ্বপতি বিধাতার পানে চেয়ে, সগৌরবে প্রাণ দেওয়াই মানুষের কাজ।

রাণী। ওগো, কে প্রাণ দেবে?

রাজা। (উত্তেজিত কণ্ঠে) যাদের জীবনের মূলা বিশ্বাস-ঘাতকতা, স্বদেশ-দ্রোহিতা? আর বলতে পারি না!

রাণী! ও কি, তুমি কেমন ক'রে তাকাচ্ছ? কারা প্রাণ দেবে? তুমি কি এমন কথা মুখে আনতে পার?—

রাজা। হাঁ আজ আমি ও কথা বলতে পারি। তারা কারা? শুনতে চাও রাণী? বুঝতে পার নি? আমার ছেলেদের প্রাণ যাবে, যদি আমি নগর সমর্পণ না করি!

এই কথা শুনে রাণী একবারে অজ্ঞানের মত হ'য়ে পড়লেন। জিমেনা তাঁর মাথায় বাতাস করিতে করিতে, তাঁর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, ওমা, স্থির হও এত অস্থির হ'য়ো না; যতক্ষণ তাদের শরীরে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আশা আছে মা!" আশার কথা জিমেনার মুখে শুনিয়া, রাণীর আত্মহারা হৃদয়ে যেন শক্তি আসিল; রাণী পাগলের মত মৃদু স্বরে বলিলেন—"ও কার মৃত্যু-ঘণ্টা-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি? না না, ওদের না?—ও কার মুখে আশার কথা শুনলাম? আশা আছে? আমি ভেঙ্গে পড়বো না; আমি নিরাশার

কথা শুনবো না! প্রকৃতির মহাশক্তি পিতৃসঙ্কেত গভীর কন্দরে বিদ্যুতের মত খেলা করে! মহারাজ তুমিও কি ব'লছ,—আশা আছে?"

রাজা। (গম্ভীর ভাবে)—আশা আছে সর্ব্ব-শক্তিমান যিনি তাঁর কাছে। উদ্যত সুতীক্ষ্ণ অগ্নি বার্থ তিনিই করতে পারেন চক্ষের নিমেষে; মেঘ বায়ু অগ্নি যাঁর আজ্ঞাবহ, সেই দেবাদিদেব সকল আশার স্থল—নিরাশার আশা। আশা তাঁর কাছে। এ জগতের কিছুতেই আশা নাই।

রাণী। তুমি আমাকে কেমন ক'রে এ কথা বলছ? তুমি এদের পিতা, তোমারই হাতে এদের প্রাণ রয়েছে!

রাজা। কি বলে রাণী? আজ এই বঙ্গ-মাকে কী সংগ্রাম তুমি দেখছ না? একদিকে ধর্ম্ম জাতিকুল মান দেশের গৌরব, পূর্ব্ব পিতামহদের পুণ্য-স্মৃতি হৃদয়কে দৃঢ় ক'রে তুলছে, অন্য দিক হ'তে মানবীয় দুর্ব্বলতা সব বাঁধ ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছে। আজ তুমি স্বর্গ পানে চাও, আজ সেই পরম দেবতার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা কর,—যিনি সকল বীরের শক্তিদাতা, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন পিতা হ'য়ে আমি মহত্বের কঠোর ব্রতে পতিত না হই।

রাণী। তবে আর আশা নাই? বাছাদের তুমি রক্ষা করবে না?

রাজা। হায় রাণী! জীবনসঙ্গিনী তুমি, জান না কি আছে জগতে যার জন্য বিশ্বাস-ঘাতক হ'তে পারি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের শয্যায় শুয়েছেন, সে কি এই জন্য?

রাণী। কি কঠিন, কি নিষ্ঠুর! রাজ্যের গৌরবের জন্যই তোমার জীবন? এক মুহূর্ত্তে সব স্নেহ ভালবাসা বিসর্জ্জন দিতে পার! পুরুষ মানুষ, তোমাদের সবই বাহিরের আড়ম্বরময়! প্রিয়জন, ভালবাসা সব দূরে ফেলে দিয়ে, মহাশূন্যে অসার গৌরব নিয়ে তোমরা বেশ থাকতে পার; যদি সব বিসর্জ্জন দিয়ে রাজ্য রক্ষা হয়, সেই হ'ল বড়! প্রিয়জন-শূন্য গৃহে আমাদের বুক ভেঙ্গে যায়। ওগো, মহারাজা তুমি, রাজ্য রক্ষা তোমার কাজ; কিন্তু আমাকেও যে তুমি ফেলতে পারবে না! শোন, শোন,—আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে! এ দুঃখিনীর কথা শোন। আমি তাদের মা, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। মাতৃ-হৃদয়ের এ আবেগ, এ তো ভগবানেরই শক্তি, তিনি নাতাসে আগুনে যেমন অদম্য তেজ দিয়েছেন, হৃদয়ের বেদনার মধ্যেও তেমনি শক্তি দিয়েছেন, তুমি এ শক্তি অগ্রাহ্য করবে? শোন, আমার কথা শোন,—আমার বাছাদের আমায় দাও।

রাজা। তাদের তোমার কাছে এনে দেব, রাণী, এই জন্য যে, যখন লোকে তাদের বাপের নাম করবে, তারা দুই হাত দিয়ে তাদের লজ্জায় অবনত দৃষ্টি ঢাকবে! লোকে বলবে বিশ্বাসঘাতকের ছেলে! তারা তাই শুনবে, এই চাও? যে দিন ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে এ নগর রক্ষার ভার নিয়েছিলাম, সেদিনকার সে প্রতিজ্ঞা কি জল-বুদ্বুদের মত অসার? সমুদ্রগর্ভে জাহাজ চ'লে যায়, জলে তার গতি-চিহ্ন তরঙ্গ এসে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে দেয়; আমার প্রতিজ্ঞাও কি তেমনি, অশ্রুজলে কিম্বা রক্তপাতে ধুয়ে যাবে? তবে, জগতে আর কেও মানুষের গভীর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করবে না! জাতীয় গৌরব, বীরের বীরত্ব স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের জন্য রক্তপাত, প্রাণদান, প্রতিজ্ঞা পালন, সব পুণ্যস্মৃতি অর্থহীন প্রলাপ—স্বপন হ'য়ে যাবে! তুমি কি ভাবছ, আমার বুকে ব্যথা নাই? সন্তানদাতা ঈশ্বর জানেন পেয়ে কি আনন্দ! আর এখন সে রত্ন তিনি ফিরে চাচ্ছেন!—ওঃ আর না, থাক্ সে কথা। শোন রাণী, যদিও সবংশে নিধন হই, তবুও ঐ প্রাচীন মন্দিরের পবিত্র পতাকা অবনত হ'তে দিব না। ও পতাকা নীল আকাশে উড়বে। রাণী, বল দেখি বুকে হাত দিয়ে, বলতে কি পার,—বীর বংশ-জাত আমরা প্রাচীন গৌরব, স্বাধীনতা, ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিয়ে অসভ্য যুবের পদানত দাস হ'য়ে, ঘৃণ্য হ'য়ে জগতে বেঁচে থাকি,—তাই চাও!

রাণী। এ ভগ্ন হৃদয়ে আর ক'রো না আঘাত,
তীব্র-ঘৃণা-বিষ-বাণ দিয়ে, মহারাজ;
বীর তুমি প্রিয়তম, দুর্ব্বল হৃদয় মম,—
কি ভাবি, কি বলি, আমি কিছুই না জানি!

তবুও অন্তরে মোর কে যেন বলিছে,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই, নিশ্চয় পতন !
কোন্ শক্তি, কোন্ আশা, কোথা মহারাজ,
নশ্বর-গৌরব রক্ষা সম্ভব যা হ'তে ?
বিষাক্ত বায়ুর স্রোতে মৃত্যু ব'য়ে যায়,
শীর্ণ বীরবৃন্দ নত পতাকার ভারে--
হায় সে গৌরবময় প্রাচীন পতাকা !
শত্রুবাণবৃষ্টি হ'তে ক্ষিপ্র খরতর
মহামারী বিষবাণ নাশে সৈন্যকুল।
ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখ ওই অনন্ত আকাশ---
ধূমাচ্ছন্ন, মেঘাবৃত, নিষ্প্রভ, মলিন,
অমঙ্গল চিহ্ন আঁকা,—পতনের দূত !
শত্রুরোধ অস্ত্রবলে নহে অসম্ভব ;
কিন্তু, হায়, হায়ে সশস্ত্র দুর্জ্জয় শত্রু,
তার সঙ্গে গৃহে মহাশত্রু মহামারী
দুর্ভিক্ষ দারুণ,—তিনে কে পারে সহিতে !
কোথা মিত্র-রাজ-সৈন্য এ বিপদ কালে ?
ঈশ্বরের কৃপা আর মানবের প্রেম
কিছু নাই ?—পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মোরা ?

রাজা। এ আশঙ্কা তব রাণী, অলীক স্বপন।
কিন্তু, যদি তাই হয়, কি হবে এ প্রাণে ?
অকাতরে প্রাণ দিব জন্মভূমি তরে
বিশ্বাসী বীরের মত, স্থির মনে জানি,
পবিত্র বীরের রক্তে দেশের উদ্ধার।

রাণী। কৃষক রমণী যথা কৃষকের পাশে
শস্যক্ষেত্রে দর-রৌদ্রে প্রফুল্ল আননে
সহকারী রূপে বয় রৌদ্র, কর্ম্মভার,
তেমনি তোমার পাশে জীবন-সংগ্রামে
নির্ভয়ে নীরবে আমি ক'রেছি যাপন ;
কিন্তু আজ বড় গুরু-ভার, প্রিয়তম,
নাই শক্তি সহিতে বহিতে—এই প্রাণে,—
রাণী আজ দুর্দ্দুষ্টিত কৃপা ভিখারিণী ?
ক্ষমা কর, মহারাজ, ছেড়ে দাও মোরে,
অনিন্দ্য কুসুম-সম-সন্তান-জননী
শূন্য গৃহে বরষার করিবে রোদন,—
স্নিগ্ধ পুষ্প পাশে শুভ্র, প্রসবিনী লতা—
কোরো না তেমন মোরে, এ শুষ্ক আলয়ে ?

রাজা। জীবনের সকল সংগ্রামে শক্তিময়
হৃদয়ের দেবী তুমি, ব'লো না কাতরে
পাপের কলঙ্ক দিয়ে করিতে ধারণ,—
পাপের কদর্য্যরূপ অঙ্ক অশ্রুনীরে
তব নহে প্রতিভাত, কিন্তু তীব্রতম
মৃত্যু, তবু নহে রাণী, কদর্য্য তা হ'তে।

রাণী। পবিত্র নির্ম্মল শুভ্র-সৌন্দর্য্যের খনি,
পুত্রকন্যা মম বীরে তোমার ছায়ায়
হ'য়েছে বর্দ্ধিত, সে কি শুধু ধ্বংস-হেতু ?
সব দিবে মৃত্যুগ্রাসে মহারাজ তুমি ?
এই কথা তব যেন প্রফুল্ল নলিনী,—
হাসির সুষমা তার বিলুপ্ত অধরে—
বিষাদ-কালিমা-মাখা সর্ব্বাঙ্গ তাহার,—
দেখ চেয়ে, গৃহের আনন্দ মম হায়,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে যায় অসময়ে !

রাজা। জিমেনার কথা বলছ ? ওর পানে চেয়ে আমি বল পাচ্ছি। ওর মুখে যখন ফুটে উঠেছে ! স্বদেশ-বৎসল বীর যেমন রণভেরীর আহ্বান শুন্‌বামাত্র উৎসবের আনন্দ ছেড়ে, খাওয়া দাওয়া সাজসজ্জা গানগল্প সব তুচ্ছ ক'রে, অসিচর্ম্মধারী হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যায়, তার চোখে মুখে বীরত্ব ও দৃঢ়তা ফুটে ওঠে, তেমনি আমার জিমেনার মুখের যদিও সেই অরুণ রাগের লাবণ্য নাই, ও দৃষ্টিতে কি জ্যোতি ফুটে উঠেছে ! ওর অন্তরের তেজ যেন ওর চোখে প্রকাশ পাচ্ছে ! বাহিরের সৌন্দর্য্য-সুষমা এখন নিভে যাক, আজ অন্তরের তেজ বীর্য্য, মানব অন্তরে ভগবানের শক্তি, আজ জ্বলে উঠুক ! অটল বিশ্বাস নির্ভরে ভক্তির কর্ম্মে জিমেনা তার বুক বেঁধেছে ; সে যখন সেবিকার বেশে আহত সৈন্যদের সেবা করে, তাদের আহত স্থানে ওষুধ দেয়,—বেঁধে দেয়,—তাদের মুখে জল দেয়,--তারা তার পানে চেয়ে চেয়ে দেখে ; তার দেবীর মত শান্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দে'খে সব দুঃখ ভুলে যায়।

রাণী। জিমেনার মুখে বিশ্বাস নির্ভর দেখ্‌ছ তুমি ?

ওকি স্বাভাবিক ভাব ওর? ও যে ভয়ের কারণ, ওযে বাছার আমার বিকারের লক্ষণ! নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের অস্বাভাবিক দীপ্তির মত, ওযে ওর মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ! তুমি বাপ হ'য়ে ওকে মৃত্যুর দ্বার হ'তে ফেরাবে না? মৃত্যুরূপে মেয়ে ডুবে যাচ্ছে, তা দেখেও তুমি হাত ধ'রে টান্‌বে না? ওগো, তুমি এমন হ'লে কেন?—আর মা জিমেনা আয়, আমার সঙ্গে জাহুপেতে বোস্। আমার কথায় তো হ'ল না, আয় তোর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একবার পায়ে প'ড়ে ভিক্ষা করি, যদি দয়া হয়—আয় মা, আমার পাশে মাটিতে পড়ে একবার ভাইদের প্রাণ-ভিক্ষা চা; তাদের হ'য়ে তাদের প্রাণ-ভিক্ষা কর!

জিমেনা। মা, মা, ওকি বল্‌ছ মা! ও যে কর্‌তে পার্‌ছি না মা!

[জিমেনার পলায়ন]

রাজা। দেবী আমার, জননী আমার!—ভগবান, দুর্ব্বল সন্তান মানুষ আমরা, মৃত্যুর যাতনা সম প্রাণের বেদনা, তাতো জান প্রভু! তবু এত ভীষণ মর্ম্মভেদী নৈবেদ্য চাও!

রাণী। ওঃ! এই তোমার মনের কথা! যাও, আর তোমাকে চাই না।—কত সময় আছে? ওঃ সে কথা মনে কর্‌তে বুক ফেটে যায়—কত সময় আছে বল?

রাজা! কত সময়? কি বল্‌ব?—বড় কম!

রাণী। কি?—কি বল্লে? শুন্‌তে পাচ্ছি না!

রাজা। সময় খুব কম।

রাণী। কি? যে হস্তে গ্রথিত যুক্ত করতল কম্পিত
জীবনবীণার তন্ত্রী, সব ছিঁড়ে যাবে?
হৃৎপিণ্ড হৃদি হতে সজোরে উৎপাটি,
চূর্ণ ক'রে ফেলে দিতে হবে,—হেন কাজে
সময় অত্যল্প কম! কি ক'রে বলিল
পাষণ্ড নিষ্ঠুর সে যে নরদেহধারী?—
পল অনুপল ধ'রে করে কি এ কাজ?—
নরহত্যাকারী পাপী কলঙ্ক ধরার,
মৃত্যুদণ্ডাধীন, সেও প্রস্তুত হইতে
পায় যে সময়, তাও বেশী এর চেয়ে!—
এ কি হ'তে পারে?—তাই পরাধর্ম কাল!

রাজা। ভগবান মঙ্গল-বিধাতা যবে চান
প্রেমাস্পদ যা কিছু জীবনে, নতশিরে
সে আজ্ঞা পালন ছাড়া, আর গতি নাই!

রাণী। প্রেম? প্রেম? প্রেমাস্পদ?—সব মিছে কথা!—
কত মৃদু হাসি, কত করুণ বচন,
প্রাণমন-কেড়ে-নেওয়া সতৃষ্ণ চাহনি,
—সব শূন্য,—প্রভাতের চকিত কুয়াশা—
মায়ামরীচিকা সম, অন্তর আকারে
জাগায়ে প্রেমের তৃষ্ণা করে প্রতারণা!
বুক ফাটে তবে, তার সন্ধান মেলে না!
এ অসার কঠোর জগতে কোথা আছে
মৃত্যুহীন সতেজ গভীর ভালবাসা
জননী হৃদয় ছাড়া? পিতার হৃদয়ে
পুত্র-প্রেম সে কেবল বংশের গৌরব।
সে ভাবে অপত্য পানে চেয়ে, পুত্র হবে
বংশের গৌরব-রবি, রণজয়ী বীর:—
এই প্রেম!—পিতৃপ্রেম?—আশ্চর্য্য তা নয়!—
কখন তো তব বক্ষ করনি তাদের
উপাধান, সুস্থিময় পুষ্পসম মুখ
স্নেহ-রস পরিপূর্ণ বক্ষের স্পন্দনে
তব বক্ষে হয়নি কম্পিত; তব শ্বাসে
হিল্লোলিত হয় নাই স্বপ্ন কেশ তার!
শিশু পাশে, ব'সে আর তার পানে চেয়ে
পলক বিহীন, তাঁর বক্ষের স্পন্দন
চোখে মুখে শত ভঙ্গি নিমেষে নিমেষে,
তাই দেখে প্রাণ ভরে, বিনিদ্র রজনী
কখন কাটেনি তব?—তুমি তো কখনো
ঘুমন্ত সে চাঁদমুখ জাগিবে কখন,
সে আশায়, শত ক্লান্তি অগ্রাহ্য করিয়া
অরুণ উদয় পূর্ব্বে কতক্ষণ ধরে
চাওনি সে মুখপানে আপনা বিস্মরি—
তার আগরণ সুধা চুমিতে আদরে?
বুকের ওপর দিয়ে স্বপ্ন-জাগরণ

তুমি তো করনি শাস্ত ; অতি ছোট তার
অস্ফুট প্রথম শব্দ বুঝিবারি পেতে
তুমি তো করনি আহরণ : কণ্ঠে কিবা
ভরে ভীত অধীর ক্রন্দন তার শুনে,
জাগ্রত সহিষ্ণু ক্লান্তিহীন স্নেহদানে
তুমি তো করনি তারে প্রফুল্ল-আনন !—
ও নয় তোমার রাজা,—মাত্র অধিকার !—
নারীর যৌবন, রূপ, হৃদয়ের খনি
সব কেড়ে নেয় ওরা নীরবে গোপনে !—
ওরে বাপধন মম ! ওরে প্রাণ মোর !—
এত যে সয়েছি বুকে সকলই বিফল ?
কেন জন্মেছিলি তোরা এ অভাগী-কোলে ?

রাজা। অসহ্য ! অসহ্য ! হায় ! মানব হৃদয়
এত সয় ? জান তুমি হৃদয়-কন্দরে
গোপনে নীরবে কত গভীর-বেদনা
বৃশ্চিক দংশন সম তোমার ক্রন্দনে।

রাণী। হৃদয় !—হৃদয় তব ? শুষ্ক মরুভূমি !
বোঝা নাই করুণ ক্রন্দনে, আর্ত্তনাদে,—
এত দৃঢ় তুমি ! কিন্তু দৃঢ়তা তোমার
কত দিন রবে স্থির ? আসে যেন দিন,
ধীর হয় শিশু সম দুর্ব্বল, অক্ষম :—
আসিবে সে দিন তব বিধির বিধানে
তিক্ত আস্বাদন তার বুঝিবে তখন ;—
একাকী নির্জ্জন গৃহে রহ প্রাণ ভরে
শূন্যতার গুরুভার বক্ষে ধরে টানি।
আমার কি ভয় ? এই কাতর ক্রন্দন,
ভিক্ষা চাওয়া, সব হবে নীরব অচিরে !
এ প্রাসাদ তব বিজন অরণ্য হবে,
মহানিদ্রা-মগ্ন হবে মোরা : সেনাপতি,
রাজা, সৈন্য সব রবে পূর্ব্বের মতন !
এই শূন্য গৃহ-মাঝে বিস্তৃত প্রাসাদে,
উদাস বিষাদ মাখা বায়ুর স্বনন
কম্পিত পতাকা শিরে করিবে প্রবণ !
তখন সম্বল তব কি রহিবে বল ?
পূর্ব্ব-পিতৃকুল-স্মৃতি-সমাধি হইতে
স্বপ্নময়, ছায়াময় বীর শক্তিগুলী,
পঙ্কে তুলে কল্পনার মোহময় বলে ?
কিন্তু হায় ? কতক্ষণ কল্পনার বলে
রবে স্থির ? শক্তিহীন হবে বাহু তব :
যে দিন হৃদয় হবে নিরাশ নির্জ্জীব,
সে দিন সে জীবনের অবসান কালে,
যখন হৃদয় চাবে প্রবল তৃষ্ণায়
শুনিতে আনন্দ-ধ্বনি কোমল কণ্ঠের —
উল্লম্ফন পদধ্বনি প্রতিধ্বনি সহ
করতালি ; চাবে প্রাণ বাহুর বেষ্টন
কোমল সে সুখ স্পর্শ, আনন্দ উচ্ছল
নেত্র-জ্যোতি দেখিবারে চাবে চক্ষু তব,
যে জ্যোতিতে শোভাময় ছিল এ ভবন,—
আসিবে সে দিন যবে, এ বিশ্ব মাঝারে
কোথা পাবে সে অমূল্য অপার্থিব ধন ?
শুষ্ক শূন্য অবিশ্রান্ত তপ্ত মরু জগতে
আত্মার গভীর তৃষ্ণা কিসে দূর হবে ?
যশে ? যশস্মৃতি-নীরে ? হায়রে দুরাশা !
বহুমূল্য পরিচ্ছদ, বিজয় মুকুট
পারে কি নাশিতে তৃষা, দগ্ধ মরুবাসী
তৃষার বিশুষ্ক-বক্ষ মুমূর্ষু জনের !

রাজা। তোমা হ'তে এই রাণী ? জীবনের রস
তিক্ততম ক'রে ঢেলে দিলে আজ তুমি !
হায় রাণী ! পাগলিনী ! ক্ষমা করি তোরে !

(রাণীর প্রস্থান)

শক্তিদাতা ! শক্তি দাও দুর্ব্বল সন্তানে,
কঠোর কর্ত্তব্য পথ দুর্গম বন্ধুর,
অন্ধ দৃষ্টি, কাতর হৃদয়, কম্পমান
পরীক্ষার গুরু ভারে, পারি না সহিতে !
পত্নী পুত্র সব যায় ?—যাক্ ! দাও বল,
কর্ত্তব্য পালনে কর হৃদয় অটল।

(প্রস্থান)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথী গুপ্ত।

বিধবাদের শিক্ষা *

বিধবাশ্রম স্থাপন, বিধবাদের শিক্ষাদান, বিধবাদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় বিধান, এ সকল বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেক সদাশয় লোক নারীশিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও নারীর অর্থোপার্জনের বিশেষ বিরোধী। অনেক সময়ে ইঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরা অতি তীব্রভাষায় এ সকল চেষ্টার প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া থাকেন। নারীর জন্য নারীর প্রাণ কাঁদিবে, দরিদ্রার দুঃখ মোচনে ধনবতী, বিধবার দুঃখ মোচনে সধবা, নিজের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিবে, ইহাই হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দেখা যায় শিক্ষার দোষে বা কুসংস্কার বশতঃ তাহা হয় না। বাড়ীর পুরুষেরা যাহা বলেন, বুঝুন না বুঝুন গৃহিণীরা তাহাতে সায় দেন। এক সময়ে বিধবাদের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত এবং চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, পরক্ষণে অদৃষ্টের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া তাঁহারা মনকে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন এবং দুঃখীর দুঃখ মোচনে কোনই চেষ্টা করেন না।

রোগ শোক দারিদ্র সংসারে চির দিন আছে এবং থাকিবে; এক দেশে না এক বেশে সর্ব্বদাই মানুষের দুঃখ ও আতঙ্ক উৎপাদন করিবে, এ কথা সত্য। কিন্তু জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে অদৃষ্ট বা নিয়তির বলও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক সময়ে যাহা অনতিক্রম্য অদৃষ্টের বিধান বলিয়া বিশ্বাস ছিল এখন আর তাহাকে সেরূপ মনে হয় না। সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলেই মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহার শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাকে অদৃষ্ট বলা যায় তাহার প্রভাব খর্ব্বীভূত হইয়া আসে। বালবিধবাদিগকে অদৃষ্টচক্রে ভর দিতে না দিয়া আমরা যদি নিজেরা একটু চিন্তাশীল ও কর্ম্মশীল হই, এবং তাহাদের মধ্যে আত্মচেষ্টা ও আত্ম-নির্ভরের ভাব সঞ্চারিত করিতে পারি তাহা হইলে দেখিব দুঃখিনী বিধবাদের অদৃষ্টের কঠোরতা অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

যাঁহারা বিধবাদিগকে উপার্জ্জন করিতে দেওয়া অন্যায় বা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—বিধবা হইলেই কি স্ত্রীলোক নিরাশ্রয় হয়? কত স্ত্রী-লোকের স্বামী নিজের পিতা ভ্রাতা বা শ্বশুরে অন্নে পালিত; এমন স্বামীর জীবদ্দশায় যদি সে স্ত্রীলোক নিরা-শ্রয় না হয় তাহার স্বামীর মৃত্যুতেই বা তাহার এমন কি অবস্থান্তর ঘটে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে স্বামীর বর্ত্তমানেও নারীর দুর্গতি ঘটে, তাহা ঠিক, কিন্তু তখনও যদি সমাজ সুবিধা এবং সুযোগ দেন নারীর পক্ষে স্বামীকে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সাহায্য করা ও নিজের ও সন্তানদিগের দুরবস্থা মোচন করা সম্ভব ও প্রার্থনীয়। দরিদ্র স্ত্রীলোককে কোন না কোন প্রকারে খাটিতে হয়ই হয়। বাধ্য হইয়া আত্মীয়-গৃহে দাসীত্ব করিয়া দুর্ব্যবহার পাওয়া অপেক্ষা শিক্ষকতা বা শিল্পকর্ম্ম দ্বারা কিম্বা অর্থ লইয়া চিকিৎসা বা সেবা-কর্ম্ম দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ইহাতে নারীর আত্মসম্মান রক্ষিত হয় এবং নারীর যদি সন্তান থাকে তবে তাহারাও জননীর নিকট হইতে আত্মসম্মান ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করে। লাঞ্ছিতা অপমান-সহিষ্ণু জননীর সন্তানেরা লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

সকল স্ত্রীলোকই স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুন এরূপ মত প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ সেরূপ করিলে গৃহে বিশৃঙ্খলা, সন্তানের পালন ও শিক্ষাদানে ত্রুটি—সংক্ষেপে গৃহধর্ম্মে সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা এবং সমাজেরও অকল্যাণ। শ্রম-বিভাগ জীব-জগতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। যাহারা পাখীরা পুষিয়াছেন তাহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন পক্ষিণী বাসায় বসিয়া ডিমে তা দেয় তখন পক্ষী একলা বাহির হইয়া আপনার উদর পূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, চঞ্চুপুটে আহার্য্য বহিয়া আনিয়া পক্ষিণীকে খাওয়ায়, এমন কি জলটুকু পর্য্যন্ত নিজের মুখে করিয়া আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দেয়। এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর, বড়ই

* কলিকাতা মেট্রোপলিটান হলে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু মহাশয় কর্ত্তৃক হিন্দুবিধবার অবস্থা ও তাহা হিন্দু বিধবাশ্রমের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা উপলক্ষে সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ, মহাশয়ার লিখিত প্রবন্ধ।

শিক্ষাপ্রদ। সন্তানকে স্নেহে বাঁধিয়া, কোলে রাখিয়া এবং শাসন পালনে জননীকে এত নিবিষ্ট ও একাগ্র থাকিতে হয় যে তাহার নিজের জীবনের রক্ষার জন্য একটু চিন্তারও অবসর থাকে না। ভি মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য। মানব সমাজে কেবল এইটুকু ভিন্নতা—পুরুষ কেবল সন্তানের জন্মকালে ও বৈধব্যে নহে সকল কালেই পত্নীর ভর্তা—তাহার ভরণপোষণের জন্য দায়ী। আমার মতে গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই আত্মরক্ষা ও জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসা উচিত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। স্বচ্ছল অবস্থা হইতে অস্বচ্ছল অবস্থায় পড়িতে অধিক সময় লাগে না। বিধাতা মানুষমাত্রকেই আত্মপালনের শক্তি দিয়াছেন: সমাজের রীতিনীতি সে শক্তিকে অনেক সময় খর্ব্ব করিয়া দেয়। যাহার পায়ে হাঁটিয়া বন্ধুর বাটীতে যাইবার আবশ্যক না হয় সে পাকী গাড়ী বা মোটরকারে যাউক কিন্তু বিধাতা সকলকেই একজোড়া পা দিয়াছেন, আবশ্যক হইলে সে তাহা ব্যবহার করিতে পারে। প্রাচীন চীনা-রমণীদের মত লৌহ-পাদুকায় সে পা দুখানি খর্ব্ব বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা অনুচিত। স্বামীরা যখন স্ত্রী পুত্র পরিজনের ভার স্কন্ধে লইয়া জীবনের পথ চলিতে প্রস্তুত ও সমর্থ তখন তাঁহাদের স্কন্ধেই এ ভার থাকুক, কিন্তু যেখানে এই অতিরিক্ত সহায়ের অভাব সেখানে উপায় কি?

যখন কোন পুরুষ পত্নী ও পুত্রকন্যাকে অনাথ করিয়া পরলোকে যাত্রা করেন তখন তাঁহার পত্নীর স্কন্ধেই রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত হয়। আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান থাকিলেও পিতার অধিকাংশ কর্ত্তব্যই সন্তানগণের বিধবা মাতার অবশ্য-পালনীয় হইয়া উঠে।

বহু স্থলে দেখা যায় স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে যে নারী দেবর ভাসুর ননন্দা শ্বাশুড়ী প্রভৃতির অশেষ সেবা ও উপকার করিয়া তাহাদের নিকট সুখ্যাতি ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার একান্ত অনুগত এই সকল ব্যক্তিই তাঁহার বৈধব্য প্রাপ্তির পর মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাকে নানারূপে নির্য্যাতন করিতেছেন এবং তাহার সন্তানদিগকে ঠকাইয়া ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছেন। এ সকল অতি পুরাতন ও পরিচিত ব্যাপার। সতীদাহ প্রথার মূল কারণ যাহাই হউক, এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে পর ইহার সংখ্যা বর্দ্ধন ও স্থায়ী করণের প্রধান কারণ বিধবার ধনে আত্মীয় স্বজনের লোভ।

পুণ্যের ও স্বর্গলাভের আদর্শ জাতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত না হইয়া যায় না। কেবল স্বামী-সহবাস সুখের জন্য যে নারী আপনার শিশুগুলিকে পথে ফেলিয়া বিদেশ-যাত্রী স্বামীর অনুগমন করে কেহ সে নারীর প্রশংসা করিবে না। কিন্তু সতীদাহ যখন প্রচলিত ছিল তখন অনেক রমণী এমন কাজ করিয়াছেন, এবং প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। শুনা যায় জনৈক বাদশাহের প্রধানা পত্নী সকল অবস্থায় এবং সর্ব্বত্রই স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। ঠিক মনে নাই, স্বামীর মৃত্যু হইলে রাজধানী হইতে দূরে কোন স্থানে প্রসূত ৯ দিনের কন্যাটিকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। কেবল সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেই যে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য শেষ হইবে এ কথা আজ কাল সকলে স্বীকার করিবেন না। স্বামীর অদর্শন-দুঃখ যতই দুঃসহ হউক, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহা সহিয়া থাকাতেই অধিকতর মহত্ত্ব। এখনকার দিনে এই শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। স্বামী রুগ্ন বা অসমর্থ হইলে স্ত্রী যদি তাঁহার হইয়া সংসার প্রতিপালন করেন আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে সাধুবাদ করি। স্বামীর মৃত্যুর পরও সেইরূপ।

কেবল একটি কথা এই সঙ্গে বলা আবশ্যক বোধ করি। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কি উঠাইয়া দিতে হইবে? আমি বলি—'না'। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। কেবল আহার পরিচ্ছদে ও সমাজ ভয়ে সংযম রক্ষা নহে; অন্তরে শুচিতা ও সংযম ও ব্রহ্মপরায়ণতা অভ্যাস করিতে হইবে—বাহিরের বাহা চিহ্ন আত্মার ভিতরে তাহা স্বরূপতঃ লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দটাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে লইলে চলিবে না, চলিত ভাষায় একথার যতটুকু বুঝায়, তদপেক্ষা

কঠিনতর কর্ত্তব্যের পুনরাবর্ত্তন পঠন করিতে হইবে। যেটুকু নিয়ম ও সংযম পালিত হইবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত হওয়া চাই নতুবা তাহার কোনই মূল্য নাই। নিয়ম পালন করিবার সময় যে উদ্দেশ্যে সে নিয়ম, সে উদ্দেশ্য ভুলিলে চলিবে না।

ব্রহ্মচর্য্যের কতগুলি অন্তরায় আছে, তাহাও বলি। ভোগ বিলাসের ইচ্ছাই কেবল একমাত্র অন্তরায় নহে। কর্ম্মহীন অলস জীবন আত্মা ও দেহের শুচিতার প্রধান শত্রু। পরানুগৃহীত লালিত জীবনের অনেক প্রলোভন। এক দুই উদরান্নের জন্য যাহাকে অশেষ দুর্ব্বাক্য সহিতে হয়, যে উদরান্ন খাটিয়াও একটু স্নেহ ব্যবহার পায় না তাহার কাছে দুই জনের স্নেহ ব্যবহারও লোভনীয় হয়। ভালবাসার লোভে আরামের আশায় সে যদি বিপথগামিনী হয় তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

কোন প্রকার আতিশয্যই হিতকর নহে। ধন ও ঐশ্বর্য্য যেমন মানুষকে পাপের পথে লইয়া যায়, দারুণ দারিদ্রও সেইরূপ করে। একান্ত পরিশ্রমবিমুখ লোকের যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, গুরুতর পরিশ্রমেও সেইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। সেই জন্য পবিত্র সুস্থ জীবন যাপন করিতে হইলে বিধবাদিগের, বিশেষ বালবিধবাদিগের, দৈহিক ও মানসিক কষ্টের একটা সীমা থাকা আবশ্যক। সকলেই জানেন সে দিকে সমাজ উদাসীন। নরসেবাতেই ঈশ্বর সেবা। যে সেবা স্বামী বা অপর প্রিয়জনকে দিবার সুযোগ ঘটিল না, সে সেবা জগতের কুগ্ন আর্ত্ত ও দীনগণকে দিয়া বিধবা তাহার সেবা প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই সার্থক করিতে পারেন। সধবা ও সন্তানবতী নারীর পক্ষে যে সেবাপরায়ণতা অসম্ভব তাহা বিধবার পক্ষে সম্ভব ও সহজ। বাল্যবিবাহাদি রহিত হইলেও সংসারে যত দিন রোগ শোক আছে বৈধব্যও থাকিবে। পতিপুত্রহীনাদের জীবন আত্মীয়-গৃহে সেবাকার্য্যে এখনও যাপিত হইতেছে কিন্তু শুশ্রূষা-প্রণালী (nursing) ইত্যাদিতে রীতিমত শিক্ষালাভ হইলে এই সকল রমণীর দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ইয়োরোপে সন্ন্যাসিনীগণ (nun), বৌদ্ধ শাসনে এ দেশে ভিক্ষুণীগণ এইরূপ শিক্ষাদান ও সেবাকার্য্য ধর্ম্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও আমাদের সম্মুখে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী (nuns) ও প্রটেষ্টাণ্ট ভগিনীগণ (sisters) এইরূপে ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায়, তাঁহাদের চিরকালব্যাপী ও পরিশ্রমের ফলে কি প্রকাণ্ড সব শিক্ষালয় ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! আমাদের বিধবারাও কালে এইরূপ করিতে পারিবেন। কত প্রকারে বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াও সামাজিক জীবরূপে আপনাদের জীবনের সার্থকতা সাধন করিতে পারেন সে বিষয়ে আমার বেশী কথা এখানে বলিবার অবসর নাই। সম্প্রতি শিক্ষকতা, শিশুচর্য্যা, রোগের চিকিৎসা, রোগীর সেবা এই কয়েকটি মুখ্য কাজ তাঁহারা অনায়াসে শিখিতে পারেন। বিশেষ সেবা। এই সেবাব্রতে নারীর বিশেষ অধিকার।

এখন শিক্ষা প্রভাবে যে সকল মহিলা কুসংস্কার-মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য—আপনাদের গৃহ ও সমাজকে নূতন আদর্শ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। যাঁহারা নিজ গৃহে বিধবাদের শিক্ষাদান ও সাধু জীবন যাপনের সুবিধা বিধান করিতে পারেন তাঁহারা তাহা করুন। যেখানে সেরূপ সুবিধা সুযোগ নাই সেখানে?—সেখানে, কোন সমাজ কিংবা কোন জনহিতৈষী দল বিধবাদের জন্য আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা করিলে সকলের উচিত কায়মনোবাক্যে তাহার সাহায্য করা। কায়মনোবাক্যে বলিয়া মন সন্তুষ্ট হইতেছেনা। চিন্তা বাক্য এবং কিয়ৎপরিমাণে কায়িকশ্রম যতই বাঞ্ছনীয় হউক না, অর্থ সাহায্যই সম্প্রতি সর্ব্বপ্রধান সাহায্য রূপে পরিগণিত হইবে। ঢাকা হিন্দু বিধবাশ্রমের বিবরণ আপনারা শুনিলেন। দুস্থা হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-মোচন কল্পে সমবেত মহিলাগণ যদি সাধ্যমত কিছু কিছু দান করেন অদ্যকার এই সম্মিলন সার্থক হইবে।

আমরাই কি পরের সেবা নিয়তির দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? কাহারও নিয়তি বৈধব্য ও দুর্গতি, কাহারও নিয়তি আরোহ ও আরাম। ভগিনীগণ, কেবল

34471

আত্ম-সুখ চেষ্টায়, কেবল বেশ বিন্যাস ও আমোদে সময় ও অর্থের বিনিয়োগ কি সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের নিয়তি?

সে দিন আমরা মিসেস গাঙ্গুলিকে কেন এত সম্মান দেখাইয়াছিলাম? তাঁহার দামী ঢাকাই বা বেনারসী শাড়ী ছিল না; স্বর্ণ মুক্তা বা হীরকের অলঙ্কার ছিল না, তাঁহার কাপড় পরিবার, চলিবার ও দাঁড়াইবার কোন বিশেষ ভঙ্গীও ছিল না। সেই মলিন-বস্ত্রপরিহিতা নিতান্ত সাদাসিধা মানুষটিকে দেখিয়া তবু কেন আমাদের মস্তক শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়াছিল? আত্মত্যাগের মহিমা, সংযমের সৌন্দর্য্য বিনয়ের মধুরতা তাঁহাতে দেখিয়াছিলাম, এক কথায় তাঁহার চরিত্রখানি দেখিয়াছিলাম। হয় তো আমরা এত কথা ভাবিয়া দেখি নাই কিন্তু আমাদের মন এক দৃষ্টিতেই তাঁহাকে চিনিয়াছিল।

প্রিয়দর্শনা সধবা ভগিনীরা, তোমাদের হাতের নোয়া সীমন্তের সিঁদুর অক্ষয় হউক, তোমাদের উজ্জ্বল মধুর হাস্য পিতামাতা স্বামীপুত্রের চক্ষু তৃপ্ত করুক। কিন্তু এই প্রার্থনা ও এই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আমার আর একটি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের অন্তর-নিহিত লক্ষ্মী তোমাদের চক্ষে মুখে অধরে আরও উজ্জ্বলতর শোভা বিস্তার করুক। যে সকল বালিকা দুরদৃষ্ট বশতঃ তোমাদের এই সুখ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তোমরা সধবারা সেই বিধবাদের শুভ-অদৃষ্টরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। আজ সকল সুগন্ধকে পরাজয় করিয়া করুণার মধুর সৌরভ চারিদিকে বিস্তৃত হউক। সধবারও ব্রহ্মচর্য্য আছে। ব্রহ্ম বিধবারও যেমন সধবারও সেইরূপ। ব্রহ্মে সঞ্চরণ কর। যাহা শুভ তাহা ঘরে, গৃহে, তাহা সমাজে, সজনে নির্জ্জনে, আপনার চতুর্দ্দিকে সঞ্চার কর, সেবা কর, সেবা শিক্ষা দাও।

তোমাদের নিয়তির সীমা প্রসারিত হউক, তোমাদের নিয়তি উচ্চ হইতে উচ্চতর হউক।

কেতাবের ভাষা ও কথা কওয়ার ভাষা

কেতাবের-ভাষা ও কথা কওয়ার-ভাষার মধ্যে পার্থক্য যত কম হয়, ততই তাহা ভাষার পক্ষে মঙ্গলজনক। বাঙ্গলা ভাষার গতি এখন সেই দিকে। এখনকার বাঙ্গলা-ভাষার লেখকেরা অধিকাংশ স্থলে চলিত ও সহজবোধ্য কথা পাইলে, সাধ্যপক্ষে কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে চাহেন না।

বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সাহিত্য শাখার বিস্তৃত অভিভাষণে পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার মুখে কঠিন সংস্কৃত-মূলক কথার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলাভাষায় চলিত কথার ব্যবহারের আবশ্যকতার কথা শুনিয়া আনন্দ হয়।

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃত ও ইংরেজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া তাহা সহজ, মিষ্ট ও সরল করিতে বলিয়াছেন।

আমাদের সামান্য বিবেচনায় মনে হয় যে এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন।

লেখায় চলিত কথা ব্যবহার করা খুব ভাল। কারণ, লেখার উদ্দেশ্য লোককে বুঝান। লেখক যাহা লিখিলেন তাহা যদি অধিকাংশ লোকে বুঝিতেই না পারিল, তাহা হইলে লিখিয়া ফল কি? কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বত্র চলিত ভাষা এক রকম নয়। কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা যে সকল চলিত কথা ব্যবহার করেন, ঢাকা অঞ্চলের লোকেরা সেই সকল কথার সবগুলি ঠিক বুঝিতে পারেন না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকেরা যে বাঙ্গলায় কথা বলেন তাহা সব বুঝিতে পারা কলিকাতা অঞ্চলের লোকদিগের সাধ্যের অতীত। সেই জন্য মনে হয় যে, লেখায় চলিত কথা ব্যবহারের দিকে বেশী ঝোঁক দিলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত চলিত কথা ব্যবহার করিবার দিকে সেই সেই অঞ্চলের লেখকদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

হইবে এবং তাহা হইতে অরাধিক মনোমালিন্যের ও রেষারেষির সৃষ্টি হইতে পারে।

তাহাড়া সংস্কৃত-মূলক শব্দ ব্যবহার করিলেই যে ভাষাগত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে এমন ব্যবস্থা করাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না। "সময় কাটেনা"র পরিবর্ত্তে যদি কেহ লেখেন, "সময় কর্ত্তন হয় না", তাহা হইলে সে-টা বাড়াবাড়ি। কিন্তু "বাড়িয়ে গুছিয়ে নাও" না লিখিয়া কেহ যদি "পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও" লেখেন কিম্বা "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়" না লিখিয়া, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়" লেখেন, তবে কি তাঁহার লেখা কেহ পড়িবেন না?

"ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল" না লিখিয়া যদি কেহ "কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়" লেখেন, তাঁহাকে কি শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষমা করিবেন না? "ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল"র দ্বারা মনের ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু সকল রচনায় সর্ব্বত্রই কি ঐ "ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল" লেখা শোভন হইবে? "আক্কেল গুড়ুম্" দ্বারা মনের ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া "আক্কেল গুড়ুম্" না লিখিয়া "হতবুদ্ধি" লিখিলে চলিবে না কেন?

একজন লেখক লিখিলেন, "বিশ্বামিত্র মুনি মহারাজ দশরথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, মিথিলার যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণের জন্য আমি সেই স্থানে রাম লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। আপনি এ বিষয়ে অনুমতি করুন।' ইহা শুনিয়া মহারাজ দশরথ কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।" এই স্থলে "কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া" না লিখিয়া "ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন," লিখিলে কি খুব ভাল শোনাইত?

"ভ্যাবাচ্যাকা", "আক্কেল গুড়ুম", "চক্ষুস্থির", "লাল-বুরুক্কর" প্রভৃতি এমন অনেক চলিত কথা আছে যাহা দ্বারা মনের ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয় এবং হাল্কা রচনায় সেগুলি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু গম্ভীর রচনায় সেগুলি ব্যবহার করিলে বর্ণিত বিষয়টাই যেন খেলো হইয়া পড়ে।

"আলালত" না লিখিয়া যদি কেহ লেখেন "বিচারালয়" তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আপত্তি। সেইরূপ "অফিস" না লিখিয়া কেহ "কার্য্যালয়" লিখিলেও শাস্ত্রী মহাশয় বলিবেন, "ওটা পণ্ডিতী ভাষা, উহা চলিবে না। 'আপিস' না হয় 'অফিস' লিখিতে হইবে।"

চলিত কথা দেখিলেই নাক-সিঁটকান, এমন কোন দল আছেন কিনা জানি না, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সাধু-ভাষা দেখিলেই খড়্গ-হস্ত হন। আবাল্য সংস্কৃত-সাহিত্যের অত্যধিক আলোচনা করিয়া সাধুভাষার উপর শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অরুচি জন্মিয়াছে, তাই তিনি চলিত কথার অত পক্ষপাতী হইয়াছেন।

যেমন, লোকের প্রতিদিনের আহার্য্য-দ্রব্য খুব মশলাদার না হইয়া সাদাসিধা ধরণের হওয়া দরকার, তেমনি পুস্তকের ভাষাতেও যথাসম্ভব চলিত ও সহজ কথা ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতি-দিনের আহারের জন্য যে সাদাসিধা জিনিস প্রস্তুত হয় তাহা যেমন একবারে মসলা বর্জ্জিত করা চলে না, বা কোন ক্রমেই পরমমশলাদার জিনিস খাইব না এইরূপ জিদ্ করিলে চলে না, তেমনি, পুস্তকের ভাষাতে, চলিত কথা ছাড়া সংস্কৃতমূলক কথা ব্যবহার করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিতে বসিলেও চলে না। তেমন লেখা যে খুব ভাল হয় এমন মনে হয় না।

রচনার বিষয় যেমনই হউক না কেন "আলালী" বা "হুতোমী" ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করিব না, সংকল্প করিলে বাঙ্গলা ভাষা নেহায়েৎ একঘেয়ে হইয়া পড়িবে এবং তাহা আলোচনা করিবার আগ্রহ লোকের তেমন থাকিবে না। চলিত কথা বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলেও ঐ আশঙ্কা। ইংরেজী-শিক্ষিত লেখকদিগের বাঙ্গলা লেখায় ইংরেজী সাহিত্যের ভাব কতকটা আসিয়া পড়িবেই। তবে সেগুলি যাহাতে পুরাদস্তুর হাটকোটধারী না হইয়া দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয় সেই দিকে লেখকদিগের দৃষ্টি থাকিলেই হইল। বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা বৃথা; গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টাও বৃথা। তেমনি, বাঙ্গলা ভাষার

ইংরেজীর ভাব প্রবেশে বাধা দিবার চেষ্টাও যে ফলবতী হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। বরং, ইংরেজী ভাষার ভাব বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশলাভ করিলে তাহা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। "হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।" এই "সাহেবী বাঙ্গলার" কেহ "বাঙ্গালী বাঙ্গলা" করিয়া দেখাইয়া দিলে ভাল হয়।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সাহিত্যশাখার অভিভাষণের বা সম্বোধনের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, "ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে না, ঠিক করিয়াছেন আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত। না হইলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।" এই প্রস্তাবটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ। বাঙ্গলা ভাষার অভিধান কি বর্ত্তমান সময়ে কথার গুরুভারে এমন প্রপীড়িত হইয়াছে যে তাহা হইতে কতকগুলা অনাবশ্যক কথা ঝাঁটিয়া ফেলার এবং যাহাতে নূতন কথা বাঙ্গলা অভিধানে প্রবেশলাভ করিতে না পারে এমন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইয়াছে? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এ পর্য্যন্ত এমন একখানি অভিধানও সঙ্কলিত হয় নাই যাহাকে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গলা ভাষার অভিধান বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় "কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়" না লিখিয়া "ভ্যাবাচ্যাকা" লেখার পক্ষপাতী। কিন্তু আমি কয়েকখানি বাঙ্গলা অভিধান খুঁজিয়া "ভ্যাবাচ্যাকা" কথা পাইলাম না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত "বিশ্বকোষে"ও "ভ্যাবাচ্যাকা" শব্দ পাইলাম না।

বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল চলিত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেইরূপ শব্দ সঙ্কলিত একখানি বাঙ্গলা অভিধানও এ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দু একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। "রাগ" শব্দটী বাঙ্গলা ভাষায় "ক্রোধ" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে বোধ হয় "রাগ" শব্দের "ক্রোধ" অর্থ হয় না। অথচ নগেন্দ্র বাবুর বিশ্বকোষে বা সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত বাঙ্গলা অভিধানে "রাগ" শব্দের অর্থ "ক্রোধ" লেখা হয় নাই। বসু মহাশয়-সঙ্কলিত বিশ্বকোষে "রাগ" শব্দের সতের আঠার রকম মানে লেখা হইয়াছে। "রাগ" শব্দের অর্থ লিখিতে গিয়া "বিশ্বকোষ" সঙ্কলয়িতারা সংগীত শাস্ত্রের ছয় রাগের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল রাগের মূর্ত্তির বর্ণনা দিয়াছেন, কত সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়াছেন, অথচ "রাগ" শব্দের বাঙ্গলা ভাষায় যে অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত তাহা দেন নাই। অনুপ্রাস পূর্ব্বক "রাগত" শব্দের অর্থ "ক্ষুব্ধ" লেখা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে ওটা দেশজ শব্দ। সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "বাঙ্গালা অভিধানের" আজ কাল বাজারে ভারী নাম। তাঁর অভিধানেও "রাগ" শব্দের ক্রোধ অর্থ ছাড়া অনেক অর্থ লেখা হইয়াছে। আমার কাছে বরং প্রথমদিকের ও শেষদিকের কয়েকখানি করিয়া পাতা-ছেঁড়া যে একখানি ছাপান বাংলা অভিধান আছে, তাহাতে "রাগ" শব্দের অর্থ "ক্রোধ" লেখা হইয়াছে। এ অভিধান খানির নাম বা তাহার সঙ্কলয়িতা কে বা উহা কবে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। পনের বৎসর পূর্ব্বে আমি ঐ অভিধানখানি কতকগুলা বাজে কাগজ পত্রের মধ্যে অত্যন্ত ছেঁড়া অবস্থায় পাই। তারপর আমি সেখানিকে বাঁধাইয়া কোন রকমে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইয়াছি। আজকাল যে সকল বাঙ্গলা অভিধানের খুব কাটতি সেগুলির চেয়ে ছেঁড়া অভিধানখানি অনেক অংশে ভাল।

বাঙ্গলা ভাষার লেখকদিগকে শাসন করিবার জন্য একাডেমীরূপ বেত্রপাণি দৌবারিক খাড়া না করিয়া যাহাতে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাঙ্গলা অভিধান ও একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ সঙ্কলিত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সংস্কৃত ইংরেজী বাঙ্গলা ও অন্যান্য নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা এই কার্য্যে ব্রতী হইলে বাঙ্গলা ভাষার একটা প্রকৃত অভাব দূর হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত

ঢেঁকী-তত্ত্ব

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীটা বৈজ্ঞানিক যুগ। আজকাল বিজ্ঞান বলে না হইতে পারে এমন কাজ বড় নাই। কলাবার্ত্তা, চলাফেরা, রং তামাসা সকলই কলে কৌশলে সম্পন্ন হইতেছে। এমন কি চুরি চামারিও কলে সুসম্পন্ন হইয়া যায়। পাট, চিনি, সুতা, কাপড় প্রভৃতি সমস্ত জিনিষেরই কল বসিয়াছে। আজকাল কলে ধান, কলে দান, কলে শক্তি, কলে মুক্তি: চারিদিকেই কল—কল। সহরের ত কথাই নাই, সুদূর পল্লী অঞ্চলেও কল কারখানার হড়্ হড়্—কড়্ কড়্, পোঁ-পোঁ-পোঁ-পোঁ, প্রভৃতি সুমধুর শব্দে মনপ্রাণ আকুল করিয়া তোলে! আর বায়ু-তাড়িত কলার গুড়া নাকে মুখে ঢুকিয়া একবারে 'বাহ্যান্তরে শুচিঃ' করিয়া দেয়। দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিশ্রান্ত কল চলিয়াছে। দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও যখন ভেকের মকমকানি, শিয়ালের হু-উ-য়া-কাঁ এবং মশক কুলের সুমিষ্ট আলাপনে ঘুম আসেনা, তখন ঐ কলের শব্দগুলি কেমন প্রতিমধুর লাগে। "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!" যাহা হউক, এটা পল্লীর অভিজ্ঞতা। সহরবাসিগণ ইহার রসাস্বাদ বুঝিবেন না। বিজ্ঞানের এরূপ ছড়াছড়ির মধ্য দিয়া আমাদের শান্ত জীবন-স্রোতঃ নীরবে চলিয়া যাইতেছে। কাজেই আমাদের দেশীয় শিল্পগুলির ভিটাছাড়া হওয়া ব্যতীত আর কি উপায় আছে? এই লুপ্তপ্রায় শিল্পের মধ্যে আজ আমরা আমাদের ঢেঁকীর কথা পাঠকবর্গকে শুনাইব। ঢেঁকী সহরে ত নাইই, পল্লী অঞ্চলেও বড় বেশী দেখা যায় না। আজকাল ধান-ছাটা কল হওয়ায় এখন তাহার আর আদর নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই ঢেঁকী থাকিত। 'ঢেকী কুলা, বউ পোলা' যার না থাকিত, তাহাকে সকলে 'লক্ষীছাড়া' বলিত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন ঢেকী থাকাটাই বরং অলক্ষ্মীর চিহ্ন, নেহাৎ অভদ্রতা। হায়, কাল মহাত্মা!

কোন্ সময় হইতে ঢেঁকী আমাদের অন্দর মহল উজ্জল করিয়া শোভা পাইতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইহা যাদুকরের অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলেও প্রচলিত ছিল। প্রমাণ, পুরাণে নারদ প্রসঙ্গে ইহার সহস্রবার উল্লেখ। লক্ষ্মীর বাহন যেমন পেচক, গণেশের যেমন ইন্দুর, শিবের যেমন বলদ, তেমনি এই নারদ ঠাকুরের বাহনও ঢেঁকী। "যাদৃশী দেবতা তস্যাস্তাদৃশ বৃষবাহনম্!" এজন্য নারদের অপর নাম ঢেঁকী-যান বা ঢেঁকী-বাহন।

এমন সুগঠন, সেবাপরায়ণ, শিল্প-চাতুর্য্যময় ঢেঁকী কে আবিষ্কার করিয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই মনে একটা কুতূহল জন্মিতে পারে। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা ইহার কোনও রেকর্ড প্রাপ্ত হই নাই। তবে অনুমান করিয়া বলিতে পারি দেবর্ষি বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ংই হয়ত ঢেঁকীর আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের এ অনুমানের কতকটা কারণও যে না আছে, এমন নয়। দেখিতেছি, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল জিনিষেরই পরিবর্ত্তন ঘটে। মানুষেরা বুদ্ধি খাটাইয়া বিজ্ঞান ও শাস্ত্র-সম্মত উপায়ে সকল প্রকার জিনিষেরই একটা না একটা নূতন কিছু যোগ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ঢেঁকী এমনই সুকৌশলে ও অত্যাশ্চর্য্য ধরণে গঠিত হইয়াছে যে, কেহই ইহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিশোধন করা আবশ্যক মনে করিতে পারে নাই। ইহা আদিতে যাহা ছিল অদ্যেও তাহাই আছে। "ঘোরের উপর ঘোরকারী" কি সহজ কথা? বাস্তবিক স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার উর্ব্বর মস্তিষ্ক ব্যতীত এমন উদ্ভাবনী শক্তি আর কোথা হইতেও আসিতে পারে না। ধন্য তিনি, যিনি এই শোক-দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসার মরুভূমিতে এই ধূল-কুণ্ঠীর সদৃশ সকলরোগের ঢেঁকী সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ-যুগলে কোটি নমস্কার।

শুনিয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞানবল-দৃপ্ত আমেরিকার কোনও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত মৃদঙ্গ নামক বাদ্য যন্ত্রটির গঠন-নৈপুণ্যে এত বিমোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি উহার আবিষ্কর্ত্তার জ্ঞান-পরিমা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে

পৌরাঙ্গ-ভক্ত হইয়া পড়েন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সেই গুণগ্রাহী ভদ্রলোকটী যদি আমাদের বঙ্গ-ললনা-কুল-পদ-সেবিত ঢেঁকীর দর্শন পাইতেন, তাহা হইলে কখনও তিনি ঢেঁকীভক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না এবং সম্ভব যে আমরা আমেরিকার প্রতি ঘরে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম। অন্যান্য এত সুন্দর জিনিষ থাকিতে কেন যে নারদ ঠাকুর মহাশয় ইহাকেই বাহন করিয়া লইয়াছিলেন, এখন বোধ হয়, তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছেন।

ধানভাঙা ঢেঁকী কলটা নিতান্ত রসিক; উহা দানবের মত অহোরাত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সশব্দে দিগ্বলয় প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। ঘুম যখন করিয়া পথিকের পাত্রে মসীলেপন করিয়া দেয়। ইহাতে লোকের প্রয়োজন অনেক। কুলি, মজুর, কেরাণী, বড় বাবু, ছোটবাবু, দরোয়ান প্রভৃতি লোক লইয়া দস্তর মত একটী বড় আফিস চাই। কয়লা, আগুন, জল, গুদামঘর—উঃ! কি হাঙ্গাম! আবার ইহাদের কোনও জিনিষের হ্রাস বা প্রাবল্য ঘটিলেই কল বেকল হইল। এইরূপ পঞ্চময় জীবন লইয়া লোকের যুগপৎ কর্মজ্বালা ও পাত্রজ্বালা উৎপাদন পূর্ব্বক ছাটাকল বঙ্গের অঙ্গ জুড়িয়া আছে। আমাদের ঢেঁকীর এসব উৎপাত নাই। ইহাতে না আছে কয়লার প্রয়োজন; বেশী লোকেরও দরকার করে না। মাত্র ২।৩ টী কোমলাঙ্গী একখানা কুলার সাহায্যে সে কাজ অতি সহজে সম্পাদিত করিয়া দিতে পারেন। তাহার অবস্থিতি আরও অদ্ভুত, আরও রহস্যময়। অন্দর মহলের কোনও এক নিভৃত কোণে স্বল্প স্থান ব্যাপিয়া সচরাচর ঢেঁকীশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেখানে আমাদের কুলবধূদের ব্যতীত তপনদেবেরও প্রবেশাধিকার নাই। 'অন্যে পরে কা কথা?'

ঢেঁকীশাল বঙ্গ-ভামিনীদের পার্লামেণ্ট। সংসারের রান্না বাড়ার কাজ সারিয়া শেষ বেলায় তাঁহারা যখন প্রতিবাসিনীদের সহিত সেখানে মিলিত হন, তখন কত রাজনীতি সমাজনীতির কথা, কত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা কত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আলোচিত হয়। ন্যায়, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, শিল্প, সঙ্গীত, বৃথা প্রভৃতি চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যার কেমন সুন্দর অনুশীলন চলে। প্রেমালাপ, রঙ্গালাপও বাদ যায় না। কত স্বামী-হীনার 'হা হতোস্মি', কত বিরহ-বিধুরার দীর্ঘশ্বাস ঢেঁকীর উত্থান-পতন-জনিত সুমধুর শব্দের সঙ্গে মিশিয়া যায়। সন্তান পালন, পাক-প্রণালী, ধাত্রীবিদ্যা, প্রভৃতি রমণী-জন-সুলভ বিষয় গুলির যথাযথ আলোচনা দ্বারা সমাজের যথেষ্ট উপকার করা হয়। ঢেঁকীর প্রচলন বন্ধ হইলে এ সব হইতে পারিবে কি? এখনই তো আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি। এখন ঢেঁকী উঠিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার কচ্‌কচিটা যায় নাই। এখন ব্রাহ্মণ-সভায় ঢেঁকীর কচ্‌কচি, কায়স্থ-সভায় ঢেঁকীর কচ্‌কচি—কোথায়ই বা নয়?

ঢেঁকী সম্বন্ধে আপনারা যতই আলোচনা করিবেন ততই তাহার কবিত্বময় সরস নূতন নূতন তত্ত্ব সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। উহা আমাদের সমাজের প্রাণের প্রাণ, জাতীয় প্রকৃতির সম্যক উপযোগী। ইহার একবারে বিলোপ সাধন হইয়া গেলে, আমাদিগকে একটা দারুণ অভাব নিবন্ধন দুঃসহ কষ্টে পড়িতে হইবে। মানুষের বুকের ভিতর অন্তঃকরণটা অনবরত ধুক্ ধুক্ করিয়া যেমন জীবনী শক্তিকে সতেজ ও কার্য্যক্ষম রাখে সেই প্রকার আমাদের সমাজদেহের বুকেও অন্নদাতা ও প্রাণরূপী ঢেঁকী ধুপ্ ধাপ্ শব্দে সমাজের জীবনীশক্তি যোগায়। সম্ভবতঃ ইহার উদ্ভাবন কালে মানবান্তঃকরণের কার্য্যাবলীর প্রতি আবিষ্কর্ত্তার পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিজ্ঞানানুমোদিত কলকারখানা কোন মতেই আমাদের জাতিগত স্বভাবের সহিত খাপ খায় না। আমরা বাঙ্গালী; শান্তিতে থাকিতে পাইলে আমরা রাজমুকুটও তুচ্ছ করিতে পারি। আমরা প্রেমের গান শুনি, কবিতা লিখি, বক্তৃতা দেই। ইউরোপীয় কল কব্জার দানবী লীলা আমাদের চোখে নিতান্ত উদ্ভট, বিসদৃশ ও বেখাপ্পা। তাহাতে না আছে কবিত্ব না আছে রস। স্বাধীনতা তাহার চতুঃসীমায় ঘেঁষিতে পারে না। কোনদিকেই একচুল নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। তাহা হইলেই অন্ন নাশ! সবটাতেই আটা আটি বাঁধাবাঁধি নিয়ম। ঢেঁকী কোনও নিয়মেরই ধার ধারে না। উহা স্বাধীন

ভাবে ধীর-মন্থর-গতিতে সমাজ-দেহের উপর কাজ করিয়া যায়।

তারপর আর একটী কথা। শুধু দান জানাই ঢেঁকীর কাজ নয়। উহাদ্বারা আপনারা হলুদ-মরিচ-তিল-মুগ ইত্যাদি গুড়া করিয়া লইতে পারেন। যে মুগল বাদশাহী ভারকুট হইলে আদর খানা ভালরূপে জমে, এমন কি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমও যাহার গুণমুগ্ধ ছিলেন, সেই প্রাণঘন মাতোয়ারা অপরূপ পদার্থটী ঢেঁকীতে তৈয়ারী হয়। ধানছাটা কলে এসব হয় কি? ছাটা কলের চাউলে পিত্ত-বিকৃতি, বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার প্রভৃতি রোগ জন্মায়—একথা ডাক্তারগণ বলেন। কিন্তু আমাদের ঢেঁকীর উচ্ছিষ্ট পাখিরা, পরিপোষক এমন কি দেবতাদেরও উপভোগ্য। এমন সর্ব্বগুণাকর ঢেঁকীর বিলোপ সাধন হইয়া যাইতেছে, অথচ আপনারা কেহ একটা টুঁ শব্দও করিতেছ না, ইহাই আশ্চর্য্য। তবে যাও ঢেঁকী, মর্ত্যে তোমার স্থান হইল না স্বর্গে যাও। তোমার উপযুক্ত স্থান স্বর্গই বটে। সেখানে পিয়া-পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান্ ক্রমে দেবলোকের অমর মহল উজ্জ্বল করিয়া বসবাস করিতে থাক; আর আমরা তোমার কচ্‌কচিটা নিয়া জীবন কাটাই।

শ্রীজানকীনাথ সরকার।

স্বাস্থ্যোন্নতি *

আমাদের দেশের লোক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি যে এত উদাসীন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। স্বাস্থ্য-তত্ত্বে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমাদের শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের অনেক কারণ আছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষার জ্ঞানার্জ্জনের কোন কথাই নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত পুরুষগণকেও কোন দিন স্বাস্থ্যতত্ত্বের এক বর্ণও শিখিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের দেশীয় লোকেরা কতক শাস্ত্রীয় অনুশাসনে, কতক অভ্যাস বশতঃ অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ অনেক সময় আমরা অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করি। এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে সহজে করিয়া তুলিতে পারে না। কাজেই যখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর হইতে নূতন নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আমরা তাহা বুঝিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ি। আমাদের পুরাতন দেশ ও পুরাতন জাতি এখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যহ অগ্রসর হইতেছে। কি নিয়মে আমরা এই সকল বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি, তাহা না জানিলে আমরা কিছুতেই এ জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে পারিব না।

বাঙ্গালা দেশের লোক-সংখ্যা ৪৫৩,২১৮৭। ১৯১৩ সালে তন্মধ্যে ১৩৮,৭৭৯, জনের মৃত্যু হয়। প্রতি হাজারে মৃত্যুসংখ্যা ৩০। জন্মের সংখ্যা গত বৎসর ১৫২৯২১ অর্থাৎ হাজারে ৩৩·৭৬। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা ১৯২০৪২ অধিক।

শিশুদের মধ্যে ৩২০,১১২টীর অর্থাৎ গত শিশু জন্মার তাহাদের শতকরা ২০·১৫টীর মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক শিশুর মৃত্যু অতি অল্প দেশেই আছে।

উপরিউক্ত মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ ১৫৫,৫৫৫টী মৃত্যুর কারণ জ্বরোগ। (২১·৩০ হাজার করা) অর্থাৎ সমস্ত মৃত্যুসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭২টীর কারণ জ্বরোগ। ইহাদের মধ্যে ২৫,৬৬৭টী সহরে, বাকী ১৩০,৫২৪টী পল্লীগ্রামে।

৩২,১৯৫টী মৃত্যুর কারণ উদরাময় ও অতিসার, ১২০৬৩টীর কারণ শ্বাসযন্ত্রের রোগ। এই জাতীয় রোগের সংখ্যা সহরে বেশী।

৭৮৯৯টীর মৃত্যুর কারণ কলেরা।

এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগে ১০৬২ ও প্লেগরোগে ২৮৮টীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ কলেরা, জ্বর, বসন্ত, প্লেগ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া।

* মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এম্ এ, এম্, ডি, কর্ত্তৃক বঙ্গীয়-হিতসাধন মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

এদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এই রোগের বীজাণু Comma bacillus (Koch)। আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রোগীর মল মিশ্রিত থাকিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। Koch প্রথমে বেলেঘাটার একটি পুষ্করিণীর জলে এই বীজাণু প্রাপ্ত হন। কোন কলেরাগ্রস্ত রোগীর মল দ্বারা দূষিত কাপড় ঐ পুষ্করিণীতে ধোয়া হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সহরে এক রেজিমেণ্টের কিটারের বালি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বালি নদীতল হইতে আনাইয়া দেওয়া হয়। ঐ বালি কলেরা মল দ্বারা দূষিত ছিল। ঐ রেজিমেণ্টে অনেকের কলেরা হয়। পূর্ব্বে সেখানে কলেরা-বীজ ছিল না। কোন যাত্রী এই রোগ বহন করিয়া এই সকল স্থানে যায়। মাছি ইহার আর একটী বাহক। তাহারা যে কেবল পায়ে করিয়া এই বীজাণু মল হইতে লোকের আহার্য্য দ্রব্যে বহন করে তাহা নহে, তাহাদের নিজের মলেও এই বীজাণু অনেক পাওয়া যায়।

কোন সহরে জলের কল নূতন খোলা হইলে অনেক দিন সেখানে কলেরা থাকে না। কলের জল কলেরা রোগের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থাই কলেরা রোগ নিবারণের প্রধান উপায়। এতদ্ভিন্ন আহার্য্য দ্রব্য এবং খাদ্য প্রস্তুতি সমস্ত খুটাইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। আহার্য্য দ্রব্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত সর্ব্বত্রই করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের প্রায় ২৬৪০০০ লোক প্রতি বৎসর অর রোগে মারা যায়। ইহাদের অর্দ্ধেক (৪৮০০০০) অধিকাংশের (অন্ততঃ অর্দ্ধেকের) কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। অন্ততঃ পক্ষে ১০ জনের এই রোগ হইলে একজন মারা যায় সুতরাং প্রায় ৫০ লক্ষ লোক অর্থাৎ এই দেশের প্রায় প্রত্যেক ৯ জনের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত। যদি আমেরিকানদিগের ন্যায় আমাদের সকল বিষয়ে হিসাব ঠিক থাকিত তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম কি এই রোগে প্রতি বৎসর আমাদের কত লোকসান।

এই সকল মৃত্যুতে লোকের কষ্ট ত আছেই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানব জীবনের একটা আর্থিক মূল্য এখন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারিত করেন। কোন ব্যক্তির উপার্জ্জন ক্ষমতা কত এবং তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা কত দিন, এই দুইটি অঙ্ক লইয়া ঐ ব্যক্তির জীবনের আর্থিক মূল্য স্থির করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মিঃ ফার (Farr) হিসাব করিয়াছিলেন যে একটী নবজাত কৃষকসন্তানের জীবনের মূল্য ৫ পাউণ্ড। আমেরিকার ফিসার (Fisher) যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদিগের জীবনের মূল্য গড়ে ৪৮০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। নিকলসন্ ইংলণ্ডের এক একটী লোকের জীবনের মূল্য স্বদেশের পক্ষে ১০০০ পাউণ্ড এইরূপ নির্দ্ধার করেন। আমরা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, মাতৃভূমির পক্ষে এক এক জনের জীবনের মূল্য গড়ে উহার ৩০ ভাগের একভাগ ধরিয়া লইতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না।

ম্যালেরিয়াতে বৎসর বৎসর যে ৪৮০০০০ লোক মারা যায় তাহাতে আমাদের দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা উপরিউক্ত অঙ্কগুলি হইতে গণনা করা যাইতে পারে। একটি জীবনের মূল্য ৫০০ টাকা হইলে ৪৮০০০০এর অর্দ্ধেক ২৪০০০ হাজার উপার্জ্জনক্ষম লোকের জীবনের ১২০০০০০০ বার কোটি টাকা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগ আমাদিগের নিকট হইতে হরণ করিতেছে।

এই রোগের কারণ যে কি তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। এক রোগী হইতে এই বীজ অন্য রোগীতে সংক্রামিত হয়, কোন কোন জাতীয় মশা এই সংক্রামণে সাহায্য করে। ইহার কারণ কেবল যে ঐ সকল মশা তাহা মনে করিলে চলিবে না, যে কোন অবস্থা উহাদের দ্বারা এই সংক্রমণের সাহায্য করে সে সকলই ইহার গৌণ কারণ। ছোট ছোট পুরাতন অপরিষ্কার পুষ্করিণী, ডোবা, খানা, বিল, নদীর কোল পুরাতন নদীর স্রোতহীন অবশিষ্ট ভাগ, পুরাতন পাতকুয়া এমন কি গাবলার পচা জল ও কুলগাছের টব গোপদের জল এই সকল মশার ডিম পাড়িবার স্থান, আর বন জঙ্গল বা কোন অন্ধকারময় স্থান ইহাদের বাসস্থান। আমাদের পল্লীগ্রামের এক একটি গোয়াল ঘরে শত শত ম্যালেরিয়ার বাহন মশা

পাওয়া যায়। তার পর আবার আমাদের এই উর্ব্বরা জমিতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত ভাল না থাকায় বন জঙ্গল খুব সহজেই বাড়িয়া যায় আর ছোট ডোবা, খানা, গর্ত্ত শুকায় না।

আবদ্ধ জল, বন, জঙ্গল, ম্যালেরিয়াকে বিশেষ সাহায্য করে। এইরূপ প্রত্যেক বাটীর নিকটে নানা প্রকার মশলা ম্যালেরিয়ার সাহায্য করে।

প্লীহা হইতে যেমন প্লীহা জন্মে যায় সেইরূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এক রোগী হইতে মশা ম্যালেরিয়া বীজ অন্য রোগীর শরীরে বহন করে মাত্র। ইহা ত আর কোথাও জন্মে না, আর মশা নিজেও কিছু ইহা প্রস্তুত করে না। সুতরাং পূর্ব্বকার এক রোগীই ভবিষ্যতের অপর রোগীর রোগের কারণ।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হয়।

১। যাহাতে লোকের বসত বাটীর সন্নিকটে অর্থাৎ ১০০ গজের মধ্যে ম্যালেরিয়া-বাহক মশা ডিম পাড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সকল বাটীর নিকট যে সকল ছোট ছোট ডোবা, খানা, গর্ত্ত, পানা পুষ্করিণী, পুরাতন পাতকুয়া প্রভৃতি থাকে, তাহাতে একটু জল জমিয়া থাকিলেই মশার ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়। এজন্য এইগুলি ভরাট করিয়া জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

২। বাটীর নিকটে যে সকল ঝোপ জঙ্গল থাকে তাহা মশাদের আশ্রয়-স্থান। ইহারা কোন প্রকার একটু থাকিবার স্থান পাইলেই সেখানে আশ্রয় লয়। এজন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা আবশ্যক। জঙ্গল থাকিলে জমীর জল নিকাশ কখনও ভালরূপ হয় না।

৩। জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত। অনেক স্থানেই পল্লীগ্রামের নিকটস্থ খাল, নদী, মজিয়া যায়, এবং অনেক স্থানেই জল আবদ্ধ হয়। নদী নালা খালের উপর দিয়া অপ্রশস্তভাবে রেলওয়ে রাস্তা বা অন্য কোন রাস্তা নির্ম্মিত হইলে জল আবদ্ধ হয়।

৪। ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগুলিকে কুইনাইন সেবন করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদের শরীর হইতেই বীজ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। তাহাদের শরীরেই এই বীজ যদি নষ্ট করা যায় তাহা হইলে সংক্রামণের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। এ বিষয়ে কুইনাইন আমাদের প্রধান অস্ত্র। উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইলে ম্যালেরিয়া দমন সুনিশ্চিত।

পল্লীগ্রামের পক্ষে যেমন ম্যালেরিয়া, সহরে তেমনি যক্ষ্মারোগ। নানা কারণে এই রোগ দিন দিন আমাদের ভিতর বদ্ধমূল হইতেছে। এই সহরে বৎসর বৎসর প্রায় ২৩ শত লোক এই কারণে মারা যায়। একটী কথা এই যে এই রোগ নির্দ্ধন মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র পরিবারের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানা প্রকার কারণ একত্র হইয়া এই কুফল আনিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক সামাজিক, এবং কতক আর্থিক। নানা কারণে পল্লীগ্রাম হইতে অগণ্য লোক কলিকাতায় আসিতেছে। যৎসামান্য আয়ে এখানে খুব কষ্টে বহুলোক-পরিপূর্ণ ছোট ছোট অন্ধকারময় অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিতে হয়। একে অন্নের অভাব, তাহার উপর আবার পরিষ্কার বাতাসটুকুও নাই। প্রত্যহই দেখা যায় স্বার্থত্যাগ ও ধৈর্য্যের প্রতিমা স্বরূপিণী আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ রোগ বড়ই বৈষম্যব্যাধী; ধনী ও দরিদ্র রোগীর প্রতি ইহার প্রকোপের বিশেষ তারতম্য আছে। যদি এই সমিতি চেষ্টা করিয়া আমাদের বঙ্গসমাজের যেরূপও স্বরূপ মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদিগের এই রোগ নিবারণের কিছু সদুপায়ও করিতে পারেন তবে ইহার জন্য সফল হইবে। কিন্তু এই প্রশ্ন কিছু জগতের সম্মুখে নূতন নহে। প্রত্যেক বড় বড় সহরের এই প্রশ্ন আছে। লণ্ডন, পারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন এ সকল সহরে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা কতই কমিয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরেও গত ২ বৎসর হইতে এই রোগ নিবারণের জন্য সমবেত চেষ্টা হইতেছে। আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। ইহাতে অর্থের আবশ্যক আছে সত্য; কিন্তু সমবেত উদ্যম ও চেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বাস মিলিত হইলে আর্থিক অভাব কোথায় চলিয়া যাইবে তাহা কে জানে।

আধুনিক বিজ্ঞান-সঙ্গত উপায়ে উপযুক্ত লোকের

সমবেত চেষ্টাদ্বারা স্বাস্থ্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে প্যানেমা নগর ও প্যানেমা যোজকের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই নগর প্যানেমা খালের প্রশান্ত মহাসাগরের দিকের মোহানার নিকট অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৩১০০০। ১৯০৪ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই নগর পীত জ্বরের (yellow fever) মহামারি দ্বারা প্রপীড়িত হয় কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সেই মহামারিই এই নগরের শেষ মহামারি। আমেরিকানেরা এই নগরের ভার লইবার পর ২ বৎসরের মধ্যে এই রোগ সমূলে এই সহর হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন। এখন এই সহরের অবস্থা এত ভাল যে এ রোগ এখানে হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গত ৯ বৎসরের মধ্যে একজনও এই রোগে বিনষ্ট হয় নাই। পীতজ্বর stegomyia fasciata নামক একপ্রকার মশা দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই সহরে যাহারা উক্ত সময়ে রোগগ্রস্ত হইয়াছিল অথবা যাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হইত তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করিয়া মশার অগম্য গৃহ মধ্যে রাখা হইত। যে সকল ঘরে পূর্ব্বে এই সকল রোগী অথবা সন্দেহিত ব্যক্তি থাকিত সে সকল ঘরে মশা বিনাশ করিবার জন্য উপযুক্ত ধূম ও ঔষধ বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া হইত। আর এই জাতীয় মশককে তাহাদের জন্মস্থানে মারিবার জন্য উপযুক্তরূপ সেনানী সকল নিযুক্ত করা হইত। এই সময় এই নগরের প্রত্যেক ঘরের ছাদের বৃষ্টির জল ধোয়া নর্দ্দমা দিয়া কতকগুলি পিপাতে ধরা হইত। ইহাই এই নগরের খাবারের জল ছিল। কোন প্রকার জল নিকাশের নর্দ্দমা বা পয়ঃপ্রণালী ছিল না। রাস্তা কাঁচা সুতরাং বর্ষাকালে উহা কর্দ্দমে ভরিয়া যাইত। এই রাস্তারই ছোট ছোট গর্ত্তে এই মশা ডিম পাড়িত। আমেরিকানরা প্রথমেই কলের জল ও ড্রেনের পায়খানা ও পাকা ভূনিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করে। পরে প্রত্যেক রাস্তা পাকা করে ও তাহাতে ড্রেন বসায় এবং যত সম্ভব ছাদের খোলা নল এবং উহার জল ধরিবার পিপা দূর করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করে। তাহাতে প্রথমে এই স্থানের লোকের মধ্যে একটু অসন্তোষ জন্মিলেও পরে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা সিমেন্ট দ্বারা ঢাকিতে হইতেছে, ইহাতে ইঁদুরের বাস একবারে অসম্ভব। ইহাতে প্রথমে কিছু অর্থ ব্যয় হইয়াছে (£455000) সত্য কিন্তু এখন ঐ সহরে আর রেপ, টাইফয়েড জ্বর, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, পীত জ্বর প্রভৃতি কোন জ্বরই নাই। এই ত গেল প্যানেমা নগরের কথা।

প্যানেমার যে নূতন খাল প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে একত্র করিয়াছে ঐ খাল নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে একটী ফরাসি কোম্পানী গঠিত হয়। কিন্তু তাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়াই তাহাদের অন্যতম প্রতিবন্ধক। এই স্থানটি ভয়ানক প্রবল ম্যালেরিয়ার বাসভূমি এজন্য এখানকার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপায় মশক বিনাশ। খালের দুইধারে অগণ্য জলাশয়ই ম্যালেরিয়া বাহক এনোফিলসের জন্মস্থান। দুইটি উপায়ে এই জলাগুলিকে ভরাট করা হইয়াছে। খালের মাটি রাশি রাশি রেলগাড়িতে আনিয়া এই সকলের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, আর খালের তলদেশ আরও গভীর করিবার জন্য তথা হইতে কর্দ্দম ও বালি মিশ্রিত পাঁচ ষোলা জল বা তরল কর্দ্দম পম্পদ্বারা শোষিত করিয়া এমন কি ১ মাইল পর্য্যন্ত দূরে নলের ভিতর দিয়া চালান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় জলার উপর স্থানে স্থানে অনেক মাটির রাশি এমন কি বড় বড় গাছের গলা পর্য্যন্ত এইরূপে মাটি জমান হইয়াছে। বালবোয়া নামক একটী নূতন সহর এইরূপ ভরাট জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে স্থানের মধ্যস্থল দিয়া প্যানেমা খালটি গিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল এবং প্রসার ১০ মাইল। এই পাঁচ শত বর্গমাইল স্থানে প্রায় ৪০,০০০ শ্রমজীবী ও তাহাদের আত্মীয়বর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিত। ইহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করাই প্রধান প্রশ্ন। ইহাদের জন্য প্রায় ৪০টী পল্লী গঠিত হইয়াছিল।

এই স্থানে জল-বায়ু, আতপ ও বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ (100 in) সবই এনোফিলিসের বংশবৃদ্ধির সুবিধাজনক। এদেশে চারিমাস কাল বৃষ্টি হয় না কিন্তু তখনও খানা গর্ত্ত ডোবায় এত জল থাকে যে তাহাতে মশক সহজেই ডিম পাড়িতে পারে। অধিকন্তু এই সব শ্রমজীবীরা দলে দলে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে।

১৯০৪ হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ২,৫০,০০০ লোক এই স্থানে অস্থায়ীভাবে বাস করিয়াছে। এজন্য স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্যও কিঞ্চিৎ অধিক দুরূহ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছিল :—

২। উক্ত সীমার মধ্যে পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত মশকের সমস্ত আশ্রয়স্থান নষ্ট করা হইয়াছিল।

৩। সকল বাড়ীর দরজা জানালা তামার তার দ্বারা মশকের অগম্য করা হইয়াছিল।

৪। যেখানে জল নিকাশ দ্বারা ডিম পাড়িবার স্থান নষ্ট করিতে পারা যায় নাই সেখানে কেরোসিন বা অন্য কোন ডিম্বনাশক বিষ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

এই ৩০০ বর্গমাইল স্থানকে ১৭টী বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির ভার এক এক জন পরিদর্শকের অধীনে রাখা হয়। এই ব্যক্তি নিজ বিভাগের ড্রেণ তরাট, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি সব কাজের জন্য দায়ী এবং সকল ঘরের জানালা দরজায় তারের জাল দিতে বাধ্য। প্রতি সপ্তাহে প্রধান আফিসে এই সকল বিভাগের রিপোর্ট আসে। যদি রোগীর সংখ্যা শতকরা ১½ অধিক হয় তাহা হইলেই কোথাও কোন ত্রুটি হইয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় এবং কর্ম্মচারিদিগকে এই কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দেওয়া হয়। এবং আবশ্যক মত স্থানে যেখানে এনোফিলিসের ডিম পাড়িবার স্থান বলিয়া সন্দেহ হয় সেখানে নূতন নূতন ড্রেণ বসান হয়। জল নিকাশের সুবন্দোবস্তই এই রোগ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া যথাসম্ভব ড্রেণগুলি পরিষ্কার রাখা হয়, এবং আবশ্যক মত তাহাতে কেরোসিন-তৈল ঢালা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত মশক তাড়াইবার জন্য প্রত্যেক বসত বাটীর ১০০ গজের মধ্যে যত বন জঙ্গল থাকে তাহা পরিষ্কার করা হয়। এতদ্ব্যতীত জানালা দরজা সব তারের জাল দিয়া বন্ধ করা হয়। প্রত্যেক কার্য্য কার্য্যাধ্যক্ষের চক্ষুর সম্মুখে হওয়া চাই। তিনি এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

রোগ প্রতিষেধক রূপে কুইনাইন মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এজন্য কাহাকেও বাধ্য করা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় নূতন বসতিতে ১ম সপ্তাহে শতকরা ২৫ জনের ম্যালেরিয়া হয়, কিন্তু একমাস কি দুই মাস পরে যখন ড্রেণ গুলি সব প্রস্তুত হয় এবং বনগুলি সব পরিষ্কার হইয়া যায় তখন রোগীর হার শতকরা ১ জন মাত্র থাকে।

প্যানেমাতে উপরিউক্ত রূপ ম্যালেরিয়া নিবারক উপায় সকল অবলম্বন করিয়া যে সুফল হইয়াছে তাহা কর্ণেল Gorgas এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

১৯০৪ সালে যখন যুক্তরাজ্য প্যানেমার ভার গ্রহণ করেন, ঐ স্থানের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। ৪০০ বৎসর ধরিয়া এই যোজকটীকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মনে করা হইত এবং ঐ স্থানের মৃত্যুসংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ছিল। প্যানেমার পূর্ব্বতন রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে ১০০০ নিগ্রোকে আফ্রিকা হইতে আনান হয়। ৬ মাসের মধ্যেই তাহারা সকলে মরিয়া যায়। অন্য একটি ষ্টেশনের নাম মেটাচিন।

ফরাসী কোম্পানীর অধীনে ১৮৮—৮৯ সালে মোট ২২,১৪৯ কুলির অর্থাৎ ১০০০ করা বার্ষিক ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। যুক্তরাজ্যের হাতে ভার পড়িলে পর প্রথম প্রথম প্রত্যেক হাজারে বার্ষিক ৪০ জন মারা যাইত কিন্তু এক্ষণে ৭৩০ জন মাত্র। কেবল ম্যালেরিয়া আক্রমণের সংখ্যা হাজার করা ৮২১ হইতে এক্ষণে ৮৭ হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার দ্বারা ১০০০ করা ৮২ জন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৪৫ জন, ১৯০৮এ ২৮ জন, ১৯০৯এ ২২ জন, ১৯১০এ ১৯ জন, ১৯১১তে ১৯ জন,

১৯১২ তে ১১ জন, ১৯১৩ তে ৮ জন, মাত্র আক্রান্ত হইয়াছিল।

পীত জ্বর একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ১৯০৪ সাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত একটিও রোগী পাওয়া যায় নাই। ইহাতে খরচ যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। অন্ততঃ মার্কিন দেশের পক্ষে সে খরচ কিছুই নহে। এই খালের নির্ম্মাণ কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত মোট বার্ষিক ৭৯০০০ ডলার।

Col. Gorgas এক স্থলে লিখিয়াছেন—"ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বুঝিবেন যে এই খালদ্বারা কেবল যে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা হইল এবং একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল তাহা নহে কিন্তু ইহাদ্বারা প্রমাণ হইল যে বিষুব রেখার নিকটস্থ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানও উপযুক্ত উপায়ে মানুষের সমবেত চেষ্টায় এমন স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে যে সেখানে যে-কোন স্থান হইতে ইউরোপীয়গণ যাইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারেন।

প্যানেমাতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে উপায় গুলি অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি Ross এর নির্দ্দিষ্ট পুরাতন উপায়। কিন্তু এইগুলি অবলম্বন করিতে যে উদ্যম, যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, যে যত্ন, যে সাবধানতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে মনোযোগ এবং প্রত্যেক "খুটিনাটি" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিবার যে সুবন্দোবস্ত তাহা আমাদের কেন, সমস্ত জগতের শিক্ষার বিষয়।

ইটালিতে পূর্ব্বে অনেক স্থান ম্যালেরিয়ার বাসভূমি ছিল কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যে যে উপায়ে উহা করিয়াছে তাহা ১৯০১ সালের ঐ দেশীয় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় আইন হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানে সকল সরকারী ও সাধারণ আফিস, সকল রেলওয়ের বাড়ী, এবং সকল সরকারি কন্ট্রাক্টরের আফিস সমূহের দরজা জানালায় জুন হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জাল দিতে হইবে যাহাতে ঐ সকল স্থানে মশা প্রবেশ করিতে না পারে। বেসরকারি কার্য্যালয় অধিকারীরা ঐরূপে জাল দিয়া তাঁহাদের বাড়ী রক্ষা করিলে তাঁহারা Malaria fund হইতে ১০০০ ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইবেন। যতদূর সম্ভব ভূম্যধিকারীগণ তাঁহাদের বাটীর জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিবেন এবং কোন মতেই ছোট ছোট গর্ত্ত বা ডোবায় জল জমিতে দিবেন না। রাস্তা এবং খালের কণ্ট্রাক্টরগণকে এমন করিয়া মাটি কাটিতে হইবে যে, জল জমিতে পারে এমন গর্ত্ত কোথাও না থাকিয়া যায়। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ যদি কণ্ট্রাক্টরদিগের দোষ দেখিয়া উপেক্ষা করেন তবে তাঁহারা নিজেই দণ্ড পাইবেন।

পূর্ত্তবিভাগের কণ্ট্রাক্টরদিগকে স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে এই সর্ত্তে হুকুম লইয়া কাজ করিতে হইবে যে রাস্তা বা খাল প্রস্তুত করিতে যে মাটির আবশ্যক হইবে স্বাস্থ্যবিভাগের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেই তাহা লইতে হইবে এবং এজন্য যে সকল খানা খন্দ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভরাট করিয়া দিতে হইবে। যাহারা এরূপ ভাবে খালের চাষ করিতে পারিবেন, যে তজ্জন্য কোথাও জল জমিবে না, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এতদ্ভিন্ন সরকারি বেসরকারি সকল মনিবই নিজ নিজ অধীনস্থ সকল লোককেই কুইনাইন দিবেন। প্রত্যেক ম্যালেরিয়াক্রান্ত বিভাগে দুই মাইলের মধ্যে কুইনাইনের দোকান থাকা চাই।

এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণের কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান Surgeon Genl Sir Pardey Lukis এ বিষয়ে সদুৎসাহে ও মহোদ্যমে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৪৯ সালে ইংলণ্ডে একবার কলেরা রোগে প্রায় ৩০০০০ লোক মারা যায়। সেই সময় হইতেই ইংরাজেরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল্য বুঝিয়াছেন, আমাদের দেশের মহামারিতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বৎসরে জল নিকাশের জন্য, পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপালিটিগুলি বৎসর বৎসর

৩৪।৩৫ লক্ষ টাকা কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খরচ করেন। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য আছে। কিন্তু আমাদের ভার আমরা নিজে বহন করিতে চেষ্টা না করিলে কেহই আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না। আর আমাদের ভাবিবার বিষয় বেশী নাই, করিবার অনেক আছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার করা চাই, বসত বাটীর নিকটস্থ (১০০ গজের মধ্যে) ডোবা, খানা, ভরাট করা চাই,—ছোট ছোট পগার খাল পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহা দিগকে একত্র করিয়া, জল নিষ্কাশের সুবিধা করিয়া দেওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন যে সকল ভাই ভগ্নীরা রোগগ্রস্ত হইবে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য কুইনাইন সেবন করান চাই। কলেরা নিবারণের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে পরিষ্কার পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা চাই এবং আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে মক্ষিকা স্পর্শে দূষিত না হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। সহরে বসন্তরোগ নিবারণের জন্য ধনহীন ভ্রাতা ভগ্নীদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার মাছ ও পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত করা চাই। বসন্ত ও প্লেগ নিবারণের জন্যও উপযুক্ত টীকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা চাই।

সর্ব্বোপরি এই সকল উদ্দেশ্যের সফলতা সমাজের লোকের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সেবা সমিতি প্রতিজ্ঞা করুন যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞানের প্রচার তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইবে। একদিনে কিছু হইবে না, কিন্তু সমবেত হইয়া বদ্ধপরিকর হইয়া আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই বিধাতার কৃপায় সফল হইব।

কর্ত্তব্যের ভার কখনও মানবের শক্তি অপেক্ষা অধিক হয় না। সেবাব্রতের শক্তির সীমা নাই। একবার ভারতের সেই অতীতের আত্মোৎসর্গময়ী শক্তির আরাধনা করিয়া, সকলে আপনাকে ভুলিয়া, সকলে একত্র হইয়া সমবেত সামর্থ্যকে পরসেবায় নিযুক্ত করিলে সব বাধা দূর হইয়া যাইবে। আমাদের স্বপ্ন ও মানস রাজ্যের মধ্যে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে। প্রতিকূল ঘটনার খরস্রোত পন্থাও তাহা নষ্ট করিতে পারিবে না।

বীর বিক্রম *

দৃশ্য কাব্য

নাট্যোক্ত পাত্রপাত্রীগণ

বিক্রমসিংহ— সিংহল-রাজ।
বীরবাহু— তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠপুত্র।
বলবন্ত ভীম— পাণ্ড্যরাজকুমার।
সহদেব— চোলরাজ।
অমর— সহদেবের দশম বর্ষীয় পুত্র।
রবিতন্ত্র— সহদেবের অধীন সামন্তরাজা।
বিক্রম সিংহের ছয় পুত্র। সৈন্যগণ, ভৃত্যগণ ইত্যাদি।
তরলিকা—বিক্রমসিংহের কন্যা, বলবন্তের স্ত্রী।
মালবিকা—বিক্রম সিংহের পালিতা কন্যা, সহদেবের স্ত্রী।

১ম অঙ্ক

[দৃশ্য—চোল দেশের উপকূল, সমুদ্র হইতে খাড়া পাহাড় উঠিয়াছে, দূরে পাহাড়ের এক ধারে এক বৃহৎ প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে। অন্যধারে সমুদ্রে নঙ্গর করা দুইখানা যুদ্ধ জাহাজের উচ্চ মাস্তুল দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের উপরি সমুদ্রের অব্যবহিত পাড়ে একখানা কুটীর,—দ্বার রুদ্ধ।

ঝড় বৃষ্টি। যোদ্ধবেশে সজ্জিত বলবন্ত সমুদ্রের ধার হইতে দেখা দিলেন। যোদ্ধবেশেই সজ্জিত বিক্রমসিংহ পাহাড়ের ধার হইতে নামিলেন। সহসা কুটীরখানা দেখিয়া বলবন্ত তাড়াতাড়ি কুটীরের নিকট গেলেন এবং রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিক্রমসিংহ উচ্চভূমি হইতে নামিয়া বলবন্তকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া বলবন্তকে আহ্বান করিলেন। বিক্রমসিংহ বৃদ্ধ হইলেও বীরত্ব-ব্যঞ্জক আকৃতি—শুভ্র পক্ক ও দীর্ঘ এবং প্রকাণ্ড পাগড়ীতে মুখ প্রায় ঢাকা।]

---

* নরওয়ের নাট্যকার ইবসেনের Warriors at Helgoland অবলম্বনে।

বিক্রম। সরে দাঁড়াও যোদ্ধা!

বলবন্ত। (চকিতে ফিরিয়া, তরবারিতে হাত দিয়া) তা হ'লে জীবনে এই প্রথম বার সরে দাঁড়ান হবে!

বিক্রম। যাও বলছি। তোমায় যেতে হবে! এই কুটীর আমার চাই-ই,—আমার সঙ্গীরা অত্যন্ত ক্লান্ত।

বলবন্ত। আমার সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে, তার দরকার তোমার সঙ্গীদের চেয়ে ঢের বেশী।

বিক্রম। সরে যাও, আমার একজন লোক তোমার সহস্র স্ত্রীলোকের চেয়ে মূল্যবান!

বলবন্ত। কাপুরুষ! এই দেশে অতিথিদের কি এতই বহুমূল্য?

বিক্রম। সাবধান যোদ্ধা, তোমাকে এই অপমানের প্রতিফল দিব। (তরবারি খুলিলেন)

বলবন্ত। (তরবারি খুলিয়া) তবে মর, বৃদ্ধ!

(দুই জনে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তরলিকা এবং বলবন্তের সৈন্যগণ সমুদ্রের দিক হইতে দৌড়িয়া আসিল। বিক্রমের ছয় পুত্র পাহাড় হইতে দৌড়িয়া নামিল)

তরলিকা। (উচ্চৈঃস্বরে জাহাজের দিকে ফিরিয়া) —শীঘ্র এস বলবন্তের সৈনিকগণ, তোমাদের প্রভুর—ভারী বিপদ—শীঘ্র এস।

বিক্রমের পুত্রগণ। থাও—থাও, পিতাকে সাহায্য কর।

বলবন্ত। (নিজের সৈন্যগণের প্রতি) দূরে দাঁড়াও—আমি একাই পারব,—ভগবান স্মরণ কর বৃদ্ধ!

বিক্রম। (পুত্রগণের প্রতি) সরে যাও সবে, (বলবন্তকে আক্রমণ করিয়া) তোমার রক্তে স্নান করব।

বলবন্ত। নিজের রক্তে স্নান কর আগে,— (বিক্রমকে আহত করিলেন, বিক্রমের হাতের তরবারি পড়িয়া গেল)

বিক্রম। ধন্য, ধন্য বীর—তোমার অস্ত্র চালনা ভীম বলবন্তকেও লজ্জা দিত,—

বলবন্ত। (হাসিয়া) ঠিক্ বলেছ বৃদ্ধ!

বিক্রমের পুত্রগণ। বাবা, এ যে বলবন্ত নিজেই—ভীম বলবন্ত!

বিক্রম। ধন্য বলবন্ত, তীব্র তোমার আঘাত; কিন্তু আমার কন্যা তরলিকাকে হরণ করে নিয়ে এসে তুমি আমাকে এর চেয়ে তীব্র আঘাত দিয়েছ। (মাথা হইতে পাগড়ী খুলিলেন এবং মুখ প্রকাশ পাইল)

বলবন্ত ও সৈনিকগণ। (সবিস্ময়ে) সিংহলরাজ বিক্রমসিংহ!

তরলিকা। (আবেগে) বাবা তুমি, তুমি!—ভ্রাতৃগণ আমার!

বলবন্ত। তরলিকা, আমার পশ্চাতে দাঁড়াও।

বিক্রম। কোন দরকার নাই, বলবন্ত! (অগ্রসর হইয়া) আমি তোমাকে দেখবামাত্র চিনেছি, আর তাই ইচ্ছা করে কাপড় বাঁধিয়েছিলাম। লোকে বলে তোমার কাছে দাক্ষিণাত্যে তরোয়াল ধরিতে পারে এমন কেহ নাই,—তাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম সত্যি কি না? আমি তুষ্ট হয়েছি, বলবন্ত। বলবন্ত! আজ হতে তোমাতে আমাতে সন্ধি, তোমার উপর আর আমার কোন বিদ্বেষ ভাব নেই!

বলবন্ত। (প্রণাম করিয়া) সন্ধির সর্ত্ত বলুন, আপনার সহিত সন্ধি আমার প্রার্থিতম, আমার গৌরব!

বিক্রম। তুমি মহাবীর, বলবন্ত। বিক্রমসিংহের তরবারি হস্তচ্যুত, আর পূর্ব্বে কখনো হয় নি! বিক্রম সিংহের সম্মুখে এমন নির্ভীকভাবে তরবারি ধরতে আর কাউকে দেখি নাই।

বলবন্ত। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সঙ্গে তরবারির পরিচয় আর যেন না হয়। আপনার কন্যাকে হরণ করে যে অপরাধ করেছি, তার শাস্তিবিধান করুন, আমি স্বীকৃত আছি; কি সর্ত্তে বিবাদ মীমাংসা হবে, বলুন।

বিক্রম। বিবাদ যেখানে আন্তরিক নয়, মীমাংসা অতি সহজেই হয়। (অন্য সকলের প্রতি) তুমি তোমরা সবে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ড্য-রাজকুমার বলবন্ত আর চোল-রাজকুমার সহদেব সমুদ্র ভ্রমণ উপলক্ষ্যে সিংহলে এসে অতিথি হয়। আমি তাদেরে সাদরে আমার প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলাম। আমার প্রাসাদের রত্ন স্বরূপ ছিল, আমার কন্যা তরলিকা আর আমার পালিত

কন্যা মালবিকা। এই রাজকুমার ছল করে বলে আমার দুই কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যায়। এক রাত্রে—কি ভয়ানক সেই রাত্রি—আমার স্পষ্ট মনে আছে,—সেই রাত্রে বলবন্ত তরলিকাকে নিয়ে, আর সহদেব মালবিকাকে নিয়ে জাহাজে চড়ে পালিয়ে যায়। বলবন্ত, কন্যাহরণ ক্ষত্রিয়গণ পাপ মনে করেন না। তুমি বীর, বীরের মত যদি আমার কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যেতে, আমি তোমার হাতে আমার কন্যাদান করে গৌরব বোধ করতাম। কিন্তু তুমি আমার আতিথ্যের অবমাননা করেছিলে তুমি তস্করের মত আমার কন্যাকে হরণ করেছ। (বলবন্ত অধোমুখ হইলেন) তোমার সেই অপরাধে তোমাকে তিন সহস্র সুবর্ণ দণ্ড দিতে হবে। কেমন? স্বীকার আছ?

বলবন্ত। অতি লঘু দণ্ড! আমি অবনত মস্তকে এই শাস্তি স্বীকার করে নিলাম। আমি এই দণ্ড দিব, আর তার সঙ্গে আপনাকে একখানা চীনাংশুক উপহার দিব, কলিঙ্গরাজ আমাকে সেখানা দিয়েছিলেন। সিংহলে এমন বস্ত্র কেউ চোখেও দেখেনি।

তরলিকা। ধন্য প্রভু! বাবা, (প্রণাম করিয়া) প্রকৃত সুখ কি আজই প্রথম তা জানলুম।

বিক্রম। বলবন্ত, বৎস, দীর্ঘজীবী হও। তরলিকা এখন তোমার ধর্ম্মপত্নী হল। আশীর্ব্বাদ করি দুজনে চির সুখে থাক।

বলবন্ত। এখন হতে আমাকে আপনার নিজের পুত্রের ন্যায় অনুগত মনে করবেন।

বিক্রম। তা আমি জানি বৎস। বীর তুমি, তোমার কথার অন্যথা হবে না; আমি এখন দেখতে চাই তুমি আমার কিরূপ অনুগত।

বলবন্ত। আমি প্রস্তুত। বলুন কি কর্ত্তে হবে।

বিক্রম। আমি তোমার সাহায্য চাই—কায়মনোবাক্যে সাহায্য। আমি এখানে কেন এসেছি জান? আমি জীবনের হিসাব নিকাশ করতে বের হয়েছি, দেনা পাওনা সব পরিষ্কার করব। তোমার সঙ্গে আমার দেনা পাওনা পরিষ্কার হয়ে গেল, এখন বাকী সহদেব। আমি তার শাস্তি বিধান করব, সে আমার পালিতা কন্যা মালবিকাকে অপহরণ করে এনেছে। বলবন্ত, তোমাকে সাহায্য করতে হবে!

বলবন্ত। সহদেব?——এখানে!

তরলিকা। আর মালবিকা? সেও এখানে?

বিক্রম। কেন, এটা যে চোল দেশ জানতে না? ঐ যে সহদেবের প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে!

বলবন্ত। সত্যি জানতুম না! সেই সিংহল থেকে একত্র আসা অবধি আমি আর সহদেবের কোন সংবাদ রাখি নাই। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার বড় ভাই পাণ্ডা সিংহাসনে বসলেন, তাঁহার নিকট হতে এক রণতরী লয়ে আমি আজ পাঁচ বৎসর সমুদ্রতরঙ্গের মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। অবশেষে কলিঙ্গরাজের অধীনে স্থির হয়ে বসেছিলাম, কিন্তু কেন জানি না, বহুদিন পরে স্বদেশের জন্য প্রাণটা কেঁদে উঠল:—থাকতে পারলুম না, তাই চলে এলুম। কাল ঝড়ের বেগে এসে এই দেশে পড়েছি এটা যে চোল দেশ জানতুম না।

তরলিকা। তবে তুমি সহদেবকে শাস্তি দিতে বেরিয়েছ বাবা!

বিক্রম। হাঁ মা। ভগবান তোমাদেরে মিলিয়ে দিয়েছেন, কারণ খুঁজলেও নিশ্চয় পেতুম না!

বলবন্ত। (চিন্তিতভাবে) ঠিক, ঠিক, সবি ঠিক। কিন্তু সহদেব, শৈশবের খেলার সাথী, যৌবনের বন্ধু আমার;—সিংহলরাজ, আপনি কি তাকে শাস্তি দিতে সত্যই কৃতসঙ্কল্প?

বিক্রম। নিশ্চয়! শুন বলবন্ত। গত বৎসর আমাদের সাময়িক সভায় আমার সামন্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ভোজন শেষে, যখন পরস্পরে সদালাপ চলছিল তখন আমি কন্যাহরণের প্রতিশোধ নেই নি বলে মদ্য-পানোন্মত্ত এক সামন্ত আমাকে কাপুরুষ বলে গাল দেয়। ভগবান জানেন, আমি তখনই তাহার মস্তক ছেদন করতাম, কিন্তু আমার মনে হল, সামন্ত সত্য কথা বলেছে। এমন অপমানের প্রতিশোধ যে না নেয়, সে কাপুরুষ নয় ত কি? সেই দিন প্রতিজ্ঞা করলুম, প্রতিশোধ নিতে হবে। তাই রণতরী নিয়ে বের

হয়েছি, প্রতিশোধ না নিয়ে আর সিংহলে ফিরে যাব না!

বলবন্ত। আমি বুঝেছি, যে রকমেই হউক, আপনার প্রতিশোধ না নিয়ে ফেরবার উপায় নেই!

বিক্রম। ঠিক তাই! কিন্তু আমি সহদেবের প্রতি অন্যায় করব না: তোমাকে অর্ধদণ্ড করেছি, তাকেও অর্ধদণ্ডই করব। উন্মুক্ত সমুদ্র বক্ষে বেরিয়ে যে আমার কি আনন্দ হয়েছে, তোমাকে কি বলব! শৈশব হ'তে সমুদ্র আমার চির সঙ্গী, আমার দিন কুরিয়ে এসেছে, তাই আজন্ম-সুহৃদের বক্ষে একবার মুক্তপ্রাণে বিচরণ করবার বড় সাধ হয়েছিল। আমার বড় ছেলেরা প্রায়ই রণতরী নিয়ে সমুদ্রে বের হয়। কিন্তু সকলের ছোট বীরবাহুকে কখনো সমুদ্রে যেতে দিই নি, তাকে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত করানও এক কাজ—

তরলিকা। বীরবাহু তোমার সঙ্গে এসেছে বাবা? কোথায় সে?

বিক্রম। ঐ জাহাজে, (পশ্চাতে দেখাইলেন) দেখবে তোমরা, ভারি সুন্দর ছেলে। সে এখন অনেক বড় হয়েছে, সে এখন প্রকৃতই বীরবাহু। দেখো বলবন্ত, সে একদিন তোমার মত নাম করবে।

তরলিকা। (হাসিয়া) এ চিরদিনই দেখে আসছি, বাবার সমস্ত টান এই সকলের ছোট বীরবাহুর উপরে।

বিক্রম। আর তোদের উপর বুঝি টান নেই, না? আহা, শৈশবে বেচারীর মা মারা গেছে—বীরবাহু ঠিক তার মার চেহারা পেয়েছে।

বলবন্ত। এখন সহদেবের বিষয় যা হয় একটা ঠিক করে ফেলুন। আপনি কি আজই চান—

বিক্রম। বেশ ত, আজই হয়ে যাক না, ক্ষতি কি? আমি অর্থ দণ্ডেই তুষ্ট হব, কিন্তু সহদেব যদি তা' না দিতে চায় তবে সে তার অপরাধের ফলভোগ করবে, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিনীকান্ত ভট্টশালী।

পরলোকে আত্মার গতিবিধি

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"—

গীতা ২য় অধ্যায়, ২০।

আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই; আত্মা কখনও হয় নাই: আত্মার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নাই। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হ'লে আত্মা হত হয় না।

মানুষের আত্মা যে অমর, শরীর নষ্ট হ'য়ে গেলেও আত্মা যে থাকে, এই বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত। প্রাচীন নবীন, সভ্য অসভ্য এমন মানুষ দেখা যায় না, যারা পরলোকে বিশ্বাস না করে। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে ধারণা এক এক দেশে এক এক রকম:—পরলোক যে কেমন সেখানে আত্মা যে কি ভাবে থাকে, জীবিত মানুষ তা তো চোখে দেখে নি, সে বিষয়ে নানা দেশের জ্ঞানী লোকেরা ভেবে কল্পনা করে যেমন সম্ভব বলে মনে করেছেন, তেমনি নানা কথা নানারূপ বর্ণনা করেছেন। সে সবই কিন্তু কল্পনা।

কিছুদিন হ'তে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা চলেছে। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ৪০।৫০ বছর ক্রমাগত এ বিষয়ে চিন্তা ক'রেছেন—এবং এক দিকে ধ্যানবল, প্রেমবল অন্য দিকে বিজ্ঞানবল—দুই উপায় একত্র ক'রে, পরলোকে আত্মার অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব নিশ্চিত রূপে জানবার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁরা পরলোকস্থ আত্মার ধ্যানের দ্বারা, গভীর মন-সংযমের দ্বারা ইহলোকে থেকেই পরলোকের সংবাদ জানতে চেষ্টা ক'রেছেন; শত সহস্র বিদেহী আত্মার সঙ্গে, শত শত চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি, নানা স্থানে নানা ভাবে, চিন্তাবিনিময় ক'রেছেন। চিন্তাবিনিময়ের পথে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর, এ বিষয়ে বহু পরিবাদে নিঃসংশয় হওয়ার পর, তাঁরা বিজ্ঞান বলে বিদেহী আত্মার সূক্ষ্মদেহের ফটো তুলবার

চেষ্টা করেন, এবং অনেক পরীক্ষার পর কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হ'ন। তার-বিহীন টেলিগ্রাফের মত এই ব্যাপার সাধারণ লোকের কাছে অসম্ভব এবং বিস্ময়কর। কিন্তু ক্রমশঃ, পরলোকস্থ আত্মার ছায়াচিত্র তোলা সহজ ঘটনায় পরিণত হ'য়েছে। সে চিত্র কেমন তার একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া গেল। এই প্রবন্ধে তাঁদের চেষ্টার ফল ধারাবাহিকরূপে সংক্ষেপে বিবৃত করা হ'বে।

১। মৃত্যুর পর ধর্ম্মমত সঙ্গে যায় না; কর্ম্মফল আত্মার সঙ্গে যায়।

তুমি কোন্ সমাজের লোক, তুমি কত বড় কাজ কর, তোমার কত টাকা, কত প্রভুত্ব,—পরলোকে এ সকলের কোন মূল্য নাই। এখানকার মহামহোপাধ্যায় প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়ে দীনদরিদ্র শূদ্রের সঙ্গে সমান। মৃত্যু মানবাত্মার সকল বাহ্য সম্পদ-সম্ভ্রম পরিচ্ছদ খুলে দিয়ে, পরলোকে সকলের সাম্নে একবারে নগ্ন বেশে তাকে ছেড়ে দেয়। এখানে যে রাজা, সেখানে সে পথের ভিখারী। ইহলোকের কর্ম্মফল পরলোকে আত্মার একমাত্র সম্বল। কিন্তু, আমরা কেবল শরীর দিয়েই কাজ করি না। আমাদের অধিকাংশ কাজ হাত পা নাড়বার আগেই মনের মধ্যে সম্পন্ন হ'য়ে যায়। আমাদের চিন্তাই চরিত্র-গঠন করে। শরীর দিয়ে আমরা যা করি তা মনের সাময়িক ও আংশিক প্রকাশ মাত্র। শাস্ত্রে আছে—"পরলোকবাসী তোমার প্রিয় আত্মাগণ সেই নূতন রাজ্যে পরমাত্মাকে তোমাকে বরণ ক'রে নেবেন। এবং তোমার শুভকর্ম্মফল তোমার পূর্ব্বেই সেখানে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে।"

২। পরলোকে আত্মার কোন কাজ থাকে কি না!

পরলোকে গিয়ে আত্মা নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ আত্মা—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু,—নানা অবস্থার আত্মা সেখানে যাইতেছে। তাদের গ্রহণ করা, অন্যান্য রাজ্যের বিধি-নিয়ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া, পূর্ব্বগামী ও উন্নত আত্মাদের কাজ। জীবন্ত ও জ্ঞান বান অসংখ্য অমর আত্মা বর্ত্তমান আছে, অথচ কিছুই করে না, একি সম্ভব? ধর্ম্মের নামে কত ভুল ভ্রান্তিতে আত্মা ডুবে থাকে, দেহত্যাগ কর্‌লেও সেই ধারণা যায় না। এই সব আত্মা পরলোকে গিয়ে জাঁপরে পড়ে। ইহাদিগকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করা, এদের ভুল সংস্কার দূর করা,—এক মহা কাজ। স্থূল দেহ ত্যাগের পর আত্মা এক প্রকার সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয়, তা প্রায় বর্ত্তমান দেহের মত। পরলোকে শত শত আত্মা নবাগত আত্মাদের পরিবর্ত্তিত অপরিচিত অবস্থাটা যে সহজ সহাই কি সেই শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সেখানে একটি আত্মাকেও কেও তাচ্ছল্য করে না। উন্নত অগ্রগামী শক্তিশালী আত্মা সকল পৃথিবী হ'তে সমাগত প্রত্যেক আত্মার সেবা ও সহায়তা করে।

৩। পরলোকে ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি।

এ জগতে যারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতের গোঁড়ামি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা পরলোকে গিয়ে নিজেদের ভ্রান্তি দেখে অবাক্ হয় এবং যাঁরা ঐ সব মতের প্রচারক ও শিক্ষক তাঁদের আত্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তাঁরা ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন কেন? সেখানে গিয়ে এখানকার বড় বড় আচার্য্য-গুরু, পুরোহিত ও ধর্ম্ম প্রচারকগণ নিজেদের ভুল দেখে লজ্জিত ও বিস্মিত হ'ন। সেখানে গিয়েই এদের ভ্রান্তি যায় না!—কেবল কেমন একটা গোলমাল বোধ হয়। উন্নত আত্মাদের অনেক চেষ্টায় এদের পূর্ব্ব-সংস্কার দূর হয়। এই অবস্থায় কোন কোন আত্মা কোন মানুষকে মধ্যবর্ত্তী করে নিজের ভ্রান্ত মত গঠন করিয়াছে বলিয়া কত দুঃখ করে।

৪। পরলোকে জীবনের বিভিন্ন স্তর।

মৃত্যুর পরেই সব মানুষের আত্মার অবস্থা এক হয় না। মানব জীবনের অভিজ্ঞতা ও মনের বিকাশ অনুসারে, পরলোকে আত্মাসকল ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বাস করে। এ জীবনে যে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবেছিল, সে যে দেহত্যাগ করবামাত্র জ্ঞানের মুক্ত আলোকে বিহার কর্‌বে, তা নয়। দেহত্যাগের পরই, আত্মা

ছায়ার মত অস্পষ্ট কি-জানি-কেমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে, নিজের অজ্ঞতা দুর্ব্বলতা অনুভব ক'রে লজ্জিত ও ব্যথিত হয়। এই অবস্থার পর, একটু অগ্রসর হ'লে, ছায়ার মত অস্পষ্ট ভাব ক্রমশঃ কমিতে থাকে, একটু আলো দেখতে পায়, একটু জ্ঞান লাভ করে। এমনি ক'রে ধীরে ধীরে উন্নততর স্তরের দিকে যায়। অপর পক্ষে, এ জীবনে যে ব্যক্তি সাধু ও জ্ঞানী, সে দেহত্যাগ ক'রেই আলোকময় আনন্দময় স্তরে প্রবেশ করে। মানুষ রাজাই হোক, আর পরিবই হোক, সঙ্গে সঙ্গে অসার ও বাহ্যিক জাঁক জমক, পদমর্য্যাদা হ'তে সে বঞ্চিত হয়;—ঠিক সে যা কেবল মাত্র তাই থাকে,—ঢাকবার কিছু থাকে না। এ জগতে যিনি নম্র, প্রেমিক, সেবাপরায়ণ, তিনি (যতই দরিদ্র হউন না কেন) পরলোকে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সঙ্গে উচ্চ আসন পাবেন। আবার, এ জগতের মহারাজ চক্রবর্ত্তী যদি স্বার্থপর অপ্রেমিক হয়, সে পরলোকে কোন অন্ধকার গহ্বরে যাবে, কারণ আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে সে পথের ভিখারী। (ক্রমশঃ)

মাকাল

ফাল্গুন মাস। প্রজাপতির রাজ্যে মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। প্রেসগুলি অনবরত প্রীতি-উপহার ছাপিতে ছাপিতে হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তকালয়গুলিতে স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থ প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম; এবং সহরের কলেজগুলিতে প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পর-হাজিরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, কারণ ঐ দুইটি শ্রেণীর প্রতিই প্রজাপতি মহাশয়ের অনুকম্পা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এহেন সময়ে একটি ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে ক্রমান্বয়ে তিনটি ছেলের প্রতি প্রজাপতি মহাশয়ের ডাক পড়িল। প্রত্যেকবারই মেসের ছেলে-মহলে ভারি একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়—কেহ প্রেসে যায় প্রীতি-উপহার ছাপিতে, কেহ যায় বই কিনিতে, আর কেহ বা বরের সঙ্গে যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় গুছাইতে আরম্ভ করে। যাহারা তখনো প্রজাপতির অনুগ্রহপ্রার্থী তাহারা বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কাহার যে কখন ডাক পড়ে ঠিক নাই; কারণ ডাক পড়িবার সম্ভাবনা অনেকেই মনে মনে আশা বা আশঙ্কা করিত।

এমন সময় মেসের যতীনের নামে এক টেলিগ্রাম আসিল,—তাহাকে অবিলম্বে বাড়ী যাইতে হইবে। কেন যাইতে হইবে তাহা কিন্তু লেখা নাই। যতীন টেলিগ্রাম পড়িতে না পড়িতেই ছেলেরা "যতীনের বিয়ে, যতীনের বিয়ে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এখন যতীন বেচারি বিবাহের কোন সংবাদই পূর্ব্বে পায় নাই। বড়দিনের ছুটিতে সে একবার বাড়ীতে শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধের কথা চলিতেছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে যে সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে, তাহাকে এ পর্য্যন্ত তাহা জানানও হয় নাই। এজন্য বাড়ীর উপর সে একটু বিরক্ত হইল; অন্ততঃ বৌদিরও তাহাকে এ সংবাদটা পূর্ব্বে দেওয়া উচিত ছিল! কিন্তু সে বিরক্তির ভাব ক্ষণিকের জন্য; আর বৌদি যে জানায় নাই, তাহার কারণ সে ভাবিল, বোধ হয় তাহাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য করিয়া দিবার জন্য। তখন সে মনে করিল, বৌদিকে এই জন্য বেশ একটু "আক্কেল" দিতে হইবে।

এতক্ষণ যে যতীনের হাস্য-পরিহাসে ছাত্রাবাসের গৃহগুলি বিকম্পিত হইতেছিল, হঠাৎ সে এই টেলিগ্রাম পাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ব্যক্তির চেয়েও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া সতীর্থ নীরদচন্দ্র বলিল, "কি হে ভায়া, একবারে যে পেচক হয়ে বস্‌লে! শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওরকম ভাবে থাকলে দেখতে পাচ্ছি তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি অক্ষত রেখে ফিরে আসা দায় হবে!" আশু বলিল, "এত বড় খবরটা তুমি এতদিন আমাদের কাছে কি করে লুকিয়ে রাখ্‌লে হে? ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দাওনি? কেউ তো আর ভাগ বসাতে যাচ্ছে না!" এই ভাবে সকলে আসিয়া যতীনকে ঘিরিয়া হৈ চৈ করিতে লাগিল।

তখন রোহিণী বলিল, "এখন এ সব রাখ। ও না হয় আমাদের সাথে নেহাৎ 'পরের' মত ব্যবহার করেছে, তাই বলে তো আর আমরা ওরকম কর্‌তে পারি না। যতীনের বিয়ে, কিছু দিতে টিতে তো হবে। তোমরা কেউ বাজারে যাও।" এই বলিয়া পকেট হইতে একটা পাঁচ টাকার নোট সম্মুখে ফেলিয়া দিল, কারণ সে মাসে তাহার শ্বশুর তাহাকে পাঁচ টাকা বেশি পাঠাইয়াছিলেন। তারপর বলিল, "দাও দেখি কে কি দিবে, অন্ততঃ কুড়ি টাকার জিনিষ দেওয়া চাই;—তাড়াতাড়ি কেউ একটা লিষ্ট করে ফেল কি কি জিনিষ দিতে হবে।- ভাল কথা, একটা প্রীতি-উপহার তো ছাপতে হবে,—সুরেশ চট্ করে একটা লিখে ফেল তো।"

যতীন এতক্ষণ এ সকল কোন কথার ভিতরই ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, তিন দিন পর বাইশে তারিখ একটা ভাল দিন আছে,—সে দিন অনেকেরই বিবাহ। বোধ হয় সেই দিনই তাহার বিবাহ হইবে। কাজেই আজ রাত্রেই তাহাকে রওনা হইতে হইবে।

এমন সময় রোহিণীর কথা শুনিয়া সুরেশ বলিল, "আচ্ছা, তা এখনি লিখে দিচ্ছি। ভাল কথা, মেয়ের নামটা তো দরকার হবে,—কিরে যতীন, তোর বউর নাম কি?"

যতীন বলিল, "কি জানি ভাই, নাম তো জানি না।"

ইহা শুনিয়া আশু একবারে যতীনের কান টানিয়া বলিল, "নাম জানিস না কিরে হাঁকা! বল তোর বউর নাম মৃত্যুকালী না মোক্ষদাসুন্দরী?"

যতীন বলিল, "কান ছাড়, বড় লাগে। সত্যি ভাই নাম ধাম কিছু জানি না। আমাকে আগে কিছু জানায় নাই। তাদের বিশ্বাস সেই আমাকে যেতে লিখ্‌বেন আর অমনি আমি সুশীল বালকটির মত গিয়ে বিয়ে করে আস্‌ব! আর কি আশ্চর্য্য দেখ ভাই, বৌদি পর্য্যন্ত আমাকে কিছু লেখে নাই। বিয়ের পর এর শোধটা তুল্‌তে হবে।"

আশু হাসিয়া বলিল, "তবু যা' হোক শোধ তুল্‌বে তুমি বিয়ের পর। বিয়ের আগে কিন্তু শোধ তুল্‌তে যেয়ো না, তা'হলে সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা তরুণীটি রাগ কর্‌বেন! সে যাক্, আমি কিন্তু তোর সঙ্গে যাচ্ছি। তোর বউকে স্বচক্ষে না দেখে ছাড়্‌ছি নে। নিবি কিনা বল?"

যতীন বলিল, "নেব না কি রে! তুই গেলে সে আমরা দুজন হয়ে যাব। তোকে যেতেই হবে।"

যত নের অনুরোধে আরো অনেকেরই যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কলেজের 'পারসেন্‌টেজের' ভয়ে কেহ যাইতে চাহিল না। ঠিক হইল শুধু আশুই যাইবে; আজ রাত্রের গাড়ীতেই তাহারা রওনা হইবে।

একরাশ ভাব ও চিন্তাভারাক্রান্ত মন লইয়া যতীন আশুকে সাথে করিয়া রাত্রে মেস হইতে রওনা হইল।

(২)

সারাটা রাত্রি তাহাদিগকে ট্রেনেই কাটাইতে হইবে; পরদিন বেলা আটটায় যতীনদের গ্রামের ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছিবে। তাহারা গাড়ীতে উঠিয়াই কম্বল পাতিয়া দুইটি বেঞ্চ দখল করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিল।

আশু এতক্ষণ কিছুতেই যতীনের সহিত আলাপ জুড়িয়া তুলিতে পারিতেছিল না। আশুর বোধ হইল যেন যতীন এ রাজ্যে নাই। সে বলিল, "যতীন, অত ভাবছ কি হে তুমি? বিয়ে করবে, এর ভিতর অত ভাবনাই কি আছে আর এত কল্পনাই বা কি আছে? আমি ওসব বুঝতে পারি না। কল্পনা টল্পনা একবারে রেখে দিয়ে এস একটু গল্প করে সময়টা কাটানো যাক্।"

যতীন বলিল, "বুঝবে হে ভায়া, বুঝবে, এ মুহূর্ত্ত যখন তোমার আসবে তখন বুঝতে পারবে কত ভাব, কত আশা, কত ভয় এসে মনকে কোলপাড় করতে থাকে।"

যতীন চিরকালই একটু ভাবপ্রবণ। আশুর এ সব ভাল লাগিত না। অত ভাব বা কল্পনার ধার সে কোনো দিন ধারে নাই। সে ভাবিল, এই ভাব ও কল্পনা নিয়ে যতীন বড় বাড়াবাড়ি করে, তাকে একটু জ্বালাইতে হইবে, তার মুখে কথা ফুটাইতে হইবে।

আশু গম্ভীরভাবে বলিল, "যতীন, তোমার বিয়েটা

তারি সুসময়ে হচ্ছে—নব বসন্ত এসে সমস্ত পৃথিবী জাগিয়ে তুলচে, বকুলের আধার বনে কোকিল তার প্রেম জাগানো স্বরে বিশ্বের প্রাণ সঞ্চার করচে. বিশ্বময় যেন একটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা ছুটে বেড়াচ্ছে। এই তো বিয়ের প্রকৃত সময়। দুইটি পিপাসিত আত্মার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিলনের এই তো মাহেন্দ্র যোগ! প্রাণ স্বতঃই এ সময় একটি অন্তরের সঙ্গী পেতে চায়. কেমন. তাই না?

আশু এবার যতীনের মনের ঠিক স্থানটাতে আঘাত করিয়াছিল। তাই এখন তাহার বাক্যাবলী উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিল। সে বলিল, "ভাবতে গেলেই ওসব ভাবনা আসে। ওসব না ভাবাই ঠিক। এতদিন কোনো অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু এখন যেন মনটা খালি খালি বোধ হচ্ছে. কাহার সোণার কাঠির পরশ যেন আমার সুপ্ত আত্মাকে শত চেতনায় জাগিয়ে তুলচে। মন আমার অধীর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেইখানে যেখানে,—

...এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে!'...

তুমি হয় তো হাসবে। কিন্তু ভাই সত্যি বলতে কি, কত কল্পনা, কত ভাব যে আমার হৃদয়ে খেলে বেড়াচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই।"

আশু বলিল, "তোমার এখনি যে ভাব দেখছি, তুমি নিশ্চয় বউ-পাগলা হবে।"

যতীন বলিল, "তা' কক্ষনো নয়। কিন্তু ভাই বড় ভয় হচ্ছে, যদি আশার মনোমত না হয়। তা হলে যে জীবনটা আমার ছাই হয়ে যাবে।"

আশু বলিল, "তা হবে কেন? নিশ্চয়ই কল্পনার মত অপরূপ একটি তরুণী তার অসীম হৃদয়-সম্পদ নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় তাহারা কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিল। তারপর আশু ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু নিদ্রাদেবী সেদিন যতীনের মানসী-দেবীটিকে সরাইয়া তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারিয়াছিল কি না তাহা অনাদি কালের জাগ্রত প্রহরী ভিন্ন কাহারো বলিবার সাধ্য নাই।

(৩)

পরদিন বেলা আটটার সময় তাহারা যতীনদের বাড়ীর ষ্টেশনে নামিল। যতীন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে তাহাকে নিবার জন্য ষ্টেশনে কেহ আসে নাই। যাহা হউক, দুই জনে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। যতই বাড়ীর কাছে আসিতে লাগিল ততই যতীনের ভাবান্তর হইতে লাগিল।

তাহারা যখন বাহির-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন উভয়েই বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, এ বাড়ী তো বিবাহবাড়ীর মত মনে হইতেছে না! আশু জিজ্ঞাসা করিল "যতীন, তোমার বিয়ে তো ঠিক? টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল?"

যতীনের বুকটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল; বলিল, "আঁা তাই তো, টেলিগ্রামে তো তেমন কিছু লেখা ছিল না! ভয়ানক ভুল বুঝেছি তো তা' হলে!"

এমন সময় যতীনের পাঁচ বৎসরের ভাতুষ্পুত্র নীরু নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া হাজির হইল। যতীন আশুকে লইয়া বৈঠকখানার ঘরে গিয়া উঠিল। যতীন ভাবিল, ঠিক খবরটা লইয়া তবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে। সে নীরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে কবে রে?"

নীরু বলিল, "ও-বাড়ীর ফেলিদির বিয়ে রবিবার দিন হয়ে গেছে।"

তখন আশু জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কাকার বিয়ে কবে রে?"

"কাকাবাবুর বিয়ে! তা' তো জানি না। মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি?" এই বলিয়া বালক এক দৌড়ে গিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। যতীন পিছন হইতে কত ডাকিল কিন্তু কা'র ডাক কে শোনে?

যতীন বলিল. "আশু, সর্ব্বনাশ করেছ! আমরা যে কি ভুল বুঝেছি তা এখনি বের হয়ে পড়বে; লজ্জায় একবারে মাথা কাটা যাবার জোগাড় হয়েছে! হতাশার উপর লজ্জা! সেটা সহ্য করা বড় কঠিন! যাই একবার বাড়ীর ভিতর, ব্যাপারটা কি বুঝে আসি।"

যতীন মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমাকে আসতে তার করেছ কেন!"

মা বলিলেন, "পরশু এক খুব বড় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসেছিলেন। অনেকের অনেক কথা বল্লেন, সব কথাই প্রায় সত্য বল্লেন। তোর সম্বন্ধে বল্লেন যে তোর নাকি একটা ভারি বিপদের সম্ভাবনা আছে। একটা লোহার মাদুলী দিয়ে গেছেন; কাল পূর্ণিমা, কতকগুলি অনুষ্ঠান করে কাল সেটা তোকে ধারণ করে এক বছরকাল রাখতে হবে। এই জন্যেই তোকে তার করে আনান হয়েছে।"

শুনিয়া যতীনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোথায় সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল একটী জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ-মধুর তরুণীর পাণিগ্রহণ করিবে, আর কিনা সেখানে তাহাকে একটি লোহার মাদুলী ধারণ করিতে হইবে! ঘটনাচক্রের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

আশু আর যতীন ঠিক করিল, তাহারা যে এরূপভাবে নিজেদের নির্লজ্জতায় ঠকিয়াছে তাহা মেসে গিয়া প্রকাশ করা হইবে না। কাজেই সেখানে কয়েকদিন তাহাদিগকে কাটাইয়া যাইতে হইবে।

যতীন কিছুতেই তাহার সরল স্বচ্ছন্দ ভাব ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। সে যেন একটু লাজুক হইয়া গিয়াছে; সকলের সঙ্গে পূর্ব্বের মত মিলিয়া মিশিয়া চলা তাহার পক্ষে যেন বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদাই তাহার মনে ভয় ছিল যে সে যে এরূপভাবে ঠকিয়াছে, এই বুঝি বাড়ীর লোকে তাহা জানিতে পারিল।

তাহার এই ছাড়া-ছাড়া ভাব সকলের চক্ষু এড়াইলেও বৌদির চক্ষু এড়াইতে পারিল না। নীরব প্রশ্নে ও যতীনের ভাব-গতিকে বৌদি-ঠাকুরাণী তাহার সঙ্গীন অবস্থাটি পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারিলেন। বেচারা ঠাকুরপো যে বিবাহ করিতে আসিয়া এমন জব্দ হইয়াছে, ইহাতে স্নেহবতী বৌদিদিটি ব্যথিত হইলেন।

একদিন তিনি যতীনকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, তুমি এমন হয়ে গেছ কেন? তোমার জন্যে ভারি কষ্ট হয়। এমনও কারো হয়? তুমি মেসে গিয়ে মুখ দেখাবে কি করে?"

যতীনের নাকমুখ লাল হইয়া উঠিল। সে আগে হইতেই ভয় করিয়াছিল, বৌদির কাছে ধরা পড়িতে হইবে। তাড়াতাড়ি বলিল, "নীরু বলেছে বুঝি তোমাকে? আচ্ছা যে ওটা চাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিল তা আর বুঝতে পারলে না?"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, "কার কাছে লুকাও? এখনো এসব বুঝবার বয়স আমার যায়নি ঠাকুরপো!"

যতীন দেখিল বড় বেগতিক। তখন কাতরস্বরে বলিল, "যা, ঠকেছি বৌদি, আর কারু কাছে বোলো না, তা হলে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

বৌদি বলিলেন, "ভয় নাই, আমি কারুকাছে বলব না। এবার যাও, বৈশাখমাসে যেরূপেই হউক তোমার বিয়ে দেওয়াব।"

৬

যখন ইচ্ছা করিয়া পর পর দুইদিন ট্রেণ ফেল করিয়াও যতীন্দ্র দেখিল যে মিছামিছি আর বাড়ীতে থাকা ভাল দেখায় না তখন দুই বন্ধুতে আবার মেসে ফিরিয়া আসিল।

মেসে আসিতেই চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই প্রশ্ন, বউ কেমন? যতীন কোনো কথারই উত্তর দিতেছিল না। আশু বলিল, "একবারে পরী আর কি! Cynosure of neighbouring eye"

তারপর বউর নামের জন্য তাগিদ পড়িল। আশুর যাহা মনে আসিল তাহাই একটা বলিয়া দিল—কনকপ্রভা! তখন একজন ব্যঙ্গস্বরে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল,—

"কনকপ্রভা নয়নলোভা বুকজুড়ান ধন,
যতীন হেরে রাখতে নারে মনের উচাটন!"

যাহা হউক কোনো প্রকারে এই পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। যতীনও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু পরদিনই ঘোর বিপদ। স্নান করিবার সময় যখন সে রান্নাঘরের পাশে দাঁড়াইয়া তৈল মর্দ্দন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল তখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িল তাহার হস্তস্থিত বৃহৎ লোহ মাদুলিটির উপর! যতীনের মুখখানা শুকাইয়া যেন চোঙ্গা হইয়া গেল! ইহাতে সকলেরই কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু যতীন কিছুতেই মাদুলী সম্বন্ধে কোনো

কথা বলিবে না। তখন তাহারা আশুকে ধরিল। অগত্যা আশুকে সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল।

তখন সেখানে এক বিপুল হাসির রোল উঠিল। কয়েক মিনিট পর যখন তাহা থামিল তখন যতীন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইহার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত যতীনকে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা এই বলিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিত,—

কনকপ্রভ নয়নশোভা বুকফুলানো ধন,
যতীনবাবু হলেন কাবু বুঝাই আকিঞ্চন!

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

চয়ন

১৩২১ সনে বাংলা সাহিত্য

আলোচ্য বর্ষে ফাল্গুন হইতে মাঘ পর্য্যন্ত অন্যূন ১১২২ খানি নূতন বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ১৪৪২; তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৯২। এগুলির সংখ্যা আমরা ধরি নাই। উল্লিখিত ১১২২ খানি পুস্তকের মধ্যে,—

বিশুদ্ধ বাঙ্গলায়—	৮১২
মুসলমানী বাঙ্গলায়—	১৬
বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে—	৮৭
বাঙ্গলা ও উড়িয়ায়—	২
আরবি ও মুসলমানি বাঙ্গলায়—	৪
বাঙ্গলা ও ইংরাজিতে—	১৬৭
পারসী ও মুসলমানী বাঙ্গলায়—	৫
বাঙ্গলা, ইংরেজি ও হিন্দীতে—	২
বাঙ্গলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতে—	২২
বাঙ্গলা, পালি ও সংস্কৃতে—	৩
বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতে—	২

মোট—১১২২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা, বাঙ্গলা ও হালিতে প্রকাশিত ১০১৬ খানি পুস্তকের বিষয়-ভেদে শ্রেণী-বিভাগ করিলে দেখা যায়:—

আলোচ্যবর্ষে,—

কথা-বিষয়ে—	১১
জীবন-বৃত্তান্তে—	৩৮
নাটকাদিতে—	৮৭
উপন্যাসে—	৬৮
ইতিহাস-ভূগোলে—	৪৫
সাহিত্যে—	২২৫
আইনে—	১১
চিকিৎসায়—	৪০
দর্শনে—	৪
কাব্য ও কবিতায়—	১০২
ধর্ম্মবিষয়ে—	১০৮
ভ্রমণে—	১৮
বিজ্ঞান বিষয়ে—	১০২
বিবিধ বিষয়ে—	৮০

মোট ১০১৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণের রীত্যনুসারে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-পুস্তিকাগুলি তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের ৪৫ খানির মধ্যে—	২২	খানি
সাহিত্যের ২২৫ খানির মধ্যে—	১৮১	"
কাব্য ও কবিতার ১০২ খানির মধ্যে—	২৮	"
বিজ্ঞান বিষয়ক ১০২ খানির মধ্যে—	৮২	"
বিবিধ বিষয়ক ৮০ " "—	২৫	"

এই মোট ৩৪৮ খানি পুস্তক স্কুল-পাঠ্য।

সেকালে "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" নাম দিয়া যে ধরণে দেশ-ভ্রমণকাহিনী কোনও কৌতুকী লেখক লিখিয়া গিয়াছিলেন—তদপেক্ষা সুন্দর উপায়ে এক নূতন প্রণালীতে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, অধ্যক্ষ রায়েন্দ্র

সুন্দর ত্রিবেণীর স্মৃতিভাণ্ডার আলোড়ন করিয়া কত অপূর্ব্ব কথা "বিচিত্র প্রসঙ্গ" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ এরূপ প্রণালীতে প্রকাশ বাঙ্গলা ভাষায় এই নূতন। বিষয়-গৌরবে ও নূতনত্বে এখানি বাঙ্গলা ভাষার গৌরব বাড়াইবে।

ইতিহাস বিভাগে এবার একখানি অতি সুন্দর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গলায় দেখিতে দেখিতে অনেক জেলারই ইতিহাস বাহির হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার যতগুলি প্রাদেশিক ইতিহাস বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে "খুলনা ও যশোহরের ইতিহাস" শীর্ষস্থান অধিকার করিবার উপযোগী, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কাহিনী হিসাবে এ বৎসর আর একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ এ বিভাগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিশ্রমলব্ধ ঐতিহাসিক মালমশলাগুলি অতি সুন্দর-ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁহার কাহিনীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এরূপ নীরস বিষয় লইয়া ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কাহিনী লেখেন নাই। এই গ্রন্থে প্রতিভাস্পর্শে কৃতি-হস্তের নিপুণ রেখার নিদর্শন রহিয়াছে। উপন্যাস ও গল্প বিভাগের মধ্যে "বিন্দুর ছেলে" সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বহুদিন বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এ খানিকে প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস বা ছোট গল্প বলিতে পারা যায় না।

নাটক-বিভাগে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আহেরিয়া ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু-লিখিত "ক্লিওপেট্রা" অতীব সুন্দর হইয়াছে। অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "গীতগোবিন্দ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা-পুস্তকের মধ্যে অষ্টোত্তর-শত কবিতা-বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথের "গীতালী" কাব্য-বিভাগের শিরোমণি। (মানসী)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

পৌরাণিকী কথা

বিশ্বব্যাপী আত্মার এবং দেহব্যাপী আত্মার মিলন-চেষ্টা হইতেই উপাসনার উৎপত্তি। একা আমি থাকিতে পারি না, আমার একটা অবলম্বন চাই, তাই বাহিরের তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই। এই অনুসন্ধানই উপাসনা। • • •

আমাদের বাঙ্গলা দেশে আজকাল যেমন মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়, পূর্ব্বে এমন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু ঘরের পূজা করিতেন, ঘরের উপর হোম করিতেন এবং মন্ত্র জপ করিতেন। রাজা গণেশ রায়ের সময় (১৪শ শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালায় আধুনিক প্রথামত দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে কালী গড়াইয়া পূজা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দই (১৬শ শতাব্দী) চালাইয়া গিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। সরস্বতী পূজা কখনই মাটির প্রতিমা গড়াইয়া হইত না; গ্রন্থের পূজা হইত এবং দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া হোম হইত। প্রতিমা গড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ হয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে এমন ভাবে মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না। মহারাষ্ট্রদেশে গণপতি উৎসবে গণেশের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয় বটে, কিন্তু সে মূর্ত্তি-গঠন উৎসবের অঙ্গ বিশেষ, উপাসনার আলম্বন রূপে গ্রাহ্য নহে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে ঘটস্থাপনা করিয়া, মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া হোমযাগাদি যথারীতি হয়, প্রতিমা পূজা হয় না। তবে প্রতিষ্ঠিত দেবতার মন্দিরে যাইয়া পূজার ব্যবস্থা আছে বটে। সে-সকল মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া যন্ত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহারই উপর সোনারূপার মূর্ত্তি গড়াইয়া আরোপ করা হয় মাত্র। কাশীর অন্নপূর্ণা আমাদের তন্ত্রোক্ত অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি নহে, এক খণ্ড পাথরের উপর সোনার মুখ বসান মাত্র। কাশীর অনেক মন্দিরে পুরাতন সূর্য্যমূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি, আধুনিক দেবতার আকার ধারণ করিয়া পূজিত হইতেছেন। কোথাও ধ্যানী বুদ্ধকে শিব সাজাইয়া পূজা চলিতেছে।

বাঙ্গালায় যেমন ঘরে ঘরে মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয়, পূজান্তে তাহার বিসর্জ্জন হয়, এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই, পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না। দশম কি একাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই পদ্ধতির ধীরে ধীরে প্রচলন হইয়াছে। • • •

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, পুরাণ বেদব্যাসের রচিত। অথচ বচন আছে—"ব্যাসাদি মুনিভিঃ রচিতং" —কোন্ ব্যাস যে তাহারও নির্দ্দেশ নাই। • • বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে দেখিয়াছি ৺ বীর নৃসিংহ শাস্ত্রী পুঁথির বচন পড়িতে না পারিলেই স্বয়ং সেই স্থানে দুইটা বা দশটা অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোক রচিয়া দিতেন। আগে বটতলার প্রকাশকগণের অধীনে অনেক কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন,যাঁহারা আদেশমত পুরাণ রচিয়া দিতে পারিতেন। কাশীতে ডাক্তার ব্যালেণ্টাইনকে একখানা গোটা ভবিষ্যপুরাণ নূতন করিয়া রচিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাশ্মীরেও এইভাবে দুই একখানা উপপুরাণ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। (নারায়ণ)

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেবা-আদর্শ

সেবাধর্ম্ম নূতন নহে। ভিন্ন ভিন্ন আকারে এই ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। প্রেমের প্রকাশ যেমন কখনো ভক্তিতে, কখনো সৌজন্যে, কখনো বা করুণায়, প্রেমাত্মক সেবারও প্রকাশ তেমনি তিনটি ক্ষেত্রে। পিতা মাতা গুরু প্রভৃতির সেবায় ভক্তির, বন্ধুবান্ধব বা জনসমাজের সেবায় সৌজন্যের, আর আর্ত্ত অনাথ অপোগণ্ডের সেবায় করুণার চরিতার্থতা। মানুষ যেমন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের, তেমনই সমাজপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়াও এই চরিতার্থতা খুঁজিয়াছে। যেমন জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব, তেমনই জরথুস্ত্রীয় ইহুদী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দেখিতে পাই দরিদ্রের ভরণপোষণ, রোগীর শুশ্রূষা, অনাথ ও বিধবার পরিরক্ষণ, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, পতিত পাপীতাপীর উদ্ধার-এ সকলই ধর্ম্মের সাধন বা মুক্তিপথের সোপান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। • • •

কি ধর্ম্মসাধনের কি সামাজিক জীবনের দিক দিয়াই দেখি না কেন এই লোকহিতচেষ্টা বিনা কোন সমাজই টিকিতে পারে নাই। সামাজিক জীবনধারা ও তাহার অভিব্যক্তিতে (social evolution) এই পরার্থপ্রবণতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল গঠনীশক্তি। এই শক্তির হ্রাস যেখানে হইয়াছে সেইখানেই সমাজ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। বুদ্ধি তাহা ঠেকাইতে পারে নাই। • • •

জীবনীশক্তি একটা সৃজনীশক্তি,—আত্মশক্তির উদ্বোধন না হইলে জীবন পাওয়া যায় না। সুতরাং সেবার উদ্দেশ্য এমন নয় যে বাহির হইতে অভাব পূরণ করিয়া দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা। কিন্তু প্রত্যেক মানবে—আর্ত্ত পতিত-দুঃস্থ সকলের মধ্যেই —জীবনীশক্তি ইচ্ছাশক্তি জাগানই সেবার একমাত্র লক্ষ্য। জীবনে অধিকার (right to live), সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার (right to happiness),নিজের শক্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তিতে ও ব্যবহারে নিজের ভাগ্যবিধান করিবার অধিকার,—সমাজের কাছে, বিধাতার রাজ্যে, আমার কেবল দেনা নয়, আমার পাওনাও আছে এইরূপ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ—এ গুলি না জাগিলে কাহারো কল্যাণ হয় না। সেবককে শক্তিসাধনের অনুকূল করিতে হইবে। সুতরাং অক্ষমকে সক্ষম করিয়া তোলা, নাবালককে যাহাতে সাবালক হইয়া উঠে ও আত্মরক্ষণের উপযোগী শক্তি আহরণ করে সেইরূপ বিধান করাই আমাদের এ যুগের সেবার শিক্ষা হইবে। বিশেষতঃ ইহা বুঝিতে হইবে যে যতদূর সম্ভব দুঃখদারিদ্র্যের বীজ উন্মূলিত করাই দুঃখদারিদ্র্য লাঘব করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কেবল জীবনসংগ্রামে আহত ব্যক্তির সেবা করা, সমাজের সংগ্রামক্ষেত্রে লাল ক্রুশ (Red Cross) আর্ত্তসেবার চিহ্ন বহন করা ও হত আহত ব্যক্তিদের গতি করাই প্রকৃষ্ট সেবাধর্ম্ম নহে। এ কথা বলিলে চলিবে না যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে থাকুক ; তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, এস আমরা কেবল আহত ব্যক্তিদের সেবা করি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই যে কতকাল ধরিয়া মানবসমাজে কুরুক্ষেত্র চলিতেছে ইহার উপশম চাই। শত্রুসেনা অসংখ্য,—কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো ব্যক্ত। ব্যাকটিরিয়া, অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অজ্ঞান,

ব্রাহ্মণত্ব, কুসংস্কার, কদাচার, কুপ্রথা পাপের সামাজিক বা দৈহিক বীজ (criminal taint) রোগদুষ্ট বংশবীজ (hereditary taint),—এই সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইবে। হত্যাক্ষেত্রে নয় এই যুদ্ধক্ষেত্রেই শক্তি বাহীর্য্য আহরণ করিতে হইবে।

কিন্তু এই সেবার প্রাণশক্তি এখানে নয়। ইহার অন্তরালে যে মানুষের আত্মশক্তি আছে, তাহাতেই। প্রেমই সেই আত্মশক্তি,—মানুষে মানুষে যে প্রেম, কোনো অলৌকিক প্রেম নয়। মানুষকে প্রথম মানুষ বলিয়া প্রেম করিতে হইবে। ভগবৎসন্তান বলিয়া নয়, ভগবানের অবতার বলিয়াও নয়। সে-সকল পরে আসিবে। আধুনিক সমাজধর্ম্মের প্রস্থান (starting point) এই মানবপ্রেমে। আর-এক জনের যে আত্ম-সম্পদ, আত্মাধিকার আছে, সেই অধিকারে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই নূতন মানব-ধর্ম্ম। আর এই মানব-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র তিনটিঃ—(১) অপূর্ণকে পূর্ণতর করিতে গিয়াই পূর্ণতা পাওয়া যায়; ইহাই আত্মার পূর্ণতাসাধন (universal in the personal life); (২) পূর্ণতরের আত্মোৎসর্গ ব্যতীত অপূর্ণের জীবন মিলে না। (৩) সর্ব্ব-মুক্তি বিনা কাহারো মুক্তি নাই, অপরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে আমিও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব না।

(প্রবাসী)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

হিতসাধন

মনদৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি॥

এখানে ভাগবতের ঋষি শিক্ষা দিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীব, সে যতই পাপী যতই তাপী যতই হীন যতই দীন যতই মলিন হউক না কেন—তাহাকে যেন আমরা বহু-মান সহকারে পূজা করি, কারণ তাহার মধ্যে ভগবান্ জীবভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। খৃষ্টীয় সাধু সেণ্টপলের নিকটও আমরা ঐ শিক্ষাই পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন —Know ye not that ye are the tabernacles of God and that the Most High dwelleth in thee অতএব প্রত্যেক জীব ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি আমরা সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এই ভাবে ভাবিত হইয়া যদি আমরা জনসেবায় প্রবৃত্ত হই, তবেই আমাদের সেবা সার্থক হইবে। দরিদ্রকে আমরা যে সেবা দান করিব, তাহা যেন শ্রদ্ধার সহিত দান করি, তবেই সে সেবাদান সফল হইবে নতুবা নহে। (প্রবাসী)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলফ্রেড ক্রুপ

ইংলণ্ডের শেফিল্ড নগর উৎকৃষ্ট লৌহ শিল্পের জন্য বহু-দিন হইতে জগতে প্রসিদ্ধ। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ফ্রেড্রিক ক্রুপ নামক জনৈক জার্ম্মাণের মনে এই শেফিল্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার বাসনা জাগিল। সহজেই যদি সকলের মনস্কামনা সফল হইত তবে আর ভাবনা কি ছিল? চারিবর্ষ পরে ক্রুপ সাহেব হিসাব খতাইয়া দেখিলেন, লৌহ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়ে অবস্থোন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য ও সঞ্চিত অর্থ হারাইতে বসিয়াছেন। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সপরিবারে তিনি একটি একতল কুটীরে উঠিয়া আসিলেন কিন্তু নানা বিষয়ে সাবধানতা ও মিতব্যয়িতা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নূতন গৃহে উঠিয়া আসিবার চারিবর্ষ পরেই একদিন চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক পুত্র আলফ্রেড ক্রুপের স্কন্ধে সংসারের গুরুভার চাপাইয়া এবং জননী ও ছোট ভাই গুলিকে দেখিতে বলিয়া তিনি অন্তিম শয্যায় উঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সম্পত্তির মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কারখানা ও চারিজন মাত্র কারিকর।

আলফ্রেড ক্রুপের জননী একজন অসামান্যা রমণী ছিলেন। ইহারই গুণে নাবালক পুত্র ধীগুণ হইতে পেরেছিল। বিবাহ করিলে পাছে মায়ের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে হয় এই ভয়ে আলফ্রেড ক্রুপ, মাতা যতদিন

জীবিত ছিলেন, বিবাহ করেন নাই। মায়ে পোয়ে মিলিয়া ২১ বৎসর কারখানাটি চালাইয়াছিলেন। • • •

আলফ্রেড্ ক্রুপ্ চাষচের উপর ঢালার পিস্টি লাগাইবার এক পেটেণ্ট বাহির করেন; ইংরাজ কারদাগীর নিকট উহা বিক্রয় করিয়াই তিনি উহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলেন। ইহাই হইল উন্নতির সূত্রপাত। চাষচ পিস্টি করিবার পেটেণ্ট বেচিয়া যে অর্থলাভ হইল, লোহার কারখানাটির উন্নতি সাধন জন্য তাহা ব্যয়িত হইল।

কিছুকাল পরে রেলগাড়ীর জন্য উন্নত প্রণালীতে উৎকৃষ্ট চাকা নির্ম্মাণের কৌশল আবিষ্কার করিয়া ক্রুপ অল্পকাল মধ্যে প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিলেন। নানাদিকে যেমন আয় বাড়িতে লাগিল লোহার কারখানাটিরও তেমনি উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন জন্য তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। উৎকৃষ্ট ইস্পাত সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল; ক্রমে তিনি কামান ঢালাই করিতে মন দিলেন। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণে বা সহায়তা লাভে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে ফ্রান্স দেশের পারিস সহরে একটা প্রদর্শনী বসিয়াছিল। নানাদেশ হইতে নানা লোক, তাহাতে নানা জিনিস পাঠাইয়াছিলেন। আলফ্রেড্ ক্রুপ্ও তাঁহার নবাবিষ্কৃত কামানের দু একটি নমুনা উহাতে পাঠাইয়া দেন। আর একটু হইলেই জার্ম্মাণীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্যের দেশে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু জার্ম্মাণীরই আর একটি সুসন্তানের গুণে উহা ঘটিতে পাইল না। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিল সাধারণ শ্রমজীবীর ন্যায় কর্কশ ও বৃহৎ করতল বিশিষ্ট কে একজন বিদেশী লোক প্রদর্শনী ক্ষেত্রে কত মনোমুগ্ধকর ভাল ভাল জিনিষ থাকিলেও, কোন এক অজানা কারিকরের অজানা কারখানা হইতে প্রেরিত কতকগুলি নূতন কামানের নমুনা, দিনরাত নির্নিমেষচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করছে। বলোম্মত্ত সৌভাগ্যগর্ব্বিত ফরাসী জাতি তখন কি জানিত ঐ কারখানার মালিক ক্রুপ সাহেব—স্বজাতির নিকট আশানুরূপ সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়ে তাহারই দ্বারে ভিক্ষার্থীর ভাবে সমাগত—আর ঐ চাষাড়ে লোকটা জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা বিশ্ববিখ্যাত বিসমার্ক।

দেশে আসিয়াই বিসমার্ক কারখানার মালিকের খোঁজ লইলেন। তাঁহারই প্রযত্নে গবর্ণমেণ্টের সহিত বোঝাপড়া হইয়া গেল। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে প্রুশিয়ান্ গবর্ণমেণ্টের জন্য ৩০০ কামান প্রস্তুত করিয়া দিবার আদেশ আসিল। ১৮৬৬ সালে অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধিল। প্রাচীন য়ুরোপভূমির ত্রাসস্বরূপ তুর্কগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া অষ্ট্রিয়া বহুকাল হইতে য়ুরোপের একটি প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু ক্রুপ কারখানার নবাবিষ্কৃত কামানের জোরে অতি সহজেই পরাজিত হইল। ভাগ্য এইরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; তুর্কবিজয়ী রুশগণও এই সে দিন ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে কত না লাঞ্ছিত হইল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রান্কো প্রুশিয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ফরাসিগণ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সময়ে জার্ম্মান্গণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়াছে, সুতরাং এবারও বিজয়লাভ ধ্রুব ও অতি সহজ জ্ঞান করিয়া মহোৎসাহে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। যুদ্ধকালে কিন্তু সৌভাগ্যগর্ব্বিত ফরাসিগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল তাঁহাদের বাছা বাছা কামানের গোলা অনেক চেষ্টায়ও দূরের জার্ম্মান্ ব্যাটারিগুলাকে স্পর্শ করিতেও সকল সময় সমর্থ হইতেছে না কিন্তু জার্ম্মাণ কামানসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত গোলা অনায়াসে ফরাসি ব্যাটারি অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এই যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী প্রুশিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে যুদ্ধের খরচাস্বরূপ তিন শত কোটি টাকা আদায় করে ছাড়েন। • •

ক্রুপের কারখানা এখনও জগদ্বিখ্যাত। ইহার জন্য একাধিক লৌহ-খনি এবং তিনতিনটা বড় বড় কয়লার খনি ইঁহাদিগকে কিনিয়া লইতে হইয়াছে। কয়লার খরচ, সারা বৎসর প্রত্যহ প্রতি মিনিটে ৪ টন বা একশ মনেরও অধিক। কারিকরে সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। বহুসংখ্যক ষ্টীমার, প্রকাণ্ড ডক্ বা জাহাজ মেরামতি কারখানা, কামান পরীক্ষার জন্য সুবৃহৎ চাঁদমারি-ক্ষেত্র প্রভৃতিরও ইঁহারা মালিক। জগতে এমন রাজ্যই নাই, যেখানে ক্রুপের কামান-

সম্বাদদের সহিত ব্যবহৃত হয় না। এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার কামান কারখানাতে ঢালাই হয়েছে। ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের পরিমাণ হইতে জানা যায় কারখানার বর্ত্তমান বার্ষিক আয় প্রায় পনর কোটি টাকা। কারখানা-টিকে একটি ছোটখাট রাজ্য বলিলেই হয়। চতুর্দ্দশ বিভাগে ইহা বিভক্ত, প্রতি বিভাগে এক একজন কর্ত্তা, সকলের উপর চেয়ারম্যান। ক্রুপ বংশের যিনি উত্তরাধিকারী তিনিই অংশু সকলের মালিক। পীড়িতের ফণ্ড, পেন্‌শন ফণ্ড, জীবন বিমার ফণ্ড, সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আপৎকালে সাহায্য প্রাপ্তির নানা ব্যবস্থা ও সমিতি আছে। কারিকরদের জন্য আদর্শ বাসগৃহাবলি, হাসপাতাল, খানাগার, বিদ্যালয়, লাইব্রেরি প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান আছে। এই সব বিষয়ের জন্য কারখানার আয় হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়।

এতবড় কারখানার মধ্যে ফ্রেডরিক ক্রুপের ক্ষুদ্র কুটিরখানি আজও বিদ্যমান। পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নরূপে ক্রুপবংশীয়গণ ইহার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই, যেমন ছিল সেই ভাবেই রাখিয়া দিয়াছেন। "যতদিন ক্রুপের কারখানা থাকিবে ততদিন ক্রুপবংশীয়-গণ এই কুটির খানি দেখিলে, দুর্দ্দিনে কখন অবসন্ন বা সুখের দিনে অহঙ্কারে আত্মহারা হইবেন না অথবা ক্ষুদ্রকে কখন তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না" পিতৃবৎসল পুত্র আলফ্রেড ক্রুপের ইচ্ছায় ও আদেশে উক্ত লিপি ফলকে ধারণ করিয়া, চারিদিকে নানা ঐশ্বর্য্য বিকাশের মধ্যে কুটিরখানি এখনও পূর্ব্বাবস্থাতেই বর্ত্তমান আছে।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে আলফ্রেড ক্রুপের দেহান্তর ঘটে। অল্পদিন হইল ইঁহার পুত্রও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ক্রুপের কারখানা কিন্তু এখনও বিদ্যমান এবং বর্ত্তমান ক্রুপবংশধরও ইউরোপের একজন প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী ধনকুবের রূপে সর্ব্বত্র পূজিত। (সমাপ্ত)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইউরোপে মহাসংগ্রাম

সার্ভিয়া রাজ্যের খানিকটা অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল। সেই অধীন প্রদেশের একজন লোক অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফর্ডিনাণ্ডকে হত্যা করে। সেই সূত্রে অষ্ট্রিয়া সমস্ত সার্ভিয়ার দণ্ড দিতে চায় এবং উহার জাতিতে যুদ্ধ বাধে। সার্ভিয়া ছোট রাজ্য, সার্ভিয়ানরা আর্য্যজাতির শ্লাব্ শাখা সম্ভূত, রাশিয়ার স্বজাতি। সার্ভিয়া রাশিয়ার শরণাপন্ন হয়; রাশিয়া সার্ভিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। তা দেখে জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়।

গত শতাব্দীতে ইউরোপের বড় বড় রাজাদের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত সন্ধি হয়। তার মধ্যে সব চেয়ে পুরানো সন্ধিটি এই যে, ইউরোপের বড় বড় রাজাগণ ছোট ছোট রাজ্যগুলির স্বাধীনতায় কখনও হাত দিবেন না। এই সন্ধি-পত্রে রাজা বা রাজপ্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করেছিলেন। এই সন্ধি অনুসারে বড় রাজাগণ, ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের কোন অন্যায় আচরণ ব্যতীত তার স্বাধীনতায় হাত দিতে পারেন না।

অন্যান্য সন্ধিগুলির ফলে ইউরোপের বড় বড় রাজ্যগুলি দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়:—

১ম দল—(১) জার্ম্মানী। (২) অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী। (৩) ইটালী।

২য় দল—(১) ইংলণ্ড। (২) ফ্রান্স এবং (৩) রাশিয়া।

এই দল বাঁধার অর্থই এই যে, যুদ্ধে বিগ্রহে পরস্পরের সহায় হবে।

এই সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে—বর্ত্তমান যুদ্ধে একদিকে অষ্ট্রিয়াহাঙ্গারী ও জার্ম্মানী এবং অপর পক্ষে সার্ভিয়ার সঙ্গে রাশিয়া ও ফ্রান্স দাঁড়াল।

প্রায় ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানী ফ্রান্সের দুর্দ্দশার আর কিছু বাকী রাখে নাই; সেই ফ্রান্স মাথা তুলে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে দেখে, জার্ম্মানীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, সে ফ্রান্স ধ্বংস করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। ফ্রান্সকে জব্দ করতে হ'লে

বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনা করতে হবে, নতুবা সুবিধা হবে না। পক্ষান্তরে জার্ম্মানী বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনার রাস্তা চাইল। বেলজিয়াম, জার্ম্মানীর অধীন নয়—এবং সে ফ্রান্সেরও শত্রু নয়—তার পক্ষে সব রাজ্যই মিত্র, তবে সে কেন এক রাজার সৈন্যকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার পথ দিবে, কেন গোলযোগ বিবাদ করতে যাবে? বেলজিয়ামের রাজা বল্লেন—ভারত, যদ্যপি তিনি কোন মতেই জার্ম্মান সৈন্যকে তাঁর রাজ্য দিয়ে যেতে দিতে পারেন না। তাই শুনে জার্ম্মানী বল্লে—কি, যেতে দেবে না! তারি তোমার জোর, আর যদ্য; আমরা সমস্ত বেলজিয়াম ছারখার ক'রে ফ্রান্সে যাব, দেখি কে ঠেকায়!

সেই কথা শুনে ইংলণ্ডের মন্ত্রীগণ জার্ম্মানীকে পুরোনো সন্ধির কথা মনে করিয়ে দিলেন, তার ধর্ম্মের দোহাই দিলেন, সব দেশের মন্ত্রীগণ একত্র হ'য়ে পরামর্শ করে বিনা যুদ্ধে গোলযোগ মিটিয়ে ফেলবার জন্য কত চেষ্টা করলেন; কিন্তু জার্ম্মানী কোন কথায় কান দিলে না। তখন অগত্যা তার ধর্ম্মের খাতিরে ইংলণ্ডকে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'ল। ইংলণ্ডের দূত যখন জার্ম্মান মন্ত্রীর নিকট বিদায় নিতে যান, তখন মন্ত্রী রেগে বলেছিলেন "তোমরা বড় নির্ব্বোধ, এক-টুকরা কাগজের জন্যে জার্ম্মানীর সঙ্গে শত্রুতা করে! আচ্ছা দেখা যাবে!" এইরূপে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট পুরোদমেই যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

জার্ম্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করলো—বেলজিয়ামের রাজা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। বেলজিয়ানগণ খুব বীর, তাদের যুদ্ধের আয়োজনও কম ছিল না, কিন্তু প্রকাণ্ড জার্ম্মানীর তুলনায় তা অতি সামান্য। তবুও বেলজিয়াম জার্ম্মানীকে সহজে ছাড়ে নাই! ফরাসী ও ইংরাজ সৈন্য বেলজিয়ামে পৌঁছাবার আগেই, জার্ম্মানী অসংখ্য সৈন্য এবং প্রকাণ্ড কামানের বলে বেলজিয়াম ছারখার ক'রে, একদিকে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস এবং অপর দিকে ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য ছুটল। প্রথম প্রথম জার্ম্মান সৈন্যদের দ্রুতগতি এবং জয়লাভ দেখে সকলে স্তম্ভিত এবং ভীত হ'য়েছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর সে গতি বেশী দিন রইল না। ইংরাজ, ফরাসি বেলজিয়ান এবং ভারতীয় সৈন্যের বীরত্বের কাছে জার্ম্মানীকে থম্‌কিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধল।

এই সব যুদ্ধের মধ্যে জার্ম্মানী তুরস্ককে নিজের দলে টেনে নিয়েছে এবং সুয়েজ খাল দখল করবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

এই যুদ্ধে কত লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করেছে, কত লক্ষ লোক, স্ত্রীলোক শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, গৃহহীন, অন্ন বস্ত্রহীন হ'য়েছে, কত শস্য ক্ষেত্র নষ্ট হয়েছে, কত প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস হ'য়েছে, তার শেষ নাই, কেও তার পরিমাণ বলতে পারে না।

বেলজিয়ামের তো কথাই নাই; রাজারাণী যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের সঙ্গে রড় বৃষ্টি মাথায় করে যুদ্ধ ও সেবা করছেন; তাদের পুত্র ও কন্যাগণ ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারে স্থান পেয়েছে। রাজা ও রাণীর স্বদেশ-প্রেম, বীরত্ব ও ত্যাগস্বীকার বর্ত্তমান যুগে জগতে অতুলনীয়। অন্যান্য দেশের রাজকুমারগণও যুদ্ধে গিয়াছেন। ভারতবর্ষের কত রাজা সসৈন্যে যুদ্ধে গিয়াছেন, কত বাঙ্গালী যুবক ডাক্তার রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

একদিকে যুদ্ধের ধুমধাম, বীরত্ব, অন্যদিকে পৃথিবীময় হাহাকার। যে সব দেশের পুরুষগণ যুদ্ধে লিপ্ত, সেই দেশের মহিলাগণ যুদ্ধ থামাবার জন্য আয়োজন করছেন, ধর্ম্মাচার্য্যগণ সর্ব্বদা শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। বঙ্গের জননী এবং ভগিনীগণও শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বেলজিয়মের রাজকবি
কুমারী মারগারেট কপিন

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ | ২য় সংখ্যা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্ত্রী-শিক্ষা

যখন মহাত্মা গোখলে গরীব ভারতবাসীর জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন একদল অতি-সাবধান এবং অতি-বিজ্ঞ লোক নানা ভাবে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলেন। শিক্ষিত ভারতবাসী যে গরীব ভারতবাসীর শিক্ষার অন্তরায় হ'তে পারে, সে তত্ত্ব তার পূর্ব্বে স্বপ্নের অগোচর ছিল। একবার একটা গল্প শুনেছিলামঃ— কোন গৃহস্থের বাড়ীতে সামান্য-পরিচিত একব্যক্তি একদিন সপরিবারে অতিথি হ'য়েছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সেদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হ'চ্ছিল। গৃহস্থের একটি ছ'মাসের ছেলে ছিল, সে মার দুধ পেতনা, গরুর দুধ খেত; ঘরে কেবল তারই একটু দুধ ছিল। অতিথিরও একটি ছ'তিন বছরের ছেলে ছিল। সেই দুর্য্যোগে অতিথি মহাশয়ের স্ত্রী ঘরে যা ছিল তাই দিয়ে রান্না করে খেলেন, তারপর মনে হ'ল তার খোকার জন্য একটু দুধ চাই তো। তখন গৃহস্থের স্ত্রীর কাছে দুধ চাইলেন। তিনি দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন, কেবল তাঁর খোকার মত দুধ আছে, কি ক'রে দেবেন! অতিথি ঠাকরুণ বল্লেন—তা সেই টুকুই দাও! গৃহিণী তো অবাক, অপ্রস্তুত! তিনি কাতর হয়ে বল্লেন "আমার খোকা মাই-দুধ পায় না। ওর দুধটুক আপনাকে দিলে, ওকে কি খাওয়াব!" তিনিও বেশ নিঃসঙ্কোচে বল্লেন "তা আজ রাত্রিটুক বইতো নয়, তোমার খোকাকে একটু না হয় জল খাইয়ে রেখো!" এমন হৃদয়, এমন প্রেম, কল্পনা ব'লেই জানতাম। গোখলে মহোদয়ের প্রস্তাব উপলক্ষে জানা গেল, আমাদের ভারতীয় জীবনে এমন দুর্লভ বস্তু বেশ জীবন্ত ভাবেই আছে।

কথায় কথায়—"আমাদের জাতিভেদ", "আমাদের বর্ণাশ্রম" প্রভৃতির গৌরবে আমরা অজ্ঞান, এবং প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্বে গর্ব্বিত, হ'য়ে থাকি। স্ত্রী-শিক্ষা এবং হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা সম্বন্ধেও বড়াই কিছু কম করি না। গত বৈশাখ মাসের "গৃহস্থের" 'বর্ত্তমানের স্ত্রী-শিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করে, সব শেষে বলেছেন "তার পর বর্ত্তমানে আমাদের বিধবাদের শিক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। যাঁহারা মূর্ত্তিমতী শিক্ষা, যাঁহারা মূর্ত্তিমতী করুণা, যাঁহারা মূর্ত্তিমতী দয়া তাঁহাদের আবার নূতন করিয়া কি শিখাইতে হইবে!" কয়েক ছত্র পরে আবার লিখেছেন "ইঁহারাই মূর্ত্তিমতী ত্যাগ। আমাদের বিধবার নারী-প্রকৃতি অন্যান্য দেশের ন্যায় কখন পতিত থাকিয়া অনুর্ব্বরতা লাভ করে না . . . ।" সব শেষে তিনি বলেছেন, 'তাই বলিতেছিলাম আমাদের সমাজ বিধবাদিগের যে সুন্দর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন তদতিরিক্ত শিক্ষার আর আবশ্যক দেখি না।" একথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আমরাও বল্‌তে পারি:—"যে দেশে বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতন্যের জন্ম, সে দেশের পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। ইহসর্ব্বস্ব অন্যান্য দেশেই শিক্ষা আবশ্যক। আমরা ভারতবাসী সব পারলৌকিক আত্মা!"

এমন ভাবুকতা অনেক দিন দেখি নাই। হিন্দুনারী বিধবা হ'লেই তার প্রকৃতিতে যে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন হয়, এবং সে অপর মানুষ হ'তে একবারে স্বতন্ত্র হয়ে যায়, এ একটা তত্ত্ব বটে! এমন অনেক তত্ত্ব জগতে ছিল এখনও আছে। দাস-ব্যবসায় উঠিয়ে দিবার আন্দোলন যখন চল্‌ছিল, তখন একদল খৃষ্টান কেঁদে আকুল হ'য়েছিলেন যে দাস-ব্যবসা উঠে গেলে বাইবেল যে মিথ্যা হয়ে যাবে! ও যে শাস্ত্রের বিধি—দাসের দাসত্বেই মুক্তি!

এক আচার্য্য মহাশয় লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক তাঁর মুখস্থ ছিল। একদিন তাঁকে যখন বলা হল যে মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বেদের বাংলা অনুবাদ ক'রেছেন, তিনি তাই শুনে, একবারে কানে আঙুল দিয়ে বল্লেন 'আরে বল কি বল কি, কায়েতের ছেলে বেদ পড়ে! তার যে অপরাধ হ'ল, পাপ হ'ল!"

এই সব যুক্তির কি আর দিন আছে! সমাজ এবং মানব-প্রকৃতি বড় জটিল বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একবারে অজ্ঞাত নূতন বিষয় নয়, কল্পনার বিষয়ও নয়।

স্ত্রী-শিক্ষার "স্ত্রী" হ'তে বিধবারা যে কেন একবারে স্বভাবতই স্বতন্ত্র, তা তো বুঝ্‌তে পারি না। স্ত্রী-শিক্ষা অর্থ ছোট বড় কুমারী সধবা বিধবা সকল অবস্থার স্ত্রী-লোকদেরই শিক্ষা! ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার স্ত্রী-লোকদের জন্য বিভিন্ন রূপ শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা আবশ্যক; কিন্তু বিধবাদের জন্য কোন শিক্ষারই প্রয়োজন নাই কেন? দশ বার বছরের একটি বালিকা, সে কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা যাই হউক না কেন, সে স্বভাবত দশ বার বছরের অন্যান্য বালিকাদেরই একজন। আজ কুপ্রথার দাস হ'য়ে বার বছরের বালিকার বিয়ে দিয়ে বলা হবে, 'আমাদের স্ত্রী বিলাসিতার সামগ্রী নয়—

'কার্য্যেষু মন্ত্রী, চরণেষু দাসী,
ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী" ইত্যাদি।

আবার কাল সে বিধবা হ'লেই হঠাৎ "মূর্ত্তিমতী শিক্ষা" ও "মূর্ত্তিমতী ত্যাগ" হ'য়ে উঠবে! এ নিছোক কল্পনার গোলোক-ধাঁধায় আর কত কাল ঘুরে বেড়াব!

বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে হিন্দু-নারীর অবস্থা, বিধবাদের অবস্থা তো আর ঢাকা নাই, সংবাদ পত্রেও সর্ব্বদাই সে খবর বেরিয়ে প'ড়ছে। অন্যান্য দেশের নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে এক্ষেত্রে কিছু ব'লে দরকার নাই। নিজেদের কথাই ভাবা যাক্। গত বৎসর মেহলতার আত্মহত্যার পর হ'তে কতগুলি আত্মহত্যা হ'য়ে গেল, তার গোড়ার ব্যাপার কি? বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সুরাট, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সকল স্থানের লক্ষ্য ও কাজ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ক'রলেই সকলে জান্‌তে পারেন বিধবাদের শিক্ষার কিছু আবশ্যকতা আছে কি না। সমাজে বাস ক'রে সমাজের অবস্থা জানবার জন্য যে শ্রম স্বীকার আবশ্যক, তাতে যারা পরাঙ্মুখ কালিকলমে তাদের এ সকল বিষয় আলোচনা না করাই ভাল, করা অপরাধ।

সমাজের ঘটনাবলী তো সকলের সামেই ঘটছে। কিন্তু কেও যদি দেখেও না দেখে, তার সঙ্গে পারা যায়।

মাতৃত্ব

দেশের প্রকৃত শক্তি, প্রকৃত গৌরব—নারী। সুস্থ, সবল, সুশিক্ষিত, স্বচ্ছন্দ অবস্থা-সম্পন্ন যুবতী রমণী যখন সন্তানের মা হ'ল, তখন সেই নারীর ন্যায় মূল্যবান পদার্থ রাজ্যের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। সুমাতার সংরক্ষণ রাজশক্তির, দেশের সমবেত শক্তির প্রধান কর্ত্তব্য। বালিকাগণ যাতে সুস্থ সবল হয়, সুশিক্ষা পায়, যৌবনে সৎ পাত্রের সহিত বিবাহিত হয় এবং তারপরও স্বচ্ছন্দে সুস্থ দেহে সুস্থ সন্তান প্রসব ও সন্তান পালন ক'রতে পারে—সেদিকে দেশের সমস্ত শক্তির জাগ্রত দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যদি বালিকা অসুস্থ হয়, মাতার অবস্থা যদি স্বচ্ছল না হয়, শিক্ষা যদি সারবান না হয়, তা হ'লে, মাতার রোগ, দুর্ব্বলতা, দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা, অশিক্ষা, সন্তানের জীবনকে দূষিত বাষ্পের মত ঘিরে থাকে; এবং তাহার ফলে দেশের ভবিষ্যৎ বংশ প্রচুর পরিমাণে অকালে ইহলোক ত্যাগ করে, আর যারা থাকে তারাও কোনো প্রকারে জীবন ধারণ করে।

সন্তানের মাতা হওয়াই নারী জীবনের সার্থকতা। কিন্তু শিক্ষা এবং সহায়তার অভাব বশতঃ শত শত নারী জননী হয়ে, কত ক্লেশ বহন করে, কিন্তু সন্তানের পালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে করতে পারে না। এ'তে কেবল সন্তানের মাতা পিতা বা সেই পরিবারেরই ক্ষতি হয় না; সমস্ত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দরিদ্র, দুর্ব্বল, অজ্ঞ দেশকে যদি সচ্ছল সমৃদ্ধিশালী সবল ও জ্ঞানবান ক'রে তুলতে হয়, তা হ'লে কেবল কল কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, স্কুল কলেজ খুল্‌লেই হবে না; এসব তো চাই, কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই মাতৃত্ব-পরিপোষণ। দুর্ব্বল দরিদ্র অশিক্ষিত মাতার দুর্ব্বল উচ্ছৃঙ্খল সন্তান কি শিক্ষা লাভ ক'রবে? মানব-সমাজের মূল শক্তি মাতা। মা হওয়া কত বড় গৌরব, কত গুরুতর দায়িত্ব, তার জন্য কত শিক্ষা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন,—এসব তত্ত্ব যেমন বয়স্কা কন্যাদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তেমনি এই শিক্ষা লাভ ক'রবার এবং শিক্ষা অনুসারে কাজ ক'রবার সকল রকম সুযোগও ক'রে দেওয়া উচিত। এজন্য দেশের অর্থ, জ্ঞান, শক্তি সবই ব্যয় করা আবশ্যক। দেশের হিতসাধনের গোড়ার কথা এই। ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করতে হ'লে, এ দিকে ভারতবাসীর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। ধনী ও জ্ঞানী মহিলাদের দায়িত্ব এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী। যারাই মাতা ও সন্তানের মূল্য ভাল বোঝেন।

সেবা-সদন

বোম্বাই নগরের "সেবা সদন" নারীশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সকল মারাঠি মেয়েরা কোন স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে পারে না তাদের শিক্ষার জন্য সেবা সদনে দুই রকম ব্যবস্থা আছে। ১ম, সাধারণ শিক্ষা—সকল শ্রেণীর বয়স্কা এবং অন্য কোন স্কুলে পড়তে অসমর্থ মারাঠি হিন্দুমহিলাগণ সেখানে মারাঠি এবং ইংরাজী শিখতে পারেন। পাঁচটি মেয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, এক বছরে ছাত্রীসংখ্যা হয়েছে ১৬৪। ২য়, শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা—এ বিভাগেও ৪৯টি ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে। কার্য্যনির্ব্বাহক ও শিক্ষকগণ সকলেই বিনা বেতনে কাজ করেন। বোম্বাই নগরের হিন্দু মেয়েদের পর্দ্দা নাই, তাঁরা স্বভাবতই স্বাধীন ভাবে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করেন। তাই, এতবড় কাজ সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, এই মহিলাগণ হিন্দু।

বনিতা-বিশ্রাম

বোম্বাই এবং সুরাট নগরে সম্প্রতি দুটি নূতন বাড়ী তৈরি হ'য়েছে। সে বাঁড়ী দুটি বহুমূল্য রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও মূল্যবান, এবং দেবমন্দির তুল্য পবিত্র, ভারতীয় নারীশক্তির মূর্ত্তিমান প্রকাশ। এই বাড়ী দুটির নাম "বনিতা-বিশ্রাম"। হিন্দু গুজরাটি নারীদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করা এবং বিধবাদের সহায়তা করা এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই পবিত্র কাজে গুজরাটি

মহিলাগণ যথেষ্ট সাহায্য ক'রছেন। জাভেরবাই ভগবান দাস নামক একজন মহিলা ৫০,০০০ টাকা দান ক'রেছেন, এবং অন্যান্য মহিলাদের চেষ্টায় প্রায় ২০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হয়েছে। সুরাট বনিতা-বিশ্রামে ২০০ মহিলার বাসস্থান এবং তাদের শিক্ষার জন্য বিধি-ব্যবস্থা থাকবে। বোম্বাই আশ্রমে ৫০ জন মহিলার বাসের ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু সেখানকার শিক্ষালয়ে বাহিরের সকল শ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষালাভ করতে পারবে। এই আশ্রম নারীদের সর্ব্ববিধ শুভকার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ বাঞ্ছিত হবে। গুজরাটী হিন্দু বিধবা ও গরিব অনাথ মেয়েরা এখানে আশ্রয় পাবে, এবং নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের এবং বিধবাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে হবে, এবং এই আশ্রম হতে একটি অবৈতনিক আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। এই সকল কাজে সজ্জন পুরুষগণ সহায় আছেন, কিন্তু মহিলাগণের দ্বারাই সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

পুণা হিন্দু বিধবাশ্রম

ইহা প্রায় ২০ বৎসর স্থায়ী একটি শুভ-অনুষ্ঠান। এই আশ্রমের তিনটি স্বতন্ত্র শাখা ছিল:—(১) অনাথ বালিকা বিদ্যালয় (২) মহিলা বিদ্যালয় এবং (৩) নিষ্কাম কর্ম্ম-মঠ। সম্প্রতি এই তিন শাখা একত্র করে (বোর্ডিং) বিধবাশ্রম ও স্কুল করা হ'য়েছে। এবছর এই স্কুলে ১৯ জন বিধবা, ৮৪ জন কুমারী এবং ২১ জন সধবা নারী শিক্ষালাভ করছে। এখানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হয়।

ম্যাঙ্গালোরের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে দুজন বয়স্কা বিধবা ছিলেন,—তাঁরা প্রাচীনার মধ্যে গণ্য; সেকেলে ভাবের মধ্যে বাস করতেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমতী পার্ব্বতী বাই এর বক্তৃতা শুনে, এই বিধবা দুয়ের অভিভাবকগণের মনে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তার পর, অভিভাবকগণ অনেক উৎসাহ দিয়ে তাঁদের এই আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে, ম্যাঙ্গালোরে ফিরে গিয়ে, মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছেন। আর একজন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

শিশু-মৃত্যু

এ দেশে যত শিশুর মৃত্যু হয়, অন্য কোন দেশে এত হয় না। বাংলায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতি হাজারে ২০৯'৫ জন শিশু মারা গিয়াছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্থির ক'রেছেন যে, যে সব অসুখ অনায়াসে দূর করা যায় এমন অসুখেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয়। সুতরাং শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা কমাতে হ'লে, স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-চিকিৎসক প্রধান অস্ত্র। এ দেশে অভিজ্ঞ মেয়ে-ডাক্তারের সংখ্যা অতি কম; এবং যা দু-চার জন আছেন, তাঁরাও বিশেষ কাজে লাগেন না, কারণ গরিব লোকে ডাক্তার দেখাবার খরচ দিতে পারে না, এবং কুসংস্কারের জন্যও সহজে ডাক্তার দেখায় না। আর এদেশের মেয়েদের কথা আর বলব কি! তাঁরা একে তো শিক্ষা পায় না, তার উপর আবার বাল্য বয়স যেতে না যেতেই মা হয়; তাদের কে সামলায় তার ঠিক নাই, তারা আবার ছেলে সামলাবে! তবে এত ছেলে যে বাঁচে তাহাই আশ্চর্য্য! আচ্ছা, যারা বাঁচে তারা তো বাঁচেই; কিন্তু যারা অকালে মারা যায় তাদের মৃত্যুর জন্য কি কেও দায়ী নয়! তার কি প্রতিকার করতে হবে না? শুধু দৈবের দোহাই দিলে চলবে না। শিক্ষা দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা, অকাল মৃত্যু কতটা দমন করা যেতে পারে, "চিত্রগুপ্তের লিখন" কতটা খণ্ডন করতে পারা যায় গত বৈশাখের ভারত মহিলায় শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের "স্বাস্থ্যোন্নতি" প্রবন্ধে পানামা যোজকের স্বাস্থ্যোন্নতির বিবরণে তার অনন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

নারীর দায়িত্ব

জীবনটা যে কত বড় বস্তু, সে বিষয়ে ধারণা যার যেমন, তার জীবনের গতিও তেমনি হয়। নারীগণ যদি বাল্যকাল হ'তে নিজেদের জীবন সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে যে কোন একজন পুরুষকে স্বামীরূপে

অবলম্বন ক'রে, তার ঘরকন্নার কাজগুলি সম্পন্ন ক'রে, কয়েকটি সন্তানের মা হ'য়ে দিন কাটিয়ে যেতে পারলেই জীবন সার্থক হ'ল, তা হলে তার কাছে লেখাপড়া শেখা, গান বাজনা, সেলাই, চিত্রবিদ্যা চিকিৎসা প্রভৃতি শেখা বিদ্যার নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হবে। কিন্তু নারী যদি একবার জগতের দিকে চেয়ে দেখে, জীবন-সংগ্রামের সংবাদ নেয়, সন্তান পালন কি কঠিন জটিল ব্রত তা চিন্তা করে, তা হ'লে সে বুঝতে পারে যে তার জীবন পুরুষের জীবন চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, কম দায়িত্ব-পূর্ণ নয়; বরং বহু পরিমাণে নারীর কাজই অধিকতর জটিল ও কঠিন। ধর্মপ্রচারক, বিচারক, পুলিশ, শিক্ষক হতে আরম্ভ ক'রে পাচক ও ভৃত্য পর্য্যন্ত গৃহের সকল কাজ রমণীর হাতে। স্বাধীন জাতির নারীগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত যান। বঙ্গ রমণীর সেখানে যাওয়ার সময় এখনও হয়ত আসে নাই। কিন্তু তাঁর গৃহের কাজ দিন দিন জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। গৃহের দাসী হয়ে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কাজ যন্ত্রের মত সম্পন্ন করে গেলেই, গৃহের জননীর কর্ত্তব্য শেষ হয় না, সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যও সম্পন্ন হয় না। সকলেই সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত হ'তে পারে না; তাই বলে কোন ছেলে কিম্বা পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে তার শিক্ষা বা শক্তির বিকাশের পথে আমরা একটা অটল পাহাড় তুলে দিই না, বরং আমরা নানা প্রকারে এই চেষ্টাই করি, যেমনই হোক না কেন, তার শিক্ষার পথ যত পরিষ্কার করে দিতে পারা যায় তা দেওয়া যাক, সে যতটা হ'তে পারে, করতে পারে, তার চূড়ান্ত ক'রে দেখবার সুযোগ পাক। কিন্তু মেয়েদের বেলা আমরা সহজেই বলি—"খুব জোর দ্বিতীয়ভাগ আর বাজারের হিসাব পর্য্যন্ত!" কিন্তু তর্কের বেলায়—মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী আমাদের মুখে লেগেই আছে। যারা লীলাবতী প্রভৃতির দোহাই দিয়ে গৌরব করে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বেলায় দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করে, তারা কেমন মানুষ! রাজপুত রমণীর বীরত্বের কত গৌরব! বঙ্গ রমণীর সে বীরত্বের পথে কণ্টক রোপণ করেই কি বাঙ্গালীর গৌরব বাড়বে! পুরুষ অপেক্ষা নারীর জীবন ও কর্ত্তব্য কোন অংশে হীন নয়, সুতরাং নারীর শিক্ষার ব্যবস্থাও কোন অংশে পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থার চেয়ে হীন হওয়া উচিত নয়।

উচ্চ আদর্শের কথা না হয়, ছেড়েই দিলাম। সংসারের লাভ ক্ষতির দিক দিয়েই দেখ এইরূপ অবাধ স্ত্রীশিক্ষা কত প্রয়োজনীয়। একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, চারটি ছেলে, চারটি মেয়ে ও কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে। তিনি বড় চালাক লোক, স্বয়ং সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন—কি একটি চাকরী ক'রে দু পয়সা উপার্জ্জন করতেন, বহুকষ্টে ছেলেদের কিছুর পড়াইয়াছিলেন। মেয়েদের একবারেই লেখাপড়া শেখান নাই, পৈত্রিক সম্পত্তিরও সুবন্দোবস্ত করিতে না পারায় তা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ছেলেদের এক একটা চাকরী জুটলো, মেয়েরা বাল্যকালেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতেই থেকে গেল। মেয়েরা আর কি করবে? হাঁড়ি বাড়ে খায় ঘুমায়, কলহ করে, এবং ভাইপো ভাইঝিদের আদর দিয়ে মাটি করে। এই এক দৃষ্টান্ত। অপর দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তি নিজে ভাল লেখাপড়া শেখেন নাই, কিন্তু প্রাণপণ করে পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা ক'রেছেন, বহু কষ্টে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও যার যতদূর শক্তি লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ছেলেরা কেও এম, এ, কেও বি, এল, কেও তার নীচেই লেখাপড়া শেষ করেছে, মেয়েরাও কেও এম, এ, কেও বি, এ, কেও কোন পরীক্ষা পাস করতে পারে নাই। এই পরিবারেও ছেলেদের ছেলে-পিলে হ'য়েছে, মেয়েরা কেও কেও বিধবা হয়ে পিতৃ-গৃহে আছে, কিন্তু এই উভয় পরিবারের মধ্যে কত পার্থক্য! পূর্ব্বের পরিবারে ধন ও বিদ্যা উভয় সম্পদ হ'তে বঞ্চিত, দরিদ্র; কিন্তু দ্বিতীয় পরিবার উভয়বিধ সম্পদের অধিকারী। টাকাকড়ি যেমন সম্পদ, বিদ্যা—জ্ঞানও তেমনি, তার চেয়েও বড় সম্পদ,—স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে পরম সম্পদ। "সংসারের লাভ ক্ষতি, সুখ স্বচ্ছন্দতার দিক হ'তেও বিদ্যা পরম সম্পদ। শিক্ষিত, উন্নত, বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, মেয়ে হোক আর পুরুষ হোক, সকল বিষয়েই বেশী কার্য্যক্ষম;—কি অর্থ উপার্জ্জন, কি সন্তান পালন, কি গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, কি সেবা শুশ্রূষা, কি বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণ। অবশ্য বিশেষে এসব কাজই

নারীকে করতে হয়। তুমি বয়স্কা বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে আছ—কিন্তু পিতার দুঃখভার লাঘব করবার শক্তি নাই, কোন বিষয়ে তাঁর সহায় হ'তে পার না,—কেবল দু'খানা বাসন মেজে, রান্না করে তুমি কি করবে? সে কাজ তো তিন টাকা বেতনের একজন ঝী-চাঁধুনীও করতে পারে! পিতৃহীন নাবালক ভাই সংসারে একাকী—তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত দিদি, তুমি ভাইকে মানুষ করবে কি করে, তোমার যদি কোন শক্তি, কোন জ্ঞান না থাকে? তুমি নিজেই দাঁড়াবে কোথায়? তোমার স্বামী শশিব, শুষ্কতর পরিশ্রমে শ্রান্তক্লান্ত, তুমি তাঁর দুখানা চিঠিলিখে দিতে পার না, তাঁর চিন্তার ভার বহন করতে পার না; তিনি অসুস্থ হলেও তুমি দু পয়সা আনতে পার না, সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা, দেখা, পরিচালন করা, কিছুই পার না,—কারণ, বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, নিঃসম্বল—। তা হ'লে, ধিক্ সহধর্ম্মিণী হওয়া, মা হওয়া! —নারী জন্মই বৃথা!

নারী জননী—ভগিনী,—সহধর্ম্মিণী—কন্যা,—গৃহে শিক্ষয়িত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, চিকিৎসক, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব রক্ষক, স্বত্বাদের কর্ত্রী ও পরিচালিকা, আনন্দ ও শান্তি বিধায়িনী। সমাজে, কর্ম্মক্ষেত্রে, দেশের সেবায়—নারী পুরুষের পরম সহায়, সঙ্গিনী। অজ্ঞান, অন্ধ, দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী, নারীর দ্বারা কি একাজ সম্ভব! এ দেশের নারীগণ আপনাদের দায়িত্ব অনুভব করুন। সম্মুখে কঠোর জীবন-সংগ্রাম। সমস্ত জগত এ সংগ্রামে লিপ্ত। যে দেশের নরনারী পরস্পরের সহায় হয়ে এ সংগ্রামে লিপ্ত হবে, সে দেশ দাঁড়াবে; যে দেশে তা হবে না, সে দেশের দুর্গতির সীমা থাকবে না। এ দেশের সমস্ত পুরুষ শিক্ষিত হ'লেও, স্ত্রীশিক্ষার অভাবে এ দেশের শক্তি জাগবে না।

মন্দাটের ছবি

ভারত-মহিলার মন্দাটের ছবিখানি আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বামীপুত্র নিদ্রিত থাকিতেই, উষাকালে, গৃহিণী শয্যা থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়েছেন, তারপর গৃহসংলগ্ন বাগানে স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষ হ'তে পুষ্প চয়ন করেছেন।

ভগবদর্চ্চনার কালে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সাত্ত্বিক ভাবে দেখা ও রাখা সকলেরই উচিত। আমাদের রক্তমাংসের সহিত সাত্ত্বিকতার একটা আদর্শ আবহমান কাল হ'তে চলে আসছে। গৃহিণী উপাসনা-স্থান লেপন করবার জলের জন্য গৃহস্থালীর সামগ্রী হ'তে পৃথক ক'রে একটি কমণ্ডলু, বসিবার একখানি আসন ও উপাসনার সময় পরবার জন্য একখানি পট্টবস্ত্র রেখেছেন। সেই কমণ্ডলুর জলে স্থানটি লেপন ক'রে সেই কাপড়খানি প'রে, সম্মুখে একখানি থালায় ফুল সাজিয়ে তিনি ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত ভগবদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারতের গৃহিণীগণ সকলেই যদি ঘরে ঘরে এই আদর্শ অনুসরণ করে চলতে আরম্ভ করেন তবে গৃহ স্বর্গ হবে, দেশ জেগে উঠবে।

জাপানী রমণীর জাগরণ

সম্প্রতি জাপানের বর্ত্তমান সম্রাটের মাতা রাণী হারুকুর মৃত্যু হ'য়েছে। জাপানের নারীজাতির বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার মূলে এই শক্তিশালী মহিলা বিশেষ কাজ ক'রেছেন; তিনিই একপক্ষে জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূল বললে অত্যুক্তি হয় না। জাপানের এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। তিনি রাজরাণী হ'বেন, এই আশা ও বিশ্বাসে বাল্যকাল হ'তে রাজার মনোরঞ্জনের জন্য আবশ্যক নানা প্রকার হাবভাব আদব কায়দাই শিখেছিলেন। কিন্তু পরলোকগত রাজা মুৎসুহিতোর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার পর, তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি কেবল রাজার স্ত্রী নন। বর্ত্তমান যুগে রাণী, কেবল রাজার স্ত্রী হলেই হবে না; তিনি রাজ্যের রাণী, তাঁকে দেশের রমণীদের আদর্শ ও নেত্রী হ'তে হবে; জাপানের নারীদিগকে অজ্ঞান অন্ধকার হ'তে মুক্ত করতে হ'লে, তাঁকেই পথ দেখাতে হবে; জনহিতকর কাজের দৃষ্টান্ত তাঁকে দেখাতে হবে; দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগ ও ক্ষমস্বীকার কেমন ক'রে করতে

হয়, তা তাঁকেই ক'রে দেখিয়ে সকলকে স্বদেশ-প্রীতি শিক্ষা দিতে হবে। তিনি গভীর মনোযোগ এবং কঠোর পরিশ্রম ক'রে এইসকল কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হ'য়েছিলেন, এবং প্রচুর পরিমাণে কৃতকার্য্যও হ'য়েছিলেন। জাপানে স্ত্রী-শিক্ষা, শুশ্রূষা, হিতসাধন এবং স্বদেশ-প্রীতি তাঁর দৃষ্টান্তে বিশেষ গতি ও শক্তি লাভ করেছে। তিনি স্বয়ং একজন কবি ছিলেন, এবং অপর কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের খুব উৎসাহ দিতেন। জাপানে এমন কোন শুভ অনুষ্ঠান হ'ত না যাতে কিছু পরিমাণে তাঁর হাত না থাকত।

জাপানী রমণীগণ সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী। যখন মেয়েদের কাজ কেবল রান্নাবান্না ও সন্তান-পালন মাত্র ছিল, এবং পুরুষেরা মেয়েদের খেলার সামগ্রী বা ভার স্বরূপ মনে ক'রত, সেই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্যোতি জাপানের মেয়েদের চোখ খুলতে আরম্ভ করে। মেয়েরা কেবল স্বামী, ভ্রাতা বা পিতার ভিতর দিয়ে যা কিছু ক'রতে পারে তাই ভেবে এভাব বদলে যেতে লাগল; মেয়েরা নিজেদের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের সেবা করবে এই আদর্শ জাগতে লাগল। শান্তির সময় শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী হিতসাধিকার কাজ করবার জন্য আহ্বান আসতে লাগল, যুদ্ধ বিগ্রহ বিপদ আপদ, দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্পের সময় দীনদুঃখীদের দুঃখ দুর্গতি দূর করবার জন্য নারীগণ আহূত হ'তে লাগলেন। নারীগণ এ আহ্বান অগ্রাহ্য করেন নাই। এ বিষয়ে রাণী মাৎসু জাপানী রমণীগণের নেত্রী ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগের জাপানী রমণীগণ উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রমণীগণের সাধনার ফল ভোগ করছেন। তাঁদের সাধনার প্রধান ফল অবাধ স্ত্রী-শিক্ষা। এই শিক্ষার গুণে জাপানী রমণীদের প্রভাব জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে কল্যাণ সাধন করেছে। জাপানের গৃহ-পরিবার এখন উন্নত আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত; অক্ষম দুর্ব্বল অজ্ঞ রমণী রাজ্য আর নাই। তার স্থানে শিক্ষিতা, আত্ম-নির্ভরশীলা, তেজস্বিনী নারী সমাগত। তাঁরা সকল বিষয়ে ভেবে চিন্তে কর্ত্তব্য নির্ণয় করতে পারেন। বিষয় কর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকলা সকল বিভাগেই জাপানী রমণীর আবির্ভাবে বিশেষ উন্নতির সূচনা হ'য়েছে।

জাপানী রমণীগণের জাপরণে জাতীয় চরিত্র উন্নত ও মহৎ হ'চ্ছে, উন্নতা—অপরের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি—খুলছে। শিক্ষার ফলে জাপানী রমণী, পুরুষের সঙ্গিনী সহকর্ম্মিণী এবং সহধর্ম্মিণী হ'য়েছেন, যোগ্যতর মা হয়েছেন, জাতীয় শক্তি ও গৌরবের উৎস স্বরূপ হ'য়েছেন।

কুমারী ম্যাক্‌ফারসন্

লণ্ডন ও কলিকাতার ন্যায় বড় বড় নগরের গলিতে গলিতে যে কত দুঃখ দারিদ্র্য কত শত নিরীহ বালক-বালিকার রক্ত শোষণ করছে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের কয়েকটি গলির মধ্যে যে কয়টি ঘটনা সহৃদয় নরনারীর চ'খে প'ড়েছিল, তারই বর্ণনা সংক্ষেপে ক'রব।

লণ্ডনের একটি অতি অপ্রশস্ত গলির মধ্যে একটি ছোট দোতালা বাড়ীতে দিয়াশলাইএর বাক্স তৈরি হ'ত। কয়েকজন সহৃদয় নারী দিয়াশলাইএর বাক্স কি ক'রে তৈরি হয় তা দেখবার জন্য সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। বাড়ীর কর্ত্রী বাক্স তৈরির ব্যবসা করে। সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁদের উপরের একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরা, জীর্ণ-শীর্ণ একদল ছোট ছেলে মেয়ে বাক্স তৈরি করছে। তারা ১৪৪টা বাক্স তৈরি ক'রলে, দুই পয়সা পায়। সমস্ত দিন খেটেও কেও কেও দুই পয়সার কাজ শেষ ক'রতে পারে না। কতদিন দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় সেই শিশুগণ কাজ করে; তারপর কাজ শেষ হ'লেও তারা পয়সা পায় না, যত পয়সার কাজ করেছে, সেই মালের খরচ টুকরা শুকনা রুটী খেতে পায়। ভোর হ'তে রাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্রাম নাই, খেলা নাই, কথা

নাই, খেলা বাতাস নাই, কেবল কলের মত কাগজ ভাঁজ করা, কাগজ কাটা, আঠা লাগান, প্যাক্ করা, তারপর দু'তিন টুকরা রুটি; এমনি ক'রে দিনের পর দিন যায়। মনে হয়, শত শত শিশুর অকাল মৃত্যু। এদের মধ্যে যারা একটু বড়, দুপয়সার বেশী রোজগার ক'রতে পারে, এবং রুটি না খেয়ে, পয়সা নিয়ে বাড়ী যায়, তারাও তাদের সেই পয়সা ভোগ ক'রতে পায় না। দরিদ্র, অমিতব্যয়ী পিতামাতা এই শিশুদের রক্তভুলা অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করে, কত পশুভুলা পিতা সেই পয়সা দিয়ে মদ খায়।

এই সব ছেলে মেয়েরা সত্য সত্যই অতি শিশু। এক একজন এত ছোট যে মার কোল ছাড়বার যোগ্য নয়, তাদের কোলে ক'রে কাজের জায়গায় নিয়ে আসতে হয়, বড় ভাই বোন ছাড়া থাকতে পারে না। সাড়ে তিন বছর হ'তে দশ বছরের ছেলে মেয়েরা এই কাজ করে। যারা সবচেয়ে ছোট তারা কেবল আঠা-লাগান কাগজ, তৈরি বাক্সে লাগায়। ক্রমশঃ কাগজ কাটতে, ভাঁজ করতে, কাগজ লাগাতে, শুকাতে এবং শুণে শুণে প্যাক ক'রতে শেখে। ছোট বড় চারপাঁচ ভাই বোন একসঙ্গে সমস্ত সপ্তাহ খুব পরিশ্রম করলে এক সপ্তাহে প্রায় তিন টাকা উপার্জ্জন করতে পারে।

এই সময়, একজন ধর্ম্মাচার্য্য ঘটনাক্রমে, একটি এই বাক্স-তৈরির জায়গায় গিয়েছিলেন। তিনি চার বছরের মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি কাজ করতে পারে! তার মা বলেছিল সে তিন বছর বয়স হ'তে কাজ করছে, সে যা রোজগার করে, তাতে তাদের ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। এই সব কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে অনেকক্ষণ সেই মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন। তারপর তিনি লিখেছেন, যে সেই চার বছরের শিশু জানে না খেলা কি বস্তু। একটা গাছ, কি ফুল সে দেখে নাই, সে ক্ষুদ্র গলির বাইরে কখনও যায় নাই; তার মুখে হাসি নাই, শরীরে স্ফূর্ত্তি নাই, চোখে জ্যোতি নাই, এক মাত্র চিন্তা বাক্স তৈরি করা। তার শান্ত নিরীহ পরিশ্রান্ত চেহারার পানে চেয়ে মনে হ'ল, হায়, এ অবস্থায় তাকে আর বেশী দিন থাকতে হবে না, পরম জননী শীঘ্রই তাকে বিশ্রাম ও শান্তির রাজ্যে নিয়ে যাবেন। এমন শত সহস্র শিশু র'য়েছে, প্রতিদিন শত শত শিশু প্রাণত্যাগ করছে। সুকোমল শিশু খেতে পায় না, বস্ত্র পায় না, আলো বাতাসও পায় না, কিন্তু তাদের দ্বারা পরিশ্রম করতে হয়। তার ফলে, শতকরা প্রায় ৭০ জন শিশু অকালে প্রাণ হারায়। এক একটি ৬।৭ হাত লম্বা ঘরে আটটি ছেলে এবং মা বাপ বাস করে, এই জন্য এক এক সময় সকলের অসুখ করে; এই ঘরের জন্য মাসে দশ বার টাকা ভাড়া দিতে হয়; সুতরাং পরিবারের খাওয়া পরার উপযুক্ত যথেষ্ট অর্থ থাকে না। কিছু দিন পূর্ব্বে একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম গৃহস্বামীর অসুখ করেছে, আর খানা পাঁউরুটি ছাড়া ঘরে আর কিছু নাই, পয়সাও নাই, কিন্তু কয়েকটি ছেলেপিলে আছে। এ অবস্থা ঘরে ঘরে; খুব কম লোকেরই বিছানা কিম্বা কম্বল আছে।

এইরূপ গৃহে জন্ম গ্রহণ ক'রে, হাজার হাজার শিশু লণ্ডনের গলিতে গলিতে, অনাহারে অনিদ্রায় শীতে, এবং পরিশ্রমে অকালে প্রাণত্যাগ করে; শত শত গৃহে ঘুরে ঘুরে, এই সত্য যখন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল তখন, কয়েকটি নারীর হৃদয় এই অসহায় শিশুদের জন্য কেঁদে উঠল। তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান—কুমারী ম্যাক্-ফারলন্।

ইনি দল বেঁধে পরিবারের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখতে লাগলেন, কোথায় অবস্থা কি রকম। একটি গলির ভিতরে ক্ষুদ্র একটি গৃহে এক দুঃখিনী একটি রক্তহীন মুমূর্ষু শিশু কোলে করে অন্য শিশুদের সঙ্গে দিয়াশলাই এর বাক্স তৈরী করছে। আর একটি গৃহে, এক দুঃখিনী মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে, তার তিনটি শিশু-সন্তান পাশে বসে বাক্স তৈরী করছে; তারা তিনজনে যা উপার্জ্জন করে তাতেই তাদের সকলের দিন চলে। মা শুয়ে শুয়ে ভাবছে,—শীঘ্রই সে তার সন্তানদের এই প্রকাণ্ড সংসারে ফেলে চলে যাবে, তাদের কে দেখবে। আর এক জায়গায়, একটি দশ বছরের ছেলে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ করে, বেশী কাজ থাকলে আরও

রাত্রি জেগে কাজ করতে হয়। কোন কোন ছেলেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এইসব ছেলেদের জীবন শ্রান্তিময়, এদের মন নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এইসব শিশুদের দুঃখ দুর্গতি দূর করা তো সহজ নয়। হাজার হাজার পরিবার, লক্ষ লক্ষ নরনারী পিতামাতা-রূপে, এদের সঙ্গে জড়িত। কেবল তাদের দারিদ্র্য এই দুঃখের কারণ নয়, কত প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুঅভ্যাস, তাদের দুঃখ শতগুণ বর্দ্ধিত ক'রেছে। শিশুদের দুঃখ দূর করতে হ'লে কি করা সম্ভব, এই চিন্তায় কুমারী ম্যাক্‌ফারলন্‌ ও তাঁর বন্ধুগণ বিব্রত হ'য়ে পড়লেন।

অনেক চিন্তার পর স্থির হ'ল, আপাততঃ, মাঝে মাঝে একদিন সন্ধ্যার সময় এই ছেলেমেয়েদের জন্য পেট ভরে খাওয়ার এবং আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করা যাক। এই পরামর্শ অনুসারে, একটি প্রকাণ্ড গৃহে তিন চার শ ছেলের চা এবং অন্যান্য নানা রকম খাদ্য এবং আমোদের ব্যবস্থা করা হ'ল। কয়েকজন সহৃদয় মহিলা পাড়ার এই শিশুদের চা সভার (Tea meeting) সংবাদ দিয়ে শিশুদের আন্‌বার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন সন্ধ্যার পর শিশুদের জননীগণ, সন্তানদের সঙ্গে সেই সভায় উপস্থিত হলেন। প্রায় তিন শ ছেলেমেয়ে, একসঙ্গে খেতে বসল,—ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরিবেশন করে আদর করে তাদের খাওয়ালেন; তারা এই প্রথম সুস্বাদু জিনিষ আস্বাদন করল এবং পেট ভরে খেতে পেল,—তারা খেয়ে তৃপ্ত, তাদের মারা সন্তানদের সুখে আনন্দিত। ছেলেমেয়েরা আনন্দে অধীর। তাদের খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে শিশুদের প্রার্থনাসূচক গান হ'ল, কেও কেও গল্প বল্লেন, কেও উপদেশ দিলেন। অনেক শিশু গানে যোগ দিয়েছিল। তাদের জীবন দুঃখভারে ভারাক্রান্ত, তবুও অনেক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। সবশেষে আনন্দ ধ্বনি করতে করতে সকলে বাড়ী চ'লে গেল।

হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের জন্য একদিন পেটভরে খাওয়ার ও আনন্দ সম্ভোগ করবার ব্যবস্থা ক'রে যে স্বর্গীয় দৃশ্য সকলে দেখলেন, তাতে সকলেরই মনে এই ভাবের উদয় হ'ল যে, এরূপ ব্যবস্থা আরও করতে হবে। তদনুসারে, সকলের চেষ্টায় আবার একদিন অপর একটি বড় স্কুলঘরে পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েদের ডাকা হ'ল। আবার তিন চার শত ছেলেমেয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। ক্রমে ক্রমে সকলে খাবার টেবিলের দুইধারে বেঞ্চে বসতে লাগল। সে কি দৃশ্য! একদিকে তাদের আনন্দে উজ্জ্বল চক্ষু,—অপরদিকে মলিন বেশ, জীর্ণ শীর্ণ দেহ। বড় ভাই বোনেরা কত যত্ন ক'রে ছোট ভাই বোনদের কাছে বসাচ্ছে, কত বোঝাচ্ছে! যারা ছোট তাদের কয়েক জনের বয়স মাত্র দাড়ে তিন বৎসর। সাড়ে তিন বছরের শিশু খেটে খায়, পয়সা রোজগার করে,—কি ভয়ানক কথা! এদের পক্ষে এ জীবন যন্ত্রণাময় কারাবাস। তাই এই নিমন্ত্রণ সভায় এসে, আলো বাতাস, খাবার জিনিষ, আনন্দ এবং সকলের আদর দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেল।

মহিলাগণ পরিবেশন করতে লাগলেন। রুটি মাখন বিস্কুট পিঠা চা প্রভৃতি সকলকে দিতে লাগলেন। একটি ছেলে একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল—"আমার একটি খোকা ভাই আছে, আমার রুটি ও মাখন তাকে আমি না খেয়ে তার জন্য নিয়ে গেলে কি আপনি রাগ করবেন?" এই কথা শুনে আরও অনেক শিশু হাত তুলে সেই কথা বলতে লাগল। কেও বলে—"আমার মার জন্য পিঠাটুকু নিয়ে যাব", কেও বলে—"আমাদের বোনের জন্য রুটিটুকু নিয়েযাব", এবং সকলেই নিজের অংশটুকু একটা কাগজে জড়িয়ে নিবার জন্য কাগজ চাইতে লাগল। তখন পরিবেশনকারিণীগণ বল্লেন—"তোমাদের অংশ তোমরা খাও। তোমরা যখন বাড়ী যাবে, তখন আর একটুকরা করে দেব, তাই নিয়ে যেও।"

খাওয়া শেষ হলে, ধন্য বিষয়ক সঙ্গীত হ'ল, তারাও অনেকে আনন্দের সঙ্গে সেই গানে যোগ দিয়েছিল। তারপর ছায়াচিত্র (Magic lantern) দেখিয়ে তাদের উপদেশ দেওয়া হ'ল: আবার গান হ'ল, তারপর কেও

কেও তাদের উপদেশ দিলেন। তারপর আবার প্রার্থনা-সঙ্গীত করে সভা শেষ হ'ল।

এই সভায় উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে একজন দুইদিন অনাহারে ছিল; একজনের মা বাপ কেও ছিল না সে রাস্তায় পড়ে থাকত। এদের জন্য অনেকে পুরোনো জামা কাপড়, বই, জুতা, খেলনা এবং আরও অনেক জিনিষ পাঠিয়েছিলেন। মহিলাগণ অবস্থা অনুসারে সে সকল বিতরণ ক'রে দিলেন; খাওয়ার সময় এইসব জিনিষ পেয়ে ছেলেদের আনন্দ শতগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল।

ছেলেদের জন্য এমন সভাসমিতি করবার সঙ্গে সঙ্গেই কুমারী ম্যাক্‌ফারসন্ অনুভব করতে লাগলেন, যে মা-দের অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে, কোন স্থায়ী সুফল হবে না। এই চিন্তা করে তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে এই সব সন্তানদের মা-দের জন্যও, ঠিক এমনি সভার আয়োজন করতে লাগলেন। এই সভাতেও দুঃখিনী মা-দের প্রথমে খেতে দিয়ে, তারপর তাদের শিক্ষণীয়, তাদের কাজে লাগবে এমন বিষয়ে কথাবার্ত্তা ব'লে উপদেশ দিতে লাগলেন। ঘরবাড়ী কেমন ক'রে পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাখা যায়, আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়, ছেলেদের কেমন ক'রে পালন করতে হয়—এই সব বিষয়ে কাজের কথা ব'লতেন, এবং সভার শেষে অতি প্রয়োজনীয় সংসারের জিনিষপত্র অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করতেন। এইসব গরিব মেয়েরা অনেকেই লেখাপড়া জানত না, অনেকে শিখতেও চাইত না।

এদের জন্য কি করা যায়,—এ বিষয়ে অনেক চিন্তা ক'রে, কুমারী ম্যাক্‌ফারসন্ তিন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন:—

(১) শুনে শেখা (২) পড়ে শেখা, এবং (৩) পড়তে শেখা। রবিবার বৈকালে প্রায় দুইঘণ্টা মায়েদের এবং সন্ধ্যার সময় সন্তানদের শিক্ষার ভার করতে লাগলেন। সন্তানদের শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মায়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, পরিচ্ছদ দিতেন, জুতো দিতেন। এইজন্য তিনি সাধারণের কাছে আবেদন করতেন এবং ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন। ক্রমশ শত শত টাকা, শত শত জুতো মোজা তাঁর হাতে আসতে লাগল। সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁর পাঁচ শ ছেলের খাওয়ার এবং পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

শুধু লেখাপড়া শেখান নয়, বই কাপড় পেন্সিল দেওয়া; শুধু তাই নয়, খেতে দেওয়া; কেবল তাই নয়, জুতো মোজা দেওয়া; এবং কেবল ছেলেমেয়েদের জন্য এসব করা নয়,—তাদের দুঃখিনী মায়ের জন্যও এমনি ক'রে, শিশুদের মত ক'রে, পড়া খাওয়া, বস্ত্রপরিচ্ছদ, এমন কি বিছানার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা, একেই বলে প্রেম, সেবা, হিত সাধন।

কেও কেও বলবেন, এত দয়া করলে, গরিবদের বাবু ক'রে দেওয়া হবে। কিন্তু যাদের সত্যসত্যই পরবার কাপড় নাই, শোবার বিছানা নাই, খাওয়ার সংস্থান নাই, তাদের জন্য কেবল পড়ার স্কুল করলে কি হবে। শত শত গরিবের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে, কুমারী ম্যাক্‌ফারসন্ সকলের সাহায্য চাইতে লাগলেন, তার ফলে, ভদ্রপরিবারের বালকবালিকারা পর্য্যন্ত নানা ভাবে সাহায্য পাঠাতে লাগল। একটি ছেলে স্কুলে পড়ত; সে স্বয়ং চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনে প্রায় দুই টাকা জমিয়েছিল এবং অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় ২০৲ টাকা পাঠিয়ে লিখেছিল—"গরিব ছেলেমেয়েদের খাওয়ার জন্য এই টাকা পাঠালাম।" একটি পাঁচ বছরের মেয়ে লিখেছিল—"আমার চিনির দাম, আমার হাত-খরচের কিছু টাকা, আর মা আমাকে কিছু দিয়েছেন, এই তিন মিলিয়ে কিছু টাকা পাঠালাম, এ দিয়ে জুতো কিনে দিবেন। কয়েক-দিন পরে আরও টাকা পাঠাব।" একটি বার বছরের মেয়ে লিখেছিল—"আমার মা নাই, আমি আমার বাবার কাছে থাকি। তাঁরা আমাকে যে পয়সা দেন, তাহ'তে ৭৷০ টাকা জমিয়েছি, তাই পাঠালাম। ভগবান তোমা-দের মঙ্গল করুন।" একজন মহিলা লিখলেন "আমার ছোট ছেলে, গরিব ছেলেমেয়েদের বিষয় শুনে অবধি তার ঘরে রাত্রে আলো জ্বলতে দেয় না; বলে এই আলোর জন্য রোজ এক আনা খরচ হয়, সেই পয়সা প্রতি মাসের শেষে আপনার কাছে পাঠাবে। পূর্ব্বে

সে সমস্ত রাত্রি ঘরে আলো না জ্বেলে শুতে চাইত না।" এমন শত শত পত্র এবং টাকা আসতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রথমে বহুদিন তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হ'য়েছিল।

ক্রমশ তিনি স্থায়ী সাজ্য স্থাপন ক'রে, তাতে কেবল লেখাপড়া নয়, সেলাই, মোজা তৈরি করা প্রভৃতি হাতের কাজ শিখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরিব মেয়েদিগকে গৃহস্থ-বাড়ীর কাজ করবার যোগ্য শিক্ষা দিয়ে, বস্ত্রাদি দিয়ে, কাজ জুটিয়ে দিতে লাগ্‌লেন এবং তাদের জন্য পোষাক ও জুতা প্রভৃতি তৈরির এবং আরো অনেক রকম কারখানা করে, স্থায়ী শিক্ষালয় ও বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত ক'রে, শত শত পরিবারের এবং হাজার হাজার শিশুর জীবনের পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন।

বীর বিক্রম

(একটা ভগ্ন দণ্ড হস্তে দ্রুত রবিভদ্রের প্রবেশ)

রবি। রক্ষা কর যোদ্ধাগণ, বাঁচাও আমাকে!

বিক্রম। ভয় নাই, ভয় নাই, কি হয়েছে তোমার?

রবি। রক্ষা কর বীরগণ, বীরধর্ম্ম পালন কর, সহদেবের সৈন্যগণ আমার প্রাণবধ করবার জন্য আসছে।

বিক্রম। সহদেবের সৈন্যগণ?

বলবন্ত। নিশ্চয় তুমি তার কোনো অনিষ্ট করেছ! নচেৎ—

রবিভদ্র। দোহাই, আমি অন্যায় কিছু করি নি। সহদেব আমার নিকট দূত পাঠিয়েছিল, সে দূত আমায় অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, তাই আমি তাকে বধ করি।

বিক্রম। দূত অবধ্য, তাকে বধ করবার তোমার কোন অধিকার ছিল না তুমি অন্যায় করেছ।

রবিভদ্র। রক্ষা করুন আমাকে বীর, আমি আশ্রিত,—

বলবন্ত। তুমি নরাধম, তোমাকে আশ্রয় দেওয়াও পাপ। আমি আবাল্য সহদেবকে জানি, সে শান্তিপ্রিয়, নিরপরাধকে সে শাস্তি দিতে অগ্রসর হবে,—এ অসম্ভব!

রবিভদ্র। দোহাই, আমি আশ্রিত; সহদেব আমাকে ক্ষমা করেছিলেন—কিন্তু আমাদের রণচণ্ডী রাণী মালবিকা,—তারই—

তরলিকা। মালবিকা?

বিক্রম। মালবিকা?—তা হবে। সে ছেলেবেলা হতেই তেজস্বিনী,—ক্ষমা সে জানে না!

রবিভদ্র। আমি ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলুম—সহদেব স্বীকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু রাণী মালবিকা,—অগ্নিময়ী রমণী সে। মালবিকা প্রতিজ্ঞা করেছেন,—

(কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে লইয়া সহদেব প্রবেশ করিলেন এবং বলবন্ত বিক্রম ইত্যাদিকে দেখিয়া পশ্চাৎ হটিয়া দাঁড়াইলেন।)

সহদেব। (সবিস্ময়ে) সিংহলরাজ বিক্রমসিংহ!

বিক্রম। (গম্ভীর ভাবে) হাঁ আমি বিক্রমসিংহ।

সহদেব। যদি বন্ধুভাবে এসে থাকেন,—আমার দীন-কুটীর আপনার পদধূলিতে পবিত্র হবে।

বিক্রম। আমাকে বন্ধু বা শত্রু করা এখন তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর করছে, সহদেব!

বলবন্ত। সহদেব—ভাই!—

সহদেব। বলবন্ত—বন্ধু,—(আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন) সিংহলরাজ, বলবন্ত যখন আপনার সঙ্গে তখন আপনি শত্রুভাবে আসেন নি—নিশ্চয়! আমি অনুমান করতে পারি, আপনি কেন এসেছেন, আপনি মালবিকা-হরণের প্রতিশোধ নিতে এসেছেন।

বিক্রম। তুমি ঠিক অনুমান করেছ সহদেব; মালবিকাকে অপহরণ করে এনে তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছ, তুমি এর জন্য দণ্ড পেতে বাধ্য। যদি না দও—

সহদেব। বলুন আমায় কি দণ্ড দিতে হবে; যদি তাতে আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

বলবন্ত। ঠিক আমি যা মনে করেছিলাম,—উদার মহৎহৃদয় সহদেব। সিংহলরাজও তোমার প্রতি অন্যায় করবেন না সহদেব!

সহদেব। সিংহলরাজ মহৎ।

বিক্রম। অন্যায় আমি কেন কর্ত্তে যাব? দেশের নিয়ম মতে আমার সম্মান রক্ষা হউক, তোমরা সুখে থাক-এই আমার ইচ্ছা। কিন্তু তার আগে একে দেখ। (রবিভদ্রকে দেখাইয়া) একে তুমি চিন সহদেব?

সহদেব। চিনি না? এ আমার বিদ্রোহী সামন্ত, আমার ঘোর শত্রু।

বিক্রম। এ আমার আশ্রয় নিয়েছে সহদেব, বিশেষতঃ এ যখন ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছে,—

সহদেব। কেন আমি ত ওকে ওর অপরাধ সত্ত্বেও অনেক আগেই ক্ষমা করেছি।

রবিভদ্র। কিন্তু রাণী-মা আমাকে ক্ষমা করছেন না প্রভু। আপনি আজ প্রাতে রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি সৈন্য নিয়ে নিজে আমার ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করেছেন—এখন আমার প্রাণ নিতে চান।

সহদেব। সত্যি বলছো তুমি? মালবিকা নিজে?—

রবিভদ্র। প্রত্যেক বর্ণ সত্য প্রভু।

বিক্রম। এরি জন্য এ বেচারা আমার আশ্রয় নিয়েছে সহদেব। বিপন্নকে আশ্রয় দান করা বীরধর্ম্ম।

সহদেব। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) সিংহলরাজ, আপনি মহৎ; আপনার আশ্রিতের কোন বিপদ হবে না। রবিভদ্র! আজ হতে তুমি আবার পূর্ব্বের মত আমার অধীন সামন্ত, তোমার কোনো ভয় নাই।

রবিভদ্র। যথা আজ্ঞা প্রভু। (অবনত মস্তকে প্রণাম করিল)

বলবন্ত। (পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দেখ তো কে আস্‌ছে?

সহদেব। (অসন্তুষ্টভাবে) এ যে মালবিকা?

বিক্রম। সৈন্য সঙ্গে কেন?

রবিভদ্র। (ভয়ে) রক্ষা করুন, রাণী মা আমার খোঁজে আস্‌ছেন!

(কয়েক জন সৈন্যসঙ্গে মালবিকা প্রবেশ করিল। তাহারি পরিধানে আটা পোষাক, হস্তে বর্শা)

মালবিকা। (সহসা থামিয়া) অনেক লোক দেখছি!

চন্দ্রলিকা। মালবিকা—বোন,—(আবেগে)

মালবিকা। (শান্তভাবে) চন্দ্রলিকা, তুমি? তুমি এসেছ, আমি শুনেছিলাম। (দণ্ডায়মান সকলের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মালবিকা ধীরে অগ্রসর হইল) চোলরাজ এবং রবিভদ্র: সিংহলরাজ এবং তার পুত্রগণ, আর—(সহসা বলবন্তকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল)—অনেককে দেখ্‌ছি। কিন্তু কে শত্রু কে মিত্র কিছুই জানি না,—

বিক্রম। এখানে সকলেই তোমার মিত্র, মালবিকা!

মালবিকা। আমার যে, সে রবিভদ্রকে বন্দী করে আমার হাতে সমর্পণ করুক।

বিক্রম। তার কোন দরকার নেই, মালবিকা।

সহদেব। আমি রবিভদ্রকে ক্ষমা করেছি মালবিকা!

মালবিকা। (চক্ষুদ্বয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধ দমন করিয়া ঘৃণার স্বরে) ক্ষমা করেছ? রবিভদ্রের অনেক বল জুটেছে দেখতে পাচ্ছি, তাই দেখে তুমি ক্ষমা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করেছ, নয়?

সহদেব। ব্যঙ্গের কোন প্রয়োজন নেই (দৃঢ়স্বরে) রবিভদ্রের সঙ্গে আমার আর কোন বিবাদ নাই। আমি তাকে ক্ষমা করেছি।

মালবিকা। (ক্রোধ দমন করিয়া)—ক্ষমা করেছ? —বেশ তাই হ'ক,—তবে ত সব বিবাদ মিটেই গিয়েছে,—আর কি!

বিক্রম। তুমি আস্‌বার আগে আর একটা বিবাদেরও মীমাংসার কথা হচ্ছিল মালবিকা।

মালবিকা। কোন্ বিবাদ?—তোমার আর চোলরাজের বিবাদ?

বিক্রম। তোমার বিষয় নিয়েই বিবাদ—তুমি জানো তা। তারই কথা হচ্ছিল।

মালবিকা। সব জানি আমি, কিন্তু তুমি সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে চোলরাজকে ভয় দেখিয়ে যে বিবাদ মিটাবে, তা মনেও করো না! চোলরাজ্য আজও এত দুর্ব্বল হয় নি! তুমি এখানে একাকী চোলরাজের অতিথি হয়ে এলে বরং সহজে বিবাদের মীমাংসা হতে পারত।

সহদেব। সিংহলরাজ আর তার পুত্রগণ বন্ধুভাবেই এসেছেন, মালবিকা।

মালবিকা। হতে পারে, কিন্তু লোকে অন্য রকম বলছে। আর কারও তোমার সিংহলরাজের এই ভাবকে বন্ধুভাব বলে ধারণা হয় নাই। যখনি শুনা গেল যে সিংহলরাজ রণতরী নিয়ে চোল উপকূলে উপস্থিত হয়েছেন, অমঙ্গল আশঙ্কায় তখনি তুমি তোমার পুত্রকে পাণ্ড্যদেশে পাঠিয়ে দিয়েছ। চোলরাজের মতগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বদলে যায়,—নয় ?

বলবন্ত। তুমি অমরকে পাণ্ড্যদেশে পাঠিয়ে দিয়েছ, সহদেব ?

সহদেব। হাঁ, আমরা মনে করেছিলাম, যদি সিংহলরাজ চোলদেশ আক্রমণও করেন তবু অমর পাণ্ড্যদেশে নিরাপদে থাকবে।

বিক্রম। (গম্ভীর ভাবে) তুমি আমাদের বিবাদ মীমাংসায় যে রকম ভাবে বাধা দিচ্ছ, তাতে মনে হয় অমরকে পাঠিয়ে দিয়ে সহদেব ঠিক কাজই করেছে! এ চাট্টা নয় মালবিকা—

মালবিকা। ভাগ্যে যা আছে তা ফলবে, তার জন্য চিন্তা কি ? কিন্তু তাই বলে অপমান স্বীকার করে বিবাদ মীমাংসা কর্ত্তে হবে ? তার চেয়ে শতবার মরণ ভাল।

তরলিকা। তুমি অন্যায় বলছ মালবিকা। আমার প্রভু তার নিজের অপরাধের জন্য উপযুক্ত দণ্ড দিয়েছেন, তাই বলে তা কি ভীরুতার কাজ হয়েছে ?

মালবিকা। তোমার প্রভুর সম্মান কিসে বজায় থাকে তা তিনিই ভাল জানেন।

বলবন্ত। (ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া) বলবন্তকে কারো সম্মান রক্ষা শিখাতে হবে না। সমস্ত দাক্ষিণাত্যের লোক জানে—বলবন্ত ভীরু নয়।

মালবিকা।—এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যের লোকে জানে যে সহদেবও ভীরু নয়। বলবন্ত বীর হতে পারে, কিন্তু চোলরাজ—যে আমার দরজায় সেই ভয়ঙ্কর শেত ভল্লুকের প্রাণ সংহার করেছিল, সে মহাবীর!

সহদেব। (বিপন্ন ভাবে) আঃ—থামো মালবিকা, যথেষ্ট হয়েছে,—

বিক্রম। সত্যই, সে বড়ই দুঃসাহসিক কাজ করেছিল সহদেব—সমস্ত সিংহল তোমার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল—তাই—

বলবন্ত। তাই তো বিবাদ মীমাংসায় সহদেবের সম্মানহানি হবার সম্ভাবনা আরো কম।

মালবিকা। চোলরাজ যদি দণ্ড মেনে নেন তবে আর এক দণ্ড দাবী করবার অধিকারও তার রয়েছে। মনে আছে চোলরাজ, তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ?

সহদেব। তুমি কি সে প্রতিজ্ঞাপালন করাতে চাও, মালবিকা ?— আমি অন্যায় ক্রোধে সে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম।

মালবিকা। ন্যায় অন্যায় আমি বুঝি না, যদি এর পরে তোমায় আমার এক বাড়ীতে থাকতে হয়, যদি তুমি ধর্ম্মপত্নী বলে আমার উপর এর পর থেকে কিছুমাত্র দাবী রাখতে চাও তবে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞাপালন করবে—নচেৎ তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। (ফিরিয়া) শুন সিংহলরাজ, তোমার পালিতা কন্যাহরণের জন্য যদি তুমি চোলরাজের দণ্ডবিধান কর্ত্তে চাও, তবে আমার পিতা গোকুলসিংহকে বধ করার জন্য এবং তার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণের জন্য তোমারো দণ্ড দিতে হবে।

বিক্রম। রণক্ষেত্রে, ধর্ম্মযুদ্ধে গোকুল নিহত হয়েছিল, তার জন্য আমি দায়ী নই। তুমি তখন ছোট ছিলে, তোমার আত্মীয়গণ তোমাকে অনাথিনী বলে পরিচয় দিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দেয়, আর আমি তোমাকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করি। পরিচয় গোপন করে শত্রু-কন্যাকে আমার পালিত কন্যারূপে গ্রহণ করানোতে বরং তোমার আত্মীয়গণ আমার প্রতি গুরুতর অন্যায় করেছেন। গোকুল সিংহের কন্যা বলে জানলে আমি তোমাকে নিশ্চয় গ্রহণ কর্ত্তেম না।

মালবিকা। অন্যায় ?—তোমার প্রতি যে মহৎ সম্মান করা হয়েছিল।

বিক্রম। তুমি এসে অবধি আমার অশান্তি ও বিপদ ভিন্ন আর কিছুই হয়নি।

মালবিকা। আরো বেশী বিপদ হতে পারে যদি তুমি এখন—

বিক্রম। (ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া) ভের হয়েছে,—আমি এখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করতে আসি নাই। সহদেব,—আমি জানতে চাই তুমি দণ্ড মেনে নেবে কি না?

মালবিকা। চোলরাজ, মনে কর তোমার সেই প্রতিজ্ঞা—

সহদেব। সিংহলরাজ, আপনি শুনেছেন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি—

বিক্রম। (উত্যক্ত ভাবে) যথেষ্ট শুনেছি, বিক্রম সিংহ স্বয়ং যুদ্ধে বধ করার জন্য দণ্ড দিয়েছে এ কেউ কোন কালে শুনবে না!

মালবিকা। (গর্ব্বিত স্বরে) তবে তোমার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করলুম!

বিক্রম। (ক্রমশঃ তাঁহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল) গোকুলের মৃত্যুর জন্য দণ্ড চাহিতে পারে এখানে এমন কে আছে? তার আত্মীয়দের সেই অধিকার ছিল বটে কিন্তু তারা সব মরে গেছে। কে এখন গোকুলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে আমি জানতে চাই!

মালবিকা। চোলরাজ করবে, আমার পক্ষ হয়ে।

বিক্রম। চোলরাজ? হাঁ চোলরাজের সে অধিকার থাকত,—যদি সে তোমাকে তোমার পালয়িতার অনুমতি নিয়ে ধর্ম্ম অনুসারে বিবাহ কর্ত্ত, অথবা তোমাকে হরণ করে আনার জন্য দণ্ড স্বীকার করত, তবে তার গোকুলের পক্ষে দাঁড়াবার অধিকার হ'ত কিন্তু—

তরলিকা। বাবা, বাবা—বলোনা বলোনা—

বলবন্ত। ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হবেন না সিংহল-রাজ—

বিক্রম। আমি শতবার বলব, আমি চীৎকার করে বলব—অপদস্থত রমণী উপপত্নী মাত্র!

সহদেব। (আবেগে) সিংহলরাজ—

মালবিকা। (চীৎকার করিয়া) অপমান, ঘোর অপমান—এখনো স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দেখছ চোলরাজ! তোমাকে ঐর জন্য একদিন অনুতাপ কর্ত্তে হবে সিংহল-রাজ!

বিক্রম। আমি আবার বলব,—অপদস্থতা রমণী উপপত্নী। যদি তোমার চোল-রাজের পত্নী বলে পরিচয় দেবার অধিকার পেতে ইচ্ছা থাকে, তবে—

মালবিকা। (ক্রোধ দমন করিয়া) না সিংহলরাজ, আমি আমার অবস্থা বুঝি,—আমি বাস্তবিকই চোল-রাজের উপপত্নী, নচেৎ চোলরাজ দাঁড়িয়ে আমার এমন অপমান দেখেন! কিন্তু সাবধান সিংহলরাজ, তুমি ফণিনীর লাঙ্গুলে পা দিয়েছ, এখন থেকে জেনো প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদ তোমার পশ্চাতে ঘুরছে। (ফিরিয়া) আর রবিভদ্র,—সিংহলরাজ তোমার পক্ষ নিয়েছেন, আমি দেখে নিব, তুমি চোলদেশে কোথায় নিরাপদে থাক!—

সহদেব। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলে মালবিকা?—

তরলিকা। বোন্, যেওনা বোন, যেওনা,—বাবার রাগ এখনি পড়ে যাবে, আমি বাবাকে শান্ত করছি—

মালবিকা। চল এখান থেকে চোলরাজ! দাঁড়িয়ে কি দেখছ কাপুরুষ, তোমার উপপত্নী বলে পরিচিত করবার জন্যই কি আমায় সিংহল থেকে এনেছিলে; হায়! তার আগে আমার মরণ হল না কেন? তুমি সিংহলে আমার কক্ষদ্বারে ভীষণ শ্বেত ভল্লুককে মেরেছিলে, সমস্ত সিংহল তোমার যশোগানে ভরে গিয়েছিল! আর আজ কি তুমি এমনি শক্তিশূন্য হয়েছ যে তোমার পুত্রের মাতার অপমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ, একখানা হাত তুলতেও সাহস হচ্ছে না—কাপুরুষ!—

(নিষ্ক্রান্ত হইল)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষা

শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের অভিমত

জ্ঞান-শিক্ষা বা পড়াশুনার সঙ্গে খোলা জায়গায় পরিশ্রমজনক খেলা ও ব্যায়াম যুক্ত থাকলে সকল প্রকার শক্তি এবং সাহস বাড়ে, কোন একটা বিষয়কে আপনার আয়ত্ত ক'রবার শক্তি জাগে। ইংলণ্ডের মহিলাগণ নানাপ্রকার অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম ক'রে যে

শক্তি লাভ ক'রেছেন, তার তুলনায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের ইংরাজ-নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, দুর্ব্বলতাই যেন তখনকার মেয়েদের ভূষণ ছিল! বহু পূর্ব্বের ইংরাজ-মহিলাগণ এবং মহাভারতের যুগের, রাজপুতানার এবং মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার সময়ের ভারত-মহিলাগণও, শক্তি ও সাহসের আদর্শস্থল ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতনারীর জীবনের উপর দিয়ে মহাপরিবর্ত্তনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; তা'তে তাদের হৃদয়ে নূতন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। কত স্থানে বহুসংখ্যক মহিলা মহিলাদের বক্তৃতা শুন্‌বার জন্য সভায় যাচ্ছেন, এবং মহিলা-বক্তাদের বক্তৃতাও পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ—ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব এবং ইংরাজ নারীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। কিন্তু ভারতনারী চিরদিনই এখনকার মত জাতীয় সমস্ত সকল হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, গৃহকোণে বাস করতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েকজন বিশেষ শক্তিশালিনী নারী স্বদেশের পালন ও শাসনকর্ত্রী ছিলেন। মহারাষ্ট্র মহিলাদের পাঠসমিতি, শিল্পসমিতি, বক্তৃতা-সভা প্রভৃতি নানা প্রকার সভা সমিতি ক্লাব দেশময় ছড়ান; এসব সভায় মেয়েরা স্বাধীন ভাবে মিলে মিশে আপনাদের উন্নতি সাধন করে। বাঙ্গলা দেশে পর্দ্দা আছে, সেখানকার স্ত্রী-শিক্ষা হয় শাস্ত্রপাঠ ব্যাখ্যা ও কথকতা প্রভৃতির দ্বারা। শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট দেখে যারা স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা নির্ণয় করে, তারা ভুল করে।

শিক্ষা ও সমাজে দুইদিক দিয়ে ইংরাজ জাতির প্রভাব ভারত-নারীর উপর কাজ ক'রেছে। ইংরাজের সামাজিক প্রভাব একবারে নির্দ্দোষ নয়। এদেশের মেয়েরা যখন হঠাৎ ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ভদ্র অভদ্র, সব মিশ্রিত ভারত-প্রবাসী ইংরাজ-মহিলাদের সঙ্গে মেশে, তখন, (অনভিজ্ঞতার জন্য) তারা বুঝতে পারে না যে ইংরাজ-সমাজের কি ভাল আর মন্দ; তারা যা দেখে তাই অনুকরণীয় মনে করে। এর ফল সব সময় ভাল হয় না। এদেশের মেয়েরা যদি তাদের নিজেদের সুরুচি এবং স্বাধীন বিচার শক্তির অনুকরণ করে, তাহলে আর কোন ভয় থাকে না: কিন্তু অনেক সময় অনুকরণ-প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তার ফলে তারা নানা প্রকার অশোভন অথচ ব্যয়বহুল পরিচ্ছদের সৃষ্টি করে। এসব দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিস্তার। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি আর নাই; এখন অনেক ভেবে, চিন্তা ক'রে নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করতে হবে।

ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, বিস্তার ও পরিচালন ভারতবাসীর দ্বারা হওয়া উচিত। তা না হ'লে দেশের মর্ম্মস্থলে কালী পড়বে, মেয়েরা ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাব বর্জ্জিত হবে। এদেশের মেয়েদের ধর্ম্ম ধারণার মধ্যে উজ্জ্বল জ্ঞান, এবং স্পষ্ট অনুভূতি নাই: সত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা তারা বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের শিখান হয় কেবল কতগুলা বাঁধা ক্রিয়া-কলাপ: সেগুলা তারা অন্ধভাবে ক'রে যায়। "ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান যোগ কর।" মেয়েদের শিক্ষার যে ব্যবস্থাই হোক না কেন, ধর্ম্মের উন্নত আধ্যাত্মিকতা এর গোড়ায় থাকা উচিত। এই ধর্ম্মভাব যদি অন্তরে না থাকে ভারতবর্ষ শ্মশানতুল্য হবে।

স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে, স্বদেশ প্রেম এবং মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য বোধ এবং তার দুঃখ দূর ক'রবার জন্য স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিতে হবে। ভারতের ইতিহাস এই শিক্ষার উপকরণে পরিপূর্ণ। * * *

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতের ইতিহাস, ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র, ভারতের কাব্য, ভারতের শিল্প প্রভৃতিরই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করা উচিত।

স্ত্রীশিক্ষা কেবল বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত না হয়ে যদি আরও বেশী কিছু হয়, তা হলে বাল্যবিবাহ একবারে দূর করা আবশ্যক। ৭—৮, ৯—১০, ১১—১২ বছরের বালিকার যদি বিয়ে হয়, আর ১৩-১৪ বছর বয়সেই যদি তারা মা হয়, তা হলে তারা কখন কি শিখবে? শৈশব উত্তীর্ণ না হতে কোলে শিশু এলে—শিক্ষার কথা না বলাই ভাল। বাল্যবিবাহ যে কি প্রকার জঘন্য ব্যাপার, অভ্যাস ও দেশাচারের অন্ধতায় তা এ দেশের লোক বুঝতেই পারে না। অসহায় বালিকাদিগকে টাকা দিয়ে কেনা পাত্রদের হাতে ক্রীতদাসীর মত

দেওয়া হয়। বালিকারা যেন ঘটি বাটীর মত বস্তু-বিশেষ! এ অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন এ দেশের উঠবার আশা নাই।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, খাদ্য-পাক, গৃহ চিকিৎসা, দুর্ঘটনার প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। সাংসারিক ব্যাপার অসচালনাও বাদ দেওয়া উচিত নয়। যারা উচ্চশিক্ষা চায়, তাদের সংখ্যা কম, তারা সাধারণ কলেজেই পড়বে।

সম্ভব হলে মেয়েরা বাড়ী হতে এসে স্কুলে পড়ে যাবে, এই ব্যবস্থাই ভাল। স্কুলের বোর্ডিংএ যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। যদি কোথাও মেয়েদের বোর্ডিং করতে হয়, তা হলে ভদ্রবংশের কোন বয়স্কা মাতৃস্থানীয়া নারীর হাতে তার ভার দেওয়া উচিত। তিনি মেয়েদের মা হবেন এবং মেয়েরা ঠিক বাড়ীর মত থাকবে, এমন হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—নরনারী একত্রে এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তার চেষ্টা করলে, এ দেশের বালিকাগণ মনস্বিনী নারী হ'য়ে উঠবেন। ভারত-মহিলা কি ছিলেন, তা আমরা জানি, এখনও সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁরা যে কি তা দেখছি—জগতে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রমণী কোন দেশে নাই। আমরা আশা করি ভবিষ্যৎ ভারত-মহিলা জ্ঞানে গার্গী, সাহসে সাবিত্রী, প্রেমে সীতা, সহিষ্ণুতায় দময়ন্তী, এবং বিশ্বস্ততায় শকুন্তলার মত হবে।

রায় মহাশয়

নক্সা

(১)

আমাদের গ্রামে পরাণ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এখন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁর বয়স প্রায় নব্বই বৎসরের কাছাকাছি হইত। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। আমরা তাঁহাকে গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুর্দ্দা বলিতাম, গ্রামের সাধারণ লোক তাঁহাকে রায় মহাশয় বলিত। রায় মহাশয় বড় 'র'ঙড়ে' লোক ছিলেন। তিনি নানা প্রকার মজার গল্প বলিয়া আমাদিগকে খুব হাসাইতেন। এক এক সময় হাসির চোটে পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। রায় মহাশয়ের গল্প শুনিয়া অন্যে হাসিয়া লুটাপুটি হইলেও তিনি নিজে কখনও হাসিতেন না। তাঁর গল্প বলিবার ভঙ্গিটি ছিল বড় সুন্দর। তাঁর গল্প প্রায়ই চুটকি; কিন্তু তিনি সেই গল্প এমন রসান দিয়া, এমন অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিতেন যে ছোট একটী গল্প বলিতে অনেক সময় লাগিত। রায় মহাশয় সেই সম্প্রদায়ের রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহাদের পুত্রদের বিবাহে অনেক টাকা লাগে। রায় মহাশয় টাকা যোগাড় করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সে সময়ে আমাদের গ্রামে রায় মহাশয়ের তুল্য অবিবাহিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। বিবাহ করেন নাই বা হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাদিগকে ভীষ্ম বলিতেন। আমরা তখন বুঝিতে পারিতাম না যে ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াকে যে অর্থে পক্ষীরাজ ঘোড়া বলা হয়, গরুর গাড়ীকে যে অর্থে পুষ্পক রথ বলা হয়, রায় মহাশয়-বর্গকে অনেকটা সেই শ্লেষাত্মক অর্থেই ভীষ্ম বলা হইত।

রায় মহাশয় লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না। এমন কি নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। কেমন করিয়া মুখে মুখে শটকে কড়া গণ্ডা প্রভৃতি বাজার হিসাব শিখিয়াছিলেন। এবং অনবরত ভদ্রসমাজে মিশিতেন বলিয়া লেখাপড়া না জানার দরুণ যে অভাব তার কতকটা পূরণ হইয়াছিল। তিনি চলনসই কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন; ঠাকুর পূজার মন্ত্রাদি জানিতেন। এসমস্তই অন্যের নিকট শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন।

রায় মহাশয়ের কিছু ধোত ও কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। তাহাতেই তাঁর ক্ষুদ্র সংসারের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত। ইহা ছাড়া রায় মহাশয় তাঁর পরাণের এক মহান্ত মহারাজদিগের বাটীতে মহাপ্রভু-গৌরাঙ্গের

বিগ্রহের পূজারীর কার্য্য মধ্যে মধ্যে করিতেন। তাঁহাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধিতে হইত। পূর্ব্বোক্ত মহান্ত মহারাজেরা পরম বৈষ্ণব। কেহ কেহ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এমন নিন্দাও করিতেন যে বৈষ্ণবত্বের হানি হইবার ভয়ে তাঁরা বেল পাতার নাম করেন না "কালী মায়ের নাম লন না, হাট করেন না কালীগঞ্জের হাটে।" প্রকৃত পক্ষে ইহা শত্রুপক্ষের রটনা। তবে একথা ঠিক যে তাঁরা এমন লোকের হাতের রাঁধা জিনিষ খান না যাঁর গলায় কাঠের মালা নাই।

রায় মহাশয় পাঁঠা খাইতেন এবং সকল সময়ে তাঁর গলায় বৈষ্ণবত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ কাঠের মালা থাকিত না। তবে তিনি মহান্ত মহারাজদিগের বাটীতে মহাপ্রভুর ভোগ রাঁধিতে যাইবার সময় গলায় কাঠের মালা দিয়া তিলক কাটিয়া পরম বৈষ্ণব সাজিয়া যাইতেন।

পূজারী ব্রাহ্মণ বলিলে আজকাল যেমন অনেকটা পরিচারক ভৃত্য বলিয়া মনে হয় পূর্ব্বে পূজারী ব্রাহ্মণদের পদমর্য্যাদা তেমন হীন হয় নাই। বড় লোকদের বাটীতে বাটীতে বিগ্রহের নিত্য সেবার ভোগ রাঁধিবার জন্য যে সকল পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মুনিবেরা অনেকটা সদয় ব্যবহার করিতেন। রায় মহাশয় ত তাঁর মুনিব মহান্ত মহারাজদিগের সহিত সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের মজলিসে বসিতেন, ও নানা প্রকার খোসগল্প করিয়া মজলিস্ সর্ব্ব সরস রাখিতেন। মহান্ত মহারাজদিগের মধ্যে সেই সময় যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা রায় মহাশয়কে ভালবাসিতেন। ইহার প্রথম কারণ রায় মহাশয় অতিশয় পরিহাস-রসিক লোক ছিলেন, দ্বিতীয় কারণ তিনি রন্ধন-বিদ্যা পারদর্শী ছিলেন। রায় মহাশয় আমাদিগকে প্রায়ই বলিতেন যে ভগবান্ পৃথিবীতে দেড়খানি তরকারী সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানি হইতেছে পাঁঠা এবং আধখানি হইতেছে এঁচোড়। ইহা ছাড়া, আর যাহা খাওয়া যায় তাহা ঘাস। বলা বাহুল্য মহান্ত মহারাজদিগের সমক্ষে রায় মহাশয় কখনও পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিতেন না।

(২)

একবার রায় মহাশয় কতকগুলি বৈরাগীকে বড় জব্দ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি মহাপ্রভুর ভোগ রাঁধিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার কানে এই ভাবের কথা গেল যে নবাগত কতকগুলি বৈরাগীর মধ্যে কেহ যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, 'যে ঠাকুরটী মহাপ্রভুর ভোগ রাঁধিতেছে তাঁর গলায় শ্রীমালা আছে তো? আমার বোধ হয় তাঁর গলায় শ্রীমালা নাই। তাহা হইলে ত বড় অন্যায় হইতেছে। আমরা কেমন করিয়া প্রসাদ পাইব?' এই কথা শুনিয়া রায় মহাশয় এদিক ওদিক তাকাইয়া, তাড়াতাড়ি গলা হইতে মালা খুলিয়া টাঁকে গুঁজিলেন এবং তিলক মুছিলেন। তারপর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া সেই সকল বৈরাগীদের দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন, "কি বাবাজী সকল, তোমরা কি বলিতেছ?" মালা-তিলক-বিহীন রায় মহাশয়কে দেখিয়া ত বৈরাগীদের চক্ষু স্থির! তারা বিনীত ভাবে বলিল, "পূজারী ঠাকুর, এ কেমন হইল! আপনার গলায় শ্রীমালা নাই কেন? আপনার তিলক নাই কেন? একি হইল?" রায় মহাশয় বলিলেন, "বাবাজী সকল, মালা গলায় দিলে গলা বড় কুট কুট করে, তাই ও মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।" এই কথা বলিয়াই রায় মহাশয় দ্রুত পদে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিলেন। বৈরাগীরা বিষণ্ণ মুখে বড় মহান্তের নিকট গেল। মহান্ত মহারাজদিগের মধ্যে তখন যিনি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাকে সকলে বড় মহান্ত মহারাজ বলিত। বৈরাগীরা বড় মহান্তের নিকটে গিয়া যোড় হাতে বলিল, "প্রভু বড়ই অন্যায় হইতেছে।" বড় মহান্ত মহারাজ শিষ্যদের ভাব গতিক দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "কি বাবা সকল, কি অন্যায় হইল?" বৈরাগীরা বলিল "প্রভু বেশ জানা শুনা লোককে ত ভোগ রাঁধিতে দেওয়া হয়?" বড় মহান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কেন? এ কথা বলিতেছ কেন?" বৈরাগীরা বলিল: "প্রভু তাহা হইলে খুলিয়াই বলি। আর যিনি মহাপ্রভুর ভোগ রাঁধিতেছেন তিনি প্রভুর জানিত ব্যক্তি ত?"

বড় মহাশয়। হাঁ। কি হইয়াছে তাই বল না?

বৈরাগীরা। প্রভু! প্রভু! বড় অপরাধ হইয়াছে। এই বলিয়া বৈরাগীরা ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বড় মহাশয়। আরে কি হইয়াছে খুলিয়াই বল না?

বৈরাগীরা। প্রভু, আমরা আজ দেখিলাম যে যিনি মহাপ্রভুর ভোগ রাঁধিতেছেন তাঁর গলায় শ্রীমালা নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি যা বলিলেন তা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

বড় মহাশয়। না, না, তা তো হইতে পারে না! পরাণ রায় আমার বিশেষ জানিত ব্যক্তি। তোমাদিগকে সরল প্রকৃতির সাদাসিদা লোক পাইয়া নিশ্চয়ই সে তোমাদের সঙ্গে রহস্য করিয়াছে। ওরে, কে আছিস্, একবার পরাণ রায়কে এখানে ডাকিয়া আন্ তো। অমনি একজন ভৃত্য পরাণ রায়কে ডাকিতে গেল। পরাণ রায় বুঝিলেন ব্যাপার কি! অমনি ট্যাঁক হইতে মালা বাহির করিয়া গলায় দিলেন, ভৃত্যকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিলেন। এবং তাড়াতাড়ি তিলক কাঁটা কাটিয়া তাহা শুকাইলে, একটু বিলম্ব করিয়া বড় মহাশয় মহারাজের নিকট নিতান্ত গো-বেচারির মত গিয়া দাঁড়াইলেন। বড় মহাশয় বলিলেন, "হাঁ পরাণ, এদের কি বলিয়াছ?" পরাণ নিতান্ত ভাল মানুষের মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "আজ্ঞে, কি বলিব? তেমন কিছু বলিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না!" বড় মহাশয় পরাণকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও। এই সকল ক্ষ্যাপাদের আর ক্ষ্যাপাইও না।" গলায় মালা ও তিলকসমন্বিত রায়মহাশয়কে দেখিয়া বৈরাগীরা কিছু অপ্রস্তুত হইল।

(৩)

একবার পূর্ব্বোক্ত বড় মহাশয়ের সহিত রায় মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে মহাশয়দিগের অনেক শিষ্য ছিল। একদিন বড় মহাশয় মহারাজ তাঁহার শিষ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রায় মহাশয় রন্ধন-বিদ্যায় দ্রৌপদীর অবতার, সুতরাং রান্নার ভার তাঁর উপর পড়িল। বড় মহাশয় বলিলেন, "পরাণ, বেশ ভাল করিয়া রাঁধিও।" নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে শিষ্যমণ্ডলী খাইতে বসিল। রায় মহাশয় অতি পরিপাটী করিয়া রাঁধিয়াছিলেন। আহারকারীরা রায় মহাশয়ের রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিল বটে, তথাপি যেন একটু কিন্তু রহিয়াছে বোধ হইল। অনেক পীড়াপীড়ি করায় তাহারা বলিল যে "রান্না খুব ভালই হইয়াছে, তবে কাল একটু কম হইয়াছে।" রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কয়েক দিবস পরে রায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বড় মহাশয়কে বলিলেন, 'সেদিন আপনার শিষ্য-মণ্ডলীর ভাল খাওয়া হয় নাই। আপনি তাদের আর একদিন নিমন্ত্রণ করুন। এবার আমি বেশী করিয়া কাল দিয়া ব্যঞ্জনাদি রাঁধিব। সেদিন আমাদের রাঢ় দেশীয় লোকদিগের পছন্দ-সহি করিয়া রাঁধিয়াছিলাম, তথাপি, কাল একটু বেশীই দিয়াছিলাম। এবার পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের আহারের উপযুক্ত করিয়া কাল দিয়া রাঁধিব। সেদিন আমি লজ্জিত হইয়াছি।" তাহাই হইল। আর এক দিন শিষ্য-মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইল।

এদিন রায় মহাশয় যত পারিলেন ঝালঝাঁটা দিয়া ব্যঞ্জনাদি রাঁধিলেন। শিষ্যমণ্ডলী আহার করিতে বসিল। সেদিন ঝালের চোটে পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকেও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইল। কাল বেশী হউক, ব্যঞ্জনাদি অতি সুস্বাদু হইয়াছিল। কাজেই শিষ্য-মণ্ডলী শত মুখে রায় মহাশয়ের রন্ধন পারিপাট্যের প্রশংসা করিল। তাহারা যার আর নাকের জলে চোখের জলে একখানি হয়। আহার কালে তাহাদের প্রত্যেকেরই বাঁ হাতে একখানি করিয়া ভিজা গামছা ছিল। তারা যার আর সেই ভিজা গামছা দিয়া অনবরত নাকের চোখের জল মুছে। তা দেখিয়া রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাবা সকল, আজ কেমন পাক হইয়াছে!" তাহারা এক বাক্যে বলিল, "বাবা ঠাকুর খুব হইয়াছে। অতি উত্তম হইয়াছে, হাবা • করি" এই বলিয়া রায় মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিল।

• শুনিয়াছি, বরিশাল অঞ্চলে নমস্কার অর্থে হাবা শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভাঃ মঃ সঃ

(৪)

রায় মহাশয় নানা প্রকার অদ্ভুত গল্প করিতেন। একবার তিনি নিম্নলিখিত গল্পটী বলেন। তিনি বলেন যে ঐ গল্পের বর্ণিত ঘটনা সত্য এবং তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ গল্পটী রায় মহাশয় আমাদিগকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বলেন এবং গল্পের ঘটনা আমাদিগকে রায় মহাশয় তাহা বলিবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। গল্পটি ভূত নামানো সম্বন্ধে।

এক শীতকালের রাত্রিতে বড় মহাল-মহারাজের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় অনেকে বসিয়া রহিয়াছেন। নানা প্রকার গল্প গুজব চলিতেছে। রায় মহাশয়ও সেই মজলিসে আছেন। একজন নবাগত ব্রাহ্মণ যুবকও সেই বৈঠক-খানায় এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কথায় কথায় ভূত নামানোর কথা উঠিল। তাহা শুনিয়া নবাগত ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, "আমি ভূত নামাইতে পারি।" তাঁহার সে কথা সেই বৈঠক-খানায় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে আর কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তখন ব্রাহ্মণ যুবক কহিলেন, "আপনারা কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করিলেই আপনাদের আমার কথায় বিশ্বাস জন্মিবে। আপনারা আমার পরীক্ষা করুন।" অন্য সকলে বলিলেন, "ভূত নামানের পরীক্ষা কেমন করিয়া হইবে?" ব্রাহ্মণ যুবক কহিলেন, "আমি যদি এখনই এখানে ভূত নামাইতে পারি তাহা হইলে ত আপনাদের বিশ্বাস জন্মিবে?" এ প্রস্তাব সকলের নিকটই সঙ্গীচীন বোধ হইল এবং সকলেই ব্রাহ্মণ যুবককে ভূত নামাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-যুবক কহিলেন, "কাহার ভূত নামাব বলুন।" সভাস্থ একজন কহিলেন, "অল্প কয়েক দিন হইল আমাদের গ্রামের যাদব রায় মারা গিয়াছেন। তাঁহার ভূত নামান।" এ কথায় আর সকলে সম্মতি দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ-যুবক ভূত নামাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ প্রথম কয়েক মিনিট অস্পষ্ট অবোধ্য ভাষায় বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র না কি পড়িলেন। তারপর সভাস্থ সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "যাদব রায় রে!" প্রায় মিনিট দুই পরে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কালীতলা হইতে কে যেন অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, "যাই রে।" ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, "ভূত মিহি গলায় "যাই রে" বলিয়া উত্তর দিল, শুনিলেন ত? পশ্চিম দিক হইতে উত্তর দিয়াছে। তিনি কালীতলা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন বোধ হইতেছে।" এ সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল। কেহ বলিল, "যাই রে" শুনিয়াছি, কেহ বলিল যে "ঐরূপ কোন শব্দ শুনি নাই।" ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। ভূত এমন পাত্র নহেন যে একডাকে আসিবেন। ডাকিতে ডাকিতে গলা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবে ত তিনি আসিবেন। এইবার আবার ডাকিতেছি। এবার এ দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উত্তর দিবেন বোধ হয়। ক্রমেই এই বৈঠকখানার দিকে আসিবেন।" এই বলিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ব্রাহ্মণ যুবক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "যাদব রায় রে।" ব্রাহ্মণ যুবকের গলা ত নয়—যেন কাঁসী। কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। তখন রাত্রি দেড় প্রহর অতীত-প্রায়। পল্লীগ্রামের পথে লোক চলা বন্ধ হইয়াছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকেই শুইয়াছে। দুই একটী বৈঠকখানায় মজলিসী গল্পাদি হইতেছে মাত্র। রাত্রি একবারে নিস্তব্ধ। সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণ যুবক হাঁকিলেন, "যাদব রায় রে।" সেই হাঁক শুনিয়াই যেন প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সেই হাঁক বা ডাকের কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর আসিল, "যাই রে।" এইবার সভায় প্রায় সকলেই স্বীকার করিলেন যে "যাই রে" শব্দ শুনা গিয়াছে। তবে ত ভূত আসিতেছে।

পৃথিবীতে কখন অবিশ্বাসী ও কুতার্কিক লোকের অভাব হয় নাই। সভাস্থ সেই প্রকৃতির দুই তিন জন বলিলেন, "কোথায় কে উত্তর দিল? সব তোমাদের মনের খেয়াল। সারারাত্রি ডাকিলেও ভূত আসিবে না।" এ কথায় ব্রাহ্মণ যুবক কহিলেন, "মহাশয়গণ, ব্যস্ত হইবেন না। ভূতের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করা ভাল নয়। এখন হইতে সাবধান হউন। ভূত আসিয়া যদি সন্দেহ-

বাপাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেন ত আমি তার দায়ী হইব না। ব্যাপার বড় গুরুতর। কর্ত্তা যদি অনুমতি করেন ত ভূত ডাকি, না হয় এ ব্যাপারে ক্ষান্ত দিই।" এ কথায় অবিশ্বাসীরা পাইয়া বসিলেন, তাঁহারা ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ওহে ছোক্‌রা, এখন পথে আইস। তোমার জারিজুরি বোকা গিয়াছে। এ ভদ্রপল্লীতে কি আর তোমার ওসব বুজরুকী খাটে?" ব্রাহ্মণ যুবক বড় মহান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা, তাহা হইলে ভূতকে ডাকি?" সকলেরই কৌতূহলের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় সকলেই বলিলেন, "হাঁ, হাঁ ডাকুন।" বড় মহান্ত মহারাজও তাহাতে সায় দিলেন। দু'এক জন অতিমাত্রায় ভীরু স্বভাবের লোক বলিলেন, "না, না, এই দুইপ্রহর রাত্রে ওসব হাঙ্গামে আর কাজ নাই। আজ একে অমাবস্যা তায় শনিবার।" কিন্তু তাঁদের কথা টিকিল না।

তখন ব্রাহ্মণ যুবক পুনরায় তার স্বরে ডাকিলেন, "যাদব রায় রে!" মিনিট তিন চা'র বাদে শুনিতে পাওয়া গেল কে যেন রায় পুকুরের নিকট হইতে উত্তর দিতেছে "যাঁই রেঁ।" এবার উত্তর সকলেই শুনিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ যুবক অবিশ্বাসীদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, এবার কিছু শুনিতে পাইলেন কি? এবার "রায় পুকুরের" নিকট হইতে উত্তর আসিতেছে বোধ হইল নাকি?" অবিশ্বাসীরা কিছু বলিল না। অপ্রস্তুত ভাবে বসিয়া রহিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল তাহারা যেন একটু ভীত হইয়াছে। মিনিট তিন চা'র পরে ব্রাহ্মণ যুবক আর একবার ডাকিলেন, "যাদব রায় রে!" কিছুক্ষণ পরে উত্তর আসিল, "যাঁই রেঁ।" মনে হইল ভূত যেন আর একটু অগ্রসর হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যুবক ডাকিলেন, "যাদব রায় রে।" অতি অল্পক্ষণ পরেই উত্তর আসিল "যাঁই রেঁ।" এবার উত্তর অতি সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল যেন তাল পুকুরের নিকট হইতে শব্দ আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে মজলিসে তামাক চলিতেছিল। এবার সকলে তামাক রাঁধিয়া কিছু গম্ভীর কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া বসিলেন। সকলেই কিঞ্চিৎ ভীত,—চকিত। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ যুবক ডাকিলেন, "যাদব রায় রে!" সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট স্বরে উত্তর হইল, "যাঁই রেঁ!" এই উত্তর আসিল ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর সম্মুখ হইতে। সেই স্থান মহান্তদিগের বৈঠকখানা হইতে পাঁচ রশি দূরে। এবার সভায় সকলেই পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘেঁসিয়া বসিতে লাগিলেন। সকলেরই মুখে সুস্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। কয়েক মিনিট সকলেই নীরব রহিলেন। আবার ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার বাজখাঁই আওয়াজে হাঁকিলেন, "যাদব রায় রে।" এই শব্দ বৈঠকখানা ঘরে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই নিশীথ রাত্রে সে শব্দ বড় বিকট শুনাইল। শ্রোতৃবর্গের বুক দুর দুর করিয়া উঠিল। খানিক পরে উত্তর হইল, "যাঁই রেঁ।" এইবার উত্তর আসিল, যে গলির পূর্ব্ব প্রান্তে সেই বৈঠকখানা অবস্থিত সেই গলির পশ্চিম প্রান্ত হইতে। এখন সভায় সকলের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা অনুমান করিতে হইবে। সকলেই পরস্পরের দিকে আরও ঘেঁসিয়া বসিলেন। আবার ডাক হইল, "যাদব রায় রে।" উত্তর আসিল, "যাঁই রেঁ। এবার দোতালা বৈঠকখানার ঠিক নিম্ন ভাগ হইতে উত্তর আসিল। তখন, ভয়ে সকলের আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ যুবক পুনরায় ডাকিলেন, "যাদব রায় রে।" বৈঠকখানা ঘরে উঠিবার সিঁড়ি হইতে এবার ভূত উত্তর দিল, "যাঁই রেঁ।" এই শব্দ শুনিয়া সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া বসিলেন। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া রাম রাম বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের ঢিপঢিপ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। এমন সময় সেই দুঃসাহসিক ব্রাহ্মণ যুবক গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন "যাদব রায় রে!" তৎক্ষণাৎ বৈঠক-খানা ঘরের দরজার ঠিক বাহির হইতে উত্তর আসিল, "যাঁইরে!" সভ্যগণ আর নাই, সকলেই কটমট করিয়া চোক বুজিয়াছেন ও কাঁপিতেছেন। তখন ব্রাহ্মণ যুবক ডাকিলেন "যাদব রে।" অমনি যাদব রায়ের ভূত চক্ষের নিমেষে যেন ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া

বলিয়া উঠিল "এঁ্যাই যে রে।" এখন সভ্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রাণের ব্যাকুলিতে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া "বাবা গো, খেলাম গো, মলাম গো" বলিতে বলিতে ফরাসে পড়াইতে লাগিলেন। অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে দুই জন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া গো গো শব্দ করিতে লাগিলেন। এক জন যাহা করিলেন তাহা অবক্তব্য। ভূতের প্রতি অবিশ্বাসে লোকেরই কি এক অজ্ঞাত ভয় আসিল! কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই যেন সংজ্ঞা-রহিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। উঠিয়া বসিতে কিম্বা চক্ষু মেলিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। বোধ হয় প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন, "এইবার বুঝি যাদব রায়ের ভূত আমার ঘাড় মটকাইল।" এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিলে পর সেই দুঃসাহসিক ব্রাহ্মণ যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহাশয়েরা উঠুন, আর কোন চিন্তা নাই। অনেক বিনতি করিয়া ভূতকে বিদায় করিয়াছি।" আশ্বাস পাইয়া সকলেই একে একে উঠিয়া বসিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। তখন ব্রাহ্মণ যুবক অবিশ্বাসী মহাশয়দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "কি মহাশয়গণ, আর কখনও ভূত প্রেতের কথা লইয়া তামাসা করিবেন!"

অবিশ্বাসী মহাশয়রা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। পূর্ব্ব-কথিত ভীরু ব্যক্তি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "আমি তখনই বলিয়াছিলাম এবার কাজ নাই। এখন বলা বুঝুন। এই আমাবস্যার রাত্রে এখন বাড়ী যাই কেমন করিয়া! আমাকে আবার কালী তলার কাছ দিয়া যাইতে হইবে। আমি আজকার রাতটা এই খানে পড়িয়া থাকিয়া রাম নাম জপ করিয়া কাটাইব। "আজ রাত্রে আর কিছু খাইব না।" অন্য সকলেও বাড়ী যাইবার নাম করিলেন না। ব্যাপার দেখিয়া বড় মহাশয় মহারাজ বলিলেন, "আজ রাত্রি আপনাদের কাহারও আর বাড়ী গিয়া কাজ নাই। এইখানেই আপনাদের ব্যবস্থা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যুবক বড় মহাশয়কে বলিলেন, "কর্ত্তা, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি।" বড় মহাশয় বলিলেন, "কি বলিবেন বলুন।" ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, "এই যে যাদব রায়ের ভূতের কথা শুনিলেন ওসব কিছুই নয়।"

বড় মহাশয়। নয় কি রকম?

ব্রাহ্মণ যুবক। আজ্ঞে, আমি যাদব রায়কে বলিয়া ডাকিয়াছি, আবার আমি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ঁাই রে বলিয়া উত্তর দিয়াছি। আপনাদের কাহারও ভয়ের কারণ নাই।"

তখন ত সকলের ধড়ে প্রাণ আসিল। বড় মহাশয় মহারাজ ব্রাহ্মণ যুবককে বিলক্ষণ পুরস্কৃত করিয়া তাঁহাকে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

রায় মহাশয়ের নিকট আমরা যখন পূর্ব্বোক্ত গল্পটী শুনি তখন তার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি নাই। তারপর ইংরেজী স্কুলকলেজের বিদ্যার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণ যুবকের বা অন্য কোন মানুষের পক্ষে যে অমন ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা কওয়া সম্ভব তাহা অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করি। পুনরায় কিছু দিন পরে জানিতে পারি, যে ঐ রূপ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত বটে। উহাকে ইংরেজী ভাষায় ventriloquism বলে। বাঙ্গলা ভাষায় ইহাকে স্বর-সাধন-বিদ্যা বা স্বর-চাতুর্য্য বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী উক্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের পরিচয় দিয়াছেন।

(৫)

রায় মহাশয় কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা সকল ঋতুতেই খয়ের বাহেরার মশারি খাটাইয়া শুইতেন এবং প্রথম তখন খুব করিয়া সরিষার তৈল মাখিয়া যে কোন পুকুরে, তা ভালই হউক আর মন্দই হউক, অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিতেন। তাহাতে তাঁহার সর্দ্দি কাশী কিম্বা অন্য কোনরূপ পীড়া হইত না। এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রায় মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন যে, "ওহে, আমার বাতিকের ধাত, সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা লাগাই, কোনরূপ অসুখ করিবে না।"

রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আমরা সর্ব্বদাই বেড়াইতে

যাইতাম। তিনি কখন বা আমাদিগকে তাঁর রান্না সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি খাইতে দিতেন, কখন বা বরফী, পাস্তুয়া প্রভৃতি দিতেন। ফল কথা, রায় মহাশয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া আমরা কখনই শুধু মুখে ফিরিতাম না। তিনি একটী প্রকাণ্ড হুঁকায় একটী রূপার নল লাগাইয়া সুগন্ধি তামাক সর্ব্বদাই টানিতেন।

আমরা একদিন রায় মহাশয়কে তাঁহার পাচিত ব্যঞ্জনাদি অত সুস্বাদু হওয়ার রহস্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে তিনি ব্যঞ্জনাদিতে অতি সামান্য মাত্রায় পেঁয়াজের রস দিয়া থাকেন। একবার আমাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন যে, "যাঁরা অতি নিষ্ঠাবান্, তাঁরা পেঁয়াজ খান না। আপনি তাঁহাদিগকেও পেঁয়াজের রস খাওয়াইয়া তাঁদের ধর্ম্মহানি করেন নাকি?" তাহার উত্তরে রায় মহাশয় উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "না ভাই, মূর্খ হইলেও আমার সে বুদ্ধিটুকু আছে। যে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ তাঁহাকে কখনও পেঁয়াজের রস দিয়া রান্না করা তরকারি খাওয়াই নাই বা ঠাকুরদের ভোগ রাঁধিবার সময়ও কখনও ওসব কর্ম্ম করি নাই।"

(৬)

একদিন আমরা কয়েক জনে সাবান মাখিয়া স্নান করিতেছিলাম। সেই সময় রায় মহাশয় সেখানে স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁর পৈতা গাছটী অত্যন্ত ময়লা দেখিয়া আমাদের একজন বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, তোমার পৈতায় যদি একটু সাবান দাও তো খুব পরিষ্কার হয়।" রায় মহাশয় বলিলেন, "ভাগ, আমাদের বেলের আঠাই ভাল। তোমাদের ও সাবানে অনেক রকম খারাপ জিনিষ আছে। সাবান ছুঁতে নাই।" আমরা বলিলাম, "আপনিও যেমন! ওসব কথার মূলে কোন সত্য নাই। নারিকেল তৈল, চুন, সাজি মাটি এই সব জিনিষ দিয়া সাবান প্রস্তুত হয়।" রায় মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি! ওতে শূয়োরের চর্ব্বি থাকে না!" আমরা বলিলাম, "আরে রাম! রাম! তা কি কখনও হয়?" বলা বাহুল্য, কি দিয়া সাবান হয় আমরা তা জানিতাম না। রায় মহাশয় এদিক ওদিক তাকাইয়া, স্নানের ঘাটে কোন বৃদ্ধ লোক নাই দেখিয়া আমাদের নিকট হইতে সাবান লইয়া তাহা দ্বারা তাঁর পৈতা খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

যখন অন্য কোন কাজ থাকিত না সে সময় রায় মহাশয় ঢেঁড়া দিয়া পাট কাটিয়া দড়ি করিতেন।

(৭)

প্রায় তেইশ বৎসর হইল রায় মহাশয়ের লোকান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি স্বর্গের সেই অঞ্চলে দিব্য দেহে বাস করিতেছেন যে অঞ্চল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি পরিহাস-রসিকগণ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশর্ম্মা গুপ্ত।

পরলোকে আত্মার গতিবিধি

৩। মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা।

মৃত্যু যখন আত্মাকে শরীর হ'তে মুক্ত করে, তখন আত্মার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মানুষের পাপ ও পুণ্যের উপর মৃত্যুর হাত নাই। মৃত্যুর সময় আত্মার যেমন রুচি আকাঙ্ক্ষা বা চরিত্র থাকে, দেহত্যাগের পর ঠিক তেমনিই থাকে, কেবল শরীরের আবরণ থাকে না,—মৃত্যুর পর আত্মার পাপ পুণ্য সবই তার নিজের কাছে এবং অপর বিদেহী আত্মার কাছে সর্ব্বদা স্পষ্ট হ'য়ে থাকে। তারপর আত্মার উন্নতি ও বিকাশ নির্ভর করে তার নিজের উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপর এবং উন্নততর আত্মাদের সহায়তার উপর। কোন নিম্ন অবস্থার আত্মার মধ্যে মহত্তর আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌বামাত্র উন্নত অবস্থার আত্মাগণ তার সাহায্য করেন। অপরত আত্মাদের সাহায্য ক'রবার জন্য উন্নত আত্মারা সর্ব্বদা প্রস্তুত। পরলোকে পুণ্যবান উন্নত আত্মাসকল কাজকর্ম্মহীন শান্তি-সুখে মগ্ন থাকেন না, নিজের এবং অপরের উন্নতি সাধনে তাঁরা সর্ব্বদা ব্যস্ত।

৬। বিদেহী আত্মার উক্তি।

তোমাদের কাছ থেকে যারা আমাদের কাছে আসে, এখানকার পুণ্যবান আত্মাগণ তাদের খুব যত্ন করেন। পৃথিবীর রাজা, পণ্ডিত, পাপী পুণ্যবান সকলের সম্বন্ধেই এখানে এই এক নিয়ম। কিন্তু এক এক সময় এমন হীন আত্মা দেখা যায় যে, তারা এখানে এসে মঙ্গলকারী উন্নত আত্মাদের চিন্‌তেই পারে না, কেও কেও আবার বলে "আমি তোমাদের সাহায্য চাই না;"—এদের এমন একটা অবস্থার মধ্যে থাকতে দেওয়া হয় যে অবস্থায় থেকে তাদের প্রকৃত অবস্থা তারা বুঝতে পারে, ক্রমশঃ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগে। তারপর উন্নত আত্মারা এদের সাহায্য করেন।

৭। মহা প্রশ্ন।

জন্ম মৃত্যু রূপে একি খেলা;
আত্মা পরমাত্মার মিলনে?
জীবনের গুপ্ত গতি-লীলা,
লক্ষ্য কি তা বুঝিব কেমনে।

"আমি কে এবং কি? কোথা হ'তে এসেছি? কার ভিতর হ'তে আমার জন্ম? আমি শরীরী হ'য়েছি কেন? আমি কোথায় যাচ্ছি? মৃত্যুর পর এ শরীর ছেড়ে আমি কোথায়, কি অবস্থায় যাব?"—এই সব মহা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রাণ দেওয়াও বেশী নয়। সকল ত্যাগ, সকল কষ্ট স্বীকার ক'রেও এই তত্ত্ব গুলির প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারলে, জীবন ধন্য। যে নিজের সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করতে পারে, সে অনন্ত ভবিষ্যৎ জীবনে পরম পুরুষের লীলার পূর্ণাভাষ পেয়ে ধন্য হয়।

৮। আত্মার জন্ম।

"আমার জন্ম হ'ল কবে?"—এই চিন্তা করতে করতে অসংখ্য যুগ অতিক্রম ক'রে, বায়ুর ন্যায় এক প্রকার অবস্থার ভিতর উপস্থিত হই। পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র আছে, এই পৃথিবীর চারিদিকে তেমনি বায়ু-সমুদ্র আছে। বায়ু-সমুদ্র ঘিরে আছে ব'লেই পৃথিবী ও সমুদ্র বর্ত্তমান অবস্থায় আছে। এই বায়ুমণ্ডল সমস্ত জড় জগতের মূলে র'য়েছে। তেমনি আমাদের এই দেহের জীবনের মূলে, বাতাসের মত একটা জীবন-সাগর আছে। এখানে আমি আমাকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ব'লে জানতে পারছি, কিন্তু সেই বায়বীয় প্রাণ-সাগরে এই স্বতন্ত্র আত্ম-বোধ ছিল না। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবে মিশে একাকার হ'য়ে থাকে, তেমনি আত্ম-জ্ঞান আত্ম-বোধ বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার পূর্ব্বে আমরা এক পরম পুরুষের মহাজ্ঞান-সাগরে ডুবে মিশে একাকার হ'য়ে থাকি।

৯। পরলোকে কোথায়?

সাধারণ বিশ্বাস এই যে, পরলোকে গেলে মানুষের আর ইহলোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কারণ পরলোক যে কত দূরে তা কে জানে! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহলোকে পরলোকে কোন ব্যবধান নাই। আমরা এখনও আত্মার রাজ্যেই বাস করি পরেও আত্মার রাজ্যেই থাকব। শরীরটা আত্মার একটী আবরণ মাত্র। এই আবরণ প'রে যেমন আত্মা এখানে বাস করে, তেমনি এ আবরণ খুলেও বাস করে। ইহলোক ও পরলোক বলে দুটা স্বতন্ত্র জায়গা নাই, আত্মার দুই অবস্থার দুটা নাম মাত্র। বিদেহী আত্মাগণ অবাক হ'য়ে বলেছেন,—আমরা তো অনেক দূরে যাইনি, আমরা তো এখানেই আছি।

দৃষ্টির অগোচর এই অধ্যাত্ম রাজ্য যে সত্য সত্যই বর্ত্তমান তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ বিদেহী আত্মারাই দিয়েছেন। তাঁরা দেখা দিয়েছেন, কথা বলেছেন, নিজেদের বিষয় বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মানুষ যাকে ভূত বলে—তা নয়। বরং বিদেহী আত্মাদের কাছে এই স্থূল জগত যেমন সত্য বিদেহী আত্মাদের কাছে সূক্ষ্ম পরলোকও তেমনি সত্য। সেখানেও সমাজ আছে, সেবা আছে, ভাব আছে, কর্ত্তব্য আছে; জ্ঞান ও প্রেমই সেখানকার বিধি।

১০। মৃত্যু নূতন অবস্থায় যাওয়ার দরজা মাত্র।

মানুষ শরীরের ঘরে বাস করে, এক রকম বিধি ব্যবস্থা ও অবস্থার মধ্যে থাকে, মৃত্যু সেই ঘরের

দরজা খুলে দেয় আর আত্মা পাশের ঘরে একই অন্য রকম অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। শীতের সময়ে গাছ পালা সব জীর্ণ শীর্ণ বিশ্রী হয়ে থাকে, আবার নূতন পাতায় ও ফুলে সুশোভিত হয় তেমনি মানব-আত্মা দেহ-পরিচ্ছদ ছেড়ে, নূতন বেশ ধারণ করে। পরলোকে আত্মার উন্নতি সহজ এবং স্বপ্রণোদিত। মৃত্যুর পর আত্মার চিন্তা ভাবনা, প্রেম প্রভৃতি পূর্ব্বের মতই থাকে। শরীরে থাকতে তার জীবনের অবস্থা যেমন ছিল, সেই অনুসারে মৃত্যুর পরও আত্মার অবস্থা হয়। যে রকম বাসনা ও কামের মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষের মৃত্যু হয়, তারপর ঠিক সেই অবস্থাতেই পরলোকেও জীবন আরম্ভ হয়। মৃত্যুতে হৃদয় মনের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরলোকে প্রত্যেক আত্মার সাহায্যের জন্য উন্নততর আত্মা প্রস্তুত থাকেন। যাহারা শরীরের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে যায়, তাদের অনেক দিন অন্ধকারে বাস করতে হয়, এই বাসনার বিষয় তো সেখানে নাই, তাই তারা সব অন্ধকার দেখে। কিন্তু ক্রমশঃ শিক্ষাদাতা আত্মাদের সাহায্যে তারা আলো দেখতে পায়, এবং উন্নতির পথে পদার্পণ করে।

একটি পর-লোকগত আত্মা ব'লেছেন যে পরলোকে গিয়ে যখন আমি প্রথম আমার চিন্তা ফিরে পেলাম, আমার মনে হ'ল আমি যেন ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু আমারও তোমাদের মত হাত পা ছিল স্মরণ ক'রে, আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম, সে যেন বড় অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ল। আমি জানতাম, মৃত্যুর পর কতকাল সমাধির মধ্যে অন্ধকার ঘরে থাকতে হবে, কিন্তু দেহ-ত্যাগের সময় যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, তার কিছুক্ষণ পরে জেগে উঠে যখন জানলাম যে, আমি জড় ও মৃত্যু ছেড়ে অমৃতের রাজ্যে এসেছি, আমি উন্নততর অমৃতময় জীবনের রাজ্যে এসে জন্মেছি, তখন আমি পরিস্কার আমার আত্মীয় বন্ধুদের কান্নার পানে চেয়ে রইলাম। তাদের অজ্ঞতা দেখে আমার একটু দুঃখ হ'ল। কিন্তু আমি, যে তারা জানতে না পারিলেও, সর্ব্বদা তাদের কাছে থাকতে পারব, এই ভেবে আমার আনন্দও হ'ল।

মৃত্যুর সময় হ'তে কিছুক্ষণ আত্মা ঘুমের ঘোরে মগ্ন থাকে। সেই ঘুম ভাঙবার সময় প্রথমতঃ অনেক আত্মা বুঝতেই পারে না যে সত্য সত্যই সে দেহ-ত্যাগ ক'রেছে, সে নিজের অবস্থাটাকে স্বপ্ন ব'লে মনে করে। একজন ইংরাজ সেনাপতি মৃত্যুর তিনদিন পরে, একদল সেবক-আত্মার মধ্যে এ লোকের পরিচিত কয়েক জন, আত্মাকে দেখে ব'লেছিলেন "আমি কি মরেছি, তবে আমি এ কোথায় আছি!"

স্বর্গ নরক সম্বন্ধে ভ্রান্ত শিক্ষার ফল।

মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে, কত রকম শাস্তি পাবে, অনন্ত সুখ বা অনন্ত নরক যাতনা ভোগ করবে, এইরূপ ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে, অনেক আত্মা পরলোকে গিয়ে প্রথমতঃ ভয়ে কম্পিত হয়, কি জানি কোন্ নরকে যেতে হবে! এইরূপ লক্ষ লক্ষ ভীত কম্পিত ভ্রান্ত আত্মাকে প্রকৃত সত্য বুঝবার যোগ্য করে তুলতে এদের ভয় দূর করতে, লক্ষ লক্ষ উন্নত আত্মাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রতে হয়। যাঁরা এই সব ভ্রান্ত মত প্রচার ক'রে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা ও প্রেমের অপমান করেন, তাঁরা পরলোকে গিয়ে নিজেদের অপরাধের জন্য মনস্তাপে দগ্ধ হন, এবং প্রাণপণ ক'রে তাঁদের ভুল শিক্ষার প্রতিকার করতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তাদের বহুদিন নিরন্তরে বাস করতে হয়।

অবরোধ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সন্ধ্যাকালে উপাসনা-মন্দিরে আচার্য্য হারনাণ্ডেজ, মহাবীর গার্সিগ্রাস্ ও অন্যান্য সৈন্য সামন্তগণ উপস্থিত। জাতীয় দুর্দ্দিনে নগরবাসীগণ সেই অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা ভগবানের অভয় নামই একমাত্র মহাবল ও পরম সম্বল রূপে ধরেছে।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দলে দলে সৈন্য, সেনাপতি, রাজা জনসাধারণ সকলেই এসে ভগবানের কাছে কেঁদে, দেশের জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। বৃদ্ধ আচার্য্য হারনাভেজের জীবনের উপর দিয়ে কত শোক তাপের ঝড় ব'য়ে গিয়েছে, কিন্তু ভগবানের প্রেমে তিনি সুদৃঢ়,—মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হবে, এবং তাই ভাল,—এতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; তিনি তাঁর গভীর ভক্তি ও নির্ভরের ভাবপূর্ণ ব্যাকুল প্রার্থনায়; নিরাশ নির্জ্জীব মনে নব আশা নব তেজ জাগিয়ে তুলতেন।

আজ বড় দুর্দ্দিন। আজ সকলের প্রিয় রাজকুমারদ্বয় শত্রুর হাতে বন্দী। শত্রুর জয়গর্ব্বে নগরবাসীর প্রাণ কম্পিত! আজ রাত্রে নগর রক্ষার ভার পড়েছে মহাবীর গার্দিনাসের উপর। বীরগণ ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছেন। অর্চ্চনা প্রার্থনা শেষ হ'য়ে গিয়েছে, সকলে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ আচার্য্য বল্লেনঃ—

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ,—
তাই নিয়ে যাও বৎস, স্বকার্য্য সাধনে
নির্ভয় অন্তরে; হও অজেয় সমরে।
প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর প্রিয় জন্মভূমি,—
রেখে যাও শান্তি সুখ সন্তানের তরে।
ছায়া তরে বৃক্ষ-বীজ যে করে রোপণ,
সে কি কভু বসে সেই পাদপ ছায়ায়?
পর সে যে করে শ্রম ভাবী হিত তরে।
উচ্চ চিন্তা উচ্চ ভাবে পূর্ণ ক'রে মন,
যাও, বৎস, রক্ষা কর স্বদেশসদন।

গার—গুরুদেব তব বাক্য পবিত্র মহৎ
নিরাশা-কাতর প্রাণে দেয় নব বল,—
আশাবাণী, মহাভাব যাও ঢেলে প্রাণে।
বীর বংশ-জাত আমি, বিনিদ্র রজনী
কত যে কেটেছে মাঠে সমর-অঙ্গনে
দেখেছে তারকা ফুল গগন বিহারী,
চারিদিকে ব'য়ে গেছে রক্তবর্ণ নদী;
যেন তার উৎস নয় পর্ব্বত কন্দর,
বীর-বক্ষ ভেদ করে জনম তাহার—
ভেসে যায় কত বীর অনন্ত সাগরে!
দীর্ঘ নির্ব্বাসনে আর ঘোর কারাগারে,
শুষ্ক মরুভূমি মাঝে নিশীথ সময়ে
বিরল বৃক্ষের ছায়া দেখেছি বিস্তরি,
কখন বা সিংহসম পবন-হুঙ্কার
কম্পিত ক'রেছে বক্ষ অধীর চঞ্চল।

হার্গা—নির্ব্বাসন! নির্জ্জনতা? আরো শুরুতর!
এ জগতে কোন খানে যদি কোন জন
থাকে তব, যার নাম, যাহার স্মরণ
হৃদয়ে সঞ্চার করে পুলক স্পন্দন,
হোক না সে শত দূরে শত নদ নদী
পাহাড় সাগর মাঝে হোক ব্যবধান,
তবুও নির্জ্জন নও তুমি; প্রেম বলে
সব দূর দূরে যায়, আত্মায় আত্মায়
প্রেমযোগ বিরাটের তরঙ্গ খেলায়!
এ হ'তে বঞ্চিত হলে নির্জ্জন সে জন।
কিন্তু বৎস, গৃহ-সুখ প্রেমালাপ তরে
করো না গৌরব। সবে যার মৃত্যুপানে—
জানেনা সে আত্মীয়তা প্রেম কাকে বলে!

গার্দি—দেখেছি মৃত্যুর লীলা সমর-অঙ্গনে,
প্রাবণে ঝটিকা মাঝে, কিন্তু কোন দিন
এ হৃদয় বিন্দুমাত্র হয়নি কম্পিত।
এই যে নিশীথ কালে প্রহরীর কাজ,
কি যে বিভীষিকা দেখি প্রাণ কেঁপে যায়!
চারিদিকে অকল্যাণ, মৃত্যু পদতলে,
শূন্যে অমঙ্গল চিহ্ন, ধূমাচ্ছন্ন দিশি,
গ্রীষ্মের আকাশে তারা নহে ধূমশূন্য!
থেকে থেকে মেঘরাশি আসে কোথা হ'তে
ভীষণ গর্জ্জন, কত বিচিত্র পতাকা,
রথী পদাতিক, অশ্ব বিপুল বাহিনী,
শূন্যে দেখা দেয় হয় তুমুল সংগ্রাম,
মুহূর্ত্তের কটিকায় সব অবসান!

হার্গা—আমিও দেখেছি বৎস, নিসর্গের খেলা
অদ্ভুত বিস্ময়কর যুদ্ধ উর্দ্ধদেশে,—
কিন্তু এ হৃদয় মম হয়নি কম্পিত!

সাসি—আমিও ভরি না দেব, নিসর্গ খেলায় :—
কিন্তু এই ধূম্রে শব্দে কাঁপে বীরগণ!
কেবল কি উর্দ্ধে এই স্বপ্ন মায়াময়!
কি আসে জাননা দেব! অধোদেশ হ'তে
যদি হ'ত বর্ব্বরের ভেরীর নিনাদ
বজ্রসম, বীররক্ত উঠিত নাচিয়া,—
কিন্তু মর্ম্মভেদী রবে বুক ফেটে যায়!
বীরের অকাল মৃত্যু, নারীর ক্রন্দন,
পূর্ণ করে শূন্যতল, পুতুলের মত
নীরবে দাঁড়িয়ে শোনা সেই আর্ত্তনাদ
কি দুঃসহ! তার চেয়ে তুরিভেরী রবে
সহা রণরঙ্গে মুক্ত অসি চর্ম্ম করে
মাতি যবে শত্রু সনে, বুকের পাষাণ
নেমে যায়, যথা রোগশয্যাশায়ী জন
বহুদিন পরে এসে উন্মুক্ত আকাশে
নূতন জীবন পায়—বাঁচি হাঁফ ছেড়ে।

হার—অগণ্য বিপক্ষ পক্ষ, অস্ত্র খরশান
তুচ্ছ করে ছুটে যাও' উন্মত্ত উৎসাহে,
এই যদি বীরত্বের গৌরব মুকুট,
নয় সে কঠিন কিছু। কিন্তু বীরত্বের
আরো উচ্চতর স্তরে আরো সহিষ্ণুতা
আরো মহত্তর প্রেম, সম্ভব জগতে।
বড় ভয়ানক কাজ—কঠোর সংগ্রাম!
দৃঢ় হও, ধৈর্য্য ধর তবে। ভেবে দেখ,
অতি সাধারণ লোক কড়ে রক্তারাতে
ধৈর্য্য ধরে থাকে; কিন্তু আমাদের কাজ
আরও কত পবিত্র মহৎ—মাতৃভূমি,
ধর্ম্ম, কুল, মান, প্রাণ,—সব রক্ষা হেতু
রাত্রি জাগরণ, শ্রম; এ মহৎ কাজে
যদি হয় প্রাণপাত, এই রক্ত দিয়ে
জন্মভূমি ঋণ যদি কিছু শোধ হয়;
আনন্দে শয়ন কর পতাকার তলে,
এ চিত্তার বাঁধ বুক, পাষাণ সমান
দাঁড়াও অটল হ'য়ে সর্ব্বসহা হয়ে—
আশা রাখ ভবিষ্যতে।—বিদায় এখন।

সার—প্রণাম; বিদায় প্রভু!

(সাসিরাদ ও সৈন্যগণের প্রস্থান)

হার—আহা, এদের ঘর-কন্না প্রিয় জন ছেড়ে,
যুদ্ধে যেতে প্রাণ কাঁদছে! দেশের জন্যে সমস্ত প্রাণটা
দিতে পারছে না। কিন্তু ভগবান যাদের উপর একটা
মৃত জাতির মধ্যে নব জীবন-সঞ্চারের ভার দেন,
তারা ধন্য; তাদের কর্ত্তব্য, এমন মহৎ ব্রত উদযাপনের
জন্য সব বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়া।
পাহাড়ে-নদী সমুদ্রে যাওয়ার গতি থামিয়ে কি ফুল
নিয়ে খেলা করে? এত রাত্রে কার পায়ের শব্দ?
কে আসছে?

(সবিস্ময় দৃষ্টিপাত)

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী—রাজরাণী ভিখারিণী-বেশে আজ দেব,
সমাগত তব পাশে বিনিদ্র নিশীথে।

হার—বীরপত্নী, জানি দুঃখ তব হৃদয়ের,
কিন্তু ভেবে দেখ দেবী, ক্ষুদ্র তৃণ দলে
ছেড়ে দিয়ে, বহে ঝড় বিশাল পাদপে,
বড় দুঃখ বড় ঝঞ্ঝা তবে ব্যথা তার
সহিবার বল, ভক্তি-উৎস অন্তরের
কাতর ক্রন্দন বৃথা, নিষ্ঠুর যাতনা
শোনে না বিলাপ-ধ্বনি, বর্ত্তমানে
পতিত বিপন্ন জন শোনে না যেমন
বহু দূরে উপকূলে আনন্দ-সঙ্গীত।

রাণী—পিতৃসম তুমি; আজ কৃপা ভিক্ষা তরে
আসিনি তোমার কাছে; দুঃখীর হৃদয়,
যে জানে দুঃখের স্বাদ আসে যে কারণ
তার কাছে, সেই জন্যে এসেছি এখানে—
দুঃখিনী বিপন্ন আমি, চাই সহায়তা।

হার—সহায়তা! বিশ্বপিতা সর্ব্বশক্তিমান
আলোকে আঁধারে যিনি সদা বর্ত্তমান,
তিনি ছাড়া কোন শক্তি নাই এজগতে
তোমার সাহায্য করে; অসমর্থ আমি।

রাণী—অসমর্থ তুমি? তুমি ভক্ত উপাসক?

প্রেমের আঘাত-ক্লিষ্ট জীবন তোমার!
তবুও যেয়োনা তুমি দুঃখ ভুঞ্জিবার!

হার—হায় মাতা! শক্তি কিছু আছে কি আমার
বাঁচাতে সন্তানে তব! ডাক ভগবানে
বিঘ্ন-বিনাশন যিনি মঙ্গল-বিধাতা।

রাণী—বিধাতার লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাকি দেব,
মানুষের দ্বারা! আমি জানি তুমি পার
বাঁচাতে সন্তানে মম। তব উপদেশ
সদা দৈববাক্য সম রাজ সন্নিধানে!

হার—অতএব!—বল, বল! রাজকন্যা তুমি,
বীরবংশে জন্ম তব, জাতীয় গৌরব
সুখ স্বার্থ তরে তুমি দেবে বিসর্জ্জন!

রাণী—ক্ষমা কর দেব! আমি পারিনা সহিতে
দৃষ্টি তব! কালও ছিল গর্ব্ব অহংকার,—
ঘৃণা ভরে যে চিন্তা করেছি পরিহার;
আজ তব ভূপতিত দুঃখের আঘাতে,
লুপ্ত বংশ-গৌরব-মুকুট, হীন প্রাণ,—
সে কথা বলিব আজ ব্যাকুল ক্রন্দনে।

হার—দৌর্ব্বল্যের নয় এ সময়! ওই দেখ,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যত বৃক্ষ-পুরাতন
কটিকার সহ করে তুমুল সংগ্রাম;
ক্ষীণপ্রাণ পুষ্প যত যায় ঝরে হ'য়ে।
তুমি নও ক্ষীণ-প্রাণ পুষ্পের মতন,
বীর বংশে জন্ম তব, রমণী মাঝারে
প্রবাহিত যে শোণিত অরণ্য জগতে,
নত হতে জাননা সে; উচ্চ কর শির,
বীরাঙ্গনা! বল শুনি কি আকাঙ্ক্ষা তব!

রাণী—চেয়ো না অমন ক'রে তীব্র দরশনে!
কি বলিব! ভাষা যে আসে না মুখে, দেব!
ঘৃণাপূর্ণ ও ভ্রুকুটি সরাও তোমার!—
বীরকুল-কন্যা আমি, বীরকুল-বধূ
এত কি গভীর কূপে ডুবেছি অতলে,
নাই ঘৃণা লজ্জা হায়! বীর শিশু মম
কি বলিবে জননীর হীন আচরণে,
বীরকুল কালী মম!—সব ভুলে যাই!—
সেই সে সে কতদিন, বসন্ত উষায়
শিশুপুত্র কোলে মম মর মর রোগ দাহে,
পুষ্প উদ্গীরণ সহ মুদিল নয়ন,
সে যাতনা সবেছে হৃদয়ে, কিন্তু হায়,
কি তীব্র বিষের জ্বালা, বুক জ্বলে যায়,
ওই কৃষ্ণার্ণ মেঘ ঢেকেছে আকাশ,
ওই বজ্রাঘাতে যায় পুত্রগণ মম!
কি আকাঙ্ক্ষা শোন বলি সুস্পষ্ট ভাষায়,
রাজি কর মহারাজে পত্রাদর্শ দিয়ে
দুঃখিনীর ধন দুটি ফিরায়ে আনিতে!

হার—অক্ষম দাসত্বভার যারা নেতে নিয়ে!

রাণী—আজ কিম্বা কাল হবে অবশ্য পতন।
তবে কেন দুদিনের ঘৃণা গর্ব্ব তরে
এ হৃদয় শুষ্ক হবে জ্বলংপিণ্ড বিদারি!
মহাযাত্রী অগ্রগণ্য শক্তির পীড়ন
কতদিন সবে বল এ নশ্বরবাসী!

হার—কতদিন? জাননা কি সর্ব্বশক্তিমান,
অনন্ত গগনযোগী তারকা মালার,
অথবা গভীর নীল নীরেন্দ্র পর্জ্জনে
যাঁহার মহিমা ব্যক্ত, সেসকল তুচ্ছ,
অতি তুচ্ছ, তাঁর কাছে, যখন মানব
সাধিতে পবিত্র ব্রত করে প্রাণপণ,
প্রেমে হৃদে তুলে নেয় শত দুঃখভার;—
সেখানে প্রেরণ করে শক্তি আপনারে
মানবে স্বর্গের শোভা করেন প্রকাশ!
ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ তুমি,—তুমি কি বুঝিবে
মহৎ কামনা আর পবিত্র সাধনা
কত সয়, কত বয়, কত দূর যায়
গৌরবে মণ্ডিত করে মানব জগৎ!
অযোধ্যে সে শক্তি, কোথা সীমা আছে তার?
তুমি চাও তার সীমা করিতে নির্ণয়?
যাঁহার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ যত
দুর্ব্বার সাগর আদি সীমাবদ্ধ সবে,
সেই দেব মানবের মহান প্রয়াসে
করেছেন অন্তহীন মহাফলপ্রসূ।

রাণী—বৃথা—বৃথা—অর্থহীন যশের লালসা ;
স্বর্গ বলে ব্যর্থ করে বিকট শ্মশান :
আশাহীন রণমদে বৃথা দেয় প্রাণ !
হার—বৃথা দেয় প্রাণ ? যারা জন্মভূমি তরে
ধর্ম্মরক্ষা হেতু দেয় আত্মবলিদান,
বৃথা মরে তারা ! হায়, বিভ্রান্ত হৃদয় !
ধর্ম্ম স্বাধীনতা তরে বীর হৃদয়ের
রক্তপাত ব্যক্ত করে অমর ভাষায়
যে আহ্বান প্রতিধ্বনি তার যুগে যুগে,
অন্ধকার পরাজয় মৃত্যু অতিক্রমি'
গগনে জাগায়ে তোলে অমৃতের বাণী !
যে দেশের বীরবৃন্দ ধর্ম্মের কারণ
যুগে যুগে প্রাণ দিয়ে করেছে শয়ন,
সে দেশের পুত্রগণ আজ ধর্ম্ম হেতু
করুক মস্তক দান, আবশ্যক যদি !
কিন্তু জেনো স্থির নিশ্চয়ে ! ধ্রুব সত্য ইহা
অমর আত্মার বীজ বীর-রক্তপাতে
পর্ব্বতে প্রান্তরে উপ্ত—মরিবেনা কভু—
সুদময়ে, পরিমার জগৎ আলোকি,
বীরবৃন্দ দলে দলে উঠিবে তা'হতে।
নিষ্কামীর রক্তপাত অব্যর্থ সন্ধান।
রাণী—কোন্ দিন, কবে, কোন্ দূর ভবিষ্যতে
দেশের দুর্গতি দূর হবে, তাই ব'লে,
অযুত কোরক সম দীপ্ত ছটি প্রাণ,
দেবে বলিদান, ওই শত্রুর শিবিরে !
হার—সেদিন দেশের ভাগ্যে কি হবে কি জানি ?
রাণী—নিরাশা কাতর প্রাণে কেন বৃথা আমি
এসেছি এখানে ! হায় প্রেমের বন্ধন
জানে না যে, পুত্রহীন, তার কাছে আসা
অরণ্যে রোদন সম ! যাও শূন্য গৃহে
নীরব কোমল কণ্ঠধ্বনি বিবর্জ্জিত ?
অসহ্য বুঝিতে তুমি হৃদয় আমার।
হার—হৃদয়ের কত স্থানে করিলে আঘাত !
তোমারও সন্তানগণ ত্যজিবে জীবন,
ভাল হবে তায় ! কেন সেই চিন্তা করে,
কাতর হৃদয় ! বৃথা ভিক্ত কেন কর
হৃদয় তোমার, যাক্ শান্তি রজনীর
দিয়ে বিসর্জ্জন, কেন পরীক্ষা-অনল
তীব্রতর কর আর ! এ জগত মাঝে
কি ফল লভিবে তুমি এ আয় বিনাশে !
আজ যদি বাঁচে তারা, দেবে পরিচয়
পুন রণরঙ্গে মাতি,—প্রেম কিছু নয় !
কত চিন্তা, কত সেবা, কত ভালবাসা
জীবনের এই গতি না পারে ফিরাতে—
চঞ্চল জগতে এক অচঞ্চল গতি—
যার তরে দিতে চাও প্রাণ বলিদান'
প্রাণ দিয়ে সেই দেবে তৃপ্তি প্রতিদান !
শ্রান্তি তরে নিদ্রা যথা তুমিও কি চাও ;
কাতর হৃদয় তরে মৃত্যু সেইরূপ !
জগতে আমার এই এক পরিণাম !—
যদি বেঁচে থাকে তারা, কতদিন রবে
তব গৃহ আলো করে বালকের মত ?
তোমার অঞ্চল ছেড়ে জীবন-সাগরে
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে দিবে সন্তরণ,
অথবা পর্ব্বতপৃষ্ঠে করিবে গমন,
যাবে জীবনের পথে গৃহ-কোণ ছেড়ে,
রবেনা তোমার চিন্তা তাদের অন্তরে !
রাণী—মিথ্যা কথা, অজ্ঞ তুমি ! কেন ব্যথা দাও
ব্যথিত হৃদয়ে ! মম বীর পুত্রগণ
প্রেমে করুণায় পূর্ণ বীরত্বে যেমন !
হার—আরও পুত্র ছিল, আছে—সর্ব্বশুদ্ধাধার।
থাক্, আর কাজ নাই তিক্ত আলাপনে।
দেখ তুমি এ জগতে আছে কিনা আছে
তোমা হতে শতগুণ দুঃখ গুরুভার।
রাণী—অসম্ভব ! জননীর হৃদয়-কন্দরে
যে ব্যথা সন্তান তরে, অতুল্য জগতে !
হার—পুত্র মম শয্যাশায়ী বীরের শয়নে—
তার রক্তে আভাময় কত নব প্রাণ !
রাণী—পিতা তুমি ! পুত্রহীন সমর-সাগরে !
হার—গভীর বেদনা চিহ্ন দেখ এ ললাটে,

এ নহে মলয়-বায়ে জলের কম্পন—
উচ্চ বংশ, অধিকার, সংগ্রাম, সংকট—
কঠোর আঘাতে যদি মহৎ জীবন
নত হয়, হায় কত তার কি গভীর?
এ জীবন চিরদিন ছিলনা এমন!
রাজ্য অধিপতি, বীর পুত্রের জনক—
আজ শূন্য গৃহ মম, একক জীবন!

রাণী—তোমারও হৃদয়ে আছে সন্তানের ব্যথা—
তবু দুঃখিনীর দুঃখে হবেনা করুণা!

হার—করুণা তোমার প্রতি! বীরকন্যা তুমি,
বীরজায়া, বীরমাতা, সন্তান তোমার
গৌরবে ত্যজিবে প্রাণ তপ্তরক্ত দিয়া—

রাণী—রক্ত! সন্তানের রক্ত! এ কি তুচ্ছ এত?
আনন্দ উৎসবে মত্ত অলস আবেশে
পান-পাত্র ফেলে দেয়, একি সেইরূপ!
হায় প্রাণধন মম! সত্য পিতা তুমি!

হার—থাক্ সন্তানের প্রাণ, গৌরব সাগরে,—
চিরদিন রক্ষমাঝে অমর শোভায়
থাকিবে তাদের স্মৃতি অনিন্দ্য জীবন!
কত তুচ্ছ এ জীবন সংসারে জড়িত
আমার আবদ্ধ দশা বুঝিবেনা তুমি।
অকালে জীবন-সূর্য্য যাবে অস্তাচলে,
বড় শুরু শোকভার! কিন্তু তার চেয়ে
আছে শতগুণ দুঃখ দীর্ঘ জীবনের!
যারে ভালবাসি তার এ মরজীবন
এমন অমৃততুল্য ক'রে তুলি মোরা,
এতই নির্ভর করি সুখ শান্তি হেতু—
মোহে অন্ধ জীব হায়, স্বভাবপ্রকৃতিতে
যায় যবে স'রে, প্রাণ করে হাহাকার!
শৈশবে আমার পুত্র যেত যদি চ'লে,
রবিকর-প্রতিভাত শিশিরের মত
অশ্রুপাত করিতাম বিরহে তাহার,
কিন্তু ভালবাসা এখনও থাকিত স্থির।

রাণী—সংগ্রামে সে দিয়াছে জীবন। তার সাথে
তোমাদের মহোৎসব ছিলতো গৌরব!

হার—গৌরব!—কি?—শান্ত হও; শোন মন দিয়ে;—
শেষ বংশ-চিহ্ন পুত্র মম বক্ষোপরে
ধীরে ধীরে মেরেছিল; অস্ত্রের কৌশল
শিখায়েছিলাম তারে পরম যতনে,
তুমিতেরী দামামার রণঘাত শুনে
উৎসাহে উজ্জ্বল চক্ষু, রক্তিম কপোল,—
কৈশোরেই হয়েছিল বীর ভয়হীন।
স্বচক্ষে দেখেছি তারে সংগ্রাম মাঝারে
বিদ্যুৎ সদৃশ গেছে বাধা অতিক্রমি
চালায়ে বাহিনীকুল বিষম সমরে,
লুণ্ঠিত পতাকা মাঝে, উচ্চ শিরস্ত্রাণ!
আমার জীবন ঘিরে তার যশোভাতি
সঙ্গীতের মত রেখেছিল বিমোহিত।—
কিন্তু হায়, পরিপূর্ণ মহিমার মাঝে
হৃদয়ে পড়িল বাজ অতি নিদারুণ!

রাণী—এমনই হ'য়ে থাকে! হায় সে কারণে
গভীর প্রেমের মাঝে গোপনে বিরাজে
অন্ধকার অকল্যাণ আতঙ্কের ছায়া।
তারপর মৃত্যু-মুখে গেল সে মিলায়ে?

হার—মৃত্যু! মৃত্যু যদি হোত, এ ধরণীতল
তবে হোত স্বর্গসম! যদি তার প্রাণ
রণাঙ্গনে যেত সেই গৌরব শোভায়।
উচ্চ শির নত হলে কি তীব্র যাতনা,
কি আগুন জ্বলে প্রাণে রহিত অজ্ঞাত,
কি হবে কেমনে হায়, মম বংশ-রবি
গেল অস্ত, সে কাহিনী বলিনু তোমায়!
তবু শোন,—সেই পুত্র নয়নের মণি,
প্রাণাধিক প্রিয়তর, ছেড়ে গেল মোরে
বংশের গৌরবস্তূপে পদাঘাত ক'রে,
তুচ্ছ ক'রে পিতৃপ্রেম, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি
দিয়ে চলে গেল হায়! শত্রুর শিবিরে,
বিধর্ম্মী মুরের কন্যা-প্রেম-মদে মাতি—
এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় নয় কি, জননী!

রাণী—ওঃ! বুক ভেঙ্গে যায় তোমার কথায়!

হার—আরো শোন। শতবক্ষ বর্ম্ম দিয়ে ঢেকে

ভুলিতে বিশ্বের জ্বালা—সমর-সাগরে
উন্মত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে দিলাম সাঁতার!

রাণী—আর হয় নাই দেখা?

হার—শোন হও, শোন। দেখা আর একবার
হয়েছিল তার সনে শিবির বিধান—
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় কিরূপে কি জানি,—
নতুবা সে দৃশ্য দেখে সুদূর আকাশে
চন্দ্র সূর্য্য মহা ক্রোধে মুদিত নয়ন।
আর একবার দেখা, সে কেবল হায়,
বজ্রাগ্নির তীব্র দাহে দগ্ধিতে জঠর—
রেখে গেছে বক্ষ মাঝে সে কালিমা রেখা!
একদিন মহাযুদ্ধে অস্ত গিন যবি,
রক্তে বহে নদী, দূর তখনো বিজয়ী,—
ঘন অন্ধকার, তবু চ'লেছে সংগ্রাম,
দীর্ঘ শিরস্ত্রাণধারী বিপক্ষের সহ
আমি যুদ্ধে লিপ্ত আমি উন্মত্ত প্রায়,—
বহুক্ষণ পরে মোর অসির প্রহারে
লুণ্ঠিত হ'ল বীর, বিজয় গৌরবে
দাঁড়ালাম আমি তার ছিন্ন দেহ পাশে;
বাক্য উচ্চারণ-চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল তার,
কিন্তু শেষ কণ্ঠস্বরে কাঁপিল জঠর;
যেন পরিচিত ধ্বনি—চন্দ্রমা প্রকাশে
দেখিলাম, পুত্র মম লুণ্ঠিত ধরায়,—
মোর পানে চেয়ে, ক্ষীণ হস্তে আচ্ছাদিল
উজ্জ্বল নয়ন; ধীরে মৃত্যুর আঁধার
টেনে দিলে সে নয়নে চির যবনিকা!—
চেওনা অমন করে! যাও, চলে যাও!

রাণী—এত দেখে, এত ক'রে তবু আছে প্রাণ!

হার—তবু আছে প্রাণ! কেন? কি বুঝিবে তুমি!
ঘোর অন্ধকারে ডুবেছিল এ জঠর,
ইহলোক, পরলোক, অনন্তের আশা;—
কম্পিত বিভ্রান্ত মনে ধীর বেশ ছাড়ি
নির্জ্জন কুটীরে আমি করিনু প্রবেশ।
নিরাশার অন্ধকার নীরবতা মাঝে
বিদ্যুতের মত এলো গম্ভীর আহ্বান,
সে আহ্বানে নব প্রাণ কে দিল সঞ্চারি'—
উঠে দাঁড়ালাম আমি সিংহের * মতন
শীতের তুষাররাশি শাখা-সঞ্চালনে
ফেড়ে ফেলে দেয় দূরে—অন্তরের বাণী
বলিল কম্পিত স্বরে,—যে রক্তে রঞ্জিত
এই বাহু, সেই রক্ত করিছে আহ্বান,—
দাঁড়াও পতাকা হাতে স্বদেশের তরে,
জাগাও পতিত মৃত নিষ্ক্রীব পরাণে
জাতীয়-গৌরব-স্মৃতি, মাতাও সমরে,
যতদিন নহে দেশ শত্রু-বিবর্জ্জিত!
এখনও বসিনে মোরে, তব পুত্র তরে
শত্রু পদে সমর্পিতে এই জনপদ?

রাণী—আর বলিবনা আমি সে কথা তোমায়।
আশা নাই? কিন্তু তুমি বোঝতো বেদন!
শক্তি আছে তব মুখে, কর সহায়তা
নগর বাহিরে যাব?

হার—কেন? কোথা যাবে!

রাণী—তুমিও জানিতে চাও, কেন, কোথা যাব!
পিতা ছিলে, পুত্রহীন একাকী এখন,
তবুও বোঝ না হায়! হতভাগা নর
দুই দণ্ড যার প্রাণ রবে না ধরায়,
বধ্যভূমি পানে যেতে যেতে তৃষ্ণা পায়
যদি তার, দেও জল চায়,—কে না জানে
এখনি সকল তৃষ্ণা এক খড়্গাঘাতে
হবে দূর চিরতরে, কিন্তু তবু তার
কে না শোনে সেই ক্ষুদ্র অন্তিম প্রার্থনা,
কে না দেয় জল, যাতে জুড়ায় পরাণ?
দারুণ তৃষ্ণায় মোর বুক ফেটে যায়
যাতনা অসহনীয়! যাহাদের মুখ
এ চোকে দেখিব আমি, শুনিব বচন
তাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা আমার।
এই কি বিধির বিধি—করিবে তাহারা?
শিবিরে নিষ্ঠুর শত্রু বর্ম্ম পরিহিত,
কে জানে সে বর্ম্ম মাঝে আছে যে হৃদয়

* এক প্রকার প্রকাণ্ড বাঘ।

জননীর অশ্রুজলে হবে না কোমল ?
যার—কি ? শত্রুর শিবিরে যাবে রাজার মহিষী
পুরুক পাপের যাত্রা দুষ্টের দস্যুর !
পাগল হয়েছ তুমি ! শত্রুব্যূহ ভেদি
কেমনে যাইবে তুমি পুত্র দরশনে !
রাণী—শত্রুব্যূহ ? দুঃখে যারা কে দেয় জগতে ?
যার—অসম্ভব। মহাপ্রাণ মহারাজ শিরে
গুরুভার, বক্ষে তার অশেষ যাতনা,
আর বাড়িও না বোঝা তীব্র যাতনার
স্বামী বক্ষে মহারাণী, করোনা আঘাত !
যাও, গৃহে যাও। ডাক সর্ব্বশক্তিবলে,
চাও শক্তি তাঁর কাছে পুত্রের কল্যাণ।

(আচার্য্যের প্রস্থান)

রাণী—সকলের এক কথা ! এই কি মানুষ !
দুঃখীর বেদনা যারা করে হেয় জ্ঞান
এখনি না হয় কেন তাদের পতন !
না—না—একি কথা—ইনি দেবতুল্য নর,
আপন সন্তানে নাশি আপনার হাতে,
এখনও মহৎ ভাবে অনন্য অন্তর,
দেশের গৌরব তরে ! কেও নাই সম ! (গভীর চিন্তা)
আছে পুরাতন ভৃত্য, সন্তান-পালক,
অনুগত,—নিশ্চয় সে আমার আহ্বান
মাথা পেতে নেবে ! যাই তাহার সন্ধানে।

(প্রস্থান)

———:০:———

নারীজাতির উচ্চশিক্ষা

একদল শিক্ষিত লোক বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষাই নারীদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই মতাবলম্বী লোকেরা নারীদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রধানতঃ এই কয়টি কারণ দেখান—শারীরিক দুর্ব্বলতা, বুদ্ধিহীনতা, স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা, বিলাসিতা, এবং গৃহধর্ম্মে অবহেলা। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই যুক্তিগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

১ম. শারীরিক দুর্ব্বলতা। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, শারীরিক শক্তিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন। প্রকৃতি নারীকে কোমল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নারীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রথা নারীর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিধান করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে; নতুবা কন্যার পিতৃকুল নরকগামী হইবেন। শাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ী ভারতের সর্ব্ব দুধেই বালিকা বিবাহ, এমন কি শিশু বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত। যে বয়সে অন্য দেশের মেয়েরা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে এবং খেলা ধূলা নিয়া ব্যস্ত থাকে, সে বয়সে আমাদের দেশের মেয়েরা সংসার ধর্ম্ম পালনে ব্যস্ত। বাল্যবিবাহ ও বালমাতৃত্ব ভারতবর্ষীয় নারীদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও অকাল মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। মহাযুদ্ধে অনার্য্য জাতির সংস্রবে আসিয়া, আর্য্য-জাতির ভিতর এই ভয়ানক অনিষ্টকর প্রথা প্রবেশ করে। বৈদিক ঋষিগণ যুবতী বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অবরোধ প্রথা নারীদের দুর্ব্বলতার আর একটি কারণ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই কুৎসিত প্রথা ছিল না। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা অবরোধ প্রথার কোন অস্তিত্ব পাই না। রাজর্ষি জনকের সভায় সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্য শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বিদুষী প্রকাশ্য রাজ-সভায় মহারাজ দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সীতা রামচন্দ্রের সহিত রাজ-সভায় এক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদিগের অভিমত যে, অবরোধ প্রথা মুসলমান শাসনের সময় হিন্দু সমাজে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। রাজজাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করা জিত জাতির পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, হিন্দুরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে এই প্রথা নিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়, আমাদের দেশে

নারীদের কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করিবার সুবিধা নাই। সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আরও বাড়িয়া যায়। প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করুন। ভারতের রমণীরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য মহিলারা নানাপ্রকার শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। নারীদের স্বাস্থ্যোন্নতির পথে সকল প্রকার সামাজিকবাধাবিঘ্ন দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

২য়, বুদ্ধিহীনতা। আমাদের বিশ্বাস মানসিক শক্তিতে রমণীরা পুরুষদের অপেক্ষা হীন নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে আমরা নারী-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে কত বিদুষী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খনা, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, দেবহুতি, বিশ্ববারা, খনা, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদের জীবন কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করি। বর্ত্তমান সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ইউরোপে, আমরা অসংখ্য প্রতিভাশালিনী মহিলার পরিচয় পাই। জর্জ ইলিয়ট, মেরী কেরেলী, রসেটী, ব্রাউনিং, জেন অষ্টিন প্রভৃতি মহিলারা কোন পুরুষের চেয়ে মানসিক শক্তিতে হীন নহেন।

অনেকে বলেন যে পৃথিবীতে যত প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় প্রতিভাশালিনী রমণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহার উত্তরে আমরা বলিব নারীদের বুদ্ধি বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় নাই। পুরুষদের জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য কত স্কুল, কলেজ, সভা, সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। নারীদের জন্য অতি সামান্য আয়োজন করা হইয়া থাকে। মানিলাম, নারীর স্বাভাবিক বুদ্ধি শক্তি পুরুষের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু সেই জন্য কি তাহার উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে? যাহাদের বুদ্ধিশক্তি প্রখর নয়, তাহাদের শিক্ষার জন্য আরও বেশী যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক।

৩য়, স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা। আমরা সর্ব্বদা অভিযোগ শুনিয়া থাকি যে, উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলারা বড় স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়। তাঁহারা পুরুষদের কথা গ্রাহ্য করেন না। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। শিক্ষা বলে—"মানুষ! তুমি ছোট নও, তুমি বড়। তোমার ভিতর সেই অনন্ত শক্তি বিরাজিত। তুমি দুর্ব্বল নও। তোমার শক্তি বিশ্বজয় করিতে সমর্থ। তোমার স্বাধীনতা আছে।" সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা যাহার লাভ হইয়াছে, তাহার আত্মসম্মান বোধ জাগরিত হইবে। অশিক্ষিতা নারীর সম্মান-জ্ঞান নাই। চিরজীবনের সংস্কার তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছে। শত প্রকার লাঞ্ছনা, অপমান, গঞ্জনা ও তিরস্কার, সে নীরবে সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষালাভ করিয়া যাহার আত্মশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাহার পক্ষে এই প্রকার ঘোরতর অন্যায় ও অত্যাচার বিধাতার দান স্বরূপ গ্রহণ অসম্ভব।

আমাদের সমাজে নারীর অধিকার কতটুকু? স্বার্থপর পুরুষ নারীকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। উচ্চতম সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষায় নারীর অধিকার নাই। পুরুষ পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে পারে, নারীর চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখাও অন্যায়। ষষ্ঠি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ অনায়াসে ষোড়শ বৎসরের বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু দশম বর্ষীয়া বিধবা বালিকার পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ। পুরুষ মদ্য পান ব্যভিচার প্রভৃতি শত প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে পারে, তথাপি সে নারীর পূজ্য দেবতা। কিন্তু বিনাপরাধে নারী পুরুষ কর্ত্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে পারে। পুরুষ সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া পাপাচারের অনুষ্ঠান করে। সমাজ পুরুষের শাসনের জন্য কোন বিধি ব্যবস্থা করেন না। কিন্তু নারী সামান্য প্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। তাহাকে একেবারে রাস্তায় নামিতে হয়। অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শিক্ষা পাইলে মেয়েরা তাহাদের অধিকার বুঝিবে, এই জন্য পুরুষেরা তাহাদিগকে চিরকাল

অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। পুরুষেরা সহস্র প্রকার অত্যাচার করুক, মেয়েদের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিধান।

সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, শিক্ষিতা মেয়েদের ভিতরও স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান বোধ খুব কম। তাহাদের অনেকের লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকে কোন প্রকার স্বাধীন ভাব ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সহস্র বৎসরের সংস্কার কয়েক বৎসরের শিক্ষায় বিলুপ্ত হয় না। আমরা আশা করি শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যখন নারী আপন স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে পুরুষের প্রকৃত সহযোগিনী হইতে পারিবে। নারী-শক্তির উদ্বোধন ভিন্ন ভারতের আর কল্যাণ নাই।

৪র্থ, বিলাসিতা। বিলাসিতা সম্বন্ধে এই দেশের লোকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকেও বিলাসিতা মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বিলাসিতা নহে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ব্যবহার করাকেই বিলাসিতা বলা যাইতে পারে। আমরা দুঃখের সহিত স্বীকার করি যে, কোন কোন শিক্ষিতা মহিলাকে যখন তখন একটু বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। আমরা কিছুতেই ইহা সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু এই স্থলে একটি কথা বলিব। অশিক্ষিতা মহিলারা আরও বেশী বিলাসিতা-প্রিয়। ধনী হিন্দু পরিবারের বধূদের ও মেয়েদের বহু টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়। যিনি কোন প্রকারে কায়ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিও মেয়েদের অলঙ্কারের টাকা যোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত হন। অর্থ-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হিন্দু মহিলাদের এই অলঙ্কার-প্রিয়তা ভারতবর্ষের দরিদ্রতার একটি প্রধান কারণ। যতগুলি মুদ্রা বাজে অলঙ্কারে প্রস্তুত হয়, ঐ মুদ্রাগুলি দ্বারা কল, কারখানা খুলিলে, ভারতের অর্থাগমের একটা উপায় হয়। বিলাসিতার সঙ্গে শিক্ষার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। যিনি প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন, বিলাসিতা জ্ঞান উপার্জ্জনের অন্তরায় স্বরূপ। বর্ত্তমান যুগ বিলাসিতার যুগ। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিলাস সামগ্রীর সৃষ্টি হইতেছে। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সরলভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেছিনা। ধনী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ সকলেই এ বিলাসিতার আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এখনকার শিক্ষিত পুরুষেরাও কি পূর্ব্বকার পুরুষদের চেয়ে অধিকতর বিলাসী নয়? বেশভূষা ও আহার বিহারের জন্য, তাঁহারা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আমাদিগকে পুনরায় সেই সহজ পথে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৫ম, গৃহকার্য্যে অবহেলা। কোন কোন শিক্ষাভিমানিনী মহিলাকে গৃহ কার্য্যে অবহেলা করিয়া নাটক নভেল পাঠে সময় কাটাইতে দেখা যায়। ইহারা শিক্ষার নামে কুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। গৃহ ধর্ম্মই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নারী-জন্ম ধারণ করিয়া যিনি গৃহকার্য্যে পরাঙ্মুখ হন, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু গৃহকার্য্য বলিতে শুধু রান্না করা, বাসন মাজা অথবা ঘর ঝাট দেওয়া বুঝায় না। এই কার্য্য গুলি অবশ্যই প্রতিপাল্য। কিন্তু তাহাকে ইহার চেয়ে অনেক গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সেই জন্য সুশিক্ষার আবশ্যক। নারী সন্তানের জননী, সন্তান-শিক্ষা অতি কঠিন কার্য্য। বাল্যকালে সন্তানেরা জননীর নিকট যাহা শিক্ষা করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সেই শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। অশিক্ষিতা জননীরা সন্তানদিগকে বহুৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করে না। তাহারা শৈশব অবস্থায় সন্তানদিগকে যে সকল কুসংস্কার শিক্ষা দেন, সন্তানদের সমস্ত জীবনে তাহার বিষময় ফল দেখা যায়। সুশিক্ষিতা জননীগণ শৈশব সময়েই সন্তানদের হৃদয়ে মহত্বের বীজ রোপণ করিয়া থাকেন। ফলে উহা ফল পুষ্প শোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়। সুতরাং নারীদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আজ আর বেশী বলিবার ইচ্ছা নাই। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকালিচরণ দাস।

পায়ের কাঁটা

(১)

অনিলের দাদার বিবাহ হইতেছিল। দাদার পার্শ্বে বসিয়া শিশু অনিল অবাক হইয়া বিবাহ দেখিতেছিল। দাদার অপরূপ বেশ,—পরিধানে রক্ত পট্টবস্ত্র, মাথায় বিচিত্র টোপর, ললাটে চন্দন-রেখা, করোপরি একটি তরুণীর কর স্থাপিত। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছিল। চারিদিকে লোকসমাগমের কোলাহল, অন্দরে রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত শুভ হুলুধ্বনি, বাহিরে সেঁদ ও পোরা বাজনার খিচুরি রাগিণী, এবং ক্বচিৎ সেই রাগিণীকে লক্ষিত করিয়া দু'একটা বোম্ ভীমনাদে ফুটিয়া শিশুর মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছিল, আর ভয়ে সে একটু একটু দাদার দিকে সরিয়া বসিতেছিল।

বিবাহ-মণ্ডপ নানা পত্রপুষ্প ও রঙিন কাগজ-কাটা লতা ফুলে সজ্জিত। চারিদিকে তাড়া করা ঝাড়লণ্ঠনের ভিতর হইতে মোমবাতিগুলি ক্ষীণ ভাবে জ্বলিয়া জ্বলিয়া আলো বিতরণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, এবং তীব্র-গন্ধযুক্ত অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক-সমক্ষে ম্লানভাবে পুড়িয়া ছাই হইতেছিল।

অন্দরের দিকে চিক টাঙান,—তাহার ভিতরে বসিয়া রমণীরা বিবাহ দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধাগণ সংসারের সুখ দুঃখের আলাপ জুড়িয়াছিলেন, নবীনাগণ প্রাণের পরদা খুলিয়া প্রেমের রাজ্যের কাহিনী কহিতেছিলেন। আজিকার এই মধুমুহূর্ত্তে তাহাদের সকলের প্রাণে আনন্দ-আলোকিত, স্বপ্ন-তান-মুখরিত এক স্মরণীয় মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িল। সেই মুহূর্ত্ত ও আজিকার এই মুহূর্ত্ত,—ইহার ভিতর কাহার অদৃষ্টে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

অনূঢ়াগণ বিবাহ দেখিতে দেখিতে এ উহার গা টেপাটেপি করিতেছিল, এবং এই শুভ মুহূর্ত্তের আশায় অনেকের হৃদয়ে পুলকোচ্ছ্বাস বহিতেছিল। দু'একটা উজ্জ্বল কৃষ্ণ অক্ষি-তারকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণে বাহিরের কোন কোন যুবকের দৃষ্টি-তরঙ্গ চিকের ফাঁকে ফাঁকে অন্দরের এই স্থানে আসিয়া ভাসিতেছিল।

বয়স্কগণ সামিয়ানার নীচে ফরাসে বসিয়া, মোটা মোটা তাকিয়ায় দেহভার অবশভাবে হেলাইয়া, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে—আঁয়াসের আভাস জানাইয়া—অমুরি তামাকের ধূম উদ্গীরণ করিতেছিলেন, এবং ফরাসের বাহিরে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লুব্ধ নেত্রে হুকার দিকে সঘন দৃষ্টিপাত করিয়া সেই সৌরভটুকুর প্রাণেই ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেছিল, আর যদি পরজন্ম হয় তাহা হইলে যেন এই 'বাবু' শ্রেণীর লোক হইয়া জন্মিতে পারে, ভগবান সমীপে এই প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ জানাইতেছিল।

বরকর্ত্তাগণ নাদা-বিবরে ঘন ঘন নস্য প্রবেশ করাইয়া, মেজাজ উষ্ণ করিয়া যেন পাওনা ও কৌলীন্য সম্বন্ধে উষ্ণ বাকবিতণ্ডা করিতেছিলেন এবং যখন এই বাক্‌যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইল তখন কন্যাপক্ষীয়গণ রজতগোলকরূপী শুভ্র পতাকা (white flag) হস্তে আসিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। শুভকর্ম্মে রক্তপাত কুলক্ষণ!

বর-কনের মনে কি হইতেছিল তাহা অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাই ধারণা করিয়া লইবেন। ঠিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখি,—বরের বয়স ঊর্দ্ধে পঁচিশ কি ছাব্বিশ, কনের বয়স চৌদ্দ কি পোনর;—বর ইংরাজি-শিক্ষিত সুঠাম সুন্দর যুবা পুরুষটি, আর কনে নভেল পড়া, জ্যোৎস্নায়-পড়া, ফুটফুটে তরুণীটি।

বালক অনিল বিস্ময়ে একবার দাদার মুখের দিকে, একবার অবগুণ্ঠনবতীর দিকে বড় বড় টানা টানা সরল চোখ দুটি স্থাপন করিয়া ভাবিতেছিল 'এ কে? দাদাকে ধরিয়াছে কেন!' এরূপ কোমলমূর্ত্তি হইতে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, এবং দাদা যখন পুরোহিতের সহিত মাথামুণ্ড বকিয়া বকিয়া এক একবার তাহাকে কোলের দিকে টানিতেছিল তখন বালক নিশ্চিন্ত হইল—ভয়ের কোন কারণ নাই।

বিবাহ দেখিতে দেখিতে বালক দাদার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল—আকাশ নীলিমাময়,—সেই নীলত্বের ভেদ করিয়া অভিনব আলোক-মালা ফুটিয়া রহিয়াছে।—কোনটা লাল, কোনটা পীত, কোনটা হরিৎ,—এমন আলো শিশু জীবনে দেখে নাই।

তাহার ভিতর একটা স্নিগ্ধ সবুজ আলো জ্বলিতেছিল,—ক্রমে তাহা বড় হইতে লাগিল এবং তাহা ভেদ করিয়া এক মনোহর মাতৃমূর্ত্তি বাহির হইয়া শিশুর অঙ্গস্পর্শ করিল। কি মধুর স্নেহস্পর্শ! বালক পুলকে শিহরিয়া উঠিল, এমন মধুর স্পর্শ সে পৃথিবীতে আর অনুভব করে নাই। মূর্ত্তি, চম্পকাঙ্গুলী তরুণীর দিকে স্থাপন করিয়া, মধুবর্ষণ করিয়া বলিলেন, "অনিল, আজ হইতে এই তোর মা।" শিশু বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে মূর্ত্তির দিকে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে তরুণীর দিকে চাহিল,—আবার মূর্ত্তির দিকে চাহিল; কিন্তু আর দেখিতে পাইল না। সে স্নেহময়ী মূর্ত্তি, সে আলোকরশ্মি নিবিয়া গিয়াছিল;—সে স্থলে দেখিল, শুধু রাশি রাশি জমাটবাঁধা কাল মেঘ স্তরে স্তরে আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে,—আর তাহার ভিতর দিয়া কাচা রক্তের মত টক্‌টকে লাল বর্ণের একটা উল্কা দ্রুতগতিতে ছুটিয়া যাইতেছে। • • •

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। শিশু ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; তারপর উদাসভাবে চারিদিক তাকাইয়া, ধাত্রীর কোল ছাড়িয়া উঠিয়া কচি কচি হাত দুটিতে অবগুণ্ঠনবতীর কণ্ঠ জড়াইয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বলিল, "তুমি মা?"

স্বপ্ন কি জানি না।—ইহা অমূলক চিন্তা বা দিবসের জল্পনার ভ্রান্ত প্রতিমূর্ত্তি,—বৈজ্ঞানিকগণ যাহাই বলুন,—এই অবোধ সরল শিশু স্বপ্নে অবিশ্বাস করিল না। সে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির নির্দ্দেশে এই অবগুণ্ঠনবতীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিল।

বিস্ময়ে হর্ষে বিষাদে সুনীলের চক্ষু হইতে দরদর বারি বিগলিত হইল; হায়! আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি জনক জননী জীবিত থাকিতেন! তাঁহারা কোন্ সুদূর অজানা রাজ্যে!

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দ,—কেবল নৈশ-সমীরণ বাহিরের রজন চৌকীর সানাইয়ে করুণ সুর বহিয়া আনিয়া সভাস্থলে এক উদাসভাব ছড়াইতে লাগিল। চিত্তের ভিতর অনেক সন্তানহারা রমণীর রুদ্ধ সন্তান-শোক সহসা কটিকা-সংক্ষুব্ধ সাগরের মত প্রবলভাব ধারণ করিল, তাহাদের সমস্বর ক্রন্দনরোলে নৈশ-সমীর আকুল হইয়া উঠিল।

বধূর হৃদয়েও বোধ হয় মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিয়াছিল, সে বালককে সস্নেহে ক্রোড়ে টানিয়া নিল। বালক তাহার কোল ছাড়িয়া বসিয়া কচি হাতে তাহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। • • •

এইরূপে শিশু অনিল নিজ হইতেই ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিল। বস্তুত এই বয়সে মাতৃস্নেহের জন্য যে একটা একটা লালায়িত না হইয়াছিল তাহা নহে; সে তাহার স্বাভাবিক কোমল হৃদয়ের অপর্য্যাপ্ত স্নেহে,—বর্ষার উচ্ছ্বসিত তটিনীর মত স্নেহনীরে বালকটিকে ছাপাইয়া ফেলিল। নিদাঘের রৌদ্রতপ্ত পাদপ যেমন বর্ষার বারিপাতে মুকুলিত হইয়া উঠে, বালকের শুষ্ক প্রাণ স্নেহনীরে তেমনি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। মাতৃহারা শিশুর মুখে যে একটা স্বাভাবিক কালিমা-রেখা ফুটে হয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে একটা অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি আপনি জাগিয়া উঠে তাহা দু'দিনেই দূর হইল। পূর্ণিমার শশিকলার ন্যায়, বর্ষার সলিলপুষ্ট নদীর মত, শিশুর সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, প্রফুল্লতা আসিয়া দেখা দিল;—দেখিয়া সুনীল আবার মহোল্লাসে সংসার করিতে লাগিল।

(২)

সুনীল এই নিরাশ্রয় শিশু ভাইটিকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। একবোঝা দুঃখ ও নিঃসহায় এক বৎসর-বয়স্ক শিশু ভাইটির ভার তাহার কাঁধে অর্পণ করিয়া পিতামাতা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সুনীলের তখন বাইশ বৎসর বয়স। সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সংসারের কঠিন পীড়ন সহিতে অক্ষম, স্নেহের ক্রোড়ে লালিত যুবক,—হৃদয়ে একপ্রাণ আশা, শান্তি লইয়া সুখের রাজ্যে সুখকল্পনায় মগ্ন ছিল,—সহসা সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল, বীণার প্রথম মূর্চ্ছনা না বাজিতেই তার ছিঁড়িল। সংসারের দিকে তাকাইয়া দেখিল,—সম্মুখে দুঃখ ঝঞ্ঝাবাত্যা-তাড়িত বিশাল পরীক্ষা-সাগর, সীমাহীন, পারাপারশূন্য।

ভাইটিই এখন তাহার একমাত্র বন্ধন, আকর্ষণ। তার কল্যাণ চিন্তাই এখন সুনীলের প্রাণের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিল। ভাইয়ের জন্য সে সব করিতে পারে কিন্তু শিশুপালনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ঈশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য

এমনই, যে তিনি স্ত্রীপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যগুলি বেশ চিনিয়া যেন গণ্ডীর ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছেন। অথবা টাকার লোভ দেখাইয়া এক দূর সম্পর্কীয়া বিধবার হস্তে শিশু ভ্রাতার লালন-পালনের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু অর্থ দ্বারা যে স্নেহ ক্রয় করা যায় না, স্নেহের কাঙাল শিশুর অবিরাম ক্রন্দনেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া ভাইয়ের দিকে চাহিয়াই সুনীল বিবাহ করিল। অলকাপুরের জমিদার-কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল, এবং অনিল আপনা হইতেই ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিল।

সুনীল সোয়াস্তির হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল,—আর তাহার বুক হইতে একটা বিষম ভারি পাথর নামিয়া গেল।

প্রতিদিন কর্ম্মান্তে গৃহে ফিরিয়া যখন দেখিত—শিশু ভাইটি কেমন বৌদিদির কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে বা হাসিমুখে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে তখন সে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত 'হায়রে মাতৃহীন, পৃথিবীতে সবচেয়ে দুই-ই দুঃখী।' তারপর মূলকরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত 'ভগবান, এই ভাবেই যেন দিন যায়।'

যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে শিশুরা তাহার সহিতই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিমান আবদার করে। শুধু শিশু কেন, পৃথিবীর রীতিই এই। তাই কোন কবি বলিয়াছেন—'অভিমান তত তার'পর যে যাহার আপনার যত।'

এই অভিমান আবদারের চোটে চারুকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। কিন্তু দেবর যখন ভ্রাতৃজায়াকে আপনা হইতে প্রথমেই মাতৃরূপে গ্রহণ করিল তখন বাধ্য হইয়া ভ্রাতৃজায়ারও নিজেকে মাতৃ সিংহাসনে বসাইতে হইল।

(৩)

এইরূপে নয় বৎসর কাটিয়া গেল। দেবর ভ্রাতৃবধূর স্নেহের সম্বন্ধ এই নয় বৎসরে আরো গভীরতর হইয়াছে। অনিল একদিন বৈকালে পুঁথি বগলে হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। সে এখনও মায়ের কাছ-ছাড়া থাকে না। অনেক বুঝাইয়া, বলিয়া কহিয়া, নানা জিনিষের লোভ দেখাইয়া তাহাকে গ্রামের এন্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। প্রথম প্রথম দুপুর বেলাটা মাকে ছাড়িয়া স্কুলে থাকিতে তাহার বড়ই কান্না আসিত, ক্রমে এটুকু সহ্য হইয়া গেল, সে নিয়মিতরূপে স্কুলে পড়িতে লাগিল।

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে বড্ড হাসি যে! স্কুলে প্রাইজ হয়েছিস বুঝি?" অনিল মাথা নাড়িয়া 'না' জানাইল। ঘরের ভিতর পুঁথিগুলি রাখিয়া আসিয়া মায়ের গলা ধরিয়া বলিল, "এই দেখ তোমার জন্য কি এনেছি মা!" চারু অবাক হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "কি এনেছিস্ রে?—দেখি!" অনিল মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "আগে বল তুমি খাবে, তবে দেখাব।" চারু বলিল "যা, তবে না দেখালি, আমি রান্না কর্ত্তে যাই" এই বলিয়া ধুচুনি হস্তে প্রস্থানোদ্যতা হইল। অনিল পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, তারপর চাদরের ভিতর হইতে একটা শালপাতার ঠোঙা বাহির করিয়া বলিল "তুমি ছানার বরফি ভালবাস মা, তাই এনেছি।" সবিস্ময়ে চারু বলিল "আমার জন্য ছানার বরফি! পয়সা দিল কে রে?" "যে দিক্‌ না মা তোমাকে খেতেই হ'বে" বলিয়া অনিল জোর করিয়া চারুর মুখে বরফি গুজিয়া দিতে লাগিল। চারু হাত মুখ নাড়িয়া বিস্তর আপত্তি জানাইতে লাগিল, কিন্তু অনিল বলিল "যদি তুমি না খাও তবে আমিও বলে রাখ্‌ছি—আজ কিন্তু খাব না, খাব না, খাব না।" সে তিন সত্য করিল, কাজেই বাধ্য হইয়া চারুর খাইতে হইল।

রাত্রিবেলা যখন সুনীল ও অনিল খাইতে বসিয়াছিল তখন চারু সুনীলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি অনিলকে বরফি কিন্‌বার পয়সা দিয়েছিলে?" সুনীল বলিল "না, আমি দেইনি ত।" চারু অনিলকে বলিল, "কি রে তবে পয়সা পেলি কোথায়?" দায় কাহে, বেচারা ফাঁপরে পড়িল। ফাঁকি দেওয়া চলে না। অসম্ভব মনোযোগের সহিত মাছের কোলে ভাত মাখিতে মাখিতে নত দৃষ্টিতে অনিল বলিল "জলখাবার পয়সা থেকে।" চারু চমকিয়া উঠিল, "জলখাবারের পয়সা? সেত মোটে চা'র পয়সা। তুই বুঝি এক দিনও জলখাবার কিনে খাস্‌নে। সব জমিয়ে বরফি কিনেছিস?" স্বচ্ছদর্পণে যেমন সম্মুখস্থ দ্রব্যের ছায়া প্রতিফলিত হয়, অনিলের এই কার্য্যে তেমন তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভাব প্রকাশিত হইল। আজ চারু

বুঝিল অনিলের ভালবাসা কত অপার, অতলস্পর্শী। অনিল গ্লাসটা মুখে পুরিয়া নীরবে চিবাইতে লাগিল,—তাহার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া গিয়াছিল।

সুনীল ব্যাপার না বুঝিতে পারিয়া হাঁ করিয়া ছিল, এখন ব্যাপার সম্যক বুঝিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছোলার ডালে চিনি ও দুধের বাটিতে নুন মিশাইয়া ফেলিল।

এই সামান্য কার্য্যের ভিতর বালকের হৃদয়ের যে অসীম অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল তাহা বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না।

(৪)

ইহার কিছুদিন পরে একটি ঘটনা ঘটিল। চারুর একমাত্র ভগ্নী তরুর বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হইল। তিনি তিনটি পুত্র—তন্মধ্যে কনিষ্ঠটির সাত বৎসর বয়স—ও একটি পরিবারকে কাঁদাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। এ সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া চারুর পিত্রালয়ে গমন করিতে হইল। এরূপ রোগ ও শোকের ভিতর অনিলকে নেওয়া যায় না, তাই ইচ্ছা করিয়া অনিলকে নেওয়া হইল না। অনিল তখন স্কুলে ছিল। বাড়ী ফিরিয়া ডাকিল "মা!" ভাবিল মা বোধ হয় গৃহকার্য্যে ব্যস্ত। ঘরে বহি রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া ডাকিল "মা!" রান্নাঘরের ভিতর পুরাতন চাকর রামচরণ রান্না করিতেছিল, বলিল "মা অলকাপুর গিয়াছে।" অনিল রাগিয়া বলিল "ক্ষিদের সময় ফাজলামি ভাল লাগে না, মা কোথায় বল।" রামচরণ মুখ ভার করিয়া বলিল "বল্লুম তা বিশ্বাস করবে না ছোট দাদাবাবু, তবে বড় বাবুর কাছে জিজ্ঞাসা কর।" অনিল তাহাই করিল। সুনীল হঠাৎ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, এই আদুরে ভাইটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার উত্তর যোগাইল না। উঠিয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিল "আয় অনিল, তোর খাবার তৈরি আছে, খাবি আয়।" অনিল নড়িল না, বলিল "মা গেল কোথায়?" সুনীল আস্তে আস্তে অস্ফুটস্বরে বলিল "বেড়াতে গেছেন।" "যা! বেড়াতে যায় এখন, আমার ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে।" "খাবার তৈরি আছে খাবে এস।" চীৎকার করিয়া অনিল বলিল "আগে বল, মা কোথায় গেছে, তবে খাব। স্কুল থেকে আসবার সময়, তিনি গেলেন এমন বেড়াতে!" সে বাঁকিয়া বসিল।

সুনীল দেখিলেন মহিল ব্যাপার ক্রমেই বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতেছে সমস্ত দিয়া বলিলেন "মা যাবে। তোর মা দু'দিন বাদেই আসবে। তার চোখ্ মরে গেছে তাই অলকাপুর গেছে।" অনিল কাঁদিয়া বলিল, "আমার ফেলে গেল কেন?"

"অসুখের বাড়ী তোকে নিয়ে যাবে নাকি!"

অনিল আর কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে খাবার ঘরে ঢুকিল; জানালা দিয়া খাবারগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর মেঝের উপর বসিয়া দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, কাঁদিতে লাগিল; অভিমানে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় রামচরণ তাহার খোঁজে ঘরে ঢুকিল। অনিল তাড়াতাড়ি কাপড়ের কোচায় চোখের জল মুছিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। রামচরণ খাবারের পাত্র খালি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কার্য্যে চলিয়া গেল।

অভিমানে দুঃখে অস্থির হইয়া সে পাগলের মত বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। আশেপাশে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিয়া লাগিয়া সন্ধ্যাবেলা যখন রাগটা পড়িল তখন অনিল গৃহে ফিরিল। ফিরিয়া অন্ধকার গৃহের এক কোণে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'মায়ের কি আমার জন্য কষ্ট হয় না? আমাকে এমনি করিয়া ফেলিয়া গেল। মা আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে না, নহিলে এ ভাবে একা রাখিয়া যাইত না।' অবশ্যভেদে মায়ের এই আচরণটা সামান্য হইলেও অনিল সহ্য করিতে পারিল না। দুস্তর অতলস্পর্শী সাগরের ভিতর একটা অবলম্বন পাইলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তাহা আঁকড়াইয়া ধরে, এক মুহূর্ত্তের জন্য সে অবলম্বন ত্যাগ করিতে চায় না, বান্ধবহীন এই বালকটিও বৌদিদিকে মাতৃভাবে পাইয়া তেমনি এক মুহূর্ত্তের জন্য কাছ-ছাড়া করিতে চাহিত না।

ক্রমে, রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল অভিমান ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার মা গল্প না বলিলে,

পিঠে হাত না বুলাইলে তাহার ঘুম আসিত না; ঘুম আসিল না, এপাশ ওপাশ ছটফট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তাহার অস্ফুট ফোঁস ফোঁস শব্দ ক্রমশঃই স্ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সুনীল অন্য পাশে শুইয়াছিলেন, এই শব্দে জাগিয়া বলিলেন, "কিরে কাঁদিস নাকি!" অন্ধকারে ভয়ানক মাথা নাড়িয়া বা হাতে নাক ঝাড়িয়া, ভরা গলায় সে বলিল "কাঁদিনি। বড় গরম—তাই।" বাহিরে বেশ বৃষ্টি নামিয়াছিল এবং সুনীল শুইতে অভ্যস্ত হইয়া বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার হাসি পাইল বলিলেন "বড় গরম লাগে, একটু বরফ খাবি!" তিনিও খাট ছাড়িয়া অনিলের পার্শ্বে আসিয়া শুইয়া বলিলেন, "কাঁদিস্ না, দুদিন বাদেই তোর মা আসবে।" তিনি সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অনিল জোর করিয়া একধারে সরিয়া গিয়া, অপরাধের মত চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। দাদা আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না; অচিরেই তাঁহার নাসিকা-ধ্বনি তাঁহার গাঢ় নিদ্রার কথা প্রচার করিয়া দিল। আর অনিল ছটফট করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিল, সে স্বপ্নে দেখিল সে দিনকার মত—কোন্ দিন ঠিক মনে পড়িল না—আকাশে জমাট-বাঁধা কাল মেঘ স্তরে স্তরে ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর তাহার ভিতর একটা কাচা রক্তের মত লাল উল্কা দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। সেই উল্কাটা ফিরিয়া তাহার দিকে আসিল। সেই উল্কার ভিতর হইতে একটা বিকট মূর্ত্তি বাহির হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিল, তয়ে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল 'তুমি কে!' মূর্ত্তি বলিল, 'পায়ের কাটা।' অনিল শিহরিয়া উঠিল। ঘুম হইতে জাগিয়া পুকুরের ধারে যাইয়া জলের কাছে স্বপ্নের কথা বলিয়া আসিল। জলের কাছে কুস্বপ্নের কথা বলিলে তাহা নাকি ফলে না। অনিল একটু নিশ্চিন্ত হইল।

(৩)

কয়েকদিন পর বৈকাল বেলা নানা তরীর চীৎকারে পাড়া কাঁপাইয়া উড়িয়া বাহকেরা একটি পাল্কী সুনীলের ভিতর বাড়ীর উঠানে আনিয়া নামাইল। অনিল গৃহের ভিতর বিষণ্ণ মনে বসিয়াছিল, কোলাহল শুনিয়া বাহিরে আসিল। পাল্কী দেখিয়া বুঝিল 'মা আসিয়াছে।' তাহার ক্ষুব্ধ অভিমান জমিয়া উঠিল, আবার ঘরের মধ্যে যাইয়া ঢুকিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল আর সারিয়া মায়ের সঙ্গে কথা কহিবে না। কিয়ৎক্ষণ পর চাকরেরা ট্রাঙ্ক, বোচ্‌কাগুলি ঘরে আনিয়া রাখিল; চারু ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "অনিল, ভাল আছিস্ ত!" অনিল কথা না কহিয়া মুখ ফিরিয়া রহিল। চারু বলিলেন "কিরে, আমার ওপর রাগ করেছিস বুঝি! ছিঃ! তুই ত আর ছেলে মানুষটি নোস্ যে এখনও মা ছেড়ে থাকতে পারবি না।" তিনি আসিয়া সস্নেহে তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এ স্নেহ স্পর্শে অনিলের অভিমান উছলিয়া উঠিল, যে জমাটবাঁধা অভিমানের চাপে তাহার সমস্ত হৃদয়টা পিষিয়া যাইতেছিল, মুহূর্ত্তের ভিতর তাহা তরল হইয়া অশ্রুরূপে দুইখণ্ড বহিয়া চলিল, সে মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা মায়ের পার্শ্বে একটি বালককে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, সেদিনকার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। সেই রক্তবর্ণ উল্কার ভিতর হইতে যে মূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল এই বালকের মুখ যেন তাহারই মত। অনিল স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলিল, "এ কে মা?" "তোরই ছোট ভাই অনিল।" অনিল বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল, "আমার ছোট ভাই! কোন দিন ত একে দেখিনি।" "এই ত আজ দেখ্‌লি। ভাইটিকে ভাল বাসিস্।" অন্যমনস্ক ভাবে আচ্ছা বলিয়া অনিল ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল, একটা গাঢ় কাল রেখে তাহার সমস্ত হৃদয়টা ছাইয়া ফেলিল।

চারু বালককে ক্রোড়ে লইয়া এধর ওধর ঘুরিতে লাগিল। বালকটির নাম রঞ্জন। ইহাকে ও বড় আর দুটি পুত্র রাখিয়া চারুর দিদি অল্প বয়সে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। চারুর পিতামাতা চারুকে বলিলেন, "তোর ছেলেপিলে নাই, রঞ্জন ত তোর আপন বোনেরই ছেলে, ওকে নিয়ে বড় টর কর কাছে রাখ।" আপন ভগ্নীর পুত্র মাতৃহীন রঞ্জনকে চারু না আনিয়া পারিল না। ভাবিল, অনিল

এখন বড় হইয়াছে, আর দুদিন বাদে পাশটাশ দিয়ে হয়ত সহরে পড়তে যাবে, তখন একজন ত কাছে থাকা চাই।

চারু রঞ্জনকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া আদর করিয়া যাদুলোক ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টিতা হইলেন। রঞ্জন তাহাকে পূর্ব্বে মাসী বলিয়া ডাকিত, চারু মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইলেন। অষ্টম বর্ষীয় বালককে অভ্যাস-বিরুদ্ধ কার্য্য খুব অল্প আয়াসে করান যায় না। চারু, রঞ্জনকে অনেক খেলনা ও মিঠাইর লোভ দেখাইয়া মা ডাক মুখস্থ করাইল, কিন্তু অতিরিক্ত আদর ও নিজের স্বভাব দোষে রঞ্জন ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

মায়ের উপর সন্তানের যে একটা একাধিপত্য তাহা কোনও সন্তানই স্বেচ্ছায় অন্য কাহাকেও দান করে না। এইজন্য বালকগণও সময় সময় হিংসায় অন্ধ হইয়া শিশু ভ্রাতার উপর সুযোগ মত আক্রমণ অত্যাচার করিতে ছাড়ে না। সরল অবোধ শিশুর প্রাণেই যখন এই হিংসা তখন বয়োপ্রাপ্ত অনিল যে রঞ্জনকে তাহার নিজের প্রাপ্য অধিকার কাড়িয়া লইতে দেখিয়া হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রতিহিংসার উপায় খুঁজিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! অনিল ভাবিল, এই রঞ্জনটা আসিয়া আমার মাকে কাড়িয়া নিয়াছে, ও না আসিলে সেই স্নেহে আমিই ত একমাত্র অধিকারী। হিংসাতে জ্ঞানিলোকেরও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়, বালক কোন্ ছার। অনিল হিংসায় জ্বলিয়া ভাবিল "মাও যখন ওটাকে নিয়া থাকে তখন আমিও আর মায়ের কাছে ঘেঁসিব না।" সে নিজকে দূরে দূরে রাখিতে লাগিল। সময় সময় রঞ্জন সম্মুখে পড়িলে অনিল ভ্রূকুটি করিত, আপনা আপনি তাহার মুষ্টি বদ্ধ হইয়া আসিত, হিংস্র শ্বাপদের মত তাহার দিকে ধাবিত হইত, কিন্তু রঞ্জন দৌড়াইয়া চারুর কাছে পলাইত। অভিমানে অনিল চারুর সংসর্গ ছাড়িয়া দিল। চারু ভাবিল, বেশ ত, অনিল এখন বড় হইয়াছে, আর কেন আঁচলে ধরিয়া ফিরিবে।' সে আপন মনে ভগ্নীপুত্রকে পালন করিতে লাগিল। রঞ্জনকে খাওয়াইয়া, গল্প বলিয়া, ঘুম পাড়াইয়া বাকী সময়টা অনিলের খাওয়াদাওয়ার যত্ন করিতে আসিত, অনিল রাগে অভিমানে দূরে সরিয়া যাইত। চারু ভাবিত, অনিল এরূপ করে কেন? বোধ হয় বড় হইয়া মা ছাড়িয়া থাকিতে শিখিয়াছে। অনিল ভাবিত, রাত দিন ওটাকে আদর সোহাগ করিয়া কুকুরের মত আমাকে তাহার উচ্ছিষ্ট দিতে আসে। আমি তাহা চাই না। সে দূরে সরিয়া যাইত। এইরূপ অনিল যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল ততই চারুর হৃদয়ে অনিলের জন্য যে অংশটুকু ছিল রঞ্জন তাহা ছড়িয়া বসিল। পরে ব্যাপার এইরূপ হইল, চারু রঞ্জনকে লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, অনিল কখন খাইত, ঘুমে যাইত ঘুমাইত চারু সে খোঁজ লইবারও সময় পাইত না, সময় পাইলেও এতটা আগ্রহ হইত না। অনিলের মুখের ভাব, ব্যবহার এইরূপ হইয়াছিল যে চারুর তাহার কাছে আসিতে তত ভাল লাগিত না।

অনিল চারুকে দেখিলে সরিয়া যাইত কিন্তু চারু কাছে না আসিলেও কাঁদিয়া ফেলিত। মাকে সে ত আগের মতই ভালবাসে, মা কেন তাহার প্রাপ্য ভাগে অংশী ডাকিয়া আনিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে ভাত মাখিয়া খাইতে খাইতে অনিলের কি জানি কেন চোখ জলে ভরিয়া আসিত, দীর্ঘ শ্বাস বহিত, অর্দ্ধেক আহারের পর কাঁদিয়া উঠিয়া যাইত, "অম্বলে বড্ড কাল।" চাঁধুনী অবাক হইয়া ভাবিত 'এ বলে কি?'

অনিল স্কুলের পর খেলা ছাড়িয়া দিল, একা একা মাঠে, নদীর ধারে, বেঁপের আড়ালে বসিয়া কেবলই কি ভাবিত, কড়ের মত নিঃশ্বাস বহিত চোখে জল পড়িত, আবার সময় সময় চোখদুটা জবার মত রক্তবর্ণ হইত, হাত মুষ্টিবদ্ধ হইত, দাঁত কড়মড় করিত। বসিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে কেবলই কি চিন্তা করিত। অবস্থা দেখিয়া খেলার সাথীরা তাহাকে ত্যাগ করিল, পাঠ বলিতে পারে না বলিয়া শিক্ষক তাড়না করিল, সুনীলের নিকট বলিয়া দিল, সুনীল ভর্ৎসনা করিল।

অনিল নীরবে ভর্ৎসনা, তাড়না সহ্য করিত বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া কাঁদিত, রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে শুইয়া ছটফট করিত, এইরূপে সে হৃদয়ের ভিতর অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া একটু একটু করিয়া সে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। আর কেহ তাহা জানিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

কুমারী মারগারেট্ কপিন্

কুমারী মারগারেট কপিন্ বেল্‌জিয়ামের একজন বিখ্যাত লেখক ও কবি। তিনি তাঁর বৃদ্ধা মার সঙ্গে ব্রাজেল্‌স্ নগরে বাস করতেন। যুদ্ধের সময় মাকে নিয়ে ইংলণ্ডে চলে যান। এখন লণ্ডনে বাস করছেন। তিনি প্রায় বিশ বছর একখানি দৈনিক কাগজে লিখে আসছেন। সংবাদপত্রে স্তম্ভলেখিকা ব'লে তাঁর খুব নাম আছে। কিন্তু কেবল তাই নয়, তিনি একজন বড় দরের কবি। বেল্‌জিয়ামের লোকেরা তাঁকে "রাজ-কবি" বলে অর্থাৎ তিনি বর্ত্তমান সময়ে বেল্‌জিয়ামের শ্রেষ্ঠ কবি। ফ্রান্সের একাডেমী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সভা,—এ পর্য্যন্ত কোন নারী সে সভার সভ্য হ'তে পারেন নাই। এই সভার নারী সভ্য করার নিয়ম নাই ব'লে তাঁরা এঁকে সহযোগী সভ্য করে নিয়েছেন। তাঁর লেখার জন্য তিনি অনেকবার সোণার ও রূপার মেডেল পেয়েছেন। ফ্রেঞ্চ একাডেমী তাঁকে যে সভ্য চিহ্ন দিয়েছিলেন, তার ভিতরে একটা রূপার তালপাতা ছিল, ইংলণ্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে সেটাও বিক্রি করতে হ'য়েছিল!

তিনি বেল্‌জিয়াম্ সম্বন্ধে ব'লেছেন,—বেল্‌জিয়াম্ অন্য দেশের মত ঠিক একটী দেশ নয়। কতগুলি ছোট বড় নগর আছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি যেন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; প্রতিজেলার লোকেরা নিজের শাসন ও পালনের ব্যবস্থা করে তাদের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট্ যেন একজন ছোট রাজা। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত বেল্‌জিয়াম্ যে একটি দেশ এবং এ দেশের জন্য যে সকল জেলার লোক মিলে একটা কিছু করতে হবে, এ কথা কেও স্বপ্নেও জানতো না। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তখনও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বল'তো, "আমাদের কি?—জার্ম্মানরা তো এখানে আসে নাই! আমরা গরিব মানুষ,—কাজ চাই; খাবার চাই!" দেখতে দেখতে জার্ম্মানগণ নগর গ্রাম ধ্বংস করতে লাগল, ব্যবসা বাণিজ্য কোথায় গেল।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমরা কিছু রক্ষা করতে পারলাম্ না। যখন যুদ্ধ ঘোষণা হ'ল—আমরা সর্ব্বদা ব্যাকুল হ'য়েছিলাম কখন ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য আসবে,—এই এলো, একবার ষ্টেসনের দিকে লোক যায়, একবার সমুদ্রের ধারে!—কিন্তু ১৭ দিন আমরা একলা যুদ্ধ করেছি। ২৪০,০০০ সৈন্যের মধ্যে এখন আমাদের মাত্র ৮০,০০০ সৈন্য জীবিত আছে। জার্ম্মান-দের অত্যাচারের কথা আর কি ব'লবো! আমরা ভেবেছিলাম তারা কেবল রাস্তা ক'রে নিয়ে ফ্রান্সে যাবে, কিন্তু তারা নিরীহ অসহায় নরনারী ও শিশুদের প্রতি যেরকম অত্যাচার ক'রেছে তা বর্ণনা করা যায় না।

যখন বোঝা গেল যে জার্ম্মান সৈন্যের গতিরোধ করা অসম্ভব তখন, নগরে নগরে যে সব সাধারণ লোক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারাও কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে, যুদ্ধের সাজ খুলে রেখে বন্দুক লুকিয়ে রেখে-ছিল,—এইজন্য যে তারা চ'লে যাক, বাধা দিয়ে বৃথা অত্যাচার কাটাকাটি করে দরকার কি। জার্ম্মানগণ প্রতি নগরে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে খাবার খেয়েছে, হোটেলে গিয়ে খেয়েছে, কিন্তু তবুও নিরীহ লোকদের উপর অসভ্যের মত অত্যাচার ক'রেছে!

ইনি এখন ইংরাজী কাগজে লিখে দিন চালাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ বেল্‌জিয়ামের সঙ্গে ইনি ইংলণ্ডে আশ্রয় পেয়ে, শত মুখে ইংলণ্ডবাসীর প্রশংসা করছেন। ব্রাজেলের কলেজে তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁর কয়েকজন ছাত্রী বাস করেন। দেশের দুর্দ্দিনে প্রবাসী কবির নারী-হৃদয় আর সব ভুলে এখন কেবল দেশের জন্যই কাঁদছে, এখন তাঁর সকল লেখাই দেশের জন্য অশ্রুপাত।

চয়ন

পল্লীর উন্নতি।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদেশ-শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়ার মত আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের

গ্রীক পুরাণের প্রেম-দেবতা
ভিনাস দেবী।

কুড়ে কুড়ে নতুন পাতা ধরিয়ে মূল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে দায়িত্ব এবং কর্ম্মশাসনের যোগ নেই তা না—এর মধ্যে সঙ্গীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই,—আত্মপ্রকাশের এমনতর উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড় দৈন্য তার বোধশক্তি পর্য্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্য্যন্ত আমরা খর্ব্ব করে ফেলেছি। এই জন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য্য ঘটে না। সেই জন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে জোর থেকে যায়। কোনো রকম বড় ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তরুণ সাহেবোপিরি ডেপুটিগিরিকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো এক হাফেজিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে ভারত বর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করেছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই-সমস্ত নূতন নূতন কেরানীগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসছে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তৃষা দেয় না, সুধা দেয়; যা কেবল ইন্ধন যোগায় না, অগ্নি দেয়। এই ত গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা—যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেহ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—হৃদয়ের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। তাদের হৃদয়ের যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের হৃদয় মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত রুক্ষ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচীর হয়ে ফেটে গিয়ে যেন উর্দ্ধপানে তাকিয়ে রয়েছে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও ত আমারই জন্যে—আমাকে দাও! সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন দুএকজন কথাটা যাঁরা মানেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করলেন না; আর যাঁরা মানেন না, তাঁরা উদ্যম সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়! এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকল প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রামে নিজের শিক্ষা দ্বারা আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বলুম, "তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল কর।" এজন্য আমি সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কৃতকার্য্য হতে পারিনি।

—আমি যে-গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অধিকাংশ হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ চাষবাস শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করেনি। আমি বলুম—'তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস্ তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।"—তারা বল্লে, "এ কি বাঙ্গের তেলে মাছ ভাজা!"

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতএব যে লোক জলাশয় দেয় পরম একমাত্র তারই। এইজন্যই যখন গ্রামের লোক বলে, মাছের তেলে মাছ ভাজা, তখন তারা এই কথাই জানত যে, একের যে-মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্ছে সেটা আধারি পারত্রিক ভোজের—অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদেরই ঘর জলে যাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দুতিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনচে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত বসে আছে, যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয় তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। তেমনি সমাজে জল বল অন্ন বল বিদ্যা বল স্বাস্থ্য বল যে-কোন অভাব-মোচনের দ্বারা যদি ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে অভাব নিজের চৈতন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন কি, তার এক-প্রকার অহঙ্কার থাকে। সেই অহঙ্কার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে উঠে, "এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!"

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠচে—পারলৌকিক বিষয়-বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়ে-মহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তারপরে, দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষ্যেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন সহরে সহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়চে। কৃতী সহরে যার কাজ করতে, ধনী সহরে যার ভোগ করতে, জ্ঞানী সহরে যার জ্ঞানের চর্চা করতে, রোগী সহরে যার চিকিৎসা করাতে। এটা ভাল কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা—এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তাঁরা অধিকাংশই ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতাবৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড় অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে-লোক দেবে এবং যে-লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। একদল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করেনি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্ত্যে যে-ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড় ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্বোধন ছাড়া তাকে কোনমতেই কোনো দয়ার বা কোন বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্যসহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্ব্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্ব্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।

দুর্ব্বলতা যে কি রকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছুদূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বলে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল

ব্যাপারখানা এই :—কোনো ধনীর এক পেয়াদা তরলাবস্থায় রাস্তে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দুচারজন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর সহরে রটে গেলে যে পাঁচশো ডাকাত বাজার লুট করতে আসছে। বোলপুরে কেউ বা দরজায় খিল এঁটে দিলে কেউ বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চারজন বাহুল মিলে ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর-বাজারে যখন আগুন লাগল তখন কেউ যে কারো সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে তখন নিজের কলসীটা পর্য্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসী তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুরা আমরা বুঝি, এমন কি প্রাণ্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কষ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝিনে এবং এইটে বুঝিনে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অঙ্গের শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক্ একটি গ্রাম আমরা যাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর বাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চ্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী-পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা পালন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বঘটিত আইন, জমি জরীপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতস্থলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্বোধিত করবার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন তবে পল্লী সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে এদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ। (প্রবাসী)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোয়েন্দা ডাঃ গ্রোভস্।

"জার্ম্মান গুপ্ত-কার্য্য-বিভাগ" পৃথিবীর সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর কোথায় রাজনৈতিক কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে জার্ম্মানজাতির উপকার না অপকার হইতেছে ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য জার্ম্মান গবর্মেণ্ট এই সকল ছদ্মবেশী গোয়েন্দাকে দেশবিদেশে প্রেরণ করেন। গোয়েন্দাদের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষ দুই আছে। এমন কি, অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, অনেক কাউণ্ট ও কাউণ্টেসও এই গোয়েন্দাদলভুক্ত। ডাক্তার আর্থার্ড কার্ল গ্রোভস্ উক্ত গোয়েন্দাদলে কাজ করিয়া

আজ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যাবলীর কথা The Secrets of the German War Office নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক। আমরা তাঁহার কাহিনীর অনুবাদ পরিবেশন দিলাম :—

"১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুন তারিখের সকালে সার্ভিয়ার রাজা, রাণী, মন্ত্রী ও রাজপরিষদবর্গ গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। চক্রান্তকারীদের সর্দার কে বা কাহারা, আমি তাহা জানিবার জন্য প্রেরিত হইলাম। আমাদের সন্দেহ কর্ণেল মাসিন ও অল্পসংখ্যক সৈন্যদলের জনকত উচ্চতন কর্ম্মচারীর উপরে পড়িয়াছিল। এই সকল রাজদ্রোহী, রুষদের অর্থে পুষ্ট হইয়া, চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল। সার্ভিয়ার রাজা, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া, রুষিয়ার বিষনজরে পড়িয়াছিলেন।

আমি ছদ্মবেশে এক আদল বোলতার চাকের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এবং অবিলম্বেই আমার বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। জাল দস্তক লইয়া ভ্রমণ করিবার অপরাধে, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল লিপাসিট্‌স্‌ক্‌ আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। সার্ভিয়ার ভিতরকার অবস্থা তখন ভয়ানক। গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ড তখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার কাছে কোন সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের বিরোধী পক্ষের সহিত সংস্রব রাখাতে, আমাকে কোর্ট-মার্শেলে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল।

একদল সৈন্য আসিয়া আমাকে কফিখানা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। পরদিন সকালে আমাকে কর্ণেলের পোষাক পরা তিনজন লোকের সুমুখে হাজির করা হইল। আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমি একেবারেই শুনিলাম,

"তোমাকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশিতে দেখা গিয়াছে। তুমি জাল দস্তক ব্যবহার করিয়াছ। সূর্য্যাস্তের সময়ে তোমাকে গুলি করিয়া মারা হইবে।"

প্রথমটা আমি ভাবিলাম বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হইতেছে। কিন্তু লোকগুলার মুখের দিকে তাকাইয়া ঠাট্টার কোন আঁচ দেখিতে পাইলাম না। তখন আপনার বিপদ বুঝিয়া এবং মনের উদ্বেগ মনেই চাপিয়া আমি শান্তভাবে বলিলাম, "কাউণ্ট বোলেরা-ভিচকে (সমর-সচিব) আপনারা জানিয়া আসুন যে, কাউণ্ট হুয়েরিংগ্রোড তাঁকে সেলাম দিয়েছেন।"

তাহারা অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। তারপর, এক ব্যক্তি আমার উপরে অন্যায় প্রশ্ন বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমি সে-সকল প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া শুধু কহিলাম, "মশাই, আমার যা বলবার আছে, তা বলেছি।"

আমাকে আবার কারাগারে পাঠানো হইল। বেলা চারিটার সময়ে আমার বিচার-কর্ত্তাদের একজন আসিয়া আমাকে বলিল, "তোমার সংবাদ পাঠানো হয় নি। আমার সঙ্গীদের তা মত নয়। বোলেরাভিচের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে। যদি তুমি কারণ দেখাতে পার, তা হ'লে তোমার সংবাদ দেবার ভার আমি নেব।"

আমি তাহাকে কারণ দেখাইলাম। সে বিবর্ণমুখে, ব্যাকুলভাবে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটা নিয়া আমি বড় বেশী মাথা ঘামাইলাম না। কিন্তু আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময়ে যখন আমার কারাগারের দরজা খুলিয়া গেল এবং দুইজন রক্ষী সঙ্গীন খাড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, আমাকে অঙ্গনে—যেখানে আরও কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল—লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল, তখন আমি চিন্তিত হইলাম। বুঝিলাম, এই হট্টগোলের দিনে আমার সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছায় নাই। দুর্গের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দিকে তাহারা আমাকে লইয়া গেল।

একটি পুরানো পাথরের বাড়ীর কাছে আমার বধ্য-ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। একটা দেয়ালের পাশে গিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। প্রধান কর্ম্মচারী একখানা দলিল বাহির করিয়া সার্ভিয়ান ভাষায় পড়িতে আরম্ভ করিল। দলিলের ভূমিকাটা আমার কাছে অনাবশ্যক দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল।

দলিল-পড়া শেষ হইয়া গেলে আমি বলিলাম যে, আমি সার্ভজাতীয় নই, সুতরাং দলিলের একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই।

কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল যে, সে আমাকে সার্জ্জ বলিয়াই জানে।

আমি জোরালো ভাষায় ও স্পেক ভাষায় তাহাকে জানাইলাম, এ ব্যাপারটায় নিশ্চয়ই কোথাও গলদ হইয়াছে, এর জন্যে পরে তাহাদের যথেষ্ট বিপদভয় আছে।

সে কিছু বিচলিত হইল বটে, কিন্তু বলিল, "আমি যে আদেশ পেয়েছি তা পালন কর্ত্তব্য।"

আমি বলিলাম, "আমি মন্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়েছি।"

তাহারা আমাকে মারিবার জন্য তেমন তাড়াহুড়া করিল না। পাঁচ মিনিট কাটিল। দশ মিনিট কাটিল। কর্ম্মচারী ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, আটটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছে।

কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আর দেরি কর্ত্তে পারি না।"

একটা লোক আসিয়া আমাকে দেয়াল ঠেসাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর রুমাল দিয়া আমার চোখ বাঁধিতে আসিল। আমি বলিলাম আমার রুমালের দরকার নাই।

তখনই হুকুম দেওয়া হইল। বারোটা বন্দুকের কুৎসিত কালো নাক আমার দিকে ফিরিল।

সে-সময়টা আমার মনের ভিতরে যেরূপ উত্তেজনার উদয় হইয়াছিল, সে কথা বলিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তখন কিছুই আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তবে একটা কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। দ্বিতীয় সারির তৃতীয় লোকটা কিন্তু অসাবধানতার সহিত বন্দুক ধরিয়াছিল। প্রথমটা সে আমার পেট ও বুকের মাঝামাঝি জায়গায় লক্ষ্য করিল; তারপর আমার নাকের পানে টিপ্ করিল—সেটা আমি একেবারেই পছন্দ করিলাম না, বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা কতক্ষণ যে এমনি দাঁড়াইয়াছিলাম, তা আমি জানি না। তারপরে যা হইল, তা আমি ভুলি নাই। কিছুদূরে দুই-জন কর্ম্মচারীকে আসিতে দেখা গেল। তাহারা হাত নাড়িয়া গাইডকের কি বলিতেছিল। হঠাৎ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা উঠিল।

তাহারা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন আমাকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া এক পাত্র মদ্য পান করিতে দিল। ইচ্ছা থাকিলেও, আমি তাহা পান করিলাম না। আমি বরাবর বুকের উপরে দু'হাত রাখিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একজনকে আমি বলিতে শুনিলাম, "লোকটা কাপুরুষ নয়।"

গোয়েন্দার কাজে আমার যথেষ্ট। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলে পুরস্কারের পরিমাণটাও খুব বেশী। কৃতকার্য্য না হইলে সাধারণ মাহিনা পাওয়া যায়। আমরা গবর্মেণ্টের কাজ করিলেও, বিপদে পড়িলে আমাদিগকে গবর্মেণ্ট কোনরকম সাহায্য করিতে অপারগ। যাহারা ঘটনাবহুল জীবন যাপন করিতে ভালবাসে, এ কাজটা তাহাদের ভাল লাগে। দুর্ব্বল-প্রকৃতি লোকের পক্ষে জীবিকাস্বরূপ গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যে-সকল স্ত্রী বা পুরুষ-গোয়েন্দা দুঃসাহসিক কার্য্য গ্রহণ করে,—সময়ে সময়ে তাহারা কি মানুষ কি শয়তান কাহাকেও ভয় করে না। একটু-কোন খুঁৎ হইলে স্বাধীনতা বা জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এ ভাবনা বড় যে-সে ভাবনা নয়! আমি এমন অনেক সাহসী লোককে জানি, যাহারা এই প্রবল উত্তেজনার চাপে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি এমন জন-বারো নর-নারীকে জানি, যাহারা ভেদী গাঙ্গীর মত অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছে, ধরা পড়িয়াছে বা মরিয়াছে। তাহাদের এমন বিপদ অনেক সময়ে শত্রুর কবলে পড়িয়া হয় না। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দিব:—একটি রমণীর ও আর একটি পুরুষের।

ওরা ক্রডার একজন মেয়ে-গোয়েন্দা। সে জার্ম্মেনীর তরফ হইতে রুসেলসে গোয়েন্দাগিরির কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর আগে য়ুরোপীয় খবরের কাগজ-গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রুষিয়া-সীমান্তে 'মেয়ে-দের' এক হোটেলে ওরা ক্রডার নামে এক রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। একটি রুষীয় কেল্লার নক্সার জন্য ক্রডারকে পাঠানো হইয়াছিল। বার্লিনে বসিয়া কর্তৃপক্ষ

টের পাইলেন যে, সে নয়া পাইয়াছে। কিন্তু একজন রুষ কর্ম্মচারীর প্রেমে পড়িয়া, নয়াগুলি তাহাকে আবার সে ফিরাইয়া দিবার মৎলোব আঁটিতেছে। অতএব, ওয়া ক্রুডার আত্মহত্যা করিল। অর্থাৎ—তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করা হইল।

লেফ্‌টানেণ্ট ভন ষ্যাসট্টভ, সৈন্যদল ছাড়িয়া পোয়েন্দাগিরির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে। তিনি রুষিয়ান চরের সঙ্গে ভাব করিয়াছিলেন, এইরূপ সন্দেহ করা হইয়াছিল :—সন্দেহ-মাত্র! তাঁহাকে কয়েদ করা চলিল না,—কারণ, তিনি অনেক লুকানো খবর জানিতেন। তিনি অসামরিক কর্ম্মচারী, অতএব জার্ম্মান আইন অনুসারে তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইলে, সাধারণ বিচারালয়ে সে কাজ করিতে হইত। সুতরাং ষ্যাসট্টভকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইল। পোয়েন্দা-সর্দ্দার প্রথম যে লোকটিকে পাঠাইয়াছিলেন, ষ্যাসট্টভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে নিহত করিলেন। প্রথম লোকটি মারা যাইবামাত্র, আর একজন লোক আসিল। সেবারে ষ্যাসট্টভ নিজেই মরিলেন।"

(ভারতী)

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

পরাভব

জগতের সিংহাসনে গর্ব্বে পদ তুলি,
অহং করিল আমি অখিলের ভূপ,
আমার চরণে নত বিশ্ব বন্ধাঞ্জলি
হের মোর জগজ্জেতৃ মহেশ্বর রূপ!
নীরবে দাঁড়াল শ্রেম নিকটে তাহার
লজ্জায় বিজয়ী কহে নামি ভূমিতলে,
মানিলাম পরাভব সম্মুখে তোমার
লহ মম জয় গর্ব্ব দিনু পদ-মূলে!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

শিল্পী

(গ্রীক পুরাণের কথা)

(১)

সাইপ্রাস দ্বীপের এমেথাস্ সহরে পিগমেলিয়ন নামে এক শিল্পী বাস করিত। তাহার কাজ ছিল পাথর খুদিয়া মূর্ত্তি তৈরি করা। জীবনে সে ঐ একটি কাজই মাত্র শিক্ষা করিয়াছিল এবং তাহাই তাহার কাছে ভাল লাগিত। আত্মীয়স্বজন তাহার বড় কেউ ছিল না। নির্জ্জনে একক জীবনটা সে কাটাইয়া দিত। মানুষের সংসর্গ তাহার ভাল লাগিত না, বন্ধুবান্ধবও তাহার কেহ ছিল না। সে যাহা কিছু আনন্দ পাইত তাহা তাহার ঐ মূর্ত্তি-গঠন কার্য্যে। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে তাহার নির্জ্জন কুঠরীতে এই কাজে ব্যাপৃত থাকিত। এক একটি কাজ শেষ হইত, আর আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত। তাহার তৈরি মূর্ত্তিগুলি এমনি সুন্দর হইত যে শীঘ্রই তাহার প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এমনি ভাবে অনেক দিন চলিয়া গেল। একদিন সে কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া জানালার পাশে আসিয়া একটু দাঁড়াইল। সেই জানালার সম্মুখ দিয়াই রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের চলাচল সে দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, পৃথিবীতে লোকের কি ব্যস্ততা, কি হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, কি কাজের ও ভাবের বিচিত্রতা। আরো দেখিল সেখানে কত ভাব, কত আনন্দ খেলিয়া বেড়ায়—বন্ধু বন্ধুর গলা ধরিয়া চলিয়াছে, ভাই ভগিনীর জন্য, পিতা সন্তানের জন্য, কত জিনিষ কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। কত দিক দিয়া কত ভাবের আনন্দ তাহাদের জীবনের স্তরে স্তরে বিরাজ করিতেছে।

আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কি একক একঘেয়ে জীবন তার! না আছে একটু বিচিত্রতা, না আছে একটু আনন্দ। একক জীবন তার ভারবহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সঙ্গীর অভাব সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিল।

নানা সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা শিল্পী সে, সৌন্দর্য্যের-অবতার একটি সঙ্গীর জন্য তাহার চিত্ত কাতর হইয়া উঠিল। প্রীতি ভালবাসার তাহার হৃদয় একবারে ভরিয়া গেল। তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল সে প্রীতি ভালবাসা অপরের চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য। কিন্তু মানুষের সঙ্গ সে এতকাল বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, আবার কি বলিয়া মানুষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে। তাই সে ভাবিল, এমন একটি মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিব যাহাকে আমার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-প্রীতি অর্পণ করিয়া আমি সুখী হইতে পারি।

এই ভাবিয়া সে নূতন একখণ্ড পাথর লইয়া কাজে মন দিল। অনেক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ সে এমনি এক রমণীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিল যে তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কাছে দর্শকের মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে।

পিগমেলিয়ন ভাবিল, এই আমার জীবনের সঙ্গী, ইহাকেই ভালবাসিয়া, পূজা করিয়া আমার জীবন কাটাইয়া দিব।

অনিমেষ নয়নে সে ইহাকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইতে লাগিল 'হায়! এ যদি রমণী হইত, যদি জীবন্ত হইত, তবে ইহার সহিত কথা কহিয়া কি শান্তিই লাভ করিতে পারিতাম! হায়! যদি ইহাকে জীবন্ত করিবার ক্ষমতা আমার থাকিত!

মূর্ত্তিটি কথা বলিতে পারে না বলিয়া তাহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কথা বলিতে পারুক আর নাই পারুক, এতদিন তাহার হৃদয়ে যে ভালবাসা সঞ্চিত ছিল তাহা সমস্ত আজ সেই মূর্ত্তির উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

সে বাজার হইতে সুন্দর সুন্দর গহনা কিনিয়া আনিয়া তাহাকে সাজাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ফুলের মালা গাঁথিয়া তাহার গলায় পরাইত। মালা শুকাইয়া গেলে আবার নূতন করিয়া গাঁথিয়া দিত। প্রতিদিন ধূপ ধুনা পুড়াইয়া তাহাকে দেবীর মত পূজা করিত। আবার কখনো বা তাহাকে এই পৃথিবীর একটি রমণীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার সহিত নানা প্রকার আলাপ করিত।

এক এক সময় সে বলিত, "প্রিয় রমণীমূর্ত্তি! পৃথিবীর রমণীর দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য তোমার ভিতর আছে কিন্তু তাহার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য তোমার কিছু নাই। তোমার ভাষা নাই, তবু তোমাকে আমি ভালবাসিব। পৃথিবীর রমণীকে যত ভালবাসিতাম তাহার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসিব কারণ আমিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু হায়, যদি তোমাকে প্রাণ দিতে পারিতাম তবে কি সুখেরই হইত!"

এইরূপে তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে যে একজন সঙ্গী পাইয়াছে—যদিও সঙ্গী মারবেল পাথরের, তবু সে যে আর একা নাই; ভালবাসিবার একটা কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, ইহা কল্পনা করিয়াও সে অনেকটা সুখী হইল।

(২)

একদিন প্রাতঃকালে পিগমেলিয়ন তাহার কুঠরীতে বসিয়া কাজ করিতেছে এমন সময় বাহিরের রাজপথে সে সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিতে পাইল। উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল যে এমেথাস নগরের পুরোহিত ও নাগরিকগণ ভেনাস দেবীর মূর্ত্তি লইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছে। সে চিনিল যে মূর্ত্তিটি তাহারই হাতের তৈরি।

প্রতি বৎসর তিনবার করিয়া ভেনাস দেবীর মূর্ত্তি লইয়া মিছিল বাহির করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবার প্রথা বহু-প্রাচীন কাল হইতেই তাহারা চলিয়া আসিয়াছে। মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে নগরের যত যুবক যুবতীরা গান গাহিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলে।

দেখিতে দেখিতে পিগমেলিয়নের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া মিছিল চলিয়া গেল। ভেনাস্ ছিলেন প্রেমের দেবী। হতভাগা নিরাশ প্রেমিকদিগকে তিনি কত সাহায্য করিয়াছেন, সে সব কথা পিগমেলিয়নের মনে হইতে লাগিল। সে ভাবিল, 'আমি কেন ভেনাস দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করি না, তিনি হয় তো আমার ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তিতে প্রাণ দিয়া আমাকে সুখী করিতে পারিবেন।' এই ভাবিয়া সে ঐ মিছিলের সঙ্গে যোগ দান করিতে চলিল।

সমস্ত সহর ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিমা আবার তাহার বেদীর উপর আনিয়া রাখা হইল। পিগমেলিয়নও প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বেদীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তখনো সেখানে অনেক লোক ছিল। সকলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলে পর সে দেবীর সম্মুখে হাটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল। অবশেষে সে বলিল, "হে প্রেমের দেবি! জগতে কিছুই তোমার কাছে অসম্ভব নয়, আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিও না। তোমার কত দয়ার কথা শুনিয়াছি, আমাকে একটু দয়া কর। প্রস্তর-মূর্ত্তিকে আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে প্রাণ দিয়া আমার জীবন সফল করিয়া দাও।"

ঘরে ধূপ জ্বলিতেছিল, এই কথা বলিতে বলিতে সেই ধূপের ধোঁয়া উঠিয়া প্রতিমাটিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। পিগমেলিয়নের বোধ হইল যেন দেবী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; সে ভাবিল, বুঝি বা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য দেবী চলিয়া গেলেন।

কতক্ষণ পর ধোঁয়া কাটিয়া গেল, দেবী আবার দেখা দিলেন। তখন দেবীকে প্রণাম করিয়া সে বাড়ী রওনা হইল। পথে আসিতে তাহার নানা ভয় হইতে লাগিল—যদি দেবী তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না করেন তবে তো আবার পূর্ব্বের মত নিরানন্দ ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে।"

কিন্তু তাহার বাড়ীর কাছে আসিতেই তাহার যেন এক নূতন ডাক হইতে লাগিল। তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। যে ঘরে তাহার প্রিয় মূর্ত্তিটি ছিল, প্রথমেই গিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইল। কিন্তু হায়, গিয়া দেখে যেখানে মূর্ত্তি ছিল সেখানে তাহা নাই।

দুঃখে সে বলিয়া উঠিল, "গেছে! যা কিছু আমার প্রিয় ছিল গেছে সব!"

এমন সময় কে মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "পিগমেলিয়ন!"

যেদিক হইতে এই মধুর ডাক আসিল সহসা সে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল তাহারই তৈরি মূর্ত্তি অপর দিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তি আর এখন পাষাণী নয়, জীবন পাইয়া সে মানবী হইয়াছে। শিল্পী কল্পনা করিয়া তাহাকে গড়িয়াছিল, এখন তাহার রূপও হইয়াছে ঠিক কল্পনারই মত মনোরম।

পিগমেলিয়ন তাহার দুই চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সেই মূর্ত্তি বলিল "পিগমেলিয়ন, তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমারই সেবার লাগিবার জন্য তিনি আজ আমাকে জীবন দান করে গেছেন।"

তবু যেন পিগমেলিয়নের বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেছিল না। তখন সে পিগমেলিয়নের হাত ধরিয়া বলিল, "প্রিয়তম, এ স্বপ্ন নয়! কথা বলছ না যে? আমি যখন শুধুই মূর্ত্তি ছিলাম তখন যেমন আমার সহিত তুমি কথা বলতে, আর কি সেরূপ ভাবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?"

তখন পিগমেলিয়ন বলিল, "কি করে তুমি জীবন্ত হলে—জীবনলাভ করলে, বল আমায় সে কথা।"

তখন সে বলিল, 'বলবার আমার বেশী কিছু নাই, আর ভাল করিয়া কথা বলতেও এখনো শিখি নাই, তবে যত দূর আমার সাধ্য তোমাকে সে কথা আমি বলছি।"

"যখন আমি জীবনলাভ করে, প্রথম দৃষ্টিপাত করলাম, দেখিলাম সম্মুখে অতি সুন্দরী রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বল্লেন 'নেমে এস তোমার বেদী হ'তে। এই বাড়ীর যে কর্ত্তা সে তোমার জীবনের সঙ্গী হবে, তাকে ভালবেসে তোমার জীবন ধন্য কর ও সুখী হও। আমি যাই এখন আমাকে ভেনাস দেবী বলে জেনো।' এই বলে তিনি অদৃশ্য হলেন।"

তখন পিগমেলিয়ন ভেনাস দেবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তারপর তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে লাগিল।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জুপিটার

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or Godlike, bond or free:
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (TENNYSON.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অত্যন্ত অবনতা পাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিস রাজকবি লর্ড টেনিসন।

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as justice. I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (WILLIAM Lloyd Garrison

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথা কর্ণপাত না করিলে কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ। | আষাঢ়, ১৩২২ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ-প্রসঙ্গ

রমণীর অধিকার।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়িয়েছে অনেক। কি সভ্য কি অসভ্য সকল দেশেই পুরুষ প্রভু, নারী অধীন। সভ্যসমাজে নারীর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন, তাও অনুগ্রহ মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, দেশের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর কোন অধিকার নাই। তার কারণ, অনেকেই বলেন, নারী দুর্ব্বল, নারী অজ্ঞান, ইত্যাদি। নারী যে স্বাভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নয়, অবস্থা-চক্রে, হীনতর থাকতে হ'য়েছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মোদ্দ প্রমাণ এই যে, যখন, যে দেশে কোন নারী আপনার শক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছে, তখনই উক্ত মতের অসত্যতাই প্রমাণ হ'য়েছে। তবুও এখনও অতি সুসভ্য দেশেও নারীর কোন উচ্চ অধিকার নাই। অল্পদিন পূর্ব্বেও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা পুরুষদের মত অবাধে উপাধি পেত না; বড় বড় সাহিত্য-সমিতিতে মেয়ে-সভ্য গ্রহণ সহজ নয়; তারপর, রাজকার্য্যে তো মেয়েদের পক্ষে বন্ধ। বিচারকের, উকিল, আইন সভার সভ্য প্রভৃতি কাজে মেয়েদের কোন অধিকার নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের দাবীতে মেয়েদের জন্য কোন কোন কাজের দরজা খুলে গিয়েছে। এও অতি সামান্য। সুসভ্য ফ্রান্সেরই এই অবস্থা; মেয়েরা রাজ্যমধ্যে পুরুষের সমানের অধিকার পাওয়ার জন্য কত কত কাণ্ড করেছে, সব প্রায় বৃথা হ'য়েছে। অনেকে বলেন, এ বড় বাড়াবাড়ি, মেয়েদের স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছে গৃহে, তারা কেন পুরুষের কাজে হাত দিতে আসে? কথাটা শুনতে বেশ। কিন্তু, কোন কাজের কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে মেয়ে

কিম্বা পুরুষ নিয়ে নয়, যোগ্যতা নিয়ে। পুরুষের চেহারা হ'লেই পুরুষ, তেজস্বী, বুদ্ধিমান হয় না, আর স্ত্রী-লোক হ'লেই দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধ হয় না। এ তো বহু-পরীক্ষিত সত্য। এদেশে বেশ বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনেছি, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়!

কে কি হবে, কি পারবে, কি পারবে না, সে কথা স্বতন্ত্র; তা কোন নিয়ম বা অধিকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না; কিন্তু যে যা হ'তে পারে, তার পথ তো বন্ধ রাখা উচিত নয়? সাহেবেরা যখন বলে, "বাঙ্গালী ভীরু, দুর্ব্বল, বড় কাজের যোগ্য নয়," তখন আমরা এ কথার অর্থ বুঝতে পারি। আমরা পতিত, ভীরু, দুর্ব্বল, কোন বড় কাজের যোগ্য নই, তা তো জানি, কিন্তু কেও কোন কাজের যোগ্য নই, কেও সবল বা সাহসী নয়,—বা কখনও হ'তে পারবো না, এমন কথা বল্লে দুর্ব্বল বাঙ্গালীরও রক্ত গরম হ'য়ে উঠে। বাংলা দেশে জন্ম হ'লে কোন কালে ইংরাজ বা ফরাসীর মত হ'তে পারবে না, এ যেমন সত্য, মেয়ে হ'য়ে জন্মালে সে কোন কালে পুরুষের সমান হ'তে পারবে না, তাও তেমনি সত্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে যে এত বড় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসান হয়ে ছিল, সে কি কেবল সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধনের জন্য? এ কথা কে বলবে? রাজপুত রমণীদের কথা ছেড়ে দিলাম। বাংলা দেশে এ যুগেই কত গৃহস্থ রমণী পুরুষের সকল কাজ, জমিদারী পরিচালন প্রভৃতি, অতি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করছেন; তবুও তো এদেশে শিক্ষার অবস্থা অতি হীন। সুসভ্য সুশিক্ষিত দেশের নারীদের কীর্ত্তি উল্লেখ করা বাহুল্য, তবুও, কোন দেশে পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের গুণের ও যোগ্যতার সমান মূল্য দেওয়া হয় না। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক ব'লেই, অনেক বিষয়ে পুরুষের পেছনে ও নীচে থাকে।

শিক্ষা, শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে, নর নারী, শাদা কাল, সকলেই যে কোন কাজ ক'রবার অধিকারী; সকলের জন্য পথ খোলা, যে পারে উঠে এসো,—এই বিধি যতদিন যে দেশে গৃহীত না হয়, ততদিন সে দেশ প্রকৃত পক্ষে উন্নত ও সভ্য নয়।

সম্প্রতি এ বিষয়ে ডেন্‌মার্ক জগতের সকল জাতির পথ-প্রদর্শকরূপে মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে। সেখানে এই রাজবিধি ঘোষণা করা হ'য়েছে যে—নরনারী সাধারণের সমান অধিকার। দেশের সকল কাজে, সকল পদে, সকল বিভাগে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার। স্ত্রীলোক যে পুরুষের মত মানুষ, এত দিনে ডেন্‌মার্ক তা জগতকে দেখাল।

লেডী ডাক্তার।

কিছু দিন পূর্ব্বে মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্রী লেডী ডাক্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাঁর উক্তির সারমর্ম্ম এই,—প্রায়ই শোনা যায়, ছেলেদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা মেয়েদের যোগ্য নয়। মৈত্রেয়ী ও গার্গী পুরুষেরা যে দর্শন শাস্ত্র পড়েন তাই পড়েছিলেন এবং পুরুষদের সভায় পুরুষদের সঙ্গে দর্শনের প্রসঙ্গ করে-ছিলেন। দর্শন, পণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির কি আবার স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে? অতীত কালে এবং এখন কত স্ত্রীলোক রাজ্যশাসন করেছেন। এখন কোন কোন মহিলা আইনেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। ফিলাডেল্‌ফিয়ার একজন মহিলা অতি দক্ষতার সঙ্গে বিচারকের কাজ করে থাকেন। শিক্ষা ও সুযোগ পেলে স্ত্রীলোক সব কাজই করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী-ডাক্তার যেমন অত্যাবশ্যক তেমন আর কোন কাজ নয়। মেয়েরা সত্য সত্যই পুরুষদের চেয়ে বেশী নির্ব্বোধ নয়। একজন মহিলা পুরুষের ছদ্ম বেশে ডাক্তারী করে শেষে একজন বিখ্যাত "সার্জ্জন জেনেরাল" হয়েছিলেন। তাঁকে স্ত্রীলোক বলে জানতে পারলে আর তাঁর সার্জ্জন হওয়া হ'ত না। মেয়েদের প্রধান ক্ষেত্র গৃহ, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মেয়ে-ডাক্তার যে কত প্রয়োজনীয় তা বলে শেষ করা যায় না। স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যের জন্যই পুরুষের পক্ষে পুরুষ-ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীলোক-ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী স্বাভাবিক। মেয়েদের স্কুলেই যদি স্ত্রীলোক শিক্ষক হ'লে ভাল হয়, তা হ'লে মেয়েদের অসুখের সময় স্ত্রীলোক-ডাক্তার

হ'লে যে ভাল হয় তাতে কি আর সন্দেহ আছে! অসুখের সংস্রবে ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর কত গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা আবশ্যক হয়, কত রমক ক'রে রোগীকে পরীক্ষা করা দরকার হয়,——একজন পুরুষ ডাক্তারের হাতে একজন স্ত্রীলোক রোগী কখনও সহজে আপনাকে এতটা ছেড়ে দিতে পারে না। এখন হওয়াটা বড় অস্বাভাবিক। এদেশে কত ঘটনা এমন হ'য়েছে যে কেবল মেয়ে-ডাক্তার পাওয়া যায় নাই বলে স্ত্রীলোকেরা প্রাণে-ত্যাগ করেছে। অসহ্য যাতনা হয়েছে, তবুও পুরুষ-ডাক্তার ডাকতে দেয় নাই। একজন ডাক্তারের স্ত্রী অল্পদিন পূর্ব্বে এমনি করে মারা গিয়েছে। চিকিৎসা মেয়েদেরই একটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত। সব জায়গায় মেয়ে-ডাক্তার দরকার। আমি প্রথম বছরের পরীক্ষা দিয়ে এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখনি কত ডাক আসত, আমি তাদের বুঝিয়ে দিতাম যে এখনও আমি কিছু বিধি নাই। এ কাজে চাকরী না পেলে চলে না তা নয়, স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করা যায়, এবং যথেষ্ট পরোপকার করা যায়।

স্ত্রীলোক ডাক্তার আরও একটি কারণে দরকার। স্বাস্থ্যবিধি না জানার জন্য এ দেশের ঘরে ঘরে কত রোগ ও অকাল-মৃত্যু। গৃহে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাকর্ত্রী মেয়েরা। মেয়ে-ডাক্তার রোগীর বাড়ীর মেয়েদের এ বিষয়ে যেমন শিক্ষা দিতে পারেন, পুরুষ-ডাক্তার কখনও তা পারে না। স্ত্রীলোক গৃহে গৃহিণী, স্ত্রীলোক জাতির জননী, স্ত্রীলোক ব্যক্তির শক্তি। এ দেশের বহু স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হ'য়ে ডাক্তার হওয়া আবশ্যক। তাঁরা কেবল ঔষধ দেবেন না। তাঁরা স্বাস্থ্যবিধি প্রচার ক'রে দেশের অশেষ কল্যাণ করবেন।

শিক্ষাবিস্তারে নারী।

ইংলণ্ডের দরিদ্র দুঃখী পরিবারের সন্তানদের দুঃখ দূর ক'রবার জন্য, কুমারী ম্যাক্‌মিলান, (ডেপ্‌টফোর্ড্ ফ্রেণ্ড্‌স্ সেণ্টার) অর্থাৎ "ডেপ্‌টফোর্ড্ স্বাস্থ্য-নিবাস" নাম দিয়ে, একটা খোলা জায়গায় একটি আশ্রম ক'রেছেন। কথায় বলে "পাখা পিটিয়ে ঘোড়া করা।" ইনি "পিটিয়ে" নয়, কেবল ভালবাসা ও সুব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, যারা জন্তুর মত, তাদের প্রকৃত মানুষে পরিণত করছেন। প্রেমের এমনি শক্তি, ইনি দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের দুঃখ, মনের ভাব যেমন বোঝেন, তেমন তারাও বুঝতে পারে না! রোগা, কুঁজো, দুর্ব্বল, স্ফূর্ত্তিহীন কতগুলা হাড় ও চামড়ার মূর্ত্তি এনে, তিনি সে সকলকে সুস্থ, উন্নত, সবল, তেজস্বী মানুষে পরিণত করছেন! কল কারখানার মালিকেরা এখনও কুলি মজুর ও তাদের সন্তানদের ঠিক কলের মত খাটায়, একবারে পশুবৎ ক'রে রাখে।

এইসব ছেলেকে তেমন ক'রে রাখা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতার মিষ্ট আস্বাদন পেয়ে এরা আর অধীনতা স্বীকার করতে চায় না, মানুষের মত কাজ করতে চায়। এখন এঁর কাজ পাঁচ ভাগে বিভক্ত:—(১) রুগ্নদের সেবা বিভাগ, (২) অপর পরিবদের জন্য চিকিৎসা বিভাগ; (৩) ছেলেদের আশ্রম, (৪) মেয়েদের আশ্রম, এবং (৫) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। এঁর অধীনে কয়েকটি মহিলা ও পুরুষ কাজ করেন, সকলেই সুশিক্ষিত। তিনি সকল বিভাগে গিয়ে সকলের সংবাদ নেন, প্রত্যেককে উৎসাহ দেন। তিনি যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছু করেন, তখন বোঝা যায় যে ইনি তাদের মধ্যে একবারে ডুবে গিয়েছেন: সকল কাজ তাঁর

হৃদয়েরই যেন একটা ছবি। তিনি আনন্দের সঙ্গে সমস্ত কাজের কথা বলেন, সব বিভাগ দেখান; কিন্তু নিজের কথা একবারেই বলেন না। প্রত্যেক বিভাগের অতি সামান্য খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না।

সেবা বিভাগে—কৃশ দুর্ব্বল ছেলেমেয়েদিগকে এমন ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয় যে, তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ ও সবল হয়; রোদ বৃষ্টি ঠাণ্ডা সহিতে পারে: এখানে থেকে ছেলে মেয়েরা সহজেই বুঝতে পারে খোলা ঠাণ্ডা বাতাসে কোন ভয় নাই। যদি পেট ভরে খেতে পায় ভিতরটা গরম থাকে, আর শরীর পরিষ্কার থাকে তা হ'লে ঠাণ্ডায় কিছু হয় না। সব ছেলে মেয়েকে এই বিভাগে রেখে, তাদের শরীর ঠিক ক'রে নিয়ে তারপর তাদের শিক্ষা বিভাগে (ক্যাম্পে) পাঠান হয়।

চিকিৎসা বিভাগে—দলে দলে ছেলে মেয়ে এসে ঔষধ নিয়ে যায়—সুযোগ্য চিকিৎসকগণ তাদের দেখেন।

ছেলেমেয়েদের আশ্রম (ক্যাম্প) অর্থাৎ থাকবার জায়গা—খোলা মাঠে কাঠের ঘর; সর্ব্বদা খোলা বাতাস চলে। রাত্রে শোবার আগে ছেলে মেয়েরা স্নান করে, তারপর সকলের শোওয়া হ'লে, তিনি সকলকে বেশ করে ঢেকে দিয়ে সকলের সঙ্গে দুটি একটি মিষ্টি কথা ব'লে, দরজা জানালা বা বন্ধ করতে হয় ঠিক করে দিয়ে চলে যান।

ক্যাম্পের সঙ্গেই শিক্ষা-বিভাগ যুক্ত। সাধারণতঃ খোলা জায়গায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শরীর মন সহজ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাতে স্ফূর্ত্তি পায় এমন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শরীর ও মনের উপযোগী ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। মনের বিকাশের সঙ্গে শরীর সুগঠন, সোজা, এবং কর্ম্মতৎপর হয় সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে, এবং ছেলেমেয়েদের উন্নতি দেখে অবাক হ'তে হয়। গত বৎসর ১২৪ জনের মধ্যে ১১৭ জনের পিঠ কুঁজো (মেরুদণ্ড বাঁকা) ছিল, তারা ভাল করে নিশ্বাস টানতে পারতো না, কত ছেলের হাতপা'র মাংসপেশী শিথিল, নিস্তেজ। চিকিৎসা এবং হাতে কলমে শিখা ও খেলার মধ্যে দিয়ে এসব ভাল করা হয়। খোলা বাতাসে ভাল করে বুক সোজা ক'রে শ্বাস প্রশ্বাস, আর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়মিতরূপে ব্যবহার—এই দুই উপায়ে সকলেরই শরীর আশ্চর্য্য রকম সুস্থ সবল হয়। ঘুলের ঘর আর টেবিল চেয়ার করতে এখন এদেশে যত খরচ করা হয়, সেই টাকা দিয়ে যদি গরিব ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা খাওয়া ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা হয়, তা হ'লে ঠিক হয়। বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালীকে ইনি অত্যন্ত অদোষ্য প্রণালী বলে মনে করেন। শিক্ষার আশাপোড়া শরীর ও মনের শক্তির বিকাশ স্ফূর্ত্তি আনন্দ না হ'লে সে শিক্ষাই নয়। প্রত্যেকের জন্য মাসে মাত্র ১০ টাকা খরচে, এঁরা শত শত গরিব ছেলে মেয়েকে বড় লোকদের ছেলেমেয়েদের চেয়েও ভাল শিক্ষা এবং পোষাক, খাওয়া, ঔষধ এবং আশ্রয় দিচ্ছেন।

এখন সবেমাত্র আরম্ভ। ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা এখানে থাকে। তারপর আরও চার বছর, ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত যাতে থাকতে পারে, সে ব্যবস্থা করবার চেষ্টায় আছেন। শিশুদের জন্যও একটী বিভাগ খুলবার আয়োজন করছেন।

আমাদের দেশে এমন কাজের কত প্রকাণ্ড ক্ষেত্র। এতো মেয়েদেরই কাজ। দীন দরিদ্র অনাথ হাজার হাজার শিশুকে মানুষ করে তুলবার ভার, এদেশের মহিলারা যখন এমন করে গ্রহণ করবেন, তখন নব যুগের সূত্রপাত হবে।

স্ত্রী-শিক্ষা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" "স্ত্রী-শিক্ষার কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে,। লেখক স্ত্রী-শিক্ষার কোন "প্রকার" বা "পদ্ধতি" নির্ণয় করেন নাই। তিনি যে সব কথার উত্থাপন করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে,—এখন স্ত্রী-শিক্ষার কি রকম ব্যবস্থা হওয়া উচিত তার সঙ্গে, বাল্যবিবাহ প্রাচীন বা নবীন প্রথা এবং বেদে স্ত্রী জাতির কি পরিমাণ অধিকার ছিল সে তত্ত্বের কোন নিশ্চিত সম্বন্ধ

আছে ব'লে তো আমরা বুঝ্‌তে পারি না। প্রাচীন কালে আমরা, এবং আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি যতই উন্নত থেকে থাকি না কেন, এখন আমরা পতিত, এবং এ দেশের নারীগণ মৃতপ্রায়। এ "বর্ত্তমানের সুনিশ্চিত সত্য।" এখন চিন্তার বিষয়, বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা বঙ্গ সমাজের পক্ষে অকল্যাণের কারণ হ'য়ে প'ড়েছে কি না। কোন একটা প্রথা মজ্জাগত হ'য়ে প'ড়েছে বলেই যদি সেটাকে, অকল্যাণকর ব'লে বুঝেও, রক্ষা করা সঙ্গত হয়, তা হ'লে বাঙ্গালীর দাসত্ব একবারে মজ্জাগত হ'য়ে প'ড়েছে ব'লে আমাদের উন্নতি ও অধিকার লাভের সমস্ত আয়োজন বন্ধ ক'রে দিতে হয়। বাঙ্গালীর ঘরে একটা কুকুর মারবার লাঠি পাওয়া যায় না, একটা শেয়াল দেখলে বাঙ্গালী পালায়, আজ কি না বাঙ্গালী যুদ্ধ ক'রতে যেতে চায়। কেন বাঙ্গালীর এ স্পর্দ্ধা! কারণ আমরা বুঝেছি, মানুষ মাত্রেই উন্নতি সাধনে অধিকারী! মজ্জাগত জড়তা ভেদ করে, শত শত বৎসরের অন্ধকার ও পতন অতিক্রম ক'রে মানুষ উঠতে পারে। আমেরিকার নিগ্রোজাতি কুলি হওয়ার জন্যই জন্মেছিল, ওদের জীবনের লক্ষ্যই ওই, শ্বেতকায়দের এই ভাব ছিল। এখন সেই নিগ্রো কত উন্নতি ক'রেছে, সেই জাতির বুকার ওয়াশিংটন বর্ত্তমান জগতের একজন নমস্য মহাপুরুষ। বাঙ্গালী মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই কথা। বাঙ্গালী খৃষ্টান এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মগণ বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদেরই মত বাঙ্গালী; খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম মেয়েরাও বাঙ্গালী মেয়ে। তাঁরা অনায়াসে বাল্য-বিবাহ দূর ক'রেছেন। এখন কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় জায়গায়, কত বয়স্কা হিন্দু মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ে, কেও কেও পরীক্ষাও দেয়; দুএকজন মেয়ে কলেজে প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও দিয়েছে। বাল্য-বিবাহ এবং অবরোধ দেখ্‌তে দেখ্‌তে দূর হচ্ছে। গত পনের বছরের মধ্যে হিন্দু মেয়েদের বিবাহের বয়স ১২ হইতে ১৪।১৫ এমন কি ১৬তে উঠেছে। শিক্ষিত নরনারী মনোযোগ দিলে দশ বছরের মধ্যে বাল্য-বিবাহ এবং অবরোধ এদেশ হ'তে দূর ক'রতে পারেন। কিন্তু কবে সুদিন হবে, আপনি এসে হ'বে যাবে, গাছে মাঁচরটি লাগ্‌বে না, এই ভেবে বসে থাকলে, কতদিনে সে'দিন আসবে জানি না। বাল্য-বিবাহ এবং অবরোধ যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান অন্তরায় তাতে কি আর সন্দেহ আছে! শরীরে প্রবিষ্ট বিষ যতই মজ্জাগত হোক, তা কেমন ক'রে বের ক'রে ফেলা যায় সেই চেষ্টাই ঠিক, বিষ শরীরে রেখেই কেমন ক'রে ভাল থাকা যায়, সে চেষ্টা করা ঠিক নয়। সে চেষ্টা সফল হয় না। বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ কেবল শিক্ষার নয়, স্বাস্থ্যেরও প্রধান অন্তরায়, এবং জাতীয় উন্নতির মহা বিঘ্ন। কবির নয়, নির্দ্ধারিত সত্য।

দ্বিতীয় কথা—লেখক "বর্ত্তমান কালের তথা কথিত" উচ্চ শিক্ষার অপেক্ষা, রামায়ণ মহাভারত পাঠ ও কথকতা, শ্রবণ এবং ব্রতউপলক্ষে প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্বে যে শিক্ষা হতো তাতে বালিকাদের চরিত্র গঠিত হ'ত বলে, সেই শিক্ষাকেই শ্রেষ্ঠ ব'লেছেন। কথাটা অতি গুরুতর। যে সব মেয়ে স্কুল কলেজে পড়েছেন, উচ্চ উপাধি লাভ ক'রেছেন, তাঁদের চরিত্র যে পূর্ব্বোক্ত বালিকাদের চরিত্র অপেক্ষা অপঠিত বা হীন, একথা কি লেখক অভিজ্ঞতা হ'তে ব'লেছেন? সৌভাগ্য বশতঃ আমরা বহু সংখ্যক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গমহিলাকে জানি। তাঁরা অনেকেই বিবাহ করে ঘরকন্না করছেন কেউ কেউ কুমারী থেকে শিক্ষকতা করে অনেক বালিকাকে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদের অবলম্বন স্বরূপ হ'য়ে আছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আদর্শ বা নিখুঁত নয়,—ছেলেদের পক্ষেও নয়, মেয়েদের পক্ষেও নয়। কিন্তু যতদিন অন্য ব্যবস্থা না হয়, ততদিন তো শিক্ষা, বন্ধ রাখা যায় না। বঙ্গের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষগণ যেমন বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলারাও সেইরূপ বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপ।

চরিত্র গঠন পুরুষ ও রমণী উভয়ের পক্ষেই সমান আবশ্যক। জ্ঞান উপার্জ্জন পুরুষ ও রমণী উভয়ের পক্ষেই সমান আবশ্যক। অন্তঃপুর রমণীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু একমাত্র ক্ষেত্র নয়। অন্তঃপুরে রমণী সন্তানের জননী, জননীর সন্তানের শিক্ষা বিধান ক'রতে সমর্থ হওয়া আবশ্যক। এবিষয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারত মহিলার'

বিবিধ-প্রসঙ্গে নারীর পারিবারিক অংশে বিস্তৃত লেখা হ'য়েছে। কেবল গৃহ নয়, রমণীকে শিক্ষাকার্য্য : অল্পবয়স্কা অপরাধীদের বিচার, শাসন ও সংশোধন, এবং ডাক্তারী প্রভৃতি কত কাজে ক'রতে হবে। আজ বাঙ্গালী যুবক সংগ্রাম ক্ষেত্রে যাচ্ছে ; কাল বাঙ্গালী মহিলাদেরও নাইটিঙ্গেলের স্থান অধিকার ক'রতে হবে।

তৃতীয় কথা—অন্তঃপুরে "বালিকা-পত্নীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান পতির একটা প্রধান কর্ত্তব্য।" পত্নী যেমন বালিকা, পতিও তো তেমনি বালক : কে কা'কে দেখে। একজন যুবক যদি তার বালিকা পত্নীর শিক্ষার ভার নিতে পারে, তা হ'লে প্রাচীনকালে যখন ছেলেরা গুরু-গৃহে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন ক'রতো, তখন বেদজ্ঞ স্বামী, ভাই বা পিতা কেন আপন আপন স্ত্রী বোন বা কন্যাকে বেদ শেখাতেন না! কতকদূর শিক্ষা, এবং অভিজ্ঞতা না হ'লে নরনারী বিবাহের যোগ্যই হয় না। কেবল বয়স দিয়ে বিবাহের সময় নির্ণয় করা বর্ব্বরদেরই শোভা পায়। বিয়ে হয়ে যাক্ তারপর লেখাপড়া শিখবে,—এ ব্যবস্থা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। বিবাহের পর জীবনের জটিলতা বাড়ে বই কমে না। তখন কি শিক্ষার কাল! তখন শিক্ষা, বিপদে পড়ে মধুসূদনকে ডাকা,—অগাধ জলে পড়ে, সাঁতার শিখ্‌বার চেষ্টা।

আমাদের শেষ নিবেদন এই,—স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময়, সকলে মনে রাখবেন, আমরা যেমনটি আছি চিরদিন তেমনটি থাকব না। চঞ্চল জগৎ আমাদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কালস্রোতের সঙ্গে। আমরাও জগতের অন্যান্য জাতির মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হব, সাম্রাজ্য রক্ষায় আমাদেরও হাত থাকবে। এই জাতীয় উন্নতির পথে মেয়েরা গৃহে অবরুদ্ধ, ভীরু, পরনির্ভর-পরায়ণ জীব হ'য়ে থাক্‌লে হবে না। একজন ভদ্রলোক মেয়েদের সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন—"কোথাও যেতে হ'লে সবচেয়ে মুস্কিলের বিষয় এই "জীবন্ত লাগেজ-গুলি!" "জীবন্ত লাগেজ" হ'য়ে, অন্তঃপুরের শোভা হ'য়ে থাকলেই হবে না,—গৃহে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হ'তে হবে। সুতরাং যত উপায়ে সত্বর শিক্ষার দ্বার খোলা হোক, শিক্ষার ব্যবস্থা হোক ; সব বাধাবিঘ্ন দূর হোক। পাপজ্ঞানে, জাতীয় উন্নতির মহাশত্রু জ্ঞানে, বাল্য-বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা দূর কর্‌তে সকলে যত্নবান হোন্,—শিক্ষার পথ খুলে যাবে, দেশের কল্যাণ হবে।

নারী ও ধর্ম্ম

শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দেখলে মনে হয়, তাঁরা মনে করেন ধর্ম্ম শুধু নারীরই জন্য। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প'ড়ে পুরুষদের মনের অবস্থা এমন হয় যে বিনাবিচারে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মব্যবস্থার কাছে তাঁরা মাথা নত করতে পারেন না। তাঁরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু মহিলারা ধর্ম্মটাকে বেশ করে ধ'রে থাকেন, সেটা তাঁদের খুব ইচ্ছা। পাশ্চাত্য দেশেও এইভাব, সেখানেও মেয়েরাই সমাজ মন্দিরে যায়, ধর্ম্ম ব্যবস্থা মেনে চলে, প্রার্থনা করে। পুরুষ যায় খুব কম। শিক্ষিত পুরুষদের পক্ষে ধর্ম্ম-মন্দিরে যাওয়া যেন লজ্জার বিষয়। ওতো মেয়েদের কাজ! এদেশেও পূজা পার্ব্বন গুলি মেয়েরাই করেন, বাবুদের তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু মেয়েরাও যদি এ সকলের প্রতি উদাসীন হন, তা হ'লে বাবুদের বড় ভয় হয়। গোড়াতেই এই ধারণা আছে যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতি, পুরুষের যা না হলেও চলে, মেয়েদের তা না হ'লে চলে না ;—যেমন, রূপ, চরিত্র, ধর্ম্ম,—এসব পুরুষ মানুষের থাকে ভাল, না থাকে নাই ; কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপ, চরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠা না থাকলে, সে তো গেল! ছেলে গদাধরচন্দ্র হোক, কানা খোঁড়া বোকা, দুষ্টু যা হয় হোক, সে-যে ছেলে, আর মেয়ে, সে সুন্দরী কর্ম্মিষ্ঠা বুদ্ধিমতী হলেও, সে মেয়ে বই নয়! এমন অনেক মত, প্রথা ও কাজ আছে, যা মানুষ বরাবর ক'রে আসছে বলে তার কদর্য্যতা বুঝতে পারে না। যদি পরিষ্কার ছবি এঁকে দেখান যায়, তখনও মনে করে,—না এতটা বিশ্রী হ'তে পারে না। স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য জগতে যে রকম আকার ধারণ

ক'রেছে, তার চিত্র অতি বিশ্রী। এই পার্থক্যের একটা অংশ আজ আলোচ্য,—ধর্ম্ম ব্যাপারে নারী।

মেয়েরা বাড়ীতে পূজা অর্চ্চনা গুরু পুরোহিত নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েরা উপাসনা-মন্দিরে যায়, মেয়েরা বেশ নির্ব্বিকারে শাস্ত্র ভাবে ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা মান্য করে: মেয়েদের এভাব দেখ্‌লে পুরুষদের বেশ ভাল লাগে। কারণ, এরকম একটা মেষায় মেয়েদের মন বশ থাকলে, অনেক পাপ প্রলোভনের ধার কমে যায়। মেয়েদের বেশভূষার মত, ধর্ম্মে অনুরাগও একটা সৌন্দর্য্য-উপকরণ। আর পাঁচ কাজের সঙ্গে, ধর্ম্মভাব থাকলে মেয়েরা সহজে বশে থাকে, শান্ত থাকে, এবং দুঃখ কষ্ট নীরবে সইতে পারে। সুতরাং বাবুরা স্বয়ং ধর্ম্মের ধার না ধারলেও, মেয়েরা ধর্ম্ম নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছে, এ দেখ্‌তে পেলে তৃপ্তি লাভ করেন। সকল দেশের পুরুষদেরই এই ইচ্ছা যে, মেয়েরা যথা-প্রচলিত ধর্ম্ম ও ক্রিয়া-কলাপে, মত বিশ্বাস নিয়েই থাকুক, ধর্ম্মের বিজ্ঞান ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে হাত দিয়ে তাদের কাজ নাই। কিন্তু বহু প্রাচীন কালেও কোন কোন মহিলা প্রচলিত মৃত ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে, প্রকৃত ধর্ম্ম কি জানতে চেয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞ পুরুষদের সমকক্ষ হ'য়েছিলেন। অতীত কালে এমন দুটি চারটি নারীর নাম শুনা যায়।

বর্ত্তমান কালে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও ধর্ম্মে সার ও অসার কি তা জেনে ও বুঝে, অসার বর্জ্জন ও সার গ্রহণ করতে চাচ্ছেন। শাস্ত্রে লেখে, কিম্বা প্রচলিত আছে, অথবা গুরু পুরোহিত বলছেন বলে, কোন কথা নির্ব্বিচারে মান্য করা, বা অন্ধের মত কোন কাজ করা শিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে দিন দিন অসম্ভব হ'য়ে উঠছে; এমন কি যারা শিক্ষিতা নয়, তারাও শিক্ষা বিস্তারের মার্জ্জিত হাওয়ার সংস্রবে এসে সব বিষয়েই সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা আবশ্যক বোধ করছে। মানুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়সকল যদি সবল সতেজ হয়, তা হ'লে সে কেবল অন্যের চালনার অধীন হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, সে নিজে নিজেই নানা দিকে হাত পা বাড়ায়। তেমনি, মানুষের মন যদি জাগ্রত, চিন্তাশীল হয়, তা হ'লে মানুষ অন্যের মত মেনে চল্‌তে পারে না, তার নিজের বুদ্ধির আলোক অনুসরণ না ক'রে সে থাকতে পারে না। দেহ-মনের এই জাগ্রত সতেজ অবস্থাই মানুষের উন্নতির, মুক্তির দ্বার। এপথ সংগ্রামময়, কিন্তু এই পথই পথ।

জগতের অধিকাংশ লোক আর সকলকে নিজের অধীন রাখতে পারলেই যেন সুখী হয়। ব্যক্তি হিসাবে, জাতি হিসাবে, স্ত্রী পুরুষ হিসাবে, নানা আকারে এ কথা সত্য। জগতে চিরদিনই এ ভাবের প্রতিবাদ হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে এই সংগ্রাম অতি স্পষ্ট হ'তে চ'লেছে। ভারতবর্ষে, এক সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই সংগ্রাম চলেছিল,—কি রাজ্য শাসনে, কি ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনায়। এখন এই সংগ্রাম বহু বিস্তৃত আকারে দেশময়, জগৎময় ছড়িয়ে প'ড়েছে। তবুও প্রভুত্বের লালসা জগতে বেড়েই চলেছে। সেই লালসার লোল জিহ্বা আজ ইউরোপের মহা সংগ্রাম রূপে জগত গ্রাস করতে প্রসারিত। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও সেই সংগ্রামের মধ্যে প্রতিপক্ষরূপে বর্ত্তমান। সম্মুখে স্বাধীনতার ও মুক্তির যুগ, সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ তাই ঘোষণা করছে।

তবুও রমণী পুরুষের অধীনে থাকে, এভাব জগতে অতি প্রবল। প্রচলিত ধর্ম্ম-ব্যবস্থার অধীনতা যদি রমণীগণ স্বীকার করেন, তা হ'লে অন্য প্রকার অধীনতা স্বীকার সহজ হবে। এই জন্য, মহিলারা প্রচলিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবনতা থাকেন, এটা পুরুষদের কাছে মেয়েদের একটা বিশেষ গুণ।

কিন্তু, জ্ঞানের ফল মানুষের মনের উপর স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দুই প্রকার হয় না। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে, পুরুষদেরই মত, নারীদের মনেও অনেক কথা জাগ্‌ছে। ধর্ম্মের নামে যা কিছু প্রচলিত, তা সত্য কিনা, কল্যাণকর কিনা, সত্য কিনা,—এসব চিন্তা তাদেরও মনে উদয় হ'চ্ছে। বুঝি আর না বুঝি, কোন একটা কাজ, কোন একটা অনুষ্ঠান, কোন একপ্রকারের অর্চ্চনা-বন্দনা, প্রচলিত প্রথানুসারে করলেই আত্মার কল্যাণ হয় কিনা, চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, শিক্ষার আলোকে নারীগণ জীবনটাকে যত বড় ব্যাপার ব'লে বুঝতে পারছেন, তার তুলনায় জগতে তাঁদের স্থান অতি সংকীর্ণ বলে অনুভব করছেন। কেবল অধীনতা, বাধ্যতা, মাথা নত করাই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য নয়, তাতেই জগতের কল্যাণ নাই,—তাঁদের পক্ষেও চোক মেলে চেয়ে দেখে, বুঝে, সত্যের পথে মাথা উঁচু ক'রে চলাই ভগবানের বিধি তাতেই জগতের কল্যাণ। জীবনের পথে, সংগ্রাম ও সৌন্দর্য্য সাধনের পথে ধর্ম্ম যদি কোন কাজে না লাগে, সে ধর্ম্ম পুরুষগণ দু'দিন আগে ছেড়েছেন, মেয়েরা দু'দিন পরে ছাড়ছেন,—ছাড়ছেন। তাতে আমরা এত বিস্মিত হ'ই কেন? জীবনের অবাধ গতির পথে, উন্নতির পথে ধর্ম্ম কি সহায়, না পদে পদে বিঘ্ন? যদি সহায় হয়, পুরুষেরাও ছাড়বেন না, মেয়েরাও ছাড়তে পারেন না। যদি কোন বস্তু কাজে না লাগে, অথচ জায়গা জুড়ে বসে থাকে, তা হ'লে সে বস্তু বেশী দিন আদর ক'রে রাখা কঠিন; বর্ত্তমান যুগ লক্ষ লক্ষ মনে এই চিন্তা এনেছে, যে খৃষ্ট ধর্ম্মের কি এই বল, এই শক্তি! শিক্ষার পিছে সময় নষ্ট করা, আর কোটি কোটি টাকা ও কত লোকের জীবন দিয়ে এই ধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারের কি দরকার! ধর্ম্মের এত কাণ্ডকারখানা ক'রেও যদি মানুষ বাঘ ভালুকের অধম হ'য়েই থাকলো, তবে এ ধর্ম্মের কি দরকার? এ বড় কঠিন প্রশ্ন।

জগতের সকল বিভাগেই নারী তার স্থান দেখতে পাচ্ছে। কেবল সন্তান প্রসব, সন্তান পালন এবং গৃহস্থালী সামলানই নারীর কাজ নয়। এই কাজগুলির উপর খুব রং ফলিয়ে আঁকিয়ে দেখালেও কেবল এই একমাত্র সংকীর্ণক্ষেত্রে—অন্তঃপুরে—সকল রমণীর জীবন সীমাবদ্ধ নয়, কেবলমাত্র এই এক ক্ষেত্রেই নারী-জন্মের সার্থকতা নাই। জগতের যেখানে পুরুষ, সেখানেই নারীর আবশ্যকতা আছে;—কেবল নারীর নিজের জন্য নয়, পুরুষের জন্য, জগতের জন্য।

বেদের তাৎপর্য্য জেনে তৃপ্ত থাকার দিন আর আজ নাই। সকল বিভাগে মহিলাগণ ক্রমশঃ আপনার স্থান অধিকার করতে চাচ্ছেন। শ্রীমতী কস্তুরাবাই গান্ধির এত সম্মান কেন? ভারতবাসীর রাজনৈতিক সংগ্রাম-ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভারত-মহিলা, তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রেছেন, স্বামী জেলে গিয়েছেন, আর তিনি অন্তঃপুরে বসে বসে অশ্রুপাত করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা ও বধূ হ'য়ে, প্রকাশ্য রাজপথে পণ্য-দ্রব্যের বোঝা মাথায় ক'রে বেড়াতে লজ্জা বোধ করেন নাই। ইনি বর্ত্তমান যুগের রমণীর আদর্শ। ইনি গৃহিণী, জননী,—কিন্তু জাতীয়-জীবনের প্রশস্ত রাজপথে, সংগ্রামে, সর্ব্বত্র স্বামীর সহায় ও সঙ্গিনী। ইনি জীবনটাকে বড় চোকে দেখেছেন, তাই এসব কাজ করতে পেরেছেন, না ক'রে থাকতে পারেন নাই। জীবনের সকল বিভাগে রমণীর দৃষ্টি পড়েছে। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ সর্ব্বত্র নরনারী সকলের সমান অধিকার,—পুরুষের পক্ষে এক রকম ব্যবস্থা, মেয়েদের পক্ষে আর এক রকম ব্যবস্থা ঠিক নয়,—মানবাত্মার বিকাশের সকল পথ সকলের জন্য খোলা থাকা চাই, যে যে পথে পারে অগ্রসর হবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের কোন সভায়, একজন মহিলা, ইংরাজ মহিলাদের সকল বিভাগে উন্নতি ও অধিকার লাভের চেষ্টা সম্বন্ধে, ব'লেছিলেন:—আমাদের আন্দোলন নারীত্বের আন্দোলন নয়। বরং একে মনুষ্যত্বের আন্দোলন বলা যেতে পারে, কারণ, আমরা স্ত্রী পুরুষ সকলের জন্য মনুষ্যত্বের পথ উন্মুক্ত করতে চাই: পুরুষদের মধ্যেও পবিত্রতা, কোমলতা ও ত্যাগ দেখতে চাই, এবং মেয়েদের জন্যও বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহসের পথ খোলা থাকা চাই। স্বর্গ রাজ্য যাকে বলে, অর্থাৎ সকল প্রকার শক্তির সাধন ক্ষেত্র, আমরা তাই আনতে চাচ্ছি। যোগ্যতার দিক দিয়ে দেখলে, আমরা এই স্বর্গ রাজ্যের নিতান্ত অযোগ্য; পুরুষগণও অযোগ্য। কিন্তু ভগবানের রাজ্য তো কেবল সাধুদের জন্য নয়, অযোগ্য যারা তারাও যোগ্য হবে, সে জন্যই তাঁর এত বিধি ব্যবস্থা,—পুরুষগণ সব তাঁদের আয়ত্তে রেখে, মেয়েদের জন্য একটি কোণ ছেড়ে দিয়েছেন। এ ভগবানের সনাতন বিধি নয়।

সমাজ, শিক্ষা রাজনীতি, চিকিৎসা, সেবা প্রভৃতি জীবনের বিবিধ বিভাগে যেমন রমণী নূতন ভাবে আপ-

নার স্থান অধিকার ক'রেছেন, তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও রমণীর দৃষ্টি গভীরতর ও তীক্ষ্ণতর হ'চ্ছে। কেবল প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা রমণীর পক্ষেও দিন দিন কঠিন হ'চ্ছে! "মাতাপুত্র কিছু বুঝিনা তবুও করতে হয়, তাই করি"—এভাব আর টিকছে না। চারিদিকে শিক্ষার স্রোত খুলে যাচ্ছে,—কতক স্বয়ং লেখাপড়া শিখে কতক শিক্ষিতা মহিলা ও শিক্ষিত পিতা পুত্র স্বামী ভাই প্রভৃতির সংস্রবে থেকে, মহিলাদের স্বাধীন চিন্তা খুলে যাচ্ছে। সকলেই চিন্তা করতে শিখছেন,—এটা সত্য কি না,—জ্ঞানের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, উন্নতির সঙ্গে, এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না; যদি তা না থাকে এতে কেন মন দেব, এ কেন মান্‌বো?

পুরুষগণ নিজেদের জীবনে শিক্ষা ও সময়ের এইরূপ ফল দেখে তত আপত্তি করেন না; যত তয় মেয়েদের বেলায়। কিন্তু, যে বিভাগে মহিলাগণ পা দিয়েছেন সে বিভাগেরই যথেষ্ট কল্যাণ হ'য়েছে। শিক্ষিতা মহিলা সকল বিষয়ে, পুরুষের শক্তি, বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট সহায় ও সঙ্গিনী। ধর্ম্ম বিষয়ে মহিলাদের জাগ্রত দৃষ্টি ও স্বাধীন চিন্তার ফলে, ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য আনন্দ প্রস্রবণ-রূপে উৎসারিত হবে; এ আশা অতি সঙ্গত। সকল বাধা অতিক্রম ক'রে জগত সেইদিকে চলেছে—এপথে যাঁরা সহায়, তাঁরাই বন্ধু।

বীর-বিক্রম

সহদেব। বলবন্ত, ভাই, আমি যাই, কিন্তু তোমায় এক অনুরোধ বলবন্ত; আমার সঙ্গে আমার দেখা না করে তুমি চোলরাজ্য পরিত্যাগ করোনা ভাই!

(নিষ্ক্রান্ত)

বিক্রম। (রুদ্ররোষে) পালিতা কন্যা আমার, আমি বলে রাখছি, আজের ঘটনার জন্য তোমায় অনুতাপ করতে হবে। তখন দেখবে—

তরলিকা। বাবা, বাবা, তুমিও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়োনা—

বিক্রম। আমি বলে রাখছি বলবন্ত, অর্দ্ধঘণ্টার আর এ বিবাদের শান্তি হবে না,—একটা বিষম বিপ্লবের সূচনা মাত্র আজ হয়ে গেল।

বলবন্ত। আপনি কি কর্ত্তে চান, সিংহলরাজ?

বিক্রম। এমন অপমান? আমার অন্তরাত্মা জ্বলছে। কি করব?—কি করব জানিনা, কিন্তু এমন কিছু করব, যাতে সিংহলরাজের চোলদেশে আগমন ভারতবর্ষের এক-প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়ন হয়ে উঠে।

বলবন্ত। হতে পারে, কিন্তু স্থির জানবেন সিংহলরাজ! আমি জীবিত থাকতে আপনি সহদেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে পারবেন না।

বিক্রম। পারব না? যদি করিই.

বলবন্ত। পারবেন না বলছি, যতই কেন আপনি অভিলাষ না করুন।

বিক্রম। (আবেগে) বেশ! তুমিও আমার শত্রুর সঙ্গে যোগ দিলে বলবন্ত! তুমি ভেবেছ তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমি একা দাঁড়াতে ভয় পাব?

বলবন্ত। শুনুন সিংহলরাজ! আপনি আর আমি শত্রুভাবে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াব—ভগবান করুন এমন দিন যেন না আসে, আপনি আমাকে শত্রু ভাববেন না। আপনি তরলিকার পিতা—আমার পিতৃতুল্য—একথা সর্ব্বদা আমার মনে জাগছে।

বিক্রম। বলবন্ত, মহৎ উদার তুমি—আমিও এমনি আশা করছিলাম।

বলবন্ত। কিন্তু সিংহলরাজ, সহদেবের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে, সহদেব আমারি আশৈশব বন্ধু। যুদ্ধে, বিগ্রহে, শান্তি-সম্পদে, আমরা চিরদিন পরস্পরের মুখ চেয়ে, হাতে হাত ধরে চলে এসেছি—পৃথিবীতে আমার প্রিয়তম বন্ধু সহদেব। আপনি জানেন সিংহলরাজ, সহদেব ভীরু কোন দিনই নয়, কিন্তু সে শান্তি-প্রিয়, যুদ্ধের তৃষ্ণা তার নাই। আর আপনি এও জানেন বোধ হয় যে বলবন্তের নিকট যুদ্ধ কোন দিনও বিভীষিকার বস্তু নয়। তবু আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি সহদেবের সঙ্গে বিরোধ রাখবেন না; এইবার শুধু আমার অনুরোধ রক্ষা করুন সিংহলরাজ।

বিক্রম। আমি পারি না। আমি শুধু হাতে যদি সিংহলে ফিরে যাই, সিংহলের সমস্ত বীরগণ আমার পানে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসবে।

বলবন্ত। আপনি শুধু হাতে ফিরে যাবেন কেন, সিংহলরাজ? সমস্ত দেশ ঘুরে ঘুরে আমি হতে আজীবন যাহা সংগ্রহ করেছি, সেই সমস্ত সমুদ্রের উপকূলে, আমার ঐ জাহাজ দুটিতে আছে। আপনি তার একটি গ্রহণ করুন, দুটির যেটি খুসি বে'ছে নিন্, সমস্ত ধনসম্পত্তি শুদ্ধ আমি তাহা আপনার হাতে সমর্পণ করে কৃতার্থ হই। বিনিময়ে আমি আর কিছুই চাই না, শুধু আপনি সহদেবের মালবিকা অপহরণ মার্জ্জনা করুন, সহদেব শান্তিতে থাকুক।

বিক্রম। ধন্য বলবন্ত, তুমি সহদেবের জন্য এতখানি ত্যাগে স্বীকৃত হচ্ছ!

বলবন্ত। এ অতি সামান্য সিংহলরাজ, বিশ্বস্ত সুহৃদের জন্য যাই করা যাক না কেন, কিছুই বেশী বোধ হয় না।

বিক্রম। তোমার যা' আছে সমস্তের অর্দ্ধেক দিচ্ছ!

বলবন্ত। (আবেগে) অর্দ্ধেক কেন, আমার সর্ব্বস্ব আপনি গ্রহণ করুন, আমার দুই জাহাজ, তাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি, আমি সব আপনাকে দান করলুম, আমি সামান্য সৈনিকের বেশে আপনার ভৃত্যের মত আপনার সঙ্গে সিংহলে যাব। আমার হস্ত দুর্ব্বল নয়, আমার অসি তীক্ষ্ণধার, আমি আজ আপনাকে যা দান করলুম তা উপার্জ্জন কর্ত্তে আমার বেশী দিন দরকার করবে না। কিন্তু আপনি যদি আজ সহদেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, আমার মনের সুখ-শান্তি চিরকালের নিমিত্ত নষ্ট হয়ে যাবে। সিংহলরাজ, আপনার কি উত্তর?

বিক্রম। (চিন্তিত ভাবে) দুটি উৎকৃষ্ট রণতরী, নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র, বহুমূল্য মণিমাণিক্য, ধনসম্পত্তি,—এর চেয়ে বেশী ভার আমি কি আশা কর্ত্তে পারি? কিন্তু (থামিয়া, আবেগে) না বলবন্ত, তা হতে পারে না, মালবিকা আমার হৃদয় দেখিয়ে দিয়েছে। আমি শুনব না—তোমার দান লওয়া—সে অতি হেয় কাজ হবে।

বলবন্ত। শুনুন আমার কথা—

বিক্রম। না, হবে না, আমার দাবী আমি নিজেই আদায় করব—তাতে যা হয় হবে।

রবিভদ্র। (অগ্রসর হইয়া) বলবন্ত তো আপনাকে ভাল পরামর্শই দিচ্ছেন সিংহলরাজ। আপনি যদি নিজেই আপনার দাবী আদায় কর্ত্তে চান, আমিও আপনাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এই ব্যাপারে মালবিকার কিন্তু হাত যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এর মীমাংসার আশাও করবেন না। আপনি আমার পরামর্শ যদি শোনেন তবে সহজেই প্রতিহিংসা গ্রহণ কর্ত্তে পারেন।

বিক্রম। প্রতিহিংসা? কি পরামর্শ তুমি দিতে চাও, শুনি।

বলবন্ত। নিশ্চয় কুপরামর্শ।

তরঙ্গিকা। ওর কথা তুমি শুন না, বাবা!

রবিভদ্র। মালবিকা আমায় ঘরছাড়া করেছে, প্রতি নিমেষে আমার প্রাণনাশ করবার সুযোগ খুঁজছে! পরে আমায় রক্ষা করবেন, প্রতিজ্ঞা করুন, আমি সমস্তের প্রতিশোধ নেই, আমি আজ রাত্রে যেয়ে তাদের ঘরবাড়ী সমস্ত পুড়ে ছাড়খার করে দিয়ে আসি। কেমন, আপনি রাজি আছেন?

বলবন্ত। রাক্ষস!

বিক্রম। রাজি? বলব আমি কি করতে বেশী রাজি? (বজ্রকঠোর স্বরে) আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোর নাক কান কেটে তোকে সাগর পার করে দিয়ে আসি, নরাধম, ঘৃণিত কুকুর! এমনি কাজে তুমি আমার সাহায্য আশা কর—হীনমতি দুর্বৃত্ত!

রবিভদ্র। (সভয়ে, সবিস্ময়) আপনি যদি কিছু না ও করেন, মালবিকা কখনো শত্রুতাসাধনে বিরত থাকবে না।

বিক্রম। না থাকুক, আমার বাহুতে শক্তি আছে, অসিতে ধার আছে!

বলবন্ত। এখন দূর হ পাপাশয় বর্ব্বর! তোর সঙ্গে আলাপ করাও ভদ্রলোকের অপমানের বিষয়।

রবিভদ্র। (যাইতে যাইতে) বেশ তাই হ'ক, আমার প্রতিহিংসা আমি যেরূপে পারি নিজেই নিব।

কিন্তু আমি বলে যাই সিংহলরাজ, মালবিকাকে আপনারা জানেন না। তার সঙ্গে ব্যবহার কর্ত্তে সাবধান। মৃদু ব্যবহারে বশীভূত হবার রমণী সে নয়। আমি তাকে বেশ জানি, তার সঙ্গে লড়তে হলে কি রকমে লড়তে হবে তাও জানি। (সমুদ্র-তীরের দিকে চলিয়া গেল)

তরলিকা। এ নিশ্চয় মনে মনে কোন প্রতিহিংসার মতলব এটেছে—বাবা, একে এখনি বাধা দেওয়া উচিত।

বিক্রম। (সক্রোধে) না,—নিক এ প্রতিহিংসা, বাধা দেব না, বুঝুক মালবিকা—

তরলিকা। এ নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা নয় বাবা, তুমি রাগ করে বলছ! পিতার স্নেহে, নিজ হাতে তুমি মালবিকাকে শিশুকাল হ'তে পালন করে এসেছ, সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা!

বিক্রম। পিতার স্নেহে?—অন্যায় করেছি। এখন দেখছি গোকুলের অভিশাপ ফলতে চল্ল!

বলবন্ত। অভিশাপ?

বিক্রম। হাঁ, জান না? আমার অস্ত্রাঘাতে মালবিকার পিতা গোকুল যখন মরণাহত হয়ে ভূমির উপর পড়ল, আমি অসি দূরে নিক্ষেপ করে স্তম্ভিত হয়ে তাহার নিকট দাঁড়ালুম। স্থির চোখে গোকুল আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্‌ল—

শোধ দিবে এর বিলক্ষণ,
গোকুলের যে আপন জন।
গোকুল বিত্ত হবুল যেই,
জগতে তার শান্তি নেই।

সুর করে এই কথা বলে, সে কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর আমার দিকে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল,—তারপরে সে মরে গেল।

বলবন্ত। আপনিও যেমন! এই সামান্য কথা নিয়ে এতটা বিচলিত হচ্ছেন!

বিক্রম। কি জানি,—কি করে বলি? সামান্য না ও হতে পারে! লোকে বলে, শুনতে পাই, গোকুল না কি তার ছেলে মেয়েদের বাপের হৃৎপিণ্ড রেঁধে খাইয়েছিল, প্রতিহিংসা নিতে যেন তারা কখনো না ভুলে! মালবিকাকে দেখো, কথা বড় মিথ্যা হবে না!

(থামিয়া, তাহাদের চাহিয়া) সহদেব যে! আমার তবে আমাদের দেখা হলো!

সহদেব। (প্রবেশ করিয়া) হাঁ সিংহল-রাজ; আপনি আমাকে যাই মনে করুন আমি আপনার নিকট হ'তে শত্রু ভাবে বিদায় নিতে পারছি না।

বিক্রম। কি করতে চাও?

সহদেব। বন্ধুভাবে আপনার আশীর্ব্বাদ চাই, তার পরে আপনি যাবেন! আমার কথা শুনুন সবে;—আমার বাড়ী চলুন আজ, আমার অতিথি হয়ে যত দিন ইচ্ছা থাকুন, আমার সাধ্যমত অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হবে না। কাপড়া কাটির কথা কেউ উল্লেখ করবে না, আজও না, কালও না—

বলবন্ত। কিন্তু মালবিকা?

সহদেব। সে আমার কথায় রাজী হয়েছে; বাড়ী গিয়ে তার মতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে এখন মনে করছে, আপনারা যদি আমার বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হতে রাজি হন, তবে এখনো একটা মিটমাট হতে পারে।

তরলিকা। বেশ, বেশ যদি তা হয়,—

বলবন্ত। (সংশয়ের সহিত) কিন্তু আমি, ঠিক বুঝতে পারছি না,—

তরলিকা। তোমার বন্ধু সহদেব, তুমি নিশ্চয় আপত্তি করবে না, আমি তোমার স্বভাব জানি।

সহদেব। আশৈশব বন্ধুত্বের কথা স্মরণ কর বলবন্ত, সেই একসঙ্গে ভোজন, শয়ন ভ্রমণ, এই সময়ে তুমি বিমুখ হয়ো না বলবন্ত!

তরলিকা। (বলবন্তের প্রতি) মালবিকা রেগেছে, জানো! চলে গেলে তার সে রাগ চিরকাল থাকবে। তা কখনো হবে না প্রভু।

সহদেব। আমি সিংহলরাজের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছি, তার প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত আর আমার মনে শান্তি নেই!

বলবন্ত। (আবেগে) আর যা করতে বল করব, কিন্তু থাকতে অনুরোধ করোনা সহদেব। (শান্ত হইয়া একটু পরে) জানত, আমি কলিঙ্গরাজের বেতনভোগী

কৃতা. শীঘ্র শেষ হবার আগে আমার কলিঙ্গে পৌঁছান চাই-ই।

তরলিকা। কিন্তু এখানে দুই একদিন দেরী করলেই ত আর শীঘ্র শেষ হয়ে যাচ্ছে না!

সহদেব। মানুষের ভাগ্যে কি আছে তা কেউ জানতে পারে না; হয়ত তোমার আমার এই শেষ দেখা বসবন্ত। তাই যদি হয় ভাই, তবে ঠিক জেনো, আমার শেষ অনুরোধ না রাখবার জন্য তোমায় অনুতাপ করতে হবে।

তরলিকা। আর, আমিও বলে রাখছি, তবে আমার মুখে আর কোনো দিন হাসি দেখবে না!

বসন্ত। তবে তাই হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক সহদেব,—আমিও—; যাক। আমার মন স্থির হয়ে গেছে. এই তরবারি ছুঁয়ে বলছি, আমি থাকব, তোমার অতিথিও হ'বে। কেমন হ'ল?

সহদেব।—আর কি বলব বসবন্ত! আমি জানতাম তুমি স্বীকার করবে। আর সিংহলরাজ আপনিও থাকবেন নিশ্চয়।

বিক্রম। (ক্রুদ্ধভাবে) দেখি বিবেচনা করে। মালবিকা আমার বড় অপমান করেছে, আমি আজ তোমাকে কোন কথা দিচ্ছি না।

সহদেব। আচ্ছা বেশ, বীরশ্রেষ্ঠ, তরলিকা আর বসবন্ত সে বুঝবে, আপনাকে নরম করতে তারা জানে। আমি যাই তবে, ভোজের আয়োজন করিগে। আমার বাড়ীতে আবার দেখা হবে। (দক্ষিণে নিষ্ক্রান্ত)

বসবন্ত। (আপন মনে) মালবিকার মতির পরিবর্ত্তন হয়েছে?—সহদেব মালবিকাকে জানে না, আমার মনে হচ্ছে মালবিকা কোন নূতন মতলব পাকাচ্ছে—নিশ্চয়,—থাক্। (নিজের লোকজনের প্রতি) এস তোমরা সবে, আমাদের চলে এস; সহদেবকে মূল্যবান উপহার দিতে হবে, তা পছন্দ করিগে এস।

তরলিকা। সবার চেয়ে ভাল, জিনিসগুলি বেছে নিব চল। আর বাবা, তুমি যেতে স্বীকার না হওয়া পর্য্যন্ত আর তোমায় শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিনে! (তরলিকা, বসবন্ত ও তাহার লোকজন চলিয়া গেল)

বিক্রম। স্বীকার হব? হুঁ। হতেম যদি এর মধ্যে মালবিকা না থাকত তবে—আর যদি একবার বুঝতে পারতাম কি করে একে জব্দ করা যায়! একি! বীরবাহু, কোথা হতে এলি!

বীরবাহু। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) বাবা! তোমার নাকি সহদেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

বিক্রম। হাঁ!

বীরবাহু। আর তার সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে?

বিক্রম। হাঁ,—অন্ততঃ মালবিকার সঙ্গে ত!

বীরবাহু। তবে শুনে খুসী হবে, তোমার প্রতিহিংসা তুমি পাবে।

বিক্রম। প্রতিহিংসা? কে নিচ্ছে?

বীরবাহু। শোন;—আমি তাহাকে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় লাঠি হাতে একটা লোক ছোঁড়া এল আর ডেকে বল্‌ল—শুন বিক্রমসিংহের লোক সব, বিক্রমসিংহকে তোমরা রবিভদ্রের প্রণাম জানিয়ে ব'লো, আমি আমাদের উভয়ের জন্য প্রতিহিংসা নিতে যাচ্ছি।" এই বলে সে একটা নৌকায় উঠে দাঁড় চালিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আবার ডেকে বলে গেল,—আমি বিশ জন লোক নিয়ে যাচ্ছি, তার প্রত্যেক জন মালবিকা রাণীর কোপ-দৃষ্টিতে নির্ব্বাসিত। তাদেরে নিয়ে আমি পাণ্ড্য দেশে যাচ্ছি, রাত্রি আসবার পূর্ব্বেই মালবিকার মাতৃগৌরব আমি ঘুচিয়ে দিব।

বিক্রম। এই বলেছে সে! হাঁ বুঝতে পারছি, সহদেব তার ছেলেকে পাণ্ড্য দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর রবিভদ্র মালবিকার ঘোর শত্রু—

বীরবাহু। তাই রবিভদ্র যাচ্ছে, ছেলেটাকে বধ করতে!

বিক্রম। (সহসা দৃঢ়স্বরে) এখনি চল যাই, তরবারির রক্তপিপাসা মিটাবার উপযুক্ত অবসর এই!

বীরবাহু। তুমি কি করতে চাও, বাবা?

বিক্রম। তা তোর শুনে কাজ নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলি, প্রতিহিংসা রবিভদ্র নিবেনা, প্রতিহিংসা আমি নিব।

বীরবাহু। আমি তোমার সঙ্গে যাব, বাবা?

বিক্রম। না, তোর বলবন্ত আর তরলিকার সঙ্গে সহদেবের বাড়ী যেতে হবে।

বীরবাহু। বলবন্ত? সে এদিকে এসেছে?

বিক্রম। হাঁ দেখিস নি? ঐ দেখ তার যুদ্ধ জাহাজ, আমাদের মিটমাট হয়ে গেছে, তুই তার সঙ্গে যাবি।

বীরবাহু। তোমার শত্রুর বাড়ীতে!

বিক্রম। হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই যাচ্ছিস্ কেবল। কেমন পারবি না? কিন্তু সাবধান বীরবাহু, আমি কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কারো কাছে বলিস না কিন্তু। বুঝেছিস্? কারো কাছে না।

বীরবাহু। না, না, নিশ্চয় বলব না।

বিক্রম। (তাহার হাত ধরিয়া স্নেহবিগলিত নয়নে চাহিয়া) যা তবে বীরবাহু, নিরস্ত্র সভায় বেশ ভাল ভাবে চলিস কিন্তু, আমার মান রাখিস্ বাপ! কারো সঙ্গে বৃথা তর্ক করোনা কিন্তু যা বলবে তা যেন তীক্ষ্ণধার হয়। স্নেহের চোখে যে দেখবে তার কাছে অবিনয় প্রকাশ করিস না, কিন্তু কেউ যদি আক্রমণ করে তবে চুপ করে বসে থাকিস না।

বীরবাহু। আমি সব ঠিক করে নিব তুমি কোন চিন্তা করো না বাবা!

বিক্রম। আচ্ছা, তবে যাও এখন সহদেবের বাড়ী, আমি শিগ্‌গিরই আস্‌ছি—এমন ভাবে আসব, লোকে দেখে অবাক হয়ে যাবে! (সোৎসাহে সৈন্যগণের প্রতি) উঠ একবার সিংহশিশুগণ, তীক্ষ্ণধার অসি সঙ্গে লও, আমি রক্তপান করাব তোমাদেরে!

(তাহার পুত্র ও সৈন্যগণসহ চলিয়া গেল। অপর দ্বার হতে দূরে উৎসব বেশে সজ্জিত বলবন্ত ও তরলিকার প্রবেশ)

বীরবাহু। (পিতার দিকে চাহিয়া) এরা যুদ্ধে চল্‌ল, আর আমি নিরস্ত্র রক্ষা করতে চল্‌লাম। সকলের ছোট হওয়া ভারী দুর্ভাগ্য (তরলিকাকে দেখিয়া) তরি দিদি যে, তোমাদের দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছে—(প্রণাম)

তরলিকা। বীরু ভাই আমার, কত বড়টি হয়েছ তুমি!

বীরবাহু। পাঁচ বৎসরে হয় না?

বলবন্ত। (বীরবাহুকে আলিঙ্গন করিয়া) তুমি বাপের নাম রাখতে পারলে বীরবাহু, আমি ঠিক বল্‌ছি!

বীরবাহু। কিন্তু সুযোগ পাই কৈ, বাবা আমাকে যেতেই দেন না কোথাও!

তরলিকা। বাবার স্নেহের অত্যাচারটা বীরবাহুর উপরই বেশী,—তোমার বুঝি ততটা ভাল লাগে না বীরু—নয়?

বলবন্ত। সিংহলরাজ কোথায় গেলেন?

বীরবাহু। জাহাজে গিয়েছেন, এখনি আসবেন। চল আমরা আগে যাই।

বলবন্ত। আমি আমার লোকের জন্য অপেক্ষা করছি, তারা কিছু দিনিস নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসবে। আর জাহাজগুলিও মজুর করে আনবে।

বীরবাহু। যাই, আমি তবে, তাদের সাহায্য করিগে। (প্রস্থান)

বলবন্ত। (একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) তরু, লক্ষ্মীটি, এখন এখানে আর কেউ নেই, তোমায় একটা কথা বলব, আর তা গোপন করে রাখা যায় না!

তরলিকা। (বিস্মিত হইয়া) কি কথা?

বলবন্ত। দেখ, এই যে সহদেবের বাড়ী যাচ্ছি এতে বিপদ ঘটতে পারে!

তরলিকা। বিপদ? তুমি কি মনে কর সহদেব—

বলবন্ত। না, না, সহদেব খুব ভাল মানুষ, তবু তার বাড়ী অতিথি না হয়ে চলে গেলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।

তরলিকা। আমার বড় ভয় হচ্ছে, তুমি খুলে বল ব্যাপার কি?

বলবন্ত। আমার কথা শুন আগে। তোমায় একদিন সোনার থালা এনে দিয়েছিলাম, মনে আছে? তা কোথায়?

তরলিকা। (দেখাইয়া) এই যে, তুমি আমায় পরতে বলেছিলে, তাই পরি।

বলবন্ত। ঐ থালা খুলে সমুদ্রের জলে ছুড়ে ফেলে দাও, আর যেন তা কখনো না পাওয়া যায়। ঐ থালা

দেখছ ওতে হয়ত অনেক লোকের মৃত্যুবাণ লুকিয়ে আছে।

তরলিকা। বাণাতে?

বলবন্ত। মনে আছে সেই রাত্রির কথা তরু, যখন তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসি!

তরলিকা। মনে নাই?

বলবন্ত। সেই রাত্রির কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।

তরলিকা। (ব্যগ্রভাবে) কি বলবে?—বল আমাকে প্রভু!

বলবন্ত। মনে আছে? সে রাত্রে এক ভোজ হয়েছিল। তুমি কিছু রাত্রি হতেই তোমার শয়নকক্ষে চলে গেলে। মালবিকা কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে লাগল। বীরপুরুষ সব সেখানে একত্র হয়েছিল, সব বীরত্বের গল্প চলতে লাগল। জীবনে কে কি বীরত্ব দেখাবে, তাই প্রত্যেকে বলতে লাগল। আমি বললাম যে, যাহাদের এক সুন্দরী লাভ না করে আমি সিংহল হতে দেশে ফিরব না। সহদেবও তাই প্রতিজ্ঞা করল—আর অর্থপূর্ণ চাউনিতে মালবিকার দিকে সে চাইল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মালবিকা বলল,—"বীরত্বের বীরত্ব ঢের দেখেছি, আমার কক্ষদ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্বেত ভল্লুকের প্রাণ যে একাকী গিয়ে সংহার করতে পারে, সেই প্রকৃত বীর, সেই নারীর পতি হবার যোগ্য।"

তরলিকা। হাঁ, সে সব ত শুনেছি!

বলবন্ত। কিন্তু জান ত? সকলে ভাবত, সে অসম্ভব কাজ, কারণ, ওরকম ভীষণ ও হিংস্র জন্তু আর দুটি ছিল না! কেবল মালবিকা তার কাছে যেতে পারত,—বিশজন লোকের জোর সেই ভল্লুকের গায় ছিল!

তরলিকা। তাত জানি! সহদেব সে ভালুককে মারল, আর দিকদিগন্তে তার যশ বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল!

বলবন্ত। (নিরুত্তরে) যশ হল তার কিন্তু—কাজটা করেছিলাম আমি।

তরলিকা। (চীৎকার করিয়া) তুমি?

বলবন্ত। ভোজের স্থানে যখন আর লোক রইল না, তখন সহদেব আমাকে গোপনে বলল "বলবন্ত, ভাই, মালবিকাকে না পেলে আমি আর বাঁচব না," আমি বললাম, "তবে শ্বেত ভল্লুক মেরে তার কক্ষে যাও।" সে বলে, দেখ ভাই, তাদেরে আমার প্রাণের মায়া বেড়ে গেছে, বেঁচে থাকবার সাধ হচ্ছে। আমি যদি ভালুককে আক্রমণ করি, তবে ফল কি হয় বলা যায় না; মরব যে তা ভাবিনা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাকেও যে হারাব তাই ভাবছি!" অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথা-বার্ত্তা হল। ফলে এই দাঁড়াল, সহদেব তার জাহাজে গিয়ে আহার তৈরি করে রাখল, শুল্ক তরবারি হতে আমি মালবিকার কক্ষে গেলাম।

তরলিকা। (গর্ব্ব ও আনন্দের সহিত) তবে তুমি—তুমিই শ্বেত ভল্লুক মেরেছিলে!

বলবন্ত। হাঁ আমিই। মালবিকার কক্ষে সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অন্ধকার। মালবিকা মনে করল সহদেব এসেছে, সে হাতের বালা খুলে আমার দিল, সেই বালাই এখন তোমার হাতে!

তরলিকা। (একটু সংশয়ের সহিত) তুমি সমস্ত রাত্রি মালবিকার কক্ষে ছিলে!

বলবন্ত। আমার উদ্দেশ্য আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল। (একটু নিস্তব্ধতা) ভোর হবার পূর্ব্বেই আমি মালবিকাকে নিয়ে সহদেবের জাহাজে পৌঁছে দিলাম। সে কখনো আমাদের কৌশল বুঝতে পারে নাই। সহদেব তাকে জাহাজে তুলে নিয়ে গেল। তারপর আমি তোমার কক্ষে গেলাম, পরে কি হলো, তুমিত জানই। আমার প্রতিজ্ঞারক্ষা আমি সিংহলের শ্রেষ্ঠ রত্ন নিয়ে চলে এলাম, তারপর থেকেত তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ!

তরলিকা। বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী আমার! তবে তুমিই সেই বীরত্বের কাজ করেছিলে? আর—আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল, তুমি ছাড়া এই কাজ আর কার সাধ্য নয়। তুমি মালবিকার মত রমণী-রত্নকে লাভ করতে পারতে, তবু প্রভু এই হতভাগীকে বেছে নিয়েছ! তোমাকে আমি কত ভালবাসি প্রিয়তম, আমি তোমার পায়ের ধূলারও যোগ্য নই!

বলবন্ত। তবু,—প্রিয়তমে, সব শুনলে ত, যা তোমার শোনার ছিল। এখন মালাটাকে সযত্নে ফেলে দাও, মালবিকা যেন এটা কখনো দেখে না!

তরলিকা। না প্রিয়তম, আমি এ মালা ফেলব না, এ তোমার বীরত্বের কীর্ত্তিচিহ্ন; তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি গৌরবে চিরদিন ধারণ কর্ব্ব! তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি এটা কাউকে দেখাচ্ছি না, আর এসব কথা কাউকে কখনো বলব না।

(বলবন্তের লোকজনসহ বীরবাহু তাহাদের পিছন হইতে প্রবেশ করিল)

বীরবাহু। সব তৈরি, চল এখন নিমন্ত্রণে যাই।

তরলিকা। এস প্রভু, বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী আমার।

বলবন্ত। আস্তে আস্তে, ভক্ত, আস্তে! শান্তি কি রক্তপাত তোমার উপর নির্ভর করছে এখন, মনে রেখো! (উচ্চৈঃস্বরে) চল এখন সবে সহদেবের বাড়ীতে এস।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাশালী।

স্বর্গীয়া শিবসুন্দরী দেবী *

(১৯১৫।১৬ সা এপ্রিল শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক পঠিত)।

যাঁহাকে স্মরণের মধ্যে লইয়া অদ্যকার উপাসনা, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান আবশ্যক। কিন্তু পরিচয় দিতে গিয়া আমি জীবনচরিত বর্ণনার প্রয়াস পাইব না; কারণ তাহাতে কাহারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ বঙ্গনারীর জীবনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ; তাহাতে ঘটনার বিচিত্রতা নাই। একজনের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা হইতে অপরের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বাস্তবিক, মনে হয় যে, যদি কোনও নিপুণ ব্যক্তি দুইখানি জীবনচরিত রচনা করেন—একখানিতে দৈনিক গৃহকর্ম্মে আত্মসুখকে হীন করিয়া পরের সুখের জন্য তিলে তিলে দেহপাত, এবং অপর খানিতে আত্মসুখকে প্রধান করিয়া পরকে আপনারই প্রয়োজনে নিয়োগের চেষ্টা—একখানিতে ত্যাগ ও অপরখানিতে ভোগ—বর্ণনা করেন, তবে প্রত্যেক বঙ্গনারীর জীবন তাহার একখানি বা অপর খানির সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। সুতরাং কাহারও পরিচয় দিতে হইলে, তাঁহার জীবন ত্যাগের জীবন ছিল, কি ভোগের জীবন ছিল তাহা বলিয়া ফেলিলেই এক কথায় সমুদয় বুঝা যায়।

যাঁর কথা বলিতে যাইতেছি তাঁহার দীর্ঘজীবন ছিল। দিনের সুখ দুঃখ, দিনের ঘটনাবলী, দিনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; কিন্তু সে সকলের আঘাতে আত্মা যাহা গড়িয়া উঠে তাহা থাকে। সুতরাং কাহারও জীবন বহুলোকের সমক্ষে অতিনীত হইল, কি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নির্জ্জন অন্ধকারে অতিনীত হইল, তাহাতে আত্মার পক্ষে কিছুই আসে যায় না—আসে যায় দেহ-সুখকে আহুতি স্বরূপ দিয়া আত্মার আলোককে উজ্জ্বল করিয়া তোলা হইল, কি দেহসুখকে রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্মাকে অনশনে ক্ষীণ করিয়া রাখা হইল, তাহাতে। সংসারে কাহার জীবন সফল, কাহার জীবন নিষ্ফল কে তাহার বিচার করিবে? যাহাদের ধনবান আরোহী চর্ব্ব্যচুষ্য আহার করেন, কোমল শয্যায় শয়ন করেন, সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদে কাটান; তাঁহার জীবনেরই মূল্য অধিক, কি যে খালাসী তাহাদের অন্ধকারময় গহ্বরে সকলের অজ্ঞাতে দীন বেশে অনিদ্রায় করুণা তোমার তাহার জীবনের মূল্য অধিক, কে তাহা নির্ণয় করিবে? আত্মার বিচার কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃতির দ্বারা নয়, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিমাণের দ্বারাও নয়, কত লোকের সেবা হইল তাহার সংখ্যা দ্বারাও নয়, কর্ম্ম কতকাল স্থায়ী হইল তাহার দ্বারাও নয়; কিন্তু আত্মা কি ভাবে খাটিল, কতদূর দীন হইয়া আপনাকে পরার্থে দিল, তাহারই দ্বারা। এই হিসাবে, সকল অবস্থা হইতে

* ইনি শ্রীহট্ট জিলার এক বিখ্যাত সংস্কৃতাধ্যাপকের পত্নী ছিলেন।

মুক্ত হইয়া আমার জননী আজ আমার চক্ষে কত উর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছেন তাহার পরিচয় কিরূপে দিব ?

দুঃখের দ্বারা পরিত্রাতা ভগবান তাঁহার জীবনকে ত্যাগমুখী করিয়াছিলেন। আপনি দুঃখ না পাইলে পরদুঃখ বুঝা যায় না। পরের মন বুঝা, বলিবার পূর্ব্বে অভাব হৃদয়ঙ্গম করা, এ শক্তি আপন হৃদয়ে দুঃখের মধুর রস সঞ্চিত না থাকিলে জন্মে না। এই কারণে ভগবান যাহাকে ত্যাগের পথে লইয়া গিয়া পরিত্রাণ দিতে চান, তাহাকে দুঃখের দ্বারা পবিত্র করিয়া লন। মার প্রথম দুঃখ, পিতৃকুলের এমন কেহ রহিলেন না যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মা একবার পিত্রালয়ে যাইতে পারেন। আমি জন্মাবধি কখনও মাতুলালয়ে যাই নাই। সে গ্রামের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও তথায় যাওয়া ঘটে নাই। মার দ্বিতীয় দুঃখ, সন্তান-বিয়োগ। আমার তিন ভ্রাতা ও দুই ভগিনীকে একে একে তিনি হারাইয়াছেন। তৃতীয় দুঃখ, আমার অপর দুই ভগিনীর বৈধব্য। চতুর্থ দুঃখ, এক মাত্র অবশিষ্ট পুত্রের—কুলাচার পরিত্যাগ। এ সকল একদিনে ঘটে নাই, এবং বলিতে যত সহজে বলা হইল, ভোগ করিতে তত সহজও হয় নাই। বাল্যাবধি ৬০—৬২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এ সকল ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত মৃদুতর দুঃখ ভোগ করিতে করিতে অবশেষে যে শান্তির রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন তাহার আভাস ক্রমে দিতেছি।

সমস্ত জীবন ধরিয়া একদিকে দুঃখভোগ ও অপর দিকে পরসেবা কিরূপে চলিয়াছিল তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব না। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে কেহ আমার পিতার ছাত্ররূপে, অথবা অতিথি রূপে বা কুটুম্বরূপে আমাদের গৃহে কখনও বাস করিয়াছেন তিনিই মার সেবার গুণে মুগ্ধ হইয়া সে গৃহকে আপন গৃহরূপে অনুভব করিয়াছেন। আপনার বিশ্রাম বা কোনও প্রকার সুখভোগের চিন্তা বা তৎসম্বন্ধীয় কোনও কথা মার নিকট অতিশয় লজ্জাজনক ছিল। আপনাকে কোনও বিষয়ে প্রধান ধরিয়া তোলা বা আপনার ভোগ সম্পর্কীয় কোনও কথা বা কার্য্যকে অপর দশ বিষয়ের সঙ্গে সমান ভাবে প্রকাশ্যে স্থান দেওয়ার মতন ঘৃণনীয় ব্যাপার তাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না। কৃপাবশতঃ নিয়মিত কার্য্য করিতে না পারিলেও সেই অকৃত কার্য্যগুলি যে তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিবে এ চিন্তাও তাঁহার নিকট অসহনীয় ছিল। এই কারণে রোগেও বিশ্রাম ছিল না। একবার আছাড় পড়িয়া কটিদেশে এমন আঘাত পান যে কয়েক মাস পর্য্যন্ত চলিবার শক্তি ছিল না: এঅবস্থাতেও কিরূপ ক্লেশে বসিয়া বসিয়া হাতের উপর ভর দিয়া চলিয়া সমুদয় গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই।

বলা বাহুল্য যে মার সকল প্রকার দুঃখের আঘাতের মধ্যে কঠিনতম আঘাত হইয়াছিল আমার উপবীত পরিত্যাগ। এ আঘাত তাঁহার নিকট কত-দূর অসহনীয় হইবে তাহা যে আমি পূর্ব্বেই পর্য্যালোচনা করি নাই তাহা নহে। আমার মনে হইত আমি উপবীত পরিত্যাগ করিলে মা আত্মহত্যা করিবেন। মাকে এমন গভীর ক্লেশ দিয়া কি ফল লাভ করিব, এরূপ সংশয় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আমাকে আন্দোলিত করিয়াছে। দিনে রাত্রে, সংসঙ্গে নির্জ্জনে, সুখের মুহূর্ত্তে, দুঃখের মুহূর্ত্তে নানাভাবে উলট্ পালট্ করিয়া বহুকাল এ কার্য্যের বৈধতা অবৈধতা চিন্তা করিয়াছি। পরিশেষে সত্যাগ্রহের অশেষ কৃপায় আমাতে তাঁহার এতটুক প্রকাশ হইয়াছে যে সত্যের সহিত আমার, আমার সহিত সত্যের অচ্ছেদ্য নিত্যযোগ প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে ; এবং এই অনুভব হইয়াছে যে, সত্য হইতে পলায়ন আমার পক্ষে অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব হইয়াছে যে মাকে রক্ষা করা আমার কাজ নয়, আমার শক্তির আয়ত্তও নয় ; আমার কাজ সত্যাগ্রহের চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকা। আমার এই প্রণতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হৃদয়ে বল আসিল, সকল সংশয় চলিয়া গেল। যিনি সত্যরূপে আমার হৃদয়ে প্রেরক তিনিই মঙ্গলরূপে জননীর রক্ষক, এই বিশ্বাসে প্রাণ আশ্বস্ত হইল। পরে দেখিলাম জননী আত্মহত্যা করিলেন না। বৎসরের

পর বৎসর ক্রন্দন করিলেন, ক্রন্দনে চক্ষুর শক্তি হ্রাস হইল ; কিন্তু সকল ক্রন্দনেই যেমন হয়, এ ক্রন্দনেও তেমনি আত্মার দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টীম হইল, আত্ম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমিও ক্রন্দন না করিলাম এমন নয় ; আমারও তাহাতে উপকারই হইল।

এই গভীর আঘাত বা ষোল বৎসর হইল পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ আঘাতের তীব্রতা তাঁহাকে ৯।১০ বৎসরের অধিক ভোগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি বুঝিলেন এ সংসারে আপনার বলিতে বস্তুতঃ কেহ নাই। কাহারও নিকট হইতে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা বা কাহারও উপর কোনও দাবী দাওয়া যে শান্তির পথ নয় তাহা বুঝিয়া সর্ব্ব প্রকার আকাঙ্ক্ষা অভিযোগ ও দাবী পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্রাতা ভগবান বিনা আড়ম্বরে কেমন করিয়া যে তাঁহাকে এই পথ ধরাইয়া দিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই। কোন্ পথ ধরিলে কোথায় যাওয়া যায়, সে সকল শাস্ত্র তিনি কখনও পড়েন নাই বা শুনেনও নাই ; আত্মশক্তির প্রয়োগ দ্বারা অভীষ্ট পথে চলিবার যে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস—যাহাকে আমরা সাধন বলি—তাহা তিনি জানিতেন না, এবং কখনও সেরূপ প্রয়াস করিয়াছেন বলিয়া দেখি নাই। কিন্তু পরিত্রাতা আপন সময়ে দুঃখের ভীষা দিয়া তাঁহাকে দুঃখের পারে লইয়া গিয়াছিলেন।

গীতায় আছে—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্
পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ
স শান্তিমধিগচ্ছতি। ২।৭১

যে ব্যক্তি সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া, নিস্পৃহ, মমতারহিত ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করে, সেই ব্যক্তিই শান্তিলাভ করে।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ
নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি
ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি। ২।৭২

হে পার্থ! এইরূপে যে নিস্পৃহ হইয়া বাস করা ইহাকেই ব্রহ্মে স্থিতি বলে। এ অবস্থা লাভ করিলে মানুষ আর মুগ্ধ হয় না। এ অবস্থায় থাকিয়া অন্তকালেও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করে।

এই নিস্পৃহ, মমতারহিত ও নিরহঙ্কার ভাবই তাঁর দৈহিক জীবনের শেষ ৮।৯ বৎসরের বিশেষ ভাব ছিল। এই স্পৃহাহীনতা, মমতাহীনতা ও অহঙ্কারহীনতার মধ্যে বার্দ্ধক্যের জড়ভাব তিলমাত্রও ছিল না। বার্দ্ধক্যের জড়তা তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনও স্পর্শ করে নাই। নিজের সম্বন্ধে নিস্পৃহ ছিলেন বটে, কিন্তু পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে যে বিন্দুমাত্রও উদাসীন ছিলেন না, তাহাতেই এ কথার প্রমাণ হয়। তাঁহার শেষ কয়েক বৎসরের শান্তি খাঁটি শান্তিই ছিল।

এই স্পৃহাহীন শান্তির অবস্থায় থাকিয়া উপরোদ্ধৃত গীতাবচন অনুসারে অন্তকালে কিরূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিলেন তাহা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বহুবর্ষ ধরিয়া মার এই এক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে যেন দেহত্যাগ হয়। এই অভিপ্রায়ে নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার কাশীতে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। পরিশেষে দেহান্তের বিলম্ব আছে ভাবিয়া এবং সঙ্গিগণ দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তিনিও ফিরিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়াও ঐ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেন না। কাশীতে যথোচিত শুশ্রূষা হইবার সম্ভাবনা নাই, এই ভাবিয়া আমরা তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা বহুদিন পূর্ণ করি নাই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না বলিয়া তিনি কখনও কাহারও প্রতি বিরক্ত হন নাই বা কাহারও সম্বন্ধে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষার যথেষ্ট পূর্ণমাত্রায় এই বিশ্বাসের ভাব বর্ত্তমান ছিল যে, বিশ্বেশ্বর স্বয়ং গ্রহণ না করিলে কেহ তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে পারে না। বিলাতে আসিয়া যে ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন, তখনও সর্ব্বদা মনে মনে কাশীধামে যাইবার সন্ধী খুঁজিতেন ও বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া

থাকিতেন; কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে জেদ করিয়া কিছু বলিতেন না। জেদ ছিল না বলিয়াই এই আকাঙ্ক্ষাকে স্পৃহা বলিয়া গণ্য করিতেছি না। শাস্ত্রে উক্ত আছে স্পৃহা দ্বিবিধা; শুদ্ধা ও মলিনা; পরমাত্মবিষয়ক স্পৃহা শুদ্ধা স্পৃহা, তাহা নিন্দনীয় নহে। উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা ছিল বলিয়াই তাহা এমন শোভন হইয়াছিল।

প্রতীক্ষা করিতে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে গত পৌষমাসে জ্বর ও কাসিতে শরীর কৃশ ও ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে কাশীযাত্রার অভিপ্রায় পুনরায় প্রকাশ করিলেন। ক্রমে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে সকলে অনুমান করিলেন যে দেহের অবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। সংবাদ পাইয়া আমি বাড়ী গেলাম। গিয়া দেখিলাম আহারে রুচি নাই, স্বয়ং চলাফেরা করিতে অক্ষম; চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু কোনও ফল দেখা যাইতেছে না। কাশীতে লইয়া যাইবার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং নিরুদ্বেগ। কে সঙ্গে যাইবেন, কে যাইবেন না, এ সকল আলোচনা তিনি সমস্তই শুনিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই আপনাকে লিপ্ত করিতেছেন না। যেমন ভাবে ইচ্ছা, যাহার সঙ্গে ইচ্ছা, তিনি যাইতে প্রস্তুত। সঙ্গে কি কি জিনিস যাইবে বা যাইবে না গিয়া কোথায় উঠিবেন, কোথায় বাস করিবেন, এ সকল বিষয়ে তিনি চিন্তারহিত। যাত্রা করিবার সময়ে পাড়ার ৫০।৬০ কি ততোধিক পুরুষ স্ত্রী বালক বালিকা সমবেত হইলেন। সকলকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া ৫ই মাঘ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে আমার দুই বিধবা ভগিনী, এক খুড়তুত ভাই ও আমি চলিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে আমার এক পিসতুত ভাই সঙ্গী হইলেন; তখন খুড়তুত ভাই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

এই যাত্রার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিস্পৃহ ভাব আমার চক্ষে অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যে গৃহে প্রায় ৬০ বৎসর কাল বাস করিয়াছেন, যেখানে দেহ সম্পর্কে আপনার বলিবার যাহা কিছু সকলই রহিল, সে গৃহকে এমন অসঙ্কোচে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অনাসক্ত না হইলে সম্ভব হয় না।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

গীতা, ২।৫৫।

হে পার্থ! যখন মানুষ মনোগত সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করে এবং আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট হয়, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

এইরূপে যে আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট তাহার স্থান পরিবর্ত্তনে বা বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিকার কিরূপে আসিবে? আমি স্পষ্টই দেখিলাম তাঁহার আত্মা গৃহে, গৃহোপকরণে বা স্বজনবর্গে সংলগ্ন নয়।

৫ই মাঘ যাত্রা করিয়া ১০ই মাঘ কাশীতে পৌঁছিলেন। মধ্যে সঙ্গিগণের সুবিধার জন্য একদিন গয়ায় বিলম্ব করিলেন। কাশীতে দেহত্যাগ যেমন মুক্তির কারণ; গয়াতে দেহত্যাগ ঠিক তদ্বিপরীত, এরূপ সংস্কার আছে। সুতরাং শরীরের এই অবস্থায় গয়ায় যে একদিনের জন্যও থাকিতে সম্মত হইবেন, আমি তাহা মনে করি নাই। কিন্তু প্রস্তাব হওয়া মাত্র নিঃসঙ্কোচে তাহাতে মত দিলেন।

কাশীতে পৌঁছিবার পরদিনই মার মুখে হাসি দেখিলাম। দুই এক দিনের মধ্যে আহারে রুচি হইল ও গৃহের মধ্যে একটু আধটু চলাফেরা করিতে লাগিলেন। পঞ্চম কি ষষ্ঠ দিনে আমার ভগিনীরা দেব দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন; তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে বেলা অবসান হইয়া যাইবে, এই কারণে মা স্বয়ং রন্ধন করিলেন ও আমাকে খাওয়াইয়া নিজে খাইলেন। এইরূপে শরীর ক্রমশঃ সবল হইতেছে দেখিয়া অষ্টম দিনে আমি চলিয়া আসিলাম। কেবল আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সেবা করিবার জন্য মার সঙ্গে রহিলেন।

ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পরে সংবাদ পাইলাম যে মার শরীর এতটুকু সবল হইয়াছে যে ৫।৬ মিনিটের রাস্তা হাঁটিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতে পারেন এবং একদিন এক মাইল পথ হাঁটিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনেও গিয়াছিলেন। এ সংবাদে আশা হইল যে আরও

কিছুকাল দেহে থাকিবেন। কিন্তু শীঘ্রই শরীর আবার রুগ্ন হইয়া পড়িল—পায়ে কিঞ্চিৎ জলাধিক্য দৃষ্ট হইল। জ্বর ও কাসি পূর্ব্ব হইতেই আছে। ক্রমে আহারে অরুচি হইল এবং চলাফেরা পুনরায় বন্ধ হইল। দিদি বলেন, "কাশীতে আসিয়া একবার বিশ্বেশ্বর দর্শন না করিলে মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থাকিয়া যাইবে, এই জন্য স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কয়েক দিনের জন্য একটু সুস্থ করিয়া সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া দিলেন।" যাহা হউক, মার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল এবং ক্রমে উদরাময় দেখা দিল। আমি চিঠি পাইতেছিলাম; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত এমন সন্নিকট বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, এবং ছুটী পাইব ও যাইতে পারিব সে আশাও বড় ছিল না। অবশেষে ১৮ই মার্চ্চ টেলিগ্রাম পাইয়া ছুটীর জন্য আবেদন করিলাম ও আশার অধিক ছুটী পাইয়া পরদিন এখান হইতে যাত্রা করিলাম। ২১শে মধ্যাহ্নে কাশীতে পৌঁছিয়া শুনিলাম, মা ১৯শে রাত্রিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এত শীঘ্র যাইবেন জানিলে দিদি অবশ্য আরও পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করিতেন। কিন্তু মার সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থা দেখিয়া ও উঠা বসা, খাওয়া শোয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে আত্মনির্ভর দেখিয়া কেহই তাঁহার অন্তিমকাল সন্নিকট বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। শেষ তিন দিন মাত্র রোগ একটু গুরুতর হইয়াছিল। কিন্তু কোনও প্রকার যাতনা বা তজ্জনিত আর্ত্তনাদ ছিল না। একদিন জাগ্রতাবস্থায় সমীপবর্ত্তী মানুষকে যেমন করিয়া সম্বোধন করে, তেমনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা বিশ্বনাথ! মার কেন, বলত?" এই একটি কথা ভিন্ন মরণ সংগ্রামসূচক কোনও কথা শোনা যায় নাই।

১৭ই মার্চ্চ বুধবার বৈকাল হইতে জ্বর ও পেটের অসুখ বাড়িল। রাত্রের অবস্থা দেখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে দিদি আমার নিকট পূর্ব্বোক্ত টেলিগ্রাম করিলেন। বৃহস্পতিবার বৈকালে আমি জানাইলাম যে আমি তৎপর দিন রওনা হইতেছি। কোন্ দিন পৌঁছিব তাহাও জানাইলাম। পৌঁছিবার সময় জানাইবার মধ্যে একটু গুপ্ত অভিপ্রায় ছিল। তাহা এই যে আমাকে দেখিবার জন্য মার মনে যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাহার ফলে হয়ত আমার পৌঁছা পর্য্যন্ত দেহে থাকিতেও পারেন। কিন্তু আমি তখন জানি নাই যে সকল স্পৃহার সঙ্গে আমাকে দেখিবার স্পৃহাও তাঁহার দূর হইয়া গিয়াছিল। আমাকে টেলিগ্রাম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "কি দরকার? আসিয়া কি করিবে!" যখন আমার উত্তর গেল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখিয়াছে?" দিদি বলিলেন "কাল রওনা হইবে।" ইহা শুনিয়া এরূপ বলিলেন "এত দূর হইতে আসিয়া কি লাভ!"

বৃহস্পতিবার রাত্রে জ্বর একবারে ছাড়িয়া গেল; এবং শরীরের কিছু উদ্বেগ অনুভব করিলেন। সমস্ত রাত্রি প্রায় নিদ্রা হইল না ও বার বার তুলিয়া বসাইতে ও পরক্ষণেই শোয়াইতে বলিলেন। এই রাত্রে যাহা কিছু বলিবার ছিল, দিদিকে বলিলেন। দেশান্তরে যাইবার প্রাক্‌কালে মানুষ যেমন করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া পুত্রকন্যাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দেয়, তেমনি নিশ্চিন্তমনে উপদেশ দিলেন। তাঁহার দেহান্তর হইলে দিদি কাহার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন, কাহার জন্য কি জিনিষ লইয়া যাইবেন, কেন গিয়া কোথায় কতকাল থাকিবেন, এ সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দিলেন। আমার সম্বন্ধে বলিলেন "...কে বলিও আমার প্রতি যদি কোনও বিষয়ে অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাহা যেন মনে না রাখেন।" পুত্রের ক্ষমা চাওয়া হইল না; কিন্তু তিনি মা হইয়া পুত্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়া গেল। শুক্রবার দিবা ভালই কাটিল; কিন্তু অপরাহ্ণে শিথিল হইয়া আসিল। অন্নের গ্রাস মুখে তুলিবার সময় হাত হইতে পড়িয়া গেল, দেখিয়া দিদি খাওয়াইয়া দিলেন! আহারান্তে হামাগুড়ি দিয়া খাটে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া দিদি সাহায্য করিলেন। রাত্রি ৮ টা। ৮॥ টার সময় প্রয়াণ-কাল নিকট হইল। চক্ষুর জ্যোতি ফিরিয়া আসিল। বলিলেন "প্রদীপটা এমন করে কেন? বাড়াইয়া দাও।" দিদি বলিলেন, "প্রদীপত বেশ জ্বলিতেছে।" কিছুক্ষণ অন্য কথার পর আবার বলিলেন "প্রদীপটা নিবিয়া যাইতেছে কেন?"

এইরূপে এই কথাটি তিন বার বলিলেন। আমার ইহলোকের অভিমুখীন ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি যখন ক্রমে রুদ্ধ হইতে থাকে, তখন সূর্য্য চন্দ্রের প্রভা লুপ্ত হইয়া যায়, ক্ষুদ্র তৈলের প্রদীপ কোন্ ছার! কিন্তু না জানি অপরদিকে কোন্ দ্বার খোলে কোন্ আলোক প্রকাশ পায়!

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ?

আমার রাজ্যে সূর্য্য চন্দ্র তারকা দীপ্তি পায় না; এই সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না; সামান্য এই অগ্নি কোথায় লাগে? কিন্তু অন্তর্মুখ আত্মা এমন দীপ্তির অভিমুখীন হয়, যে দীপ্তি হইতে সূর্য্য চন্দ্র আপন আপন তেজ গ্রহণ করিয়া তেজস্বী। ইহলোককে পশ্চাতে রাখিয়া আত্মা চলিল, পশ্চাতের প্রবাহ সকল রুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু সম্মুখে অবাধ মুক্তি, অনন্ত আলোক!

ইহার পর বলিলেন, "আমাকে পাশ ফিরাইয়া দাও।" দিদি চেষ্টা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে পাশ ফিরাইয়া দিলেন, সম্পূর্ণ পারিলেন না। দিদি বলেন, অন্তিমসময়ে বিশ্বেশ্বর আপনার নাম আপনি শোনান; এই উদ্দেশ্যে তিনিই বুঝি পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি আপনার নাম কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিতে পারেন।" সত্যই স্বয়ং বিশ্বপতি—বিশ্বেশ্বর—ভিন্ন এ সময়ে আর কে তাঁহার নাম শোনাইতে পারে? মানুষের কণ্ঠস্বর যখন প্রয়াণোন্মুখ আত্মার নিকটে আর পৌঁছায় না, তখন তিনি ভিন্ন তাঁহার নাম আর কে শুনাইবে? তিনি ভিন্ন আর কে আলোক দেখাইবে; আর কে তাঁহাকে চিনাইবে, আর কে পথকে সুগম করিয়া দিবে?

এ ভাবে পাশ ফিরিবার পর দিদি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষ্প্রপঞ্চমনোমুখ ব্যক্তির ন্যায় তাহার উত্তর দিলেন। দিদি "অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথ" প্রভৃতি যে সকল নাম শোনাইলেন, অস্পষ্টস্বরে তাহার পুনরুক্তি করিলেন। স্বর ক্রমশঃ মানুষের স্বরের ন্যায় ক্রমে বিলীন হইল। দিদির সঙ্গের ছিল পাঁচটি হিতার সহিত মানুষের পঞ্চপ্রাণ দেহ হইতে নির্গত হয়; তদনুরূপ কিছু না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, যা একটু ঘুমাইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্দেহ হওয়াতে নাসাগ্রে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন, নাসাগ্র শীতল, শ্বাস নাই! এইরূপে নিস্পৃহ আত্মা অতি সহজে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। বারাণসী চতুর্দশীর চন্দ্রমার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে যা ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আজ আর অন্নার দেহ নাই। নাম নাই, গোত্র নাই, দেশ নাই, গৃহ নাই। কোনও প্রকার পার্থিব প্রয়োজন নাই। আত্মা আত্ম-স্বভাবে পরমাত্মাতে অবস্থিত। অন্নার দেহে থাকিয়া অন্নার দেবা যাহা কিছু করিয়াছিলেন, সমুদয় ছাই হইয়া গিয়াছে। স্মৃতি এখানে এখনও আছে, দু'দিন পরে তাহাও থাকিবে না। আছে কেবল সত্য আত্মার সত্য স্বভাব। আছে কেবল সত্য আত্মার সত্য অনুরাগ। চোখে যে বিশেষের মূর্ত্তি দেখা যায়, সে মূর্ত্তি আজ আর নাই; কিন্তু সত্য বিশেষের অনুরাগী সত্য আত্মার সঙ্গে আছেন।

আমারও অন্নার দূর হউক। আমিও সত্য আত্মা, সত্য অনুরাগের সহিত বিশেষের পরমাত্মার সঙ্গে আপন যোগ অনুভব করি। আজ এই পবিত্র অনুষ্ঠান সার্থক হউক। দেহমুক্ত আত্মা প্রসন্ন হইয়া অন্তকার পবিত্র উপাসনায় যোগদান করুন।

অবরোধ

তৃতীয় অধ্যায়

নিশীথ সময়ে রাণী পাগলের মত পুরাতন ভৃত্যের সন্ধানে ছুটলেন। অন্ধকার ভেদ করে দূরে দূরে দুর্গ প্রাচীরে স্থানে স্থানে আলো দেখা যাচ্ছে। কোথা হ'তে যুদ্ধের গর্জ্জন হুঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; কত দিক হ'তে শোকার্ত্তের বিলাপে নৈশ বায়ু কেঁপে উঠছে। পদে পদে হাহা, বিলাপ আর্ত্তনাদ—সমস্তনগর পর্ব্বত উপত্যকা আসমে

পরিণত। রাণী এই শ্মশান ভেদ করে চ'লেছেন। হঠাৎ তাঁর কানে গেল,—

মহাবীর তুমি, শান্তি পেয়েছ, সাধিয়া বীরের কাজ,
প্রলয়ের ঝড়ে ধরিও রয়েছি, কাঁদিব কি মোরা আজ!
মুক্ত সমাধি, শান্তি-সদন পেয়েছ স্বদেশ সেবি
যারা আছে তারা ধরুক কৃপাণ, বন্দী না হয় যদি।
কাঁদুক তাহারা মৃতদের তরে বলিয়া কাদের যাকে,
শত্রু পরশে হয়নি মলিন দেব-নিবস সে যে,
তব গুরুভার মাথিয়ে গিয়েছে, তুলে দেব মোরা শিরে,
দেব এ শোণিত সমর ক্ষেত্রে,—বন্ধ হইব ধ'রে।
স্মরি ভগবান, স্তুতি গুণ গান, করিনু তোমার তরে,—
যারা যাবে কাল, তাদের বিদায় যে রহিবে দিবে পরে।
প্রভাতে যখন বাজিবে জাগার মধুর সাজ!
তুমি রবে শুয়ে শান্তি-সাগরে, ও'নবে না তাতো আর
যত কাজ আজ শেষ হয়ে গেছে, গৌরবে উজল মুখ
আর কোন দাগে না হবে মলিন—এতেই মোদের সুখ।

রাণী—"তব কাজ আজ শেষ হয়ে গেছে" তাই
মরণেও আছে শান্তি—? কি গভীর কথা!
কিন্তু—নাই, নাই মম চিন্তার সময়।

[রাণীর প্রস্থান।]

সে ভীষণ রজনীরও অবসান হ'ল। রাজপুরুষগণ শত্রু-শিবিরে বন্দী; রাণী পাগলিনীর ন্যায় গৃহত্যাগ করে কোথায় পাহাড়ে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; বীরগণ শয্যায় রত, রাজা কণ্টক-শয্যায় নিদ্রাহীন, কত স্থানে শোকার্ত্তের বিলাপ-সঙ্গীত! এ রাত্রিরও শেষ হ'ল। অতি প্রাতঃকালে, রাজা মন্দিরে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় আচার্য্য হারদাত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। কণকাল উভয়েই নীরব।

হারু—কোনো কথা শুনিবে না তারা?

রাজা—সত্য মৃত স্থির-জমে সমাধি শয়নে,
অথবা অনন্ত চিতা মাঝে সমর্পিয়ে
শোকার্ত্ত যে জন, তারে পথের পথিক
যদি বলে "শান্ত হও, ক'রো না রোদন"
সে যেমন শোনে, তারা তেমনি শুনেছে!
বিশুষ্ক হৃদয় হায়, কি হবে কথায়!—
শুষ্ক নদী যাবে যথা উষ্ণ ক্ষেপনে
না ঝরে তরঙ্গ-ভঙ্গ নৃত্য বৃত্তাকারে!
নিশ্চয় পতন হবে, নিশ্চয় মরণ,
কিন্তু সহে বীরোচিত রণ রঙ্গ মাঝে
চতুরঙ্গ বলে সাজি প্রমত্ত উল্লাসে
তূরী ভেরী দামামার প্রচণ্ড নির্ঘোষে:
নিশ্চয় মরণ হায়, বীরবে বিজনে,
পলে পলে হৃদয়ের দীপ্ত দীপ-শিখা
নিবে যাবে, নেমে যাবে অন্ধকার আকারে
চিরতরে বীরত্বের অন্তিম লক্ষণ!
আমারে করো না তিরস্কার, দেব চেয়ে,
কি গভীর মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় আমার—
তবু ভয় নাই—আমি হব না কাতর!

হারু—বলো না এমন কথা! হ'ব না নিরাশ,
তিল তিল অত্যাচার অনুক্ষণ আঘাতে
কাটে দিন যবে বৎসর, নীরব সহনে,
সে তো নহে পরাজয়! দাঁড়াও উন্নত বক্ষে—
আজ যারা মৃতপ্রায় বন্দির, নিরাশ,
জাগে না তোমার ডাকে, ভূতলে শয়ান,
কাল তারা বীরদর্পে উঠিবে জাগিয়া,
দাঁড়াবে তোমার পাশে প্রাণদান তরে।
চঞ্চল হৃদয় সখা, সহজে নিরাশ,—
আবার উল্লাসদীপ্ত, জাগ্রত সচেষ্ট,—
সাগরে জোয়ার তাঁটা অপেক্ষা না ক'রে
কখনো চলে না তরী,—তেমনি হৃদয়,
ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল, ভাবের জোয়ার
আসিবে—অচিরে। তুমি ডেকেছিলে যবে
প্রান্ত ক্লান্ত ষোড়শদল বর্ষ অবসাদে,
অন্নহীন, শয্যাশায়ী: নিদ্রার পীড়নে;
অথবা বিষাদ-সাধী করুণ কম্পনে
শিরায় শোণিত ধারা দিয়েছে থামায়ে:
কিম্বা শূন্যে অর্থহীন নিসর্গের লীলা
অনিশ্চিত অকল্যাণ এঁকেছে অন্তরে!

রাজা—তা নয়, তা নয় দেব, তাদের বিষাদ
আরো গুরুতর সে কি হৃদয়-বিদারী!

শত্রু সৈন্য অবরুদ্ধ নগর মাঝারে
ঘুরিতে ঘুরিতে ঘোর নিশীথ সময়ে
যা দেখেছি দুর্দ্দি তার শিরিকল্প সম
নহে ক্ষণস্থায়ী লয়—সব পাশে বসি
কোন স্থানে শোকাতুর, শুষ্ক অশ্রুনীর,
দৃষ্টি তার ব্যক্ত করে ক্ষিপ্ত হাহাকার
জনহ শ্মশান ভেদি, গভীর যেমন!
ডাকিলাম তারে হায়,ক্ষিপ্তের মতন
অর্থহীন তীব্রহাসি, প্রলাপ বচনে
আপন হৃদয়-ব্যথা করিল প্রকাশ,
অতি গুরু দুঃখ ভারে মানবের মন
ভেঙ্গে যায়, হয় ঠিক ক্ষিপ্তের মতন!
স্থানে স্থানে প'ড়ে আছে মৃতের মতন
মহাবীর সৈন্যগণ! কি বলিব দেব,
বীরদর্পে সমুন্নত মস্তক যাদের
হৃদয় বক্ষের মত, নিরাশা পরশে
কত নত হ'তে পারে তাদের জীবন!
তবু ভয় নাই, আমি হবনা কাতর।
হা ঈশ্বর! যদি দিতে সব দুঃখভার
এ মস্তকে! কর দেব পূজা আয়োজন,
অর্চনা বন্দন সূত্রে আন নব প্রাণ,
এই প্রাণ এই অসি মাতৃভূমি তরে
করি সমর্পণ পুনঃ! একি, কি কারণ,
কাতর হৃদয় মম!—কাহার জীবনে
যুক্ত নয় প্রিয়জন হৃদয়-বন্ধন!—
আর দেরী নাই, শীঘ্র বিধির বিধানে
হব আমি পুত্রহীন,—নির্জ্জন, একাকী।
চল যাই, বেদী পাশে মন্দির মাঝারে
অর্চনা বন্দনা গানে শুরু সহবাসে
জুড়াবে হৃদয় জ্বালা, পাব নব বল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

চয়ন

ভূদেববাবু ও ছেলেদের শিক্ষা।

[অনাদিনাথ বন্দোপাধ্যায়]

ভূদেববাবু লিখিয়াছেন, "স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল-শরীর। অতএব ছেলের শরীর সবল করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়াম-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতা-মাতার কার্য্য।" ছেলেকে শুধু বিদ্যা শিখাইলে হয় না। বিদ্যা শিখিবার জন্য যে পরিশ্রম করা আবশ্যক, সেই পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে, এমন শরীর সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। একটি বাড়ী তৈয়ারি করিতে হইলে, ভিত গাঁথিতে হয়। এই ভিত যত মজবুত হইবে, তত বড় বাড়ী এই ভিতের উপর খাড়া করা যাইতে পারে। প্রথমে একতালা বাড়ী তৈয়ার করিয়া লও। আবশ্যক, সময়, ও সুবিধা মত ঐ দৃঢ় ভিত্তির উপর ক্রমে ক্রমে দ্বিতল, ত্রিতল, অথবা যত তল ইচ্ছা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভিত্তি কমজোর হইলে, উপরে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে, সর্ব্বদা ভয় থাকিবে, কখন বা সেই সমুদায় সশব্দে ভূপতিত হয়। ছেলের শরীরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, যদি কেবল পড়ার চাপ দেওয়া যায়, ত প্রথম কিছুই বুঝা যাইবে না, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন পড়ার চাপে ছেলের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িবে, তাহার পাঠ-সাঙ্গ আর ত হইবেই না, অধিকন্তু ব্যাধি-সমষ্টি হইয়া, সে জড়পিণ্ডবৎ সংসারের একটা ভার হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ কৃশদেহ অপেক্ষা জন্তু যে কোনও দৃঢ়বদ্ধ সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ। দুর্ব্বল শরীরে নিজের ত কোন সুখই নাই; অধিকন্তু অপরের অসুখের হেতু হইয়া নানা গোলযোগের কারণ হইয়া উঠিতে হয়। পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে হইবে, এই ইচ্ছা প্রায়ই সকল তীক্ষ্ণধী বালকেরই মনে হয়। আর এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া, বালকেরা যে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তাহা বর্ণনায় ব্যক্ত করা যায় না। এ বিষয়ে ছেলে-

দেহ দোষ দিলে চলিবে না; দোষ—যদি তাহাদের ঐরূপ পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত দেহ তাহাদিগকে গঠন করিয়া না দেওয়া হয়, অথবা পাঠে পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম ছেলে করিতেছে কি না, তদ্বিষয়ে অভিভাবকের দৃষ্টি না থাকে। বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ মস্তিষ্ক-সঞ্চালন করিতে হয়, এমন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই শরীরের অনিষ্ট হয়। বিশেষতঃ, যদি ছাত্রের শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল থাকে, এবং তাহার কেবল পুস্তক অধ্যয়নেই আনন্দ হয়, তাহা হইলে সেরূপ ছাত্রের সকল প্রকার মনোবৃত্তি এক কালে নষ্ট হইয়া যায়। এবিষয়ে ছাত্রদের সাবধান হওয়া উচিত; কেননা, অনেকস্থলে এইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। ভূদেববাবুর এই অভিজ্ঞতা ছিল; সেই জন্য তিনি ছেলেদের যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয়, যাহাতে তাহারা ব্যায়াম করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বুঝে, নানারূপে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছেলেদের তিনি 'উঠ-বস' করাইতেন। ছেলেদের বিকালে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতে কখনও বাধা দিতেন না। 'জল-ডিঙ্গাডিঙ্গি' 'লুকোচুরি' ইত্যাদি দেশীয় খেলায় ছেলেরা সমুদায় বিকালটা অতিবাহিত করিত। তাঁহার গঙ্গার ধারের বাটীতে যে জায়গা ছিল তাহাতে ছুটাছুটি করিবার স্থানের অকুলান হইত না। ছিতল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীর ও রাস্তার ধারে পর্য্যন্ত বাটীর সর্ব্বত্র ছেলেদের গমনাগমন হইত, ও কলহাস্য শ্রুতিগোচর হইত। আর বাড়ীতে একটি-আধটি ছেলেমেয়ে ত ছিল না;—অনেক মিলিয়া খেলায় বেশ স্ফূর্ত্তি হইত। বাল্যকালের এই নির্ম্মল একত্র ক্রীড়া পরম-সুখকর। * * * ভূদেববাবু ছেলেদের জন্য ইংরাজী ব্যায়াম-চর্চ্চার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। "গলির ঘাটের" দিকে Parallel Bar, Horizontal Bar, Ring Swinging ইত্যাদি আবশ্যক যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;—প্রথম প্রথম স্বপুত্র আপনি হাজির থাকিয়া, ছেলেদের দেখাইয়া দিতেন, কেমন করিয়া, কিরূপভাবে দুলিতে হয়: অবশ্য তিনি আপনি উঠিতেন না, দেখাইয়া দিতেন, কোন্ দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—সমস্ত শরীর কেমন ভাবে রাখিতে হইবে, কিরূপে অল্পে অল্পে শরীর নত করিতে হইবে—কিরূপেই বা ব্যায়াম-কৌশলে ঘুরিতে ফিরিতে হইবে ইত্যাদি। এইরূপে উৎসাহ পাইয়া, ছেলেরা যথানিয়মে ব্যায়ামে মনোযোগ দিতে শিখিয়াছিল। তাহারই আদেশে ছেলেরা সাঁতার দিতে শিখিয়াছিল। অনেকে এক সঙ্গে স্নানে যাইয়া, প্রতিযোগিতা করিয়া, গঙ্গার অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিত। নৌকা-চালনও কেহ কেহ একটু একটু শিখিয়াছিলেন। অশ্বারোহণ ও ফেন্সিংএ পড়াশুনার ত চরম হইয়া থাকে; কিন্তু সেখানকার ঐ দুই বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নৌবাহন (Boat Race) এর প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে; আর, এই নৌবাহন-প্রতিযোগিতায় জেতারা বিশেষভাবে সম্মানিত হন। নৌবাহিপণকে উৎসাহিত করিবার জন্যই ইংলণ্ডের জনসাধারণ সব কাযকর্ম্ম ফেলিয়া নদীকূলে সমাগত হন—ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উৎসাহবর্দ্ধন করেন। আমাদের দেশে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চার তেমন উৎসাহদান নাই। ভূদেব বাবু ইহা দেখিয়া স্বয়ং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভূদেববাবুর এক পৌত্র, পাটনা কলেজে পাঠকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সূত্রপাত—সেই চুঁচুড়ার বাটিতে, তাঁহার পিতাবাবু করিয়াছেন। অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক স্কুলে Drillএর ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে শরীরের ব্যায়াম অতি অল্পই হইয়া থাকে। এত সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, যে তাহা বলিবার নহে। ছেলেরা পাঠে বসিবে বা কোনও কায করিবে—সে সময়ে ছেলেরা যেন সামনে বেশী ঝুঁকিয়া না বসে—বেশ সোজা হইয়া বসে। "এই রকমে আপেক্ষায় মুখিয়ারা বসিতেন" বলিয়া, নিজে সর্ব্বদা সোজা হইয়া বসিয়া ছেলেদের বুক চিতাইয়া বসিতে শিখাইতেন। সোজা হইয়া বসিলে ফুসফুসের কার্য্য স্বাভাবিকরূপ হইয়া থাকে, এই জন্য এ বিষয়ে চেষ্টা। ছেলেরা গা-ঢোলাইয়ে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন। ছেলেরা পাঠের অংশ-বিশেষ চেঁচাইয়া পড়ে,

এইরূপ ইচ্ছা করিতেন। চেঁচাইয়া পড়িলে শব্দ-উচ্চারণ-নালীর সম্যক্ পরিচালন হয়, শব্দোচ্চারণ ঠিক হইতেছে কি না ধরা পড়ে আর অশুদ্ধ উচ্চারণ সংশোধন করিয়া দিবার বহু সাহায্য হয়। অশুদ্ধ উচ্চারণ বাল্যকালে সংশোধিত হওয়া দরকার, নতুবা বরাবর থাকিয়া যায় ও পশ্চাতে ঐ উচ্চারণের জন্য উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

রাত্রিকালে ছেলেরা আপন আপন পিতামাতার নিকট শয়ন করিত। ভূদেববাবুর বাটীতে "যোটা খাওয়া ও যোটা পরা" বরাবর প্রচলিত ছিল। তবে কর্ত্তার ইচ্ছামত সময়ে সময়ে আহারীয়ের পরিবর্ত্তন হইত। বার মাস এক রকম খাওয়া চলে না: মাঝে মাঝে মুখ-বদলান আবশ্যক হয়। আহারীয়ে অধিক মশলার সংযোগ অধিকাংশ সময়ে হইতে দিতেন না: সহজে যাহা হজম হয়, তাহারই ব্যবস্থা ছিল। ভূদেববাবু প্রচুর পরিমাণে দুধ ও মাংস খাইতে পারিতেন। মাংস তিনি প্রায় রোজই খাইতেন। ইঁহার অধীনে থাকিয়া ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাংস রাঁধার সকল প্রকার ভেদে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। ইনি পোলাও ইত্যাদি রন্ধনে অতি মজবুত ছিলেন। ভূদেববাবু প্রাতে 'কোকো' খাইতেন কিন্তু বাড়ীর কোনও ছেলেকে চা অথবা কফো খাইতে দিতেন না। আর অদ্যাবধি তাঁহার বাটীতে "চা"র নিত্য-সরবরাহ হইতে পায় নাই। অবশ্য চা-পানে অভ্যাগতআপ্যায়িত আসিলে, বাটীতে চা যে পান না তাহা নহে। আজকাল সাধারণ আয়ের বাঙ্গালীর দুয়ে চা, মন্দে মন্দে—পুরাতন, পচা, কবে টিনে পোড়া কে জানে—জমান ছত্র, বাটীর আবালবৃদ্ধবনিতার উদরে প্রবেশ করিয়া, দেশের অর্থ বিদেশে নীত ও দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও নষ্টকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিতেছে। ...

ভূদেববাবু ১৩০১ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পর এই ২০ বৎসরে বাঙ্গলার খাদ্যদ্রব্য ও পরিচ্ছদের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার আমলে আমরা আলো-আলোয়ানের বাহুল্য দেখি নাই— আজকাল, যে কোন স্কুলের বালকের শীতবস্ত্র দেখিলে, আর পরিচয় দিতে হইবে না। আমাদের বিলাসিতা তখন হইতে বাড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এখন অভিভাবকগণ নিজে বিলাসী সুতরাং সন্তান-সন্ততির বিলাসিতার বাধা দিবে কে? ভূদেববাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোনও বিষয় এড়াইবার যো ছিল না, তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—"দরীবের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। ... যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান্ তাঁহারও কর্ত্তব্য ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন সমাজের যে অবস্থা তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা সমাজভুক্ত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার-সহ করিতে হইবে; অনেক চাপা ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকার্থস হইতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার জন্য রাজকীয় লাইকার্গাস জন্মিবে না।"

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ী আমার বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটি ষ্টেশন হ'তে তাঁর বাড়ী যতটুকু দক্ষিণ; আমার বাড়ী ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর সদা সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুড়া-গাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, একঘর স্কুলে আর একঘর বসতী। বঙ্কিমবাবুরা স্কুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উৎসবের সময় তাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, তোরসের এক অংশ তাঁহাদের বাড়ীতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্ব্বণ হয়। কিন্তু ঘরে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বার-

সাদা রথখানি পোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া রঙে মেজে চক্‌চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটি মেলা হয়; প্রচুর পাকা কাঁঠাল ও পাকা আনারস বিক্রী হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট দশ খানা বড় বড় মনোহারী দোকান বসে, গজা জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিছিদানা বুড়িমুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়ে চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে খিরোর ও খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানারকম বাঁশী, কাগজের পুঁতুল, কাঠির উপর লাফ্ দেওয়া হনুমান্, কটকটে ব্যাঙ্ কিনিতে পাওয়া পাওয়া যায়। এসব ত গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারী জিনিস এই মেলায় বিক্রী হয়—নানা রকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায় তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, লেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফুলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, কলসার গাছ, এবং গোলাপ যুঁই জাঁতি বেল মল্লিকা কামিনী গন্ধরাজ যুঁইকুন্দ বক কুরুচি কাঞ্চন টগর দিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা যে কোনও গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন এসব ত ছিলই; তার উপর একটা মোকদ্দমার সঙ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকিলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ ছিল—আল্লাদে পুঁতুল। তার এক গাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে। রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুরুবাড়ী, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুরুবাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ী যাইতেন; সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; কৃষ্ণ ছিল; কৃষ্ণ হইতে গুরুবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটি ঠিক নয়। গুর শব্দের মূল গুণিচা, অর্থ কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুরুবাড়ী লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট-দিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে, সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝী, গিন্নীবান্নী, আশাবরদী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বাঁশবাহারী বাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট, ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক চমৎকার হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সাম্নে একখানি প্রকাণ্ড আট-চালা, চারিদিক্ খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন পোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আট-চালায় রথের সময় যাত্রা, নাঁচ, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট দিনই খুব জম্‌জমাট থাকিত।

আমরা বাল্যকালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনীফুলের গাছ ছিল। আমরা

প্রায়ই স্কুল ছিঁড়িতাম। স্কুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত "তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।" সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক, ছেলে-পিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ী বড় একটা যাইতাম না। একবার ধরণীকথকের কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দু'চার দিন ধরণীকথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহির বাড়ীর পাঁচদুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদী হয়, এ বাড়ীতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপয়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণীকথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার মুখিই অথচ গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনও সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ী হইতে কিছুদূর, পূর্বদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুলবাগানে ধরণীকথকের বাসা ছিল। কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনদিন সে দিকে যাই নাই। চারি পাঁচদিন ধরণীকথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর এক দিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোন দিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই, তাঁহার ত আর ঠিক ছিল না, কোনদিন আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না।

আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্র চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি, এ, পাশ করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ্ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেননা একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর আমি ভাবিলাম এম এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারসিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়ের নিকট গিয়া

উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ; আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ; আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহাহোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম!

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসরকাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে সত্বর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমার জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম "আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি ষ্টেসনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীর দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ী ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল, তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে? তিনি বলিলেন, 'এটির বাড়ী নৈহাটি, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি, এ, পাস করিয়াছে।"

তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি, এ, পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?" আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবু ভয়ে।" তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন "আমার ভয়? কেন?" "শুনিয়াছি, কামিনী-গাছের ফুল ছিঁড়লে নাকি আপনি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি? তোমার বাবার নাম কি?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।" তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনাইয়া আলাপ করিয়া দিল! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না," বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার প্রতি তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে!" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি

প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে"। বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃত-ওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নন্দনদী পর্ব্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নন্দনদী পর্ব্বত কন্দর' আছে," বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাঙ্গলা লিখিয়াছে, হাতকড়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। • • •

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। • • সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজী কাব্য পড়িত সে-সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গলায় তিনি কীর্ত্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্ত্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে মলনী বেসুরের ন্যায় গুনগুন করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ফ্রেডেরের বেডিচিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স" (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুঁথি ঘাটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গলার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালা দখল করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে অনেক বড় বড় রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে, তখন সব অন্ধকার ছিল। তবাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য্য ও অনার্য্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তের দপ্তর তখনও শেষ হয় নাই। বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারতমহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন যোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়ই; কেন না, বঙ্গদর্শনের গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও বঙ্গদর্শনের টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি কণ্টে ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন, একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়। •

• সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে

দিনকতক তিনি সব্‌রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেককে লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল! নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি। আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেইজন্য এখন সেইসকল যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া তিন বাঁধান একখানি কৃষ্ণকান্তের উইল আমাকে দিলেন, বলিলেন "রেলগাড়ীতে এইখানি, পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। (নারায়ণ)

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিজ্ঞানে রমণীর প্রভাব

• • • •

আজ নারী জাতিকে অন্ধকারে রাখিবার ফল আমরা ভোগ করিতেছি। যে পাপ করিয়াছি তাহার উপযুক্ত সাজা ভোগ করিতেছি। আজ যে ভারতের সমস্ত পুরুষই কুসংস্কারান্ধ তাহা আমাদের এই নিজকৃত পাপের ফল। নারী জাতিকে শিক্ষা দিলে আর এই ফল

পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রীক্ট টাউন্স এক্ট' পাস হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে; সঙ্কল্প হইল ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ্ সাহেব বলিলেন, "আরও ৭৫৲ টাকা চাই কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-law's Lane বলিতে হইবে।" জজ-সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫৲ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০৲ টাকা দেওয়া দরকার।" জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black-Foot Friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব, ভাল কাজ করিলে না। বাড়ী গিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীব বাবু তিন দিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহ-খানেক পরে খবর আসিল জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিন্তুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাহার নাম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীব বাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন, আছে।

ভোগ করিতে হইত না। আজ পুরুষগণ যতই সভ্য হউন না কেন তিনি পারিবারিক কুসংস্কারের হাত হইতে যে নিষ্কৃতি না পাইয়া ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মাহত হইতেছেন ইহা তাঁহার বা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ রোপিত বিষ বৃক্ষের ফল। ইহা ভোগ করিতে হইবেই। যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান সন্ততিদিগকে ইহা ভোগ করিতে না হয় তাহার জন্য, এই বিষের বীজ যাহাতে আর না উপ্ত হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ভারতবাসী আজ বৈজ্ঞানিক হইতে চাহেন, তাঁহারা আজ উন্নতির সোপানে উঠিতে চাহেন কিন্তু আজ নারীজাতিকে বাদ দিয়া তিনি উঠিতে পারেন না; আমি আজ বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব শিখিয়াছি কিন্তু তাহা কোথাও প্রয়োগ করিবার উপায় নাই, এই বিদ্যা আমার পুঁথিগত হইয়া আছে। আজ আমি হয়ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিতে যাইব কিন্তু কুসংস্কারের ঘোর আবর্ত্তনে পড়িয়া, গৃহস্থের নারীদের মত না লইয়া আমি আমার বিজ্ঞান চালাইতে পারি না। আমি শিক্ষিত হইয়াও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বাধীন হইয়াও শৃঙ্খলিত; ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি থাকিতে পারে।

আজ যে আমাদের দেশে মহামারী রোগ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার নানা প্রকার প্রতিষেধক জানিয়াও আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না কেন? আমরা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিই নাই। এখন স্ত্রীজাতি যদি পুরুষের কার্য্যপথের অন্তরায় হয় তাহা হইলে উন্নতি কিরূপ সম্ভব তাহা অনুমেয়। নারীর প্রভাব নাই যাঁহারা বলেন তাহারা ভ্রান্ত, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—প্রভাব যথেষ্ট আছে!

আজ কি ভারতের বৈজ্ঞানিক বুকের উপর হাত দিয়া জোর করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহার গৃহে প্রত্যহ অবৈজ্ঞানিক কাজ কাজ হয় না। আমি অনেক চিকিৎসকের বাটীতেই দেখিয়াছি যে, অবৈজ্ঞানিক ভাবে চিকিৎসা হইতেছে, যে স্থলে বিশুদ্ধ বায়ু আনা দরকার, সে স্থলে বিশুদ্ধ বায়ু ত দূরের কথা, বায়ু চলাচলের পথ একেবারেই রুদ্ধ। যে ক্ষেত্রে ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক সেইখানে ঔষধ বন্ধ আছে, যে স্থলে বিচক্ষণ চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন সেখানেই শঠ প্রবঞ্চক হাতুড়িয়া আসিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। আবার আরও দুঃখের বিষয় এই যে, স্ত্রীলোকেরা বিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা হাতুড়িয়াকে বেশী বিশ্বাস করিতেছেন। এইখানে বিজ্ঞান বাস্তবিকই পরাস্ত হইয়াছে।

শুধু বিজ্ঞানের সেবা করিলে লাভ কি? জ্ঞান যদি না ছড়াইয়া পড়িল তবে জ্ঞান না-ই বা অর্জ্জন করিলাম! দেশের কাজে আজ বিজ্ঞান লাগিতেছে না, তাহার কারণ কি? আমি যদি কেবল শিখিয়া রাখি যে ইন্দুরের দ্বারা প্লেগের বীজাণু পরিব্যাপ্ত হয় আর তাহা যদি না কাজে লাগাইতে পারি তবে লাভ কি? যখন আমি দেশের বিষয় অনভিজ্ঞ ছিলাম তখন একদিন পারোনীয়ার পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম যে দেশে এমন অনেক লোক আছে যে তাহারা প্রাণ দিবে কিন্তু ইন্দুর মারিবে না, কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু আজ দেখিতেছি বাস্তবিকই তাই। আমরা এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, যে ইন্দুর আমাদের প্রাণঘাতক সেই ইন্দুরকে গণেশের বাহন করিয়াছি। লোকের ধারণা যদি বাস্তবিকই এমন হয় যে ইন্দুর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ, একবার ভাবিয়া, দেখুন। এই কুসংস্কার কোন্ বৈজ্ঞানিকের ঘরে নাই। এমন বাঙ্গালীর বাড়ী খুব কমই আছে যাহাতে ইন্দুর, আরশুলা টিক্‌টিকী, উইচিংড়া দুই দশ শত নাই। এমন বৈজ্ঞানিক গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যাহার ঘরের তাকে ধূলা নাই, রান্না ঘরের হাড়ি ও ভাতা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন নহে, যিনি একই মৃত্তিকা ভাণ্ডে যত দিন না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিন অন্ন না খান। এমন গৃহস্থ কোথায় যে তিনি উঠানের উপর সমস্ত দিন মাছের আঁইস ও কুটনার খোলা ফেলিয়া না রাখেন?

তাই বলিতেছি বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে নারীজাতিকে সঙ্গের সাথী করিতে হইবে। জ্ঞানের

আলোক তাহাদের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। তাহা না হইলে ঘোর অন্ধকারে যেমন মশালবাহীও পথ ঠিক স্পষ্ট দেখিতে পায় না আমাদের অবস্থাটা ঠিক সেইরূপ হইবে। বিজ্ঞানে নারীজাতির যখন এত প্রভাব তখন তাহাকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। ইহাতে হাসিবার ও ঠাট্টা করিবার কিছুই নাই।

স্ত্রীজাতিকে যে বিজ্ঞানাগারে গিয়া test tube লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে অথবা "European reputation" অর্জন করিতে হইবে আমার বক্তব্য তাহা নহে। সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে মানুষ আপনা হইতেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মানুষের স্বভাব, যাহা দেখে সে তাহার অর্থ বুঝিতে চায় কিন্তু যখন সে জ্ঞানের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা অর্থ বুঝিতে পারে না তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া অস্বাভাবিক বিষয়ের আলোচনা, দৈবিক বিষয়ের গবেষণা করিতে হয়। একারণেই যেখানে যত জ্ঞানের অভাব সেই খানেই তত কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রদীপ, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস খুব জোরে বহিলে সে প্রদীপ জ্বলিবে না, নিভিয়া যাইবে, না হয় তাহার প্রভা বিকীর্ণ হইবে না। দেশে আজও বিজ্ঞানের প্রতিকূল হাওয়া বহিতেছে।

আজ বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানাগারে খুব জোর আলোচনা গবেষণা করিতেছে, আজ তাহাদের বিশেষ চেষ্টা, কিসে তাহাদের নাম ইউরোপের ও আমেরিকার জার্নালে বাহির হইবে—যেন তাহাতেই মোক্ষ লাভ। হায়, এই বৈজ্ঞানিকের দল বাস্তবিকই স্বার্থপর, তাহারা দেশে কিসে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চলিবে তাহাতে নজর দিতে নারাজ। বাঙ্গালায় আজ সে দিন আসিয়াছে।

আমাদের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছে "Man adapts himself according to his environments" মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে নিজকে গঠন করিয়া তুলে। বাস্তবিকই একথাটা ঠিক! আমাদের চতুষ্পার্শ্বে আমরা যাহা দেখিব আমরা সেই মতই শিক্ষা করিব। নির্দ্দয়ের গৃহে সদ্গুণের জন্ম অসম্ভব বা অভাবনীয়। তাই কবে নির্দ্দয়ের গৃহে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিল, লোক মনে করিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি? বাস্তবিক কথা আমাদের আবহাওয়াটা আদৌ বৈজ্ঞানিক নহে। বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর শেষ দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা অবৈজ্ঞানিক অবস্থায় পড়িয়া থাকি। আমাদের শিশু অবৈজ্ঞানিক ভাবে পালিত হয়। মাতা বিজ্ঞানের ধার ধারা ত দূরের কথা, সাধারণ জ্ঞানে বঞ্চিত। তিনি কিরূপে বৈজ্ঞানিক মতে শিশু পালন করিবেন? আশ্চর্য্য যিনি কুসংস্কারে আছেন তাঁহার নিকট কি আশা করা যায়? আমি একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে দুঃখ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে আমাদের দেশের এত শিশু মারা যাইবার কারণ মাতার অজ্ঞতা।

শিশু যখন দিন দিন বাড়িতে থাকে জ্ঞানহীনা মাতা তাহাকে দিন দিন জ্ঞানের দ্বার দেখাইয়া না দিয়া অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারের পথ দেখাইয়া দেন। শিশু তখন "ভূত" শিখে; সে ভূত সে ভূত অনেকেরই পক্ষে ইহ জীবনে আর সঙ্গ ত্যাগ করে না। জ্ঞানের বয়সে অজ্ঞানতা দৃঢ়ভাবে শিশুর মন অধিকার করিয়া বসে। দিন দিন সে বেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। শিশু কখনও মাতা ও আত্মীয় স্বজন, স্ত্রীলোক ছাড়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার অবস্থানুসারে সে নিজকে এক অদ্ভুত জীব গড়িয়া তুলে।

বাল্যের এই শিক্ষার এতদূর প্রভাব যে বয়সে বিজ্ঞান শিখিয়াও সেই ভ্রান্তি যায় না। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইবার আশায় বা বড় চাকুরির আশায় বিজ্ঞান পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই বাল্যের কুসংস্কারসঞ্জাত বিশ্বাস বিষম কৃতান্তের ন্যায় চিরকালই সাথে সাথে থাকে। বরং আবার অনেক সময় তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলিকেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই দলের লোককেই ইঙ্গিত করিয়া বোধ হয় বিখ্যাত লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার নবীন সন্ন্যাসীতে "The Electrical Propagation of Hindu Religion" সভায় উল্লেখ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান শিখিয়াও যে লোকে এরূপ অবৈজ্ঞানিক হয়

তাহার কি একটা কারণ নাই? বাস্তবিকই কি আমাদের দেশটা সৃষ্টিছাড়া, বাস্তবিকই কি ইহার সবই অদ্ভুত? লোকে লিখা পড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করিতে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে কি সবই "উল্টা বুঝলি রাম।" আমাদের দেশের লোক কি মূর্খ হইবার জন্য বিজ্ঞান আলোচনা করে। বৈজ্ঞানিকের মুখে অবৈজ্ঞানিক কথা, কার্য্যে অবৈজ্ঞানিকত্ব আমাদের দেশেই দেখা যায়।

এ সবের কারণ কি? ইহার প্রতিকারই বা কি? আমরা শিক্ষিত হইয়াও কেন মূর্খ হই, জ্ঞান অর্জন করিয়া, শাস্ত্র পড়িয়া কেন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করি? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সময় আসিয়াছে। একবার উত্তর এই যে, স্ত্রীজাতির প্রভাবই আমাদের এইরূপ করিয়াছে। আমরা যদি স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতাম তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশাটা এত হইত না! আমাদিগকে আজ নিজের হাতে বিষ খাইতে হইত না।

সাধারণ শিক্ষা দিলেই লোকের মন হইতে কুসংস্কার চলিয়া যাইবার কথা; কিন্তু আমাদের দেশে তাহার যে বৈপরীত্য ঘটিয়াছে তাহার কারণ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বড় শোচনীয়। আমরা নিজেদের বাহ্য উত্তেজনার মত করিয়া আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছি। কাজেই আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি।

শিশু কিরূপ হইবে—অথবা সাধারণতঃ কিরূপ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান একবাক্যে উত্তরে বলিয়াছে যে পিতা মাতার গুণানুসারে ও বাহ্যিক অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক উত্তেজনা অনুসারে শিশু বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। Heridity কি, সে কথা অনেকেই জানেন—পুরা রকম না জানিলেও মোটামুটি এটুকু জানেন যে পিতা মাতার গুণাগুণের উপর শিশুর গুণাগুণ নির্ভর করে।

এক্ষণে দেখা যাউক বাঙ্গালী শিশু কিরূপ হইবে। পিতা মাতার কি গুণ?- সাধারণতঃ আমাদের মানসিক তেজটা অনেক কম—কার্য্যে লিপ্সা, "সঙ্কল্প ওধিব" এরূপ পণ খুবই কম। এ সব গুণ না থাকায় শিশুতে সে সব পিতা মাতার তরফ হইতে আসিতে পারে না। বিজ্ঞান আলোচনা করিতে অনেকটা তেজ, অনেকটা হৃদয়ের বল, অনেকটা সত্যের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, কর্ম্মে আসক্তি থাকা চাই। কিন্তু আমাদের কয়জনের কর্ম্মে আসক্তি আছে? আমরা কিছু বেশী "ফাঁকি বাজ" হইয়া পড়িয়াছি। কার্য্য করিতে যাইয়া কোন একটা বাধা পাইলে দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে লাগা আমাদের অনেকের পণেই ঘটিয়া উঠে না। বরং কার্য্য না করিবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইতে থাকে। কথাগুলি সবই সত্য। কাজেই পিতার এই দোষগুলা অল্প বিস্তার পুত্রে যাইবে তাহা বিজ্ঞানসম্মত। তাহার পর দেখা যাউক মাতার কি কি অকল্যাণকর ভাব পুত্রে যাইবে।

সাধারণ বাঙ্গালী রমণী বড়ই ভীরু। সাহস পুরুষেরই নাই ত নারীর কথা কি? সত্যের জন্য কোনও কথা নারী বলিতে পারে না। শাস্ত্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর লোক পর্য্যন্ত নারীকে শাসনে রাখিয়া পিষিয়া ফেলিতে চায়। এখানে কি সদ্‌গুণের আশা করা যাইতে পারে? নারীর কাহারও সহিত মেশামিশি করাত দূরের কথা, বাক্যালাপও নিষিদ্ধ। বাল্যকাল হইতে তাহাকে পিঞ্জরে পুরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া প্রায়ই তাহাকে জীবন কাটাইতে হইতেছে। জ্ঞানের দ্বার শাস্ত্রকার বন্ধ না করিলেও সমাজ করিয়াছে। নারীকে শাস্ত্র ত যথেষ্ট শাসন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সমাজ আবার "জবাই" করিবার আদেশ দিয়া রাখিয়াছে। অনেক স্থলে নারীর শিক্ষা কুচরিত্রতার সম-অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নারী হইতে বালক কি গুণ পাইবে?

এইবার বালকের পারিপার্শ্বিক বা বাহ্য প্রভাবের কথা দেখা যাউক। বালক জন্মাইল কোথায়—বাটীর যে স্থল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই স্থলে। তাহার পর যখন সে বাড়িতে লাগিল তখন কুসংস্কার তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। তাহার ভাবপ্রবণ মস্তিষ্ক—ভূত, ভূত, ভূত, অশুভ অযাত্র, ঘৃণা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে শিখিল, চারিদিকেই তাহার ভয়—এই বাল্যকালের ভয় জীবনে কখনও তিরোহিত হয় না। সে যেন শিখিয়াছে, কোন্ লোককে ছুইলে স্নান করিতে হয়, কাহার বাড়ী যাইতে নাই। সে শিখিল কাহাকে দেখিয়া

ঘৃণা করিবে। কিন্তু বিধির না যাহা ওপ—চিত্তকে কিরূপে উদার করিতে হয়, সকলকেই সমান দেখিতে হয়, সকলই এক। জাতিভেদের নিগূঢ় বন্ধন অতি বাল্যাবস্থায় তাহার মাথায় ঢুকিল—এ জীবনে আর বাহির হইল না—অথবা স্বার্থ বা নামের জন্য দশ দিন বাহির হইয়া আবার ঢুকিল।

তাহার পর পঠদ্দশায় বালকের অবস্থা কি? বালক এক কুসংস্কার-কারাগার ত্যাগ করিয়া আসিয়া আবার এক নূতন আরও রহস্যময় কুসংস্কার-কারাগারে আসিয়া রুদ্ধ হইল। তখন তাহার মস্তিষ্কে ভয়টার যেন তাল করিয়া ছাপ খাইল। বেত্রাঘাতের ভয়ে "সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে" এরূপ পড়িলেও, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিবার উপায় নাই। আদর যত্নের পরিবর্ত্তে শাসন ও ত্রাস যেন আধিপত্য করে। এরূপে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

তাহার পর উচ্চ বিদ্যালয়েও বালকের অবস্থাটা অনেকটা পূর্ব্বেকার মত। এখানেও অনেক প্রকার অশিক্ষণীয় শিক্ষা হইয়া থাকে। শিক্ষকে ছাত্রে, পিতায় পুত্রে সম্বন্ধ যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হয় না। শিক্ষক মনে করে যে ছাত্রের সহিত মিশিলে তাহার মর্য্যাদা কমিবে, বালক আর মানিবে না। বালক শিক্ষককে এক অতিনব জিনিস ভাবিতে থাকে—সে এক সৃষ্টিছাড়া জীব, সে ইতিহাস, অঙ্ক ছাড়া আর কিছু জানে না। ভাবের বিনিময় না হইলে মানুষ উচ্চে উঠিতে পারে না কিন্তু ভাবের বিনিময় আদৌ হয় না।

তাহার পর কলেজে গিয়া অনেক শেখা জিনিস ভুলিতে হয়। কেহ কেহ ভুলিতে পারেন কেহ একেবারেই পারেন না। এখানে আসিয়া যুবক একটু আধটু ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আইসে। কেবল একটা হাওয়ার পড়িয়া বা ঘূর্ণীতে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্যিক প্রভাবটা—প্যাণ্ট, নেকটাই আর সিগারেট—আসিয়া জুটে, গুণ গুলা বড় আসে না।

এই সময় যুবক এক কুসংস্কারগ্রস্তা নাবালিকা বধূ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সংসারের জালে জড়াইতে থাকে। কুসংস্কার তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, যেন ছাড়িতে পারে না।

আমাদের জাতির জীবনটা ঠিক এইরূপ না হইলেও অনেকটা এইরূপ একটা চক্রে ঘুরিতেছে। স্ত্রীলোকের প্রভাবে আমরা জোর করিয়া উন্নতি করিতে পারিতেছি না। রমণীর শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমরা যে কি দাঁও করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না, তবে নিজেদের প্রতিকর্ম্মের বাধা নিজেরা বেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি।

বাস্তবিক কথা এই যে আমরা নারীজাতিকে শিক্ষা না দিয়া উন্নতি করিতে পারি না। জগতে সামান্য জিনিষকে বাদ দিয়া চলা যায়, আর স্ত্রীজাতিকে বাদ দিয়া উন্নতি করিব একি সম্ভবপর?—না কখনই নহে।

বাস্তবিক ভাবে বিজ্ঞান আলোচনা করিতে হইলে নারী জাতিকে সাধারণ জ্ঞান দিতে হইবে। আজ হইতে যদি আমরা স্ত্রী জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কৃতসংকল্প হই তাহা হইলে চাই কি, আমাদের বংশধরগণ অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে ইহার ফল ভোগ করিতে পারিবে। চাই কি, দেশ কিয়ৎ পরিমাণে রোগশোকমুক্ত হইতে পারিবে, এমন কি দেশের আর্থিক উন্নতিও হইতে পারে। এমন দিন কি কেবল কল্পনা—না সত্যই আসিবে? (বিজ্ঞান)

ভদ্রা।

(বৌদ্ধ কাহিনী)

সাধুকের পিতা রাজ-কুল-পুরোহিত। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া সাধুক বাল্যকাল হইতে অনাচারী, কুসংসর্গ-প্রিয়। রাজ-অনুগ্রহে ব্রাহ্মণের সংসারে একদিনও অভাবের স্থান হয় নাই। পিতার সঞ্চিত অর্থে যুবক আপনার সঙ্গিগণের সহিত পাপের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল।

অনেক দিন সেই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। মায়ের আদরে পিতার অজ্ঞাতে সাধুক দিন দিন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনকে পাপের অনন্ত বিস্তীর্ণ রাজ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার পিতার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ফল হইল না। প্রবল বাসনাকে পরাজিত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত হওয়া সহজ নহে। বাসনার বিনাশ না হইলে নিজে আত্মকৃত কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে না শিখিলে, অপরের কি সাধ্য যে তাহাকে কর্ত্তব্য পথে ফিরাইয়া লইতে পারে?

সাথুক সেই আপাতঃ মধুর পাপপথে নিত্য বিচরণশীল! পিতার সহস্র চেষ্টা তাহাকে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না! শেষে বৃদ্ধ পুরোহিত পুত্রের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাকে আপন সংসার হইতে সম্পর্কচ্যুত করিয়া দিলেন।

সাথুক ভীত হইল না। সঙ্গিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী নূতন উপায়ে আপনাদের নিত্য অভাব মোচনে চেষ্টিত হইল। সে চেষ্টার অপর আখ্যা চুরি! দল বাঁধিয়া পথে হরণ করা সাথুকের নিত্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইল।

তারপর আরও কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। সাথুক এখন একটী বৃহৎ দলের দলপতি। তাহার সে দলটী ডাকাতের দল নামে অভিহিত।

রাজ্যের যাবতীয় প্রজাগণ সাথুকের ভয়ে শঙ্কিত। রাজা আপনার অধিকারস্থ প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এই ডাকাতের দলটিকে দমন করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। রাজ রক্ষিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এক দিন সাথুক সদলবলে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইল। রাজা বিচার করিয়া সাথুকের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। জল্লাদ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বধ্য ভূমিতে লইয়া গেল।

কিন্তু সাথুকের প্রাণদণ্ড হইল না। রাজা আপনার প্রিয়তমা দুহিতার অনুরোধে সে যাত্রা সাথুককে ক্ষমা করিলেন।

সাথুক রূপবান। রূপের উপাসক এ জগতে বিরল নয়। রাজকুমারী ভদ্রা সবাক্-পথে শৃঙ্খলাবদ্ধ সাথুককে দেখিয়া মোহিত হইলেন। তিনি সেই রূপের উপাসনায় নিজের জীবন সমর্পণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। এক দিকে প্রজার ধন প্রাণ, অন্যদিকে প্রিয়তমা দুহিতার কঠিন প্রতিজ্ঞা। তাঁহার রাজদণ্ডের উর্দ্ধভাগে ন্যায়ের তীক্ষ্ণ অসি মোহন্ধ্যমান। সে ন্যায়ধর্ম্ম উপেক্ষা করা রাজশক্তির সাধ্যাতীত।

অন্য দিকে সন্তান-বাৎসল্যও খুব প্রবল। একমাত্র সন্তানস্নেহের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিতে রাজার হৃদয়খানি ভরপুর। রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এক উপায় স্থির করিলেন।

ঘাতককে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তিনি আপনার আদেশ ও কন্যার প্রতিজ্ঞা উভয়ই রক্ষা করিলেন। ঘাতক পুরস্কার পাইয়া কৌশলে চোর সাথুককে বন্ধন মোচন করিয়া রাজ অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাজকন্যা ভদ্রা তাহাকে আপনার পতি নির্ব্বাচিত করিলেন।

তারপর আরও কত দিন কাটিয়া গিয়াছে। সাথুক এখন রাজজামাতা। অভাবের উৎপীড়নে সাথুক বাধ্য হইয়া লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। এখন তাহার সে অভাব মোচন হইয়াছে। সুতরাং বোধ হয় তাহার সে স্বভাবও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারীরও তাহাই বিশ্বাস। তিনি স্বামীর পূর্ব্ব স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। যখনও অভাব আসিয়া সাথুককে যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে ভদ্রা সর্ব্বদাই সে জন্য চেষ্টিত। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টার কোন ফল ফলিল না।

রাজ অন্তঃপুরে সাধারণের পরম আদর যত্নের মধ্যে থাকিয়াও সাথুক আপনার পূর্ব্ব-স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। সে আপনার সঙ্গীদের সহিত মিশিতে না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। রাজপুরীর আদর যত্ন তাহার অসহ্য হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত রাজান্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতে তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। রাজপুরী ত্যাগের ছল অন্বেষণে সে ব্যস্ত হইল।

সাথুক একদিন তাহার পত্নীকে বলিল "ভদ্রা! রাজরক্ষিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে যখন আমি নিজের জীবন রক্ষার জন্য অনন্যোপায় হইয়াছিলাম, তখন বধ্যভূমির দেবতার উদ্দেশে আপনার হৃদয়ের ভাব জানাইয়া শপথ করিয়াছিলাম, যদি এ যাত্রা রাজরোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা প্রদান করিব। দেবতা সে যাত্রা আমাকে রক্ষা

করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করি, তোমাকে সঙ্গে লইয়া বধ্যভূমিতে দেবপূজায় গমন করিব।

পতিব্রতা ভদ্রা স্বামীর সে কথায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করিল। সরল বিশ্বাসে স্বামীর সহগমনে অভিমত জানাইয়া দেবপূজার যথাবিধি আয়োজন করিয়া লইয়া একদিন শুভ মুহূর্ত্তে দুইজনে বধ্যভূমিতে গমন করিলেন।

অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখরে বধ্যভূমি। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করাইয়া তাহাকে পর্ব্বত পাদদেশস্থিত অন্ধকারময় সুবৃহৎ গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া তখনকার প্রাণদণ্ডের রীতি ছিল।

পর্ব্বতের উপর বধ্যভূমির দেবমন্দির। সহযাত্রিগণকে পর্ব্বতের তলদেশে রাখিয়া সাথুক রাজ-নন্দিনী ভদ্রাকে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।

দেবপূজা সাথুকের একটি মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র। আসল কথা রাজকুমারীর হীরকখচিত কণ্ঠহার লাভের বাসনা তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়াছিল। রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া সেই অলঙ্কার গ্রহণের উদ্দেশেই তাহার এই আয়োজন।

ভদ্রা এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন।

সাথুক বলিল, "প্রিয়তমে! তোমার সমস্ত অলঙ্কার দেহচ্যুত করিয়া তোমার উত্তরীয় বস্ত্রে বন্ধন কর।"

রাজকুমারী বলিলেন, "তাহার কারণ কি? দেবপূজায় আসিয়া অলঙ্কার উন্মোচন করিতে হইবে কেন?"

সাথুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, দেবপূজা ভাণ মাত্র। তোমার অলঙ্কার সমস্ত গ্রহণ করিবার জন্যই আমার এই দেবপূজার মিথ্যা কল্পনা।

ভদ্রা নিতান্ত বিস্মিতার ন্যায় বলিলেন, "এই সামান্য কারণে এইরূপ মিথ্যার আয়োজন কেন? আপনি কি বিশ্বস্ত হইয়াছেন যে এই দেহ, এই যৌবন আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি! এই তুচ্ছ রত্নালঙ্কারে আমার কি হইবে?"

সাথুক বলিলেন, আমি অত ভাগ বিভাগ জানিনা। লোকের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া আমি আপন জীবন ধারণ করিতে বিশেষ লজ্জিত।

রাজকুমারী বুঝিলেন অনুনয় বৃথা। পাষণ্ডের পাপমতি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বিকশিত! ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এত দিন তাহা হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। আজ তাহা আবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ভদ্রা—পতিব্রতা ভদ্রা, নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। স্বামীর পাপ-পরিস্ফুট পত্নীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভদ্রা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক। আপনি এই সমস্ত রত্নালঙ্কার গ্রহণ করুন। কিন্তু এই শেষ সময়ে, এই জীবনের শেষ অবসরে, আপনি হতভাগিনীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার আপনার হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয় মিলাইতে ইচ্ছা করি। আমাকে এই শেষ আলিঙ্গন প্রদানে সুখী করুন।"

সাথুক তাহাতে স্বীকৃত হইল। ভদ্রা স্বামীর সম্মুখ ভাগে একবার আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় পশ্চাৎ হইতে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সাথুক তাহাতে কোনও আপত্তি করিল না।

ভদ্রা পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাকে সজোরে ধাক্কা মারিল। মাতঙ্গিনীর মত বলশালিনী ভদ্রার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া সাথুক পর্ব্বত-শিখর হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। শেষে বধ্যভূমির অতল গহ্বরে তাহার স্থান হইল।

ভদ্রার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতির দেখিয়া পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন :—

ন সো সব্বেসু ঠানেসু পুরিসো হোতি পণ্ডিতো।
ইত্থীপি পণ্ডিতা হোতি তত্থ তত্থ বিচক্খণা।

সর্ব্বত্র কেবল পুরুষ পণ্ডিত হয়, এমন নহে, স্ত্রীলোকও স্থান বিশেষে বিলক্ষণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া থাকে।

ভদ্রা পিশাচ-প্রকৃতি স্বামীর হস্ত হইতে রক্ষা লাভ করিয়া দুর্ব্বিসহ হৃদয়বেদনা লইয়া গৃহত্যাগিনী হইলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চির জীবন সাধুসঙ্গবাসে আপনার পাপ বিনাশ করিবার উদ্দেশে তিনি কোন নিগ্রন্থ আরামে গিয়া প্রব্রজিতা হইলেন।

জৈনশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইয়া তিনি পরিব্রাজিকারূপে দেশ ভ্রমণে বহির্গতা হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিখ্যাত বাদার্থিনী হইলেন।

পতিত পাবন ভগবান গৌতম বুদ্ধ সেই সময় ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন মানসে জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। ভদ্রা বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া তর্কে বহু বিখ্যাত পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া পরিশেষে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। তথায় ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের সহিত তিনি শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সারীপুত্র তাঁহার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া শেষে একটী প্রশ্ন করেন।

সারীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—এক কি?

ভদ্রা এই প্রশ্নের আদি অন্ত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্ধকারে প্রবিষ্টার ন্যায় বলিলেন—ভন্তে! আমি এ মীমাংসায় অক্ষম।

তখন তাঁহাকে সুন্দর রূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ শুনিয়া ভদ্রা নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন। তারপর সারীপুত্রের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন—"প্রভু! আমি আপনার শরণাগতা।"

সারীপুত্র ভদ্রাকে বলিলেন—"সদেবলোকে ভগবান গৌতমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তুমি তাঁহার শরণ লও। তিনিই তোমাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন।"

"প্রভু তাহাই হইবে" বলিয়া ভদ্রা বিদায় হইলেন।

সায়াহ্নকাল। ধর্ম্মদেশনার সময় উপস্থিত হইলে ভগবান ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। একখণ্ডমাত্র বস্ত্র পরিহিতা অর্দ্ধনগ্না এক সন্ন্যাসিনী ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে ভগবানকে প্রণাম করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই ভগবান বুঝিলেন যে তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে. নির্ব্বাণ লাভের তিনি উপযুক্ত। মিথ্যাদৃষ্টি নাশে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বাদ বিবাদে বিলক্ষণ পটুতার অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া ভগবান লোকনাথ বলিলেন :—

সহস্সম্পি চে গাথা অনাথ পদসংহিতা
একং গাথাপদং সেয়্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।

অর্থহীন অসার সহস্র সহস্র গাথা (শাস্ত্র) অপেক্ষা যাহা শুনিলে সকল দুঃখের অবসান হয় এমন গাথার একপদও শ্রেষ্ঠ।

এই গাথা শুনিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরক্ষণেই তিনি ভগবানের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান দীক্ষার অনুমতি প্রদান করিলে ভদ্রা ভিক্ষুণীদের আরামে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

নির্ব্বাণসুখ ভোগ করিতে করিতে একদা নিম্নলিখিত গাথায় ভদ্রা মনের প্রীতি প্রকাশ করেন। নিজের পূর্ব্বাচরণ স্মরণ করিয়া বলিলেন :—

লূনকেসী পক্ষধারী একসাটী পুরে চারি
অবজ্ঞে বজ্ঝ-মতিনী বজ্ঝে চাবজ্ঝদস্সিনী।

আমি পূর্ব্বে জৈন সম্প্রদায়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে মাথার চুল উৎপাটন করিয়া ফেলিতাম। দন্তকাষ্ঠাদি ব্যবহার করিতাম না বলিয়া মুখ দুর্গন্ধ ময়লাপূর্ণ থাকিত। একখানি মাত্র বস্ত্রে শরীরের অধোভাগ আচ্ছাদন করিয়া অর্দ্ধনগ্ন থাকিতাম। যে সকল কাজে দোষ নাই সে সকল দোষের বলিয়া ত্যাগ করিতাম। দোষহীন মনে করিয়া দোষজনক কাজ সকল সম্পাদন করিতাম।

চিরা অঙ্গা চ মগধা বজ্জী কাসীচ কোসলা
অনণা পঞ্চাল বদ্দানি রট্ঠপিণ্ডং অভুঞ্জিহং॥

অঙ্গ, মগধ, বৃজি, কাশী ও কোশল জনপদে ভ্রমণ করিয়া সে সকল দেশবাসীর প্রদত্ত অন্ন ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তখন আমি মুক্ত হইতে পারি নাই। সুতরাং পরের দান ভোগের অধিকার না থাকায় আমি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলাম মাত্র। ইদানীং বুদ্ধের শাসনে আসিয়া আমি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ৫০ বৎসর যাপন করিয়াছি। এখন আমি পরের দান ভোগে অধিকারিণী। আমার পূর্ব্ব-ঋণ হইতেও এখন মুক্ত। সুতরাং অঋণী হইয়া দান ভোগ করিতেছি;

বাদার্থী বহু পণ্ডিতের নাম আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু বাদার্থিনী পণ্ডিতার নাম ইতিহাসে বিরল। বৌদ্ধ-ইতিহাসে ভদ্রা প্রভৃতি সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

(বৌদ্ধ-বন্ধু)

শ্রীভবতারণ বসু।

পায়ের কাঁটা

(৬)

একদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া চারু কি কাজে অনিলের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনিল ঘরের মেজের একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। মাথার কাছে পাঠ্য বহিগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে, তৈলের প্রদীপটার সলিতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। চারু বুঝিলেন, অনিল গত রাত্রিতে পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বাতির সলিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া ছাই হইয়াছে। রঞ্জন আসিয়াছে পর অনিল আর বড় চারুর কাছে শোয়িত না, পড়ার ঘরেই ঘুমাইত। রঞ্জন চারুর কাছে ঘুমাইত, চারু তাহাকে লইয়া অনিলের খোঁজ করিবার ততটা অবসর পাইতেন না। ভাবিতেন, অনিল রঞ্জন অপেক্ষা বয়োপ্রাপ্ত, কাজেই রঞ্জনেরই অধিক যত্নের আবশ্যক, বিশেষ অল্পদিন যাবত সে মাতৃহীন হইয়াছে।

চারু অনেক দিন অনিলকে তেমন যত্ন করিতে পারেন নাই;—কিন্তু আজ তাহাকে এমন ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বড় অনুশোচনা হইল—বাস্তবিকই তিনি অনিলকে পূর্ব্বের মত যত্ন করিতেছেন না, তাইতেই ত অনিল আজ 'মা-হারার' মত মাটিতে পড়িয়া আছে। চারু চাহিয়া দেখিলেন এ ক'দিনে অনিলের কণ্ঠের হাড় দেখা দিয়াছে, বুকের হাড় গির গির করিতেছে, চোখ বসিয়া গিয়াছে। চারু বুঝিলেন, তাহারই অবহেলার ফলে এইরূপ হইয়াছে। দু'দিন পূর্ব্বেও মায়ের হাতে না খাইলে অনিলের পেট ভরিত না, মায়ের কাছে না ঘুমাইলে ঘুম আসিত না, সে আজ প্রায় একমাস যাবত একা শোয়, নিজ হাতে খায়,—চারুর বুকটা যেন ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। বাস্তবিক তিনি অনিলকে ইদানীং আর তেমন যত্ন আদর করিতেছেন না ইহাতে ত তাহার অভিমান করিবারই কথা। চারু নিজের নির্ম্মম ব্যবহারের কথা মনে করিয়া বড়ই ব্যথিতা হইলেন, তাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে কে যেন পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, শুধু তাহারই অবহেলায় অনিল এরূপ রোগা হইয়া গিয়াছে, দীন-দুঃখীর মত ধূলাতে পড়িয়া আছে। চারু সকলই বুঝিতে পারিলেন। বহুদিন পরে আবার অনিলের প্রতি তাহার বাধাপ্রাপ্ত স্নেহ উছলিয়া উঠিল। শিশু যেমন তাহার হস্তস্থিত যষ্টিতে আহত ব্যক্তিকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দুঃখে গলিয়া তখনই প্রহৃত ব্যক্তির আহত স্থানে হাত বুলাইয়া, হাসিয়া হাসিয়া তাহার যাতনার উপশম করিতে চায়,—তদ্রূপ চারুও নিজের নির্ম্মম ব্যবহারে ব্যথিত অনিলকে তৎক্ষণাৎই নানা উপায়ে ব্যথামুক্ত করিতে চেষ্টিতা হইলেন। একটু স্নেহ-মাখা কথা কহিলে, কোলে করিয়া খাওয়াইলে অনিলের অভিমান দূর হইবে, তিনি জানিতেন। তখনই নিজের ঘরে যাইয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া পরম পরম লুচি, মোহনভোগ করিয়া অনিলকে ঘুম হইতে উঠাইয়া আনিলেন। অনিল দুই হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে আসনে বসিল, চারু একটা রেকাবীতে করিয়া লুচি, মোহনভোগ সাজাইয়া দিলেন। রঞ্জন দুই হাতে লুচি মোহনভোগ কচলাইয়া এক একবার মুখে পুরিতেছিল ও চারুর আঁচলে মুখ মুছিতেছিল। সম্মুখে শিকার দেখিতে পাইলে শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্র যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে রঞ্জনকে তদবস্থায় দেখিয়া অনিলের হিংসা অভিমান তেমনই গর্জ্জিয়া উঠিল। সে দু একবার লুচি মুখে করিয়া "ছাই, বালি পিজপিজ করে" বলিয়া রেকাবী ছুড়িয়া ফেলিল। চারু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন "একি হচ্ছে অনিল!" অভিমান-ক্ষুব্ধ অনিল "রঞ্জনের বেলা ভাল খাবার, আমার বেলা ছাই" বলিয়া দুপ্ দাপ করিয়া হাত পা আছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। চারু মুহূর্ত্তের ভিতর সমস্ত বুঝিয়া লইলেন "ও! তাই এত দূরে দূরে থাকা। এ-ত রঞ্জনের উপর দারুণ হিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের হিংসার আগুনে নিজে জ্বলবে তার আমি কি করব!" এক মুহূর্ত্তে অনিলের প্রতি চারুর সহানুভূতি ভালবাসা দূর হইল। ইহার পর হইতে অনিলের হিংসা অভিমান যাহা এতদিন দুধের আগুনের মত ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল তাহা প্রধূমিত হইয়া উঠিল; অনিল সুযোগ পাইলেই

এই অগ্নিকুণ্ডের তাপে সেই ধূমায়মান হিংসা-বহ্নির আহুতি রতনকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কারণে বিনা কারণে অনিল রতনের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। সুযোগ মিলিলেই রতনকে প্রহার করিত খেলিবার পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিত, খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিত। চারু সব লক্ষ্য করিত, লক্ষ্য করিয়া অনিলকে কিছু বলিত না, ক্রোধের জ্বালা উল্টা রতনের উপর বর্ষণ করিত।

একদিন রতনকে একা পাইয়া অনিল তাহাকে একটা কলার হস্তে আকর্ষণ করিয়া বলিল, "তুই হতভাগা আমার মায়ের কাছে যাস্ কেন? আর যাবি বল্।" রতন চীৎকার করিয়া, নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া, ভয়ে ভয়ে বলিল, "আচ্ছা আর যাবো না।" তারপর কি ভাবিয়া চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "এ ত তোমার মা নয়, তোমার মা ত মরে গেছে। ও তোমার বৌ দিদি, আমার মামীমা।" চারু যে তার মা নয়, বৌ-দিদি মাত্র, আজ এ কথাটা হঠাৎ অনিলের প্রাণে বিঁধিল।

দশ বার দিন পর বৈকালে চারু খিড়কির পুকুরে গা ধুইতেছিল। স্কুল-প্রত্যাগত অনিল ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রতন তাহার টিনের বাক্স হইতে আধ-কাটা ছুরি বাহির করিয়া কাচা আম কাটিয়া তাহার খরমন্ত্র ছড়াইতেছে। একে ত বাক্সকে সে দু'চক্ষের কোণে দেখিতে পারিত না, তাহাতে তাহার বাক্স লণ্ডভণ্ড করিয়া ছুরি বাহির করিয়াছে, অনিল রাগিয়া বলিল, "শিগ্‌গির আমার ছুরি দে।" "তা দেব না ত" বলিয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহ রতন বিগুণ উৎসাহে আম কাটিতে লাগিল। অনিল আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "দে শিগ্‌গির বোল্‌চি, হতভাগা ছোড়া।" মুখ ভেংচাইয়া রতন বলিল, "দেব না ত, কি করবি?" অনিলের আর সহ্য হইল না। "দিবি না, মুখে মুখে কথা, দাঁড়া" বলিয়া তাকে ঘাড় ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া ছুরি ছিনাইয়া লইল। ক্রমাগত আম কাটিয়া ও বালুতে শানাইয়া ছুরিটা তীক্ষ্ণ-ধার হইয়াছিল, ধস্তাধস্তির সময় রতনের হাতে লাগিয়া ফিন্‌ ফিন্‌ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অনিল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—ফল এরূপ গড়াইবে সে ভাবে নাই।

রতনের বিকট চীৎকারে চারু দৌড়াইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া ক্রন্দন-সুর উদারা হইতে তারাতে তুলিয়া রতন বলিল, "অনুদে আমার হাত কেটে দিয়েছে।" রক্ত দেখিয়া চারু ধমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চীৎকার করিয়া বলিল, 'সত্যি নাকি রে অনুদে!" অনিল মায়ের মুখে এরূপ সম্বোধন প্রথম শুনিল, এই ক'দিন যাবৎ সন্দেহ ও হিংসার আগুন তাহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, চারুর পক্ষপাতিতার আরো রাগিয়া বলিয়া ফেলিল "কেটেছি, বেশ করেছি, গলায় ছুরি দেবো।" চারু কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া অনিলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ চাপিয়া বলিলেন "তা কিছু অসম্ভব নয়। ক'দিন যাবৎ যা তোমার ব্যবহার দেখছি, একদিন তা করা আশ্চর্য্য নয়। এক ফোটা ছেলে, এখনই পেটে পেটে এত হিংসা! বড় হ'লে যে কি হ'বে তা ভগবানই জানেন। যাও, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" তিনি রোরুদ্যমান রতনকে ক্রোড়ে তুলিয়া রক্ত ধুইয়া পটি বাঁধিয়া শান্ত করাইলেন, তারপর অগ্নিপূর্ণ দৃষ্টিতে অনিলকে জর্জ্জরিত করিয়া বলিলেন, "পরিণাম বড় ভাল হচ্ছে না কিন্তু, আজকের এ ব্যাপার চোদ্দ বছরের বাড়ি ছেলের পক্ষে শোভা পায় না।" অনিল কিছু বলিল না, ছোট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অভুক্ত অবস্থায়ই গৃহের বাহির হইয়া নদীর ধারে বসিয়া অজস্র ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। এই কি মা? এই কি মায়ের ব্যবহার? সে-ত এতদিন চারুকে ঠিক মায়ের মতই দেখিয়া আসিয়াছে! না না, এ মা নয়—বৌদি। তাহার বুকটায় কে যেন একটা বিষম ভারি পাথর চাপিয়া ধরিল। সন্ধ্যার সময় সে যখন বাড়ী ফিরিল সুনীল কঠোর স্বরে ডাকিলেন, "অনিল, এদিকে আয়।" এ ক'দিন ক্রমাগত রতনের চীৎকারে সুনীলের কান ঝালপালা হইয়া উঠিয়াছিল।

সুনীল চারুর কথায় ভাবিলেন, অনিল বাস্তবিকই উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দান্ত, হিংসাদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা চারু তাহার বিরুদ্ধে কিছু জানাইত না। চারু যে তাহার মা!

অবশ্য চারুকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তিনি অনিলের হৃদয়ের ভাব ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, পারিলে হয়ত এইরূপ অশান্তি হইতে পারিত না। অনিল নিকটে আসিলে সুনীল কঠোর ভাবে বলিলেন, "কিরে অনু, আজকাল কি হচ্ছে! তোর আলায় দেখ্‌চি বাড়ী ছেড়া দায় হবে। এতটুকু ছেলে, তার এখনই এত হিংসে, আর দিন ত পড়েই আছে। সে দিন রঞ্জনকে পুড়িয়েছিলি আজ কেটে দিয়েছিস্,—তোর জন্যে কি পরে জেলে যেতে হবে না কি?" অনিল কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, হৃদয়ের সহিত তাহার সমস্ত দেহটাও যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিল। নিরুত্তর দেখিয়া সুনীল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বল্ আজ আবার ওর হাত কেটেছিস্ কেন? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চল্‌বে না। আর বরদাস্ত হয় না, আজ একটা হেস্ত নেস্ত কর্‌ব। তোর মার মুখের উপর ওকে খুন কর্‌বি বলেছিস্, তাকে আরো যা তা বলেছিস্। কেন? উত্তর দে। তোর ব্যবহার ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে, আর সহ্য কর্ত্তে পারি না। না হয় তুই তোর পথ দেখ।" অনিল ধীরে ধীরে বলিল, "মা, বৌদিদিকে কিছু বলি নি ত!" সুনীল চমকিয়া চারুর মুখের দিকে তাকাইলেন; চারু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সুনীল কম্পিত স্বরে বলিলেন, "বৌদি কে রে? তোর মা'র কথা বোল্‌চি।" তরা গলার আর্দ্র চোখে অনিল বলিল, "আর আমি ছোট নই দাদা, যখন ছোট ছিলাম তখন (চারুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি মা ছিলেন, তখন মায়ের ভালবাসার অধিকারী ছিলাম, এখন বড় হয়েছি, এখন ইনি মা নন, বৌদিদি,—মা ঐ (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐখানে, সে স্নেহ আর এজীবনে পাব না।" তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, বর্ষার বারির ধারার মত অশ্রু নামিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

চারু ও সুনীল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। এতদিন যে ভয় করিতেছিলেন তাহা এতদিনে কিরূপে ফলিয়া গেল, সংসারে অনভিজ্ঞ, সরলহৃদয় সুনীল তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না! চারু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, পৃথিবীর ইহাই রীতি। এত করিয়াও পরকে আপন করা যায় না। অনিল নিজকে একটু সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিল, "এখন তোমরা তোমাদের ভালবাসার লোক পেয়েছ, তাকেই ভালবাস। আমি কেন আর তোমাদের জ্বালাই এবেলা আমার পথ দেখাই ভাল! তোমরা—" সে আর বলিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অভিমান-ক্ষুব্ধ অনিল ঘরের বাহিরে অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার বাহিরের গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকাইল, আবার ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল, সুনীল ও চারু তেমনি অপ্রসন্ন মুখে বসিয়া আছেন। অনিল কয়েকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস জাগিয়া উঠিল, অনিল গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর মিলাইয়া গেল। সুনীল ও চারু বুঝিতে পারিল না, তাহাদের সামান্য বুঝিবার ভুলে আজ কি একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিতে চলিল, তাহাদের সামান্য অন্তর্দৃষ্টির অভাবে কি সাংঘাতিক কার্য্যের সূচনা হইল।

(৭)

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, অনিল ফিরিল না। সুনীল নামমাত্র কিছু মুখে দিয়া নিজের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মুঁদিয়া বাতিটা নিবাইয়া ফেলিলেন, তারপর অন্ধকার ঘরের ভিতর বিছানায় পড়িয়া অতীত কথা গুলি ভাবিতে লাগিলেন। আজ তিনি কি করিতে কি করিয়া ফেলিলেন। তাহার রাগ হইল চারুর উপর, কেন সে রঞ্জনকে লইয়া আসিল, এই দুরন্ত বালকই যত অনর্থের মূল। চারু রঞ্জনকে ঘুম পাড়াইয়া অনিলের ভাত থালায় সাজাইয়া সম্মুখে করিয়া অভুক্ত বসিয়া রহিলেন। প্রতি পদশব্দে চমকিয়া দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন কিন্তু অনিল ফিরিল না। সন্দেহে, গভীর আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃই অধীর হইয়া উঠিল। ক্রমে বাহিরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া একে একে বারটা বাজিয়া গেল, প্রত্যেকটা শব্দ যেন তীক্ষ্ণ সূচের মত

তাহার বুকের ভিতর বিঁধিতে লাগিল। রামচরণ ল্যাম্প হাতে অনিলকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "অনিলকে কোথাও মিলিল না।" চারুর সমস্ত হৃদয়টা অনুতাপানলে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতদিন রঞ্জনকে লইয়া থাকিয়া সে অনিলের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই, না বুঝিয়া কারণে বিনাকারণে তাহার প্রতি কত নির্মম ব্যবহার করিয়াছে—আজ সেই সকল ঘটনা জমাট বাঁধিয়া আসিয়া তাহার হৃদয়টা পিষিয়া ফেলিতে লাগিল।

নীরবে, দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতার ভিতর একাকী একপ্রাণ আঁধার লইয়া চারু অতীত ঘটনাগুলি ভাবিয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। সেই বিবাহ-রজনী, শিশুর করুণ মা মা সম্বোধন, তারপর এই কত বৎসর তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এই নিরাশ্রয় মাতৃহীন শিশু কিরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে এই বুকের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তারপর অনিলের অগাধ ভালবাসার কথা! বন জঙ্গল হইতে ফল আহরণ করিয়া নিজে না খাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছে, তাহার দামান্য পীড়া হইলে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে চারুর হৃদয়টা ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

সহ্য করিতে না পারিয়া চারু উঠিয়া সুনীলের ঘরে যাইয়া ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। সুনীল চক্ষু বুজিয়া বিছানায় অসাড়ের মত পড়িয়া আছেন।

চারু তাঁহাকে বলিলেন, "অনিল ফিরে নাই।" উদাস ভাবে সুনীল বলিলেন, "বেশত!" চারু বলিলেন, "এই অন্ধকার রাত্রিতে সে কোথা রইল, বড় ভাবনা হচ্ছে।" পূর্ব্ববৎ সুনীল বলিলেন, "গাছতলায়—নদীও আছে।" চারু শিহরিয়া উঠিলেন, এই কথাটা এতক্ষণ তাঁহার মনে আসে নাই। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, অনিল এক্ষুণি ফিরে আসবে, কি বল?" "আসতেও পারে, নাও আসতে পারে।" 'সে কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে?" "আমরা পারলে সে পারবে না কেন?" চারুর কান্না আসিল, সুনীলের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "যাও, তুমি নিজে একবার খুঁজে দেখ, এই আঁধার রাত্তিরে সে কোথাও যায় নি, কাছেই আছে।"

সুনীল নড়িলেন না, কঠোর ভাবে বলিলেন "আর তার জন্য এত ভেবে ফল কি? সে যেখানে ভালবাসা পাবে সেখানে থাক। এখানে আমাদের ভালবাসা পায় না, অন্য কোথাও ভালবাসা খুঁজতে যাবে, তাতেও বাধা দিতে চাও! তোমার ত বুক ভরাই আছে, রঞ্জনকে নিয়ে থাক। ও তার মার কাছে থাক, যার কাছে যেতে আমি বাধা দেব না।" সুনীলের চোক ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল, তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চক্ষু মুছিলেন। চারু লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুনীল তাঁহার ব্যথিত হৃদয় আরও বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আপন ভগ্নীর ছেলে, প্রাণপোরা ভালবাসায় তারই দাবী। তার আবার একটা সরীক ছিল, সেটা আপনি আপনি চলে গেছে;—বেশ ত, ভগ্নীর ছেলেকে প্রাণ ভরা ভালবাসা চালবার সুবিধা হয়েছে।" চারুর অসহ্য হইয়া উঠিল, আহত ছাগ-শিশুর মত যাতনায় ছট্‌ফট করিতে করিতে নিজের শয্যায় যাইয়া সারা রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া ফেলিল।

দুদিন কাটিয়া গেল, অনিল ফিরিল না। সুনীল চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়াও তাহার খোঁজ পাইলেন না। প্রথম শোকের বেগ উপশম হইলে চারুর অভিমান হইল—তাঁর না হয় দোষ হইয়াছে, তা বলিয়া অনিল এত বড় প্রতিহিংসা সাধন করিবে! পৃথিবীতে ভুল না হয় কার, একবার ভুল করিলে কি তার ক্ষমা নাই! তারপর ভাবিলেন, অনিল কি এত নিষ্ঠুর হইবে যে আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইয়া থাকিবে? না, না, সে বোধ হয় নিকটেই লুকাইয়া আছে, দুদিন বাদেই আসিবে। আমাকে একটু জব্দ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু অনিল ফিরিল না। চারু নিজের হৃদয়কে পাষাণে বাঁধিয়া রঞ্জনকে পালিতে লাগিল। যে আমার জন্য কাঁদে না আমি তাহার জন্য কাঁদিব কেন? ক্রমে রঞ্জন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। একদিন রঞ্জন চারুর ক্রোড়ে বসিয়া একটা আতা খাইতেছিল, খাইতে খাইতে বলিল, "অনিলটা চলে গেছে, বেশ হয়েছে। সেটা

আমাকে দেখলেই মারতে আসত, আর বোলত 'মায়ের কাছে যেতে পারবিনা।' ইস্‌ভাগ্যি মা, আমি বলেছি মাগীত তোর মা নয়, বৌদি। তা শুনে তখনি কেঁদে চলে গেল। তার পরে চলে গেছে, না মাগী! খুব আহ্লাদ!" চারু বুঝিলেন অনিল কেন সেদিন বৌদি সম্বোধন করিয়াছিল, রতনকে তিনি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রতন চীৎকার করিতে লাগিল, 'মাগী মারে!' চারু কি ভাবিয়া আবার তাহাকে কোলে করিয়া বলিলেন "আমাকে মা বলে ডাকত।" রতন ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি ত আর মা নও, মাগী।" চারু শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন "হায়, একটা কাচের জন্ত কাঞ্চন হারা'লাম।"

ইহার কিছুদিন পর কৃতান্ত বাবু (রতনের পিতা) আসিয়া রতনকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। চারু ছলছল চোখে বলিলেন, "অনিল কোথা চলে গেছে রতনের মুখ পানে চেয়ে তার শোক ভুলে আছি। রতনকে ত আমাকে দেবেন বলেই দিয়েছিলেন, ও আমার থাক্।" কৃতান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "রতনকে তুমি রাখতে চাও, সে ত ভালই, বোনের ছেলে আর নিজের ছেলে একই। আচ্ছা, অহনকে এখানে পাঠিয়ে দেব রতনকে নিয়ে যাই।"

চারু ম্লানমুখে বলিলেন 'ওকে নেবার জন্ত এত ব্যস্ত কেন কৃতান্তবাবু, ওত খুব ফুর্ত্তিতেই আছে।" কৃতান্ত বাবু চারুর কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তোমাকে বোলতে আর দোষ কি চারু তুমি ত আপনার জনই। কথাটা হচ্ছে কি, রত্নপুরের জমিদার রতনকে পোষ্য নিতে চান। তাঁর প্রায় লাখ টাকা আয়। আমাকে দশ হাজার টাকা নগদ, বাড়ী, গাড়ী দেবেন বলেছেন।" চারু বিস্ময়াভিভূতা হইয়া বলিলেন, "টাকার জন্ত ছেলে বেচ্‌বেন!" ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতান্তবাবু বলিলেন "দেব না, বল কি! দশ হাজার টাকা রোজগার করে লোকের জীবন পেড়িয়ে যায়, আর আমি ঘরে বসে চোখ বুজে দশহাজার টাকা লুকে নেবো.—এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে! আর ছেলেটাও পরম সুখে থাকবে। তুমিত আচ্ছা বোকা হে।" বলিয়া পরুষত্ব-নিন্দিত দশনপংক্তি বাহির করিয়া হা, হা, হা, হো, হো, হা, ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে তিনি হাসিতে লাগিলেন। চারু ধীর ভাবে বলিলেন, "লোকে ছেলে পায় না, আপনি সামান্ত টাকার লোভে এরূপ নীচ কাজ করবেন! পরে বড় হয়ে ছেলেও পর হয়ে যাবে, আপনাকে ঘৃণা করে বোল্‌বে তুমি সামান্ত টাকার জন্ত আমাকে পরু বাছুরের মত বিক্রী করেছ।" কৃতান্ত বাবু শুষ্ক দুরন্ত মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলিলেন "টাকা এমনি চীজ, ছেলে বড় হ'য়ে বরং বল্‌বে তোমার জন্ত এই রাজভোগে আছি।' তখন দেখবে কত টাকা পয়সা এই রতনই তোমাদের সকলকে দিলাবে। আর, তুমি বোলচ পর হ'য়ে যাবে। তা হয় না; আর যদি নেহাৎই হয়, মনে কোরব মানুষের ত ছেলে মরেও যায়।" চারু চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, টাকার অর্থ, ইহার লোভে মানুষ এত নীচ হয় পিতা সন্তানকে পশুর মত বিক্রয় করে। ইহাকে বলিয়া কোন ফল নাই দেখিয়া চারু রতনকে বলিলেন, "তুই আমার কাছে থাক, কত যত্নে আদরে আছিস্। তোর বাপ তোকে বিক্রী কোর্‌বে, তুই যাস্‌নে।" রতন তাহার পিতার নিকট রত্নপুরের বিপুল অর্থের কথা শুনিয়াছিল, বলিল 'না মাগী, তোমরা গরীব, তোমাদের এখানে থেকে লাভ কি! রতনপুরে কত টাকা গাড়ী, ঘোড়া। গরীবের বাড়ী থাকতে ভাল লাগেনা।" চারু ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, আজ তাহার সমস্ত জগতটা শূন্য হইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রিতে আলেয়ার অনুসরণকারী পথিক একাকী বিজন প্রান্তরে পড়িয়া, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যেমন হায় হায় করে থাকে, তেমনি রতনের স্নেহে মগ্না চারু নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃতান্তবাবু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রতনকে লইয়া গেলেন; চারু মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অনিলের শোক আজ দাবানল রূপে তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল।

(৬)

গৃহের বাহির হইয়া অনিল দেখিল ঘোর অন্ধকার। অমাবস্যা তিথি, তাহাতে আকাশ মেঘাবৃত আকাশ

নক্ষত্রগুলিও ঢাকিয়া রহিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে জমাটবাঁধা গাঢ় অন্ধকার, নিজকে নিজের দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। তাহাতে অন্ধকার ঠেলিয়া, পথ করিয়া নিস্তব্ধ বক্ষপথ দিয়া সে নদীর দিকে চলিল। তখন রজনীর প্রথম প্রহর হইলেও প্রকৃতি গভীর অরণ্য নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া ছিল। তাহার পদস্পর্শিত হইয়া পদপার্শ্বস্থ শুষ্ক পত্রগুলি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল, সেই শব্দে শিবাগুলি বনান্তরালে পলায়ন করিল, দু একটা নিশাচর পক্ষী পক্ষচালনা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অনিলের হৃদয়টা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এই বুকে ভূত, ঐ বুকে ব্রহ্মদৈত্যের বাস,—সহজ অবস্থায় বালক দু চারিজন সঙ্গী সমভিব্যাহারেও এই ভীতিসঙ্কুল অরণ্যে আসিতে সাহসী হইত না, কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ে অপরিমিত সাহস।

যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই,—যাহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইবার, ব্যথায় সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই,—তাহার আবার প্রাণের ভয় কি? অনিলের প্রাণেও আজ ভয় ছিল না। সে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছিল, তবুও এই নীরব, নিস্তব্ধ জনহীন অরণ্যে তাহার মনটা এক একবার কেমন দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। অনিল নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইল।

ধীরে ধীরে নদীর সিকতাময় পুলিনে বসিল, বসিয়া একবার ঊর্দ্ধে মেঘাবৃত আকাশের দিকে, তৎপর পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণ-সলিলা কল্লোলিনীর দিকে চাহিল। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, পার্শ্বে কেবলই, অন্ধকার, গাঢ়, জমাটবাঁধা অন্ধকার। বিরাট বিশ্বে ভীষণ নিস্তব্ধতা, কেবল কল্লোলিনীর কল্ কল্ নাদ ঐ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। অনিল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কপোলে করতল সংলগ্ন করিয়া হেট্ মুখে সে ভাবিতে লাগিল, "কেন এইরূপ হইল? তবে কি তাহারা সত্যই আমাকে ভালবাসেন না, সত্যই কি ঐ দুরন্তটাকে তাহারা বেশী ভাল বাসেন?" কে যেন হৃদয় হইতে বলিয়া দিল "হা ঠিক! তোমাকে উহারা এক তিল ভালবাসে না। তুমিই উহাদের দুঃখ কাঁদিয়া মর। দাদা ত আজই বলিলেন, তোমার পথ তুমি দেখ। অনিল গর্জ্জিয়া উঠিল, বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক ভাই। উঁহারা আজ আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন,—আমি উহাদের কেহ নই,—আমার কেহ নাই।" উন্মাদের মত উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া বলিল, "এ পৃথিবীতে আমার কেউ নাই। আমি সত্যই মাতৃহীন,—আমার কেউ নাই।" বালক মা, মা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইল, কিন্তু কৃষ্ণ মেঘাড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না;—কেবল তড়িৎ সেই অসীম অন্ধকার হইতে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, বজ্র অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বালক সেখানে সহানুভূতি প্রাপ্ত না হইয়া পার্শ্বে প্রবাহিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল, কেমন তর তর নাদে, বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ ভাবে লীলা-চঞ্চল কল্লোলিনীর দিকে আকুল নয়নে চাহিয়া সহানুভূতি যাচ্ঞা করিল। সহসা তাহার মনে হইল, স্বপ্নদৃষ্টা সেই মোহিনী মাতৃমূর্ত্তি যেন নদীর ভিতর হইতে তাহাকে ডাকিতেছে—আয় আয়,—আয় নৈশ সমীরণ সেই করুণ আহ্বান বহন করিয়া তাহার কর্ণে আনিতেছে।

অনিল উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কর্ণ পাতিয়া আবার শুনিল সে মধুময় আহ্বান—"রে সংসারের নিষ্ঠুর পীড়নে জর্জ্জরিত বালক! আমার শান্তিমাখা, শীতল বুকে আয়,—তোর সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবাইয়া দিব।' অনিল আর স্থির থাকিতে পারিল না,—উন্মাদের মত ছুটিয়া যাইয়া নদীর জলে ঝাঁপিয়া পড়িল,—নদীর শীতল সলিল স্পর্শে মনে হইল, সত্যই যেন এই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলে প্রাণের সব জ্বালা যুচিয়া যাইবে। সে ধীরে ধীরে গলা জলে যাইয়া নামিল।

নামিয়া একবার সে ফিরিয়া চাহিল,—নদী-পুলিনে সারি-বাঁধা বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই পেছনে তাল তমাল আম্র কানন, তাহারই অনতি-দূরে একটি শান্তিপূর্ণ কুটীর, সেখানে দাদা, আর 'মা' রহিয়াছেন,—বালকের মনে সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে জল হইতে উঠিয়া আসিল। আর্দ্রবস্ত্রে বালির

উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "মাকে ফেলিয়া এত রাত্রিতে আমি এখানে আসিয়াছি, মা হয় ত কত ভাবিতেছেন, হয়ত অসুখ করিয়াছেন, হয়ত কত কাঁদিতেছেন। না, বাড়ী ফিরিয়া যাই!" অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল, ফিরিয়া চলিল, চলিতে চলিতে ভাবিল "বাড়ী ফিরিয়া দেখিব, মা আমার জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, আমাকে দেখিলে ছুটিয়া আসিয়া বুকে ধরিবেন।" বালক দ্রুত চলিল, সহসা কে যেন বলিল "কিন্তু যদি—?" অনিল থমকিয়া দাঁড়াইল,—বন্ধু বলিতে লাগিল "কিন্তু যদি দেখ বাড়ীর দ্বার বন্ধ, মা রজনকে লইয়া ঘুমাইয়া আছেন, তবে—?" মুহূর্ত্তের ভিতর শাণিত ছুরিকাঘাতে কে যেন তাহার হৃদয়টা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল,—নিরাশা-সাগরে আশার যে বুদ্বুদটা ভাসিয়াছিল মুহূর্ত্তের ভিতর তাহা মিলাইয়া গেল। অনিল আবার ফিরিল, ফিরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল। নদীর তীরে যাইয়া শুনিল, কল্লোলিনী সেইরূপ করুণ সুরে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। অনিলের জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল,—নদীর জলে মা মা করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। নদীর জল ভীষণ আলোড়িত হইয়া উঠিল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তীরে আসিয়া প্রতিহত হইতে লাগিল, তারপর ধীরে ধীরে তরঙ্গ নদীর বুকে মিলাইয়া গেল, জলনাদ বায়ুস্তরে মিশিয়া গেল। অনিল আর উঠিল না।

(৭)

একমাস পর একদিন সুনীল নিজের গৃহে ঘরের ভিতর পালঙ্কে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে একটা সংবাদ-পত্রের পাতায় চক্ষু উল্টাইতেছিলেন। চারু বিষণ্ণ ভাবে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়াছিলেন। এই একমাস চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অনিলের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। কিন্তু চারু তাহার আশা ছাড়িলেন না। তাঁহার বিশ্বাস অনিলকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, ভালবাসা অপ্রতিশোধিত থাকে না,—অনিল আজ হউক কাল হউক, একদিন ফিরিবেই ফিরিবে।

এই আশায় আশায় দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল,—অনিল ফিরিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চারুর চোখের জল শুষ্ক হইয়া গেল,—তবু তাঁহার আশা মিটিল না, আশা না থাকিলে কে বাঁচিয়া থাকিতে পারে? বিধবা নারী স্বামী হারাইয়াও অপোগণ্ড শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এই শিশুই একদিন বড় হইবে, এই শিশুই একদিন তাহার স্বর্গীয় পিতার মুখ উজ্জ্বল করিবে। এইরূপ সকলেই একটা না একটা আশা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকেন। পৃথিবীর ভিত্তিই আশা।

সুনীল সংবাদ পত্র রেখিতে রেখিতে সহসা মুখ তুলিয়া চারুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনেছ?" বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি স্বামীর মুখে স্থাপিত করিয়া চারু বলিলেন "কি?" সুনীল বলিলেন, "তোমার ভগ্নীপতি কৃতান্ত বাবু আর ওপরে রজনের কথা।" চারু নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন, "কি হয়েছে?" "এই যে কাগজে বেরিয়েছে, কৃতান্ত কুমার গুহ নামে এক ব্যক্তি রত্নপুরের জমিদার হরবল্লভ চৌধুরীর বিধবা পত্নীকে আপন পুত্র রজনলাল গুহকে পোষ্য পুত্র রূপে দান (?) করিয়াছিলেন (অর্থাৎ নগদ দশ হাজার টাকা ও মূল্যবান্ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিলেন)। রজনলালের ত্রয়োদশ বৎসর বয়স। সম্প্রতি কৃতান্তকুমার আরও অর্থলাভের আশায় পুত্রের নিকট গিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র, কস্মিন কালেও জানে না এই কথা বলিয়া ভূতপূর্ব্ব পিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।' আশ্চর্য্য ছোকরা, আপন বাপকে এম্‌নি ভাবে অপমান কোরল! ঘোর কলিকাল।"

চারু অবিচলিত ভাবে শুনিলেন, এরূপ হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, বলিলেন "বাপ যদি ছেলেকে হাট বাজারের জীব জন্তুর মত পয়সার কাছে বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে ছেলে বাপের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পৃথিবীতে স্নেহের প্রতিদানে স্নেহ পাওয়া যায়, তাচ্ছল্যের পরিবর্ত্তে তাচ্ছল্য লাভ হয়, কিন্তু"—তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। একটু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন "তুমি না বলিয়া

ছিলে একবার আমাকে নিয়ে তীর্থপর্য্যটনে যাবে। চল না কিসে কি হয় কে জানে?" সুনীল কিছু বলিলেন না, তিনি অতীব মনসংযোগ করিয়া সংবাদ পত্রের এক অংশ দেখিতেছিলেন।

সহসা সুনীলের চোখ দুটা উল্লাসোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পত্রিকার একটা অংশ তিনি অতীব মনোযোগের সহিত পড়িয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পেয়েছি, তাকে পেয়েছি।" এই চীৎকারে চারুর হৃদয়ে যেন একটা আঘাত বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কিগো, অনিলের কথা নাকি?" সুনীল কিছু না বলিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, বয়স চৌদ্দ পনর, গৌরবর্ণ, টানা টানা চোখ, লাবণ্যমাখা মুখ, সুন্দর সুঠাম দেহের গঠন, কাঁধের কাছে একটা তিল, বাঁ পায়ে একটা বিস্তৃত আঘাত চিহ্ন—ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। চারু অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "কি বোল্‌ছ তুমি, এ ত আমার অনিলের সঙ্গেই ঠিক মিলে যাচ্ছে।" সুনীল পত্রিকা হইতে চোখ তুলিয়া চারুকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে শিশুর মত বলিলেন, "তুমি ঠিক বল্‌তে পার যে সে অনিল? তোমার কোনও সন্দেহ নেই ত? আচ্ছা সে যে অনিল তুমি কি করে বুঝলে, এরকম চেহারা, তিল, চিহ্ন ত আরও থাকতে পারে!" চারু মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না তা হ'তে পারে না। সে অনিলই হবে। কি হয়েছে বল, অনিল ভাল আছে ত?" সুনীল উন্মাদের মত উচ্চহাস্যে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি সত্যি বোল্‌ছ যে সে অনিল!" চারু দেখিলেন অত্যধিক আনন্দে সুনীল অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে অনিলের সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে। তিনি সুনীলের মাথায় গোলাপজল ঢালিয়া, তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে আপনি পড়িয়া দেখিলেন—"আজ প্রায় একমাস অতীত হইল নির্ম্মলা নদীতে একটি বালক ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া আমি লোকদ্বারা তাহাকে আমার বজরায় উঠাইয়া লই। যুবকের দেহে প্রাণ ছিল, সেবা শুশ্রূষায় বহু কষ্টে তাহার চৈতন্য উৎপাদন করিলাম। আমি জমিদারী হইতে আমার বাড়ী পলাশপুরে ফিরিতেছিলাম। যুবক দু তিন দিন যাবৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট পরিচয় জানিতে না পারায় এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম। ইহার আত্মীয় কেহ থাকিলে পলাশপুর আমাদের বাড়ীতে আসিবেন। তাহার বয়স অনুমান চৌদ্দ পনর, বর্ণ গৌর, বড় টানা টানা চোখ, লাবণ্যমাখা মুখ, সুন্দর সুঠাম দেহ, কাঁধের কাছে একটা বড় তিল, বাঁ পায়ে একটা বিস্তৃত আঘাত-চিহ্ন ইত্যাদি। এ যে অনিল তাহা চারু ও সুনীল বুঝিতে পারিলেন। চারুর মুখে হাসি, চোখে জল আসিল। হায় যদি পলাশপুরের বাবুটি তাহাকে না দেখিতে পাইতেন তবে? পরিণামের আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সুনীল বহুদিন পরে আজ হাসিমুখে চারুর সহিত কথা কহিলেন, দুজনে বসিয়া কত সুখকল্পনা আকাশ কুসুম রচনা করিতে লাগিলেন।

সেদিন বৈকালে সুনীল, চারু ও রামচরণ সহ নৌকা যোগে পলাশপুরে চলিলেন। চারু কখনও নদী দেখেন নাই, বিশালকায় নদীর তরঙ্গায়িত সলিল রাশি দেখিয়া চারু কখন বিস্ময়ের ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া বলিলেন, "মাগো, অনিল ত এই নদীর ভিতর ভাসিতেছিল। ইস্, এ নদীর ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়া—সে ত কম সাহসের কাজ নয়! আচ্ছা, অনিল ত দুদিন আগেও ভূতের ভয়ে আমার আঁচল ধরে ফিরত, তার এত সাহস!" অনিল বলিলেন, "অবস্থা বিশেষে তা হয় বৈ কি! মানুষ যখন বুঝে যে সংসারে তার দরদী আত্মীয় কেউ নেই, তখনই সংসারের আসক্তি কমে যায়। সংসারে আসক্তি না থাকলে প্রাণের মায়াও কমে যায়, তখন দুর্ব্বল শিশু এবং নারীর প্রাণেও অসীম সাহস হয়।" চারু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, জলে ডুবে ম'রতে কষ্ট পায় না?" অনিল বলিলেন, "খুব বেশী কষ্ট পায়। একটু দম্ আটকে থাকলেই বুঝা যায় কেমন কষ্ট হয়। জলে যারা ডোবে তারা দম্ আটকে মরে।" কিরূপ কষ্ট তাহা অনুভব করিবার জন্য চারু নিশ্বাস বন্ধ করিলেন, পরক্ষণেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "বাপরে, জলে ডুবেও লোকে মরে। বরং আগুনে পুড়ে মরা ভাল।" সুনীল হাসিয়া বলিলেন "তাতে আরও কষ্ট।" মুখখানা বেজার করিয়া

চারু বলিলেন, "না পৃথিবীতে সুখে মরবার যো নেই। সুখে মরবার পথ একটি বই আর নেই।" হাসিয়া সুনীল বলিলেন "সে কি!" দুই হাতে স্বামীর পদরেণু মাথায় ধারণ করিয়া চারু বলিলেন, "এই চরণে মাথা রাখিয়া।" সন্ধ্যার সময় তাঁহারা পলাশপুরে পৌঁছিলেন। অনিল তখনও শয্যাগত ছিল।

অজস্র অশ্রুধারা, হর্ষোচ্ছ্বাসের ভিতর মিলনের প্রথম আবেগ কাটিয়া গেলে চারু সস্নেহে ডাকিলেন, "অনিল," তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন আকাশে মেঘখণ্ড দেখিলে আকুল পিয়াস ভরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে, বহুদিন পরে চির-আকাঙ্ক্ষিত এই স্নেহ সম্বোধনে অনিল তেমনই আকুল ভাবে চারুর দিকে চাহিল, নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না তাহার মনে হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

চারু সস্নেহে বলিলেন, "অনিল, এম্‌নি করে কি অভিমানের প্রতিশোধ নিতে হয়? আমি না হয় দোষ করেছিলাম কিন্তু তাই বলে কি এম্‌নি করে কাঁদাতে হয়? দেখ্‌ত ভেবে ভেবে আমাদের দশা কি হয়েছে" বাস্তবিক এই ক'দিনে সুনীল ও চারুর বয়স যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনিল কিছু বলিতে পারিল না, আনন্দের অতিশয্যে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। চারু বলিতে লাগিলেন "অনিল, তোকে আমরা বুঝতে পারিনি, তোর হৃদয়কে আমরা চিন্তে পারি নাই। না বুঝে তোর কোমল মনে ব্যথা দিয়েছি। উৎসব চাঁদ যেমন সময় সময় মেঘে আবৃত হয়ে অন্ধকার হয়ে যায় তেমনি কোথা থেকে একটা কে এসে কিছুকালের জন্য আমার হৃদয়টার স্নেহ বাৎসল্য ম্লান করে ফেলেছিল। সে মেঘ আপনি আপনি কেটে গেছে। এখন অনিল তোর অভিমান ভুলে একবার আমার বুকে আয়,—একবার আগের মত মা মা বলে ডাক। কতদিন সে মধুর ডাক শুনি নি। একবার বুকের ধন বুকে আয়, দেখি আর কে ছিনিয়ে নিতে পারে!"

চারু আর বলিতে পারিলেন না, প্রবল বন্যার ন্যায় অশ্রু-প্রবাহ তাঁহার নয়ন বাহিয়া চলিল। সুনীলও কাঁদিতে লাগিলেন। এই অশ্রু স্রোতে অনিলের অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল।

অনিল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, বসিয়া ধীরে ধীরে চিরআকাঙ্ক্ষিত, চিরশান্তির স্থল তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আর তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না মা, আমার পায়ের কাঁটা সরে গেছে, তোমার স্নেহের পথে যাবার আর কোনও বাধা নাই।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

পরলোকে আত্মার গতিবিধি

(৩)

পরলোকে নারীর অবস্থা।

পত্নী ও জননীর গুরুতর ভার বহন করতে হয় ব'লে শতকরা ত্রিশ জন নারী স্বাভাবিক বয়সের ১৫।২০ বছর পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। সময় কম হইলেও, বেশী দুঃখভার বহন করেন, বেশী ত্যাগ-স্বীকার করেন, এজন্য নারী দেহত্যাগের পর সম-অবস্থার পুরুষ অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন। কয়েকজন পরলোকগত আত্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"তোমার স্ত্রী কি তোমার সঙ্গে আছেন?" তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছে'ন,—"না, তিনি উন্নততর স্তরে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়। কয়েক জন বিখ্যাত ধর্ম-প্রচারকও পরলোক হ'তে ব'লেছেন, তাঁদের পত্নীগণ উন্নততর স্তরে বাস করেন। এরাজ্যের নিয়ম যাঁরা জানেন না তাঁরা মনে করেন, মৃত্যুর পরই স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হবে, কিন্তু তা হয় না। ইহলোকে পত্নীগণ একাকী যে গুরুভার বহন করেন, তারই ফলে, তাঁরা উন্নততর স্তরের যোগ্য হয়ে পরলোকে গমন করেন।

পরলোকে নারীর নারীত্ব লোপ পায় না, কেবল শরীরের অভাবে বাহ্য চিহ্ন লোপ পায় মাত্র। শরীরী সন্তানের শারীরিক সেবার পরিবর্ত্তে, নবজাত শিশু-আত্মার সেবার ভার তাঁদের বহন করতে হয়। অসংখ্য শিশু-আত্মা অযত্নে, অনাহারে, দুর্ঘটনায়, অকালে দেহ-ত্যাগ করে পরলোকে যায়,—এদের প্রত্যেকের সেবার

তার থাকে নারী আত্মাদের উপর ; এদের শিক্ষা, শুশ্রূষা সব করেন নারীগণ। এছাড়া নারী আত্মাগণ রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য তাদের কাছেও গমন করেন, কোনও ব্যক্তি একাকী প্রাণত্যাগ করে না।

শোকার্ত্ত কে আছ : উঠিয়া দাঁড়াও মুছে ফেল আঁখিজল,
আমার আলোকে দেখ মুখ তুলে মরণ অমৃত ফল।
জীবনের মাঝে জীবন বিকাশে দেখ না নয়ন মেলি
মরণের মাঝে নবীন জীবন, দেখ আবরণ ঠেলি।

দেহ-ত্যাগ কালে আত্মার অবস্থা।

আমি দেখলাম, তার শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, তার আত্মা ধূমপুঞ্জের মত, শরীর হ'তে বাহির হ'ল, একখানা মেঘের মত শরীরটার উপরে স্থির হ'ল, ধীরে ধীরে সেই মেঘ তার চেয়ারের মত আকারে ধারণ করলো। কিন্তু তখনও তাতে যেন চেতনা নাই, এমন বোধ হ'ল ; ক্ষণকাল পরে সেই মেঘের ভার মূর্ত্তি উদ্ভব হ'য়ে উঠলো, তারমধ্যে চেতনা ও জ্ঞানের সঞ্চার দেখা গেল,—সে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল, যেন নিজে কোথায় আছে তা ঠিক বুঝতে পারছে না। তারপর তার শবের চারিদিকে যে সব আত্মীয় ও বন্ধুগণ কাঁদছিলেন, তাদের পানে সস্নেহে ফিরে রইল ; ক্ষণকাল পরে আলোক-তরঙ্গে সে সরে যেতে লাগল। তখন তিনটি আত্মা তার সঙ্গে ছিল। অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব্বে সে আর একবার করুণ ভাবে প্রিয়-জনদের পানে চেয়ে চলে গেল। তখন তার সেই স্বচ্ছ দেহ প্রেমে ও আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়েছিল যেতে যেতে আরও কত আত্মা এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সব দেখে তার যেন বলে গেল—

প্রাণ মেঘ এই ভাবে কাটে,
যাবে যায় কত অবসানে,
ধীরে ধীরে দিন যুদে আঁখি,
উপকূলে তরঙ্গ মিলায়।
আশা ভয় দ্বন্দ্ব ছেড়ে যাই,
আলো ছায়া খেলা ছেড়ে যাই ;
চিরোজ্জ্বল প্রভাতের দেশে
যাই, ধরা চঞ্চলা, বিদায় !

জীবনের কার্য্য অবসানে
কারাগার ছেড়ে যায় প্রাণ ;—
স্বর্গ মর্ত্ত্য এসে সমস্বরে,—
মৃত্যুকাল সুন্দর কেমন !

সাধুর দেহ-ত্যাগ।

যাঁরা সাধু ভক্ত ও প্রেমিক, তাঁদের দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বেই অনেক আত্মা বিবিধ উপহার নিয়ে তাঁদের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা যেন আনন্দের প্রতি-মূর্ত্তি। আত্মা দেহ হ'তে মুক্ত হবা মাত্র, তাঁরা তাঁকে আবেষ্টন করে মহা আনন্দে অমর লোকে নিয়ে যান, সেখানে সকলে পরম আনন্দে তাঁকে বরণ করেন ; পূর্ব্বগামী আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'ন।

দেহ-ত্যাগের সময় আত্মা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, তার পর-জেগে দেখে তার অবস্থান্তর হ'য়েছে,—এসময় আত্মা-গণ অতি যত্ন সহকারে প্রতি আত্মাকে তার পরিবর্ত্তিত অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে।

আত্মার চিত্র।

ডাক্তার আল্‌ফ্রেড্ রাসেল্ ওয়ালেস্ সার্ উইলিয়াম্ ক্রুকস্ প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, অনেক পরীক্ষার পর পরলোকস্থ আত্মার সূক্ষ্ম দেহের ফটো তুলেছেন। আত্মার ছায়ামূর্ত্তি ফটোগ্রাফের কোমল ফলকে প্রতি-ফলিত হয়। সে মূর্ত্তি দেখে পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তি আত্মাকে বেশ চিনতে পারে। এখন এমন সপ্তাহ যায় না যে দু একজন পরলোকস্থ আত্মার ছবি তোলা না হয়। পর-লোকগত প্রিয় আত্মার ছবি ফটোগ্রাফে উঠতে দেখে কত শোকার্ত্ত হৃদয় শান্ত হ'য়েছে। আপনার গৃহে বিদেহী প্রিয়জনের আগমন ও বর্ত্তমানতা সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে, কত লোকের শোক আনন্দে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু যাদের জীবন অপবিত্র তাদের কাছে আত্মার প্রকাশ হয় না। পবিত্রতাই এ রাজ্যের মিলন ও সান্নিধ্যের প্রধান বিধি। (ক্রমশঃ)

অরফিউস্

এক সময়ে গ্রীসদেশে অরফিউস্ নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিল। কথিত আছে, গ্রীকরা যখন বাঁশী বাজাইতেন যমুনা তখন উজান বহিত। সেইরূপ অরফিউস্ যখন বীণা বাজাইয়া গান গাহিত তখন গাছ পালা সমস্ত এমন মোহিত হইয়া যাইত যে তাহারা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলিত। পাষাণময় পর্ব্বত তাহার গান শুনিয়া পুলকে কাঁপিয়া উঠিত। আর মানুষে যখন তাহার গান শুনিত তখন তাহাদের দুঃখ শুধু ভাবনা সব চলিয়া যাইত, তাহাদের প্রাণ সেই মধুর গানের মতই মধুর হইয়া উঠিত।

তাহার এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল। তাহার নাম ছিল ইউরিডাইস্। অরফিউস তাহার গান বাজনাকে যেরকম ভালবাসিত ইউরিডিসকে তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসিত। ইউরিডাইসেরও অনেক গুণ ছিল। শিশির-ধোয়া ফুলের মত তাহার রূপ আর বেলফুলের গন্ধের মত মিষ্টি তাহার স্বভাব।

একদিন ইউরিডাইস তাহার কয়েকজন সঙ্গিনী সহ ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল আর ফুল তুলিতেছিল : এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল হইতে একটা সাপ ফোঁস করিয়া বাহির হইয়াই তাহার পায় ছোঁ মারিল।

সঙ্গিনীরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে অরফিউসের কাছে লইয়া গেল। সে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই আর তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। অরফিউসকে কাঁদাইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল।

দুঃখে অরফিউসের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সে তখন তাহার বীণাটি ধীরে ধীরে হাতে তুলিয়া লইল ; সুখের গান, আনন্দের গান আর তাহার গলা দিয়া বাহির হইল না। সে এমন এক করুণ-গান গাহিল যে গাছপালা পর্ব্বত সমস্ত তাহার দুঃখে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল কাটিল কিন্তু অরফিউস আর সহ্য করিতে পারিল না। সে স্থির করিল ইউরিডাইসকে খুঁজিতে একবার পাতালপুরীতেই যাইবে।

'হেডিস' বা পাতালপুরী মৃতের দেশ, গ্রীকদের স্বর্গের রাজা যেমন জুপিটার, গ্লুটো ছিলেন তেমনি পাতালের রাজা। গ্লুটো আর তাঁহার রাণী প্রসারপাইনী সেখানে রাজত্ব করেন। কথিত আছে সে দেশে যাওয়া একরকম অসম্ভব। সেই অন্ধকারময় পাতালপুরীতে যাইতে হইলে মৃত্যুর নদী পার হইয়া যাইতে হয়। সে নদীতে একটি মাত্র নৌকা আছে, চেরণ তাহার নাবিক। সে-ই সমস্ত মৃতব্যক্তিদিগকে পার করিয়া লয়।

বীণাটি হাতে লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সে মৃত্যুর নদীর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। চেরণ তাহাকে কিছুতেই পার করিয়া দিবে না। তখন সে এমন করুণ এক গান গাহিল যে কঠিন-হৃদয় চেরণও চোখের জল রাখিতে পারিল না। চেরণ তাহাকে তখন মৃত্যুর নদী পার করিয়া দিল।

কিন্তু পাতালপুরীর দ্বারে অতি ভীষণ এক কুকুর থাকিত। তাহার তিন মাথা, তিন মুখ আর ছয় চোখ ; ভীষণ কদাকার, দেখিলেই ভয় হয়। অরফিউস্ কাছে আসিতেই সে ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে কামড়াইতে ছুটিল। কারণ, জীবন্ত অবস্থায় কাহারো সেখানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। অরফিউস্ অমনি তাড়াতাড়ি বীণাটি কাঁধে তুলিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল : এমন যে ক্ষ্যাপা কুকুর সে-ও তাহার গান শুনিয়া নিমেষের মধ্যে শান্তভাব ধারণ করিল। তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া কুকুরটা লেজ নাড়িতে লাগিল ও তাহার হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে সে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিল। তারপর অনেক অন্ধকার পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সেখানকার রাজা ও রাণীর সিংহাসনের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

জীবন্ত অরফিউস্‌কে সেখানে দেখিয়া রাজা গ্লুটো তো একবারে স্তম্ভিত ! কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অরফিউস্ হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী গাহিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সঙ্গীত এমনি করুণ ও প্রাণস্পর্শী হইল যে গ্লুটো ও প্রসারপাইনী সমবেদনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। গান শেষ হইলে গ্লুটো বলিলেন, "ইউরিডাইস্‌কে লইয়া পৃথিবীতে যাইতে

তোমাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু একটি কথা তোমাকে মনে রাখিতে হইবে, যতক্ষণ তুমি পাতালপুরীর সীমানা অতিক্রম না করিবে ততক্ষণ পিছন ফিরিয়া তোমার স্ত্রীর দিকে চাহিতে পারিবে না। যদি চাও, তবে আর তোমার স্ত্রীকে নিতে পারিবে না, তোমার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে।"

আনন্দের সহিত অরফিউস্ ইহাতে সম্মত হইল। তখন তাহাদের কাছে বিদায় নিয়া ইউরিডাইসকে লইয়া সে রওনা হইল। তাহারা প্রায় পাতালপুরীর শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন সময় অরফিউসের হঠাৎ কেন জানি মনে হইল যে তাহার স্ত্রী বুঝি ঘুরে পড়িয়া রহিয়াছে; অমনি আর কিছু না ভাবিয়াই সে পিছন ফিরিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল। কিন্তু হায়! হায়! সেই চাওয়া অমনি সে হঠাৎ দেখিল যে ইউরিডাইস অদৃশ্য হইয়া যেন ছায়ায় মিলাইয়া গেল!

কিন্তু আর সে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিল না। অনাহারে অনিদ্রায় সাত দিন সে সেখানে পড়িয়া রহিল, আর কেবল কাঁদিল। কিন্তু আর স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইল না। তখন সে উঠিয়া ধীরে ধীরে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল

এবার আর সে লোকালয়ে রহিল না। ইউরিডাইসই যখন নাই তখন আর লোকালয়ে থাকিয়া কি হইবে! সে তাই উচ্চ এক পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র একখানা কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। ক্ষুধা পাইলে গাছের ফল খাইত আর অন্য সময় বসিয়া বসিয়া বীণা বাজাইয়া বিরহ-মাখা গান গাহিত। পশু-পাখী এখন তার সঙ্গী। তাহারাও তাহাকে খুব ভালবাসিত। এইরূপ ভাবে নীরবে সে তাহার জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

একদিন সে পর্ব্বতের উপর বেড়াইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল কতকগুলি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক নাচিয়া নাচিয়া স্ফূর্ত্তির গান গাহিতেছে আর ফুল তুলিতেছে। তাহারা অরফিউসকে দেখিবামাত্রই অতি কঠোর স্বরে তাহাকে একটা হাল্কা আমোদের গান গাহিতে আদেশ করিল।

কিন্তু ইউরিডাইসের মৃত্যুর পর হইতে সে আর স্ফূর্ত্তির বা আনন্দের গান গাহিত না। কাজেই সে তাহাদের আদেশ পালন করিতে পারিল না। ইহাতে সেই নিষ্ঠুর অসভ্য মেয়েরা ভয়ানক রাগিয়া গেল এবং ঢিল লাঠি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তারপর তাহাকে টানিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল।

পশু-পাখী, গাছপালা, ফল ফুল, নদ নদী, গিরি পর্ব্বত সকলেই তাহার জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। জল-পরী বনপরীরা তাহার জন্য দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল।

কিন্তু অরফিউস এইবার আনন্দিত চিত্তে মৃত্যুর নদী পার হইয়া গেল। কেরণ বা সেই ভীষণ কুকুর, কেহই তাহাকে এবার বাধা দিল না। পাতালপুরীর দ্বারেই ইউরিডাইস তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অরফিউস্ ছুটিয়া গিয়া তাহার উপর পড়িল। এবার আর তাহার কোন ভয় নাই, কারণ, আর তো তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না তখন দুই জনে আবার পূর্ব্বের মত সুখে পাতালপুরীতে বাস করিতে লাগিল।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

নারী

সমুদ্র-মন্থন-জাত, দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
জরামৃত্যু-ভয়হারী, দেবভোগ্য-সুধা;
দুরন্ত-দানবদলে করিয়ে শাসিত
মিটা'য়েছে দেবতার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা।
মানব চাহেনি,—তবু হয়নি বঞ্চিত।
পুরাইতে তাহাদের অমিয়া-পিপাসা,
নারী-রূপে সুধা নিধি র'য়েছে সঞ্চিত;
মাতৃস্নেহে, পত্নী-প্রেমে তাহার বিকাশ।
ওগো নারি! বিশ্বে তুমি বিশ্ব জননীর
প্রেমপূর্ণ জনয়ের পুণ্য প্রতিচ্ছবি,—
(ধরে যদা ক্ষুদ্র দেহে নি শর শিশির
প্রভাতের সুধাদান দীপ্ত-রবি-ছবি)।
মানবের চিরারাধ্যা দেবী তুমি নারি,
রোগে শান্তি, শোকে অশ্রু, পিপাসায় বারি।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ছেলেমেয়েদের বিচারালয়।

ভারত-মহিলা

নর নারীর পূজাতে হয়েছে ভবে শ্রেষ্ঠতর। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or Godlike, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (Tennyson.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (বিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as duty. I am in earnest——I will not equivocate, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (William Lloyd Garrison)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও কর্ত্তব্যের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাদপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিলে কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩২২ | ৪র্থ সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাহিত্যের মূল ও ফল।

যখনই কোন মহৎ ভাব মানুষের প্রাণে জাগিয়াছে মানুষ সেই ভাবকে ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মূক ভাষা জীবন্ত ভাবের প্রবাহে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সমাজে নব চিন্তা, নব ভাব, নব জাগরণ আসিয়াছে, নব সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। আবার সেই সাহিত্য সমাজের কত পরিবর্ত্তন, কত সংস্কার কত উন্নতি বিধান করিয়াছে। নারীজাতির শিক্ষা, নারীর অধিকার ও নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে যত লোকের মনে যত মহৎ ভাব জাগে, তাহা যদি সে সব ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করেন, তা হ'লে এক জনের ভাব শত সহস্র জনয়ে ছড়াইয়া পড়িবে, সমাজ মধ্যে নূতন চেতনা জাগাইয়া তুলিবে।

আমরা চাই কি? চাই জগতের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ, সকলের কল্যাণ—এবং নারী সকলের জীবনের বিকাশ ও সার্থকতা। যে অন্ধ সে-ই দেখিতে পায় না যে সকলের কল্যাণ এক সূত্রে বাঁধা; যে ক্ষুদ্রচেতা সে-ই মনে করে, অপরের উন্নতিতে তার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। এই জন্যই জগতে এত দ্বন্দ্ব কোলাহল। কিন্তু উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাদের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, নারী কল্যাণ, সকলের কল্যাণ মানে, তাই চান। এই শুভ চেষ্টাই জয়যুক্ত হয়।

কি সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা, কি স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার, সকল বিষয়েই এই মহৎ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইলে, আমাদের পথ পরিষ্কার হবে। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি? মানুষ নিজের জীবনের মহত্ত্ব, সার্থক, শক্তি ও সম্ভাবনা (Potentiality) ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার

একটা স্পষ্ট সত্য জ্ঞান হবে, সকল বিষয়ে নিজে বুঝিতে শিখিবে; এবং নিজের বুদ্ধির ও মনের শক্তি সকলের বিকাশের ফলে আপনার উপর নির্ভর করিতে পারিবে। এই শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষের সকলের জন্য আবশ্যক। এ শিক্ষা ভিন্ন জীবন সফল হয় না, জীবনের কর্ত্তব্য সকলের জ্ঞান জন্মে না, কর্ত্তব্যপালনও সম্ভব হয় না। এ শিক্ষা ভিন্ন জীবন-সংগ্রামে বাঁচাই মুস্কিল। ছেলে মেয়ে কাহারো পক্ষে একটি সনাতন কুসংস্কার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষা ও শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমান বা বাঙ্গালী ইংরাজ বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, স্নেহ মমতা মানুষ মাত্রেরই পক্ষে এক প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে কেহ বেশী ঝাল খায়, কেহ কম খায়, কেহ টক খাইতে ভালবাসে, কেহ মিষ্টি খাইতে ভালবাসে, কাহারো চাওয়া সব, কাহারো পরম সত্য :— কিন্তু কার কি সত্য, কার পক্ষে কি হিতকর সে বোধটা সকলের পক্ষে সমান আবশ্যক এবং এই বোধশক্তির বিকাশ সকলের মধ্যেই এক। এই বোধ-শক্তির বিকাশে হিন্দু মুসলমান নাই।

আলোক, উত্তাপ, বুক ভরা বায়ু, অঙ্গ চালনা, লোক-সঙ্গ, যথেষ্ট খাদ্য, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, সকলেরই জন্য প্রয়োজন। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান বা স্ত্রীলোক ও পুরুষে কোন পার্থক্য নাই। আবার এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহের জন্য অর্থ সকলের পক্ষেই আবশ্যক। পিতা, স্বামী ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয় বর্ত্তমান থাকিলে, হয় ত নিজের জন্য কোন কোন ভাগ্যবতী রমণীর অর্থ উপার্জ্জন করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু যাঁর এইরূপ কেহ নাই, অথবা যাঁরা আছেন তাঁরাও অত্যন্ত দরিদ্র বা রুগ্ন বা বিপদে পতিত, সে স্ত্রীলোক কি করিবেন? এইরূপ শত শত সধবা বিধবা কুমারী স্ত্রীলোক বর্ত্তমান। যাঁর নিজের জন্য অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক নয়, তিনি নানা প্রকারে যাঁর শক্তি দ্বারা দীন দুঃখীদের উপকার তো করিতে পারেন, দরিদ্র আত্মীয় বন্ধুদের উপকার করিতে পারেন। এজন্য শিক্ষা চাই, শক্তির বিকাশ চাই, শিল্প বিজ্ঞান জানা চাই—পুরুষের মত স্ত্রীলোকেরও চাই।...বরং সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে স্ত্রীলোকের আরও বেশী চাই।

সৌভাগ্য বশতঃ কলিকাতায় এ বিষয়ে দিন দিন নারীশিক্ষার বিবিধ পথ উন্মুক্ত হইতেছে। সকল বড় নগরেই স্ত্রীশিক্ষার বিবিধ উপায় থাকা আবশ্যক। কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা নূতন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা—৮৩নং মাণিক তলা ষ্ট্রীটে "নারী শিল্প-শিক্ষালয়।" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই শিক্ষালয়ের সম্পাদক। আশাকরি, স্ত্রীশিক্ষার জন্য কলেজ ও সাধারণ স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ শিল্প-শিক্ষালয়ের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। এ বিষয়ে মহিলাদেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। মহিলাগণ মনে রাখিবেন, তাঁদের উন্নতি নিজেদের চেষ্টা-তেই করিতে হইবে। আত্মহিতের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য বঙ্গরমণীগণ সর্ব্বত্র জাগ্রত হউন। সম্মুখে নব যুগের নব প্রভাত আসিতেছে। যাঁদের প্রাণে সেই নব প্রভাতের অরুণরশ্মি প্রতিভাত হইয়াছে তাঁরা প্রাণের সেই জাগ্রত উদ্ভাস ভাবরাশিকে ভাষায় ব্যক্ত করুন, বিহঙ্গ কাকলির ন্যায় পদ্যে গদ্যে সাহিত্যে প্রকাশ করুন। রমণীগণ অবলা দুর্ব্বলা হইয়া থাকিবার জন্য নয়। নারী শক্তি, নারী জ্ঞান, নারী শ্রী— এই সত্যের পতাকা জাগ্রত নারীগণ তুলে ধরুন। নারী জাগ্রত হলে কি করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কুচবিহার মহারাজের মহারাণীবয় এবং শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রভৃতি দেখাইতেছেন এ দেশের নারীর কি কর্ত্তব্য, কি পথ। যাঁদের প্রাণে ভাব জাগিয়াছে, আলো জ্বলিয়াছে, তাঁরা ভাষায় তাহা ব্যক্ত করুন, সেই ভাব শত সহস্র জীবনে প্রসারিত হউক, সমাজে নব জীবন ফুটিয়া উঠিবে। সাহিত্যের মূল মানব হৃদয়ের জাগ্রত ভাবের মধ্যে; এবং সাহিত্যের ফল সমাজ ও জীবনের সংস্কার ও উন্নতিতে।

পারস্যে নারীজাতির অবস্থা।

মেরী মার্কোভিক্ নামক কোন মহিলা সম্প্রতি "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামক মাসিক পত্রে পারস্য রমণী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—পারস্য

রমণী কারাগারে বাস করে। অবরোধের কারাগারের সঙ্গে অজ্ঞতার কারাগার। অন্তঃপুরে সাজসজ্জা, যানে ও বিলাস-উপকরণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, প্রেম ও বিশ্বাসের অভাবে রমণীদের জীবনে স্ফূর্তি নাই। পরিবারের তো কথাই নাই, তারা তো পূর্ণমাত্রায় ক্রীতদাসী!

অতি সামান্য লেখা পড়া শিখিতে না শিখিতেই, মেয়েদের অবরুদ্ধ হওয়ার সময় হয়, আর পড়াশুনাও বন্ধ হয়। তারপর মার অথবা স্বামীর সেবা করাই তাদের জীবনের একমাত্র কাজ। বিবাহে মেয়েদের কোন হাত নাই। বিয়ের পর স্বামীই নারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু তাঁর দর্শন অতি দুর্লভ। অন্তঃপুরে দাসদাসী যা থাকে, তাদের নিয়েই পত্নীর দিন যায়, স্বামীর যখন খুসী হয়, অন্দরে আসেন। কত সময় সপ্তাহ ও মাস অতীত হয়, স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় না। এই গেল সাধারণ অবস্থা।

তারপর তিনি বিশেষ ভাবে তিন শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন—বড় লোক, বণিক এবং কৃষক। বড় লোকেরা প্রায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গিয়া শিক্ষা লাভ করে, বাস করে, সুতরাং তারা মেয়েদিগকে গান বাজনা, ইংরাজী ফরাসী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়; তারা ইউরোপীয় সমাজের অনেক রীতি নীতিও গ্রহণ করিয়াছে। মেয়েরাও উদার ভাব ও উন্নত শিক্ষাসম্পন্ন আত্মীয়দের সঙ্গগুণে এবং শিক্ষা-ফলে সে সকল বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর। এই শ্রেণীর সংখ্যা খুব কম হইলেও এঁরা নিজেদের মধ্যে সভা সমিতি করিয়াছেন এবং উন্নত প্রণালীতে সন্তান পালন, দেশের হিতসাধন প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষদের সহায় হইয়া উঠিতেছেন।

কিন্তু, বণিক-শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ বড় হতভাগা। তাদের টাকা আছে, বাড়ী ঘরও মন্দ নয়, দাস-দাসীও আছে—কিন্তু জ্ঞান নাই, সুখ নাই। শিক্ষার অভাবে, দ.স দ.সী, ছেলে পিলে, রান্না বান্না সব নিয়ে একটী প্রকাণ্ড জটলা পাকিয়ে তারা তাই নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত, অস্থির। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসের সম্বন্ধ নাই। স্ত্রী নানা কৌশলে স্বামীকে বশ করবার চেষ্টায় বিব্রত থাকে। মেয়েদের মধ্যে দেখা হইলে কেবলই আপন আপন দুর্ভাগ্যের কথাই বলা হয়। স্বামীর প্রেম নাই, ছেলেগুলা জ্বালাতন করে মেরে, দাসদাসীগুলাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

পরিব কৃষকদের গৃহে রমণীর ভাগ্য ভাল। তাদের দুঃখের জীবন সমস্ত পরিশ্রম দুঃখ, দম্পতি একসঙ্গে বহন করে, একসঙ্গে খাওয়া বসা, সুতরাং কৃষকের মেয়ে স্বামী স্ত্রীর মূল্য বোঝে, স্ত্রীকে জীবনের সহায় ও সঙ্গিনী বলিয়া জানে এবং ভালবাসে।

মোটের উপর, পারসিয়ার নারীদের অবস্থা অতি অনুন্নত। পর্দ্দা প্রথা আর শিক্ষার অভাব তাদের দুর্দ্দশার কারণ। কিন্তু ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় লোকদের ছেলেরা আর পর্দানশীন অশিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিতে চায় না; তারা আলাপে পরিচয় করিয়া পত্নী মনোনীত করিতে চায়, এবং খেলার পুতুল বা দাসীর পরিবর্ত্তে জীবনের প্রকৃত সঙ্গিনী চায়। তারা অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সব কারণে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কন্যাদের জন্য টেহরানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ফরাসী, জর্ম্মান, আমেরিকানদেরও কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। আশা হয়, অতি অল্প সময় মধ্যে পারস্য-রমণীদের বিশেষ উন্নতি হবে।

অবরোধ সমাধি।

অবরোধ প্রথা নারীদের সমাধি, নারী জীবন, নারী শক্তি বিকাশের গুরুতর অন্তরায়। "কুসিয়ল্" নামক পত্রের এপ্রিল সংখ্যায় এ বিষয়ে অতি সুন্দর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তার মর্ম্ম এই :—আর্য্যজাতি যখন ভারত-বিজয়ী উন্নতিশীল জাতি ছিল তখন সমাজে আর্য্য নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। তিনি কেবল গৃহের জননী, মঙ্গল বিধায়িনী ছিলেন না; তিনি আহত সৈন্যের সেবিকা, দর্শন-চর্চ্চার উৎসাহদায়িনী, এবং কৃষকের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা গৃহে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতেন। তিনি সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতেন এবং মাতৃমূর্ত্তিরূপে সকলের সম্মান লাভ করিতেন: পর্দ্দা কাহাকে ব'লে তাহা জানিতেন

না। যতদিন জাতির উন্নতি ও বিস্তৃতির যুগ ছিল, ততদিন আর্য্য রমণীর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল,—সকলে তাঁহাকে মাতার সমাদর প্রদান করিতেন। সব বিষয়ের সঙ্গেই রমণীর জীবন গাঁথা ছিল।

কিন্তু আর্য্যজাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজে নারীর স্থান ক্রমে নামিল নীচে, নারীর সম্মান গেল। নারীকে কারার বন্দিনী করা হইল!

তারপর লেখক ভারতবাসীদের বলিতেছেন—তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, পঞ্চার অন্তরালের দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রতিদিন তোমাদের বিনাশের কারণ বাড়াইতেছে? সময় থাকিতে জাগ, আর নারীকে বন্দিনী করিয়া অন্ধকারে রাখিও না। তাঁর উন্নত স্থান তাঁকে দাও, তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা তাঁকে দাও। যদি জগতে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, যদি মানুষত্ব চাও, স্বাধীন জাতির নাগরিক অধিকার সম্ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে আর দেরী করিও না।

স্ত্রী-শিক্ষা।

সম্প্রতি অনেক কাগজে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজী বাঙ্গলা কাগজে, কন্‌ফারেন্স্ প্রভৃতিতে, সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা হইতেছে। এটা শুভলক্ষণ। সম্প্রতি Indian Education (ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন) নামক কাগজে জি, ডি, নেম্‌লেকার নামক কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে এ দেশে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে সে কোন ফল হইতেছে না, শুধু তাই নয়, তাহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে, শক্তি ও অর্থের অপচয় হইতেছে। এ দেশের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার ফলে জীবনে কোন প্রকার সুবিধা করিতে পারে না!—এমন অদ্ভুত কথা শিক্ষিত লোকে দেখেন কি করিয়া? ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ সুগৃহিণী ও সুমাতা তো হইয়াছেনই; কর্ম্মক্ষেত্রে, শিক্ষাবিভাগে, সমাজের উন্নতি সাধনে তাঁরা দিন দিন দেশের শক্তিস্বরূপে পরিণত হইতেছেন। জাতীয় উন্নতির সঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি এমন নিবিড় ভাবে জড়িত যে, তাঁহাদের উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। স্ত্রী ও পুরুষ—জাতীয় জীবনের দুখানি পা। একটি পা খোঁড়া হইয়া থাকিলে, অপর পা সুদৃঢ় হইলেও যেমন বৃথা, তেমনি কোন দেশের পুরুষগণ খুব উন্নতি করিলেও, নারীদের উন্নতি ভিন্ন তাহাতে তেমন ফল হয় না। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, স্ত্রীজাতিকে বাদ দিয়া, মাতা, ভগ্নী ও পত্নীকে বাদ দিয়া, পুরুষদেরও প্রকৃত উন্নতি, শিক্ষা, চরিত্র গঠন বা কল্যাণ হয় না; কয়েকটী পরীক্ষা পাস করা ও চাকরী করা বেশ চলিতে পারে। পুরুষগণ খুব লেখা পড়া করেন, পরীক্ষা পাস করেন, অর্থ উপার্জ্জন করেন, ক্লাব্ চেঞ্জে যাওয়া, বৈঠক খানার যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্য সুখ আমোদের আয়োজন করেন—কিন্তু মেয়েদের বেলায় দ্বিতীয় ভাগ আর জমা খরচ, কয়েকখানি গয়না আর রন্ধন শালার ব্যায়াম, আর অন্তঃপুরে সেই সনাতন আর্য্য প্রথা অনুসারে ক্ষুদ্রতার অবরোধে দিন কাটান,—এমন করিয়া কি জাতীয় উন্নতি হয়! পুরুষ মানুষ যদি জ্ঞানী হয়, শিক্ষিত হয়, শক্তিশালী হয়, তার জ্ঞান, শিক্ষা ও শক্তি সর্ব্বত্রই কাজে লাগিবে। তেমনি নারী যদি শিক্ষিত জ্ঞানী ও উন্নত হয়, তারও শিক্ষা শক্তি ও জ্ঞান যে-কোন ক্ষেত্রে সে কাজ করুক তার কাজে লাগবে। পনের বছরের ছেলেটির শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি মাতার চিন্তারাজ্যের বাহিরে থাকে, তবে সেটা কি বড় ভাল অবস্থা? শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহের, আশার কথাই লেখা উচিত। শিক্ষা মানুষের জীবনে, কোন শ্রেণী-বিশেষ বা জাতি-বিশেষের জীবনে বৃথা হয়,—এ প্রলাপ শিক্ষা সম্বন্ধীয় কাগজে ছাপানই অন্যায়। উচ্চ শিক্ষা, বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কখনও মানুষের ক্ষতি করে না। টাকা উপার্জ্জন সব সময় হয় না। টাকা দিয়ে ফল বিচার নিতান্ত হীন নীতির কাজ। শিক্ষার ফল সব সময় হাতে পাওয়া যায় না, কিন্তু জীবনে তার প্রভাব দেখা যায়।

লেখক মনে করেন যে উচ্চ শিক্ষা পাইলেই মেয়েরা কেবল প্রজাপতি সেজে উড়ে বেড়াবেন। এইরূপ অন্ধ

সংস্কার অনেক শিক্ষিত লোকের আছে। কিন্তু শিক্ষিত নারীদের মনে পুরুষদের সম্বন্ধে এইরূপ কোন ভ্রান্ত সংস্কার দেখা যায় না। অশিক্ষিতা মেয়েদের মনই পুরুষ জাতি এবং বিশ্ব সংসার সম্বন্ধে নানা কল্পনা জল্পনার পূর্ণ। উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে মেয়েরা যেন আর মাতৃ ভাষার কথা বলবেন না, ঘরদ্বার পানে চাইবেন না! এ অদ্ভুত ধারণার একমাত্র মূল অজ্ঞতা। তবে একথা ঠিক যে, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ ঠিক অশিক্ষিতা কোণের বৌটির মত হইয়া থাকিতে পারেন না! তাহা হইলেই কি শিক্ষার গৌরব হইত? শিক্ষিত পুরুষগণ কি উচ্চশিক্ষার ফলেই অশিক্ষিত ব্যক্তিদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন নাই? শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলে শিক্ষার তো কোন আবশ্যকতাই ছিল না। শিক্ষাহীন লোকে জীবনকে যে চক্ষে দেখে, শিক্ষিত লোকেও যদি সেই চোকেই দেখে, তা হ'লে সে শিক্ষা বৃথা। আমাদের এই হতভাগা দেশে হাজার জীবনে এ ব্যর্থতা অতি স্পষ্ট। আমরা কি শিক্ষিতা মেয়েদের জীবনেও এই ব্যর্থতা দেখিতে চাই? শিক্ষার ফলে, উচ্চশিক্ষার ফ'লে, জীবনে, সমাজে, গৃহে, আহারে, বিহারে, আকাঙ্ক্ষায় ও আচরণে যদি পরিবর্ত্তন না আসে, উন্নতির পথ যদি উন্মুক্ত না হয়, সব যদি পূর্ব্বের মতই থাকে, তাহা হইলেই বলিব, শিক্ষা বৃথা হইয়াছে। অজ্ঞতাই মৃত্যু, জ্ঞানই জীবন। জীবন মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া যাহারা ভীত হয়, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়।

৺ শিবকামসুন্দরী নটরাজন।

বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "ভারতীয় সমাজ সংস্কারক" (Indian Social Reformer) পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটরাজনের গুণবতী পত্নী গত ১২ই জুন রাত্রি ৯টার সময় হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। প্রায় ২৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি প্রথম বোম্বাই নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি অতি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা, ইংরাজী লেখাপড়াও জানিতেন না; সুতরাং তাঁর চালচলন অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু, পতি-প্রেম তাঁহাকে ক্রমশঃ উদারতার ও মহত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী সকল বিষয়ে উদারনৈতিক ও সর্ব্ববিধ সংস্কারে মত ও বিশ্বাস অনুসারে কাজ করেন। এই গুণবতী রমণী ধীরে ধীরে স্বামীর মত, বিশ্বাস ও উন্নত আদর্শ বুঝিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার সকল কাজে তিনি স্বামীর ও সমাজের সহায় হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারকগণের জন্য তাঁর দ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকিত। তিনি কত নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন কত বালবিধবাকে আশ্রয় দিয়া, শিক্ষা দিয়া পরে বিবাহ দিয়াছেন। "সেবাসদন" প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, তিনি নিজের বাড়ীতে পাড়ার স্ত্রীলোকদের জন্য সেলাই ও অন্যান্য কাজ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এদেশী ও বিদেশী সকলেই তাঁর কাছে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা পাইতেন। বোম্বাইবাসীদের সকল শুভ অনুষ্ঠানে তিনি একজন বিশেষ সহায় ছিলেন। কন্যাগণকে তিনি উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁর বড় মেয়ে বি, এ, পাস। একজন গ্রাম্য সঙ্কীর্ণচিত্ত কুসংস্কারের অনুগত মহিলা, ইচ্ছা করিলে, গুণমতির অনুগত হইলে, পতি-প্রেমে আত্মসমর্পণ করিলে, যে কত দূর উন্নতিলাভ করিতে পারেন, এবং দেশের কত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তিনি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৺ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত-মহিলার লেখক এবং "কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত", "গৃহের সুখ" প্রভৃতি পুস্তকের গ্রন্থকার, শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন, সেখানে, এত অল্প দিনের মধ্যে বি,এ, এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বিখ্যাত মুসিটানিয়া জাহাজের সঙ্গে তিনি সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছেন। বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া

তিনি জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এবং দেশের কল্যাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেশে আসিতেছিলেন। তাঁর পিতা মাতা, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্র কন্যা ও আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই, এমন উন্নতি-শীল জীবনের অকাল অবসানে শোকার্ত্ত ও চিন্তিত। ভগবান পরলোকে তাঁর সকল উন্নত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করুন, এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনগণকে শান্তি দান করুন।

মেরী সিকোল্

যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, দূরদেশে আহত সৈন্যদের সেবার জন্য ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেল জগতে বিখ্যাত। মেরী সিকোলও তাঁর সঙ্গে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, প্রাণপণ করিয়া আহত সৈন্যদের সেবা করিয়াছিলেন। এই সেবাপরায়ণা নারীর জীবন সেবাধর্ম্মের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মেরী সিকোলের পিতা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। তিনি জ্যামেকায় গিয়া সেখানকার একজন সেরেষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে-ডাক্তারকে বিবাহ করেন। মেরীর মার একটী বোর্ডিং ছিল। সেখানে অনেক ইংরাজ সপরিবারে থাকিতেন। ঐ বোর্ডিং সৈনিক কর্ম্মচারী-দেরও একটা প্রধান আড্ডা ছিল। মেরীর মা বোর্ডিং চালাইতেন এবং নানা রকম রোগের চিকিৎসাও করিতেন। তাঁর ঔষধ ছিল সে দেশী গাছ-গাছড়া। এই ঔষধে অনেক ইংরাজ রোগমুক্ত হইতেন। মেরী তার মার অনুকরণ করে সর্ব্বদাই ঔষধ প্রস্তুত করিত, তার পুতুলদের খাওয়াইত, হাতে পায়ে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিত; কত সময় কুকুর বিড়াল ধরিয়া আনিয়া তাদের উপর তার ডাক্তারি চালাইত, এবং সময় কখন পরিচিত লোকদেরও তার ঔষধ খাইতে বলিত।

রোগীর সেবায় মেরীর অনুরাগ দেখিয়া, সে একটু বড় হইলে—প্রায় ১০।১২ বছরের হইলে—তার মা তাকে তাঁর সঙ্গে রোগীদের কাজ করিতে বলিতেন, ক্রমশঃ তাদের সেবাও করিতে দিতেন। সে খুব মন দিয়া ঔষধ খাওয়ান, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রোগীর নানা প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট দূর করা দেখিত এবং নিজে খুব যত্ন করিয়া সে সব কাজ করিত। এমনি করিয়া অতি অল্প বয়সে মেরী একজন পাকা শুশ্রূষাকারিণী হইয়া উঠিল।

এই সময় দুইবার ইংলণ্ড এবং আরও কোন কোন জায়গা ঘুরিয়া আসিয়া, মেরী আবার তাঁর মার সঙ্গে বোর্ডিংএর রোগীদের সেবায় লিপ্ত হন। এই রোগীদের একজনের সঙ্গে মেরীর বিবাহ হইয়াছিল। বিয়ের অল্প দিন পরেই মেরীর স্বামী এবং তারপর তাঁর মা দেহ-ত্যাগ করেন। তখন মেরী একলাই মার বোর্ডিংএর কাজ চালাইতে লাগিলেন। বড় বড় ইংরাজ ডাক্তারগণ তাঁর দক্ষতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন, এবং নানাপ্রকারে শুশ্রূষা কার্য্যে তাঁর সাহায্য করিতেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জ্যামেকায় ভয়ানক কলেরা হয়। মেরী এর পূর্ব্বেই গরিব দুঃখীদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এখন তিনি একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়া দিনরাত পরিবেদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁর সেবায় ও যত্নে অনেক সহায়হীন নরনারী রক্ষা পাইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, মেরী তাঁর ভাইএর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ক্যালিফর্ণিয়ায় গেলেন। সেখানে যাওয়ার কয়েক দিন পরে, একজন স্পেনবাসী একদিন রাত্রে মেরীর ভাইএর বাসায় নিমন্ত্রণ খাইয়া গেল এবং নিজের বাসায় গিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িল ও পর দিন মারা গেল। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, মেরীর ভাই তাহাকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ খাওয়াইয়াছে! মেরী তাহা শুনিয়া সেই মৃতদেহ দেখিতে গেলেন, এবং দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তার কলেরা হইয়াছিল। মেরীর কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে দুজন তিনজন করিয়া ক্রমশঃ কলেরা ভয়ানক হইয়া উঠিল; তখন সকলেই মেরীর কথাই ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিল। সেখানে একজনও ডাক্তার ছিল না। মেরী কলেরা রোগীদের চিকিৎসা ও সেবায় লাগিয়া গেলেন। দিনরাত, এক ঘণ্টাও বিশ্রাম নাই, মেরী সেবা করিতে

লাগিলেন। যাদের টাকা আছে তারা টাকা দিত, যাদের নাই, তারা কিছু দিত না। কিন্তু মেরী বড় লোক ও গরিব বলিয়া সেবা শুশ্রূষার কোন পার্থক্য করিতেন না। এরূপে অনেক লোককে বাঁচাইয়া শেষে তাঁরই কলেরা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিলেন।

তারপর মেরীর আমেরিকাবাসী বড়লোক রোগিরা তাঁকে ধন্যবাদ দিবার জন্য একদিন এক ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। সেই ভোজের প্রধান বক্তা বলিয়াছিলেন—"আজকার এই আনন্দের দিনে, আমাদের দুটি কষ্টের কারণ আছে;—১ম—শ্রীমতী সিকোল্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রজা ন'ন, এবং ২য়—ভগবান তাঁর গায়ের রং পীতবর্ণ ক'রেছেন; তিনি একবারে শ্বেত বর্ণ ন'ন—এ কি কম দুঃখের কথা! কিন্তু তিনি যে একবারে কালও ন'ন এতেই আমাদের আনন্দ! যদি কোন উপায় থাকত আমরা তাঁর গায়ের রং বদ্‌লিয়ে আমাদের সমাজের যোগ্য করে নিতাম।" এইরূপ অভদ্র সম্ভাষণের উত্তরে মেরী বলিয়াছিলেন—"আপনারা আমাকে এই ভোজে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন ব'লে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি যা কিছু করেছি, সে বিধাতার দয়া। আমার বর্ণ সম্বন্ধে যে কথা বলা হ'য়েছে তার উত্তরে আমি এই মাত্র বল্‌তে চাই যে আমার রং একবারে কাল হ'লেও আমি দুঃখিত হতাম না; এবং আমার রং শাদা করা সম্ভব হ'লেও আমি সে অনুগ্রহ নিতাম না: আর আমার গায়ের রংএর জন্যে যদি কোন সমাজে আমি যেতে না পেতাম সে জন্য একটুও দুঃখিত হতাম না। আমেরিকাবাসীগণ ভদ্রতা শিখুক, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

তারপর, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, জ্যামেকায় ফিরিয়া গিয়া, মেরী দেখিলেন সেখানে পীত জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। আবার মেরী রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার সমর-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। এই সময় রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধে। রুগ্ন ও আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য মেরী ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। মেরীর বাসনা ছিল, জ্যামেকার অনেক সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারী তাঁর চিকিৎসার পরিচয় পাইয়াছেন, সুতরাং সমর-বিভাগ তাঁহাকে সৈন্যদের সেবার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিশ্চয় পাঠাইবেন। কিন্তু তিনি শ্বেতবর্ণ নহেন বলিয়া তাঁকে কোন মতেই নেওয়া হইল না; বার বার তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হইল! শেষে তিনি নিজেই ব্যালাক্লাভায় গিয়া একটা হোটেল খুলিলেন। পূর্ব্বপরিচিত সৈনিক কর্ম্মচারীগণ সমর হাসপাতাল ছাড়িয়া তাঁর হোটেলে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। একদিকে হোটেলের ব্যবস্থা, হোটেলের আহত ও রুগ্ন কর্ম্মচারীদের সেবা, অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া, গোলা-বৃষ্টির মধ্যে আহত সৈন্যদের নিয়া আসা, যাদের শেষ সময় উপস্থিত তাদের ভগবানের নাম শুনান, এই সব করিতে লাগিলেন।

এই সময় সুবিখ্যাত ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ সৈন্যদের হাসপাতালের প্রধান সেবিকা ছিলেন। একজন বড় ডাক্তার মেরীর দক্ষতার বিষয় জানিতেন; তিনি একখানা পত্র লিখিয়া মেরীকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তো স্বাধীন ভাবেই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং কাজের অন্ত ছিল না; তবুও নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। তিনি যখন হাসপাতালে পৌঁছালেন, তখন নাইটিঙ্গেল তাঁর কাজে ব্যস্ত, সুতরাং মেরীকে অপেক্ষা করিতে বলা হইল। মেরী-বৃথা বসিয়া না থাকিয়া হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক আহত সৈন্য তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলে, তিনি তাহাদিগকে আশা ও উৎসাহ দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন, এবং কোন কোন সৈন্যের ব্যাণ্ডেজ আলুথা হইয়াছে দেখিয়া সেগুলি ঠিক করিয়া দিতে লাগিলেন। একজন ডাক্তার হঠাৎ মেরীকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে দেখিয়া ধম্‌কাইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া শেষে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে মেরীর সাক্ষাৎ ও কাজকর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল; মেরী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলেন।

ব্যালাক্লাভায় মেরী ডাক্তারদের সঙ্গে আহত সৈন্যদের সেবা করিতে লাগিলেন। কোন দিন কোন সৈন্যের ব্যাণ্ডেজ শক্ত করিয়া বাঁধা হইয়াছে বলিয়া সে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, তাহার ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া দিতেন,

আর, সে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিত। কোন দিন কোন সৈন্যকে দুঃখিত দেখিয়া একটু চা দিতেন আর সে যেন নূতন প্রাণ লাভ করিত। তিনি সর্ব্বদা আহত ও রুগ্নদের কিসে যাতনা কম হইবে, একটু আরাম হইবে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং নানা উপায়ে তাহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। এখানেও অর্থশালী বড় বড় কর্ম্মচারী এবং সাধারণ সৈন্যের মধ্যে তিনি কোনরূপ পার্থক্য করিতেন না।

যুদ্ধক্ষেত্রে কত সৈন্য মৃত্যুকালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রিয়জনেরা যেন তাহাদের শেষ শুভ ইচ্ছা জানিতে পারে। মেরী এই অনুরোধ সকল সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

রাশিয়ার আহত সৈন্যদেরও তিনি সেবা করিতেন; শত্রুপক্ষ বলিয়া অবহেলা করিতেন না। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত সৈন্যদের সেবা করিয়া মেরী নিঃসম্বল অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সেবায় ও যত্নে মুগ্ধ সৈন্যগণ স্বইচ্ছায় তাঁহার জন্য চাঁদা তুলিয়া তাঁহার প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

অবরোধ

৪র্থ অধ্যায়।

শেষ রাত্রি। মূর সেনাপতির শিবিরে মহা ধুম-ধাম। নিশ্চয় ভ্যালেন্সিয়া হস্তগত হবে। চারি-দিকে অসংখ্য সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত। একটি সুসজ্জিত শিবিরে সেনাপতি আব্দুল্লা, এবং ভ্যালিন্সিয়া-রাজপুত্রদ্বয়— আলফোনসো এবং কার্লোস্ উপস্থিত।

আব্দুল্লা—ছোট মুখে বড় কথা; হে ক্ষুদ্র বালক,
মৃত্যু কি দেখেছ কভু আপনার চোখে!
পঞ্চদশ বছরের সুকুমার দেহ,
বদনমণ্ডলে মাখা আনন্দ সুষমা,—
জাননা আঘাত, দুঃখ, মৃত্যু কি ব্যাপার।
চড়েছ ঈগল নীড়ে, পর্ব্বত উপরে,
অথবা বিঁধেছ বাণে ক্ষুদ্র ছাগ মেষে,
এই তো বীরত্ব তব! তবু ভয় নাই,
দাঁড়ায়ে বীরেন্দ্রদল-সেনাপতি পাশে!

আলফোন—বীরের শোণিতে জন্ম, বীরকুল মাঝে
বর্দ্ধিত নির্ভয়ে আমি, পক্ষত উপরে
সংগ্রাম-বিজয় ক্ষেত্র নিত্য দরশন,
প্রাচীন গৌরব গীতি কণ্ঠস্থ আমার।
ভয় কি তোমার কাছে মূর সেনাপতি!

আব্দুল্লা—দেখেছ সংগ্রাম ক্ষেত্র—রণ কোলাহল
মিশে গেছে যথা পূর্ণ বায়ুর নিস্বনে,
বিস্তৃত সমাধি যথা বনফুলে ঢাকা!
কিন্তু হে বালক, বল দেখেছ কখন
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝার অগ্নি উৎপাদন,
ভূলুণ্ঠিত ছিন্ন শির, অশ্ব পদাঘাতে
উন্নতমস্তক বীর যায় গড়াগড়ি?
দেখেছ এমন মৃত্যু! দেখেছ কখন?

আলফোন—জন্ম মম হয় নাই মেষপাল-গৃহে,
শিখিনি তাদের সঙ্গে নিয় ভূমি মাঝে
কৃষি ক্ষেত্রে গোচারণে করিতে যাপন।
রাজবংশে জন্ম মম,—যাবাকাল হ'তে
রণভেরী ঘননাদ অস্ত্র ঝক ঝকি
বস্ত্রপরিহিত সৈন্য বীরকুল মাঝে
করেছি যাপন; আমি অশি ভয় ধরে
নামিতে সমর ক্ষেত্রে সমর্থ, প্রস্তুত;
কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা বিনা সে সুখে বঞ্চিত—
নতুবা সাক্ষাৎ হ'ত সমর অঙ্গনে।

আব্দুল্লা—শিশু তুমি! জাননা যে আরও কতরূপ
ভয়াবহ দৃশ্য আছে মানব জগতে!
রণবাদ্য জয়ধ্বনি উৎসাহ বচনে
পূর্ণ নভোতল যবে, বিজয় গৌরবে
মৃত্যু সুখকর। কিন্তু সকলের ভালে
ঘটেনা তেমন মৃত্যু, গৌরব-মণ্ডিত।
কত বীর, সৈন্য সেনাপতি বন্দীবেশে,
শৃঙ্খলিত হস্তপদ, মৃত যন্ত্রণায়—
শবাকারে ভূপতিত নীরব অচল,—
অতিক্রম ক'রে যায় বধ্য ভূমি পানে,—

অবনত উচ্চশির, কাতর নয়নে
শেষ দৃষ্টিপাত করে সুন্দর জগতে,—
দাঁড়ায় মৃত্যুর তরে যশোভাতি হীন,—
ঘৃণ্য ছাগসম মৃত্যু ; দেখেছ বালক ?

আলফো—(ভাইএর প্রতি) লক্ষ্মী ভাই ! ভয় নাই,
হ'য়ো না কাতর, দয়াময় ভগবান সহায় মোদের,
বীরকুলে জন্ম ভাই, বীরের সন্তান কেননা শত্রুর
কাছে, দৃঢ় কর মন !

আব্দুল্লা—উচ্চ, অতি উচ্চ, দৃঢ় কঠিন হৃদয়
নত হয় সুকৌশলে। দেখ চিন্তা ক'রে
হে বালক, শোন কথা চাও কি বাঁচিতে ?
নগর প্রাচীর নিম্নে দাঁড়ায়ে, কাতরে
চাবে কি জীবন-ভিক্ষা তব পিতৃপদে ?
অথবা মরিতে চাও প্রিয় ভ্রাতৃসহ ?

আলফো—মূর-সেনাপতি ! শিশু আমি, কিন্তু বৃথা
ভয় প্রদর্শন তব। পাহাড়ে পাহাড়ে
আমি করেছি ভ্রমণ, দেখেছি কৃষকে
ব্যস্ত কাজে, কিন্তু মুখে বিজয়-সঙ্গীত ;
নদীতে পাহাড়ে বনে শস্যক্ষেত্র মাঝে,
কুটীরে প্রাসাদে এক ভাব, এক গান ;—
প্রাচীন সঙ্গীত যত বীরত্ব কাহিনী,
মহাবীর "গীড্"-যশোগাথা, কি প্রকারে
মহাবীর মহাযুদ্ধে পশি, অসি করে
দীর্ঘ শিরস্ত্রাণধারী শত্রু দলে দলি,
মূররাজ হস্ত হতে, টিকোনা উজ্জ্বল
করেছিল অধিকার ; সেই অস্ত্রাঘাতে
পরাজিত শত্রুকুল ; বীর শিশু আমি,
বীর কুলে কালী দেব তুচ্ছ প্রাণ তরে ?

[একজন মূর সৈন্যের প্রবেশ]

সৈন্য—ভ্যালেন্সিয়া হ'তে প্রভু দূত দুই জন—

আব্দুল্লা—শীঘ্র আন দুইজনে এ শিবির মাঝে।

সৈন্য চ'লে গেল, এবং ক্ষণকাল পরে দূতবেশী রাণী এলমিনা এবং সহচরবেশী পুরাতন ভৃত্য ডিগোকে সঙ্গে করে', আবার ফিরে এলো। কার্লোস্, ডিগোকে চিন্‌তে পেরে তার দিকে হাত বাড়িয়ে কেঁদে ফেল্লে—

কার্লো—ডিগো ! তুমি ! ডিগো, আমি যাব মার কাছে !
নিয়ে চল ; রুক্ষ বর্ণ দেহ, লাল চোক,
নিষ্ঠুর ভ্রুকুটি ক'রে চাও মুখপানে।
তুমি ভালবাস মোরে, তুমি ভাল দাদা,
সঙ্গে করে নিয়ে চল মার কাছে মোরে।

আব্দুল্লা—চুপ !—কি খবর রাজদূতগণ ?
সন্ধির প্রস্তাব লয়ে এসেছ তোমরা ?
তোমাদের প্রভু নতশির এত দিনে ?
হয়েছে কি শুভমতি ? এ নগর দিয়ে
যাচাবেন সুকুমার শিশু-প্রাণ দুটি ?

আলফো—ব'লোনা ব'লোনা হেন কথা মুখ ফুটে' !
কিন্তু, কেন এসেছ এখানে বল শুনি !
কিন্তু যদি তাই হয়,—ঘৃণা লজ্জাভরে
তপ্ত অশ্রু ঝরিবে নয়নে ! যদি তাই হয়,—
যাও, ফিরে যাও, গিয়ে ব'লো তাঁর পায়,—
এক যুদ্ধ অশ্ব আর তরবারি ছাড়া
কিছুই না চাই আমি ! শিকারে ভোজনে
পাহাড়ে জঙ্গলে গৃহে আনন্দ উৎসবে
তাঁর পাশে নাই স্থান মম ! কিন্তু, না না !
অসম্ভব ! অপরাধ এ চিন্তা আমার !—
বৃথা আশা তব মূর ! গীড-বংশোদ্ভব
মহাবীর পিতা মম ; আমি পুত্র তাঁর,
বীরের মতন প্রাণ দিব বিসর্জন !

রাণী—মরি, মরি, সুকুমার এমন শৈশব,
এখনি মরিবে বাছা ! কি হ'য়েছে তব !
কেন এজীবনে গ্লানি ! জীবনের ফুল
না ফুটিতে, ঘৃণাভরে ফেলে দিতে চাও ?

আলফো—(সবিস্ময়ে) একি ! কার কণ্ঠস্বর !—

আব্দুল্লা—আগন্তুক ! ছদ্মবেশী ! দাও পরিচয় !

রাণী তৎক্ষণাৎ উপরের পরিচ্ছদ, শিরস্ত্রাণ, খুলে ফেলে দুই ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে পাগলের মত বল্‌তে লাগলেন,—

রাণী—বাছা মোর ! প্রাণ মোর ! হৃদয়ের মণি !
নীরব গম্ভীর কত সুখ দুঃখ মাঝে,
কত চিন্তা অকথিত কল্পনা অতীত,

বুকে ক'রে প্রাণ দিয়ে করেছি পালন !
আবার ধরেছি বুকে, দেখে চাঁদ মুখ
নয়নের জ্যোতি মম কত বরষের
দুঃখিত-স্পন্দন মম পেয়েছি জীবন,
প্রাণ যদি দিবি তোরা আমি সঙ্গে দেব।

কার্দো—(জড়িয়ে ধরে) মা মা মা আমার,
আর তো যাবে না ছেড়ে !

আব্দুল্লা—আর না, এ অভিনয় যথেষ্ট হয়েছে !
নারী, তুমি কি আশায় এসেছ এখানে ?—
বীরবৃন্দ মাঝে আমি বীরেন্দ্র-কেশরী,
কি সাহসে এলে তুমি এ শিবির মাঝে ?

রাণী—বর্ম্মপরিহিত বক্ষ বর্ষারোধকারী,
তা ছাড়া সাহস নাই অন্য বক্ষ মাঝে
এই বুঝি ভাব তুমি ! জাননা অদ্ভুত
কত প্রকৃতির লীলা ? বীর সেনাপতি !
হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা হ'ল আসিব শিবিরে
সব বাধা অতিক্রমি :—বীর যোদ্ধাগণ
মরণে নির্ভীক যারা ডরে যার নামে,—
চিন্তাহীন—জ্ঞানহীন—এসেছি এখানে !
তুমি মহাবীর, কিন্তু আমার মতন
এক মহাভাবে মম হৃদয় যাহার
তার শক্তি শ্রেষ্ঠতর রাজশক্তি হ'তে !—
এসেছি মরিতে মম যাহাদের সাথে।

আব্দুল্লা—নির্ব্বোধ পাঠান, এই বলে তব ধর্ম্মে !—
প্রাণ দেবে কেন বৃথা ? কেন, বাঁচাবার
বাঁচিবার কোন পথ নাই কি তোমার ?

রাণী—প্রার্থনা, চক্ষের জল, বুক ভরা ব্যথা
সম্বল আমার ! আর প্রভু ভগবান,—
যাঁর শক্তি আজ কিংবা দু'দিনের পর
মুকুট ভূষিত শির ধূলাতে মিশায়,—
যাঁর বিধি এই সব করে সংঘটন
শুধু প্রাণে শুনাইতে সত্যের বচন !
হয়ত তোমার ভাগ্যে, বেদনা পীড়নে
হয় নাই শিক্ষা লাভ ; হৃদয় তোমার
র'য়েছে কঠিন ; তাই অন্যের পতনে,
অন্যের ক্রন্দনে হয় আনন্দ তোমার !

[খুর সেনাপতির পদতলে পতিত হ'য়ে]
সেনাপতি, রণজয়ী ! পদতলে তব
দেখ বীরবংশে জাত রাজার মহিষী,
শত্রু তুমি, তবু পদতলে লুণ্ঠিত !
ডাক তব বীরকুলে, দাসদাসীগণে
দেখাও আমার দশা, যাক্ গৌরব
তব। কিন্তু ছেড়ে দাও পুত্র দুই জনে !

আব্দুল্লা—(মাকে উঠাবার চেষ্টা করতে করতে)
বিধর্ম্মী দেশের শত্রু অসভ্য বর্ব্বর,
তার কাছে নতজানু, একি শোভা পায়
মা আমার ! উঠ উঠ, হাসে শত্রুকুল,
এইরূপে বংশে কালী ক'রোনা লেপন !

আব্দুল্লা—নির্ভীক বালক তুমি ! কিন্তু গাববান্
যে বাহুর পরাক্রমে শৃঙ্খলিত তুমি
অবরুদ্ধ নিষ্পেষিত মৃতপ্রায় দেশ,
সে বাহু ভাঙ্গিতে হবে শুশিক্ষা তোমার,
ভদ্র ভাষা ব্যবহার জানিবে অচিরে !

রাণী—চুপ্ কর্ বাবা !—ওগো সেনাপতি,
দয়া কর দুঃখিনীরে ! ক্ষমা কর বীর,
সন্তানে আমার, সে যে উচ্চকুলজাত !
তবু শোন শোন মোর কথা ক্ষণকাল !
আর কেও নাই তব যার কথা ভেবে
কাতর ক্রন্দন তুমি শুনিবে আমার !
প্রেমিক যে, প্রেমাস্পদ বিনে চিত্ত তার
হ'য়ে উঠে ঘোর তীব্রতর ! একি সাজে,—
ক্ষুদ্র নর মৃত্যুর অধীন, পদে পদে
ভয়, কবে বিধি বিধাতার কি ঘটায়,
রোগ শোক-পরানত, একি সাজে তার,
অন্যের হৃদয় ব্যথা কাতর ক্রন্দনে
রুদ্ধ করা হৃদয়ের দ্বার !—বীর তুমি,
মহাবলী, কিন্তু হায়, কে জানে কখন
আসিবে সেদিন যবে, সৈন্যদল সহ
পড়িবে এমন স্রোতে, তৃণাবর্ত্তসম,
বক্ষ অদি খরশান তুচ্ছ হ'য়ে যাবে,

নহে অসম্ভব !—আজ রক্তাক্ত হৃদয়ে,
গভীর বেদনা ভরে মূর্ছিত চরণে
জননী সন্তান তরে, ফিরিলে নিশ্চয়,
শোক পরাজয় মাঝে তোমার হৃদয়
কোথায় দাঁড়াবে ; পাবে কোথায় আশ্রয় ?

আব্দুল্লা—কেন বৃথা বাক্য ব্যয়, প্রলাপবচন !

রাণী—নাই কি সন্তান তব ?—তাদের মায়ার
আনিতেছ বজ্রাঘাত ভয় নাই মনে !
নাই কি জননী তব সন্তান-বৎসলা,
চেয়ে আছে পথপানে তোমার কারণ
মরুভূমি পার হ'য়ে কবে ফিরে যাবে
সে আশায় উৎকণ্ঠিতা ?—সে গভীর প্রেম
এত শীঘ্র ভুলে যাবে ! জানিনা, রমণী,
আর রমণীর প্রেম সর্বদেশে একরূপ !
তবুও বধির তুমি !—হায় ভগবান,
প্রেমহীন সৃষ্টি যেন অনন্ত শ্মশান !

আব্দুল্লা—সৃষ্টি মম অর্থপূর্ণ সরল উজ্জ্বল !
ভুলেনি তোমারে। আমি কটিকার মত
এসেছি তোমার দেশে, পর্বতে প্রান্তরে
রয়েছে আমার চিহ্ন ধ্বংসের আকারে !
এখন থামাতে চাও মোরে পথমাঝে ?
অসম্ভব ! বেশ করে জেনে রাখ মনে,
তোমার সন্তানদের জীবন সংহার
অতি তুচ্ছ মম কাছে, যথা বনমাঝে
ভ্রমণের কালে যদি, বক্র বৃক্ষ শাখা
পত্র পুষ্প সুশোভিত, রোষে মোর পথ,
অবহেলে ছিন্ন করি, দূরে ফেলে দিই !

রাণী—ভগবান, এ জগৎ রচনা তোমার !

আব্দুল্লা—নতজানু হওয়া বৃথা আমার নিকটে.
যাও তব স্বামী পাশে ; বল তাঁর কাছে
তোমার হৃদয়-ব্যথা ; তব অশ্রু পাতে
আর কাতর ক্রন্দনে হয়তো গলিবে
সহজে হৃদয় তাঁর ; তাঁহার ইচ্ছায়
রয়েছে জীবন এই বন্দী দুজনের !

রাণী—(ঘৃণাভরে উঠে) মহৎ জীবন তাঁর, আত্মা বলশালী,
প্রেম মৃত্যু কথাঘাতে নিষ্ঠুর অটল।
তাঁর কথা এনোনা ও মুখে !

আব্দুল্লা—(সহাস্যে)—জানি আমি, বীর তিনি,
প্রতিজ্ঞা অটল !

রাণী—কঠিন জগতে নাই দয়া মায়া লেশ ?
এজগতে জীবন সংগ্রামে, প্রেমহীন
নীরস হৃদয় চাই !—যেতে হবে ছেড়ে
এজগত আমাদের, এসেছে আহ্বান।
আয় আয় বাপধন, মম বক্ষোপরে
রাখ্ মাথা একবার, জুড়াক হৃদয়।
এই কাল মেঘরাশি, এই অন্ধকার
যাঁহার শাসনাধীন, তাঁহার কৃপায়
যাব মোরা তাঁর কাছে। নিকষ পাষাণ,
এক সঙ্গে শেষ কর এতিন জীবন।

আব্দুল্লা—বাঁচা মরা তব ইচ্ছা। যদি তুমি চাও,
এখনো বাঁচাতে পার সন্তান দুজনে।

রাণী—তুমি ছাড়িবে না কহু ! আর, যাঁর কাছে
কেটেছে শৈশব কত নৃত্য উল্লম্ফনে,
যাঁর কানে "বাবা" "বাবা" আধ আধ কথা
পশেছে প্রথম হ'তে,—তাঁর প্রেম হায় !
কি বলিব !—লোকে বলে বীরত্ব অটল !

আব্দুল্লা—অটল বীরত্ব কত তব প্রভু সম,
গভীর নিশীথ কালে নিদ্রার আবেশে
যবে ঘরে পুরজন, নিশ্চিন্ত প্রহরী, উঠেনি চমকি
বিপক্ষ বিজয়ীদের রণবাদ্য শুনি !

রাণী—অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তব ! কি বলিতে চাও !

আব্দুল্লা—(হাস্য পানে চেয়ে)
মন্দিরের উচ্চ শির, নগর প্রাচীর
ওই দেখ,—ও নগর মাঝে কেও নাই
যার হৃদে বিজয়ের আশা মৃত-প্রায়,
আত্মরক্ষা ক্ষীণ চেষ্টা কষ্ট নিদারুণ
দূর করে দিতে চায়, পরাণ আকুল ?

রাণী—ঠিক কথা, কিন্তু তার কি হবে !

আব্দুল্লা—তারপর, পুরজন-শত্রু মম নয়,
মিত্ররূপে যাব মোরা নগর মাঝারে।

আর কাজ নাই তব সৈন্য রক্ষীগণ,
নীরব নিশীথ কালে পারেনা কি তারা
খুলিতে নগর দ্বার সন্ধানি মোদেরে ?
এই যদি পার, তবে তব পুত্রগণ
পুনরায় পিতৃগৃহে করিবে ভ্রমণ।

আল্‌ফো—বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য !

রাণী—এ পরীক্ষা হতে রক্ষা কর ভগবান !

আব্দুল্লা—পৃষ্টান রমণী তুমি, পুত্রের জননী,
এখন তোমার হাতে তাদের জীবন,
রাখ কিম্বা মার তুমি।—তাদের জীবন
এই মূল্য দিয়ে রাখ : যা ইচ্ছা তোমার।

আল্‌ফো—মা, তুমি কাঁপ্‌ছো ?

আব্দুল্লা—সংকল্প ক'রেছ স্থির তবে ?

রাণী—(হাতে মুখ ঢেকে)
সমর্থ সন্তান দৃষ্টি তীক্ষ্ণ জ্যোতি সম
লজ্জা দেয় মোরে, কাঁপে প্রাণ সে আলোকে।
এখানে উত্তর দিতে অসমর্থ আমি।

আব্দুল্লা—চল তবে ; অন্য গৃহে পরামর্শ হবে।

কার্লো—মা, তুমি যাবে চ'লে ! নিয়ে যাও মোরে।

রাণী—দেখেছি ও চাঁদমুখ, শুনেছি ও বাণী,
হাতের বেষ্টন তোর পরেছি গলায়,
আর ছেড়ে যেতে পারি, পরাণ পুতলি !

আব্দুল্লা—ছেড়ে দাও, রেখে যাও ক্ষণকাল তরে,
ঘুমাক নিদ্রায় শিশু ; প্রভাতে আবার
দেখিবে সন্তানমুখ নবরবি করে।

আল্‌ফো—তাকাবেনা আমাপানে, মা আমার !

রাণী—হায়, যদি বাঁচি বাছা, সে কথা বলিতে
ভয় হয় তোর প্রাণে মেলিতে এ চোক,
যাই যাছা !

আল্‌ফো—তবু শোন, শোন কথা,—সাবধান যাত,
তোমার কারণে হব অবোমুখ আমি,
সে বেদনা গুরুতর হবে বক্ষে তব,
তার চেয়ে সগৌরবে ক'রো অশ্রুপাত
আমার সমাধি-ক্ষেত্রে।

আব্দুল্লা—বৃথা বাক্যে কথা নিয়ে, কাল চলে যায় ;
রজনী তৃতীয় যাম : চল অন্য গৃহে।

রাণী—(আলিঙ্গন করে—)
একবার বক্ষে ধরি ! আসি তবে বাপ্‌ !

[আব্দুল্লা, রাণী ও ডিগোর প্রস্থান।]

আল্‌ফো—মা মা, শোন একবার শোন ! চ'লে গেলে !

(আল্‌ফোনসোর পশ্চাতে কার্লোসের দ্রুত পদে প্রস্থান) (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ছেলেদের বিচারালয়

যে ফলাফল বুঝে, কোন অন্যায় কাজ করে, সেই প্রকৃত দোষী। যে ভালমন্দ না বুঝে কোন কাজ করে, সে কাজ যতই অন্যায় হোক, তাকে ঠিক দোষী বা পাপী ব'লে ধরা যায় না। এই জন্য ছোট ছেলেমেয়েরা কোন অন্যায় কাজ করলে বড়দেরই মত তাদের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই কথা বুঝতে বহু যুগ লেগেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য দেশেও সাত বৎসর পূর্ণ হ'লে, যে-কোন বালকবালিকাকে পুলিশ ধ'রে নিয়ে যেতে পারতো, এবং ঠিক পাকা বদমাইস অপরাধীদের মত তাদের বিচার হ'ত। এ দেশে এখনও হয় নাই। ছোট ছেলে কিংবা মেয়ে সামান্য অপরাধ ক'রেছে, না বুঝে' ক'রেছে, সেই অপরাধে তাকে পাকা দুষ্টু লোকদের সঙ্গে রাখতে ও জেলে রেখে কঠোর ভাবে তার বিচার ক'রে ও শাস্তি দিয়ে, তার জীবন একবারে মাটি ক'রে ফেলা হয়। শত সহস্র জীবন এমনি করে নষ্ট করা হ'য়েছে। পাপের পথ বন্ধ করতে গিয়ে, পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হ'য়েছে। ছোট ছেলেমেয়েরা একবার পুলিশ আদালতে গেলে, সেখানে দুদিনে কত শত পাপের সঙ্গে পরিচয় হয়, তার ফল ভবিষ্যৎ জীবনে বড় ভয়ানক। নির্দ্দোষ বালকবালিকা দুটা ভুল ক'রেছে, দুষ্টুমি করেছে বলে কি তার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলচ্ছেদ

কর্‌তে হবে! এরূপ ক'রে কোন্ লক্ষ্য সিদ্ধ হবে? এ পথে চ'লে জগতের পাপ বাড়ান হ'য়েছে, জাতীয় শক্তি ক্ষয় করা হ'য়েছে, মানব জীবনের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হ'য়েছে, তার ধর্ম্মের রক্ষক আইন কানুন মহা অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছে।

আমেরিকা সর্ব্বপ্রথম এই অপরাধ হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করেন, তারপর ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চোক এদিকে ফিরেছে। গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই যে ছোট ছেলেমেয়েরা,—যাদের বালকবালিকা বলা যায়,—তারা যে-কোন দোষ করুক না কেন, তারা পুলিশের এলাকাধীন নয়। আমাদের দেশে একথা বড় আজগুবি শোনাবে। এই সত্য অনুসারে কাজ কর্‌তে গিয়ে,—ছেলেমেয়েদের অপরাধের জন্য কি প্রণালীতে কিরূপ ব্যবস্থা কর্‌তে হবে তা নির্ণয় কর্‌তে গিয়ে, মানবজীবনের কত জটিল প্রশ্ন উঠে পড়েছে; কিন্তু ধীরে ধীরে পথ পরিষ্কার হচ্ছে। এই পথ অবলম্বনের পূর্ব্বে সকল দেশেই, এদেশের মত, একই আইন, একই পুলিশ, একই বিচারালয় এবং একই জেল,—ছোট বড় পাকা কাঁচা, সকল অপরাধীর জন্য ছিল। সকলেরই এক পথ, এক গতি, এক গম্য স্থান!

বহু চিন্তা, আলোচনা, ও অনুসন্ধানের পর স্থির হ'য়েছে যে, ছেলেমেয়েদের অপরাধের বিচারের জন্য পুলিশ, আদালত, বিচার-প্রণালী, জেল, সবই স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। তাদের পক্ষে পুলিশ হ'তে জেল পর্য্যন্ত সবই সংশোধন ও শিক্ষার জন্য, দণ্ডের জন্য নয়। এটা হোল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কাজে পরিণত করতে গিয়ে এখন কোন্ কোন্ দেশে ব্যাপারটা কি প্রকার দাঁড়িয়েছে তার একটু আভাস দিচ্ছি।

লণ্ডনে ছেলেমেয়েদের বিচারের জন্য কয়েকটি স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তার মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তার এক দিনের বর্ণনা এইরূপঃ—

একটি উঁচু জায়গার এক পাশে একজন বিজ্ঞ ও সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীর ভাবে ব'সে আছেন; কয়েক জন পুলিশ সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে বর্ত্তমান; একজন দুষ্টপুষ্ট জেলার; একটি স্ত্রীলোক দূর হতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চেয়ে আছে,—তার ছেলের বিচার হবে। একজন স্ত্রীলোক-পুলিশ যার উপর ভাওয়ার ভার আছে সে আর নূতন কয় জনের ভার নিতে হবে তার অপেক্ষা করছে; শিশুসমিতির একজন প্রতিনিধি ব'সে আছেন; একজন অপরাধী বালক কাছে দণ্ডায়মান একজন জেলারকে সে যা বলতে পারে আস্তে আস্তে কোন রকমে বল্‌ছে। জেলার আবার জোরে সেই কথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলছেন। এই সঙ্গে দুএকজন উকিলও থাকেন। এইরূপ বিচারালয় আরও কোন কোন সহরে আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই অল্পবয়স্ক অপরাধীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই।

আমেরিকায় ছেলেমেয়েদের জন্য পুলিশ, বিচারক জেল সবই স্বতন্ত্র করা হ'য়েছে। এ বিষয় আমেরিকা পথপ্রদর্শক ও অনেক অগ্রসর। কলোরাডো এবং ওয়াশিংটন্ এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। শত শত বালক বালিকা উন্নত ও স্বতন্ত্র বিচার-প্রণালীর গুণে রক্ষা পেয়েছে। কলোরাডো প্রদেশের ডেন্‌ভার নগরে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ শিশু-বিচারালয়ের ছবি দেওয়া গেল। জজ্ বেন্ লিণ্ডসে এবং তাঁর স্ত্রী এক সঙ্গে ব'সে ছেলেদের বিচার করছেন। লিণ্ডসে ও তাঁর পত্নী ছেলেমেয়েদের পরম বন্ধু ব'লে আমেরিকায় বিখ্যাত। এই বিচারালয় দেখলে একজন ভদ্রলোকের বৈঠকখানা ব'লে মনে হয়। প্রকৃত বিচারালয়ের কোন প্রকার চিহ্ন এখানে নাই। গল্প করার মত সহজ কথাবার্ত্তার দ্বারা বিচার হয়। লিণ্ডসে ও তাঁর পত্নী প্রথমে এক এক জনের সঙ্গে স্বতন্ত্র খুব আদর করে কথা বলেন, তার প্রকৃত অবস্থা বাড়ীর অবস্থা, যা যাবার অবস্থা, শরীর মনের অবস্থা, পরিষ্কার ক'রে জান্‌তে চেষ্টা করেন। কি রকম স্থানে, কি রকম সঙ্গে সে বাস করে তা ভাল করে জানেন, তারপর যাতে তাদের সুশিক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করেন—শাস্তির ব্যবস্থা করেন না। আমেরিকার অনেক শিশু-বিদ্যালয় এইরূপে অসংখ্য শিশু-জীবন রক্ষা করেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার শিশু অপরাধীদের সংশোধন-ব্যবস্থা

আরও সুন্দর। সেখানে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের বিচার ও শাসন এবং শিক্ষার ভার শিক্ষা-বিভাগের উপর, তার সঙ্গে পুলিশ ও আইনের কোন সম্বন্ধ নাই। সিডনী নগরে একজন সহৃদয় বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করেন, এবং তত্রত্যের পুলিশ কর্ম্মচারীও উপস্থিত থাকেন, কিন্তু বিচার হয় শিক্ষা-বিভাগের একটি ঘরে এবং ছেলেমেয়েরা শিক্ষা বিভাগেরই অধীন থাকে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিচার হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট একজন সহৃদয় ভদ্রলোকের মত একটি লেখা-পড়া করবার ঘরের মত ঘরে বসেন অপরাধী ছেলেমেয়েদের অভিভাবক বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধু ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন। বাহিরের কোন লোককে বা সংবাদপত্রের সংবাদদাতাকেও সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। অতি বিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ বিচারপতিগণ এই বিভাগে কাজ করেন, এবং অন্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিচারপতিদের সমান বেতন পান।

শিশুদের বিচার ও সংশোধন-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে হাত দিয়ে দিন দিন নূতন সত্য প্রকাশিত হচ্ছে। মানব-জীবন, এক একটি শিশুর জীবন, যে কি অমূল্য পদার্থ, কত স্নেহ চিন্তার এবং কত যত্ন ও প্রেমপূর্ণ আয়োজনের দ্বারা রক্ষা করবার ও ফুটিয়ে তুলবার বিষয়, তা ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারছি। শিশু অপরাধীরা এক হিসাবে শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত, পুলিশের নয়। তারা স্বস্থই নয়, তারা চিকিৎসা বিভাগের অন্তর্গত। যে ব্যক্তি শিশুর বিচার করবে এবং সংশোধন করবে, তার জানা চাই, শিশু কেন এই অপরাধ করলে, তার মূলে সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক কি কি কারণ বর্ত্তমান, এবং কি কি উপায় অবলম্বন করলে সেই সব কারণ হ'তে শিশুকে রক্ষা করা যাবে। সুতরাং শিশু বিচারালয় সাধারণ কোর্ট তো নয়ই, শিক্ষালয়ও নয়—তা হওয়া উচিত চিকিৎসকের পরীক্ষাগার। সুচিকিৎসক যে ভাব নিয়ে তাঁর রোগীর কাছে যান, তাকে পরীক্ষা করেন, শিশুদের বিচারপতিগণের ঠিক সেই ভাবে তাদের বিচার করা কর্ত্তব্য। ডেন্‌মার্ক এবং আরও কোন কোন জায়গায় এই বিভাগের ভার একজন বহুদর্শী ডাক্তারের হাতে দেওয়া হয়েছে। তিনি ছেলেদের কেয়ার।

কিন্তু এই কি যথেষ্ট? তা না। অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিচার, পুরুষদের দ্বারা সব সময় ঠিক হয় না। এ জন্য কোন কোন স্থানে পুরুষ বিচারকের সঙ্গে এক জন মহিলা নিযুক্ত হ'য়েছেন। তিনি একলা মেয়েদের কথা আগে শোনেন, তারপর পরামর্শ ক'রে, ব্যবস্থা করেন। মেয়েরা কত কথা পুরুষ বিচারক এমন কি মহিলার কাছে বলতেই পারে না। চিকাগো এবিষয়ে পথপ্রদর্শক।

যত মানব-জীবনের মূল্যবোধ বাড়ছে, ততই শাসনের পরিবর্ত্তে সংশোধন হচ্ছে; ততই কোমল ব্যবহারের আবশ্যকতা স্পষ্টতর হ'চ্ছে, ততই বিবিধ অবস্থার লোকের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হ'চ্ছে; এবং পুরুষের পাশে সহায়রূপে নারীর আসন গ্রহণ অনিবার্য্য হ'য়ে উঠছে। নারী-অপরাধী আছে সত্য, তেম'নি নারী-পুলিশ, নারী-বিচারক, নারী-শিক্ষক, নারী-চিকিৎসক না হ'লে শাসন, বিচার, শিক্ষা, চিকিৎসা সকল সার্থক হয় না তাও সত্য। শিশুদের জন্যও জগতে নারীর কর্ত্তব্য সর্ব্বত্র। এ ভার নারীজাতি এত দিন বহন করেন নাই, এইবার সে সময় এসেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে জগতে নব যুগের সূচনা হবে। সে যুগে কি ভারত-রমণী তাঁর উচ্চ অধিকার লাভের পথে বিস্তৃত কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না? জগৎ উন্নতির পথে চলছে। হয় চলতে হবে, নয় মরতে হবে। বঙ্গরমণীগণ আর ভীরু অজ ও ভার স্বরূপে না থেকে শক্তি স্বরূপা হোন্। দেশের উন্নতির অন্য পথ নাই।

চীন রমণীর জাগরণ

(মেণ্ট্ নিহাল সিংহের রচনা অবলম্বনে)

বর্ত্তমান যুগে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় হইতে সমস্ত জগতের দৃষ্টি চীনের উপর পড়িয়াছে। রাজনীতির প্রতিই সকলের চোক। চীনের ধন-বল, জন-বল,

কলকারখানা, প্রভৃতির অবস্থা কেমন, এই চিন্তাই সকলের মনে প্রধান। জাতীয় উন্নতির আর একটা দিক আছে, সকল বলের মূল সেখানে। পারিবারিক অবস্থা, পারিবারিক উন্নতি: উপরই দেশের সকল উন্নতি নির্ভর করে। চীনের রাষ্ট্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক বিপ্লব বা উন্নতি হ'য়েছে কি প্রকার, এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিব।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চীনের মেয়েদের পা ছিল না! সে কি রকম? পা দিয়ে যদি মানুষ হাটতে না পারে তা হ'লে সে পা থাক, না থাকারই মত। চীনে মেয়েদের শরীরে পা নামে দুটা লম্বা জিনিষ ছিল, কিন্তু তা দিয়ে কোন কাজ হ'তো না। যত বড় ঘর যত সম্ভ্রান্ত বংশ—মেয়েদের পা তত অকর্ম্মণ্য, খুলো হওয়া নিয়ম ছিল। ভদ্রবংশের মেয়ে পায়ে হাঁটবে বা সোজা হয়ে দাঁড়াবে, এ বড় নিন্দার বিষয় ছিল। সম্রাট, মধ্যবিত্ত, এমন কি অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোকও সম্ভ্রান্তদের এমন কৌশল ছাড়তে পারতো না। মেয়ের জন্মের পরেই যত শীঘ্র সম্ভব তার পায়ে এমন শক্ত জুতো পরিয়ে দেওয়া হ'ত যে ক্রমে পায়ের নীচের অংশে কেবল কয়েকটি আঙ্গুল মাত্র থাকতো। নিজের নিজের পা ছোট করবার জন্য মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চ'লতো। যে স্ত্রীলোকের পা যত ছোট, সে স্বামীর কাছে তত বেশী আদর পেত। এই প্রথা শত শত বৎসর ধরে চ'লে এসেছে ব'লে, উচ্চ শ্রেণীর চীনে মেয়েদের পা একবারে না থাকার মত হ'য়েছিল। পা শক্ত ক'রে বাঁধার ফলে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পা ছোট ও শুষ্ক হ'তে হ'তে এক এক সময় খসে প'ড়ে যেত; পা-বাঁধা দীনার বিষে পা কেটে রক্ত দূষিত হ'য়ে, কত স্ত্রীলোক প্রাণত্যাগ ক'রতো: এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোক এমন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে থাকতো যে অন্যের সাহায্য ভিন্ন দু'চার পা-ও চলতে পারতো না, সব কাজের জন্য দাসদাসীর উপর নির্ভর করতে হতো। বড় ঘরের মেয়েরা পুরুষদের খেলার পুতুলের মত থাকতো, দাসদাসী তাদের সব কাজ ক'রে দিত। কিন্তু যে সব পরিবারের স্ত্রীলোকদের কাজ করতে হ'তো, তাদের কষ্টের আর অবধি ছিল না। সব চেয়ে গুরুতর কুফল জাতীয় দুর্গতির কারণ হ'য়েছিল,—স্ত্রীজাতির পক্ষে জননীর কর্ত্তব্যপালনের, এবং সুস্থ সবল

শেষ চীন-সম্রাটের মাতা।
সন্তানের জন্মদানে অক্ষমতা,—ভবিষ্যৎ বংশের দুর্ব্বলতা।

সুতরাং চীন রমণীর জাগরণের, অথবা চীন জাতির বর্ত্তমান জাগরণের প্রধান চিহ্ন,—স্ত্রীজাতিকে পা-বিহীন

ক'রে রাখার প্রথার পরিবর্ত্তন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে, এবং ইউরোপীয় রমণীদের পরামর্শ ও দৃষ্টান্তে চীন রমণীগণ প্রতিজ্ঞা করেছেন—আর তাঁরা পঙ্গু হ'য়ে থাকবেন না। এই সংস্কার সর্ব্বত্র বিস্তৃত করবার জন্ত, হংকংএর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরের পত্নী চীনের বড় বড় লোকেদের সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন।

এই সংস্কার সাধন করা সহজ হয় নাই। পুরুষগণ তো স্ত্রীজাতির এই সংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেনই—মেয়েরা পুরুষদের মত চলে ফিরে বেড়াবে, কি ভয়ানক কথা! মেয়েরাও সংস্কারের বিরোধী ছিলেন: তাঁরা পা ওয়ালা মেয়েদের ঘৃণা করতেন, তাদের সঙ্গে মিশতেন না এবং তাঁদের সম্বন্ধে কত দুর্নাম রটনা করতেন। কারণ, চীন দেশে যে সব স্ত্রীলোকের পা স্বাভাবিক, যারা হাঁটতে পারতো, তারা সকলেই হয় অতি নীচ বংশের দাসী, অথবা দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক।

শেষ রাজার বিধবা মাতাঠাকুরাণী এই সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করেন। রাজমাতা সুচাই এক অসাধারণ রমণী। চীনের বর্ত্তমান উন্নতির তিনি প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন। তিনি এই নিয়ম প্রচার করেন যে কোন স্ত্রীলোকের আর পা বাঁধা হবে না। এখন ছোট পা বড় দেখাবার জন্ত মেয়েরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। এই সংস্কারের ফলে, চীনদেশের অর্দ্ধেক মানুষ পা পেয়েছে।

তারপর, চীনেরা এতদিনে বুঝতে পেরেছে, জাতীয় জীবনে স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়—কত উচ্চে। বহুকাল হ'তে তাদের ধারণা ছিল, মেয়েরা পুরুষদের গৃহের শোভা, খেলার বস্তুমাত্র। নব নব চিন্তা-স্রোতের সংস্রবে, চীনেরা বুঝতে পেরেছে, স্ত্রীজাতি জাতীয় জীবনের জননী ও পালনকর্ত্রী। জাতীয় উন্নতি ও অবনতি স্ত্রীজাতির অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই নবভাব, নব আদর্শের ফলে চীন হতে শিশুকন্যা-হত্যা উঠে গিয়েছে। মেয়েরা এখন মানুষ ব'লে গণ্য হ'য়েছে।

নারীশক্তির মূল্য বুঝতে পেরে, চীনেরা নানা উপায়ে, সেই শক্তির বিকাশ সাধনের চেষ্টা করছে। কত স্কুল, পাঠশালা খোলা হয়েছে; কত সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে; কত ছাত্রীকে ইংলণ্ড আমেরিকার শিক্ষালাভের জন্ত পাঠান হ'য়েছে; সম্ভ্রান্ত লোকেরা সপরিবারে নানাদেশ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও নারী জীবনের উচ্চ আদর্শের ফলে সমাজে ও পরিবারে নানা প্রকার সুসংস্কার আরম্ভ হ'য়েছে। এতদিন বিবাহে মেয়েদের কোন মতামত ছিল না। এখন পুরুষদের মত মেয়েরাও নিজেদের স্বামী নির্ব্বাচন ক'রে নেয়। পুরুষগণ কেবল পুতুলের মত গৃহের শোভা একটি অকর্ম্মণ্য রমণীর পরিবর্ত্তে, চিন্তার সঙ্গিনী পত্নী চাচ্ছেন। শিক্ষিতা রমণীগণ গৃহ পরিবারের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন: জীবনের প্রবাহ ও স্ফূর্ত্তি গৃহের নব ব্যবস্থার মধ্যে অবাধ গতি পেয়েছে, সন্তানগণ গৃহে বহুবিধ শিক্ষার উপকরণ পাচ্ছে।

শিক্ষিতা মহিলাগণ, কেবল গৃহেই আবদ্ধ নন। শত শত স্কুল, সংবাদ পত্র, অনাথ আশ্রম, শুশ্রূষালয় প্রভৃতি মেয়েদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হচ্ছে; শত শত মেয়ে নার্স হ'য়ে সেবাব্রত গ্রহণ করেছে। এখন মেয়েরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করছেন।

ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষার উপর চীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বীর বিক্রম

দ্বিতীয় অঙ্ক

চোলরাজের প্রাসাদস্থিত কক্ষ। পশ্চাৎদ্বার দিয়া মালবিকা ও তরলিকা প্রবেশ করিল।

তরলিকা। দেখ, মানু. তে.র কথা শুনে আমার গা জ্বলে যায়। এই ত আমি ঘুরে দেখে এলাম, তোর ঘর বাড়ী সব,—আমি ত কিছুরই অভাব দেখলাম না। তবু তোর এখানে সুখ হয় না?

মালবিকা। দিদি, গরুকে ধরে খাচার পুরে দাও, দেখবে সে খাচার বেড়া কামড়িয়ে ভাঙতে চেষ্টা করবে, তা সে খাচা লোহারই হউক আর সোণারই হউক!

তরলিকা। যাক্—এক বিষয়ে তুই আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী; তোর কোল ভ'রে বুক জুড়ে' অমর আছে—আমার ত কিছুই নেই বোন!

মালবিকা। আমার ছেলে—তাও শুনেছই সে জারজ।

তরলিকা। জারজ?

মালবিকা। হাঁ, তোমার বাবার কথা কি ভুলে গেলে? তাঁরই কথামত অমর জারজ, মনে নাই?

তরলিকা। তুই ভারী দুষ্ট মেয়ে; বাবা রাগ করে' একটা কথা বলেছেন, তাই তুই এত মনে নিচ্ছিস্।

মালবিকা। না দিদি! সিংহলরাজ সত্য কথাই বলেছেন। তুমি অমরকে যদি দেখতে!—সে ভারী নিরীহ, গো বেচারী, বাপের ছেলের যে তেজ থাকে তা তার নাই।

তরলিকা। মালু, তুই এমন কেন?

মালবিকা। (না শুনিয়া) আমার মনে হয়, রক্তের দোষ না থাকলে এমনতর হয় না। এত নিরীহ—এত দুর্ব্বল। বাপের ছেলের কখনো এমন হয় না। আমি শুনেছি কোন্ রাণী নাকি ছেলের হাত পা শিলিয়ে দিয়েছিল আর সে হাত খানা উঠিয়েও একটু বাধা দেয় নাই। আমার কি ইচ্ছা করে জানিস্ দিদি! আমার ইচ্ছা করে, আমি একদিন অমরকে তেমনি করে শিলিয়ে দিই!

তরলিকা। (অত্যন্ত বিরক্তির সহিত) মালু—মালু!

মালবিকা। (হাসিয়া) হা-হা-হা একটু ঠাট্টায়ই এত বিচলিত হয়ে পড়লে দিদি! (স্বর বদলাইয়া) যাক্ আমার কথা বিশ্বাস কর আর নাই কর, সত্যি সময় সময় আমার ভারী ঐ রকম একটা অদম্য ইচ্ছা আসে! আমার মনে হয়, ঐ রকম একটা ভাব যেন আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে! লোকে বলে, জানত! অকৃতকর্ম্মা বীরগণের বংশে আমার জন্ম, যাক্—এস দিদি, বস না! এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তুমিত অনেক দেশে ঘুরেছ, আমাকে সেই সব ভ্রমণের গল্প বল। তুমিত অনেক রাজসভা দেখেছ, অনেক রাজার অতিথি হয়েছ!

তরলিকা। আমি কলিঙ্গ রাজসভাই বেশী দেখেছি, কলিঙ্গেই বেশী দিন ছিলাম।

মালবিকা। সব দায়গায়ই উচ্চ সম্মান পেয়েছ, নয়?

তরলিকা। হাঁ, আমার স্বামীর জন্য অবশ্য।

মালবিকা। ঠিক্! বলবন্তের স্ত্রী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়, মহাবীর বলবন্ত! কিন্তু চোলরাজ তার চেয়েও বীর!

তরলিকা। সহদেব?

মালবিকা। হাঁ, জাননা! চোলরাজ সিংহলে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, বলবন্তের তা চেষ্টা করলেও সাধ্যে কুলায় নি! আচ্ছা দিদি: বলবন্ত যখন কোন যুদ্ধে গিয়েছে, তুমিও ত তার সঙ্গে গিয়েছ। যখন তীক্ষ্ণ বীর-তরবারি সব বিদ্যুতের মত বিবর্ত্তিত হত, যুদ্ধস্থল রক্তে রাঙ্গা হয়ে যেত তোমার কি কাঁপিয়ে পড়ে' সে যুদ্ধে গিয়ে যোগ দিতে ইচ্ছা করত না! তুমি কি কখনো বর্ম্ম পড়নি, তরবারি হাতে নেও নি?

তরলিকা। না কখনো না! তুই কি মনে করিস্! ছিঃ আমি মেয়ে মানুষ হয়ে!—

মালবিকা। মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষ কতখানি করতে পারে, তা কেউ জানেনা, এ আমি তোমাকে ঠিক বলছি! কিন্তু দিদি, আমার আর ভাল লাগে না, আমি আর পারিনা! এরকম অলসের মত বসে থাকা! তার চেয়ে যদি বর্ম্ম পড়ে যুদ্ধে যেতে পারতুম যদি একবার যুদ্ধের আনন্দে মেতে উঠতে পারতুম, আমার পক্ষে ভাল হ'ত, সকলের পক্ষে ভাল হ'ত! কি পূর্ণ, কি গৌরবময় জীবন! তুমি আমাকে দেখে অবাক হচ্ছনা দিদি, সে আমি কি করে এখানে এখনো বেঁচে আছি! যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে, দিন নাই রাত নাই, কেবল বৃষ্টি পড়তে থাকে, তখন অন্ধকার কক্ষগুলির মধ্যে বসে বসে নির্জ্জীবের মত বাইরের দিকে চেয়ে থাকা, সে যে কি স্বাদহীন জীবন তুমি থাকলে বুঝতে পারতে। তোমার কি মনে হয় না আমি যেন অনেক দিন হয় মরে গেছি, যা এখন দেখছ তা আমার ছায়া মাত্র?

তরলিকা। (অস্থির ভাবে) আচ্ছা, আচ্ছা, এখন চল সকলে যেখানে আছে আমরাও সেখানে যাই।

মালবিকা। (তরলিকার হাত ধরিয়া) না আর একটু থাক! বল দেখি দিদি, পাঁচদিন ওরকম বসে থাকলে কেউ বেঁচে থাকতে পারে! বল—

তরলিকা। পাঁচদিন!

মালবিকা। হ্যাঁ পাঁচদিন! যখন চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে আসে, অনবরত বৃষ্টি পড়তে থাকে তখন, সেই সময়! (তাড়াতাড়ি স্বর বদলাইয়া) তা বলে মনে করোনা এখানে দেখবার কিছুই নাই! কলিঙ্গে যা কখনো দেখ নাই এমন সব চমৎকার দৃশ্য এখানে সময় সময় দেখতে পাবে। যতদিন এখানে আছ আমরা দুটি বোন মিলে মিশে থাকব। যখন ঝড় উঠবে তখন আমরা দুজনে মিলে সমুদ্র দেখতে যাব, দেখব, শ্বেত-ফেনর তেজস্বী অশ্বের মত তীব্র বেগে ঢেউগুলি এসে তীরে ঝাপিয়ে পড়ছে, বহুদূরে তালবন দ্বীপের মত তিমিগুলি বেড়াচ্ছে! বর্ম্মাবৃত বীরের মত তারা পরস্পরকে আক্রমণ করছে! কি আনন্দ দিদি, ডাইনির মত তিমির পিঠে চড়ে মত্তবলে সমুদ্র বক্ষে ঝড় উঠিয়ে তীব্র বেগে বড় বড় জাহাজের সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছি, সমস্ত বীর পুরুষ, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাহাজগুলা নিমেষে অতলে ডুবে যাচ্ছে!

তরলিকা। ছিঃ মালু, তুই কেন এমন সব কথা বলিস্!

মালবিকা। দিদি তুমি কোন যাদু মন্ত্র জান!

তরলিকা। (সভয় বিস্ময়ে) আমি!

মালবিকা। আমার মনে হচ্ছে তুমি যাদু জান, নইলে তুমি বলবন্তকে ভুলালে কি করে?

তরলিকা। আমি এক্ষণি চলে যাব, ছেড়েদে আমাকে!

মালবিকা। (তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া) না, না, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম দিদি, রাগনা, তোমার পায়ে পড়ি। শুন! আচ্ছা তুমি এরকম অন্ধকার কক্ষে বসে বসে জীবন কাটিয়ে দিতে পার? যখন গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলে, প্রবল বেগে বৃষ্টিধারা নেমে আসে, তখন আঁধার কক্ষে বসে বসে আমার মনে হয় যেন, আমার সম্মুখ দিয়ে যম-পুরের যাত্রীগণ সব একে একে চলেছে, কেউ তেজস্বী কৃষ্ণ অশ্বে চড়ে, কেউ বিস্তীর্ণ-পক্ষ শ্বেত পক্ষীরাজের মত প্রকাণ্ড জাহাজে চড়ে ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছে। আকাশে কে যেন তাদের যাত্রা ঘোষণা করে গম্ভীর নাদে ডমরু বাজাচ্ছে। আর দিদি (সহসা দুই হাতে তরলিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া) একবার ভাব দেখি ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড তেজস্বী কৃষ্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে চড়ে আকাশের উপর দিয়ে তীব্র বেগে যমের বাড়ী যাওয়াও কত সুখের!

তরলিকা। (প্রবল চেষ্টা করিয়া নিজকে ছাড়াইয়া) যাদু, যাদু, আমি আর কিছু শুনব না, কিছু শুনতে চাইনা, ছাড় আমাকে!

মালবিকা। (হাসিয়া) যাও তুমি নেহাৎ পো-বেচারী, এত সহজে ভয় পাও!

(সহদেব, বলবন্ত ও বীরবাহু প্রবেশ করিল)

সহদেব। আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে বলবন্ত, সে আর কি বলব? আজ বহুদিন পরে তোমাকে পেয়েছি—উদার, মহৎ, মহাবীর চির সুহৃৎ আমার! সিংহলরাজের এক পুত্র আজ আমার ঘরে অতিথি—আর সিংহলরাজ নিজেও শীঘ্রই আসছেন,—নয়, বীর বাহু?

বীরবাহু। হ্যাঁ, তিনি আসবেন বলেছেন।

সহদেব। আর—আমার অমর যদি এখন বাড়ী থাকত।

বীরবাহু। তুমি অমরকে বড়ই ভালবাস চোলরাজ, নয়? তুমি প্রায়ই ত অমরের কথা বলছ।

সহদেব। বুঝবে বীরবাহু যখন নিজে পিতা হবে। আমার আর নেই, এই একটি মাত্র, আর এই বৈশবেই সে কেমন চতুরবান, কেমন ভাল ছেলে হয়েছে যদি দেখতে!

মালবিকা। কিন্তু সে মেহাৎ শিষ্টশান্ত, সে কোনো দিনই বীর হবে না।

সহদেব। ছিঃ মালু, কি করে তুমি এমন কথা বল?

বলবন্ত। এত ভালবাস, তবু তুমি অমরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে কেন সহদেব?

সহদেব। আমার মনে হচ্ছে, না পাঠালেই ভাল

হত। (নিম্নস্বরে) কিন্তু তুমিত জান বলবন্ত, যখন কিছুকে লোকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে, তখন সে সময় সময় কাপুরুষের মত ব্যবহার করে। (স্বর উঠাইয়া) আমার বাড়ীতে লোকজন বেশী ছিল না, সিংহলরাজ যখন তাঁর সুশিক্ষিত অদূর সমুদ্রে নঙ্গর করলেন, তখন সকলেই মনে করেছিল, যে কারো প্রাণ এখন নিরাপদ নহে।

মালবিকা। আমি জানি, বীরপুরুষগণ প্রাণের চেয়েও আগে একটা বিষয়ের কথা ভাবেন!

বীরবাহ। কি সে বিষয়টা?

মালবিকা। সে হচ্ছে নিজের খ্যাতি আর সম্মান!

সহদেব। মালবিকা!

বলবন্ত। সহদেব যা করেছে তাতে যে তার কিছু সম্মানের হানি হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না।

সহদেব। (কঠোর স্বরে) বৃথা চেষ্টা মালবিকা। সিংহলরাজ এবং তাঁর বন্ধুগণের সঙ্গে আমি কিছুতেই ঝগড়া করছি না!

মালবিকা। (ঈষৎ হাসিয়া) তাই না কি! আচ্ছা পাণ্ড্য রাজকুমার, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। যে-কোন বাতাসের সম্মুখে তুমি তোমার জাহাজ চালাতে পার?

বলবন্ত। হাঁ, সাবধানে চালালে চলে বই কি?

মালবিকা। বেশ—। (কক্ষের এক পাশে গেল)

তরলিকা। (নিম্নস্বরে, অস্থির ভাবে) চল যাই প্রভু এখান থেকে, এক্ষণি চল, এই রাত্রেই!

বলবন্ত। এখন আর কি করে হয়?

তরলিকা। মালুকে বড়ই ভালবাসতাম, কিন্তু এখন—আমি তাকে এমন সব কথা বলতে শুনেছি যে চিন্তা করতেও ভয় করে! (বলবন্তের লোকজন এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত স্ত্রী পুরুষগণ একে একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।)

সহদেব। আসুন, বসুন সকলে, আজ আমার কি গৌরবের দিন,— আপনারা এসেছেন, সিংহলরাজ শীঘ্রিরই আসছেন। এস না বলবন্ত,—এই বস এই খানে।

(সম্মানের আসনে বসাইল, তরলিকা বলবন্তের বামের আসনে বসিল, মালবিকা বলবন্তের সম্মুখের আসনে বসিল, সহদেব সিংহাসনে বসিল, বীরবাহু তার পার্শ্বে বসিল, অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য আসনে বসিল)

মালবিকা। আমার আজ ভারী আনন্দ হচ্ছে, এত গুলি বীরপুরুষ আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আজ কত বীরত্বের কাহিনী শুনতে পাব। বলুন না আপনাদের বীরত্ব কাহিনী, আমরা শুনি সন্ধ্যাটা খুব আমোদে কাটান যাবে।

সহদেব। কাজ নেই, ওতে অনেক সময় কমড়া যাবে।

মালবিকা। (ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) চোলরাজ যে এতেই ভয় পাবেন, আমি এমন মনে করি নাই!

বলবন্ত। এমন মনে করা অন্যায়, কেউ এমন মনে কর্ত্তে পারে না। আমরা আজ এখানে অনেকে উপস্থিত আছি, সকলের বিবরণ শেষ হতে অনেক রাত্র হয়ে যাবে তাই—। ভাল সহদেব, তুমি তোমার ভ্রমণ কাহিনী বল না কেন—তুমি সাহস ক'রে যবদ্বীপে চলে গিয়েছিলে,—আশ্চর্য্য সাহস তোমার।

মালবিকা। আঃ—সে আর বেশী একটা কি কথা, যবদ্বীপে সকলেই যেতে পারে, বীরের সভায় বলবার যোগ্য তাতে কিছুই নেই। না—বীরত্বের কথা হউক, ও সব কি কথা? তুমিই আরম্ভ কর পাণ্ড্যরাজকুমার, নইলে আমি বলব, আমার স্বামীর প্রশংসা তোমার সহ্য হয় না। বল না, তোমার জীবনে কোন্ কাজকে তুমি সকলের চেয়ে বড় বীরত্বের কাজ বলে মনে কর।

বলবন্ত। নেহাৎই বলতে হবে? তবে শুন (একটু হাসিয়া) কি বলব? বিশেষ বীরত্ব তো কিছুতেই দেখছি না? একবার যুদ্ধে একা আট জনের সঙ্গে লড়েছিলাম মনে হচ্ছে,—যবদ্বীপে।

মালবিকা। বীর তুমি! আটজন! অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিলে?

বলবন্ত। হা তা ছিল বই কি, ঢাল তরোয়াল, বর্ম্ম, ভল্ল, সবই ছিল যেন, মনে পড়ছে।

মালবিকা। তবু আট জনের সঙ্গে একা লড়া

মহাবীরত্ব। এখন চোলরাজ, তুমি এই বীর-সভায় তোমার বীরত্ব কাহিনী শুনিয়ে দাও একবার।

সহদেব। আমি কি আর বলব? কয়েকজন দস্যু আমার উপকূলে একখানা সওদাগরের জাহাজ আটক করেছিল, আমি তাদেরে পরাজিত করে জাহাজখানা মুক্ত করে দিয়েছিলাম।

মালবিকা। তুমি গোপন করে যাচ্ছ চোলরাজ, এর চেয়ে বড় বীরত্বের কাজ তুমি করেছ।

সহদেব। (আবেগে) না,—আমি আর কোন বীরত্বের গৌরব কর্ত্তে চাই না। আমি সিংহল থেকে এসে অবধি শান্তিতে আছি, কারো সঙ্গে কোন কলহ বিবাদ নেই, কিছু কিছু ভ্রমণ করেছি মাত্র।

মালবিকা। তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব যদি তুমি গোপন করে যাও, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করব।

সহদেব। মালবিকা, চুপ কর—আমার আদেশ।

মালবিকা। বলবন্ত আটজন সৈনিকের সঙ্গে একা লড়েছিল—কিন্তু সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল—আর চোলরাজ একখানা তরবারি মাত্র সঙ্গে নিয়ে আমার কক্ষদ্বারের ভীষণ শেত ভল্লুক মেরে গভীর রাত্রে আমার কক্ষে এসেছিল, সে ভল্লুক একা বিশজন লোকের জোর রাখত।

সহদেব। (প্রবল আবেগে) আর একটি কথা বলবে ত!

তরলিকা। (নিম্নস্বরে) এও তুমি সইবে পাণ্ড্যরাজকুমার?

বলবন্ত। (তরলিকাকে) চুপ কর।

মালবিকা। (সমবেত নিমন্ত্রিতদিগকে) এখন আপনারা বলুন কে বড় বীর, চোলরাজ কি পাণ্ড্যরাজকুমার?

সহদেব। কিছু দরকার নেই—।

মালবিকা। (উচ্চৈঃস্বরে) বলুন আপনারা, আমার জানবার অধিকার আছে।

একজন বৃদ্ধ। (নিমন্ত্রিতদের মধ্যে) ঠিক বলতে হলে সহদেবই বড় বীর বলতে হবে, অবশ্য তার পরেই বলবন্ত।

সহদেব। ভাই বলবন্ত! যদি জান্তে, যদি বুঝতে।

তরলিকা। (নিম্নস্বরে) এ বড়ই বাড়াবাড়ি, বন্ধুর পক্ষেও।

বলবন্ত। চুপ কর তরলিকা। (উচ্চৈঃস্বরে অন্য সকলের প্রতি) হাঁ ঠিক, আমাদের সকলের মধ্যে সহদেবেই উচ্চ সম্মান পাবার উপযুক্ত। আমি শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও সহদেবকে তাই মনে করে যাব। যদি নাও মারত তবু আমি তাই মনে করতাম। তালুক মারাটাকে আপনারা যত বড় মনে করছেন আমি তা করি না।

মালবিকা। তুমি ঈর্ষ্যায় একথা বলছ পাণ্ড্যরাজকুমার।

বলবন্ত। (ঈষৎ হাসিয়া) এই খানটায় তুমি চুপ করলে। সহদেব, ভাই আমাদের বন্ধুত্ব কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না, যেই যত চেষ্টা করুক না কেন?

মালবিকা। কেউ সে রকম চেষ্টা করছে বলেত জানি না।

বলবন্ত। তা বই কি? এখন আমার মনে হচ্ছে ঝগড়া বাধাবার জন্যই তুমি আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছ!

মালবিকা। তা তুমি ত বলবেই! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে গণ্য হতে পারলে না কিনা তাই—।

বলবন্ত। আমি চিরদিন সহদেবের ভাবনা আগে ভেবেছি, আমার নিজের ভাবনার চেয়েও!

মালবিকা। আচ্ছা বেশ! সহদেবের তুলনায় দ্বিতীয় আসন পাওয়াও গৌরবের কথা আর—(বীরবাহুর দিকে বক্র দৃষ্টি করিয়া) বিক্রমসিংহে থাকলে হয়ত তৃতীয় স্থান পেতে পারতেন!

বীরবাহু। তবে তোমার বাপ গোকুল থাকলে সে সকলের নীচের আসন পেত। বিক্রমসিংহের তরবারির কাছে তাকে বরাবারী হতে হয়েছিল—মনে থাকে যেন।

(পরবর্ত্তী উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমশঃই বেশী উত্তেজনার সহিত চলিতে লাগিল)

মালবিকা। হাঁ খুব মনে আছে। সকলেই জানে বিক্রমসিংহে কবি। লোকে বলে তিনি—করেন যা তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বলেন।

বীরবাহ। যারা বলে তাদেরে সাবধান হয়ে বলতে বলো, আমার কাণে যেন তাদের কথা না পৌঁছায়।

মালবিকা। (ব্যঙ্গ হাস্য হাসিয়া) কি করবে? শাস্তি দিবে? অজাতশ্মশ্রু বালকের স্পর্দ্ধা!

বীরবাহ। অজাতশ্মশ্রু বালকও তোমার মত রমণীর সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে ঘৃণা বোধ করে।

মালবিকা। ঐ ঝগড়াটে করতে জান, আরত কিছু ক্ষমতা নেই,—কাপুরুষ! তাইত তোমার ভাইয়েরা সব যুদ্ধে যায় আর তোমার বাবা তোমায় ঘরে বসিয়ে রাখেন!

বীরবাহ। বাবা অনেক অন্যায় করেন বটে কি? সিংহলে তোমার উপর ভাল করে চোখ না রাখাও তাঁর অন্যায় হয়েছিল। রাখলে অমন করে তুমি সহদেবের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারতে না!

সহদেব ও বলধন্ত। বীরবাহ!—

তরলিকা। (একই সময়ে) ভাই!—

মালবিকা। (নিম্নস্বরে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) আঃ—আর কিছুক্ষণ, আরো কতক্ষণ!—

বীরবাহ। (সহদেবের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া) রাগ করোনা চোলরাজ, আমি অন্যায় বলেছি, কিন্তু তোমার স্ত্রীই আমায় রাগিয়েছে!

তরলিকা। (নিম্নস্বরে অনুনয় করিয়া) মাগ্, বোন,—বিবাদ বাধিয়ো না, তোমার হাতে ধরি—।

মালবিকা। (হাসিয়া) নিমন্ত্রণের দিনে একটু হাসি তামাসা করতে হয় বই কি, নচেৎ আমোদ হয় কৈ!

সহদেব। (বীরবাহুর সহিত একধারে আলাপ করিতে করিতে) তুমি বাপের উপযুক্ত পুত্র বীরবাহ। (দেয়ালে একখানা তরবারি ঝুলিতেছিল, তাহা লইয়া) এই নেও—আমার উপহার, আমার বন্ধুত্বের চিহ্ন—আশা করি তোমার হাতে এর সদ্ব্যবহার হবে।

বীরবাহ। (অস্ত্রখানা পরীক্ষা করিতে করিতে) ভারী সুন্দর জিনিষটি! তোমার দান অন্যায় যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না কখনো, চোলরাজ।

মালবিকা। যদি কথা ঠিক রাখতে চাও তবে তোমার ভাইয়ের হাতে কখনো এ তরবারি দিও না, আর—

সহদেব। আবার, মালবিকা!

মালবিকা। (না থামিয়া) তোমার বাপের অস্ত্রাগারেও এটা রেখো না, কারণ তা হ'লে একজন কাপুরুষের অস্ত্রের পাশে এর স্থান হবে।

বীরবাহ। সেত ঠিক কথাই! অনেক বৎসর ধ'রে সেখানে যে তোমার বাপের অস্ত্রশস্ত্রগুলো রয়েছে!

মালবিকা। (আত্মদমন করিয়া) তুমি সব সময়ই ভারী বড়াই করছ,—বিক্রমসিংহ আমার বাবাকে পরাজিত করেছিলেন! কিন্তু লোকে কি বলে জান? জান্‌লে অত বড়াই কর্ত্তে না!

বীরবাহ। কি বলে লোকে?

মালবিকা। (ঈষৎ হাসিয়া) বল্‌তে সাহস হচ্ছে না, তুমি ভারী রাগ হবে!

বীরবাহ। তবে চুপ্ থাক, তাই ভাল।

মালবিকা। তা তোমায় বল্লেও পারি! লোকে বলে বিক্রমসিংহ আমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আগে, মেয়ের কাপড় পরে তিন রাত্রি ভাইনির ঘরে আড়ষ্টিয়েছিল! সত্যি নাকি?—

(সকলে আতঙ্কে দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

বিষ্ণুপ্রিয়া

(চৈতন্যদেব নূতন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলে নবদ্বীপবাসী প্রায় সকলেই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী দর্শন নিষেধ বলিয়া তিনি সেই সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকে আসিতে বারণ করেন। পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার মনের অবস্থা নিম্নলিখিত কবিতায় ব্যক্ত হইল।)

(১)

আমার নিবেদ শুধু! মোর নাই অধিকার!
আমার জীবন-মণি নিরখিতে একবার!
আমার কি অপরাধ আমি যে দয়িতা তাঁর!
ত্রিলোক পারিবে যাহা, পারিব না আমি আর!

(২)

আমার নিবেদ শুধু! নদীয়া উজার করি,
ছুটিয়াছে জনে জনে হেরিবারে গৌরহরি!
আমার নিবেদ শুধু! মোর নাই অধিকার!
আমার জীবন-মণি নিরখিতে একবার!

(৩)

আমার নিবেদ শুধু! আমার কি অপরাধ?
নারিব মিটাতে হায়, আকুল হৃদয়-সাধ!
আমার কি অপরাধ? আমি যে দয়িতা তাঁর!—
ভালবাসিয়াছি তাঁরে নিশিদিন অনিবার!

(৪)

আমার নিবেদ শুধু! অধিকার নাহি মোর!
বুঝিতে কখনো তরে পারিব না আঁখি-লোর!
আমার কি অপরাধ? আমি যে দয়িতা তাঁর!
তাঁরে ছাড়া এ জীবনে জানি নাই কিছু আর;

(৫)

যদি আজি না হতাম তাঁহার গৃহিণী আমি
পারিতাম সখা সনে হেরিতে হৃদয়-স্বামী!
সে কি মোর ছিল ভাল? সে কি বেশী প্রিয় মোর?
কেমনে ভাবিব হায়! এ বিধান সুকঠোর!

৬

তাঁহার আমেক আমি! কি গৌরব এ আমার!
তিনি যে আমারি শুধু! আমি যে কেবলি তাঁর!
জগতের কোন সুখ কোন আশা-লাভে আর
পারি না ছাড়িতে আমি আমার এ অধিকার!

৭

হেরিতে দেবতা মোর ছুটিয়াছে ত্রিভুবন,
নাই বা হেরিনু আমি! শোক তায় কি কারণ?
সকলে দেখুক তারে! ছুটে যাক যথা ভোর!
নাই বা হেরিনু আমি! তবু শুধু তিনি মোর!

৮

একদিকে এ ধরণী, আর দিকে শুধু আমি,
আমারে পুলক করি বরিলা আজিকে স্বামী!
বুঝিলাম এতদিনে ভালবাসা কত তাঁর
ঘুরে রহি প্রাণে প্রাণে হতে চান একাকার!

৯

হে মোর অন্তরবাসী, এ জনম-বনবাসী;
বুঝিনু দাসীর প্রতি কেন আজি নিঠুরাসী;
সন্ন্যাস কাহারে কয়? তোমার সন্ন্যাস কিবা?
তুমি তো সন্ন্যাসী ছিলে নিজ বাসে নিশিদিবা!

১০

সর্ব্বজন সুখ আশে বিশ্ব-হিত-কামনায়!
আপনার প্রিয় সুখ হাসি মুখে ত্যাজি হায়!
সন্ন্যাসী বরিয়া লন জগতের মহাসুখ!
সন্ন্যাসে যে দুখ বড় সহিতে পাষাণ বুক!

১১

তাই যদি হল নাথ! কি তোমার প্রিয়-সুখ?
আমি কি ত্যাজিয়া তুমি বরে নিলে কোন্ দুখ?
নিবেদিব কিবা আর বচন নাহিক সরে
হৃদয় মুদিয়া আসে পুলক-আবেশ ভরে!

১২

আমারি নিবেদ শুধু! ডাকিয়াছে সবে আর!
আমারি বিরহ বুঝি দুঃখ তব গুরুতর!
আমারি মিলন তবে সুখ তব প্রিয়তর!
সব চেয়ে আপনার আমি তব প্রাণেশ্বর!

১৩

এসেগো নিবেদ নয়! এ যে গূঢ় আবাহন!
চরণের দাসী আমি, সঁপিতেছি শ্রীচরণ!
সরে গেল আঁখি হতে একি মোহ আবরণ!
তোমাতে আমারে প্রভু, কর আরো নিমগন!

১৪

বলেছিলে একদিন প্রিয়জন-আঁখি-জলে
জগতের পাপ-তাপ ধুয়ে দিবে কুতূহলে!
তবে তো কঠিন ধরা মধুমাখা হরিনাম
পাইবে—পূরিবে তব চিরন্তন মনস্কাম!

১৫

আজি বুঝি কৃপাময়! আসিল সে শুভদিন!
কাঁদাইতে পরিজন তাই তুমি উদাসীন!
তাই তুমি বহাইলে মহা অশ্রু-পারাবার
মায়ের, ভক্তের আর অভাগিনী দয়িতার!

১৬

এই অশ্রু-পারাবারে ভুবন গলিবে আজ!
এই অশ্রু-পারাবারে ভুবন ভাসিবে আজ!
এই অশ্রু-পারাবারে ভুবন মাতিবে আজ!
এই অশ্রু-পারাবারে ভুবন ডুবিবে আজ!

১৭

তবে দেব! তাই হোক! এস্তরে হান বাজ!
বসুধা হারাক লভি সুধাময় মূল-সাজ!
নীরবে পালিব আমি, দিও শক্তি, শক্তিধর!
সধবার বৈধব্যের কৃচ্ছ্রব্রত গুরুতর!

১৮

আজি তুমি মুক্ত নাথ! জগতের মুক্তিতরে!
বাঁধিতে চ.বনা আর আমার এ ক্ষুদ্র ঘরে!
মোর তুচ্ছ সুখ-হাসি-আশা-সাধ-ভালবাসা,
তোমার আনন্দ মাঝে মিটাবে অতৃপ্ত তৃষা!

১৯

বিশ্বের সমস্ত-আত্মা করে তোমা আকিঞ্চন,
উৎসর্গ করিনু আজি দুখিনীর প্রাণ-ধন!
আমার এ অশ্রুরাশি জাহ্নবীর ধারা সম
করে দিক্ ধরিত্রীরে নিরমল নিরুপম!

২০

করুণা-সাগর তুমি, তুমি প্রেম-অবতার!
ধরায় রেখো না আর দুঃখ দৈন্য হাহাকার!
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, পাণ্ডিত্যের অভিমান,
সব তুমি চূর্ণ করি দাও আজি মহীয়ান!

২১

শুধু প্রেম, শুধু দয়া শুধু ত্যাগ অনুদিন,
শিখুক তোমার কাছে অমি নাথ, প্রতিদিন!
পুণ্য-শান্তি-পবিত্রতা-আনন্দে সৌন্দর্য্যে আর
স্বর্গ হোক মর্ত্ত্যলোকে জ্যোতির্ম্ময়ী অমরার!

২২

তব প্রেম বিরচিত বিশ্ব-স্বর্গে দাসী তব
অর্চ্চিবে তোমারে নিত্য প্রেম ভরে অভিনব!
হে সুন্দর প্রেমময়! তুমি থেকো বর্ত্তমান
পূর্ণ করি ভবিষ্যৎ, পূর্ণ করি বর্ত্তমান!

২৩

অন্তর বাহির মোর হ'য়ে যাবে তোমাময়!
তোমা ছাড়া বিশ্বে কিছু নাহি রবে সুনিশ্চয়!
রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারা গাবে তব স্তুতি গান!
"জীবে দয়া, নামে রুচি" দিবে সবে পরিত্রাণ!

২৪

জীবন-জীবন ময়, ভুবন-জীবন আজ!
এ তো নহে যতি-বেশ! এ যে রাজ-অধিরাজ!
তবে কেন দুঃখ আর? তবে কেন অশ্রু বয়?
হারায়ে পেয়েছি আজ যা' কভু পাবার নয়!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শ্বশুর ও পুত্রবধূ *

রাজা বেস্‌সান্তর পিতাকর্ত্তৃক বন-গমনে আদিষ্ট হইলে সপ্তশত বস্তুর মহাদান ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য একদিন মাত্র সময় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি সমস্তদিন দান করিতে করিতে দাতব্যাশ্রমে অতিবাহিত করিয়া রাত্রি সমাগত হইলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন:—

* বোধিসত্ত্ব বেস্‌সান্তর কলিঙ্গ দেশীয় আটজন ব্রাহ্মণকে বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণকারী ধবল গজ-কুঞ্জর দান করাতে প্রজাগণ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তৎ পিতৃসমীপে অভিযোগ করেন। মহারাজ সঞ্জয় তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক প্রদানে অসমর্থ হইয়া প্রজাগণের অনুরোধে পুত্রের নির্ব্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। তদীয় পুত্রবধূ মাদ্রী বহু সুযুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া অরণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন। (জাতক গল্প।)

কল্য প্রাতঃকালে আমাকে এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এখন আমার জনক-জননীর নিকট বিদায়-গ্রহণ ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিব। এ রাত্রিতেই গৃহত্যাগ করিব, আর প্রাসাদে প্রবেশ করিব না।

অনন্তর বেস্‌সান্তর অশ্বচালিত রথে পিতৃ-প্রাসাদে গমন করিলেন। তাঁহার মহিষী মাদ্রী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন :—আমিও পুনঃ প্রাসাদে প্রবেশ করিব না। এখন আমি আমার শ্বশুর-শ্বশ্রূ হইতে বিদায়-গ্রহণ ও সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া পতির অনুগামিনী হইব।

অতঃপর মহিষী মাদ্রী স্বামী-সমভিব্যাহারে একই রথে গমন করিলেন। বেস্‌সান্তর পিতৃসন্নিধানে অগ্রসর হইয়া পিতৃচরণে সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন :—প্রজাগণ আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, কল্য আমি বঙ্ক-পর্ব্বতে যাত্রা করিব। পিতঃ! মানবমাত্রই লাভালাভ, যশঃ অযশঃ, নিন্দা প্রশংসা, সুখ দুঃখ—এই অষ্টপ্রকার লোকধর্ম্মের অধীন।

এ পৃথিবীতে জীবমাত্রেই সময়ে সুখ, সময়ান্তরে দুঃখ ভোগ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কেহ ভোগ করিতে পারে না। সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই ক্ষণস্থায়ী দুঃখে সন্ত্রাসিত হইয়াই সর্ব্বজ্ঞতা লাভের চারসে মণীর হর্ম্ম্যস্থিত আমার সমুদয় সম্পত্তি অর্থীদিগকে দান করিয়াছি। এ দানের দ্বারা প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিয়াছি। সুতরাং তাহাদের প্রার্থনানুসারেই এ রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। মানব সম্পদ্ বিপদ হইতে কখনও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং যদিও আমি অধুনা ব্যাঘ্র চিত্রা প্রভৃতি শ্বাপদজন্তুসমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে দীনভাবে জীবন যাপন করিব, তথাপি অরণ্যে এমন সাধুকার্য্য সম্পাদন করিব যাহাতে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। পিতঃ! আপনি শুধু এ মোহ-সুখে নিমজ্জিত থাকুন।

পিতার সহিত এবম্বিধ বাক্যালাপের পর বেস্‌সান্তর মাতৃসন্নিধানে অগ্রসর হইলেন। মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

'মাতঃ! আপনার স্নেহ বশ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। প্রজাগণকে আমার স্বকীয় সম্পত্তি দান করিয়া সাতিশয় আনায়াস করিয়াছি। এই পাপেই আমি নির্ব্বাসিত হইতেছি। বঙ্ক-পর্ব্বতে গমন করিয়া দীনভাবে সন্ন্যাসীরূপে জীবন যাপন করিব। মাতঃ! আমার সদিচ্ছার সহিত বিদায় দিন্।'

জননী কহিলেন :—"বৎস! বঙ্ক-পর্ব্বতে গমন করিয়া ঋষিরূপে অভিজ্ঞান ও সমাপত্তি অর্জ্জন কর। তথায় অন্যান্য পুণ্যক্রিয়াও সম্পাদন কর। আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমায় বিদায় দিতেছি, কিন্তু আমার কোমলাঙ্গী বধূমাতা কখনও আতপতাপ সহ্য করেন নাই। গভীর অরণ্য তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নহে। জানারেণী যতির সহচারিণী হওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গতও নয়। বৎস! তোমার সহিত তাঁহার অরণ্যযাত্রার প্রয়োজন কি? সপুত্র তিনি গৃহেই অবস্থান করুন।

বেস্‌সান্তর কহিলেন :—'মাতঃ! আমার স্বকীয় দেহের উপরও আমার কোন ক্ষমতা নাই, বিশেষ কি, অধুনা আমি একজন সামান্য ক্রীতদাসকেও আমার সহ-গমনে বাধ্য করিতে পারি না। মাদ্রী যদি আমার অনুগমন করিতে বাঞ্ছা করে, তবে আমার অনুগমন করুক। যদি গৃহে অবস্থান করিতে অভিলাষ করে তবে গৃহেই অবস্থান করুক।'

মাতা-পুত্রের এবম্বিধ বাক্যালাপ কর্ণগোচর করিয়া মহারাজ সঞ্জয় পুত্রবধূ মাদ্রীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—

'বধূমাতঃ মাদ্রী! আপনি রাজভবনে অবস্থান করিয়া অঙ্গে চন্দন সৌগন্ধি বিলেপনে অভ্যস্তা, অরণ্যে ধূলাবলুণ্ঠিতা হইতে কেন অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন? আপনি কাশীজাত লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, এখন কেন বল্কলধারণে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে? বধূমাতঃ! অরণ্য-জীবন, এমন্ কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি অথবা সংসার-বিরাগী ও যে কোনপ্রকার অল্পবস্ত্র ও শয্যায় সন্তুষ্ট দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত ক্লেশকর ও শোচনীয়। আপনি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারে দুর্ব্বলা এবং সহজেই ভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন। অরণ্য আপনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নহে। সুতরাং আপনি তথায় গমন করিবেন না।'

মাদ্রী উত্তর করিলেন :—'আর্য্য! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে কিন্তু আমি স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অঙ্গে সৌগন্ধি বিলেপন বা সুখস্পর্শ শয্যায় শয়ন বা লক্ষমুদ্রা মূল্যের কাশীজাত শিল্পের বস্ত্র পরিধান করিতে বাঞ্ছা করি না, আমার স্বামীর সহবাসে ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া বল্কল ধারণ করিয়া বনজাত ফলমূল সন্তাপত্র ভক্ষণপূর্ব্বক অরণ্যাভ্যন্তরে অথবা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইব। আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না।'

মহারাজ সঞ্জয় পুত্রবধূকে ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিলেন :—'বধূমাতঃ! আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন, অরণ্য আমাদের রাজভবনের তুল্য নহে, অরণ্য মশক, মক্ষিকা, বৃশ্চিক ও নানাবিধ কীটে পরিপূর্ণ। ইহাদের দংশন-যন্ত্রণা সহ্য করা অত্যন্ত দুরূহ। এবম্বিধ ক্লেশ আপনি সহ্য করিতে পারিবেন না। এতদ্ব্যতীত এক প্রকার জন্তুগণ আছে, তাহারা নদীর তীরে বা বিলের ধারে অবস্থান করে, যদিও তাহারা বিষাক্ত নয়, তথাপি মানবের অত্যন্ত ভয়ের কারণ। তাহারা নদীর ধারে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে, তাহারা এত শক্তিসম্পন্ন যে মনুষ্য, মৃগ বা অপর জন্তু সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উদরসাৎ করিয়া ফেলে। কৃষ্ণকুঞ্চিত-রোমবিশিষ্ট ভল্লুকও মানবের অপর এক বিপদের কারণ। বারেক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বৃক্ষারোহণেও বিপদমুক্ত হইতে পারিবেন না। কুঞ্জরা নদীর উপকূলে সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী বন্য মহিষগণ বাস করে, তাহাদের শৃঙ্গ সূচীর অগ্রভাগের তুল্য। এবম্বিধ বিপৎপাতে কি উপায়ে জীবন রক্ষা করিবেন? সন্তানগণের অদর্শনে স্নেহবৎসা ধেনুর ন্যায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবেন না? বধূমাতঃ! ইদানীং প্রাসাদাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়াও কখনও কখনও শৃগালের রবে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়েন, এমন অবস্থায় আপনার বন্য-পর্ব্বত গমন কি সম্ভবপর? মধ্যাহ্নে পক্ষীকুলের সমবেত কলধ্বনি গভীর অরণ্যের প্রতিধ্বনিবৎ অতীব ভীতি-ব্যঞ্জক। যে অরণ্যে এবম্বিধ বহুপ্রকার শঙ্কা ও ভয়ের কারণ বর্ত্তমান, আপনি কেন তথায় গমনে অভিলাষিণী?'

মাদ্রী উত্তর করিলেন :—'হে দেব! হে শিবিরাজ্যের অধীশ্বর! অরণ্যে আপনার বর্ণনানুরূপ বিপদ্‌রাশি সত্ত্বেও আমি স্বামীর অনুগমন করিব এবং তজ্জনিত ক্লেশ ধীর ভাবে সহ্য করিব। দেব! দুঃখ ব্যতিরেকে যদি শুধু স্বামীর সুখের অংশভাগিনী হই, তবে আমি স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলাম কৈ? অরণ্যাভ্যন্তরে আমার স্বামীর পুরোভাগে গমন করিয়া আমার বক্ষঃ দ্বারা তৃণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলী অপসারিত করিয়া স্বামীর গন্তব্যপথ সুগম করিব। আমি তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিব। এমন কি, লতাগ্র বা তৃণরাশি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও দিব না। আর্য্যরমণীর পক্ষে সুপতি-সংযোগ বড়ই দুর্লভ। সুপতি লাভের প্রত্যাশায় রমণীগণ কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া জনকজননীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, শুচি ও সদাচারের নীতি সযত্নে পালন করিয়া থাকেন এবং সময়ে বসন ভূষণে সজ্জিতা থাকেন দেব! রমণীজাতির পক্ষে ভর্ত্তৃবিহীনা হওয়াই অত্যন্ত গুরুতর ক্লেশ, তবে কেন আমি স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া দুঃখিনী বিধবার ন্যায় অবস্থান করিব? আমি অন্য এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি:—মনোহর-পুলিন দ্বীপ ও সুন্দর তটশালিনী নদীর সমস্তই বৃথা যদি তাহার জলের অভাব হয়। উচ্চ প্রাচীরস্থিত প্রহরীশালা, উদ্যান, তোরণ, বিপণি-শ্রেণী ও প্রাসাদ-শালিনী নগরীর সমুদায়ই বৃথা, যদি তাহার শাসন-কর্ত্তার অভাব হয়। ধনী ও কুলীনের ধন ও কুল বৃথা, যদি তাহার শিক্ষার অভাব হয়। লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের পরিচ্ছদ-ভূষিত ব্যক্তির মূল্যবান পরিচ্ছদ বৃথা, যদি তাহার চরিত্রের অভাব হয়। এমন কি, বল তাহা বিশিষ্টা রমণীর ভ্রাতা বৃথা, যদি তাহার স্বামীর অভাব হয়। আমি অন্য এক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। যেমন রথের শক্তি জয় পতাকা, অগ্নির শক্তি ধূম, রাজ্যের শক্তি রাজা, মানুষের শক্তি বিদ্যা, তেমনি রমণীর শক্তি তাহার স্বামী। আর্য্য, যদি কোন পতিব্রতা রমণী স্বামীর সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হন, তবে দেবগণ, ব্রাহ্মণ, এমন কি স্বয়ং দেবরাজও প্রশংসা করিয়া থাকেন। যদবধি আপনার

পুত্র কপিল বসন ধারণ করিবেন তদবধি আমিও অবশ্য তদ্রূপ বসন ধারণ করিয়া সকল ঋতুতেই তাঁহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিব। পর্ব্বতোপরি ও উপত্যকা মধ্যে কোন ভীষণ শ্বাপদ জন্তুর সম্মুখীন হইলে আমিই প্রথম অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার পুরোভাগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। একাকিনী এ রাজ্যে অবস্থান করিয়া এ বিশাল রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার পুত্র যদি রাজত্ব করেন, তবে আমিও তখন তাঁহার সুখের অংশ গ্রহণ করিব। যে রমণী স্বামীর সহিত শুধু সুখসম্ভোগ করে কিন্তু দুঃখের সময় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে, সে রমণী পিশাচী দানবী তুল্য নিকৃষ্টা, সুতরাং আমি আমার স্বামীর সহচারিণী হইব।'

মহারাজ সঞ্জয় কহিলেন 'বধূমাতঃ! স্বামীর সুপথী রূপে তাহার সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হইবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমস্ত যথার্থ বটে। তজ্জন্য আপনাকে নিবারণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না; কিন্তু আপনার জালী ও কৃষ্ণাজিনা নিতান্ত শিশু, অরণ্য তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নহে। তাহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়া যান। আমি আপনার অপেক্ষা যত্নে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।'

মাদ্রী উত্তর করিলেন :—'পিতঃ, আমার সন্তানগণকে আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি। অরণ্য, নগর ও রাজপ্রাসাদের বাসনা মনে জাগিয়া উঠিলে যখন দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িব, তখন তাহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে দুঃখের শান্তি লাভ করিব।'

পুনশ্চ সঞ্জয় বলিলেন :—'আপনার স্বামীর প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা প্রযুক্তই আপনি দুঃখ ভোগ করিবেন কিন্তু আমার পৌত্রপৌত্রী উভয়ে এখনও নিতান্ত শিশু; তাহারা সর্ব্বদা রাজভবনে অবস্থান করিয়া অতি উপাদেয় খাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত, অরণ্যে কিরূপে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবে? তাহারা শত পল ওজনের কনক পাত্রে ভোজন করিয়া থাকে। আমার পৌত্রপৌত্রী কিরূপে বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবে! তাহারা কাশ ও কুশ-জাত বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, কি প্রকারে তাহারা বল্কল ধারণ করিবে? প্রাসাদাভ্যন্তরে অথবা তৎবহির্ভাগে গমন কালে সুবর্ণ যানে বা অশ্বচালিত রথে গমন করিয়া থাকে, বনমধ্যে কিরূপে পদব্রজে গমন করিতে সমর্থ হইবে? যাহারা শয়নকক্ষের পরাক্ষার বন্ধ করিয়া বহু বাহুতে সুখস্পর্শ শয্যায় নিদ্রা যাইতে অভ্যস্ত, কি প্রকারে তাহারা কণ্টকময় ধূলিশয্যায় শয়ন করিবে? তাহারা সুবর্ণ-পালঙ্কে, ধূলিত কার্পাসাপেক্ষা কোমলতর গদিতে শয়নে অভ্যস্ত, কি প্রকারে অরণ্যে কঠিন তৃণশয্যায় শয়ন করিবে! তাহারা অঙ্গে চন্দন সৌগন্ধি বিলেপন করিয়া থাকে, অরণ্যে কি প্রকারে ধূলাবলুণ্ঠিত দেহে অবস্থান করিবে! আমার নিরাশ্রয় পৌত্রপৌত্রী অরণ্যের বিপদাপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; হর্ম্ম্যে সুবর্ণ-পক্ষী ও ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যজনে মশক-দংশন হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে কিন্তু অরণ্যে কিরূপে মক্ষিকা ও মশক-দংশন সহ্য করিবে?

মাদ্রী উত্তর করিলেন:—আর্য্য, আপনি দুঃখিত হইবেন না। আপনার পৌত্রপৌত্রীর তত্ত্বাবধান আমিই করিব। আমার যাহা খাদ্য বসন মিলিবে তাহাই তাহাদিগকে প্রদান করিব। যাহাতে তাহারা কোন বিষয়ে ক্লেশ না পায় তজ্জন্য যত্নবতী হইব।

শ্বশুর ও পুত্রবধূর এবম্বিধ বাক্যালাপে রাত্রি-প্রভাত হইল। তৎকালে চতুঃসিন্ধুঘোটক-সংযোজিত সুসজ্জিত রথ মহারাজ সঞ্জয়ের প্রাসাদ-দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছিল। মাদ্রীদেবী শ্বশুরপক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সখী ও পরিচারিকাগণ সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া আপন সন্তানগণকে লইয়া সত্বর শ্বশুরের প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং রাজা বেসদাম্বরের অগ্রে রথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বেসদাম্বর বহু সম্মান পুরঃসর জনক জননীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সিন্ধুঘোটক পরিচালিত রথারোহণ রথে প্রবেশ করতঃ ষাটি সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বঙ্গ-পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা

আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী হইলেও, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সহিত আমাদের পরিচয় খুব কম। এই অজ্ঞতার ফলে অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা আমদানি করা হইয়াছে। এই ভ্রমাত্মক ধারণা বিদূরিত করিবার মানসে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। অধিকাংশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, বৈদিক যুগই মানবীয় সভ্যতার আদিম যুগ। আমরা দেখিতে পাইব যে, বৈদিক যুগ হইতেই আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে।

ঋকবেদই আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ। ঋক-বেদের ঋষিগণ প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তিকে একটি দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্যের আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়, তাই সূর্য্য একটি দেবতা। মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া বসুন্ধরা শস্যশালিনী করে, তাই মেঘও একটি দেবতা। বায়ু প্রবল বেগশালী, তাই বায়ুও একটি দেবতা। এইরূপে ঋষিগণ তেত্রিশ জন দেবতার পূজা করিতেন। সমস্ত ঋকবেদখানি দেবতাদের স্তুতি গানে পরিপূর্ণ। এক একটি দেবতা লক্ষ্য করিয়া অনেক-গুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছে, কতকগুলি মন্ত্র নিয়া একটি সূক্ত গঠিত। ঋকবেদের অনেকগুলি সূক্ত আর্য্য-মহিলাদের সঙ্কলিত।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটি কথার উল্লেখ করিব। আজকাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বলিয়া থাকেন যে, নারীর বেদপাঠে অধিকার নাই। "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রৈ ন শ্রুতি গোচরাঃ।" অর্থাৎ নারী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ। এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রাচীন ভারতের বিদুষী মহিলাগণ শুধু বেদগান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা স্বয়ং বৈদিক মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন।

সভ্যতার উষাকালে ভারত রমণীর প্রতিভাসূর্য্য যে মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ করিয়াছিল, বেদ এবং উপনিষদ্ হইতে আমরা তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। ঋকবেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮শ সূক্তটি অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী ব্রহ্ম-বাদিনী মহিলাকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। এই সূক্তে ছয়টি ঋক আছে;— ঋকগুলি যেন এক একটি মাণিক—ভাষার সৌন্দর্য্যে ও ভাবসম্পদে সেগুলি অতুলনীয়। ঋষিকন্যা বাক্ ঋকবেদের দশম মণ্ডলে ১২৫ সূক্তে আটটি মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া দার্শনিক জগতে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, শঙ্করাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে, ঋষিকন্যা বাক্ ঐ অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যে-কোন দেশের রমণীর পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের কথা নয়। অষ্টম মণ্ডলে প্রথম সূক্তে চৌত্রিশটি মন্ত্র ও দশম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তটি পুরূরবা ও তদীয় পত্নী উর্ব্বশীকর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মহাকবি কালিদাস এই পুরূরবা ও উর্ব্বশীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিক্রমো-র্ব্বশী নাটক রচনা করিয়াছেন। এইরূপ ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি সূর্য্যা নাম্নী আর্য্য মহিলাকর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৫৯ সূক্তটি বৃহস্পতির ভার্য্যা নদু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৪৪ সূক্তটি ইন্দ্রাণীকর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ১৪৯ সূক্তটি যমীকর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আরও অনেক মহিলা ঋকবেদের সূক্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না। এখনও যাঁহারা নারীদিগকে উচ্চশিক্ষার অনধিকারিণী বলিতে চান তাঁহাদের বিচার শক্তির প্রশংসা করিতে পারি না।

ঋকবেদের পঞ্চম মণ্ডলে ৮৯ সূক্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা ভরতের পত্নী রাজ্ঞী শশীয়সী দেবতা-দিগের আরাধনা, জপ, তপ, হোম, পূজা এবং দানাদি কার্য্যে রত থাকিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীত আমাদের কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব। পূজা বিবাহ প্রভৃতি সকলপ্রকার মাঙ্গলিক ব্যাপারে আমাদিগকে পুরোহিত মহাশয়দের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু বৈদিক যুগে এই অন্যায় প্রথা হিন্দুসমাজে আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। যিনি গৃহের কর্ত্তা, তিনি তাঁহার পরিবারের সকলপ্রকার ধর্ম্ম সম্পর্কীয় এবং

সামাজিক কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে পারিতেন। কোন বাধা বিঘ্ন ছিল না। মহর্ষি বদরায়ণ বলিয়াছেন, "জপ, হোম, বেদপাঠাদি সৎকার্য্যে পুরুষই যে একমাত্র অধিকারী তাহা নহে, কারণ স্ত্রীলোকেরও তাহাতে ন্যায়ানুমোদিত অধিকার রহিয়াছে।"

বৈদিকযুগের পর উপনিষদের যুগেও আমরা দীপ্তিশালিনী রমণীর পরিচয় পাইয়া থাকি। উপনিষদ ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। যখন সমস্ত পৃথিবী অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ে আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেন। উপনিষদে যেমন গভীর ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এমন আর কোনও গ্রন্থে পাওয়া দুষ্কর। ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহে আমরা যে রমণীকে দেখিয়াছিলাম, উপনিষদের গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসায়ও আমরা সেই রমণীর সাক্ষাৎ পাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে মনস্বী সমাজে পূজার আসন পাইতেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। কনিষ্ঠা পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি একটি বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং সেখানে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। একদিন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দুই স্ত্রীকে ভাগ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী কিছুতেই সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি অম্লানবদনে স্বামীকে বলিলেন, প্রভো, আমি এই নশ্বর পার্থিব সম্পত্তির ভিখারী নই। "কিমহং তেন কুর্য্যাং যেনাহমমৃতস্যাং (অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমর হইব না তাহা নিয়া আমি কি করিব)" এতবড় উচ্চ কথা কোন দেশের কোন রমণী আজ পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিয়াছে কি? জগতের সমস্ত উন্নত সভ্যজাতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষকে আবার এই কথাই বলিতে হইবে, "কিমহং তেন কুর্য্যাং যেনাহমমৃতস্যাং" যিনি প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদিনীদের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন, তাঁহার নাম গার্গী। তিনি চিরকুমারী থাকিয়া সমস্ত জীবন জ্ঞানচর্চ্চায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের সেই গৌরবময় যুগে আরও বহু প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বিদ্যাবিস্তারে, ধর্ম্মপ্রচারে এবং অন্যান্য নানাবিধ সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শাসন করিবার জন্য তখনও মনু, পরাশর, কিংবা রঘুনন্দনের বিধিব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহারাজ জনক ঐশ্বর্য্যের কোলে প্রতিপালিত রাজা হইয়াও, স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতায় এবং অসীম পাণ্ডিত্য প্রভাবে ভারতীয় সুধীসমাজে ঋষির ন্যায় পূজা পাইয়া গিয়াছেন। একবার তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সেই যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন রাখা হইত। তাঁহারা অবলোকচ্ছে পুরুষদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন। অবরোধ প্রথার কল্পনাও বোধ হয় তখন আমাদের দেশে ছিল না। সেমিটিক জাতির সংস্রবে আসার পর হিন্দুসমাজে এই জঘন্য প্রথা প্রবেশ লাভ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ গুহ।

বাদল নিশায়

আজিকার বাদল নিশায়
কোন কথা বোল না আমায়,
বাতায়ন দ্যাও খুলি, নিভে যাক দীপগুলি,
বাহিরের অনন্ত আঁধার
করে দিক্ বৃহৎ অন্ধকার।

আমার মাথাটী কোলে রাখ
আমি কোন কথা কবনাক।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকুক মোর তব মুক্ত কেশ ভার।
পড়ে থাক সান্ত্বনার কথা,
জেগে থাক প্রাণ ভরা ব্যথা।

বাহিরের অনন্ত গর্জ্জন
করে দিক বধির শ্রবণ,
আমি শুধু মুদি আঁখি অনুভব করি শশি
মৃদুতর নিশ্বাস পবন
হৃদয়ের কম্পিত স্পন্দন।

ভেসে শুধু আসুক ক্রন্দন
নিখিলের বিরহ বেদন
বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ুক উষ্ণও বায়ে
বিন্দু বিন্দু ঝরুক কেবল
দুজনার তপ্ত আঁখিজল।

শ্রীমতী——

চয়ন

শিক্ষাসমস্যা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

* * *

শিক্ষাপ্রণালীর প্রথম সোপানে, আমরা অঙ্গচালনার আধিক্য থাকা দেখতে চাই। এই মূলভাব রেখে তোমরা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীই প্রবর্ত্তিত কর আর জাপানী প্রণালীই প্রবর্ত্তিত কর, তাতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই—যথোপযুক্ত অঙ্গচালনার ব্যবস্থা থাকলেই হোল।

শৈশব শিক্ষায় অঙ্গচালনার বিশেষ ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী বলে এমন যেন কেহ না মনে করেন যে শৈশবে আমরা ছেলেদের মানসিক জ্ঞানার্জ্জনের অথবা অধ্যাত্মতত্ত্ব হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাতে নিষেধ করছি। পশু পক্ষীর শাবকগণ দেখেছি যে জন্ম অবধি বুঝতে শেখে যে কে তাদের মা বাপ, কেমন করে চাইলে তারা খেতে পাবে। মানবশিশুও দেখি যে জন্ম অবধি, বিশেষত যখন থেকে চোখ খুলে' এই বিশ্বজগতের আশ্চর্য্য কারখানা দেখতে সমর্থ হয় তখন অবধি, স্বভাবতই জ্ঞান অর্জ্জন করতে শেখে। শৈশবকালে শিশুরা যেমন এক-দিকে পরিশ্রম করে সুখ পায় আরাম পায় বলে তাহাদের অঙ্গচালনা করে, তেমনি তারা পৃথিবীর জিনিষ দেখে শুনে সুখ পায় বলে মানসিক বৃত্তিসমূহেরও পরিচালনা করতে শেখে। শিশুদের অনুসন্ধিৎসা ও সকল বিষয়ে দৃষ্টি যে কি রকম শীঘ্র শীঘ্র প্রসারিত হয়, তাহা কে না লক্ষ্য করেছে? আমরা দেখেছি যে একটি তিন বৎসরের শিশু তাহার ছোট ভাইকে আদর করতে গিয়ে দৈবাৎ লাগিয়ে ফেওয়াতে তার বাপ তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, এটি সেই শিশু লক্ষ্য করেছিল এবং বাপ যে সেটা অন্যায় করেছিলেন তাও সে বুঝেছিল, আর সেই ভাবটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। আমাদের মত প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষার প্রথম সোপানে শারীরিক উন্নতির দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য রেখে যথোপযুক্ত মানসিক ও অন্যান্য জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করিতে হবে। কিন্তু বলে বলে একরাশ পুস্তক কণ্ঠস্থ করালেই যে সেই ব্যবস্থা হয় না সেটা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। শিশুরা অনুসন্ধিৎসার ফলে এটা কি, ওটা কি, এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতিকে উত্যক্ত করে তোলে। অনেকে এতে বিরক্ত হয় কিন্তু বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। এইরকম জিজ্ঞাসা ও তার সদুত্তর প্রাপ্তি দ্বারাই শিশুদের জ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়। শিশু-দিগকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এবং হাতেহেতেড়ে কাজের দ্বারা জ্ঞানদান করতে হয়। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী এই পথ অবলম্বন করে বলে আমরা শিশুদের জন্য সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করবার পক্ষপাতী।

শৈশবকালে শিশুদের শিক্ষাতে অঙ্গচালনাকে মুখ্য লক্ষ্য রেখে যেমন উপযুক্ত পরিমাণে মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা রাখা উচিত, তেমনি উপযুক্ত পরিমাণে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভেরও ব্যবস্থা রাখা উচিত। এই সময়ে আমরা কোনপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থের পাঠনা বা ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া সমর্থন করিনা। শিক্ষার প্রথমাবস্থায় গীতা প্রভৃতি মুখস্থ করালে বা একরাশ উপদেশ শোনাতে থাকলে ছেলেদের "হাঁচোড়ে পেকে" যাবার সম্ভাবনা। ছেলেদের মস্তিষ্ককে অন্তত কিলিয়ে পাকাতে গেলে ধর্ম্মের উপরেই তাদের একটা বিতৃষ্ণা আসবার খুব বেশী

সম্ভাবনা। তাই বলে এটা মনে করা ভুল যে শিশুদের মনে ধর্ম্মের মূলভাব, মহানের দিকে দৃষ্টি, আদৌ অথবা তাদের মনে ধর্ম্মের মূলভাব জাগান যায় না। সম্প্রতি আমরা পুরীধামে কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে উপরোক্ত তিন বৎসর বয়স্ক শিশু ছিল। তাকে যখন সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া হোল, সে অনেকক্ষণ ধরে ঢেউয়ের খেলা দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলে যে "এত জল কে ঢেলছে?" আমরা তার উত্তরে বলুম যে "এই আকাশে যে-ঈশ্বর আছেন, তিনি ঐ দূর থেকে জল ঢেলে দিচ্ছেন।" উত্তরটা যে খুব সঙ্গত অথবা শিশুর ধারণার উপযোগী হয়েছিল এমন কথা আমি বলছিনে। এই দৃষ্টান্তটি আমি কেবল এইটি দেখাবার জন্য বলুম যে অতটুকু শিশুর মনে ধর্ম্মভাবের মূল জাগ্রত হয় এবং সেই জাগ্রত ধর্ম্মভাবকে তাদের প্রশ্নের সদুত্তর দান প্রভৃতি নানা উপায়ে ক্রমশ পরিস্ফুট করে তুলতে হয়।

আমাদের দেশে ছেলেদের শিক্ষাসম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ বাক্য চলে আসছে—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।" সন্তানকে পাঁচ বৎসর লালনপালন করবে, তার পর দশ বৎসর তাড়না করবে, পুত্র ষোড়শ বৎসর বয়স্ক হলে তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারি। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের লালন পালন করলে অর্থাৎ তাদের শরীর গঠনের দিকেই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই সঙ্গে অবশ্য এক আধটু মানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের যে ব্যবস্থা করবে না তা নয়, কারণ সেটাও যে লালনপালনেরই একটা অঙ্গ।

শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানে এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে আরম্ভ করতে গেলে ছাত্রদিগকে বাধ্য হয়ে ঘরের বাহিরে যেতে হবে, খোলা হাওয়াতে বেড়াতেই হবে। আমাদের মতে এই দ্বিতীয় সোপানে ছাত্রদিগকে প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের এমন অংশ সকল শিক্ষা দেওয়া উচিত যেগুলি ঘরে বসে "বি-এস্-সি ক্লাসের মত মুখস্থ করতে না হয়। পশুশালায় নিয়ে গিয়ে প্রাণি-তত্ত্ব শেখাতে হয়, বোটানিকেল গার্ডেন বা অন্য কোন বড় বাগানে নিয়ে গিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ব শেখাতে হয়, অন্যান্য দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল মর্ম্ম শেখাতে হয়। এই ভাবে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করলে কেবল যে ছেলেদের খোলা হাওয়াতে বেড়াবার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে তা নয়, তার সঙ্গে ছেলেরা নিজেদের চোখ কান মন খোলা রেখে চলতে শিখবে এবং অনেক প্রাকৃতিক তত্ত্ব নিজেরা আবিষ্কার ও আয়ত্ত করতে পারবে। এই সময়েই ছেলেরা ভবিষ্যতে যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ছুতোরগিরি প্রভৃতি নানাবিধ হাতেহেতেড়ে কাজও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিক্ষার প্রথম সোপানের নাম যেমন আমরা শৈশবশিক্ষা দিয়েছি, তেমনি এই দ্বিতীয় সোপানের নাম আমরা বাল্যশিক্ষা দিতে পারি। বাল্যশিক্ষাতেও শৈশবশিক্ষার ন্যায় প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত শারীরিক উন্নতিসাধনে, অথচ এই সময়েই বিশেষ ভাবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ভিত গাঁথা আবশ্যক। এখন অবধি ছেলেদের কেবল এ-বি দুএকটী প্রশ্ন ও তার উত্তর দানের উপর তাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নির্ভর করলে চলবে না—বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক উন্নতিবিধায়ক বিষয় সকল নিয়মিত রূপে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সময়েই আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য তার মূল ধর্ম্মশিক্ষার সুনিয়মিত ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করে এসেছি যে বাল্যশিক্ষাতে বিজ্ঞানসমূহের এমন অংশগুলি শেখাতে হবে যেগুলি ছেলেদের ঘরের বাহিরে গিয়ে আয়ত্ত করতে হবে। সেইরকম ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়েও আমরা এইটুকু ইঙ্গিত করতে পারি যে বাল্যশিক্ষাতে যেটুকু ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে তাতে নীতির উপদেশই বেশী থাকা আবশ্যক। এই সময়ে যেমন ছেলেরা স্বভাবতই শারীরিক ব্যায়াম আদি করে শরীরকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করতে চায়, তেমনি এই সময়েই তাদের মন চটপট ফুটে উঠতে চায়। আর, এই সময়ই পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে তারা বুঝতে পারে যে সুনীতি ও সদ্ভাবই পরিণামে

সুফলপ্রদ। এই সময়েই তারা শিখিতে থাকে যে নিজের স্বার্থ ই জগতের সবটা নয়।

বাল্যশিক্ষাতে নানাবিধ বিজ্ঞান শেখাবার কথা আমরা উপরে বলে এসেছি। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য আমরা বিশেষ ভাবে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এটা কি কম দুঃখের কথা যে সেই দেশের শিক্ষিত লোকেরা কৃষির ক অ র জানবেন না? ভারতের বিদ্যালয় সমূহে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হলে কতদিকে যে ভাল হবার সম্ভাবনা তা বলা যায় না। সহরের বদ্ধ বাতাসের পরিবর্ত্তে পল্লীগ্রামের মুক্ত বায়ু সেবনের ফলে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল হবে, শারীরিক উন্নতি হবে; তখন আর কথায় কথায় ছেলেদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত দেখতে হবে না। তাতে দেশের আর্থিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।" ব্যবসায়বাণিজ্যে পূর্ণলক্ষ্মী বাস করেন এবং কৃষিকর্ম্মে তার অর্দ্ধেক ফল। বর্ত্তমানে কৃষকেরা ধনবান নয়, এই কথা বলে কৃষিশিক্ষা পরিত্যাগের কল্পনা করলে চলবে না। কৃষকেরা যে কেন ধনবান হয় না, সে বিষয় আলোচনা করবার বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপযুক্ত স্থান নয়। তবে আমাদের অভিজ্ঞতাতে যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে আলস্য এবং শিক্ষার অভাবই কৃষকদের ধনাভাবের দুইটি সর্ব্বপ্রধান কারণ। আর তারপর, দেশের সকল ছেলেমেয়ে যদি কৃষিবিষয়ে শিক্ষা পায় এবং কৃষিশিক্ষাতে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করা গৌরবের বিষয় মনে করে, তাহলে একটি মহান মঙ্গল সাধিত হয়—কৃষিকর্ম্মের উপর নীচকার্য্য বলে ভারতের শিক্ষিত লোকদের যে একটা ঘৃণা এসে পড়েছে সেটা চলে যায়। বর্ত্তমানে এদেশে একটি সাধারণ ভাব দাঁড়িয়ে গেছে যে লেখাপড়া ভাল করে শেখবার প্রধান ফল হচ্ছে যারই অধীনে হোক একটি মোটা মাইনের চাকরী পাওয়া। কৃষিকর্ম্ম সকল বিদ্যালয়ে শেখানো হলে এবং কৃষিশিক্ষা যে মন্দ নয় বরঞ্চ খুবই ভাল এই ভাবটা দেশের সকলের মনে বদ্ধমূল হলে কেরাণীগিরির উপর স্বদেশবাসীর লোলুপ দৃষ্টি চলে যাবে, এই আশা সুদূরপরাহত বলে বোধ হয় না। কৃষিশিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি কথা উঠতে পারে যে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব এবং চিকিৎসকেরও অত্যন্ত অভাব। এর উত্তরে আমরা বলতে চাই যে ছেলেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্মে শিক্ষিত হলে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ থাকতে পারবে না বলেই আশা করা যায়। এখন শিক্ষিত পল্লীবাসীরা চাকরীর জন্য সহরে এসে বাস করেন এবং কাজেই নিজেদের গ্রামসমূহের প্রতি মনোযোগ করবার অবসর পান না; জলাশয়গুলি ক্রমশ ভরাট হয়ে আসে এবং গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরে যায়। তখন কাজেই গ্রামগুলি রোগের আশ্রয়-স্থান হয়ে পড়ে। আমরা কিন্তু বলতে চাই যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্মে শিক্ষিত হলে ছেলেরা স্বভাবতই নিজেদের গ্রামসমূহকে পরিষ্কৃত রাখবে—না রেখে থাকতে পারবে না। তা ছাড়া, তারা পোজাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হবে। সে জাতির উন্নতি হলে ভবিষ্যৎবংশীয়েরা খাঁটি দুধ ঘি খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠবে। এই সব কথা ভাবলেও শরীর পুলকিত হয়ে ওঠে। যদি পল্লীগ্রামগুলি লোকে ভরে যায়, তাহলে চিকিৎসকেরও অভাব হবে না—পল্লীগ্রামে লোক থাকে না, কাজেই সেখানে চিকিৎসা করলে অন্ন জুটবে না বলেই কোন ভাল চিকিৎসক পল্লীগ্রামে বাস করতে চান না। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

ভূদেব বাবু ও ছেলেদের শিক্ষা।

(অনাদিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

শত উপদেশ অপেক্ষা একটি দৃষ্টান্তে অনেক বেশী কাজ হয়। সেই জন্য দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ভূদেব বাবুর পুত্র রায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিম বাবু, ও পৌরদাস বসাক মহাশয় এক সময়ে তিন জনে হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর, বাড়ী যাইবার জন্য তিনজনে তিনখানি গাড়ী ডাকাইলেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবুকে কোন কার্য্যের উপলক্ষে সেদিন রেভিনিউবোর্ডে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে অনেকক্ষণ দেরী হওয়ায় গাড়োয়ানকে ঘণ্টা

হিসাবে ৭।০ ভাড়া দিতে হয়। শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু মাসের শেষ আপনার খরচের খাতার অঙ্কগুলি পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলে, ভূদেববাবুর চোখ পড়িল, সেই ২০ গাড়ীভাড়ার ভাড়াটা অতিরিক্ত বোধ হইল। এত খরচ কেন করা হইল জিজ্ঞাসা করায়, পুত্র বলিলেন, "কলিকাতায় কাজ থাকিলে—হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া, ট্রামে করিয়া অল্প দিন যাই। কিন্তু ঐদিন আর দুইজন ডেপুটি গাড়ী ডাকাইলেন, আমিও তাঁহাদের মত গাড়ী ডাকাইয়াছিলাম।" ভূদেববাবু আর কিছু বলিলেন না। পরে যেদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যান, ফিরিয়া আসিবার পর, পুত্রের সহিত চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইলে, বলিলেন—"আমি আজ এই বয়সে হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া, ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করিতে গিয়াছিলাম—গাড়ীর খরচ বাঁচাইয়াছি। অপ্রয়োজন ব্যয় মাত্রই অপব্যয়।" পুত্রের ভ্রম কাটিয়া গেল—ঐসময়ে তিনি আরও বলেন, "নিজের শরীরের উপর ব্যয় সঙ্কোচে লজ্জার কোন কারণ নাই। সৎপথে যখন চলিবে, তখন নিন্দা বা লোকলজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মতি সৎপথে যায়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়।" ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি রেলে করিয়া কোথাও যাইতে হইলে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করেন কেন? উহার উত্তরে গ্লাডষ্টোন বলেন—'কি করি—চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী নাই যে!' গ্লাডষ্টোনের এই উক্তিতে ইংলণ্ডের ধনী যাত্রেরই চক্ষু ফুটিয়াছে, আর তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের কত সুবিধা হইয়াছে। আর আমরা, সাবেক মোটা চালচলন ছাড়িয়া দেওয়ায়, আমাদের 'কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ' হইতেছে। চটী পায়ে দোষটা পায়ে, পদব্রজে আগত পবিত্রচরিত্র পরমপণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়া এদেশের আদর্শ ছিল।"

ভূদেববাবু একথা বেশ বুঝিতেন যে, "মনোবল ও সংযম সহকারে সমুদয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। যখন আলস্য ধরিল, তখন কিছুই করিব না; আবার অন্য সময়ে কোঁক চাপিল, তখন একেবারে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম;—আমাদের ধরনটা এমনই হইয়া গিয়াছে। এরূপ আচরণ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ভ্রম করিতে হইবে। বঙ্গদেশের বায়ু সমল ও উষ্ণ: বাঙ্গালীর শরীরও দুর্ব্বল; বাঙ্গালী সহজেই শ্রমবিমুখ। অতএব, সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য পিতামাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল, তাঁহাদেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়;—একবার খুব হয় আবার কিছুই থাকে না। এরূপ অনিয়মে দুর্ব্বল শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সয় বয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে। বস্তুতঃ 'আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহারিপুঃ। নাস্ত্যদ্যমসমোবন্ধু কৃত্বযন্নাবসীদতি।' বালককাল হইতে যখনকার যে কায তখন তাহা করা, ও যেখানকার যে জিনিষ, সেখানে সেটি স্থাপন করিতে, অভ্যাস করান উচিত। কায যদি জমিতে না পাইল, ত একবারে অনেক কাযের চাপ পড়ে না; আর স্থানে জিনিষটি পাওয়া গেলে, শীঘ্র কাযটি শেষ হইয়া যায়। অনর্থক আবশ্যক বস্তুর জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে হয় না, সব জিনিষ উটকাইয়া পাটকাইয়া তছনছ করিয়া অধিকতর বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে হয় না; এ জিনিষটা কোথায় রেখিয়াছ কি—এ জিনিষটার সম্বন্ধে কিছু জান কি—বলিতে পার কি—ইত্যাদি নানা প্রশ্নে অপরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে হয় না—সুব্যবস্থায় জিনিষপত্র রাখিলে ঘরটিও বেশ পরিষ্কার ও করঝরে বলিয়া বোধ হয়। জিনিষ পত্র গোলমাল ও ছড়াইয়া রাখা, অশেষ অসুখের কারণ। ছেলেরা বাল্যকাল হইতে যাহাতে গোছাল হয়, যাহাতে আপন আপন জিনিষের যত্ন করিতে শিখে,—যাহাতে কোনও জিনিষ অযত্নের জন্য নষ্ট না হয়, ইহা শিখে,—এই অভিপ্রায়ে তিনি পৌত্র ও দৌহিত্রগণকে এক একটি ডেস্ক ও চাবিতালা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেকের দোয়াত, কলম, পেন্সিল, বহি ছুরি ও খাতা আলাদা আলাদা করিয়া দিতেন—যেন কেহ অপরের দ্রব্য লইয়া টানাটানি না করে। ছেলেরা কে কতদূর গোছাল হইয়াছে—তাহা তাহারাই বলিতে পারে। আলস্যকে জয় করিবার প্রধান উপায়—প্রতিদিন একই কায নিয়ম মত

Penny wise & Pound foolish—যেন কেহ না হন। গৃহশিক্ষক রাখ—তাহার সকল অভাব যতদূর সম্ভব দূর করিতে পার, করিয়া দাও।

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, 'নাকে তেল দিয়া ঘুমাইলে' হয় না। শিক্ষক মহাশয়ের আচরণ, ব্যবহার ও শিক্ষাদান বিষয়ে অবিলম্বিত পত্না ভাল অথবা মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। ভূলধরা অনেকের অভ্যাস। তাহা করিতে গেলে চটাচটি হইয়া যায়। আর বালকগণের সম্বন্ধে শিক্ষকের ত্রুটি ধরিতে নাই। শিক্ষাদান শেষ হইলে, শিক্ষক-মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া, নিজে যাহা ভাবিতেছ, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও; তিনি নিজের ভুল বুঝিলে, অবশ্য তোমাকর্তৃক প্রদর্শিত উৎকৃষ্টতর পত্না অবলম্বন করিবেন। ভূদেববাবু ছেলেদের শিক্ষাভার গৃহ-শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বদা শিক্ষক ও বালকগণের উপর খর দৃষ্টি রাখিতেন। শিক্ষক মহাশয় সময়ে আসেন কি না, সময়ে যান কি না, তিনি আপনার আজ্ঞা-পালনে বালকগণকে বাধ্য করিতে পারেন কি না, সমুদায় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। যদি গৃহশিক্ষকের হস্তে বালকগণের শিক্ষার ভার তুলিয়া দিলেই, নিজে যে কর্ত্তব্য করিতে পারিব না, তাহা পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে যে কেহ গৃহশিক্ষক বাড়ীতে রাখিয়াছেন, তিনিই মনে করিতে পারেন, তাঁহার কর্ত্তব্যপালন শেষ হইয়া গিয়াছে। ভূদেববাবু মাঝে মাঝে যাইয়া শিক্ষকমহাশয়ের পাঠনার রীতি দেখিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, শিক্ষক-মহাশয় শ্রুতলিখন শিখাইতেছেন। এক একটি বাক্য তিনি দুই তিনবার বা তাহারও অধিকবার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। কোনও ছাত্র "স্যর (Sir) শুনিতে পাই নাই" বলিলেই তিনি পূর্ব্বউচ্চারিত ও ছাত্রের অমনোযোগিতা হেতু অশ্রুত বাক্য পুনর্ব্বার বলিতেছেন। ভূদেববাবু শিক্ষকমহাশয়ের এরূপ করা আদৌ পছন্দ করিলেন না। তিনি শিক্ষকমহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রুতলিখনের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের মন একাগ্র করা। যদি ছাত্র বুঝিল যে, আমি শুনি নাই বলিলেই শিক্ষক-মহাশয় আমি যাহা শুনি নাই, সেটী আবার আমাকে শুনাইবেন, তাহা হইলে ছাত্রদের একাগ্রতা দূরের কথা অবহিত হইয়া শুনা যে আবশ্যক তাহা মনেও করিবে না ও তাহার সে বিষয়ে কোনও কালে চেষ্টা হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিয়া অন্যমনস্ক হইবে। সব ছেলে কিছু শান্তিনিষ্ঠ নহে! দলের মধ্যে দুই ছেলেদের অনবরত চেষ্টা হইবে, যাহাতে শিক্ষকমহাশয় বেশ না লিখাইতে পারেন। শ্রুতলিখনের প্রধান উদ্দেশ্য যে, চিত্তচাঞ্চল্য ও অমনোযোগিতা দমন করা, তাহা এককালে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ভূদেববাবুকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল। তিনি ছাত্রদের বেশ চিনিতেন। শিক্ষক-মহাশয় পরে কেবল একবার মাত্র যে বাক্য উচ্চারণ করিতেন তাহা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিতেন না।

ভূদেববাবুর পৌত্র ও দৌহিত্রগণ তখন নর্ম্মাল স্কুলের (হুগলীর) একটি শ্রেণীতে পড়ে। ইংরাজী পাঠ্য Longman's Reader No 2 or 3। নূতন ক্লাসে উঠিয়া নূতন নূতন বই পাইয়াছে। তাহারা মূল ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকের সহিত একখানি অর্থপুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিল। ভূদেববাবু এবিষয় জানিতেন না। এক দিন তিনি তাহাদের পাঠ দেখিতেছিলেন। মানে জিজ্ঞাসা করায় কতকগুলি অতীতকাল-ক্রিয়ার মানে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকেরা সকলগুলির মানের শেষে, 'য়াছিল" যোগ করিয়া বলিল: যথা—said বলিয়াছিল met দেখিয়াছিল, did করিয়াছিল। Uber মানে সকলে 'ঐ' বলিয়া দেয়। ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ, সেই অর্থপুস্তকে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত, উচ্চারণ করিল। ভূদেববাবু অসন্তুষ্ট হইলেন। কে এই সব মানে বলিয়া দিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলেন যে বালকেরা অর্থপুস্তক হইতে মানে মুখস্থ করিয়াছে ও উচ্চারণও তাহা হইতে শিখিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে আপন আপন অর্থপুস্তক গুলি আনিতে বলিয়া দিলেন। সে গুলি তাহার কাছে আনা হইলে, তিনি সে গুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন, আর ফিরাইয়া দেন নাই। বস্তুত ঐরূপ অর্থপুস্তক পাঠে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হওয়ায় আমাদের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। অর্থপুস্তকে 'মানে

লেখা আছে :—তাহা ভুলই হউক, আর ঠিকই হউক, একবার দেখিয়া লইলেই হইবে ভাবিয়া ছেলেরা পাঠে যতটা সময় দেওয়া উচিত ততটা সময় তাহাতে দেয় না, মানে আর একজন বলিয়া দিলে. নিজে চেষ্টা করিয়া ছল বিশেষে প্রযুক্ত শব্দের যথার্থ অর্থ নিরূপণে আদৌ চিন্তা-শীলতার পরিচালনা করে না।—অভিধান খুলিয়া, মানে দেখিতে গেলে, একই কথার কত অর্থ হইতে পারে, তাহা খানিকটা দেখিতে পাওয়া যায়। আর বড় অভিধান দেখা অভ্যাস করিলে, শব্দের প্রকৃত অর্থ, দৃষ্টান্ত ধরিয়া করিয়া লইবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। একই কথা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নানাস্থানে দেখিয়াও হতবুদ্ধি হইতে হয় না। অর্থপুস্তকে যে অর্থটি দেওয়া আছে, তাহা ছাড়া অন্য অর্থ আছে, তাহা জানি না, এমন অবস্থা হয় না। অর্থপুস্তকে কাগজের সাশ্রয় করিতে হয়। সুতরাং এক কথার সকল অর্থ দেওয়া সম্ভবপর নয়। সকলের চেয়ে মুস্কিল হইতেছে যে অর্থপুস্তকে প্রত্যেক ছত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া থাকায়, বালকেরা তাহা সমুদায় বর্ণে বর্ণে মুখস্থ করিয়া লয়। নিজে যে দুটা কথা জোড়াতাড়া দিয়া ব্যাখ্যা করিবে সে সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি দৈবক্রমে মুখস্থ করা বিষয়ের একটি কথা ভুল হইয়া গেল, মনে না পড়িল তাহা হইলেই সব নষ্ট। সেই একটি কথা যতক্ষণ না মনে পড়িবে, ততক্ষণ সব লেখা বা বলা বন্ধ হইয়া গেল, বালকের আর সাধ্য নাই যে অন্য কথায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে।

ছেলেদের পড়িবার ঘরে একখানি বোর্ড টাঙ্গান ছিল। শিক্ষক মহাশয়ও বালকগণকে অধিকাংশ কার্য্য বোর্ডে লিখিয়া করিতে হইত। একবার লিখিলে যে কায হয়, যত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে হয়, যেরূপ নির্ভুলভাবে হয় (অথবা ভুল করিলে যত সহজে ধরা পড়ে) দশবার পড়িলে পাঠাভ্যাস তত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। শ্লেট চক-চকে ঝকঝকে রাখিলে অতি প্রীত হইতেন। সে জন্য নিয়মমত কাঠের কয়লা দিয়া শ্লেট মাজিতে হইত, যেন শ্লেটে তেল না পড়ে। থুথু দিয়া শ্লেট মোছা বা মুখের তাপ দিয়া শ্লেট মোছা ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ জিহ্বায় ঠেকাইয়া তাহাতে শ্লেটস্পর্শ করাইয়া, তৎসাধারণ বট-খের পাতা উল্টান, (অন্যের দেখাদেখি) খামের আটায় জিহ্বা স্পর্শ করাইয়া চিঠি মোড়া—ভূদেববাবু আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। এবিষয়ে বাল্যকাল হইতে তিনি ছেলেদের উপদেশ দিয়াছেন। ছেলেরা 'নোট' লইয়া তবে লিখিতে বসিতে পারিত। ছেলেদের হাতের লেখা যাহাতে ভাল হয় তদ্বিষয়ে ভূদেববাবুর বিশেষ মনোযোগ ছিল। (ভারতবর্ষ)

শ্রাবণ ধারা

ওগো শ্রাবণের ধার,
ওগো শ্রাবণের বারি,
তুমি কোন্ স্বরগের অমৃত বারি
আকাশে মণিহার ?
তুমি কোন্ নয়নের জল
পড়িতেছ ঝরঝরি,
কার লাবণ্যে ঢল ঢল
কণ্ঠের সাতনরী !

তব চুম্বন টুটে
কম্পিত প্রেম ভরে
ঐ শ্যামল ধরার বক্ষের 'পরে
কদম্ব শিহরি উঠে !
ওগো একি তব বর দান
একি তব প্রেম ঢালা
ওগো আলোকে দীপ মান
রতন গুণমালা !

নূপুর গুঞ্জরি ঘরে
বেষ্টিয়া লঘু পায়ে
ওগো তরল হীরার কাজর ঝুলায়ে
নামিতেছ ধরাপরে !
হেথা তমাল আকুল হিয়া
আমলকি আন্‌মনে
ঐ মর্ম্মর ডাক্ দিয়া
তব পদধ্বনি গণে !

বর্ষার বুক ভরা
এসেছ দুলালী মেয়ে
তুমি　শ্রাবণের ঐ কোল খানি ছেয়ে
এসেছ হৃদয়-হরা!
ওগো　তোমার পরশ রাগে
হৃদয়ের নীপ দুলে
মোর　মধু যামিকা জাগে
নব প্রেমে কুলে ফুলে।

কুমারী নিরুপমা দেবী।

পরলোকে আত্মার গতি বিধি

(৪)

জেরাল্ড ম্যাসে।

আমার শারীরিক জীবন শেষ হয়েছে; ভালই হ'য়েছে। সংযম ও শাসনের অবস্থা হ'তে মুক্তিলাভ, আনন্দের বিষয় নয়! দুঃখ যদি ঠিকভাবে সহ্য করা যায় তার পরেই আনন্দ লাভ হয়; চোখের জলে যে বীজ বপন করেছি, আনন্দে সে শস্য কর্ত্তন করেছি। আমার দুঃখ কষ্ট শাস্তি যা ভোগ করা দরকার তা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাতে আমার বড় আনন্দ। অতীত জীবনের পানে চেয়ে দেখ্‌ছি, কত সময় যে অবস্থাকে নিজের পতন ব'লে মনে করেছিলাম সেই সময়েই আত্মার উন্নতি হ'য়েছিল; দুঃখের কশাঘাত খেয়ে আমার কল্যাণ হ'য়েছে, শিক্ষা হ'য়েছে, পাপ ঝরে প'ড়েছে। আমার জীবন সংগ্রাম ও দুঃখময় ছিল, আমি আত্মার রাজ্যের সন্তান জানতাম ব'লে, সে সব সহ্য করা আমার পক্ষে সহজ হ'য়েছিল। এ জ্ঞানের অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ কর্‌তে পারে না।

ইজিপ্ট সম্বন্ধে আমার এই রচনার সময় আমি অনেক ইজিপ্ট-নিবাসী আত্মার সাহায্য পেয়েছিলাম; তাই লিখতাম। তখন যাদের ছায়ার মত দেখতাম এখন তাদের স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

জেরাল্ড ম্যাসে একজন সুকবি, সুলেখক এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন। প্রাচীন ইজিপ্ট সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে গিয়েছেন। পরলোকতত্ত্ব তাঁর কাছে জগতের শ্রেষ্ঠ আলোক স্বরূপ ছিল। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান মানুষকে যে দৃষ্টি দিতে অসমর্থ, পরলোক-তত্ত্ব সেই প্রকৃত দৃষ্টি দান কর্‌তে সমর্থ। বিজ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তি টলিয়ে দিচ্ছে। পরলোক-তত্ত্ব ধর্ম্মকে অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। তিনি বলেছেন—ইহলোকে পরলোকে যোগ আছে, সেতু আছে,—দেহী ও বিদেহী আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ আছে। "অনন্তের বার্ত্তা" নামক গ্রন্থে তিনি ব্যক্ত করে'ছেন, যে তাঁর পরলোকগত প্রিয়জনগণ প্রতি দিন তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে থাকেন;—সকলেরই পক্ষে এ সৌভাগ্য সম্ভব। এই তত্ত্ব প্রচার করে তাঁর অনেক দুর্নাম হ'য়েছিল, কারণ তখন এসব তত্ত্ব-কথাকে পণ্ডিতেরা পাগলামি মনে কর্‌তেন। আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—পরলোক-তত্ত্ব ধর্ম্মকে সত্য ও স্থিরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে, ধর্ম্ম বিশ্বাস মাত্র না থেকে জীবনে পরিণত হবে। এই তত্ত্বের আলোক ব্যতীত জীবন, কর্ণধারবিহীন জাহাজের মত অন্ধ, কারারুদ্ধ;—আকাশের সূর্য্যকিরণ-চর্চ্চিত হয়ে ক্ষুদ্র বাতির আলোক সম্বল করে পথ চলার মত। যে ব্যক্তি অরুদ্ধ গৃহে ক্ষুদ্র দীপালোকে জীবন কাটিয়েছে, সে যদি কোন দিন অগণ্য নক্ষত্রশোভিত অনন্ত আকাশের শোভার নীচে এসে দাঁড়ায়, প্রকাণ্ড জগতের বিরাট সৌন্দর্য্য শোভা দেখে, সে যেমন নবজীবন, নবচেতনা পায়, তেমনি ইহজীবনের ক্ষুদ্র সীমার যাদের দৃষ্টি ও জীবন আবদ্ধ, তারা পরলোক তত্ত্বের আলোক পেলে, অনন্ত জীবনের প্রসারিত আলোকিত পথ দেখে নব জীবন পায়, নির্ভয় হয়, বীতশোক হয়।

গেলে কি আর ফিরে আসে!

যারা পরলোকে যায়, তারা আসে। আমাদের প্রিয়জনেরা একবারে আমাদিগকে ছেড়ে যায় না; তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে আমার একজন বন্ধুর বাড়ীতে, একটি ঘরে, আমি আর আমার বন্ধু ব'সলাম এবং আমাদের মাঝখানে টেবিলের পাশে আর একখানি চেয়ার রাখা হ'ল।

চেয়ারখানি রাখবা মাত্র আমার বন্ধুর পত্নীর আত্মা সেই চেয়ারে বস্‌লেন। তাঁর স্বামী, সন্তানগণ, এবং আমি, সকলেই তাঁর ছায়াময় উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখে এবং তাঁর স্পষ্ট প্রেমোজ্জ্বল ভাব অনুভব করে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। অল্প ক্ষণে তাঁর স্বামীর একটা চাবি পড়ে গিয়েছিল, তাও তিনি ব'লে দিলেন। কয়েকটি সুন্দর গোলাপ ফুল টেবিলে ছিল তার সৌরভও তিনি যেন সম্ভোগ করলেন।

প্রায় দুই বছর পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। আজ তাঁর স্বামী, পুত্র কন্যা, জামাতা, এবং বন্ধু (সবশুদ্ধ দশ জন) পরলোকবাসী তাঁকে দেখবার জন্য সমাগত। ৭ই মে, সন্ধ্যা প্রথম, তিনি তাঁর স্বামীকে দেখা দেন, সেই দিন তাঁর জন্ম দিন, ৮১ বছর পূর্ণ হয়ে ৮২ বছরে পদার্পণের দিন। তারপর ক্রমে সকলকেই অভিবাদন করেছিলেন। তিনি বার বার তাঁর স্বামীর গলায় তাঁর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

তারপর, তাঁর পরলোক গত কন্যাও সেখানে এলেন। তিনি অনেক দিন আগে চলে গিয়েছিলেন। আজ পরলোক হ'তে,—অজ্ঞাত পর পার হতে মা ও মেয়ের সমাগমে পরিবারটি স্বর্গে পরিণত হ'ল। তাঁরা বেশ সহজ ভাবে কথা বার্ত্তা বল্‌তে লাগলেন। কন্যা বোনদের সঙ্গে কত কথা বল্লেন।

শোকার্ত্তের সান্ত্বনা।

পরলোকগত প্রিয়জনদের পরিবার মধ্যে আগমন, দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে। আর কিছু কাল পরে, পরলোকবাসী প্রিয় আত্মাসকল প্রায়ই আমাদের কাছে আসবেন,—তখন ছেলেরাও তা বুঝ্‌তে পারবে এবং বল্‌বে—"মা, বাবা এসেছেন" অথবা "বাবা, মা, এসেছেন,—শীঘ্র এস," তিনি দাঁড়াতে পারবেন না।" এই মিলন কি আনন্দময় অমৃতময় ব্যাপার। "প্রেম ও আলোকময় রাজ্যের পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর বলে আক্ষেপ ক'রো না, অগ্রগামী আত্মার হাতে হাত দাও, তাঁর আকর্ষণে উর্দ্ধে অগ্রসর হও, এবং কম্পিত বক্ষে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটনের অপেক্ষা কর।"

মৃত প্রিয় জন এখনও কাছে।

ভাবিতে পারিনা আমি, তুমি আছ দূরে,
কারণ, স্বর্গীয় দূত, নিকটেই ঘুরে।
সন্ধ্যা ডুবে যাবে যবে খুলে যাবে দ্বার,
সান্ধ্য তারকার পাশে শুভ্র চিত্রাকার
দেখিবনা তব মূর্ত্তি,—আছে পথ চেয়ে,
জানাতেছ সন্তাষণ বাহু প্রসারিয়ে!

হুইটিয়ার।

পরলোকগত প্রিয়জনেরা আমাদের কাছে থেকে একবারে এমন জায়গায় যায় না যে, যাওয়া আসা অসম্ভব। যতদিন ইহজগতের কর্ত্তব্য পালন করতে পারে ততদিন আত্মা শরীরে বাস করে। তারপর অন্য আকারে বাস করে, কিন্তু তার স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধ দূর হয়ে যাবে কেন! একটি পরলোকগত শিশু আত্মা, একজন মিডিয়ামের ভিতর দিয়ে ব'লে ছিলেন—"একজন মা বলেছিলেন যে, যদি তিনি জানতে পারেন যে তাঁর ছেলে পরলোকে গিয়ে তাঁকে একবারে ভুলে যায় নাই, তা হ'লে তিনি সব দুঃখ সইতে পারেন। পৃথিবীতে যতদিন কেও কোন আত্মাকে ভালবাসে, তত দিন আত্মা কাছেই থাকে। আমি যাকে ভুলে গিয়েছি। একথা যেন মা মনে না করেন।" আর একটি আত্মা বলেছেন—"যারা ইহজীবন অতিক্রম ক'রে পরলোকে যায়, তাদের মধ্যে যারা যত বেশী ইহজগতের মানুষের কাছে আসে ও তাদের সাহায্য করে, ততই উন্নতি লাভ করে। তারা এই বল্‌তে আসে যে, মৃত্যু নাই, এবং পর জীবন বড় আলোকময়।"

পরলোকের আভাষ।

ইহজীবনেই কি পরলোকের আভাষ পাওয়া যায় না! পরলোক এক সত্য লোক। অনন্ত জীবনের সকল অভাব সেখানে পূর্ণ হয়। সেখানে সৌন্দর্য্যে সৌরভে আত্মা আনন্দ লাভ করে। সেখানকার পাহাড় ও সমতল চিন্ময় আলোকে অনুরঞ্জিত। সেখানকার নদী ও উপত্যকা অনন্ত প্রেমের বার্ত্তায় পরিপূর্ণ। সেখানকার আকাশে বিচিত্র-বর্ণ মেঘ, স্নিগ্ধ কিরণোজ্জ্বল সূর্য্য,

পক্ষীর মধুময় গান, শিশু ও উন্নত আত্মাদের আনন্দময় পবিত্র খেলা ধূলা, আনন্দ পান, আনন্দ পান, আনন্দ পূর্ণ অবিরাম প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ,—সবই পবিত্রতায় ও প্রেমে মধুময়। সেই অমৃত লোকই সকলের চির বাসভূমি। কেও ইহজীবনে দুঃখে দগ্ধ হ'য়ে, কেও অশুভ পের অশ্রুতে ধৌত হ'য়ে সে লোকে যায় কিন্তু সকলেরই সেই এক গৃহ, সে সুখ সকলেরই জন্য।

মৃত্যুর পর সম্বন্ধ।

প্রিয়তর যদি হয় মৃত প্রিয় জন,
মৃতজন আরও কাছে,—এ নহে স্বপন।
দূরে উর্দ্ধে অজ্ঞদেশে করেনি গমন,
ঈশ-প্রেম যোগ সূত্র তাদের জীবন,—
অনন্তের মানবীয় প্রেম-আলিঙ্গন,
ভাবে ভাব যুক্ত করে,—জীবনে জীবন।

ম্যাসে।

দেহ-ত্যাগ ক'রে, আত্মা মরেও না, দূরেও যায় না। তাদের এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয় না যে দেহীর সঙ্গে তাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ তা বাধা পায়, বা ছিন্ন হয়। ভালবাসার সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেমন ছিল, পরেও তেমনি থাকে। দেহ-ত্যাগ করে আত্মা ঘুমায় না, চির-জাগরণে জাগ্রত হয়। তারা সমাধিগহ্বরে যায়ও না, তার ভিতর হ'তে বাহিরও হয় না। এ জীবন হ'তে পরলোক এক পা মাত্র। যারা এ লোক হ'তে এক পা বাড়িয়ে পরলোকে যায় তারা আবার এক পা ফেলে এ লোকে আসতেও পারে,—আসে। শরীরী আত্মা যা করতে পারে না, বিদেহী আত্মা তা পারে। পরলোক, অব্যাহত-রাজ্য আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত। আমাদের দুঃখ কষ্ট পরলোকবাসী প্রিয়জনেরা বোঝে, এবং দূর করতে ইচ্ছা করে। আমরা যেমন তাদের বিষয় ভাবি, তারা তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের জন্য ভাবে। আমাদের তাদের কাছে যেতে পারি না, কিন্তু তারা আমরা কাছে আসতে পারে—কোন বাধা নাই।

বিশপ হল (Hall) ব'লেছেন, বিদেহী আত্মাগণ আমাদের মনের উপর বিশেষরূপে কাজ করতে পারেন। শুভ ভাব বৃদ্ধি, জ্ঞান বৃদ্ধি, প্রলোভন দমন, পাপের পথে বাধা, দুঃখে শোকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা, নিরাশায় আশা প্রভৃতি সংঘটনে বিদেহী আত্মার শক্তি অসাধারণ।

পরলোকে হিত সাধন।

ইহলোকে যে সকল আত্মা পরোপকার সাধনে রত থাকেন, তাঁরা পরলোকে গিয়েও সেই কাজ আরও প্রচুর পরিমাণে ক'রবার সুযোগ পান। নিরন্তরবাসী, বিপথগামী, অন্ধ আত্মাদের সেবার জন্য তাঁরা বিশেষ পরিশ্রম করেন। তা দিগকে বহু যত্নে ধীরে ধীরে প্রেম ও শান্তির পথে অগ্রসর ক'রে নিয়ে যান। উন্নত স্তরবাসী সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই নিম্নস্তরবাসী আত্মাদের কল্যাণের জন্য তাদেরই সঙ্গে বাস করেন।

জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার সময় সান্ত্বনা।

একজন পরলোকস্থ আত্মা বল্‌ছেন—১৯০৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের শেষভাগে, কড়ে একখানি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। সেই জাহাজ ডুববার সময়, আমি দেখ্‌তে পাই জাহাজের একটি ঘরে দশ বার জন স্ত্রীলোক করুণ-স্বরে কাঁদ্‌ছে—তাদের বাঁচবার কোন আশা নাই। তারা এই শোচনীয় অবস্থায় পরলোকে যাবে, মনে করে আমার কষ্ট হ'ল, আমি তখনি সেই কামড়ার মধ্যে গিয়ে মূর্ত্তিমতী হ'লাম। বেচারারা আমাকে ঈশ্বরের দূত ভেবে, জোড় হাতে প্রাণ-ভিক্ষা করতে লাগ্‌লো; তাদের একজনের কোলে একটি ছোট ছেলে ছিল, সে তাকে আমার কোলে দিয়ে বল্লে, অন্ততঃ একে বাঁচাও। আমি তাদের সঙ্গে আশাজনক কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা ঘুমিয়ে প'ড়্‌লো ছোট ছেলেটি হাস্‌তে হাস্‌তে ঘুম গেল। আমি তাদের মনে পরলোকের চিন্তা জাগাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। যখন জাহাজ ডুবে গেল, আমি তাদের সঙ্গে ডুবলাম—তাদের যাতে ঘুম না ভাঙ্গে তা দেখ্‌বার জন্য। তারপর যখন তাদের ঘুম ভাঙ্গল, দেহের বন্ধন তখন ছিন্ন।

অবিশ্বাসীর পরলোক গমন।

(আত্ম-কথা)

আমি পৃথিবীতে ২৭ বছর ছিলাম। যখন পরলোকে আমার চেতনা হ'ল, আমার বড় ভয় করতে লাগ্‌ল। কঠোর বিচারপতি একজন আছেন এইরকম অস্পষ্ট

বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, আমার পূর্ব্বজীবনের ঘটনাগুলো, বায়স্কোপের ছবির মত আমার সাম্নে এসে দাঁড়াতে লাগ্‌লো। সে সবই ঘোর অন্ধকারময় ভয়ানক। তখন পূর্ব্বজীবনের শিক্ষার স্মৃতি আমার মনে উদয় হ'ল, যে পাপীর জন্য অনন্ত নরক (ইনি খৃষ্টান ছিলেন)। এই ভাবে আমি ভয়ে কাঁপছি। এমন সময় একটি জ্যোতির্ম্ময় আত্মা আমার কাছে এসে, সুমিষ্ট স্বরে বলেন "প্রেমস্বরূপ ভগবান, তাঁর দিকে ফের দেখ নাই; অন্ধকার তোমার পেছনে; সামে আলোকের রাজ্য। সেই হতে আমি নূতন বল পেলাম, নব দৃষ্টি পেলাম এবং ধীরে ধীরে আলোকের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলাম; ক্রমে ক্রমে আমার পাপস্মৃতি মুছে গেল। আমিও অপরের সাহায্য করতে লেগে গেলাম। সকলেই আমার সহায়। কেও বাধা নন, আমার মাকে বলতে ইচ্ছা করে—"আমার দেহ ত্যাগের জন্য কেঁদোনা, আমি বড় অন্ধকার অবস্থায় এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আমি আলো পেয়েছি প্রেম পেয়েছি।"

'দোক্তা।' *

(১)

তখন আমি মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে (fourth year) পড়ি। 'নাইট ডিউটির' (night duty) জ্বালায় বাধ্য হইয়া, নব্য ছোকরাদের পরমোপাদেয় পান, দোক্তা, নস্য ও চা, চুরট এই পাঁচটির ভিতর প্রথম চারিটির একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িলাম। ইহার পূর্ব্বে নেহাৎ 'গুড্ বয়' (good boy ছিলাম,—যাহারা ছেলে বয়সে এই সকল নেশা করে না তাহারা বৃদ্ধদের মতে বড় 'গুড বয়।' অবশ্য এই সুনামটি বিনা কারণে নষ্ট করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহি ;— আমি ঠিক করিয়াছি পরে আবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নির্ম্মেঘ শারদাকাশের মত নির্ম্মল হইব।

* নানাবিধ মশলা, মৃগনাভি ও তামাক পাতার গুঁড়া মিশাইয়া ইহা তৈয়েরি করা হয়। পানের সহিত পশ্চিম অঞ্চলে ইহার বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়।

'নাইট ডিউটির' সময় রোগীর ওয়ার্ডে (ward) সকলে তাস পিটিতাম, পান দোক্তা চিবাইতাম, চুরুট ফুঁকিতাম, আর কিমাইতাম। কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের আগমনের সাড়া পাইলে অমনি তামাক চুরুট গোপন করিয়া নেহাৎ 'ডিউটিফুল' (dutiful) ছেলের মত রোগীর নাড়ী টিপিতে বসিয়া যাইতাম। অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক যে ইহা টের না পাইতেন তাহা নহে। তিনিও এককালে ছাত্র ছিলেন,—একবারেই শিক্ষক হইয়া জন্মেন নাই,—তাঁহারাও ছাত্রদশায় এরূপ অনেক লঙ্কা করিয়াছেন। কিন্তু হাতে হাতে না ধরিতে পারিলে কোনও রূপ শাস্তি দেওয়া চলেনা ;—এবং সমস্ত ওয়ার্ড ময় আমাদের এত 'স্পাই' (স্পাই) ছিল যে আমাদের 'ষড়যন্ত্র' ধরিতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না। আমরা নির্ব্বিবাদে আমাদের 'নাইট ডিউটি' চালাইতাম।

যাক্ সে সব বাহুল্য কথা। ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে দোক্তার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িলাম। রাত্রিতে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমান যাইত না,— দোক্তা সহ পান চিবাইয়া রাত্রি জাগরণ করিতাম। দোক্তাটা আমার নিকট এত উপাদেয় বোধ হইত যে সময় সময় আমি বিরলে বসিয়া ভাবিতাম, 'আজকাল অনেক ডাক্তার যেমন কেবল ঔষধের দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করেন আমিও তেমনি দোক্তা দ্বারা সকল রোগ সারাইব। 'এক্সপেরিমেণ্ট' (Experiment) করিয়া মহৌষধির গুণের কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলাম ; কিন্তু উপযুক্ত রোগীর অভাবে সেই বিরাট 'এক্সপেরিমেণ্ট' সমাধা করিতে পারিলাম না, সম্প্রতি কেবল 'থিওরী' (Theory) রচনা করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম।

(২)

ইহার ভিতর 'এক্সপেরিমেণ্ট' করিবার এক মস্ত সুযোগ জুটিয়া গেল। একদিন বৈকালের ভ্রমণের পর দোক্তা পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখি আমার বাহিরের ঘরে বাল্যবন্ধু কেতকীরঞ্জন বসিয়া আছে। তাহার মুখখানা মেঘের মত অন্ধকার,—চোখ দিয়া বর্ষার মত জল করিতেছে,—নাসিকা হইতে প্রলয়ের মত ঝড় বহিতেছে।

বাম হাতখানা কপোলে সংলগ্ন করিয়া, ঘরের ছাদের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া, নির্জীবের মত সে বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক কষ্টের পর এইটুকু জানিতে পারিলাম যে, কেতকীরঞ্জনের 'ওয়াইফ' (wife) কল্লোলকুমারী কেতকীরঞ্জনকে মোটেই ভাল বাসে না বরং তুচ্ছ করে। তাহার কারণ, কল্লোলকুমারীর চেহারা একটি পরী-কন্যার মত আর কেতকীরঞ্জনের চেহারা সাধারণ রকমের,—কাজেই এক্ষেত্রে পত্নীর লভ্ (love) পাওয়া অসম্ভব। কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্য কেতকী বলিল 'এই এক মাস যাবত পত্নী এখানে আসিয়াছেন ইহার ভিতর পঁচিশ বার পিত্রালয়ে যাইতে চাহিয়াছেন, এবং আর কাঁদাকাটি করিয়া সত্য সত্যই চলিয়াছেন।

রোগীর এরূপ সাংঘাতিক সাঁড়ার কথা শুনিয়া আমি আলমারা হইতে এনাটমী ও মেটেরিয়া মেডিকা (Materia medica) বাহির করিয়া অনেক ঘাঁটাঘাটি করিলাম ; কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে পারিলাম না। চেয়ারে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে একটা ঔষধ স্থির করিয়া ফেলিলাম। আনন্দে একটা হাসির লহর আমার মুখের কোণে খেলিয়া গেল।

(৩)

"এই ঔষধটাতে তোমার 'কেস' (Case) ভাল হয়ে যাবে। নাও এটা নিয়ে বাড়ী যাও,—আমার কথামত ব্যবহার করে দেখ, সব সেরে যাবে এখন। উঠিয়া আলমারা হইতে একটা শিশি বাহির করিলাম এবং তাহাতে খানিকটা দ্রব্য ঢালিয়া কেতকীর হস্তে দিলাম। কেতকীরঞ্জনের সারা মুখখানা আনন্দে হাস্যোৎফুল্ল হইল। সে হাত বাড়াইয়া শিশিটা লইল, কিন্তু পরক্ষণেই মেঘাবৃত আকাশের মত তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে সবিস্ময়ে বলিল "এযে বিষ!"—আমি সহাস্যে বলিলাম—'তাই খাবে, সব যন্ত্রণা সেরে যাবে। স্ত্রী ভালবাসে না, তোমার আর জীবনে ফল কি!" (বাস্তবিক অকৃতদার ব্যক্তিরা প্রেমিকের প্রেমের গভীরত্ব বুঝিতে পারে না!—প্রেম যেন খেলার জিনিস!) আমার কথা শুনিয়া কেতকীরঞ্জন হাবুসনয়নে কাঁদিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজকে সাম্‌লাইয়া, চোখের জল সার্টের আস্তিনে মুছিতে মুছিতে বলিল,—বাস্তবিক তাই আমার মৃত্যুই শ্রেয়। তুমি বিয়ে কর নাই, তুমি স্ত্রীর মর্ম কি বুঝবে। যে হতভাগ্য স্ত্রীর 'লাভ' (love) হ'তে বঞ্চিত তার বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরে যাওয়া শত গুণে ভাল। আমিও এক একবার মরে যাব ঠিক করি কিন্তু যখন কল্লোলের ঐ পটল চেরা চোখ দুটা ও চাঁপার মত মুখের কথা মনে পড়ে তখন আর পারি না। ভাইরে,—ডাক্তারী পড়িস, তোদের শাস্ত্রে কি এমন কোন ঔষধ নাই যা'তে স্ত্রীকে বশ করা যায়।

বহুকষ্টে হাসির বেগ সামাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম "এই ঔষধেই সব সেরে যাবে, তুমি পত্নীর ভালবাসা পাবে, যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর।" সে আগ্রহে বলিল 'কি সে কাজ? তা'তে প্রাণ যায় সেও স্বীকার।" আমি তাহার কাণের কাছে মুখ নিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিতে লাগিলাম ; শুনিয়া তাহার মুখের বর্ণ নীল, লাল, হু পর্য্যায়ক্রমে ইন্দ্রধনুর সকল বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া বিষের শিশি হাতে করিয়া কেতকীরঞ্জন বাড়ী ফিরিল। যথা সময়ে মনুপাতি পকেটে ফেলিয়া সাহেব সাজিয়া কেতকীরঞ্জনের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখি কেতকীরঞ্জন নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছে। চোখ দুটা লাল, ঘন ঘন বমি হইতেছে,—আর বিষের শিশিটা মাটীতে গড়াইতেছে। কেতকীর পত্নী আলুথালু ভাবে তাহার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া পাগলিনীর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, আর এক একবার বিষের শিশির ভিতরের ঔষধ গুলি মুখে পুরিয়া বলিতেছে—"ওগো, তুমি কোথায় যাও গো। তোমায় ছেড়ে কি করে থাকবো গো! এই আমিও বিষ খাচ্ছি—আমায় সঙ্গে করে নাও গো! ওগো তুমি সেরে উঠ গো, আর আমি বাপের বাড়ী যেতে চাবো না গো।—" ইত্যাদি।

আমার কিন্তু হাসি আসিল। (এতক্ষণে ত লোকে বলে ডাক্তারেরা হৃদয়হীন!)

রোগীর মাথায় জল ঢালিয়া ও উপযুক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রোগ আরোগ্য করিলাম। রোগীর পত্নী সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তাহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ইহার ক'দিন পর একদিন কেতকীরঞ্জন আমার বাসায় আসিয়া, অশ্রুজলে আমার হাত দুটা ভাসাইয়া দিল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল "তুমি যে উপকার করেছ, তা এজীবনে শোধ কর্‌তে পারব না। কি আশ্চর্য্য ওষুধ তুমি দিয়েছিলে, যে তা'তে এক বেলায় এতটা আকাশ-পাতাল পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। এখন ত কল্যাণ আমার এক মিনিটও কাছ ছাড়া কর্ত্তে চায় না। সকলে কাছে বসে খাওয়ায় দাওয়ায়, বাপের বাড়ী যাবার নামটিও করে না। বেড়াতে দিতে চায় না, বলে 'তুমি আবার ফাঁকি দেবে।' কত বলে কয়ে তোমার নাম করে এসেছি।"

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—যাহা আমি কৌতুক করিয়া করিয়াছিলাম তাহা হইতে একজনের কত উপকার সাধিত হইল। ভগবান এইরূপে তুচ্ছ ঘটনা হইতে অলৌকিক কার্য্য ঘটাইয়া প্রতিদিন আমাদের কত শিক্ষা দেন।

কেতকী গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিল "সে আশ্চর্য্য ওষুধটা কি? আমার কিন্তু বড় মাথা ধরেছিল আর বমি হয়েছিল। প্রথম একটু ভয় হয়েছিল—বুঝি বা চুলচুকে সত্যি সত্যি বিষ দিয়েছে,—তা হ'লে কল্যাণের কি উপায়!"

আমি হাসিয়া বলিলাম 'বল্‌লে বিশ্বাস কর্ব্বে না—ওষুধটা দোক্তা, আর কিছুই নয়।"

"দোক্তা!" অবিশ্বাস ভরে মাথা ঝাঁকাইয়া কেতকী বলিল "তা দেবার অর্থ?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"অর্থ কিছুই না—খেয়াল মাত্র। উদ্দেশ্য, বিষের মোড়ক আঁটা সিগিটা (ভিতরে যাহাই থাক) নিয়ে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে যদি আত্মীয়ের কাছে বলা যায় আমি বিষ খেয়েছি—তা হ'লে আত্মীয় অমনি যা করে বিশ্বাস করে বসে। আর তখন কি কারণে বিষ খেয়েছি তা যদি বলা যায়, তবে আত্মীয় ব্যক্তি তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন আর জীবনে সে রকম কাজ কর্‌বেন না। এই প্রতিজ্ঞা চিরকাল মনে থাকে।—উপদেশ, চেষ্টা, শাসন কিছুই এর মত ফলপ্রদ নয়। তাই ভেবে আমি এরূপ উপায় স্থির করেছিলাম।

তবে দোক্তা দেবার মানে তুমি দোক্তা খাওনা,—এক্‌টু খেলেই তোমার মাথা ঘুরবে, চোখ লাল হ'বে, বমি হবে,—দেখে পত্নী ভাব্‌বে সত্যি বিষ খেয়েছ। আচ্ছা দেখ দেখি কেমন এক চাল চেলেছি!" আমার কথা শুনিয়া কেতকী কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সোল্লাসে বলিল "ধন্য তুমি সুধীর। ডাক্তারী কর্ত্তে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় চলেনা, বুদ্ধিও ব্যবহার কর্ত্তে হয়।—"

তারপর ফাইনেল এম্‌ বি (final M. B) পাশ করিয়া কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। আর 'নাইট ডিউটি' নাই, তাই নস্য ও চা-চুরুট ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু পান-দোক্তা ছাড়িতে পারি নাই। সেই ঘটনার পর হইতে দোক্তার উপর আমার এত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে তাহা ত্যাগ করিবার কথা মনে আনিতে পারি না। আশা করি এজন্য বন্ধুরা আমাকে "বেড্‌বয়" (bad boy) বলিবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

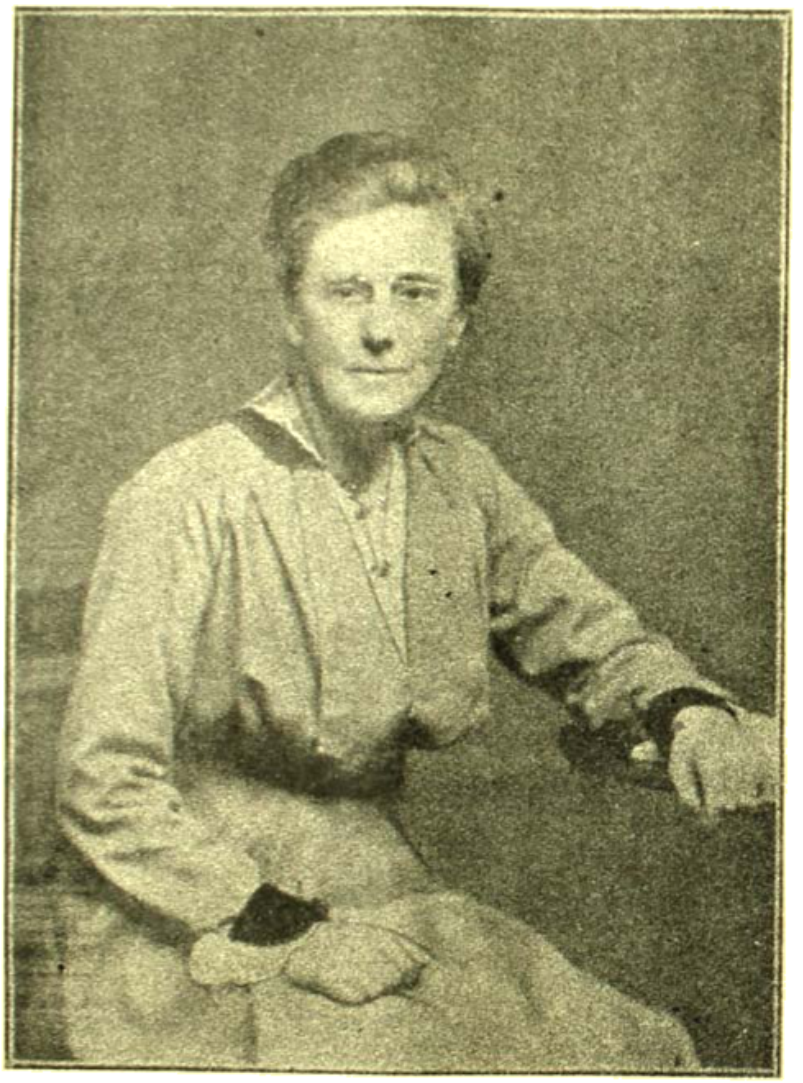

কুমারী বেগার্‌ এম, ডি।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (Tennyson.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as duty ; I am in earnest —I will not equivocate ; I will not retreat a single inch —and I will be heard. (William Lloyd Garrison)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একচিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ | ভাদ্র, ১৩২২ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নারীজাতির শিল্পশিক্ষা।

আমরা বরাবর বলিতেছি, শিক্ষা সম্বন্ধে নরনারীর সমান অধিকার, সব পথ খোলা থাকা উচিত। যে সকল নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ তাঁরা সে পথে যান ; যাঁরা সাধারণ উচ্চশিক্ষার পথে না গিয়ে, গান বাজনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতে উন্নতি করিতে চান, তাঁদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা হোক ; এবং যাঁরা বিবিধ শিল্প শিক্ষা করিতে চান, তাঁদের জন্য শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক। সব ছেলের যেমন একই পথ নয়, সব মেয়েরও তেমনি একই পথ নয়। এই সকল শিক্ষার দ্বারা কেবল দু'পয়সা রোজকার হয়, তা নয় ; যাঁদের অর্থাভাব নাই, তাঁরা এই সকল শিক্ষা-লাভ ক'রে বিমল আনন্দলাভ করিতে পারেন, সন্তানদের শিক্ষার সাহায্য করিতে পারেন এবং পরোপকার করিতে পারেন। উন্নত স্বাধীন দেশ সকলের মহিলাগণ এইরূপে দেশের কল্যাণ সাধন করেন। আমরা ক্রমশঃ এ তত্ত্ব বুঝ্‌তে পারছি। নারীগণ কেবল রান্না-বান্না নিয়ে থাকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সংসার চলা দুষ্কর হ'য়ে উঠ্‌ছে ; পুরুষদের সঙ্গে নারীদের কিছু পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করা অনেক স্থলে আবশ্যক হ'য়েছে। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন হবে কি ক'রে ? কিছু তো জানা চাই, কিছু তো করা চাই ! মোজা সেলাই বা জামা তৈরি করে, অথবা নানা প্রকার খেলনা, পুতুল তৈরি করে বাজারে পাঠালে কিছু পয়সা হ'তে পারে। এ সবই শিখ্‌তে হয়। এই শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় একটি নারী-শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। জাপান প্রভৃতি

গত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁর পত্নী এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

মাটির পুতুল ও ফল নির্ম্মাণ, দড়ির কাজ, চিকণী ও বোতাম নির্ম্মাণ, খাম ও কাগজের বাক্স নির্ম্মাণ, টাইপ রাইটিং, কৃত্রিম ফুল, মোজা, মোমবাতি, ধোবার সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করন, ফল সংরক্ষণ, চাটনী ও জেলী, এবং নিব ও চুলের কাঁটা প্রস্তুত করন, কলে কাপড় ধৌত করা কাপড় রং করা, আলোগ্রাম হ'তে থাল প্রস্তুত করা, জরীর কাজ, চিকণের কাজ, ঘড়ী মেরামত, সাইন বোর্ড লেখা, পুস্তক বাঁধান, জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করা, ক্রমাল ও তোয়ালে তৈরি করা এবং ফটোগ্রাফী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু (সহ-সভাপতি) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সম্পাদক) এবং আরও কয়েকজন পুরুষ ও রমণী দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হ'য়েছে। দেশের ধনবান ব্যক্তিদিগের সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষ আবেদন করেছেন। এইরূপ বিদ্যালয় আরও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নারীগণের কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখ্‌তে পাই, সে সকল দেশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা কেমন ক'রে এত উন্নতি করলেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে কেবল পুরুষদের দ্বারাই তাঁদের উন্নতি-বিধান হয় নাই। বহুসংখ্যক নারী স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন, কত সভাসমিতি, কত সংবাদ পত্র, কত স্কুল প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, কত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য ক'রেছেন, তার ফলে সমস্ত দেশ উন্নত হ'য়ে উঠেছে, সকলের চোক খুলেছে, নারীদের সুপ্ত মন জেগেছে। ভারতবর্ষেও, জনদ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালিকাগণ এই রকম উদ্যম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশেও কোন কোন মহিলা স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ব্রত গ্রহণ করেছেন। ভারত-স্ত্রী মহা-মণ্ডল এদেশে আছে। কিন্তু একটী বড় ব্যাপার সংঘটন কর্‌তে হ'লে, নূতন আদর্শ নূতন ভাব দেশে আন্‌তে হ'লে, বিবিধ সভাসমিতি, সম্মিলন (Conference), আলোচনা, বক্তৃতা এবং বিশেষ ভাবে প্রবন্ধ-লেখা আবশ্যক এবং এ সকল কাজ দেশের শিক্ষিতা মহিলা-দের দ্বারাই হওয়া আবশ্যক। সকল দেশের নারীগণ জেগে উঠে বলছেন, তাঁরা মানুষ, তাঁরা মা ও ভগ্নী, তাঁরা দেশের ও সমাজের অংশ, তাঁরা আত্মা, তাঁরা বিশ্বের এক কোণে নীরবে পড়ে থাকবেন কেন? তাঁরা তাঁদের স্থান গ্রহণ কর্‌বেন। নারীদিগের চিন্তা আকাঙ্ক্ষা, অসুবিধা সকলই ভাষায় ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদের সামনে কত জটিল সমস্যা উপস্থিত। এদেশে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সাহেব বাঙ্গালী প্রভৃতি কত বিভিন্ন ভাষা, ভাব, ধর্ম্ম ও সমাজের সমাবেশ, কত ঘাত প্রতিঘাত, কত সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত। শিক্ষা-বিস্তার, শিল্প বাণিজ্য বিস্তার, দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যের প্রতিকার, গৃহ ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কত কাজ। অপর দেশবাসীদের সঙ্গে কত সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত।

আমাদের সামনে জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্র ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হ'য়ে পড়ছে। এ সংগ্রামে নরনারী উভয়েরই স্থান আছে, উভয়কেই রক্তপাত করতে হবে। পুরুষগণ কি করবেন, তাঁরা কি বলবেন, তবে মেয়েরা এক পা অগ্রসর হবেন, এমন ক'রে আর কত দিন চল্‌বে? মানুষের পক্ষে নির্জ্জীব, অজ্ঞান, অসমর্থ থাকা ভগবানের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। অবলা হয়ে থাকবার দিন অতীত হ'য়েছে। এখন এদেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ কথা বলুন, কাজের কথা বলুন, কাজের আয়োজন করুন; তাঁদের কণ্ঠে নূতন বেদ গান ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক, নব-জাগরণে এদেশ জাগুক। তাঁরা বাধা স্বরূপ না হ'য়ে উন্নতির সহায় স্বরূপ হোন।

ভারত রমণীর বাণী।

বিখ্যাত কবি শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু সম্প্রতি আমেরিকা পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে স্থানকার অধিবাসীগণ তাঁকে অভিনন্দন করেছিলেন তার উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তাই ভারত-রমণীর বাণী। ভারত-নারীর প্রতিনিধিরূপে কিছু বলবার অধিকার তাঁর আছে। তিনি বলেছেন—"আপনারা আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, তা সমস্ত ভারত-রমণীর প্রাপ্য। আমি আত্মোন্নতি সাধনের যে সুযোগ পেয়েছি সেরূপ সুযোগ পেলে প্রত্যেক ভারত-রমণী এইরূপ সম্মান পেতে পারেন। এ সম্মান আমাকে ব্যক্তিগতভাবে করা হ'চ্ছে না, সমস্ত ভারত নারীকে এ সম্মান করা হ'চ্ছে বলে আমি অনুভব করছি। • • • • ভারত-রমণী বড় অনুন্নত; আপনারা তাঁদের উন্নতি লাভের সর্ব্ববিধ সুযোগ করুন। যেন তাঁরা জীবনের উন্নত আদর্শ বুঝতে পারেন। তাঁরা অবনত, কারণ তাঁরা সকল প্রকার সুযোগ হতে বঞ্চিত। তাঁদের জীবন প্রদীপ জ্বালবার যোগ্য তেল আপনারা দান করুন, তাঁদের জীবন উজ্জ্বল হবে। রাস্কিন "সত্যতার সপ্ত প্রদীপের" বিষয় লিখেছেন, সেই সাতটি প্রদীপের আলোকে পাশ্চাত্য জগত আলোকিত! আমাদের জাতীয় জীবন-মন্দিরে সাতটি নয়; সাত লক্ষ জীবনের প্রদীপ অপ্রজ্বলিতই রয়েছে, কারণ যাতে প্রদীপ জ্বলে সে সব উপকরণ আপনারা তাঁদের দেন নাই। সাতটি প্রদীপের জ্যোতিতে যদি পাশ্চাত্য জগত আলোকিত হয়ে থাকে, তা হলে ভারতের সাত লক্ষ প্রদীপ যেদিন জ্বলবে, সেদিন জগত কি মহা আলোক দীপ্তিতে পূর্ণ হবে। আমি তো সামান্য মাটির প্রদীপ; এই ভারতে কত হাজার হাজার সোনার প্রদীপ আছে; তারা সুযোগ না পেয়ে দীপ্তিহীন ও অজ্ঞাত রয়েছে। এ জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়ে বরং তিরস্কার করছি; সোনার প্রদীপ থাকতে আপনারা মাটির প্রদীপে কেন সন্তুষ্ট! আমি যে সামান্য উন্নতি লাভ করেছি তারই গৌরবে আপনারা সন্তুষ্ট হবেন না;—এ অতি ছোট আদর্শ। অতীত গৌরবেও বর্ত্তমান ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হবে না। আপনাদেরই হাতে শত শত প্রদীপ জ্বালবার ভার প'ড়েছে; সেই সকল জীবন প্রদীপ প্রজ্বলিত হলেই ভারত মাতা জাগ্রত হবেন। তাঁকে জাগাবার আর অন্য উপায় নাই;"—অর্থাৎ

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

সন্তান পালন।

নারীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অধিকার মাতৃত্ব। জগতে এমন উচ্চ অধিকার আর নাই। এই অধিকারের সঙ্গে অতি জটিল দায়িত্ব বর্ত্তমান। সন্তানের জননী হওয়ায় নারীত্বের সার্থকতা। কিন্তু, সে কি কয়েকটি শিশু গৃহে জন্মগ্রহণ করলেই হয়? তা নয়। জগতে প্রতিদিন কত শত শত সন্তান জন্মগ্রহণ করছে, কত নারী মা হ'চ্ছেন; কিন্তু মাতৃত্বের গৌরব লাভ করতে পারছেন না। মানুষ কেবল মাত্র শরীর নয়, একথা আমরা ভুলে যাই! একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও অসহায় হ'লেও আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারি; তার হৃদয় ও মন, জ্ঞান ও প্রেম, বীজের অন্তর্গত অদৃশ্য শক্তির মত প্রচ্ছন্ন থাকে ব'লে আমরা সে দিকে তত দৃষ্টিপাত করি না। কিন্তু বীজের বাহিরের আকার যতই বড় হোক না কেন, তা অসার, প'চে মাটি হওয়ার জন্য, এবং তার ভিতরের অতি সূক্ষ্ম অঙ্কুর যত যে অঙ্কুর,—শক্তি-সেতু, তাই সার, তাই কালে শুকাও বৃক্ষে, পত্র-পুষ্প ফলে, বা প্রাণ-প্রদ শস্যে পরিণত হয়। উদ্ভিদ জগতে যা সত্য মানব জগতেও তাই সত্য। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে তো ক্ষুদ্র বীজ, তার শরীরটা ক্ষণস্থায়ী অসার খোঁসা মাত্র, প্রকৃত শিশু, মানুষটি, তার মধ্যে গুপ্ত ও সুপ্ত থাকে। বীজ-প্রাণের বহিরাবরণটি রক্ষণীয়, কিন্তু যে মালী কেবল সেই বাহিরের খোঁসাটিকে রক্ষা করতেই সমস্ত শক্তি দেয় অথচ তার অন্তর্নিহীত শক্তির উন্মেষের বিধি ব্যবস্থা জানে না এবং করে না তার পক্ষে গৌরব

লাভ সম্ভব নয়। তেমনি যে জননী সন্তানের শরীর মাত্রকে সার বলে মনে করেন, এবং কোন প্রকারে শরীর রক্ষা ও বৃদ্ধি পেলেই আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হচ্ছে মনে করেন, এবং সন্তানের হৃদয় মন ও আত্মার স্বরূপ ও উন্মেষের বিধি ব্যবস্থা জানেন না, তাঁর পক্ষে জননীগৌরব লাভও অসম্ভব। আবার, যে মালী মূল বীজটাকেও রক্ষা করতে জানে না, সে তো মালী নামেরই যোগ্য নয়। তেমনি, যে মা সন্তানের শরীর-পালন সম্বন্ধেও অজ্ঞ, সে মা তো মা নামেরই যোগ্য ন'ন।

মানুষ ও পশুতে তফাত এই যে পশু কলের মত স্বভাবের টানে চলে। মানুষও কিছু পরিমাণে পশু, তাই কিছু পরিমাণে স্বভাবের টানে চলে। বহুসংখ্যক মানুষ চিরজীবন পশুই থাকে,—তারা স্বভাবের টানেই বিবাহ করে, সন্তানকে রক্ষা করে, স্নেহ করে; তার বেশী আর কিছু নাই। এ জীবন তাদের কাছে মহা প্রহেলিকা। কিন্তু মানুষের ভিতর আর একটি শক্তি আছে, জ্ঞান-আলোক আছে, যার সাহায্যে মানুষ দৃশ্য তো দেখেই, কিন্তু অদৃশ্য বিধি-ব্যবস্থাও দেখে, এবং তার অনুগত হ'তে পারে। মানুষ সীমার মধ্যে অসীমকে দেখে, শরীরের ভিতর আত্মাকে দেখে, কেবল শরীরেই মানুষ তৃপ্ত হ'তে পারে না; মানুষ হৃদয় মনের বিকাশ প্রণয় সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দেখতে চায়, তাতেই প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, অথবা কোন ব্যক্তি যখন রোগমুক্ত হয়, আমরা আনন্দিত হ'ই; কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বহু যত্নে রক্ষিত দেহ মহৎ কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ করেন, তখন আমরা তার চেয়ে শতগুণ বেশী গৌরব বোধ করি: সে আনন্দ পবিত্রতর,—কারণ, আমরা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি, আমরা শরীরমাত্র নই, আমরা আত্মা। শরীরকে আশ্রয় ক'রে আত্মার বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু আত্মার মহত্তর বিকাশের জন্য, বীজের খোসার মত, দেহ-ত্যাগই আবশ্যক হয়। আমরা বেশী সময় স্থূল জগতের মধ্যে স্থূল বিষয়েই মগ্ন থাকি; তাই অধিকাংশ সময় আত্মার এ গৌরব প্রচ্ছন্ন থাকে; যখন কোন মহৎ ব্যক্তি কোন মহৎ কাজে জীবনপাত করেন, তখন ক্ষণকালের জন্য আমাদের জড়ের বন্ধন শিথিল হ'য়ে যায়, আমরা আবার প্রদীপ্ত জ্যোতিতে স্তম্ভিত বিস্মিত হ'য়ে যাই, এবং অনুভব করি, আমরা অমর-আত্মা। যারা আত্মা সম্বন্ধে একবারে অন্ধ তারা শরীর ছাড়া আর কিছু জানে না। কিন্তু সন্তানের মা যদি সন্তানের শরীর ও ইহ-জীবন সম্বন্ধেও অন্ধ থাকেন, তা হ'লে তাঁর মা হওয়া কেবল কলঙ্কের কারণ।

সুতরাং, কথাটা হচ্ছে এই—প্রকৃত মালী হতে হ'লে যেমন বীজ সংরক্ষণ, বীজ হ'তে বৃক্ষ সংবর্দ্ধন এবং সেই বৃক্ষে পুষ্প ও ফল শস্য উৎপাদন করতে জানা আবশ্যক। তেমনি সুমাতা হ'তে হ'লে, শিশু-পালন, দেহের বিকাশ সাধন এবং সেই সঙ্গে হৃদয় মনের পূর্ণতা বিধান করতে জানা আবশ্যক। বিবিধ বিষয়ে সুশিক্ষা ব্যতীত মাতার কর্ত্তব্য সাধন কি সম্ভব? কেবল কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে আর ঘাস তুলতে পারলেই মালী হয় না; গাছের খাদ্য, সার, গাছের রোগ ও তার আরোগ্য বিধি প্রভৃতি বহু বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তেমনি কেবল সন্তানকে দুধ খাওয়াতে আর ঘুম পাড়াতে জানলেই মা হওয়া যায় না, দেহ-রক্ষার জন্যই কত বিষয় জানা আবশ্যক। বস্ত্র পরিচ্ছদ, বিছানা, স্নান, বিভিন্ন প্রকারের আহার, নিদ্রা ভ্রমণ, শয়ন, প্রভৃতি বিষয়ে কত জানবার ও শিখবার আছে। সুস্থ দৃঢ় নিরোগ বর্দ্ধনশীল দেহের জন্য কত শত উপায় ও নিয়ম জানা এবং পালন করা আবশ্যক।

তারপর, সন্তানের হৃদয় মন ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধন। সে তো আরও কঠিন ব্যাপার। পাশ্চাত্য দেশ সকলে, মানবশিশুর শিক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রতি বছর কত নব চিন্তা ও নব প্রণালী উদ্ভাবিত হচ্ছে। প্রকৃত মা হ'তে হলে কত চিন্তা, কত পাঠ কত উপায় উদ্ভাবন, কত জ্ঞান, কত তৎপরতা আবশ্যক। এ দেশের নারীগণ, জননীগণ চিন্তা করুন, তাঁদের দায়িত্ব কত গুরুতর। মাতার দেহে শক্তি এবং অন্তরে মহৎ ভাব, পবিত্র চিন্তা ও উন্নত আকাঙ্ক্ষা না থাকলে, প্রকৃত সন্তান-পালন ও মাতৃগৌরব লাভ অসম্ভব।

বিধবাশ্রম ও বিদ্যালয়।

মাদ্রাজের তামিল জাতীয় হিন্দুগণ অতি রক্ষণশীল ব'লে বিখ্যাত। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মাদ্রাজী বিধবাদের জন্য একটি বোর্ডিং ও বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন: আর বাংলার কোন কোন মহাত্মা চিন্তা করছেন, বিধবাদের আবার শিক্ষার দরকার কি? মাদ্রাজ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ প্রদেশ। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ অতি রক্ষণশীল; কিন্তু কালস্রোতে তাঁরাও বুঝতে পেরেছেন যে বিধবারাও মানুষ, ঠিক অন্য স্ত্রীলোকদের মত মানুষ: এক বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও, কিছু খেতে হয়, পরতে হয়, তাদেরও সুখ দুঃখ, মান অপমান আছে। এজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বিধবাদের জন্য বিদ্যালয় সহ আশ্রম স্থাপন করেছেন। লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন অবস্থার বিধবাদের জন্য কত সহস্র বিধবাশ্রম ও বিদ্যালয় আবশ্যক। সুখের বিষয় এদিকে ক্রমশঃ সহৃদয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়ছে।

সম্প্রতি কানপুরে একটি বিধবাশ্রম স্থাপনের জন্য একজন ধনী ব্যক্তি ১,৬০,০০০ টাকা দান ক'রেছেন। ৬০,০০০ টাকা বাড়ীর জন্য এবং ১,২০,০০০ টাকা অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য।

"বোম্বাই সমাজ সংস্কার সমিতি," কয়েক বৎসর যাবৎ বোম্বাই নগরের কয়েকটি বিধবার শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। ক্রমশঃ শিক্ষার্থিনী বিধবার সংখ্যা বাড়ছে দেখে, তাঁরা বোম্বাই নগরে আর একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা ক'রেছেন; এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন।

মানুষের হৃদয় মনের জড়তা যত ভাঙ্গবে, জ্ঞান ও প্রেম যত বাড়বে, ততই অপরের দুঃখ কষ্ট অভাব দূর করবার জন্য মানুষ আপনাকে দায়ী ব'লে মনে করবে। ততই দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে।

নবযুগে রমণীর স্থান।

বর্ত্তমান যুদ্ধ জগতে মহা প্রলয় উপস্থিত ক'রেছে। এতদিন জগত যে ভাবে যে পথে চলছিল; বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল; জাতি সকলের মধ্যে আদান প্রদান, ঘাত প্রতিঘাত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল; দেশে দেশে সকল জাতির জীবনে সমাজবিধি ও ধর্ম্মনীতির যেরূপ স্ফুরণ ও বিকাশ দেখা যাচ্ছিল, এই ভয়ানক যুদ্ধে সে সকলই আহত ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি শিল্প, শিক্ষা ও শিষ্টাচার সবই অচিন্তনীয় আঘাতে কম্পিত, ভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত। যতই দার্শনিক ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, মানুষের হৃদয় হাহাকার ক'রে ব'লে উঠছে, এত শতাব্দীর এত ধর্ম্ম প্রচার, ধর্ম্মালোচনা, এত সাধুভক্তের জীবনপাত, তার কি এই ফল? ত্যাগ, প্রেম সবই কষ্টকল্পনা ক'রে রক্ষা করতে হচ্ছে! এমন বর্ব্বরতা তো পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই! সমাজে হাহাকার, লক্ষ লক্ষ গৃহ-পরিবার ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ নরনারী বালক বালিকা গৃহহীন, বস্ত্রহীন অনাথ আতুর, শোকে মগ্ন, অত্যাচারে অপমানে ভগ্ন, পবিত্র সম্বন্ধ চূর্ণ ছিন্নভিন্ন। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ প্রায়; কৃষিক্ষেত্র মরুভূমি: শিল্পকলা মৃতপ্রায়। বাহিরের শিক্ষার ঠাট কিছু পরিমাণে বজায় থাকলেও প্রকৃত শিক্ষার কণ্ঠরোধ, এবং শিষ্টাচার ও ভদ্রতা কোথায় দাঁড়াবে তার স্থান নাই? এখনও যুদ্ধ চলছে। কোথায় এ যুদ্ধের অবসান, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, মানুষের অবস্থা যে কি প্রকার হবে, তা মহা প্রহেলিকা। কিন্তু এ যুদ্ধের অবসানে, মানবজাতিকে যে মহা প্রলয়ের অবসানে আবার নূতন করে জীবন যাত্রা আরম্ভ করতে হবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জগতে নব যুগের সূচনা হবে। জগতের অতীত ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ ক'রে, মানুষকে নূতন করে বাসা বাঁধতে হবে। সেই নব যুগে রমণীর স্থান কোথায়? এতদিন এজগতে পুরুষ রাজা, পুরুষ শাসনকর্ত্তা, পুরুষ ব্যবস্থাকর্ত্তা, পুরুষ রক্ষাকর্ত্তা ছিল এবং রমণী সর্ব্বতোভাবে পুরুষের অধীন ও মুখাপেক্ষী ছিল। জগতের কোন গুরুতর ব্যাপারে রমণীর কোন স্থান ছিল না। এক কথায়, জগতের এতদিনের সভ্যতা ও ইতিহাস রমণী বর্জ্জিত ব্যাপার। জগতে বহুবার বহু প্রলয় হ'য়েছে, বহু জাতির সঙ্গে সঙ্গে

বহু সভ্যতার উত্থান পতন হ'য়েছে, সে সবই নারী-বর্জ্জিত। এবার মহা প্রলয় উপস্থিত। এই প্রলয়ের অবসানে সেই প্রাচীন নারী বর্জ্জিত সভ্যতার পরিবর্ত্তে, নরনারী সম্মিলিত নব সভ্যতা, নব জাতীয়তা, নব সমাজের সূচনা হবে। নারী কোন বিষয়ে কেবল নারী বলে পশ্চাতে থাকবেন না: নরনারীর সকল অধিকার সমান ও অবাধ হবে।

সকল দেশের চিন্তাশীল রমণীগণ এই মহাভাবে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ছেন। একথার বিশেষ অর্থ আছে; এ কেবল অসার ভাবমাত্র নয়। আমরা সর্ব্বদাই শুন্‌তে পাই, আমাদের দেশ শাসনে আমাদের কোন অধিকার না থাকা, আমাদের কাছ থেকে রাজকর রূপে সংগৃহীত অর্থের ব্যয়-ব্যবস্থায় আমাদের পরামর্শ না লওয়া, আমাদের জন্য যে সব আইন কানুন হয় সে সকল বিধি বদ্ধ হওয়ার সময় আমাদের মতামত গ্রহণ না করা ঠিক নয়: কারণ, আমরাও তো মানুষ, আমাদের ভাল মন্দ আমরা যেমন বুঝি তেমন কি বিদেশী রাজপুরুষেরা বুঝেন! এই জন্য আমরা পার্লেমেণ্টেও ভারতবর্ষে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দাবী করে থাকি। ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ দাবী যে ন্যায়সঙ্গত, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, এরূপ দাবীর অধিকার যে এদেশবাসীর কত দূর আছে, তা চিন্তার বিষয়। এদেশে নরনারীর মধ্যে প্রভেদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রভেদ, হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ, অধিকার ভেদ, দুর্ব্বলের উপর সবলের জুলুম, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উপেক্ষা এত বেশী, এবং এত স্পষ্ট যে, আমরা যখন ইংরেজের সঙ্গে সমান অধিকার চাই, তখন কেও এই সব বৈষম্যের উল্লেখ করলে, আমাদিগকে নিরুত্তর হ'তে হয়। তবুও মানুষ স্বভাবতই উন্নতি কর্‌তে চায়, চলতে চায়; স্বাধীন হ'তে চায়, সকলের কাজ সকলের পরামর্শ অনুসারে হয়, এই চায়। উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সবল দুর্ব্বল, সকলেরই সুখ দুঃখ যে ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, সে ব্যবস্থার মূলে সকল শ্রেণীরই পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। সকলেরই নিজস্ব কিছু আছে, যা অপরে বুঝ্‌তে পারে না। এই সব কারণে, শিক্ষা, শাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসাবাণিজ্য সকল বিষয়ে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, নারীগণেরও বিশেষ স্থান থাকা আবশ্যক। "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য"—এতদিন সেই ভাবেই চলেছে। কিন্তু তার পরিণাম শুভ হ'য় নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কাণ্ড দেখে, সকল দেশের মনস্বিনী নারীগণ বল্‌ছেন, কেবল পুরুষদের হাতে আর জগতের পরিচালন ভার ছেড়ে দেওয়া হবে না। পুরুষগণ যশের ভাগী, আর রমণীগণ কেবল অত্যাচার উৎপীড়ন, অপমান, শোক দুঃখ আরও কত অবর্ণনীয় হীনতার ভাগী! পুরুষগণ রণ-গৌরবে প্রাণ দিচ্ছে, আর রমণীগণ কেবল শোকে অপমানে জর্জ্জরিত হচ্ছে। নারী ভিন্ন দেশ রক্ষা হয় না, জাতি বাঁচে না, সমাজ থাকে না, মানব-জীবনের শোভা সৌন্দর্য্য আনন্দ পবিত্রতা কিছুই থাকে না। অথচ নারীর কোন অধিকার নাই, কোন শক্তি নাই। কেবল এক অধিকার আছে অনন্ত দুঃখ কষ্ট বহনের। কিন্তু আর সে অবস্থায় থাকা নারীগণের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন পুরুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে নারীর হৃদয়কে বসাতে হবে। পুরুষ ও নারী, জ্ঞান ও প্রেম এক যোগে মানব জগতের শিক্ষা ও শাসনভার গ্রহণ ক'রবে। রাজার পাশে রাণী, অথবা দেশ নায়কের পাশে তাঁর পত্নী এখন শক্তি-হীন শোভা মাত্র। রমণী আর এরূপ প্রাণহীন শোভা উপকরণ হয়ে থাকলে চল্‌বে না। এক জনের দুই বাহুর মত, এক পাতার দুই পৃষ্ঠার মত, এক ব্যক্তির দুই পায় মত নরনারীর সমবেত চেষ্টা নব যুগের নব সভ্যতার সূচনা করবে। হিন্দু পুরাণে আছে, বার বার জগতে মহাপাপের জন্য মহাপ্রলয় উপস্থিত হ'য়েছে এবং ব্রহ্মশক্তি দেবীরূপে প্রকাশিত হ'য়ে, জগতের পাপবিনাশ করে শান্তি স্থাপন ক'রেছেন এবং সকলের পূজা লাভ করেছেন। ভবিষ্যতে রমণীই ব্রহ্মশক্তিরূপে জগতে শান্তি স্থাপন কর্‌বেন এবং সকলের পূজ্যা হবেন। এজন্য নারীর সাধনা চাই, শিক্ষা চাই, প্রস্তুত হওয়া চাই। বহু

রমণীকুল কি সেই শুভদিনের জন্য প্রস্তুত হবেন না, সেই সুপ্রভাতের দিকে অগ্রসর হবেন না ?

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।"

নারীর কাজ।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত পালামকোটা নগরে একটি বাংলাতে একজন অন্ধ বালক প্রায়ই ভিক্ষা চাইতে আসত। একদিন সেই বাংলা বাসিনী মেম্ সাহেব তাকে একটু তিরস্কার ক'রে বল্লেন "তুই ভিক্ষা ক'রিস্ কেন্ ?" সে বেচারা সরল ভাবে উত্তর দিলে,—অন্ধের দ্বারা কি কোন কাজ হয়! তখন সেই সহৃদয় মহিলা তাকে পাখা টানার কথা বল্লেন এবং তিনি তাকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করলেন। অন্ধবালক রোজ এক ক্রোশ পথ হেঁটে পাখা টান্‌তে আসতো এবং সে যে একটী কাজ ক'রে কিছু উপার্জ্জন করতে পার্‌ছে এবং আর পাঁচজন চাকরের মধ্যে একজন চাকর ব'লে গণ্য হ'য়েছে, একটী আশ্রয় পেয়েছে, এজন্য সে কত আনন্দ প্রকাশ ক'রতো। একদিন মেম সাহেব তাকে বল্লেন যে, ইংলণ্ডে তার মত অন্ধ ছেলে মেয়েরাও লেখা পড়া শেখে। তাই শুনে সে লেখাপড়া শিখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগ্‌ল। বালকটির নাম "সুপ্ত" এবং মেম সাহেবের নাম মিস্ আস্‌কুইথ্। মিস্ আস্‌কুইথ্ সুপ্তর জন্য বই আনবেন ব'লে বিলাত চলে গেলেন। সে প্রায় ২৩ বছরের কথা।

তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তামিল ভাষার অন্ধদের পড়বার উঁচু অক্ষরের বই তৈরি করালেন। এবং ফিরে এসে সুপ্তকে সেই বই দিয়ে পড়াতে লাগ্‌লেন। তিন মাসের মধ্যে সুপ্ত ইংরেজী পড়তে শিখ্‌ল। তখন সে যেন নব জন্ম পেল। মিস্ আস্‌কুইথের অনুমতি নিয়ে, সে তার মত আরও কয়েকজন অন্ধ বালক বালিকাকে তার নিজের সৌভাগ্যের কথা বলে তাঁর কাছে নিয়ে এলো। তিনি তখন একটি স্কুলের ভার নিয়েছিলেন। সেই স্কুলের দুটি ঘরে অন্ধ বালক বালিকাদের স্থান দিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে লাগ্‌ল, স্বতন্ত্র স্কুল বোর্ডিং হ'ল। কিন্তু সুপ্ত সে সব দেখ্‌তে পায় নাই; কোন নরাধম তাকে হত্যা করেছিল।

এখন প্রায় ৭০ বিঘা জমিতে অন্ধদের জন্য আশ্রম, বোর্ডিং, স্কুল, শিক্ষকদের বাসস্থান প্রস্তুত হ'য়েছে। বেড়াবার জায়গা, খেলবার মাঠ প্রভৃতি সবই তার মধ্যে আছে। দুই দিকে স্বতন্ত্র ছেলেদের ও মেয়েদের আশ্রম। এখন ছেলেদের সংখ্যা সাধারণ বিভাগে ৪৯, এবং শিল্প শিক্ষা বিভাগে ২৮; মেয়েদের সংখ্যা সাধারণ বিভাগে ৩৩ এবং শিল্প শাখায় ৭, সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭। এই বিদ্যালয়ে তিন জন ইংরেজ মহিলা এবং ২৫ জন এদেশী পুরুষ ও মহিলা শিক্ষাকার্য্যে লিপ্ত আছেন। তাঁদের মধ্যেও ১১ জন অন্ধ শিক্ষক। প্রতিমাসে প্রায় ১,২০০, টাকা খরচ হয়। গবর্ণমেণ্ট্, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি হ'তে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়; আর সবই দয়ালু ব্যক্তিদের দান। উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রবংশের অন্ধদের জন্য দালাভয় মুদলিয়ার নামক একজন সদাশয় ব্যক্তির অর্থে একটি স্বতন্ত্র আবাস তৈরি হ'য়েছে।

এই বিদ্যালয়ের যে কোন বিভাগে গেলেই দেখা যায়, অন্ধ বালক বালিকারা পরম সুখে আছে। সকলেই কিছু না কিছু শিখেছে। যারা এখানে আশ্রয় পাওয়ার পূর্ব্বে সেয়াল কুকুরেরও অধম ছিল, তারা এখন মানুষ বলে গণ্য হ'য়েছে, এজীবনের আনন্দ সম্ভোগের অধিকারী হ'য়েছে। শিল্পশিক্ষা বিভাগে ছেলেরা তাদের এবং অপর সকলের কাপড় নিজেরাই বোনে। তারা মাদুর, ফিতে, ঝুরি, পুঁতির পুঁতা প্রভৃতি আরও নানা প্রকার জিনিষ তৈরি করে। মেয়েরা রান্না করতেও শেখে। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়াম এবং ড্রিলেরও সুব্যবস্থা আছে।

একজন বিদেশী মহিলা, কয়েক বছরের মধ্যে এত বড় একটি অনুষ্ঠান ক'রে এদেশের পথের ভিখারী, সকল সুখ হ'তে বঞ্চিত, অকর্ম্মণ্য, সংসারের ভার স্বরূপ ১১৭টী বালক বালিকাকে, স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী সুখী, কর্ম্মক্ষম ও বিকাশশীল আত্মার উন্নত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ কত বড় আশার কথা।

ছয় মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে ফিল আস কুইন্‌ এবং অন্ধ বালকবালিকাদের ছবি ও স্কুলের বর্ণনা প্রকাশিত হ'য়েছে। অন্ধদের গান বাজনা, শিক্ষা, ব্যায়াম, কাজকর্ম দেখলে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়; মনে হয় এই তো স্বর্গ। এ কাজ রমণী হৃদয়েরই যোগ্য। ভগবান করুন, এ দেশে এইরূপে দেবীস্বরূপিনী রমণীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক

ভারতবর্ষে অন্ধের সংখ্যা ৮,০০,০০০। আরও কত শত এই রকম বিদ্যালয় ও আশ্রম হলে, এদেশের অন্ধদের দুর্গতি দূর হবে!

উন্নতির উপায়।

বর্ত্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ সম্মিলন; বিবিধ শক্তির সম্মিলনে মহাশক্তি উৎপাদন। পূর্ব্বে একএক জন লোক নিজের যতটুকু শক্তি সাধ্য কাজ ক'রে যেত, চাষ বাস ব্যবসা বাণিজ্য ক'রত; এখন শত শত জন মিলিত হ'য়ে এই সকল কাজ করছে, আর একটা মহাশক্তি হ'য়ে উঠ্‌ছে। কুলি মজুরেরা পর্য্যন্ত জোট বেঁধে মহাশক্তির পরিচয় দিচ্ছে। রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন, বিক্রেতা ও ক্রেতা প্রভু ও ভৃত্য, পুরুষ ও নারী এতদিন বিভিন্ন ছিল। এখন মানুষ দেখ্‌ছে, এই বিভিন্ন শক্তির সমবায় ব্যতীত জগতের কল্যাণ নাই। সম্প্রেষী ও বিভিন্ন শ্রেষ্ঠীর বিবিধ ব্যক্তি ও শক্তির সমবায়ে এক একটি প্রবল শক্তি-কেন্দ্র উৎপন্ন হচ্ছে। বিভিন্নতার মধ্যে সাম্যের পথে মানুষ অগ্রসর হ'চ্ছে। বিবিধ প্রকার সমবায়ের মধ্যে অতি প্রধান এবং গুরুতর সমবায় পুরুষ ও নারী শক্তির সমবায়। উভয় শক্তির পরস্পর মিলন ও সহায়তা ব্যতীত কোন জাতির স্থায়ী উন্নতি ও শান্তি সম্ভব নয়। এই সমবায় ও সম্মিলনের পক্ষে অপর দেশের নারীগণ জাগ্রত হ'য়ে উঠছেন। ভারত মহিলাগণ, উঠুন জাগ্রত হোন, জগতে এবং জাতীয় জীবনে আপনার স্থান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হোন্।

অবরোধ

পঞ্চম অধ্যায়।

তাসোসিয়ার রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে, রাজ-কুমারী জিমেনা এবং সহচরী ফেরেসা সমাগত।

ফেরেসা—আরো কিছুক্ষণ থাক এ উদ্যান মাঝে,
পবিত্র নির্ম্মল বায়ু মৃদুল গুঞ্জনে
কাউস্যাথা আন্দোলিয়া রহিছে কেমন,
পুষ্পের সৌরভরাশি ছড়ায়ে চৌদিকে;—
নগরে ঘুষিত বাদ্য, আর হাহাকার!

জিমেনা—অন্তিম শয্যায় শু'য়ে কত শত বীর,
কেও নাই মুখে দিতে এক বিন্দু জল,—
তাদের ক্রন্দন, তৃষ্ণা, যাতনা অপার
টানিছে হৃদয় মম চল শীঘ্র যাই।

ফেরে—তুমি না বাসিতে ভাল, নির্ঝর-সঙ্গীত?
কুঞ্জবনে পত্রমধ্যে পবন মর্ম্মর,
স্বভাবের শোভারাশি, এ সকল ছেড়ে
যাবে তুমি মৃত্যুময় নগর প্রাঙ্গণে?

জিমেনা—পত্রপুষ্প শাখা চুমি পবন মর্ম্মর
নূতন সঙ্গীত ঢালে অন্তরে আমার।
সকল সঙ্গীত শোভা মিষ্টতা বিদারি
বিষাদের ম্লান ছায়া পরশে হৃদয়।
অন্তরে শুনেছি বাণী, স্বর্গের আহ্বান,
পৃথিবীর বর্ণ দৃশ্য সঙ্গীত সুতান
নব-অর্থ পূর্ণ সব নূতন আকার!
শুনেছি আহ্বান আমি; যাব সে কারণ,
মৃত্যু যথা সদাব্যস্ত জীবন সংহারে,
ভীত করে বীর হৃদি, নিরাশ-শিথিল,
বজ্র-সম বীর-বাহু করে শৃঙ্খলিত,
যাব সেই মৃত্যুশীলা মাঝে। আজ নয়
অলস বাতাসে ব'সে বৃথা দীর্ঘশ্বাস,
লঘু মেঘ যথা ভাসে শারদ আকাশে।
প্রতি পত্র সঞ্চালনে পশিছে শ্রবণে
স্বর্গের আহ্বান-বাণী কাঁপিছে হৃদয়!
বিষম সময়, প্রতিক্ষণ পরিপূর্ণ

তীব্র বেদনার গুরুভারে অন্ধকার,—
বাকী নাই কোন দুঃখ ইহ জীবনের।
থেরে—বলোনা এমন করে, শোভে না ও মুখে;
অচঞ্চল স্থিরদৃষ্টি চক্ষে তব আজ;
উজ্জ্বল নয়নজ্যোতি করে প্রতিভাত
নব জীবনের দীপ্তি। যেওনা এখনও;
ক্ষণকাল ব'স এই নির্ঝরের পাশে,
দেখ সুরঞ্জিত পত্র নির্ম্মল সলিলে
উৎক্ষিপ্ত রজতবর্ণ বারি বিন্দু রাশি
সুস্নিগ্ধ মিষ্টতা ধীরে করে বরিষণ।
বস ক্ষণকাল, হবে স্নিগ্ধ কলেবর,
ম্লান শুষ্ক মুখ তব হবে সমুজ্জ্বল।
বস তুমি, গাই প্রিয় সঙ্গীত তোমার :—

সঙ্গীত।

স্পেনের দুহিতা সমাধিশয়নে সুদূর প্রবাসে কেন ?—
প্রীতিসহ দেবে পুষ্পউপহার ছিলনা কি কেহ যেন!
শুদ্ধ বায়ুও তিক্ততানাই কমলার শাখা নাই,
সান্ধ্য-সমীরে চঞ্চল-নত কাউ গাছ কোথা হায়;
জীবন প্রবাসে বিদেশী পোলাপ ঝ'রে যায় তব পাশে,
তাল তরু ছায়ে র'য়েছ শয়ান ছুড়ার নীরব দেশে।
ফুলরাশি ঢাকা অবনত ক্রুশ, তোমার শয়ন স্থলে,
কে লিখে দিয়েছে বিজয়চিহ্ন প্রস্তর-উপকূলে!
বিজয়ী বীরের গৌরবস্মৃতি পড়িছে নয়ন পথে—
ছিন্ন কুসুম, শুষ্ক পত্র,—একি রমণীর সাজে!
ক'রোনা তুচ্ছ, বীরের মান দাও এ সমাধি তরে,
বিজয় পতাকা উড়িবে কখন এই সমাধির শিরে।
প্রেম বলে বলী মহিয়সী নারী কৃপাণধারিণী করে,
বীরপণ পাশে বীরযোগ্য বেশে দাঁড়াল সমর তরে!
প্রেম হ'ল জয়ী, বক্ষ সে তেজ, শত্রু অস্ত্র হল বৃথা,
বিঁধিল বক্ষ আপনার হাতে, পড়িল সমাধি যথা।
পুণ্য ভূমিতে ধর্ম্ম রাখিতে পতন বীরের মত,
সেখানে শয়ন মনের কামনা,—পূর্ণ হ'য়েছে তা' তো!
শায়ন-পোলাপ, কর সুরভিত মৃদুল মলয় বায়ু,
ছুড়ার বিটপী, কর ছায়া দান, অমর তোমার আয়ু।

থাকে চিরতরে এ সমাধি যাকে অতীতের স্মৃতি লয়ে
প্রেম ও মৃত্যু মিলেছে যেখানে পলিকেরে দেখে কয়ে।

জিমেনা—বিজয়সঙ্গীতসম ধ্বনিত শ্রবণে
এ সঙ্গীত ধারা বক্ষ নাচিত স্পন্দনে;
কিন্তু আজ শোকপূর্ণ করুন রোদন
কেন ভাসিতেছে প্রাণে! সমাধি শয়নে
জুড়াব হৃদয় জ্বালা, কিন্তু তার আগে,
একবার জয়ধ্বনি পিতৃসৈন্য দলে
পাবনা শুনিতে যায়!—প্রিয় ভ্রাতৃগণ
ওই জয়ধ্বনি যাকে জীবন তোদের!—
কিন্তু চিন্তা,—কল্পনার নহে এ সময়,
র'য়েছে কর্ত্তব্য রাশি,—চল দ্রুত ক'রে।
ফুরিয়েছে দিন যার, সেকি পারে কভু
পুষ্পগন্ধ মৃদু বায়ু করিতে সেবন?

(দ্রুতপদে রাণীর প্রবেশ)।

রাণী।—আঃ—স্নিগ্ধ হ'ল দগ্ধ প্রাণ শীতল পবনে!
শান্ত হ'তে হবে মোরে, তাঁর সঙ্গে দেখা—
তাঁর দৃষ্টি দুনয়নে সহিব কেমনে!
(চমকিত হ'য়ে) একিরে জিমেনা! তুই কেন মা এখানে?

জিম—হায় মা! এ দ্রুত পদ, উন্মাদ চাহনি
একি মূর্ত্তি, একি দশা, একি বেশ তোর!

রাণী—(পাগলের মত তুইকি বুঝিবি যাদু, মরম বেদনা!
হৃদয়ে পূজিত বহ্নি ইষ্ট পূজা তরে
চর্ম্মচক্ষে হ'ত যদি দিব্য দীপ্তিমান,
কে যাচিত ঐ জগতে! কে জানে মর্ম্মের
ব্যথা, মরমের কথা প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে!

জিম—মা,—মা,—একি দৃষ্টি তোর, চঞ্চল উদাস!
শুষ্ক মুখ, একি জ্বর! অথবা রজনী
তোর শোকাহত বক্ষে আনেনি বিশ্রাম!

রাণী—বিশ্রাম! বিশ্রাম কোথা? কে করে বিশ্রাম!—
প্রাণাধিক প্রিয় যার আছে কেহ ভবে,
বিশ্রাম কোথায় তার! রত্ন মূল্যবান
যদি কিছু থাকে কারু অবনী মাঝারে
সে যেন বিশ্রাম নাহি চায়,—মূঢ় জীব!—
নরকের রাজদূত জাগ্রত প্রহরী

অন্ধকার শূন্য পথে সদা বর্ত্তমান
যশোভাতি বীর-কীর্ত্তি জীবন যাদের
তাহারা দেখুক চেয়ে মানব জীবন
কত ঘৃণ্য, কত তুচ্ছ, অলীক অসার!—
গৌরব বিহীন প্রাণ ধরিবে কেমনে!
রাজা কি সহিবে এ দীনতা! কে বলিবে?

জিম—মা, মা, এস, এস যদি নহতাহু হ'য়ে,
কাতর হৃদয় হয় একত্র মিলায়ে
ব্যাকুল প্রার্থনা করি! শান্তিপ্রস্রবণ
মঙ্গলবিধাতা ছাড়া কে আছে তাদের
বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত যাহারা?—
সরে যা দেরেসা,—বাকি একা ক্ষণকাল:
শোকার্ত্তের শান্তি চিন্তা বিজন-বাসিনী।...

(বেরেসার প্রস্থান)

দুঃখিনী জননি মোর কাঁদ ভাল ক'রে:
আহতহৃদয়ভেদী কাতর ক্রন্দন
শোনেন করুণাময়, শান্তি বিতরণে
করেন সন্তাপ দূর! যোস মম পাশে!

রাণী—না! না! যার চিত্ত শুদ্ধ সেই শুধু পারে
শান্তিপ্রস্রবণ বিশ্ব অন্তরে ধরিতে।
অন্তর মলিন মম! ভীষণ দুর্যোগে
মেঘাচ্ছন্ন, বজ্রপাতে কম্পিত হৃদয়:—
আঁধার অন্তরে তীব্র বিদ্যুতের রেখা,
বিষবাণ তুল্য জ্বালা! শান্তি! কোথা শান্তি!
শান্তি আছে এ জগতে? গেছে পৃথি ছেড়ে!
সুখ আছে? আছে সুখ, ভীষণ নিষ্ঠুর!
চুপ কর! আছে সুখ, আনন্দ জগতে,
যদি এ নগর ছেড়ে, এ শ্মশান পুরী
ছেড়ে যেতে পারি ওই উন্মুক্ত পাহাড়ে!
কিন্তু থাক চুপ কর, পুণ্য তরুলতা
কেও যেন শোনেনা এ গোপন বারতা!
ওরাও যে কথা কয় নীরবে গোপনে!
চুপ, চুপ, আর আমি কবনা সে কথা!

জিম—ভগবান! একি হ'ল! পাগলিনী মাতা!

রাণী—(চমকিয়া) ওকি! পদ শব্দ কার! আসিছেন রাজা!
ওকি তোর পিতৃ পদধ্বনি! চল্ চল্,
লুকো লুকো, তাঁর, দৃষ্টি হ'তে সরে যাই

[রাণীর গমনোদ্যোগ, রাজার প্রবেশ ও হস্ত ধারণ]

রাজা—এলিনা! ছেড়ে যাবে? জীবনসঙ্গিনী
যৌবন প্রারম্ভ হতে, যবে সুখ আশা
আনন্দ গৌরব জয় ছিল চির সাথী,
জীবনের খর স্রোতে সম্পদে বিপদে
চির স্থির প্রেম তব অটল সহায়,
সহযাত্রী চিরদিন, আজ ছেড়ে যাবে?
আজ দেখ জীবনের পান্থ অন্ধকারে
ঘনীভূত কৃষ্ণমেঘ নিয়তি আকাশে,
উঠেছে প্রবল ঝড়—আজ ছাড়াছাড়ি!

রাণী—(তীব্র স্বরে) কে বলেছে আজ আমি ছেড়েছি তোমারে!

রাজা—হায় রাণী, প্রিয়তমে, যে প্রেম তোমার
সমস্ত জীবন মোর ছিল আলো করে,
রত্ন দীপ সম স্থির অচঞ্চল প্রেম,
সুখে সুখী দুখে দুখী শক্তিনির্ঝরিণী,—
বিস্মৃত স্বপ্নের মত হবে সেই প্রেম!—

রাণী—তব মুখে এই কথা শোভা নাহি পায়!
এই প্রেম, এই স্মৃতি, জীবন কাহিনী
বক্ষবাসে নিয়ে, হয়ে অবনত মাথা
পড়েছিল পদে দাসী,—কোথা ছিল প্রেম?
এমন ঘটনা ভবে হয় সংঘটন
যাহার পরশে প্রেম অতীতের স্মৃতি
সব মুছে যায়, হয় স্বপ্নের মতন,—
রেখে যায় শূন্যগর্ভ ব্যর্থ প্রেম স্মৃতি!
বৃথা প্রেম, আত্মীয়তা এ জগত মাঝে!
নির্ভর বিশ্বাস প্রেম যে করে মানবে
মূঢ় তুচ্ছিকার তার হয় অবসান!

রাজা—দুঃখদগ্ধ হৃদয়ের তিক্ত আর্ত্তনাদ!
অন্তরে সংগ্রাম তব কর্ত্তব্যে ও স্নেহে,
বড় তীব্র। ওই শোন, ওকি তূর্য্যধ্বনি!
বহু দূরে, বহু সৈন্য পারে সিংহনাদ!

জিম—জানি আমি ওকি শব্দ? প্রবল বটিকা।

সহসা উন্মত্ত হয় রণরঙ্গে মাতি
লয়ে যায় আমাদের রণজয় ধ্বনি,
করে প্রতিঘাত দূরে পর্ব্বত শিখরে ?

রাজা—প্রতিধ্বনি ! নহে সহযোগী সৈন্য তার !
জন্মের সব শক্তি করেছি প্রয়োগ
আশা দিয়ে কতরূপে রেখেছি সজীব,
কেঁপে উঠে ক্ষণে ক্ষণে ! পরীক্ষা ভীষণ
এখনও বীরের মত হইবে সহিতে !
তব স্থির আরও কিছুক্ষণ টলিব না !
পরীক্ষার হবে অবসান, ভগবান
আর না চাবেন কিছু হৃদয় বিদারি।
আয়, তুমি রাণি !

রাণী—প্রস্তুত হৃদয় মম, যা হবে সহিতে !

রাজা—জানি আমি, রক্ষা তুমি করিবে আমারে ;
সার্থক বিশ্বাস প্রেম ক'রেছি তোমারে,—
জীবন-সঙ্গিনী, শক্তি চির-অচঞ্চল !

রাণী—(চিত্তের মত) যাও সরে যাও ! তুমি কিছুই জান না !
পুরুষ দুরাশা করে হৃদয়ে পোষণ,
ক্ষণস্থায়ী এ জীবন যশের গৌরবে
কল্পনা মণ্ডিত করে ভাবে কি মহৎ !
মনে করে বুঝেছে সে মানব-হৃদয় !
বৃথা স্পর্দ্ধা অহঙ্কার অলীক স্বপন !

রাজা—পাগলের মত কথা ! কিন্তু তবু স্থির
জানি তুমি সেই মম জীবন-সহায় !
অসংখ্য বিপদ দুঃখ পরীক্ষা আকারে
মনস্বিনী নারী তুমি চিত্ত-সুধা দিয়ে
করেছ আমার প্রাণে শকতি সঞ্চার !
এক সঙ্গে গাঁথা ভাগ্য, এক পথে গতি,
এক সঙ্গে রবে নাম তোমার আমার !
অকলঙ্ক মহাযীর দেশের সেবক
এ জীবন পাশে রবে তুমি চিরদিন !

রাণী—একি সহ্য হয় ! আর কত কথাঘাত
সবে এ হৃদয়ে হায় ! তব ক্রোধ ভাল।
রেগে কথা বল আর কর তিরস্কার,
সে যে সয় প্রাণে ! কিন্তু, কোমল বচন,
ভালবাসা তীব্র সম বিঁধে হৃদি, হায়
প্রশংসা তোমার, সেযে দারুণ সম !
বলোনা অমন ক'রে ! তব অসিঘাতে
যদি নাশ মোর প্রাণ, সে তো হবে তব !

রাজা—প্রিয়তমে, এ কেমন কথা, বল শুনি !—

রাণী—প্রিয় সম্ভাষণ আর ক'রো না আমারে !
উন্মুক্ত আহত স্থানে জলন্ত অঙ্গার
ফেলে দিলে যে বেদনা, তেমনি যাতনা
তব প্রিয় সম্ভাষণ বাণী হানে প্রাণে—
হৃদয়ে রয়েছে কত অজ্ঞাত তোমার !

রাজা—চাও মোর পানে, দেখি কি যাতনা জলে !

রাণী—মুক্ত শুভ্র সেই মুখ আর দেখিবে না,
নাই সে নয়ন মম ! কি বলেছি আমি,
ভুলে যাও সব কথা : প্রলাপ বচন !
বিকৃত মনের স্বপ্ন ভাষায় প্রকাশ,
তার অর্থ নির্দ্ধারণে কি ফল তোমার !

রাজা—আনন্দ উৎসবে মম দেখেছি তোমায়,
ঘোর দুঃখে অবনত ভাবেতো দেখেছি :
দেখেছি তোমারে সুস্থ দীপ্ত সমুজ্জ্বল,
রোগ ক্লিষ্ট ম্রিয়মান বদন মণ্ডল :
জানি তব আশা, ভয় সকল সময় :
কিন্তু কোন দিন রাণী, এদীর্ঘ জীবনে
তব চক্ষু হয় নাই লজ্জিত কম্পিত
চাহিতে এমুখ পানে ! আজ কেন তবে—

রাণী—তীব্রদৃষ্টি তব হায় বিদ্যুতের মত
অন্ধকার বক্ষ কত চায় দেখিবারে !

রাজা—তোমার অন্তরে কিছু রেখেছ লুকিয়ে !

রাণী—হায় নাই গোপন বারতা এজগতে !

রাজা—কার নাই ! এপর্য্যন্ত ছিলনা তোমার
গোপন বারতা কিছু অজ্ঞাত আমার।
কিন্তু শোন পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহকুল
পবিত্র যশ গৌরব অন্তরে স্মরিয়া,—

রাণী—হায় ! হায় ! একি কথা ! কি বলিলে রাজা !
পরাণ মাতান তব ওই কণ্ঠস্বর
সিংহনাদ জয়ধ্বনি, মৃত শব সম

আমি কেন মোর প্রতি ?—মৃত এ হৃদয়,
কোথা হবে প্রতিধ্বনি ? " যদি তব বাণী
সমাধি শয়ন লেহে আনে নব প্রাণ,
তবু এ হৃদয় জ্বালা অশক্ত জুড়াতে।

রাজা—আমার বচন বৃথা ? পবিত্র কুসুম
এই যে তনয়া তব, বিশ্বাসে অটল,
মহত্ত্ব গৌরবে দীপ্ত, উন্নত ললাট,
জানেনা হীনতা, তব শুদ্ধ অবিশ্বাসে
দেখ তার মুখ ভাতি মলিন চকল,—
এর পানে চেয়ে, বল কি আছে গোপন,
বল বীর চূড়ামণি পুত্রগণে স্মরি !

রাণী—পুত্রগণ মম ! হায় সে নাম স্মরণে
আছে তব অধিকার ?

রাজা— গৌরব আমার :
তারা বংশের গৌরব ! ধন্য হবে তারা
পবিত্র জীবন দিয়ে বীরের মতন !
পরাধীন ত্যাগহীন বীরত্ব বর্জ্জিত
নিষ্প্রাণ জীবনে বহি কলঙ্কের স্মৃতি,
পিতৃমাতৃ পাপ স্মৃতি তিক্ত হলাহল
বক্ষে লয়ে বেঁচে থাকা সুদীর্ঘ মরণ,
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল বীরের মতন !
বীরের গৌরব লাভে অধিকারী তারা।

রাণী—(ক্ষিপ্তপ্রায়) বীর তারা ! বীরবংশে জনম তাদের
মরিবে বীরের মত ! সে তাদের কাজ !
পাপীদের পক্ষে পাপ নহে অসম্ভব !
বিধাতা বিশ্বের পিতা জানেন সকলি,
এজীবনে আসে চক্ষে দারুণ পীড়ন,
সে আঁধারে ডুবে যায় বুদ্ধি বিবেচনা !

রাজা—সকল সংগ্রামে দৃঢ় অটল বিশ্বাস
অকলঙ্ক প্রেম তব, জীবনের সুধা !—
হায় ! কি করেছ তুমি ! যাও মা জিয়েনা !

রাণী—না মা তুই থাক কাছে, তোর ওই চোকে
করুণা রয়েছে চেয়ে। আর দৃষ্টি যত
সব বিষবাণ সম, ঘৃণা তিরস্কার
পূর্ণ ! তুই যাসনে মা ছেড়ে দুখিনীরে !

রাজা—অবনত তব মুখ দেখিব এ চোকে !
বুক ফেটে যায় ! তবু বল, কি ক'রেছ ?

রাণী—ওই দেখ যায় পানে। শ্রান্ত দেহ তব,
কিন্তু আজ রাত্রে আর ক'রো না বিশ্রাম,—
ওই দেখ নগরের পশ্চিম তোরণে,—
মৃত অর্থে বন্দীভূত প্রহরী সকল,
ছাড়িবে তোরণ দ্বার শত্রু সমাগমে !

রাজা—অর্থে বশীভূত তারা ! বীর সৈন্যগণ,
শত প্রলোভন-জয়ী ! কাহার একাজ !

রাণী—সকল মানব প্রাণ নহে তোমা সম !
মাতৃ-প্রাণে সয় কভু সন্তান বিনাশ।

রাজা—তবে হায় ! হেন পাপ ! তুমিই করেছ ?

রাণী—পাপ ! একি পাপ ! একি মানবের ভাষা !
শোন মোর কথা রাজা, প্রেমময় যিনি
তিনি এ জগত মাঝে মাতৃ-প্রেম সম
গভীর অতল শুদ্ধ রচেননি কিছু !
এই প্রেম-বক্ষে লয়ে এ নশ্বর ভবে
কেবল যাতনা সার ! সব বৃথা বৃথা !
বৃথা মান অপমান, জয় পরাজয় !

রাজা—(নিরাশ কাতর স্বরে) আজ এ জীবন মম তুচ্ছ ধূলি সম !
অন্তরে সংশয় বিষ ক'রেছে প্রবেশ !
সব চক্ষু হ'তে মুছে গেল পবিত্রতা !
যে দৃষ্টি পবিত্র ছিল সত্যের আভায়
উজ্জ্বল আমার কাছে, আজ হ'তে হায়,
দেখিব গোপন পাপ সেই দৃষ্টি মাঝে !
জীবনের ধ্রুব তারা হল অন্ধকার !
হায় বৃথা জ্ঞান লভি হ'য়েছিনু জ্ঞানী !
গভীর বিশ্বাস আর পবিত্র সাহস,
মহা যশ, পরীক্ষিত প্রাণ বিনিময়ে,
সব হ'ল স্বপ্ন সম ! তবে কেন হায় !
শিরস্ত্রাণ এ মস্তকে, করে এই অসি ?
গভীর হৃদয় ব্যথা বড় গুরুভার,
ভগ্ন প্রাণ —ত্যজি অস্ত্র চিরদিন তরে !
জগতের সব শোভা মহত্ত্ব গৌরব

মায়া মরীচিকা সম অলীক অসার
কেবল ভুলায় মন আশার ছলনে ?
কি আছে জগতে হেন যার জন্য পুনঃ
প্রাণপণ করি হায় করিব সংগ্রাম !

জিম—বাবা ! বাবা ! ধৈর্য্য ধর ! হ'য়ো না নিরাশ !
চাও মোর পানে ; আমি সন্তান তোমার !

রাজা—পবিত্র তোমার মুখ জননী আমার !
মহৎ জীবন পথে উষা সম ছিল।
কিন্তু আজ ওই চক্ষু সম অন্ধকার !

রাণী—(পদতলে পড়ে) ঘৃণা লজ্জা যাতনার চূর্ণ এ হৃদয়
অপরাধী অভাগিনী, ক্ষম মহারাজ !

রাজা—(দাঁড়িয়ে) এই ঘোর পাপে লিপ্ত আমারও হৃদয়
তাই কি ভেবেছে মূঢ় ! ছাড় পথ রাণী,
ছেড়ে দাও মোরে, আজ অশক্ত ও বাহু
রোধিতে আমার গতি ! আমি রব হেথা
আর ওই অবিশ্বাসী আততায়ী কূল
সাধিবে আপন কার্য্য ঘৃণিত জগতে।

[রাজার প্রস্থান]

রাণী—তুই ও কি করিবি ঘৃণা জিমেনা আমার !

জিম—ঘৃণা কি মা ? এহৃদয় নিষ্কৃত কন্দরে
কত দুর্ব্বলতা আছে কেও তা জানে না
জানেন অন্তরযামী ! আমি তো রমণী,
তব দুঃখে এ হৃদয় বেদনা-কাতর !

রাণী—বেঁচে থাক মা আমার, স্বর্গ-আশীর্ব্বাদ
পড়ুক মাথায় তোর ; এত মায়া তোর !
কাতর দুর্ব্বল আমি প্রবল সংগ্রামে !
মরণ নিশ্চয় যাহা, কিন্তু তার আগে
বল্ কি কর্ত্তব্য আছে ! হায় পুত্র মম,
আমি ভুলায়েছি বৃথা মিথ্যা ছলনায় !
পবিত্র জীবনে আমি ঢেলেছি কালিমা !

জিম—কি বলে সান্ত্বনা দিব, বাক্য নাহি সরে ?
ওই শোন, ওকি ধ্বনি, বিজয় নিনাদ,
আমার সঙ্গীত সম পশিছে শ্রবণে !

(অতীত বীরগণের চিহ্ন হস্তে, একদল সন্ন্যাসিনীর
সঙ্গীত করিতে করিতে গমন)

গান।

স্বদেশ উপরে দেখ তীক্ষ্ণ তরবারী !
কেটে ফেলে শত বীর তেজিয়ান,
করে বৃন্তচ্যুত পুষ্প সম প্রাণ,
বায়ু সহ বয় মরণের বাণ,
কোথা বীর অস্ত্রধারী !
যাই সবে মোরা সমাধি ছায়ায় —
কোথা পিতা, যার প্রাণ, রাখ তব পায় !
আনন্দ উৎসব দিনে,
আনন্দে মাতিয়া ডেকেছি তোমায়,
সে ধ্বনি হেসেছে নদী গিরি গায়,
পেয়েছে সবল হৃদয় বীর্য্যে :
আজ এ বিপদে সবে মিলে গাই—
কোথা পিতা যার প্রাণ রাখ তব পায় !
কণ্ঠে আর সঙ্গীত না সরে,—
মরণসংবাদ আনে সমীরণ
যারা থাকে করে তারাও গমন,
কেহ তো থাকে না করিতে রোদন,—
মৃত তরে মৃত কাঁদিতে নারে !
তুফান তরঙ্গে ছেড়না সবায় ;—
ডুবে মরি, যার প্রাণ, রাখ পিতা পায়।
তুলুণ্ঠিত অস্ত্র শিরস্ত্রাণ,—
হেরিয়ান বীর করেছে শয়ন,
উন্নত পতাকা ধূলায় মগন :
তুমি মাত্র তরণীর স্থান।
মরণের ছায়া ভেদি এ হৃদয় চায়,—
যার প্রাণ, দেখ পিতা, রাখ তব পায় !

আচার্য্যের প্রবেশ।

রাণী—কেন আগমন তব কঠিন হৃদয় ?
কি কাজ আমার সনে ! কত অধমত
দুঃখ তারাক্রান্ত আমি, তাকি জান তুমি ?
তুমি নও শোকার্ত্তের করিতে সান্ত্বনা !

আচার্য্য—প্রভু তব পাঠায়েছে মোরে তব পাশে।
আসিবার মহারাজ ঘতক্ষণ নহে

উদ্‌যাপন, ততক্ষণ দুর্ব্বল হৃদয়ে,
দেওনা তাঁহার কাছে। বিধাতা সকাশে
জানাও হৃদয় ব্যথা ফেল অশ্রুজল,
দগ্ধ অনুতাপে কর হৃদয় নির্ম্মল!

রাণী—আজকার মহাব্রত হ'লে উদ্‌যাপন!
আশ্চর্য্য বিজয়-দীপ্তি নয়নে তোমার!
পণ্ডিত কি আমি আজ, গৌরব মণ্ডিত
মহা উচ্চ স্থান হতে? কিন্তু তবু কেন,
তোমার ভ্রুকুটি আজ অগ্রাহ্য আমার।
এক দুঃখে বেদনায় পূর্ণ এ হৃদয়;
আর সব তুচ্ছ তার কাছে; তুচ্ছ তব
তিরস্কার, তুচ্ছ ঘৃণা বিষবাণ সম!

আচার্য্য—তিরস্কার তরে আসি নাই রাণী হেথা।
বিচিত্র বিধির বিধি অনন্ত কৌশল,
অল্প স্থূল-দৃষ্টি-নর কিছুই না জানি,
কি উপায়ে কি করেন বিশ্বের বিধাতা!
ক্ষুদ্রতরু পত্রে সম কাঁটায় সকল
ক'ড়ে পড়ে বায়ু স্রোতে কোথা উড়ে যায়,
অথবা নীলাম্বু রাশি অগ্নি ভূগর্ভের,
যথাকালে পূর্ণ করে উদ্দেশ্য তাঁহার!
জাতি, ধর্ম্ম, বংশ যশে দিয়ে জলাঞ্জলী
যার জন্য এক দিন লভিতে সমর,
একদিন দেবি, হায় তোমারই চেষ্টায়
তার সংঘটন কাল আসিবে অচিরে!

রাণী—কি বলিলে? পুন বল! মাথা ঘুরে যায়!
অর্থহীন ভাষা তব পুন বল শুনি।
(রাণীর অবসন্নতা)

আচার্য্য—এখনও তোমার প্রভু নগর প্রাচীরে
দাঁড়ায়ে অচল সম, ব'লেছেন যুদ্ধে,
"জিব না নগর ছেড়ে।" পবিত্র শোনিতে
নবশক্তি আজ পুন জাগিবে এদেশে,
গৃহে গৃহে প্রজ্বলিত হবে হুতাশন,
শিখরে শিখরে নৃত্য করিবে জীবন,
তব পুত্র কীর্ত্তি হবে মুক্তির কারণ!
(রাণীর পতন)

জিম—শান্ত, দেব শান্ত হও: দেখ অভাগিনী
সংজ্ঞাহীন! কত সয় কোমল হৃদয়ে?
ধর ধর, নিয়ে যাই শয়ন মন্দিরে।
(রাণীকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান)
(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

প্রধান সম্বল

এদেশের শিক্ষিত নরনারী মাত্রেই জেরিমি বেন্থামের নাম জানেন। ইনি হিতবাদের প্রবর্ত্তক। জনষ্টুয়ার্ট মিল্ প্রভৃতি বহু জগত প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি এই মতের অনুগত হ'য়ে ছিলেন। হিতবাদ মানে, যাতে সবচেয়ে বেশী লোকের সবচেয়ে বেশী হিত হয়, তাই মানুষের কর্ত্তব্য। বেন্থাম একজন মহা প্রেমিক লোক ছিলেন। এই বংশে কুমারী এথেল বেন্থাম জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন ডাক্তার—এম্, বি, এম্ ডি বি এস্। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু-চিকিৎসায় ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। ইংল্যাণ্ডে এঁর খুব নাম। এখন ইনি উত্তর কেন্‌সিংটনের শিশু হাসপাতালের অধ্যক্ষ। এই হাসপাতাল পরলোকগত শ্রীমতী মেরী মিড্‌ল্টন এবং শ্রীমতী র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোন্যাল্ডের স্মৃতি রক্ষার জন্য "মহিলা শ্রমজীবি সমিতি" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মিসেস্ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ নারীদের কাজের আদর্শ সম্বন্ধে একবার ব'লেছিলেন—"আমরা নারী, আমরা জগতটাকে এমন ক'রে তুল্‌বো, যে এজগতে কোন শিশু যত্নের অভাবে প্রাণ হারাবে না। এই আমাদের কাজের লক্ষ্য।"

আমরা এদেশে বসে মনে করি, ইংরাজ মেয়েরা ঘরসংসারের কাজকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্যই কেবল ঝগড়া করেন। কিন্তু তাঁরা যে কেন এত ঝগড়া করেন, এত কষ্ট স্বীকার করেন, তা বিশেষ করে তলিয়ে দেখবার বিষয়।

যুক্তরাজ্যে, প্রতি বৎসর প্রায় ১২,৫০,০০০ শিশুর জন্ম হয়। এতগুলি জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশসাধন সহজ ব্যাপার নয়। ছেলেদের মা বাপেরা বুঝবে এখন, —তাছাড়া অনাথাশ্রম প্রভৃতিতে যত আশ্রয় পায়, পাবে, —যাদের সন্তান পালনের শক্তি নাই তাদের ছেলে হয় কেন,—এইরূপ ওকালতি কোন কাজের নয়। আমাদের এদেশে জাতীয় জীবন একটা ভাবমাত্র, তার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। জাতীয় জীবনের গোড়ায় একতা, একপ্রাণতা বোধ। আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধটাই প্রবল ও সুস্পষ্ট। আমরা সভাসমিতিতে দেশের জন্য প্রাণ দান ক'রে বাড়ী এসে নির্ব্বিকার চিত্তে স্বার্থের পুঁটলী বাঁধি। রামাশুচির ছেলে কয়টা না বাঁচলে এবং সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম ও শিক্ষিত মানুষ না হ'লে, তোমার আমার কি হয় দেশের কি ক্ষতি হয়, তার ধারণা আমরা সহজে করতে পারি না। কিন্তু জীবন্ত জাতি অতি সহজেই এসকল বুঝতে পারে।

দেশের দরিদ্র দুঃখী, কুলী মজুরদের ছেলেরা সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম মানুষ না হ'লে, দেশের যে কি ক্ষতি হয়, বর্ত্তমান সময়ে তা এমন স্পষ্ট হ'য়ে পড়েছে যে, বেশী ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধে লাখ লাখ সৈন্যের আবশ্যক হ'চ্ছে। অধিকাংশ সৈন্যই দেশের দরিদ্র দুঃখি জনসাধারণের ছেলে। যাদের রক্ষার জন্য দেশ দায়ী নয়, তাদের প্রাণ নেবার দাবী কেমন করে সঙ্গত হবে? দাবী করলেই তো পাওয়া যায় না। যদি বলিষ্ঠ লোক না থাকে, চাইলে কি হবে! এতো যুদ্ধের সময়ের কথা। শান্তির সময় জাতীয় জীবনের মূল্য কিছু কমে না। বরং এখনই জীবনের যেন কোন মূল্য নাই। শান্তির সময় জীবনের যে কোন দিকে চাও, জন-সাধারণ সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম ও শিক্ষিত না হ'লে, জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

যুবকগণ সুস্থ না হ'লে কোন কাজ ভাল করে বা সময়ে করতে পারে না। বালকগণ সুস্থ না হ'লে লেখা পড়া শিখতে পারে না। শিশুগণ সুস্থ না থাকলে বাঁচেই না, যারা বাঁচে তারা অকর্ম্মণ্য হয়। এমনি ক'রে দেশের জন সাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতার উন্নতির ব্যবস্থা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে যে গলদ রয়েছে একবারে গোড়ায়। সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন হ'তে প্রথম চার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে না পারলে, অনেকেই অকালে প্রাণ ত্যাগ করে, যারা বাঁচে তাদের শরীর পরে ঠিক করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সদ্যজাত শিশুগণই দেশের আশা ভরসা, শক্তি ও প্রধান সম্বল। প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা সকল দেশের সকল জাতির জীবনী শক্তি ইংলণ্ডের মত দেশেও এখনও এবিষয়ে কত করবার আছে তা জানতে পারলে, আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণা হ'তে পারে।

প্রায় দশ বছর আগে, মিস সেফার্ড মিউকাসেল্ অন্-টাইনে চিকিৎসা ক'রতেন। তিনি কিছুকাল চিকিৎসা করার পর বুঝতে পারলেন যে, অনেক দরিদ্র প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসা অভাবে মারা যায় এবং চিরজন্ম কষ্টভোগ করে। তিনি অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর, আর একজন সহযোগিনীর সঙ্গে দরিদ্রদের পল্লীর কাছে, একটি ঘর ভাড়া করলেন। সেখানে দরিদ্র প্রসূতিগণ বিনা পয়সায় তাঁদের সাহায্য পাবে বলে চারিদিকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। চারিদিক হ'তে দলে দলে স্ত্রীলোক আসতে লাগল। ক্রমশঃ তাঁদের দুজনের পক্ষে সকলকে দেখা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। চার বছর এই ভাবে কাজ করে তিনি হাতে কলমে বুঝতে পারলেন যে, অধিকাংশ দরিদ্র প্রসূতি গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য ও সেবার অভাবে জীবন-ব্যাপী কষ্ট পায়, জীবন যন্ত্রণাময় হয়, এবং তাদের ছেলেরাও চিররুগ্ন হ'য়ে জন্মায়। শত শত নারীর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে যে তারা তাদের নিজেদের জন্য বা সন্তানদের জন্য কি কি বিধি ব্যবস্থা মেনে চলা উচিত তার কিছুই জানে না। এই জ্ঞানের অভাব এবং এ বিষয়ে সহায়তার অভাব বশতঃ অসংখ্য জীবন মৃত্যু ও ব্যাধির গ্রাসে পড়ে।

শত শত শিশুর অসুখের কোন চিকিৎসাই হয় না। কারণ, মাতা পিতা দরিদ্র মাকে খেটে খেতে হয়, ছেলেকে ডাক্তার দেখাবার বা ঔষধ খাওয়াবার

পয়সাও নাই, দেখার সময়ও নাই। শৈশবে কোন রোগের চিকিৎসা না হলে ভবিষ্যতে তা হতে স্থায়ী কুফল ফলে। কিন্তু চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শিশুরা যাতে সুস্থ থাকে, এবং অসুস্থ না হয় তার ব্যবস্থা করা। কত গরীব পরিবারে সামান্য রকম আঘাতে, প'ড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, ঘেঁৎলে যাওয়া, ঘা হওয়া প্রভৃতির কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থাই করা হয় না। মা হয় জানেনা কেমন করে কি করতে হয়, অথবা তার অবসর নাই। কিন্তু এই সব সামান্য কারণেই বহু স্থলে স্থায়ী রোগ দাঁড়ায়। দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাই সকল রোগের ও অকাল মৃত্যুর কারণ। অর্থাভাবে যারা আলো বা বাতাস বর্জ্জিত গৃহে বাস করে, তারাই সব চেয়ে বেশী রোগ ভোগ করে এবং অকালে প্রাণ হারায়। প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হ'লে, সব চেয়ে প্রথমে তাদের বাসস্থানের উন্নতি সাধন করতে হবে। অবাধ আলো ও বিশুদ্ধ বায়ু জীবনের সব প্রধান সম্বল। তারপর আর সব।

কুমারী বেথাম বলেন—এখনও আমরা বুঝতে পারিনি যে প্রসূতি ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ কত বড় জাতীয় কর্ত্তব্য। স্কুলের ছেলে মেয়েদের শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'তে এদিকে কিছু পরিমাণে দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আরও বহু পূর্ব্বে হওয়া উচিত। আগে বাঁচবে তবে তো স্কুলে যাবে? স্কুলে যাওয়ার বয়স হ'তে হ'তে অনেক শিশু মারা যায়, অনেকের শরীরে রোগ বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। প্রথম দুই বছরই জীবনের ঘনিয়াদ। স্কুলের ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা হয় রোগ দূর করবার জন্য। কিন্তু শিশুগণ স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থ শরীরেই জন্মায়; তারপর যাতে তাদের শরীরে রোগবীজ প্রবেশ না করে সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাঁচ বছর বয়সের সুস্থ সবল নিরোগ শিশু যাতে স্কুলে যেতে পারে আমরা সেই চেষ্টা করছি। লাখ লাখ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে; কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে শিখবে কে? শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বৃথা। শিশু যাতে একেবারে নীরোগ থেকে রক্ষিত হয়, তার আয়োজন করতে হবে। প্রসূতি, সদ্যজাত শিশু এবং স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্ব অবস্থার শিশুদের জন্য শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপর শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। গৃহ, খাদ্য, বস্ত্র, সেবা প্রভৃতির উপর সকলেরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে; সবচেয়ে বেশী প্রসূতির ও শিশুদের স্বাস্থ্য।

শত শত শিশু গর্ভে অবস্থান কালেই মারা যায়। শত সহস্র শিশু সুব্যবস্থার অভাবে প্রসব কালেই প্রাণ হারায়। এই সব জীবন জাতীয় সম্বল, জাতীয় শক্তি। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডে বহু সংখ্যক সুস্থ সবল যুবক প্রাণত্যাগ করেছেন আরও করবেন। এখন শিশুদের জীবনের মূল্য কত বেড়ে গিয়েছে। এখন আর এ বিষয়ে অগ্রাহ্য করা চলে না। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, আমরা যত শিশু বাঁচাতে পারি তার ত্রুটি না হয়। শিশুদের মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাভাব দূর করতে হবে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান কথা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস এবং পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের উপযুক্ত আয়। তা হলে কত শত শিশুকে অকাল মৃত্যু হ'তে বাঁচান যায় তার সীমা নাই। আমরা গরীব প্রসূতিগণকে অর্থ সাহায্য ক'রে দেখেছি তারা সেই অর্থ দিয়ে ভাল গৃহে গিয়ে এবং একটু ভাল খেয়ে যথেষ্ট ভাল থেকেছে এবং তাদের শিশুগণ প্রায় শতকরা দুজন মারা গিয়েছে। এই সামান্য অর্থ সাহায্য না করলে, হয়ত তার দশগুণ শিশু অকালে মারা যেত। এইরূপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে আমরা চেষ্টা করলে, শিশুদের অকাল মৃত্যু একপক্ষে রোধ করতে পারি। একাজে জাতীয় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

অভিযুক্ত

সংসদে হেরিয়া পার্শ্বে প্রেম কহে কবি,
দূর হ'তে দেখা হ'তে মিথ্যা অকল্যাণ
রাহুরূপী ধূমকেতু, বিত্তাগারে পশি
তস্কর কাটিল সিঁধ করিয়া সন্ধান.

সুপ্ত চেতনার তীরে ভিড়ায়ে তরণী
গোপন চরণ ক্ষেপে নিষ্করুণ খল,
হরে নিস্ কামাধনে মর্ত্ত্য-স্পর্শমণি,
উৎপাটিয়া রবি শশী জ্যোতি-পদ্মদল!

সংশয় কহিল মিথ্যা অভিযোগ সখা
বাত্যারূপে আসি তব প্রশান্ত সলিলে
তরঙ্গ মথিয়া তুলি, নিভায়ে তারকা
শতশিরা বজ্রবারে জ্বালি নভস্তলে!

তোমারে নূতন করি লভিবার সুখ
আমি দান করি সখা, সেত নহে দুঃখ!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

দম্পতি-যুগল

রাজা বেসন্তর দক্ষিণান্তঃপুর হর্ম্ম্যে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তদীয় মহিষী মাদ্রীদেবী একাকিনী অবস্থান করিতেছেন। তিনি মাদ্রীদেবীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে, এবম্বিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন :—

"প্রিয়ে মাদ্রি! আমার পিতামাতার সম্মতিক্রমে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, তুমি তাহা সবিশেষ অবগত আছ। তোমার সমীপে যৎপ্রদত্ত রজতকাঞ্চন এবং তোমার পিতাকর্ত্তৃক প্রদত্ত যৌতুক যথেষ্ট আছে, এ সমস্ত সম্পত্তি এক বৃহৎ ভাণ্ডপূর্ণ করিয়া কোন এক গুপ্ত স্থানে রক্ষা কর, যেন ইহা ধ্বংস বা নষ্ট না হয়।"

মাদ্রীদেবী অতিশয় জ্ঞানশীলা ও মহদন্তঃকরণ বিশিষ্টা ছিলেন। তিনি লোভপরায়ণা ছিলেন না। স্বামীর বাক্যাবলী অবধানতার সহিত অনুধাবন করিয়া তিনি স্বগতঃ বলিলেন—"আমরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছি অবধি কখনও আমার স্বামী কোন সম্পদ সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করেন নাই। এখন কেন সেই সম্পদ সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বলিতেছেন? আমি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলাম না। তিনি অবশ্য কোন বিশেষ কারণে ইহা বলিয়া থাকিবেন। তাঁহার সহিত কথা প্রসঙ্গে ইহার কারণ উদ্ঘাটন করিতে পারি কিনা দেখিব।

তিনি স্বামীকে বলিলেন, "দেব! এ সমস্ত সম্পত্তি কোথায় লুকাইয়া রাখিব! নিরাপদ স্থান কোথায়?"

বেসন্তর। দেবী! এ সম্পত্তি ভাণ্ডারে অথবা মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষা কর, যাহাতে পঞ্চ প্রকার আপদে যথা—অগ্নি, চোর, রাজা, শত্রু এবং জলে যেন ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। এরূপ স্থানে রক্ষা করিলে তোমার এ সুদীর্ঘ জীবনকাল ইহাতেই সুখে যাপন করিতে পারিবে। এ কারণেই বলিতেছি এ সম্পত্তি এখন নিরাপদ নহে। দানের দৃঢ় ভিত্তির উপর দয়ার সুদৃঢ় ভাণ্ডার প্রস্তুত কর, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া নিঃসংশয়ে ভাণ্ডার ধনে পূর্ণ কর। দানের এ সুবর্ণ পাত্রই একমাত্র অক্ষয় ভাণ্ডার। এ সম্পদই ছায়ার ন্যায় জন্মে জন্মে তোমার অনুসরণ করিবে। ইহা ভিন্ন অন্যতম সুদৃঢ় ভাণ্ডার নাই।

মহিষী এতদ্বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলে বোধিসত্ত্ব আরও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন :—

'প্রাণ-পত্নি মাদ্রি! কুমার জালী ও কুমারী কৃষ্ণাজিনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিও। তাহারা আমার ঔরসজাত সন্তান। আমার পিতৃদেব মহারাজ সঞ্জয়কে ও মাতৃদেবী ফুসতীকে (স্পর্শবতীকে)—যিনি সম্পর্কে তোমার পিসিমাতা ও শাশুড়ী—তাহাদিগকে ভালবাসিও ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিও। যদি কোন নরপতি তোমাকে আপন প্রধানা মহিষী করিতে বাঞ্ছিত হন, তবে তাঁহাকে তোমার পতিরূপে গ্রহণ করিও। আমার প্রতি যেমন তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছ তাঁহার প্রতিও তেমন করিও। তুমি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অবগত না হইলে হয়তঃ তাঁহাকে ভাল না-ও বাসিতে পার; যাহাকে তুমি ভালবাস অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিও। আমাকে যেমন ভালবাস, ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, সেবা-শুশ্রূষা কর, তাঁহাকেও তেমন করিও। তোমা হইতে আমার বিচ্ছেদ হইবে—দুঃখ

করিওনা। মর্ম্মে ব্যথা পাইওনা, আপনাকে আশ্রয়-বিহীনা মনে করিওনা।'

মাদ্রী। দেব! এবম্বিধ অযোগ্য অপ্রিয় বাক্য-প্রয়োগের কারণ কি, বলুন।

বেসসান্তর। দেবি! গত পূর্ণিমা তিথিতে আমি প্রাসাদের বহির্ভাগে গমন করিয়া দক্ষিণ তোরণে উপনীত হইলে, অলঙ্কার, পরিচারক ও ভিষক সমেত শতটী শ্বেত কুঞ্জর আটজন ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। জনক জননী ও তোমা ব্যতীত এ সমস্ত দ্রব্যসহ হস্তীদান করায় জন্য প্রজাগণ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়াছে; এই হেতু প্রজাগণ আমায় নির্ব্বাসিত করিবার অভিপ্রায়ে সকলে এক বাক্যে সম্মত হইয়াছে। মহাদানের জন্য তাহাদের নিকট একদিন মাত্র সময় যাচ্ঞা করিয়াছি এবং ইহাতে তাহারা সম্মতও হইয়াছে। আগামী কল্য সপ্তশত বস্তুর মহাদান ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তৎপর দিন প্রাতঃকালে নিশ্চয়ই এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। যে স্থানে যাইতে হইবে, সে স্থান ভীষণ নিবিড় অরণ্য। তথায় পৌঁছান মনুষ্যের অসাধ্য। সে অরণ্য সিংহ ব্যাঘ্র চিত্র হস্তী ভল্লুক ও নানাবিধ হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ। সেই মহা বিপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে কি প্রকারে অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইব! প্রিয়ে! তোমার ভবিষ্য সুখসম্পদের জন্য এবম্বিধ উপদেশ প্রদান করিতেছি।

পুরুষপরম্পরাগত-রাজবংশ-সম্ভূতা বরাঙ্গনার পঞ্চগুণ-বিশিষ্টা গুণবতী মহিষী মাদ্রী উত্তর করিলেন :—

'মহারাজ! আপনাকে আমি নিজের প্রাণঅপেক্ষা ভালবাসি। এতাদৃশ অযোগ্য অপ্রিয় বাক্য আমার প্রতি প্রয়োগ করা কি আপনার উচিত? আপনি বলিতেছেন যে, আপনি মনুষ্যের আবাস ভূমি হইতে অতি দূরে—ভীষণ অরণ্যে একাকী গমন করিবেন। যিনি পত্নীকে ভালবাসেন, তিনি কি কখনও এরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন? যিনি আপন পত্নীকে ভালবাসেন, তিনি আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিয়া তাহার অনুবর্ত্তিনী হইতে বলিবেন। কিন্তু পত্নী যখন ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তখন তিনি একাকী গমন করিতে পারেন। আপনি যেন আমার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়াই এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। ইহা কি সঙ্গত? প্রজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও আপনার অনুগমন করিব। আপনার সহবাসে এ মুহূর্ত্তেই যদি মৃত্যু সংঘটিত হয়, অথবা আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যদি দীর্ঘকালও বা জীবন ধারণ করি—এতদুভয়ের মধ্যে আপনার সহবাসে আসন্ন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি আপনার সহবাসে জীবন ধারণ ও জীবলীলা শেষ করিব। আপনার বিচ্ছেদে জীবন ধারণে ফল কি? তখন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে কম্পপ্রদানই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। বিবেচনাক্ষম মানব জাতির কথা দূরে থাকুক, এমন কি, বুদ্ধিবিবেচনাশূন্য পশুপক্ষীও আপন পত্নীকে ত্যাগ করে না; তাহাকেও সুখদুঃখের অংশভাগিনী করে; আমি স্বামীকে প্রাণ তুল্য ভালবাসি এবং আমার সবিশেষ বিবেচনা শক্তি সত্ত্বেও কেন আমি স্বামীর পদানুসরণ করিব না? হস্তিনী যেমন উপত্যকা মধ্যে ও পর্ব্বতোপরি হস্তীর পদানুসরণ করে, আমিও তেমন সন্তানগণ সমভিব্যাহারে আপনার পদানুসরণ করিব। আমি আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিচর্য্যা করিব।'

মহিষী মাদ্রী রাজা বেসসান্তরকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে হিমবন্ত অরণ্যের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া বলিলেন :—

'মহারাজ! যখন আমরা সন্তানগণ সমভিব্যাহারে হিমবন্ত অরণ্যে গমন করিব এবং তথায় প্রাণের জালী ও কৃষ্ণাজিনাকে পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিব, তাহাদের সুমধুর স্বর শুনিয়া যখন তাহাদের মুখমণ্ডলের প্রতি সস্নেহলোচনে দৃষ্টিপাত করিব—তখন আমাদের স্বদেশ-বাসনাও দুঃখ বিদূরিত হইবে।

আমরা অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিলে সে পর্ণকুটীরে যখন দেহের জালী ও কৃষ্ণাজিনা মনোহর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অঙ্গে সৌগন্ধি বিলেপন পূর্ব্বক উভয়ে নৃত্য করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের মুখপানে তাকাইলে, পিতামাতা ও রাজ্যবাসনা তিরোহিত হইবে।

প্রভাত ও সায়ংকালে যখন মাতঙ্গজাতীয় হস্তীকে—যাহাদের ষাটি বৎসর বয়সে শক্তি হ্রাস হয়,—সেই সুখময়

বিচিত্র কাননে বিচরণ করিতে দেখিব এবং তাহাদের বৃংহতি শুনিব তখন মনে কতই সুখানুভব করিব—তখন রাজ্যাভিলাষ আর থাকিবে না।

হে প্রভো! হে বাঞ্ছাকল্পতরো! আমরা যখন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে তরুচ্ছায়ায় গমন করিব, পথের উভয় পার্শ্বের তরুরাজির মুকুল ও সুগন্ধ কুসুম-সমন্বিত শাখা-প্রশাখা বিজড়িত হইয়া আমাদের শির স্পর্শ করিবে—তখন কি আর রাজ্যের ও প্রাসাদের চিন্তা মনে স্থান পাইবে?

হে নরপাল! বাল্যকালেই আপনি স্বকীয় অসীম মহিমা প্রভাবে রজত শুভ্রকান্তি আপন অধিকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আপনার মহিমার সীমা নাই;—যখন সন্ধ্যার শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইবে, তখন আমরা বিশ্রাম করিব। পঙ্কমালিনী নদীতে কুরঙ্গসমূহ জলপান করিতে আসিলে দেখিব; কিন্নর-কিন্নরীগণ উড্ডীন হইয়া মুগ্ধভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত করিবে, দেখিব শুনিব—তখন আমাদের স্বদেশ ও গৃহ-চিন্তা বিদূরিত হইবে।

হে জম্বুদ্বীপপালক! আপনার ষোড়শ সহস্র বরাঙ্গনা-পেক্ষা আমাকেই সমধিক ভালবাসেন, এই হেতু আমাকেই আপনার প্রধানা মহিষী করিয়াছেন। আমরা যখন প্রাসাদের সঙ্গীত শ্রবণ ও নৃত্য-দর্শনে অভিলাষী হইব, তখন বিহঙ্গকুলের কলধ্বনিতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব।

হে প্রভো! হে স্বামিন! আমরা উভয়ে এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; কৈশোরে আমার পরিণয়াবধি আপনার সহবাসে রাজকীয় প্রভূত সুখ যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছি। আমরা যখন উপত্যকা ও গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া গমন করিব এবং যখন নগরদ্বার, নদীর তীর ও চতুর্দ্দিকস্থ জনকোলাহল শুনিতে অভিলাষী হইব, বৃংহতি ঘোষা, হাম্বারব, দুন্দুভিধ্বনি ও ঘণ্টার শব্দ শুনিতে আকাঙ্ক্ষিত হইব, তখন বনজাত হস্তী, অশ্ব, বৃষ, ব্যাঘ্র চিত্রা ও সিংহের ধ্বনিতে সেই বাসনা পূর্ণ করিব!

হে রাজাধিরাজ! আপনার পিতৃদেব আপনার রাজোচিত গুণরাশি ও জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আপনার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। যখন সন্তানগণ সমভিব্যবহারে আমরা গিরিসঙ্কটোপত্যকাভ্যন্তরে গমন করিব,—বসন্তের প্রারম্ভে শালরসাল প্রভৃতি বৃক্ষ মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইবে এবং শাখা প্রশাখা প্রভৃত কুসুম সম্ভারে নমিত হইবে তখন সেই সমস্ত নয়নগোচর করিয়া আমাদের নিত্য-উপভোগ্য কুসুম-কাননের বাসনা পরিতৃপ্ত করিব।

মহারাজ! আপনি নিতান্তই উদার। প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। আমরা সমতল প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে রাজন্যবর্গ ও পরিষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উৎসবাদি উপভোগ করি। পর্ব্বতের উচ্চে নিম্নে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমতলতা বা মসৃণতার অভাব অনুভব করিব। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নীলকান্তমণি সদৃশ উজ্জ্বল বিচিত্র পক্ষ বিশিষ্ট প্রজাপতি-বৃন্দ ভূমিতল আবৃত করিলে সেই রঞ্জিত ভূমিতল দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিব।

হে রাজাধিরাজ! আপনি নিত্য আপনার প্রসিদ্ধ ষাটি সহস্র অনুচরে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন। আমাদের ভ্রমণ-পথে রাজভবনের ব্যবহারোপযোগী মনোহর সুগন্ধি বিশিষ্ট পুষ্পমাল্যের ও সুগন্ধদ্রব্যের বাসনা তৃপ্ত করিব,—শীতকাল যখন গ্রীষ্মে পরিবর্ত্তিত হয় তখন বসন্তকাল; সেই বসন্তকালে অরণ্যে নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া কানন সৌরভিত করে, সেই সৌরভে ঘ্রাণস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিব ও শান্তিলাভ করিব।

মাদ্রী দেবী এইরূপে স্বামীর এ দুঃখের সময়ও তাঁহার অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব হিমবন্ত অরণ্যের মনোহারিত্ব বর্ণনা করিলেন, যেন তিনি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন।

গজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

ট্রিভেণ্ড্রাম্ রাজকলেজ ও বালিকা-বিদ্যালয়

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ট্রিভেণ্ড্রাম নগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদের একটি সামান্য বালিকা-বিদ্যালয় ছিল

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "সরকারী বালিকা বিদ্যালয়" নাম দিয়ে গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয় নিজের হাতে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে কেবল খৃষ্টান বালিকারাই এই স্কুলে পড়তে পেত। রাজ সরকারের হাতে আসার সময় হ'তে সকল শ্রেণীর বালিকার জন্য স্কুলের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিছু দিন পরে, ইংলণ্ড হ'তে একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী আনা হয়। তারপর একজনের পর একজন সুযোগ্য ইংরাজ-মহিলার পরিচালনায় ক্রমশঃ উন্নতি হ'তে হ'তে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্কুলটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০০ হওয়ায়, প্রশস্ততর নূতন বাটীতে স্কুল স্থানান্তরিত হয়। এই সময় স্কুলের সকল বিষয়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তারপর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে গণ্য হ'য়েছে। এখন কলেজ ও স্কুলের নাম—"মহারাজার কলেজ এবং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।" ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনিং কলেজও খোলা হয়েছে। ক্রমাগত কলেজও স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বাড়্‌ছে, এবং ক্রমাগত কলেজ ও স্কুলের আসবাব প্রভৃতিও বাড়ান হ'চ্ছে। রাজসরকারের সাহায্যে, স্কুলের কোন অভাব নাই। ত্রিবাঙ্কুরে নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক, রাজাই সব খরচ বহন করেন।

রাজ কলেজ ও স্কুলে এখন ছাত্রী সংখ্যা ৮২৪।

কলেজ—	২৫
ট্রেনিং কলেজ—	২৭
স্কুল—	৪১৪
প্রাথমিক বিভাগ—	৩৫৮
	৮২৪

১৮৮১ হতে ১৯০৯ এই ১৮ বছরে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ ৫০ জন

১৯১০ হতে ১৯১৩ " ৪ বছরে ম্যাট্রিক " ৪৩ "

১৫ বছরে কলেজ হতে উত্তীর্ণ ২৪ "

১০ বছরে সঙ্গীতে উত্তীর্ণ ১৪৬ "

২ বছরে ড্রইংএ উত্তীর্ণ ১৬০ "

ক্রমশঃ ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে শুভলক্ষণের উল্লেখ ক'রে লেডী প্রিন্সিপাল মহাশয়া ব'লেছেন,—"উচ্চ পরীক্ষায় খুব কম ছাত্রীই উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লে স্কুলের প্রধান কাজ কি! তার উত্তর,—স্কুলের প্রধান কাজ মেয়েদের এমন শিক্ষা দেওয়া ও চরিত্র গঠন করা, যার ফল ভাবী জীবনে গৃহ সংসারে দেখা যাবে। আমরা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি, যাতে ছাত্রীদের মনে কর্ত্তব্য বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়,—এবং সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা, অপরের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য বোধ, সকল বিষয়ের প্রকৃত মূল্য বোধ প্রভৃতি যাতে বৃদ্ধি হয়। আমরা প্রাথমিক বিভাগেই ক্লাসের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম খেলা, গল্প, গান, ড্রইং, বর্ণচিত্র, পাদপাদা পরিদর্শন প্রভৃতি যুক্ত ক'রেছি। সুর, তাল, হাত পা নাড়া প্রভৃতি যাতে সহজ হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। • • • • এই একই প্রণালী অনুসারে নিম্নশ্রেণী হ'তে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত কাজ হয়।

যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নিয়মিতরূপে কাজ করা যাতে অভ্যাস হয়, সেবিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হয়। গড়ে প্রায় ১৪০৩ জন ছাত্রী স্কুলে উপস্থিত হয়,—এর মধ্যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশই হিন্দু মেয়ে; হিন্দু মেয়ে নিম্নতম শ্রেণী হ'তে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত সব ক্লাসেই আছে।

ছাত্রীদের সামাজিকতা শিক্ষা দেবার জন্য, বেশ সহজে সরল ভাবে যাতে তারা মিশতে পারে ও কাজ কর্ম্ম করতে তৎপর হয়, তার জন্য আমাদের ক্লাব আছে। প্রায় দুচ্চি বছর হ'তে ক্লাব চ'লে আস্‌ছে, কিন্তু ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, একটি ক্লাবে কোন ফল হয় না বলে এবার কয়েকটি ছোট ছোট ক্লাব করা হ'য়েছে। শিক্ষকগণ সে ক্লাবগুলির পরিচালিকা।—

একটি ইংরাজি বিতর্কসভা।
একটি ইংরাজি সাহিত্যসভা।
একটি বড়দের মাতৃভাষা চর্চ্চাসভা।
একটি ছোটদের মাতৃভাষা চর্চ্চাসভা।

এ ছাড়া—গান, সেলাই, রান্না, ড্রইং, টেনিস্, ব্যাড্‌মিণ্টন্, ক্রিকেট প্রভৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্লাব আছে।

• • • •

এই স্কুলের যে সকল ছাত্রী বিবাহ করে ঘর করা করছে, তারা গৃহকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছে। আর যে সব ছাত্রী নানা বিভাগে কাজ করছে, তারাও যথেষ্ট কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে। এই স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে ৬০ জন শিক্ষয়িত্রী ১১ জন ডাক্তার ও বহু সংখ্যক নার্স্ হয়েছে. তিনজন মেডিক্যাল কলেজে এম, বি পড়ছে; একজন বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড্ গিয়েছে। পাকুকুটি আজ এই কলেজ হতে বি, এ, পাশ প্রথম নায়ার মহিলা। এখন ৬০ জন শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে ৩১ জনই এই স্কুল বা কলেজের পূর্ব্ব ছাত্রী, আর কয়েক জন ছাত্রী ইন্স্পেক্ট্রেসের কাজ করছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম-ধর্ম্ম

আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে প্রশান্ত-মহাসাগরের গর্ভে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। তিন হাজার একশত চল্লিশটী ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। তন্মধ্যে ৬০০টী দ্বীপের অধিবাসী মুসলমান। ফিলিপাইন ও তন্নিকটবর্ত্তী মালয় দ্বীপ-পুঞ্জে কিরূপে ইসলাম ধর্ম্ম এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। সে সকল দ্বীপপুঞ্জ সুলতান মাহ্মুদ, সাহাবুদ্দিন, বা বক্তিয়ার খিলজির ন্যায় কোন প্রবল মুসলমান আক্রমণকারী বা নরপতি কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। বোধ হয় আরবীয় বণিকগণের দ্বারাই ইসলাম ধর্ম্ম তৎসমুদয় দ্বীপাবলীতে স্থানলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময় ব্রুনাই, আচিন, জহর প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ষ্টেট্গুলি সুলতান উপাধিধারী আরব শাসনকর্ত্তাদ্বারা শাসিত হইতেছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জহর-রাজ্যের জনৈক শরিফ ও আরবের শরিফ মক্কাস্থ এই দুইজন প্রচারকের চেষ্টায় উক্ত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তথাকার মুসলমানেরা স্পেনিয়ার্ডদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্পেনিয়ার্ডগণ তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে অথবা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃত-কার্য্য হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত দ্বীপগুলিতে প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান বসবাস করিতেছে। কয়েক বৎসর হইল তাহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রবল প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা ইসলাম ধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যেও ইসলামের বিমল প্রখর জ্যোতিঃ পূর্ণমাত্রায় তথায় প্রকাশিত হয় নাই। কারণ তাহারা মহাদেশস্থ মুসল-মান রাজ্য সকল হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে। মুসলমান রাজ্য হইতে কোন ইসলাম ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ প্রচারক তথায় গমন করেন নাই। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপে অনেক কালিমার সমাবেশ হইয়াছে। তবুও প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক ফিলিপাইন-বাসী মুসলমান হজ্জব্রত উপলক্ষে ইসলামের জন্মভূমি মক্কা নগরীতে গমন করিয়া থাকে। তাহারা মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয় হইতে প্রত্যাগত হাজীগণের মুখে উক্ত পবিত্র নগরীদ্বয়ের রক্ষক ও সেবক, মুসলমান জগতের খলিফা তুরস্কের মহামান্য সুলতানের যশঃগৌরব কাহিনী শ্রবণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ যাবৎ ফিলি-পাইনবাসী কোন মুসলমানই রাজধানী কনষ্টান্টি-নোপলে পৌঁছিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাহারা মহামান্য তুর্কি সুলতানের (খলিফার) নিকট পরিচিত হইতে এবং তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ উপদেষ্টা পাইবার জন্য জহুরেস্থা নামক দ্বীপের গবর্ণর কর্ণেল ফিনলিকে (Colonel Finley) অর্থ সাহায্য করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরণ করে। গত ১৯১৩ সনের মার্চ্চমাসে কর্ণেল ফিনলি তুর্কি রাজধানী কনষ্টান্টি-নোপলে উপনীত হইলেন। এই অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা রাজদরবারে আলোচনার বিষয় হইল। কারণ, এ যাবৎ কোন ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোক ইসলামের প্রতি-নিধিরূপে খলিফার দরবারে আগমন করে নাই।

"শেখ-উল-ইসলাম' কর্ণেল ফিনলিকে এই কার্য্যে

সাধ্যমত সাহায্য করেন। তাঁহার চেষ্টায় শীঘ্রই মহামান্য সুলতানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইল। কর্ণেল ফিন্‌লি সুলতানের নিকট হইতে "শাহি ফরমাণ" ও মসজিদের জন্য একখানা "খোৎবা" প্রাপ্ত হইলেন।

কয়েক দিন পর তিনি যুবরাজ ইউসুফ আফেন্দির সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ তাঁহাকে ফিলিপাইন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে কর্ণেল ফিনলি স্বীয় কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া হৃষ্টচিত্তে ফিলিপাইন যাত্রা করিলেন। মহামান্য সুলতান মাসিক ৫০ পাউণ্ড বেতন ধার্য্য করিয়া ৫ বৎসরের জন্য জামাল আফেন্দি নামক একজন ইসলাম ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিধানজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য দুইজন প্রচারককে কর্ণেল ফিনলির সঙ্গে ফিলিপাইনে প্রেরণ করিয়াছেন। জামাল আফেন্দি একজন উপযুক্ত লোক। তিনি আরবি ও তুর্কি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মেণ, সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষায়ও তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে।

ময়মূনন্নেছা খাতুন।

শারদ-প্রভাতে

সৌরভ-পূত নন্দন হতে শরৎ এসেছে আজি,
নিখিল বিশ্ব অর্ঘ্য রচিছে ভরিয়া কানন সাজি,
লক্ষ্মী-মায়ের চরণের রেখা
কনক-ক্ষেত্রে গেছে আজ দেখা
তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে গঙ্গা সপ্তস্রোতির নাগিনী
কল কল রবে ঢেউগুলি তার ধরেছে মিলন রাগিনী।

পিপাসা কাতর তৃষিতের লাগি এনেছে সুধার বারি,
তৃপ্ত হয়েছে তাপিত ধরণী লভিয়া সে সুধা-বারি;
রূপের লহর খেলিছে আকাশে,
করুণার ধারা ঝরিছে বাতাসে,
স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চলখানি এসেছে ভূতলে লুটায়ে,
শরম হরষে সরস কাননে কুসুম কলিকা ফুটায়ে।

শরতের রা আসিছে ভূতলে ধরণী পেয়েছে সাড়া
তৃষিত চাতক হরষে আকুল, দমীর পাগল পারা?
শারদ শেফালি পুঞ্জের মত,
কুন্দ-সনাথ কুঞ্জের মত,
অনিল সরল হাসি রাশি রাশি, সারা প্রাণ মুরছায়
নন্দন-বন-স্বপন সুষমা ধরিয়া রেখেছে তায়।

বরণ করে'নে শরৎ এসেছে, এনেছে আনন্দ রাশি,
ফুল্ল কুলদল কাননে কাননে অধরে রেখেছে হাসি।
নবপল্লবে বেলি অঞ্চল
রক্ত-গোলাপে রাখি পদতল;
পথিকের মত শরৎ এসেছে তিথিরবেশে সাজি
বন্ধ্যা ধরার বুকের দুলাল বন্ধু এসেছে আজি।

শ্রী শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

অযোধ্যা-প্রত্যাগমন

(নাট্য)

দৃশ্য—আকাশ পথ।

পুষ্পক রথারোহণে রাম ও সীতা।

রাম। বৈদেহি, এই হংসসংযুক্ত পুষ্পক রথ পূর্ব্বে যক্ষপতি কুবেরের ছিল। রাবণ কুবেরকে পরাজিত ক'রে এই রথ লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত এই রথকে একটি বৃহৎ নগরের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এই রথারোহণে আমরা আকাশ পথে অযোধ্যায় ফিরে যাব। এই রথের গতি-মনের ন্যায়।

সীতা। আর্য্যপুত্র, তুমি আমাকে পথের দর্শনীয় যা কিছু আছে দেখাতে দেখাতে চল।

রাম। তাই হবে। তা হ'লে পথের কষ্ট অনুভূত হবে না। বৈদেহি, ঐ দেখ লঙ্কানগরী ইহা চিত্রকূট শিখরে অবস্থিত। বিশ্বকর্ম্মা এই লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করেছিলেন। বানর ও রাক্ষসদের বধ্যভূমি ঐ রণ ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর।

সীতা। যুদ্ধের নিষ্ঠুর বিবরণ ছাড়া আমাকে অন্য বিষয় বল।

রাম। বৈদেহি, ঐ দেখ উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্র। আমার পূর্ব্বপুরুষ সগরের নাম অনুসারে সমুদ্রের একটী নাম সাগর। ঐ দেখ দূরে লবণাম্বু-রাশির তমাল-তালী-বন-রাজীনীলা বেলা কেমন শোভা পাচ্ছে। ঐ দেখ নবনির্ম্মিত মহাসেতু। এই সেতু ফেনিল অম্বুরাশিতে মলয় পর্য্যন্ত বিভক্ত ক'রেছে।

সীতা। শরৎকালের তারকাখচিত নির্ম্মল আকাশ যেন ছায়াপথ দ্বারা বিভক্ত হ'য়েছে।

রাম। ঐ দেখ, মহাবীর সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা। ঐ দেখ ঋষ্যমূক পর্ব্বত। এই স্থানে আমরা সুগ্রীবের সহিত মিলিত হই। ঐ দেখ পম্পা সরোবর।

সীতা। আহা, বিচিত্র-কানন এবং কমল বনে পম্পা কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ক'রেছে।

রাম। তোমার জন্য কাতর হ'য়ে ঐ স্থানে কতই না বিলাপ করেছিলাম। এই পম্পাতীরেই ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখেছিলাম। এবং এই স্থানেই যোজন-বাহ কব নিহত হয়। ঐ দেখ জনস্থান, তোমার জন্য এই স্থানে আর্য্য জটায়ু রাবণ হস্তে নিহত হ'য়েছেন।

সীতা। আর্য্য জটায়ু আমার জন্য তাঁর জরাজীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অভিনব যশঃ-শরীর লাভ করেছেন।

রাম। ঐ দেখ, আমাদের সেই আশ্রম দেখা যাচ্ছে। ঐ স্থান হ'তেই রাবণ তোমাকে হরণ করেছিল।

সীতা। সে কথা মনে হ'লে এখনও আমার হৃদকম্প উপস্থিত হয়।

রাম। ঐ দেখ আমাদের পর্ণশালাটী তখন যেমন বিচিত্র ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে। ঐ দেখ প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী।

সীতা। আহা! এখানে কত সুখেই না বাস করতাম।

রাম। ঐ দেখ সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম। ঐ দেখ শরভঙ্গ মুনির আশ্রম।

সীতা। এই স্থানে আমি ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে দেখেছিলাম। ঐ দেখ চিত্রকূট পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে।

রাম। এই স্থানে ভরত আমাকে প্রত্যর্পণ করতে এসেছিল।

সীতা। রূপার হারের মত ওটী কি?

রাম। ও হচ্ছে বিচিত্র কানন-শোভিত মন্দাকিনী নদী। ঐ দেখ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। আমরা আজ এই আশ্রমে বিশ্রাম করব। এস্থান হতে হনুমানকে অগ্রে শৃঙ্গবের পুরাধিপতি আমার সখা নিষাদরাজ গুহের নিকট তৎপর ভ্রাতা ভরতের নিকট প্রেরণ ক'রব।

সীতা। দেবর ভরত আমাদের প্রতীক্ষা ক'রছেন। তাঁর নিকটে পূর্ব্বেই হনুমানকে পাঠাবে কেন? আমরা হঠাৎ অযোধ্যায় উপস্থিত হ'লে তিনি কতই না বিস্মিত হবেন।

রাম। হনুমানকে ভরতের নিকট পূর্ব্বে পাঠানের উদ্দেশ্য এই। হনুমান গিয়ে ভরতের ভাবভঙ্গি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি হনুমান যদি কোন প্রকারে বুঝতে পারে যে এতদিন রাজ্যভোগের পর ভরতের অযোধ্যার রাজ্যে লোভ হ'য়েছে, তাহ লে সে-ই পৃথিবী শাসন ক'রবে, আমি আর অযোধ্যায় যাব না।

সীতা। ভরতের রাজ্যলোভ হবে একথা তোমার বিশ্বাস হয়?

রাম। না তা হয় না। তথাপি সাবধান হওয়া ভাল। মানুষের মনের গতি দুর্জ্ঞেয়। ঐ দেখ পবিত্র-সলিলা ত্রিপথগামী গঙ্গা। ঐ দেখ শৃঙ্গবের পুর। ঐ স্থানে আমার সখা নিষাদরাজ গুহ বাস করেন। বৈদেহি, ঐ আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের রাজধানী অযোধ্যা দেখা যাচ্ছে। (অযোধ্যার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।)

সীতা। (অযোধ্যার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।)

রাম। এইবার আমরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের নিকট উপস্থিত হয়েছি। রঘশ্রেষ্ঠ পুষ্পক এই স্থানেই অবতরণ করুক।

সীতা। (নিম্নে দেখিয়া) পুষ্পকরথ অতি বেগে অবতরণ করায় পৃথিবী অতি আশ্চর্য্য বলে বোধ হচ্ছে।

রাম। ঠিক ব'লেছ। দেখ, দেখ, পর্ব্বত শিখরগুলি কেমন মাথা তুলে উর্দ্ধে উঠছে। পৃথিবী যেন পর্ব্বত-শিখর হতে নেমে যাচ্ছে।

সীতা। গাছগুলাকে দেখে মনে হচ্ছে যে সেগুলা যেন ক্রমশঃ পাতার ভিতর হতে বাহির হচ্ছে।

রাম। মনে হচ্ছে যেন কেহ সমস্ত পৃথিবী উৎক্ষেপণ করে আমাদের পার্শ্বদেশে আনয়ন ক'রছে।

(রথ সহ নিষ্ক্রান্ত)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

———: ———

চয়ন

বিবাহ-বৈচিত্র।

পৃথিবীর সভ্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-প্রথাকে সমাজের উন্নতির বেশ একটি মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সভ্যতার একই স্তরে অবস্থিত অনেক জাতি বিভিন্ন দেশে বাস করে, বিভিন্ন ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বিবাহাদি প্রথায় তাহাদের পরস্পরের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমরা কতকগুলি অদ্ভুত সামাজিক প্রথার কথা বলিব। এই দেশাচারগুলি আমাদের নিকট যে পরিমাণে অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়, আমাদের দেশের প্রথাগুলিও অন্যান্য জাতির নিকট ঠিক সেই পরিমাণেই অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কাজেই ইহাদের অপূর্ব্ব বা অদ্ভুত না বলিয়া অজ্ঞাত বা অপরিচিত বলাই অধিকতর সঙ্গত।

ফিজিদ্বীপের রমণী-জীবন দুই কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, বাল্যকাল হাস্যমুখরিত, এবং অবশিষ্ট জীবন দাসত্বপীড়িত ও অশ্রুস্রোত। চিরকালই তাহাদের জীবন এইভাবে চলিয়া আসিতেছে। ফিজিদ্বীপনিবাসীরা যখন নরভুক্ ছিল, তখন হইতেই তাহারা শিশু বালিকার বাক্‌দান করিত. ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পরেও তাহা করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই বর বিগতযৌবন। দেখিলে মনে হয় কন্যা যত শিশু হইবে বরের যেন সেই পরিমাণে বৃদ্ধ হওয়াই নিয়ম; শীত বসন্তের বিবাহ বলিলেই হয়। এই প্রথায় অনেক মুস্কিল ছিল। বাগ্‌দত্তাকন্যার কোন অপরাধের জন্য পিতাকে জামাতার নিকট দাঁড়ী খাটিতে হইত। বাগ্‌দানের চুক্তি ভঙ্গ করিলে কঠিন দণ্ড হইত। বালিকা নায়ক কিম্বা দল-পতির বংশের বাগ্‌দত্তা বধূ হইলে মৃত্যুই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তিমি মৎস্যের দাঁত কিম্বা সেই রকম আর কিছু দিলেই অপরাধ মার্জ্জনা করা হইত! কোন কোন ফিজিযুবক কখন কখন বাগ্‌দানজালমুক্তা পরিচিতা বয়স্থা কুমারীকে পছন্দ করিতে পাইত: পৃথিবীর যে কোন স্থানের নবীন যুবকেরাই ত ইহা করিয়া থাকেন। এইরূপ স্থলে প্রাথমিক মনোরঞ্জন ও প্রণয় নিবেদনের ব্যাপারটা ভাবী স্বামীকেই করিতে হয়।

আজকাল ফিজিস্থান গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে ভাবী বধূর জন্য গৃহ না থাকিলে বিবাহ হইতে পারিবে না। গৃহের সংস্থান ঠিক করিয়া বর পুরাতন প্রথা অনুসারে কন্যার গৃহে প্রণয়-নিবেদন করিতে যায়। সারা অঙ্গে নারিকেল তেল মাখিয়া মাথার চুলগুলি একটা বৃহৎ টুপির মত করিয়া বাঁধিয়া, অপরূপ তারিকি চালে বর কন্যার পিতৃগৃহে উপস্থিত হন; তারপরে তিমির দাঁত, কাপড়, মাদুর প্রভৃতি উপহার দিয়া তাঁহাদের নিকট কন্যাভিক্ষা করেন। কন্যার পিতামাতা রাজি হইলে, তাহার সখীরা তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়; সেখানে আবার ঐ-সকল উপহার দিতে হয়। তারপর কন্যা খুব একপালা কান্না জুড়িয়া দেয়; এই বিদ্যায় ফিজি-রমণীরা আশ্চর্য্যরকম পটু। ম্লানমুখী সুন্দরীরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে ও ছোটখাট কিছু উপহার দেয়; বেশ খানিকক্ষণ পরে কন্যা হঠাৎ শান্ত হইয়া যায়। ইহাকে বলে "অশ্রুমোচন"।

তাহার পর কন্যাকে তাহার ভাবী প্রভুর রন্ধন খাইতে দেওয়া হয়। কোন কোন স্থলে ইহার পরে বধূ তিন চারি দিন ধরিয়া হলুদ মাখিয়া তাহার নবগৃহে বসিয়া থাকে। এই বিষম পরীক্ষার সময় তাহার স্ত্রীবন্ধুগণ ব্যতীত আর কেহ নিকটে যাইতে পায় না। এই অপূর্ব্ব 'গায়ে হলুদের' পরে কন্যা মনের সুখে একটা লোণাজলের

পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া লয়, সেইখানে সখীদের সঙ্গে হাসিগল্প করিতে করিতে তাহাদের সাহায্যে কতকগুলি মাছ ধরে; ইহারা এই বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। বধূ এই মাছ দিয়া তাহার ভাবী স্বামী ও বন্ধুদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করে।

ভোজের সমস্ত প্রস্তুত হইলে বর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তেল মাখিয়া সাজসজ্জা করিয়া বন্ধুবান্ধব সহ উপস্থিত হয়; কিন্তু ভোজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বরকন্যা উৎসবসজ্জা খুলিয়া দুখানা ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়া আসে। তখন কন্যা স্বামীকে স্বহস্তপক্ক খাদ্য দিয়া তাহার গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্যের সূচনা করে। ইহার পর আবার উপবাসের পালা আসে। এই অনুষ্ঠান শেষ করিয়া নব দম্পতির মুক্তি হয়।

আরবরমণী বিধবা হইবার পর বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে, বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে মৃত স্বামীর সমাধিস্থলে গিয়া তাহার নিকট হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতে বসে। সে অনুনয় করিয়া বলে, "তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিয়ো না, ঈর্ষ্যান্বিত হইয়ো না।" মনে মনে মৃত স্বামীর ক্রোধের ও ঈর্ষ্যার ভয় থাকে বলিয়া সে পাথর পিঠে করিয়া দুই মোশক জল সঙ্গে আনে। প্রার্থনা ও মিনতি প্রভৃতি হইবার পর সে এই বিরক্তিকর ঘটনায় প্রথম স্বামীর মন ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য কবরের উপর জল ঢালিতে আরম্ভ করে।

নিউগিনির উত্তরে একটি প্রকাণ্ড সুন্দর দ্বীপে অসভ্য নরভুক্ জাতি বাস করে। তাহাদের বিবাহ-প্রথার একটু বিশেষত্ব আছে। মিঃ উইলফ্রেড পাওএল এই অজ্ঞাত দ্বীপে প্রায় তিন বৎসর কাটাইয়াছেন। তিনি বলেন, যখন কোন দ্বীপবাসী যুবক অবিবাহিত জীবনে ক্লান্ত হইয়া জীবনসঙ্গিনী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে তাহার মনের কথা পিতা কিম্বা মাতার নিকটে বলে, সেই সঙ্গে তাহার বাঞ্ছিতার নামটিও বলিয়া দেয়। পিতামাতা না থাকিলে সেই প্রদেশের দলপতির কাছে বলে। বরকে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া তাহার আত্মীয় বন্ধুরা কন্যার আত্মীয়ের নিকট যায়। তাহাদের উপহারাদি দিয়া কন্যার দরের কথা তোলে। অনেক দরদস্তুরের পর মূল্য স্থির হয়; প্রায়ই কন্যাপক্ষের জয় হয়। বিবাহের দিনে কন্যা আত্মীয়স্বজনের সহিত ভাবী স্বামীর গৃহে যাত্রা করে। সেখানে ভোজ ও নাচ হয়। নাচে কন্যাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। উৎসবান্তে অতিথি অভ্যাগতরা কন্যাকে রাখিয়া চলিয়া যায়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেচারা বর কোণের মধ্যে একাকী বসিয়াই থাকে। অতিথিগণ বিদায় হইবামাত্র তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হয়। অনেক সময় শুভদিনে অশুভের আগমন হয়, কারণ বেচারা বর এই ভীষণ নির্জ্জনতা সহ্য করিতে না পারিয়া অরণ্যের মধ্যে অনেক দূরে গিয়া পড়ে, কখন বা কোনও শত্রুদল তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দুর্ভাগাকে মারিয়া আহার করিয়া চলিয়া যায়।

স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়, এমন কি তাহার জীবন মরণও স্বামীর হাতে। বিবাহসংক্রান্ত নিয়মগুলির বেশ কড়াকড়ি আছে। প্রত্যেক জাতিতে (tribe) দুইটি বিভিন্ন ভাগ আছে। কতকটা আমাদের দেশের গোত্রের মতন বোধ হয়। এই এক গোত্রের বর ও কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। সচরাচর পুরুষেরা অন্য জাতির রমণী কিনিয়া কিম্বা চুরি করিয়া লইয়া আসে। একই জাতির মধ্যে বিবাহ চলিলে জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ইহা তাহারা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়াছে। বিবাহযোগ্য কুমারীর দুজন মূল্য, একজন কন্যার পিতামাতার প্রাপ্য, আর একজন কন্যার জাতির সমাজপতির অনুমতি গ্রহণের মূল্য; এই অনুমতি না হইলে বিবাহ হইতে পায় না। দলপতির অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিলে মূল্যস্বরূপ বরের জীবন দিতে হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের (Salien Franks) রাজা ক্লভিস্ (Clovis) বিবাহের সময় বধূকে একটি সু (ডবল পয়সা) ও একটি দেনিয়ে আধপাই দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই বোধ হয় বধূকে বরের অর্থদান একটি আইনসঙ্গত উপহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সে ইহা আজও চলিত আছে। মুদ্রার মূল্য অবশ্য বর কন্যার অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে এইরকম একটি প্রথার প্রচলন ছিল। কন্যা কিম্বা তাহার সঙ্গিনী একটি সুদৃশ্য

থলি সঙ্গে রাখিতেন, ইহাতে বরের প্রদত্ত অর্থ থাকিত। গ্রাম্য প্রদেশে এই নিয়ম বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত। ইহা হইতেই বিবাহকালীন যৌতুকের বা পণপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

তুরস্কে প্রতিনিধির দ্বারা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কন্যার সম্পত্তি ও বরের সম্পত্তি প্রকৃতির এক-খানা দলিল প্রস্তুত করা হয়, তৎপরে বন্ধু ও সাক্ষীদিগের সম্মুখে প্রতিনিধিরা বিবাহের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেই বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। ইহারা চারিজন পর্য্যন্ত রমণীকে বিবাহ করিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে কিছু-না-কিছু যৌতুক দিতে বাধ্য। এই অর্থের কিয়দংশ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তাহার পিতামাতা পাইয়া থাকেন। বাকি অর্থ কয়েকজন বন্ধুর নিকট গচ্ছিত থাকে। বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যা যখন সদলে স্নান করিতে যায়, তখন একটি সুন্দর পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহ-উপলক্ষে কন্যার চুল ও পা দুখানি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাহার অগ্রে আলো জ্বালাইয়া মশালধারীরা চলে। বিবাহের পরদিন বরের প্রতিনিধি আসিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত বধূকে লইয়া যায়। বিবাহের মিছিলের সঙ্গে অভ্যাগতরাও যোগ দেন। ইঁহাদের মধ্যে বধূর যে সমস্ত আত্মীয় থাকেন, তাঁহাদের প্রায়ই ভীষণভাবে বিলাপ করিতে শোনা যায়। রাস্তা দিয়া এইরূপে যাইতে যাইতে যত লোকের সঙ্গে দেখা হয় বধূ সকলকে নমস্কার করিয়া যান, অন্যসময় এইরূপ করা নিষিদ্ধ। এই দেশে কোন বর যদি ভগিনীগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠাকে প্রথমে বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই স্ত্রীর বর্ত্তমানে কিম্বা অবর্ত্তমানে তাঁহার অন্য ভগিনীগণকেও বিবাহ করিতে পারেন, ইহার অন্যথা হইলে আর পারেন না। এই-সমস্ত প্রথা মুসলমান-আইনের অনুমত।

রুশিয়ার গ্রাম্যবধূরা বিবাহের পর গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহাদের কেশগুচ্ছ কাটিয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়। সে দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত একটী মনোহর সঙ্গীতে শোনা যায় নববধূ তাঁহার সদ্যকর্ত্তিত স্বর্ণকুন্তলের জন্য বিলাপ করিতেছেন। বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরোহিত বর ও বধূকে যাত্ত লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে তাহাদের দুই হস্ত একত্র করিয়া উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন,"তোমরা কি পরস্পরের প্রতি সুব্যবহার করিতে ও উত্তমরূপে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইবে?" তাহার পরে তাহাদের মস্তকে একটি পোমরাজে (worm-wood) মালা স্থাপন করেন। বিবাহিত জীবনের আনন্দ স্রোতের মধ্যে যে মাঝে মাঝে দুঃখের বাধা আসিয়া পড়িতে পারে ইহা দ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হয়। নবদম্পতিকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিয়া পুরোহিত বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ করেন।

ইহার পর আর একটি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান হয়। পুরোহিত নবদম্পতির মঙ্গলকামনা করিয়া একটি গিল্টি-করা কাষ্ঠ পাত্রে মদ্যপান করেন। বর ও বধূ উভয়েই তাঁহার অনু-করণ করিবার পর বর পানপাত্রটি মাটিতে আছাড়াইয়া পা দিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতে ফেলিতে চীৎকার করিয়া বলেন, "যাহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব জাগাইয়া তুলিতে ও আমাদের অনিষ্ট করিতে চায় তাহারা যেন এইরূপে দলিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" ইহা অনেকটা আমাদের দেশের ছাদনা তলায় স্ত্রী-আচারের সময় বরকন্যার শুভদৃষ্টি উপলক্ষ্যে নাপিতের সকল কুলাককে গালি ও অভিসম্পাত দিয়া ছড়া কাটিবার নিয়মের অনুরূপ। ইহা অপেক্ষাও মজার আর-একটি প্রথা রুশিয়াতে প্রচলিত আছে। বিবাহের পর বাড়ীতে পৌঁছিয়া স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার জুতা খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করেন এবং বলেন যে, আমার এক হাতে চাবুক ও আর-এক হাতে টাকার থলি আছে তুমি একটা বাছিয়া লও। স্বামী ভবিষ্যতে তাঁহার উপর সদয় ব্যবহার করিবেন কি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন বেচারী স্ত্রীর এই নির্ব্বাচনের উপরই তাহা নির্ভর করে।

সুইডেনে কন্যা যদি বরের অগ্রে বেদীর সম্মুখে দক্ষিণ পদ রাখিতে পারে তাহা হইলে বিবাহিত জীবনে সে বরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে। আবার বিবাহের দিন সকালে বর তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই যদি সে বরকে দেখিতে পায় তবে তাহার প্রতি তাহার স্বামীর ভালবাসা চিরকাল স্থির থাকিবে এইরূপ বিশ্বাস। ইহুদী বরকন্যা বিবাহের সময় একটি পাত্র হইতে পান করিয়া তৎক্ষণাৎ

তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহা তাহাদের মনে পার্থিব সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব জাগাইয়া দেয়।

কোরিয়ার যুবকদের চুলের ধরণ দেখিলেই বিবাহিত কি অবিবাহিত বোঝা যায়। অবিবাহিত যুবক একগুচ্ছ চুল পিঠের উপর ঝুলাইয়া খোলা মাথায় থাকেন। বিবাহের পর চুলের গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহা মাথার উপর তুলিয়া দেন। বিবাহের গ্রন্থি চুলের উপর গিয়া পড়ে। (প্রবাসী)

শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত ভট্টাচার্য্য।

ট্রেঞ্চের মধ্যে খবরের কাগজ।

অবাধ ছাপাখানার প্রচলন ও ছাপাখানার স্বাধীনতা লাভের পর যত অদ্ভুত জায়গায় খবরের কাগজ ছাপা ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ বা খানার মধ্যে খবরের কাগজ প্রকাশ অদ্ভুততম। খবরের কাগজওলারা জেলখানায় বন্দীদশায় কাগজ ছাপিয়া বাহির করিয়াছে শোনা গিয়াছে; ষ্টীমারে জাহাজে খবরের কাগজ প্রকাশ করা ত আজ কাল খুব চলিতেছে; কিন্তু গোলাগুলির বর্ষণের মধ্যে ট্রেঞ্চে বসিয়া খবরের কাগজ চালানো একটা খুব নূতন ব্যাপার বটে। পারীর গলওা নামক খবরের কাগজে ইহার সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই-সমস্ত কাগজে সাধারণ অবস্থার প্রকাশিত কাগজের ন্যায়ই নানাবিধ রসরচনা রঙ্গ, রহস্য, খবর প্রভৃতি সবই থাকে। কানের পাশে যখন গোলাগুলি শনশন করিয়া ছুটাছুটি করে, তখন এই সমস্ত সৈনিক কাগজওয়ালারা দিব্য নিশ্চিন্তভাবে ছাপার কাজ করে,—ইহাতে তাহাদের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় এবং তাহাদের দেখিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া পরম উৎসাহে তাহাদের সঙ্গীরা যুদ্ধ করিতে থাকে।

এই-সমস্ত কাগজ হাতপ্রেসে ছাপা হয়; এবং তাহাতে যে ছবি থাকে তাহা লেখা ছাপার পর দ্বিতীয় বারে ছাপিয়া দেওয়া হয়। দুবার-ছাপা কাগজ সাধারণ অবস্থায় খুব দামী ও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

একখানা কাগজের নাম The War Cry; Victory Street নামক ট্রেঞ্চ হইতে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল ১লা জানুয়ারী ১৯১৫, দ্বিতীয় সংখ্যার তারিখ ২১শে জানুয়ারী। এই কাগজে সেনাপতির আদেশ, উন্নয়ন পুরস্কার প্রশংসা যাহারা পাইয়াছে তাহাদের নাম ও বিবরণ, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসি মস্করা ঠাট্টা বিদ্রূপ, কবিতা গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা সবই থাকে; বিজ্ঞাপনও বাদ পড়ে না বিজ্ঞাপনের নমুনা—জার্ম্মান দেশ তাড়া খুব কর্দ্দা কাঁকা দরাজ নূতন বৎসরের সওগাত, সঙ্গেশ মিষ্টান্ন আমরা ভারে ভারে আনিয়া কার্ত্তুজ-বেল্টে সাজাইতেছি এবং খুচরা খুচরা বন্দুকে কামানে ভরিয়া জার্ম্মানদের বিলি করিয়া দিতেছি, জার্ম্মানরা সত্বর আসিয়া লইয়া যাও, বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে।

অপরাপর কাগজের নাম The Cave Man, The Trench Gazette ইত্যাদি।

ফরাসী বন্দীরা জার্ম্মান দেশে বন্দী অবস্থাতেও এক খবরের কাগজ বাহির করিয়াছিল. তাহার নাম Le Heraut, মানে ইংরেজিতে Herald অর্থাৎ নাবিক বা দূত, তাহার কাজ "ফ্রান্সে হাসির বিস্তার ও রক্ষা।" এই কাগজগুলির সমস্ত জার্ম্মানরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে! মাত্র এক কপি তাহাদের হাত ফস্কাইয়া এখনো বাঁচিয়া আছে। (প্রবাসী)

অবরোধ ও অবগুণ্ঠন।

অবরোধ ও অন্তঃপুরিকা শব্দ ভারতে অবরোধ-প্রথার বহু প্রাচীনতা প্রকাশ করে। মহাভারতাদি প্রাচীন সাহিত্যে ঐ দুই শব্দের বহু প্রয়োগ পাওয়া যায়। অন্তঃপুরে বিশেষভাবে স্ত্রী-জনকে রক্ষা করা হইত বলিয়াই ঐ দুই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা শব্দটিও ইহাই প্রকাশ করিতেছে। রাজপত্নীগণ যে সূর্য্যকেও দর্শন করিতেন না, ইহা তাহার

অভিপ্রেত অর্থ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজ-পত্নীগণকে এমন ভাবে রক্ষণ করা হইত যে, যাহাতে সাধারণ লোকে তাঁহাদিকে দেখিতে পাইত না, সূর্য্যকে না দেখিয়া পারা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণবিধি এরূপ সুচারু হইত যে যেন তাঁহারা সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতেন না,—যেন সূর্য্যও তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না। পানিনির (৩-২-৩১) ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"গুপ্তিপরং চৈতৎ। এবং নাম গুপ্তা যৎপরিহার্য্য দর্শনং সূর্য্যমপি ন পশ্যন্তীতি (কাশিকা)। "তেন সত্যপি সূর্য্যদর্শনে প্রয়োগো ন বিরুধ্যতে" (তত্ত্ববোধিনী)। শত্রুর আক্রমণ নিবারণই যে এইরূপ রক্ষাবিধির উদ্দেশ্য, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়।

সাধারণ লোকের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, অবরোধ-প্রথা ভারতে মুসলমানদের নিকট হইতে আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শব্দ কয়টিই তাহা খণ্ডন করিবে। অব গুণ্ঠনপ্রথাও ভারতে বহু প্রাচীন। কালীদাস ত (শকু ৫-১৩) ইহা প্রয়োগ করিয়াছেনই, তাঁহার বহু পূর্ব্বের মনু-মহাভারত প্রভৃতিতেও ইহা বহুবার প্রযুক্ত দেখা যায়। পালিসাহিত্যের সুবিখ্যাত অর্থ কথাকার বুদ্ধঘোষ (৪র্থ শতাব্দী) প্রাতিমোক্ষের টীকায় (দেখিয় ২) প্রসঙ্গতঃ অবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন:—"যেমন অন্তঃপুরিকারা কেবল চোখের তারাটি বাহির রাখিয়া সমস্ত শরীর প্রাবৃত করিয়া থাকেন"; ("যথা চ অন্তেপুরিকায়ো অক্খিতারকমত্তং দস্সেত্বা ওগুণ্ঠিকং পারুপন্তি")। বুদ্ধ-ঘোষের এই বর্ণনা ঠিক মুসলমান-জানানাদিগেরই মত।

আজকাল এ দেশে সমাজ বিশেষে অবগুণ্ঠনপ্রথা অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তিতর্ক আলোচনার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। পাঠকগণকে আমরা এস্থলে এ বিষয়ে এক অতি প্রাচীন যুক্তির কথা শুনাইব। এখনই যে এদেশে আমাদের মধ্যে এক দল অবগুণ্ঠন প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা নহে; বহু প্রাচীন কালেও এইরূপ হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের সহধর্ম্মিণী গোপাদেবীই অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন করিতেন না, বদনাবগুণ্ঠন আচ্ছাদন করিতেন না, * তাঁহার এই ব্যবহারে সকলেই নিন্দা করিয়া উঠেন, কিন্তু গোপা দেবী নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যুক্তিতর্ক দেখাইয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহা-যানের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ললিত বিস্তরে (১২শ অধ্যায়) ইহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেই আমরা তাঁহার এখানে কয়েকটি কথা গ্রহণ করিতেছি।

"শরীর যাঁহাদের সংযত, বাক্য যাঁহাদের সংযত, এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহাদের সুরক্ষিত ও মন নির্ম্মল, বদন আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের কি হইবে? যাঁহাদের চিত্ত সুরক্ষিত ও ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত থাকে, অন্য পুরুষের দিকে যাঁহাদের চিত্ত গমন করে না, এবং স্বপতিতেই যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা উন্মুক্ত ভাবে প্রকাশ পান তাঁহাদের বদন আচ্ছাদন করিবার প্রয়োজন কি!"

"জানন্তি আশয় মম ঋষয়ো মহান্তা
পরচিত্তবুদ্ধিকুশলাস্তথ দেবসঙ্ঘাঃ।
যথ মচ্ছীল গুণ সংযম অপ্রমাদো
বদনাব গুণ্ঠনমতঃ প্রকরোমি কিং বে॥"

—ললিত বিস্তর, ১৮২ পৃঃ।

ঋষিগণ ও দেবগণ পরের চিত্তবৃত্তিকে জানিতে পারেন, আমার হৃদয়ের ভাব কি, তাহা সেই মহাত্মারাই জানেন। তাঁহারা আরও জানেন—আমার শীল, গুণ সংযম ও অপ্রমাদ কিরূপ, অতএব আমি আমার বদনের অবগুণ্ঠন করিব কেন?

রাজা শুদ্ধোদন ও আর আর সকলে শাক্যকন্যা গোপার এই সকল গাথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

(ভারতবর্ষ)

---

* "তত্র খল্বপি গোপা শাক্যকন্যা ন কঞ্চিদ্ দৃষ্ট্বা বদনং ছাদয়তি স্ম (স্বয়ং স্বয়ং) বা স্বমুখং (স্বমুখং) বা অবগুণ্ঠনং বা। তে তামুপধ্যায়ন্তি স্ম বিচারয়ন্তি স্ম নববধূকা হি নাম অপ্রতিলীনা তিষ্ঠতে।" ললিত-বিস্তর, ১৭৯ পৃঃ।

বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্য।

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় উপরিলিখিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। নিয়োগী মহাশয়ের মত বিজ্ঞ এবং বিদ্বান ব্যক্তি যখন এই অশেষ উপকারী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন ইহাতে যে বিশেষ উপকার দর্শিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই তিনি এ বিষয়ে লেখনীধারণ করিয়াছেন। আমাদের অকালবার্দ্ধক্যের তিনি যে সমুদায় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং যে যে উপায়ে নিবারিত হইতে পারে, প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অকাট্য। এ বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না। আমরা সকলকেই এই প্রবন্ধটি আমূল পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এবং তাঁহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি।

আমাদের প্রধান দোষ এই যে, আমরা কোন বিষয়েই স্থির বুদ্ধিয়া কাজ করিতে পারি না। এই অকাল বার্দ্ধক্যের প্রধান কারণ—আমাদের বিশেষতঃ বঙ্গবাসী-দের—তাড়িছলা ও অকালপক্কতা। আমরা শীঘ্র শীঘ্র বড়লোক হইয়া উঠিব, বিদ্বান্ এবং গণ্যমান্য লোক হইয়া দাঁড়াইব, এই জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বা অন্যথা শক্তি নিয়োগ করিয়া জীবনী শক্তিকে নষ্ট বা দুর্ব্বল করিয়া ফেলি।

কিছুদিন গত হইল, আমি "জীবনী শক্তি" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছি। ইহাতে আহার পরিশ্রম, অবসর, মানসিক চিন্তা, কার্য্যক্ষমতার উপযুক্ত ও নিয়মিত চালনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। এই সমুদায় সংযত করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়, জীবনী শক্তির অযথা ক্ষয় হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমুদায় যুবক এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন—এবং যাঁহারা মুখে এই সমুদায় ঠিক বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে উপরিলিখিত নিয়ম অবজ্ঞা করিয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে, তন্মধ্যে অনেকেই বলেন ও সকল বিষয় আমরা জানি বটে কিন্তু ওরূপ নিয়মে কার্য্য করা সকলের সাধ্য নহে।

যে দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যুতে নিয়োগী মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন, তিনি আমার জামাতা। তাঁহাকে চিরকালই নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছি: তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বরং আমাকে অনেক সময় বলিয়াছেন, "আপনার মত নিয়মপালন করিয়া কাজ করা অসম্ভব। এরূপ কাজ করিয়া জীবনে আরাম বোধ হয় না।" কি ভ্রম! তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তারেরা এবং আমি নিজেও তাঁহাকে মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম: তিনি তাহা শুনেন নাই, বরং বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি যে এত পরিশ্রম করি, তাহা আমার শ্বশুর-মহাশয়কে যেন জানিতে দেওয়া না হয়। দেখুন, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণই জানিতেন, স্বাস্থ্যের নিয়মলঙ্ঘনের কি বিষময় ফল। তবুও তিনি কার্য্য কালে এ বিষয়ে উদাসীন হইয়াছিলেন। তাহার ফল হাতে হাতেই ফলিল।

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দরের অকালবার্দ্ধক্যের কথা নিয়োগীমহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমি বিশেষ দুঃখিত। তিনি আমার বাল্যবন্ধু এবং আমি বহু-কাল হইতে তাঁহাদের গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি। তাঁহাকে অনিয়মিত পরিশ্রম করিতে কত যে বারণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া এবং তদুপযুক্ত বিশ্রাম না লওয়াতে শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত বিজ্ঞ এবং ধীর প্রকৃতির লোকসকল যখন স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই—তখন আর কাহার কথা বলিব!

অনেকে বলেন—ওরূপ নিয়মপালন করা সম্ভব নহে। কেন নহে—তাহাত বুঝিতে পারি না। তাঁহারা বলেন, বিশ্রাম করা আমাদের হইয়া উঠে না। আমাদের অবস্থায় লোকের তাহাতে সংসার চলে না। ইহার মত অযৌক্তিক কথা আমি কখনই শুনি নাই। আমার

স্বর্গীয় ডাক্তার স্বর্গীয় বিহারীলাল ভাদুড়ী-মহাশয় তাঁহার এক বন্ধু রোগীকে বলিয়াছিলেন—"দেখ—এখন কিছু বিশ্রাম লাভ করিতে চেষ্টা কর। একবার বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম প্রদেশে কোন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন কাটাইয়া আইস।" তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিলেন—আমার উহা করিতে গেলে সংসার চলে না। ভাদুড়ী মহাশয় বলিলেন—"তুমি মরিয়া গেলে কি তোমার সংসার চলিবেনা না? তোমার পরিবারস্থ সকলেই কি তোমার অভাবে মরিয়া যাইবে? তাঁহার সেই বন্ধু কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে সকল বিষয়েই—বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেন। এইরূপ ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কথা এই যে স্বাস্থ্যরক্ষা অগ্রে করিতে হইবে ইহা আমাদের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। না করিলে অনিষ্ট হইবে, ইহাই আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না। পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেই আর একটি কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে অল্পবয়সে অসাধারণ পরিশ্রম করিতাম। আহারাদি ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রায় কোন নিয়মই রক্ষা করিতাম না। তাহার ফল হাতে হাতেই পাইলাম। কিছুদিন পরেই পিত্তশূল রোগ প্রকাশ পাইল। তাহাতে এত কষ্ট হইত যে, মৃত্যুও তাহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইত। এখানে চিকিৎসা করিয়া উপশম হইত বটে কিন্তু আবার অনিয়ম করিতাম এবং কষ্ট পাইতাম। এই সময়ে আমি আমেরিকা গমন করিলাম এবং তথায় একজন অশীতবর্ষবয়স্ক চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার রোগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে উপদেশ দিলেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।

তিনি প্রথমেই বলিলেন, "সকল বিষয়েই নিয়ম রক্ষা করিয়া না চলিলে উন্নতি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি এত অল্প বয়সে পরিশ্রম করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, ব্যাধির পীড়নে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না, হয়ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ও সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার সুবিধামত একটি সময় স্থির করিয়া লইবে এবং প্রত্যহ সেই একই সময়ে আহার গ্রহণ করিবে ও উপযুক্ত বিশ্রাম করিবে। এইরূপ করিলে তুমি রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। এবং তোমার পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের দেশের ও সাধারণতঃ সকলেরই উপকার করিতে পারিবে।" এই মহাত্মার একমাত্র ঔষধ সেবন করিয়াই আমি রোগমুক্ত হইলাম, এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে আহারাদির নিয়ম পালন করিয়া, অদ্যাবধি (প্রায় ২০ বৎসরের উপর হইল) সুস্থ ও সবল শরীরে রীতিমত কার্য্য করিতে পারিতেছি রোগও আর প্রকাশ পায় নাই। পাঠকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিয়মিতরূপে কার্য্য করিলে এবং যথাসাধ্য বিশ্রাম লইলে জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া, সকল দিকেই উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। সেই জন্য আমি আমার দেশীয় যুবকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের প্রবন্ধটি উত্তম রূপে পাঠ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত নিয়মগুলি সযত্নে পালন করুন। কেবল পাঠ করিয়া ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না; হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন; অমৃত ফল লাভ করিবেন। (ভারতবর্ষ)

সত্যসুন্দর।

(শ্রীমতী প্রতিভা দেবী)

আমাদের একটী নব যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগটী ধর্ম্মের যুগ। ধর্ম্মের যুগে ধর্ম্মের ভাব প্রাণকে অধিকার করে। ধর্ম্মের ভাব মনে আসিলে ভাল বুদ্ধির উদয় হয়, জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের সঞ্চার হইলে কোনটী ভাল কোনটী মন্দ তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তখন ভালমন্দ বিচারের শক্তি আসে, আর তদনুসারে কর্ম্ম করিতে তৎপরতা জন্মে। মনে মন্দ ভাব আসিলে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে, বুদ্ধিবিবেচনা ঠিক থাকে না। তখন জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বুদ্ধিভ্রংশে

জন্মাইয়া দেয় এবং স্বার্থের পরিবর্ত্তে অন্যায় করিতে মানুষকে বাধ্য করে।

এই ধর্ম্মভাবের মূল পরম পিতা পরমেশ্বর। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া বিশ্বরূপে তাঁহার সত্য-সুন্দর মঙ্গল ভাব দেখাইতেছেন। তাঁহার জগৎসৃষ্টিতে কত না লীলা কত না ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্রতায়, সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তাঁর সত্যসুন্দর ভাব কেমন সুন্দর প্রকাশ পায়। প্রকৃতি তাঁরই সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল, তাঁরই ভাবে গদগদ। চেতন অচেতন সকল পদার্থ নিজ নিজ ভাষায় সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে তাঁহার নাম প্রচার করিয়া তাঁহার স্তুতিগান করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছে, নমস্কার করিতেছে। তাঁহার ভাবে সকলেই ভাবুক।

ভগবানের সত্যসুন্দররূপ হৃদয়ে অনুভূত হইলে নিজের অস্তিত্ব থাকে না; তাঁহার ভাবে ভাবুক হইলে তাঁহাতে একেবারে মিশিয়া যাইতে হয়। তখন তাঁহার বাণীতে শ্রবণ ভরিয়া যায়; তাঁহার রসাস্বাদনে অন্তরাত্মার পরিতৃপ্তি হয়। তখন সকল অবস্থাতেই সন্তোষ জন্মে এবং সকল বস্তুতে তাঁহারই স্পর্শ অনুভূত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে নিজের নিজত্ব থাকিতে পারে না। সকল শক্তিই তাঁরই সেবার জন্য, তাঁর প্রতি একান্ত ভালবাসা দেখাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারা যায়। তখন তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন হইয়া উঠেন এবং আমাদের অন্তরে নবশক্তির উদয় হয়।

সেই সত্যসুন্দর পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি প্রেমেতে সত্যেতে সত্য-স্বরূপ হইয়া স্বপ্রকাশ হয়েন। সেই পরমেশ্বর ব্যতীত আমাদের মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। তিনিই মূলাধার, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই আমাদের একমাত্র সম্বল, তিনিই আমাদের সখা। তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিজেকে জগতের মঙ্গলের জন্য দান করিয়াছেন। তিনিই দাতাকর্ণ, দয়ার সাগর দয়াময়।

একবার হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দেখ, হৃদয়-মন্দিরে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাঁহার আকর্ষণে তাঁহার সহিত আমরা কেমন যুক্ত হইয়া পড়ি। তাঁহার তেজে আমাদের সকল শক্তি সকল তেজ প্রকাশ পায়। আমরা প্রত্যেকে তাঁহারই সন্তান। আমরা যদি সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হই তবে তিনি কত না আনন্দিত হয়েন। জগতের সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে, এস, আমরাও তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

আমাদের মনকে সুন্দর না করিলে সুন্দরের সুন্দর তাঁহাকে কি প্রকারে দেখিতে পাইব? সেই অন্তর্য্যামীর বিশুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলে অন্তঃ-করণকে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র করিতে হইবে। উষার আগমনে যেমন সূর্য্যের আলোক পাইয়া জীব জন্তুগণ জাগিয়া উঠে, প্রাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানময় জ্যোতিকে পাইলে অন্তরের সকল অন্ধকারই ঘুচিয়া যায়। সেই অনাদি অসীম জ্ঞানেরই ইঙ্গিতে এই জগৎসংসারের লীলা চলিতেছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন প্রদীপ ক্ষুদ্রভাবে পূর্ণ হইয়া যেন নিভিয়া না যায়। আমরা যেন তাঁহার আলোক আত্মাতে নিয়ত জ্বালাইয়া রাখিয়া আত্মাকে সর্ব্বদাই সজীব রাখ। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সাধনার দ্বারা আমরা যেন আপনাদিগকে তাঁহারই সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া জীবনের প্রত্যেক কাজ করিতে হইবে। তাঁহাকে যখন আমাদের জ্ঞানে ধ্যানে ও কর্ম্মে প্রত্যক্ষ করিব, তখন তাহাকে "আমার" বলিয়া অপূর্ব্ব আনন্দসাগরে অবগাহন করিব। তখন কি আরাম, কি আনন্দ, কি শান্তি।

হে সত্যসুন্দর মহান পুরুষ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আমার ভাষায়, সুরে, গানে, ভাবে আমার যাহা কিছু আছে সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হও। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাও। সংসার জালে তুমি আমাকে আবদ্ধ করিয়াই বটে, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া আমার মুক্তি কোথায়? তুমি একমাত্র ত্রাণ-কর্ত্তা। পিতঃ আমি আমার জ্ঞানে, ধ্যানে ও কর্ম্মে তোমাকে দেখিতে চাই। তুমি আমার গানে, আমার সুরে, আমার প্রত্যেক কার্য্যে তোমার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তুমি অবতীর্ণ

হও যাহাতে তোমার মহান শক্তিতে শক্তিমান হই, আর তোমার ইচ্ছাতে আমার ইচ্ছা মিলিত করিয়া দিই। এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর থাকি।

হে জ্ঞানস্বরূপ! আমাকে তোমার জ্ঞানের অধিকারী কর। তোমার প্রেমে আমার হৃদয় ভরিয়া দাও; তোমার সঞ্জীবনীমন্ত্রে আমাকে সজীব কর। আমি জ্ঞানহীন, আমার প্রতি দয়া কর, তোমার জ্ঞানের কণামাত্র পাইলে আমার কোনই অভাব থাকিবে না। হে পিতঃ! আমার আত্মাকে এমন জ্ঞানে পূর্ণ কর যাহার তেজে পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। হে সুন্দর! তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি যেন নিত্যই আমার অন্তরে দেখিতে পাই। আমি তোমারই সন্তান, তোমারই পবিত্র ভাবে আমার আত্মাকে পূর্ণ কর, আমাকে তোমার পবিত্র নামের অধিকারী কর। আমাকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা এবং প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখ।

হে পিতঃ! যে সংসারবন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইয়া আছি সেই সংসারকারাগার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার অমৃত নিকেতনে লইয়া চল। তুমি আমার জ্ঞান, তুমিই আমার শক্তি। তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লও। তোমার একটিমাত্র নিঃশ্বাস আমার সকল পাপ বিদূরিত করুক। তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া যেন পুণ্য কর্ম্মে ব্রতী হই। তোমারই স্তুতিগান করিয়া আমি যেন ধন্য হই। তোমার দয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করিও না। তুমি একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি বিশ্ব-চরাচরের পিতা। আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বলিয়া যেন তোমার কৃপাদৃষ্টির বাহিরে না পড়ি। তুমি আমার হৃদয়মন্দিরে দিবানিশি প্রতিষ্ঠিত থেকো। হে আরাধ্য দেবতা, তোমার উদ্দেশে আমরা সকলে চাহিয়াছি, তোমাকে খুঁজিতে গিয়ে যেন পথ না হারাই। তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃতভবনে লইয়া যাইবার পথ প্রদর্শক হও।

হে দেব! আমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার হৃদয়ে তুমি তোমার পূর্ণজ্যোতিতে আবির্ভূত হও। তোমার জ্যোতি প্রভাবে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। আমার হৃদয়কে তোমার সৌরভে আমোদিত কর। তোমার সৌন্দর্য্য আমার মন প্রাণ নিত্যই ডুবিয়া থাকুক। হে অভয়দাতা, তুমি আমাকে অভয়দান কর। তোমাকে দান করিয়া আমার শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ কর। আমার সকল পাপতাপ মলিনতা দূর হউক তোমাকে না পেলে আমার মন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি ছাড়া আমার সেই ব্যাকুলতা আর কে দূর করিবে? তুমি একটি বার আমার নয়নের সম্মুখে এস, আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। এই আশীর্ব্বাদ দাও যেন তোমাকে বিস্মৃত হইয়া পাপপঙ্কে ডুবিয়া না যাই, তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যেন এক পদও অগ্রসর না হই।

হে নাথ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও যে বাঁচিতে চাই না। যে ফুল দিয়া লোকে তোমার পূজা করে, তুমি আমাকে সেই ফুল কর, আমি সর্ব্বদাই তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব! আমিও আজ হৃদয়থাল ভরিয়া ভক্তিপুষ্প তোমাকে দিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তুমি আমার প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তোমারই পূজার জন্য আমার হৃদয়মন্দিরকে সুন্দররূপে সাজাইয়াছি, তুমি সেখানে এসে আমার পূজা গ্রহণ কর। হে ভগবান, তুমি আমার হৃদয়কে জ্ঞানে, প্রেমে ভক্তিতে উজ্জ্বল কর। আমি তোমার ধ্যানে তোমার ভাবে ডুবিয়া গিয়া জীবনকে সার্থক করি। তোমাকে নমস্কার। (তত্ত্ব-বোধিনী)

বীর-বিক্রম

সহদেব, বলবন্ত ও তরলিকা। মালবিকা।—

বীরবাহু। এত বড় মিথ্যাকথা বিক্রমসিংহের নামে কেউ কোন দিন বলতে সাহস করে নি। তুমি নিজে বানিয়ে এসব কথা বলছ! তোমার মত জঘন্য চরিত্রের

পক্ষেই এ সম্ভব। তুমি আমার বাবার নামে জেয়তম কলঙ্ক আরোপ করেছ। (তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) এই নেও চোলরাজ, তোমার তরবারি—আমি চাই না। আমার পিতার অপমান যে বাড়ী হয়, সেখান থেকে কিছু নিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

সহদেব। একবার আমার কথা শুন, বীরবাহু!—

বীরবাহু। না,—কিছু শুনতে চাই না, আমি যাচ্ছি, কিন্তু শুন মালবিকা, শুন চোলরাজ, যে বিক্রমসিংহকে অপমান করলে, তোমাদের প্রিয়তম পুত্রের জীবন মরণ এক্ষণে তার হাতে!

মালবিকা। (চমকিয়া) বিক্রমসিংহ কি—

সহদেব। (চীৎকার করিয়া) কি বলছ তুমি?

বলবন্ত। বিক্রমসিংহ কোথায়?

বীরবাহু। (অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন—আমার ভাইদেরে নিয়ে!

সহদেব। দক্ষিণদিকে গিয়েছেন!

মালবিকা। (আবেগে) চোলরাজ, বিক্রমসিংহ আমাদের অমরকে মেরে ফেলেছে!

সহদেব। মেরে ফেলেছে? অমরকে? আমি দেখে নেব কেমন বিক্রমসিংহ আর তার ঘাড়! বীরবাহু,—বল কি হয়েছে, ঠিক বল।

বলবন্ত। সহদেব, ভাই, শুন আমার কথা,—শুন—

সহদেব। বল, যদি জীবনের মমতা থাকে, নইলে—

বীরবাহু। আমাকে ভয় দেখাবে মনে করেছ? মিছে। আসুক আমার বাবা, দেখবে তিনি কি রকমে তোমার বংশের গালে চুণ কালি দিয়ে দেন! আর মালবিকা, আমি আজ যা শুনেছি, বলে যাচ্ছি, যা পার বুঝ;—"সন্ধ্যা হবার আগেই সহদেব আর মালবিকার পুত্র-গৌরব ঘুচে যাবে!" (পশ্চাৎদিকে চলিয়া গেল)।

সহদেব। (গভীর দুঃখাবেগে) মেরে ফেলেছে, হত্যা করেছে, অমরকে এরা হত্যা করেছে!

মালবিকা। (উন্মত্তের মত) আর তুমি ওকে অমনি ছেড়ে দিলে, ওকে ছিঁড়ে ফেলে না, কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে না—প্রতিশোধ নিলে না। সমস্ত দেশের লোক তোমাকে উপহাস কর্বে, যদি তুমি—

সহদেব। (আত্মবিস্মৃত) দাও, একখানা তরবারী, একখানা কুঠার দৈ—(পার্শ্ববর্তী একজন লোকের হাত হইতে একখানা কুঠার ছিনিয়া লইয়া উন্মত্তের মত বাহির হইয়া গেল)।

বলবন্ত। (অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়া) সহদেব! থামো সহদেব—

মালবিকা। (তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া) যেতে দাও, যেতে দাও না, ওরা ছাড়িয়ে দিবে আমি জানি চোলরাজকে!

(দরজার কাছে সমবেত জনমণ্ডলী হইতে চীৎকার উঠিল)।

বলবন্ত। কি,—কি হয়েছে?

জনমণ্ডলীর মধ্যে একজন। বীরবাহু হত হয়েছে!

বলবন্ত। বীরবাহু?—আমি যাই—

মালবিকা। ও হো হো, ভাই, আমার!

(বলবন্ত বাহিরে যাইতে উদ্যত, এমন সময় সহদেব রক্তাক্ত কুঠার হস্তে প্রবেশ করিয়া কুঠার দূরে নিক্ষেপ করিল)।

সহদেব। যাক্, হয়ে গেছে, প্রতিশোধ নিয়েছি!

বলবন্ত। কি করলে সহদেব, কি করলে—ওঃ—

সহদেব। আমার অমর, অমর আমার—তুমি জান না বলবন্ত কি আগুন জলছে।

মালবিকা। বৃথা অনুতাপের আর সময় নেই চোলরাজ, বীরবাহুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অনেকে উদ্যত হবে!

সহদেব। অন্যে আর কি প্রতিশোধ নিবে? সে নিজেই তার জীবন প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওঃ কি মূর্ত্তি, চিরকাল মনে থাকবে আমার!

মালবিকা। বীরবাহু উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে, তার বাপের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, এজন্য এত কেন?

সহদেব। তা ঠিক। কিন্তু কি কাজ করেছি। এত দিন আমার মনে শান্তি ছিল, কিন্তু—

মালবিকা। প্রথম প্রথম এরকমটা হয়ই। আর তোমার যে রকম স্বভাব! এ দুদিন পরেই সেরে যাবে।

মনে কর দেখি বিক্রমসিংহ কি নীচ ছল আশ্রয় করে আমাদের অমরের প্রাণ নিয়েছে! তার একবার সম্মুখে যুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস না পেয়ে, মিটমাট করবার ছলে আমাদের অসহায় অমরকে হত্যা করল। আমি আগেই সব টের পেয়েছিলাম, আমি জানতাম বিক্রম সিংহ কৌশলী ও ক্রূর-স্বভাব; তাই আমি তার বিরুদ্ধে তোমাকে আগাগোড়া উত্তেজিত করেছি।

সহদেব। তা তুমি ঠিক করেছ; আমি যা করেছি তার তুলনায় বিক্রমসিংহের পাপ সহস্রগুণে গুরুতর। তার বীরবাহু গিয়েছে, আরো ছয় পুত্র আছে, কিন্তু আমার!—ওঃ! কেউ নেই—কেউ নেই!

(একজন ভৃত্য দৌড়িয়া প্রবেশ করিল।)

ভৃত্য। সিংহলরাজ বিক্রমসিংহ ঐ আসছেন।

সহদেব। বিক্রমসিংহ?

মালবিকা ও অন্য কয়েক জন। অস্ত্র নেও, অস্ত্র নেও সবে।

তরলিকা। বাবা এসেছেন!

বলবন্ত। (সংশয়ের সহিত) বিক্রমসিংহ?—ওর সহদেব,—সহদেব!

সহদেব। (তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া) উঠ সবে আমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ দেবে, উঠ।

(বীর পাদক্ষেপে অমরকে কোলে করিয়া বিক্রমসিংহের প্রবেশ।)

সহদেব। (চীৎকার করিয়া) অমর!

বিক্রম। এই যে তোমার অমর সহদেব, তোমার কাছে ফিরে এসেছে!

সকলে। (বিস্ময়ে) অমর! অমর বেঁচে আছে!

সহদেব। (তরবারি হাত হইতে পড়িয়া গেল) হায়, হায়, আমি কি করেছি! কি করেছি!

তরলিকা। ওঃ! তাই বীরবাহুরে—

বলবন্ত। আমি ঠিক অনুমান করেছিলাম।

বিক্রম। (অমরকে নামাইয়া দিয়া) এই নেও সহদেব, তোমার ছেলে।

অমর। বাবা! তুমি না বলেছিলে ঠাকুর্দা ভাল নয়, ঠাকুর্দা মারবে? কই মারেনি ত, আরে কত আদর করেছে।

বিক্রম। (মালবিকার দিকে) এখন বল মালু? এখন তোমার পিতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বোধ হয়, এখন বোধ হয় মিটমাট হতে পারবে?

মালবিকা। (আবেগ দমন করিয়া) তা হতে পারে!

সহদেব। (যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া) আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি। কিছু ঠিক পাচ্ছিনা! আপনি—আপনি—অমরকে ফিরিয়ে এনেছেন সিংহল-রাজ?

বিক্রম। দেখ্‌ছ ত; কিন্তু এও শুন, সে প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে!

সহদেব। তা জানি।

বিক্রম। কই। তবু তুমি ত আনন্দ দেখাচ্ছ না!

সহদেব। হায়, আর একটু আগে যদি এসে অমর পৌঁছত! যাক্, কি হয়েছিল বলুনত সিংহল রাজ।

বিক্রম। বেশী কিছু নয়। জানই ত রবিভদ্রের তোমার উপর আক্রোশ ছিল, তাই সে কয়েক জন লোক নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছিল, অমরকে মারতে।

সহদেব। রবিভদ্র- (নিম্নস্বরে)। হাঁ এখন বুঝতে পারছি বীরবাহু কি বলছিল!

বিক্রম। আমি তার কুমন্ত্রণা জানতে পাই। আমি মনে করলাম, এ কখনো হতে দেব না। গোকুলের মৃত্যুর জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করা আমি আবশ্যক মনে করি নি, আর দরকার হলে ন্যায় যুদ্ধে তোমার প্রাণ নিতেও আমি কাতর হতাম না, কিন্তু তোমার শিশু অসহায় ছেলে, তাকে রক্ষা না করে কি করি। তাই আমার লোক জন নিয়ে আমি রবিভদ্রের পেছনে যাই।

বলবন্ত। (আপন মনে) কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার এখানে ঘটে গেছে!

বিক্রম। রবিভদ্রের যখন লাগ পেলাম, তখন তারা বিপদ। অমরের রক্ষী সব বন্দী হয়েছে, রবিভদ্রের হাতে তখন অমরের প্রাণ! তাও বেশীক্ষণ থাকত না। আমি গিয়ে তাদেরে আক্রমণ করলাম, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে

গেল, শীঘ্রগীর এমন তরবারি চালাই নি! রবিগুপ্ত দুজন অনুচর নিয়ে পালিয়ে গেল, আর সবে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে।

সহদেব। (অসীম উদ্বেগের সহিত)। কিন্তু আপনি সিংহলরাজ, আপনার—

বিক্রম। (কঠোর স্বরে) আমার? আমার ছয় ছেলে আমার সঙ্গে গিয়েছিল!

সহদেব। (রুদ্ধশ্বাসে) আর ফিরে এসেছে—?

বিক্রম। একজনও না।

সহদেব। (সভয়ে) একজনও না! (নিম্নস্বরে) আর বীরবাহু—বীরবাহু—!

(সমবেত জন মণ্ডলীর মধ্যে গভীর ভাবোচ্ছ্বাস. মালবিকা যেন নিজের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অন্তর্যুদ্ধে ব্যাপৃত. তরলিকা নীরবে রোদন করিতেছে. বলবন্ত আবেগ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহার নিকট দণ্ডায়মান)

বিক্রমসিংহ। (কিছুক্ষণ থামিয়া) কি কষ্ট তোমরা কি বুঝবে! প্রকাণ্ড বনস্পতির মত আমি দাঁড়িয়ে আছি, এক ঝড়ে আমার ডালপালা সমস্ত ছিঁড়ে নিয়ে গেল, আমিই শুধু রইলাম। যাক্, কেউ মরে কেউ বেঁচে থাকেই—আমায় এক গ্লাস জল দাওত? (এক জনে জল দিল, পান করিয়া) বীর পুত্রগণ আমার, সম্মুখযুদ্ধে পড়ে তারা স্বর্গে গিয়েছে,—আমিও আসছি বৎসগণ, আমারও আর দেরী নাই। এখন চল সিংহলে ফিরে। (কম্পিত স্বরে) বিক্রমসিংহের দেনা পাওনা শোধ হয়েছে, তার যুদ্ধসাধ মিটে গেছে। প্রাচীন বৃক্ষ, একটি মাত্র শাখা তার অবশিষ্ট আছে, সেইটিকে রেখে যেতে পারি তবেই হয়! বীরবাহু কোথায়?

অমর। হ্যাঁ বাবা, বীরবাহু কোথায়, ঠাকুরদা বলেছেন, সে আমাকে কাঠ দিয়া জাহাজ তৈয়েরী করে দিবে, তাতে কত কত বোদ্ধা থাকবে!

বিক্রম। ভগবান বড়ই বাঁচিয়েছেন, সে যে আমার সঙ্গে যায় নাই। কারণ যদি সেও,—না আমার যত বড় পাষাণ হৃদয় হউক না কেন, আমি তা সহ্য করতে পারতাম না। কোথায় গেল বীরবাহু! সে আসছে না যে? সে ত সকলের আগে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করে। সময় সময় মনে হয় একদিনও বোধ হয় বীরবাহুকে না দেখে থাকতে পারিনে!

সহদেব। সিংহলরাজ, সিংহলরাজ!

বিক্রম। কি, কি হয়েছে? তোমরা সব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, বলনা কি হয়েছে? বীরবাহু কোথায়?

তরলিকা। (ঝুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া) বাবা, বাবা।

সহদেব। সিংহলরাজ,—উদার হৃদয় বৃদ্ধ—না না আর লুকিয়ে কি হবে—!

বিক্রম। (আবেগে) কোথায়?—কোথায় বীরবাহু!

সহদেব। বীরবাহু হত হয়েছে!

বিক্রম। হত হয়েছে? বীরবাহু?—মিথ্যাকথা—!

সহদেব! আমার রক্তবিন্দু দিয়েও যদি তাকে বাচাতে পারতাম! —ও হো—হো—!

মালবিকা। (সিংহলরাজের প্রতি) ঘটেছে যা তা বীরবাহুর নিজের দোষেই ঘটেছে। সে আমাদের কেমন এক ভাবে বলতে থাকে যে তুমি অমরকে হত্যা করবার জন্যই নাকি তার পিছন নিয়েছ। তোমার সঙ্গে দেখবার যখন আমাদের দেখা হয় তখন প্রায় শত্রু ভাবেই তোমাকে ছেড়ে চলে আসি, কাজেই আমরাও সহজেই বীরবাহুর কথায় বিশ্বাস করি। তার পর বীরবাহু নিমন্ত্রণ সভায় ভারী খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করে। সব কথাতেই সে রেগে রেগে উঠ্‌ত লাগ্‌ল আর উদ্ধত হয়ে গালাগালি করতে লাগ্‌ল। ততক্ষণ পর্য্যন্তও চোলরাজ কিছু বলে নি, এর পরেই তিনি রেগে বীরবাহুকে আক্রমণ করেন—যা করেছেন তার কিছুই অন্যায় হয়নি!

বিক্রম। (শান্তভাবে) নিষ্প্রয়োজন! বেশী কথা বলে তুমি যে স্ত্রীলোক, তারি পরিচয় দিচ্ছ! যদি বীরবাহু মরে গিয়েই থাকে, সব কথা ফুরিয়েছে—আর কিছু শুনতে চাইনা তোমার বাপ বলে গিয়েছিল—

শোধ দিবে এর বিলক্ষণ,
গোকুলের যে আপন জন।

তুমি বাপের কথা বলিয়েছ। (একটু থামিয়া, নিজের সৈন্যগণের দিকে ফিরিয়া) কোথায় আঘাত লেগেছিল।

একজন লোক। কপালের উপর।

বিক্রম। (প্রসন্নতার সহিত) বেশ,—ভাল। সসম্মানে চলে গেছে, পিছন ফিরেনি! পাশের দিকে পড়েছিল না সম্মুখের দিকে?

লোক। আধা পাশে আধা সম্মুখে।

বিক্রম। বেশ—দেখা যাবে,—অর্দ্ধেক প্রতিশোধ হয়েছে।

সহদেব। (নিকটে যাইয়া) সিংহলরাজ, আপনার এ ক্ষতি পূরাতে পারি, আমার সাধ্য নাই—বলুন আপনি কি চান—বলুন আমি—

বিক্রম। (শান্তস্বরে) বীরবাহুর মৃত-দেহ এনে দাও, আমি চলে যাই,—কোথায় পড়েছে? (সহদেব নিঃশব্দে পিছনের দিকে দেখাইল। বিক্রম সেই দিকে অগ্রসর হইল; বলবন্ত, তরলিকা, আরও অনেকে শোক করিতে করিতে তার পিছনে চলিল। বিক্রম সহসা থামিল, ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে পিছনের লোক-দিগকে) চলে যাও—বিক্রমসিংহ স্ত্রীলোক নয়,—যাও,—কারো দয়া চাইনে—যাও আমি একাই পারব —আমার কেউ নেই—কেউ এসোনা—(ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)

মালবিকা। (কঠোর স্বরে হাস্য করিয়া) যেতে দাও, যে ভাবে খুসি চলে যাক্, বুক ফুলিয়ে আর আসতে হবেনা, বিধাতা ভেঙ্গে দিয়েছি! কেমন তরলিকা?—আর আসবে তোমার বাপ সিংহল থেকে চোলদেশে!

বলবন্ত। (ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত মালবিকার উপর লাফাইয়া পড়িবার ভাব দেখাইল, অতি কষ্টে সে ভাব দমন করিল) ধিক্!

তরলিকা। ছি ছি মালু, তুই মেয়ে মানুষ না! রাক্ষসী, এসবের পরেও তুই আবার বাবাকে উপহাস করছিস্!

মালবিকা। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মুখ ভারী করে থাকলে আর কি হবে? আমি প্রতিশোধ নেব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা নিয়েছি। গোকুলসিংহের হত্যা আমি ক্ষমা করতে পারতাম কিন্তু যখন বিক্রম সিংহ আমাকে অপমান করেছে তখন সে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনেছে। চোলরাজের উপপত্নী! বেশ এখন আর তাতে লজ্জা নেই, চোলরাজের খ্যাতি এখন সবার উপরে ছাড়িয়ে উঠবে! হাতের মুঠোর মধ্যে,—তোর স্বামীর মত দশটা চাকর এখন চোলরাজ রাখ্‌তে পারে!

তরলিকা। আমার স্বামীর মত চাকর! কে কার চাকর এখনই জানিয়ে দিতে পারি! ভীরু কাপুরুষের স্ত্রী হয়ে আবার স্পর্দ্ধা!

বলবন্ত। কি বলতে যাচ্ছ তরু,—সাবধান—

সহদেব। কাপুরুষ?

মালবিকা। (ব্যঙ্গ হাস্য হাসিয়া) তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দিদি, কবিরাজ দেখাও।

তরলিকা। (উচ্চৈঃস্বরে) আমি আর কিছু ঢেকে রাখবনা। আমি এতক্ষণ চুপ করে রয়েছি কিন্তু আমার মৃত বীর ভাইদের তুমি ব্যঙ্গ করতে আরম্ভ করেছ, আমার বৃদ্ধ শ্বশুরের পিতাকে তুমি উপহাস করছ। আমি এতক্ষণ বলি নাই, কাপুরুষের হাতে বীরবাহু হত হয়েছে জানলে বাবার দুঃখের সীমা থাকবেনা। কিন্তু এখন—শোন পিশাচী, আর কখনো তোর প্রবঞ্চক কাপুরুষ স্বামীর গর্ব্ব করিস্‌না। যেন ভয়ে যে মেরেছিল (বলবন্তকে দেখাইয়া) ঐ—দেখ সে দাঁড়িয়ে! তাকে হাতের বালা খুলে দিয়েছিলি, এই দেখ সে বালা, (বালা খুলিয়া দেখাইল)

মালবিকা। (উন্মত্ত ভাবে) বলবন্ত!

জনমণ্ডলী। (সচীৎকারে) বলবন্ত মেরেছিল,—বীর বলবন্ত।

মালবিকা। (আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে) চোল-রাজ এসব কথা সত্য?

সহদেব। (স্থির মর্য্যাদার সহিত) দেবি সত্য—কেবল আমি কাপুরুষও নই, প্রবঞ্চকও নই।

বলবন্ত। (বিচলিত) তুমি তা কখনো নও ভাই, —কখনো হবেও না। এখন—আমার সৈন্যগণ—শীঘ্র চল,—এ ভয়ঙ্কর স্থানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

তরলিকা। (যাইতে যাইতে দরজা হইতে মুখ

ফিরাইয়া) কেমন মালবিকা, শ্রেষ্ঠ বীর কে? তোর স্বামী, না আমার স্বামী?

(তরলিকা, বলবন্ত ও তাহার লোকজন চলিয়া গেল)

মালবিকা। (আপন মনে) জীবনে এখন আমার মাত্র এক উদ্দেশ্য—এক চিন্তা;—হয় বলবন্ত—নয় মৃত্যু।

তৃতীয় অঙ্ক

(দৃশ্য—সহদেবের প্রাসাদ-কক্ষ—মালবিকা একাকিনী বসিয়া একটা ধনুকের ছিলা পাকাইতেছে। কতকগুলি তীর ও একটা ধনুক নিকটে পড়িয়া; মালবিকা কাজ করিতে করিতে আপন মনে গান করিতেছে।)

কানাড়া

দীর্ঘ তপত দিন চলে গেল।
আইল যামিনী মেঘ-অঞ্জনা।
কোকিল পাপিয়া মিছু মিঠি গায়ল,
আমার পরাণ যাক ত গাওল না।
হৃদয়ক আশা যত বহুনাথে ডারব,
গোকুলক মাঝে হাম আজু নহি ফেরব,
কলোলিনী যমুনাক সখী বলি মানব
তাহে সহপিব যত বেদনা।

মালবিকা। (ছিলাটি দুই হাতে টানিয়া) খুব শক্ত হয়েছে, এতেই চলবে। (একটা বাণ তুলিয়া লইয়া তার পরীক্ষা করিল) খুব—তার কিন্তু (তীর রাখিয়া দিল। সেই শক্তিমান বাহু কোথায় যে পাবে (আবেগে) অপমান—তার হাতে! বলবন্তের হাতে—ওঃ! আমি কি ভুল করেছি—সিংহলরাজকে বৃথা শোকগ্রস্ত করেছি—আমার সমস্ত প্রতিহিংসা সমস্ত ক্রোধ এখন এই গর্ব্বান্ধ সৈনের উপর। কি করব?—কেমন করে হবে?—কে করবে?

(চিন্তাবনত আননে সহদেবের প্রবেশ)

মালবিকা। চোলরাজ—কেমন আছ? মুখ মলিন দেখা যাচ্ছে যে?

সহদেব। খুব খারাপ মালু—ভারী খারাপ—কাল যা করেছি তাই সর্ব্বদা চোখের সাম্নে জেগে উঠ্‌ছে।—কিছুতেই ভুলতে পারছিনা।

মালবিকা। আমি যা কহি তাই কর—একটা কাজে লেগে পড়।

সহদেব। হ্যাঁ তাই করতে হবে। (নিকটে যাইয়া) এ তুমি কি করছ মালবিকা?

মালবিকা। দেখছইত, একটা ছিলা তৈরের করছি।

সহদেব। ধনুকের ছিলা? তোমার নিজের চুল দিয়ে?

মালবিকা। একটু হাসিয়া) হ্যাঁ, তাই!—আজকাল ভারী আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা সব হচ্ছে, নয়? তুমি বীরবাহুকে মারলে—আমি নিজের চুল দিয়ে ধনুকের ছিলা বানাচ্ছি—আজ ভোর থেকেই এই কাজ নিয়ে আছি!

সহদেব। না না এসব চলবেনা—কোন মতেই না।

মালবিকা। কি চলবেনা?

সহদেব। তুমি কালরাত্রে কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে তুমি?

মালবিকা। কাল রাত্রে?

সহদেব। হ্যাঁ—কালরাত্রে তুমি তোমার কোঠায় ছিলে না।

মালবিকা। তুমি কি করে জান্‌লে?

সহদেব। আমার ঘুম হচ্ছিল না, কেবলি বীরবাহুর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল বীরবাহু যেন আমার সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে—! যাক্, অবশেষে জেগে উঠলাম, উঠে শুনি সমস্ত বাড়ীময় যেন মৌমাছির বিচিত্র সঙ্গীত হচ্ছে! আমি বিছানা থেকে উঠে দরজার ফাঁকদিয়ে মাথা বাড়িয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি আগুনের কাছে বসে আছ, বাণগুলিতে ধার দিচ্ছ, আর কি সব মন্ত্র পড়ে অদ্ভুত গান গাইছ! এসব কি হচ্ছে মালবিকা?

মালবিকা। বেশ হচ্ছে—খুব ভাল হচ্ছে—কঠিন হৃদয় বিদ্ধ করতে তীক্ষ্ণ, মন্ত্রপূত বানের দরকার হবে।

সহদেব। বুঝেছি, তুমি বলবন্তের মৃত্যু চাও!

মালবিকা। বোধ হয় তাই!

সহদেব। তাই যদি হয় তবে তোমাকে বলে রাখছি আমার প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না। যাই হয়ে থাকনা কেন, আমি বলবন্তের চিরসুহৃৎ এ মনে রেখ।

মালবিকা। (ব্যঙ্গস্বরে) তাই নাকি?

সহদেব। নিশ্চয়।

মালবিকা। (বন্ধছিলা ধনুক দিয়া) এই গ্রন্থিটি খুলতে পার চোলরাজ?

সহদেব। (চেষ্টা করিয়া) না খুব কঠিন গ্রন্থি।

মালবিকা। (সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল) নিয়তির গ্রন্থি এর চেয়েও কঠিন—ঠিক জেনো। তোমার আমার ক্ষমতা নয় যে তা খুলি!

সহদেব। নিয়তির গতি রহস্যময়; তুমি যা ভাবছ তাই ঘটবে কি করে জান?

মালবিকা। তা জানি না, কিন্তু এ বেশ জানি যে বলবন্ত, তোমার আমার উভয়েরই সর্ব্বনাশ করবে।

(সহদেব কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)।

মালবিকা! কি ভাবছ চোলরাজ?

সহদেব। একটা স্বপ্নের কথা—। কয়েকদিন হয় আমি স্বপ্ন দেখেছি কি জান? আমি দেখছি আমি যেন সে কাজ করেছি—তুমি যা চাও—বলবন্তের মৃতদেহ তুমির উপর পড়ে আছে—তুমি কাছে দাঁড়িয়ে আছ—তোমার মুখ শবের মত সাদা হয়ে গেছে। আমি বল্লাম "কেমন এখন খুসী হয়েছ? তুমি যা চাও তা করেছি!" তুমি বিকট হাসি হেসে উত্তর করলে—"বলবন্তের যায়গায় তুমি ঐরকম পড়ে থাকলে আরো খুসী হতুম।"

মালবিকা। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) তুমি আমাকে বুঝনা, জাননা,—তাই এই রকম সব চিন্তা তোমার মনে আসে।

সহদেব। আচ্ছা মালু, বল দেখি, তুমি এখানে সুখে আছ?

মালবিকা সত্যি বলব চোলরাজ, এখানে সময় সময় আমার ভারী খারাপ বোধ হয়—মনে হয়, চারধারের দেয়ালগুলি যেন আমাকে চেপে মারছে, আমার যেন নিশ্বাস আটকে যাবে!

সহদেব। ঠিক, আমি যা মনে করেছি! দুজনের একজন যাবে, নিশ্চয় যাবে।

মালবিকা। হয়ত দুজনারই যেতে হবে।

সহদেব। (মালবিকার শেষ কথা না শুনিয়া) এর একটা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

মালবিকা। ব্যবস্থা করবে! তুমি ভাবছ কি যে—

সহদেব। আমি ভাবছি যে আমার রণতরীগুলি সাজিয়ে আমি আবার সমুদ্রে বের'ব। তোমাকে সবার চেয়ে ভালবাসতাম বলে আমি যে সম্মান হারিয়েছি আমি আবার তার উদ্ধার করব।

মালবিকা। (চিন্তিত ভাবে) তুমি যেতে চাও, বেশ—তাই ভাল—বোধ হয় আমাদের দুজনের পক্ষেই তা ভাল হবে।

সহদেব। তোমাকে যেইদিন সিংহল থেকে নিয়ে আসি সেইদিনই বুঝেছিলাম তোমার আমার মিলবে না। অসহ্য তোমার দর্প—অটল তোমার প্রতিজ্ঞা—সময় সময় তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়। কিন্তু কেমন যেন বুঝিনা, তাইতে যেন আমার ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। আমাকে তুমি কি এক ভয়ঙ্কর মোহে বদ্ধ করে রেখেছ, মালবিকা, আমি জড়িয়ে জড়িয়ে তিলে তিলে মরছি। আমার সময় সময় মনে হয়, আমাকে দিয়ে যে কোন ভীষণ পাপ করিয়ে নিতে পার—তুমি যাই করতে বলবে তাই যেন আমার ভাল মনে হবে। (ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলিত করিয়া) নিয়তির গতি বিচিত্র—বলবন্ত তোমার স্বামী হলে ঠিক হত!

মালবিকা। (চীৎকারে) বলবন্ত!

সহদেব। হাঁ বলবন্ত। তুমি ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় অন্ধ না হলে বলবন্তের মূল্য বুঝতে। আমার মনে হয় আমি বলবন্তের মত হ'লে বুঝি তোমাকে সুখী করতে পারতাম।

মালবিকা। (গভীর রুদ্ধ আবেগে) তোমার কি তাই মনে হয়—যে বলবন্ত তা করতে পারত?

সহদেব। তোমারি মত দৃঢ় তার সঙ্কল্প—তোমারি মত তার দর্প।

মালবিকা। (আবেগে) যদি তাই হয়—(আত্ম-

সম্বরণ করিল) যাক্—(সহসা চীৎকার করিয়া) চোলরাজ, বলবন্তকে হত্যা কর,—বধ কর তাকে!

সহদেব। কখনো না।

মালবিকা। প্রবঞ্চনা প্রতারণা করে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ—আমি সব ভুলে যাব—দীর্ঘ পাঁচবৎসর আমি তোমার ঘরে নিরানন্দ জীবন যাপন করেছি সকলি আমি ভুলব—যেদিন বলবন্তের জীবন শেষ হবে।

সহদেব। আমাকে দিয়ে বলবন্তের কোন অনিষ্ট হতে পারবে না—ফের অমন কথা মুখেও এনোনা মালবিকা।

মালবিকা। তবে আমার অন্তলোক দেখতে হচ্ছে যে প্রতিশোধ নিতে পারবে। অপমানের উপর অপমান স্তূপীকৃত করতে আর যাতে সে না পারে আমি তার উপায় দেখবই। (ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) ওঃ! অসহ্য! এতক্ষণ বোধ হয় সে সেই ফাঁকা স্ত্রীলোকটার সঙ্গে বসে তাকে আদর করছে—আর আমার অপমানকাহিনী বলছে!—ওদের হৃৎপিণ্ড দুটা নখে উপড়ে ফেলতে পারলে আমার মনের জ্বালা জুড়ায়!

সহদেব। বলবন্ত তেমন লোকই নয়, তুমি তাকে জান না।

মালবিকা। চোলরাজ, আমি কিছু শুনব না—আমি তাদের রক্ত চাই—এই বলবন্ত আর তরলিকার—শুনিছ। এরা বেঁচে থাকতে আমি শান্তি পাচ্ছিনা। (সহদেবের নিকটে সরিয়া আসিল · আবেগপূর্ণ নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল। যদি তা' করতে পার, তবে তোমাকে ভালবাসব—নারীর ভালবাসা কি তা বুঝবে। ব্যাঘ্র বাহুপাশে বেঁধে এমন আলিঙ্গন করব যার সুখ তুমি স্বপ্নেও ভাবনি!

সহদেব। তুমি ভালবাসবে। বাসবে তুমি—

মালবিকা। হ্যাঁ, এমন ভালবাসব যা জীবনে একদিনও পাওনি। তুমি কাজ আরম্ভ করে দেখ—আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে যাবে। তুমি ঘরে ঢুকলে আমি বের হয়ে গেছি কেন গেছি তুমি কি বুঝতে? কিন্তু আর যাব না—আর তোমাকে নিষ্ঠুর কথায় জ্বালাব না—তোমার মুখের হাসি এক কথায় নিভিয়ে দিব না। আমি তোমার মনের মত সেজেগুজে থাকব—তুমি যুদ্ধে গেলে তোমার সঙ্গিনী হব—ঘোড়ায় চড়ে যখন বেড়াবে, তোমার পাশে ঘোড়ায় চড়ে চলব। ঘরে তোমাকে নিজ হাতে পাক করে পরিবেষণ করে খাওয়াব—খুসীর সময় গান গেয়ে তোমার আনন্দ বাড়িয়ে তুলব!

সহদেব। (প্রায় স্বীকৃত) সত্যি। সত্যি তুমি—

মালবিকা। হ্যাঁ সত্যি—সত্যি এসব করব—এর চেয়ে দশগুণ বেশী করব—আমি শপথ করছি—তুমি প্রতিহিংসা নেও—কেবল বলবন্ত আর তরলিকাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও! তারপর দেখবে—(দরজা খুলিতে দেখিয়া সহসা থামিল —একি! তরলিকা যে তুমি!

তরলিকা। (দূর হইতেই উচ্চৈঃস্বরে) শীগ্‌গীর চোলরাজ—শীগ্‌গীর—সময় নেই—শীগ্‌গীর তোমার লোকজন ডাক।

মালবিকা। লোকজন কেন!

তরলিকা। রবিভদ্র আসছে—কতগুলো দস্যু নিয়ে তোমার অনিষ্ট করতে—পাণ্ড্যরাজকুমার এতক্ষণ তাদের বাধা দিয়েছে, কিন্তু কে জানে—।

সহদেব। বলবন্ত এতখানি করেছে আমার জন্য!

তরলিকা। কেন, পাণ্ড্যরাজকুমার কি এ নূতন করছে তোমার জন্য! সারা জীবন সে তোমার বিষন্ন বন্ধু।

সহদেব। আর আমরা কি করছিলাম—মালবিকা? —আমরা ভাবছিলাম—যাক্। আমি যা বলেছি—ঠিক—তোমার প্রত্যেক কথাতে যদি আছে—তুমি বোঝাতে আরম্ভ করলে, এমন কাজ নেই, যা ভাল বলে বোধ না হয়।

তরলিকা। এ সব কি বলছ সহদেব?

সহদেব। না-না, কিছুনা কিছুনা—তুমি যে আমাকে খবর দিতে এসেছ বেশ করেছ—আমি একজন সংগ্রহ করে নিয়ে আসছি—(বাহির হইয়া যাইবার জন্য দরজার নিকট গেল—পরে ফিরিয়া আসিল) হ্যাঁ,—সিংহলরাজের অবস্থা কি বলত'?—

তরলিকা। (অবনত বদনে) সে কথা আর

জিজ্ঞাসা করো না—গতরাত্রে সে বীরবাহুর দেহ নিজে কাঁধে করে তাবাসে নিয়ে গিয়েছে, দাহ করিতে দেয়নি। আজ অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার মত করা গেছে। এখন সমুদ্রের পারে চিতা সাজান হচ্ছে দেখে এসেছি। (সহদেব-গুপ্ত হইয়া বাহিরে গেল।) মালু—বোন, আমার একটি কাজ বাকী রয়েছে—আমি তোকেই খুজ্‌ছিলাম।

মালবিকা। আমাকে? কালের ঘটনার পর!

তরলিকা। হাঁ। তারি জন্যেই। মালু, বোন আমার, আমার উপর রাগ করিস নে, বোন? কাল আমি রাগে দুঃখে তোরী অন্যায় কথা বলেছি, সে সব ভুলে যা, বোন! আমায় ক্ষমা কর—আমি তোর চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট পাচ্ছি।

মালবিকা। তুমি বলবন্তের স্ত্রী, তুমি কষ্ট পাচ্ছ—এ কি বলছ?

তরলিকা। আমার দুঃখ বলবার নয়। আমার মনে হচ্ছে—যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল তা সকলের জন্য যেন আমি দায়ী- আমারই দোষেই যেন সব ঘটেছে। আমার মত সুখী কেউ ছিল না—কিন্তু সুখশান্তি এখন চিরদিনের মত আমার চলে গেছে?

মালবিকা। (সহসা যেন কোন বিষয় মনে করিয়া) কিন্তু এর পূর্ব্বে—এই দীর্ঘ পাঁচবৎসর—সব সময় তুমি সুখী ছিলে?

তরলিকা। নিশ্চয়, এ'তে কি সন্দেহ থাকতে পারে?

মালবিকা। হুঁ—কাল সন্দেহ ছিল না বটে—কিন্তু?

তরলিকা। তার মানে?

মালবিকা। না-না কিছু না—এস অন্য কোন বিষয়ে আলাপ করি।

তরলিকা। না-না মালু বোন—বল আমাকে—কে বল।

মালবিকা। শুনে তোমার কিছু লাভ হবে না তবে যদি নেহাৎ ই শুনতে চাও তো—(হিংস্রভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল) মনে আছে দিদি, সিংহলে সেই বসন্তোৎসবের রাত্রি? সিংহলরাজ আমাদের নিয়ে বসে গল্প করছিলেন, এমন সময় দুজন বিদেশী এল।

তরলিকা। সহদেব আর পাণ্ডারাজকুমার।

মালবিকা। হাঁ, তারা এসে নম্রভাবে সকলকে অভিবাদন করে আমাদের কাছে বসল,—আবার হাসি গল্প চলতে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল যে এরা সিংহলে এসেছে শুধু স্ত্রী লাভ করবার জন্য। তা শুনে বলবন্ত তাচ্ছিল্য করে বলল যে তার ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারে এমন স্ত্রীলোক সিংহলে নেই! সিংহলরাজ তাই শুনে হেসে বললেন যে সিংহলে উচ্চবংশীয়া ধনশালিনী কন্যার অভাব মোটেই নাই! বলবন্ত বললে—"তা হতে পারে, কিন্তু বীর যে সে বীরাঙ্গনা চায়, প্যাংপেনে, ছিচকাদুনে মেয়ে নিয়ে সে কি করবে? দেখবেন আমি যাকে বিয়ে করব সে কি রকম মেয়েমানুষ হয়! সাধারণ স্ত্রীলোক যা নিয়ে তুষ্ট থাকে, তার তা নিয়ে তুষ্ট থাকলে চলবে না। অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তার হৃদয় ভরা থাকবে—যুদ্ধে যখন যাই তখন বর্ম্ম পরে সে আমাকে অনুসরণ করবে উৎসাহ দিয়ে আমায় দৃপ্ত, উত্তেজিত করে তুলবে—তরবারীর ঝলক্ দেখে তার ভয় পেলে চলবে না। এমন, যদি হয় তবেই ত সে স্ত্রী—এরেই ত বলি সহধর্ম্মিণী।" কেমন, ঠিক নয় দিদি? বলবন্ত এ সব বলেছিল না?

তরলিকা। (অস্বস্তির সহিত) হাঁ বলেছিল বটে। কিন্তু—

মালবিকা। অমন স্ত্রী পেলেই তার জীবন সুখী হত-কিন্তু—(অবজ্ঞার সহিত) এসব বলে- সে বিয়ে করল কি না তোমাকে!

তরলিকা। (সংবেদনায়) অ্যাঁ মালু, কি বলিস্—তবে কি—

মালবিকা। আর তাই তোমার এত দর্প—এত অহঙ্কার—এত মাথা উঁচু করে চলা—

তরলিকা। না—না কখন ই না—মালু তুই—

মালবিকা। নিশ্চয়ই তুমি তার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হয়েছ—তাকে বীরত্বের কার্য্যে উৎসাহিত করেছ—তার সঙ্গে আনন্দে যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতম প্রদেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছ—তাই নয় দিদি? (ক্রমশঃ)

শ্রীমতিনীকান্ত ভট্টাশালী এম, এ।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কর্ম্মী মহিলাবৃন্দ।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured miserable,
How shall men grow? (Tennyson.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not equivocate, I will not retreat a single inch———and I will be heard." (William Lloyd Garrison.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ | আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২২ | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাণী এলিজাবেথ্।

বেলজিয়ামের রাণী এলিজাবেথ্ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে বীরত্বে, ত্যাগে, স্বদেশপ্রেমে নারীজাতির শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর একবার কঠিন অসুখ হ'য়েছিল, সেই হ'তে তাঁর শরীর খারাপ, অত্যন্ত দুর্ব্বল। যুদ্ধে যখন জার্ম্মানগণ রাজধানী দখল ক'র্লো, তখন রাণী পুত্রকন্যাদের ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন। তাহারা এখন ইংল্যাণ্ডেই বাস করিতেছে। কিন্তু তিনি রাজমহিষী ও সন্তানের মাতা, এবং রুগ্না হ'য়েও যুদ্ধে রাজার সঙ্গে র'য়েছেন।

ইনি বিবাহের পূর্ব্বে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সন্তানদের ইংল্যাণ্ডে রেখে এসে ইনি সামরিক শুশ্রূষাবিভাগের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন। যুদ্ধের পর অসংখ্য হত ও আহত সৈন্য যুদ্ধভূমিতে পড়ে থাকে, সে কি ভীষণ দৃশ্য! রাণী সেই সমরক্ষেত্রে এসে আহতদের তুলে নিয়ে যান। নগরে নগরে, শিবিরে শিবিরে, পরিবারে পরিবারে শুশ্রূষাকারিণীর বেশে দিনরাত্রি রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আহত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের সেবা কর্‌ছেন, আশার কথা বল্‌ছেন, নিজের হাতে আহত স্থান বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে কত স্নেহ প্রকাশ কর্‌ছেন; যাদের বাঁচবার আশা নাই, তাদিগকে ভগবানের নাম শুনাচ্ছেন। একাজে লেগে তিনি রাণীর যোগ্য সুকল প্রকার বাহ্য আড়ম্বর ত্যাগ ক'রেছেন। একটি সামান্য গোলা-বাড়ীতে তিনি বাস করেন।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে দেখে এসে ব'লেছেন,—"শুনেছি সাধক ভাবুকগণ সাধুদের কপালে কি এক রকম জ্যোতি দেখ্‌তে পান, রাণী এলিজাবেথের মাথায় আজ তেমনি সুন্দর দীপ্তি-মুকুট শোভা পাচ্ছে। বুঝে সবধর্ম্ম ডুবে গিয়েছে। এরই মধ্যে রাণী দেখাচ্ছেন দুর্ব্বল নারী জীবন সংগ্রামে কেমন করে দেবী হ'য়ে ফুটতে পারেন।" বেলজিয়ামের আর কিছু নাই, সমস্ত রাজ্য প্রকাণ্ড শ্মশান, নগরগুলি বিধ্বস্ত, প্রাচীন গৌরব চূর্ণ, নরনারী গৃহহীন ভিক্ষুক, কিন্তু এক রাণীর গৌরব-মুকুটে আজ বেলজিয়ামের মুখ উজ্জ্বল। এ গৌরব-মুকুট কোন বিজয়ী শত্রু অপহরণ কর্‌তে পারে না। রাণী জানেন মৃত্যু বা বিপদই কোন জাতির চরম দুর্গতি নয়। এজন্য তিনি দেশবাসী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে হাস বিপদ মাথায় তুলে নিয়েছেন। তাঁর গুণে বেলজিয়ামবাসীগণ তাঁকে দেবীর মত ভক্তি কর্‌ছেন। ত্যাগে, সহিষ্ণুতায়, প্রেমে, তিনি রমণীকুলগুরু।

জঙ্গলের কন্যা-মহাবিদ্যালয়।

লালা দেবরাজ নামক মহাশয় ব্যক্তি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত পঞ্জিত অর্থ নষ্ট হওয়ায়, বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁদের একদল কলিকাতায় চার পাঁচ দিন মাত্র থাকিয়া বক্তৃতা করিয়া কয়েক হাজার টাকা তুলিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় স্কুলের বিপদ কাটিয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যক্ষ পণ্ডিতা লজ্জাবতী এবং পণ্ডিতা লক্ষ্মীদেবী দুয়োধার "স্ত্রীজাতি ও সমাজ সংস্কার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। মহারাজা গাইকোয়ার, তাঁর রাণী এবং অনেক গণ্যমান্য পুরুষ ও রমণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতা লজ্জাবতী বিশেষ ভাবে (১) জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, (২) অবনত জাতিদের উন্নতি বিধান, (৩) হিন্দু সমাজ সংস্কার এবং (৪) নারীজাতির মুক্তি সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন। অনেক পণ্ডিত তাঁর মতের সমর্থন করিয়া ছিলেন। পণ্ডিতা লক্ষ্মীদেবী সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নারী কি না কর্‌তে পারেন? বঙ্গমহিলাগণ অন্ধ্র প্রদেশের কর্ম্মশীলা ভগ্নীদের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন, স্বস্থানে আপনার গৌরবে উঠে দাঁড়ান, বঙ্গ-সমাজ ধন্য হবে।

সমাজ সংস্কারকের ২৫ বৎসর।

The Indian Social Reformer (ভারতীয় সমাজ-সংস্কারক) নামক কাগজের ২৫ বৎসর সম্প্রতি পূর্ণ হইয়াছে। কি অবস্থার মধ্যে ইহার জন্ম হ'য়েছিল, এবং এখন দেশের কি রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে এই পত্রিকার এক সংখ্যায় আলোচনা করা হ'য়েছে। যখন সমস্ত দেশ সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সঙ্গত কিনা এই আন্দোলনে তোলপাড় হচ্ছিল, তখন অন্যান্য প্রদেশের মত বোম্বাই ও মান্দ্রাজেও দুই দল হ'য়েছিল। একদল আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী আর একদল তার বিরোধী। দুইদলে খুব তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। মান্দ্রাজে একদিন এবিষয়ে আলোচনা ক'রবার জন্য একটি প্রকাণ্ড সভা হয়। রাজা সার টি, মাধব রাও উক্ত আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্যে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ান রঘুনাথ রাও আইনের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। উভয়েই শক্তিশালী ব্যক্তি, এক স্থানে দাঁড়িয়ে দুই বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের বাদ প্রতিবাদ সমস্ত দেশকে উত্তেজিত ক'রেছিল। এই ঘটনার ছয়মাসের পরে সার মাধব রাও দেহত্যাগ করেন।

সেই সময়, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, "সমাজ সংস্কারকের" জন্ম হয়। তখন মান্দ্রাজে রঘুনাথ রাও এর কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি বিধবা-বিবাহ সমিতি ছিল, কিন্তু সে সমিতি কেবল মতই প্রচার ক'রতো, কাজ কিছুই ক'রতো না। শাস্ত্রের উক্তির দ্বারা বিধবা বিবাহ সমর্থন এবং বাল্য বিবাহের প্রতিবাদ সেই সমিতির প্রধান কাজ ছিল। সেই সময় সুব্রহ্মণ্য আয়ার "হিন্দু"

পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত আইনের এবং বিধবা বিবাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। এইরূপ দুই একটি ঘটনাতে তখন দেশের লোক ক্ষেপে গিয়েছিল। সম্পূর্ণরূপে বিবিধ সংস্কারের সমর্থন করার জন্য, উদার ভাব ও উন্নত আদর্শ প্রচার ক'রবার জন্য "সমাজ সংস্কারকের" জন্ম হ'ল।

রঘুনাথ রাও প্রভৃতি সব কাজেই শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করতেন। শাস্ত্র ছাড়া তাঁরা কিছু করতে অসমর্থ। কিন্তু "সমাজ সংস্কারক" সে পথে যাওয়া ঠিক মনে করেন নাই। যা কল্যাণকর, তাই কর্ত্তব্য, তার সমর্থন শাস্ত্রে থাক্, আর না থাক্,—এই উন্মুক্ত পথে "সমাজ সংস্কারক" চল্‌তে লাগলেন। কাজেই উভয় পক্ষের এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হ'ল না।

শাস্ত্র ব'রে' যাঁরা চ'লতেন, তাঁরা মুখে যা বলতেন, কাজে তা কর্‌তেন না! রঘুনাথ রাও-এর সমিতির উদ্যোগে একটি বিধবা বিবাহ একবার হ'ল। কিন্তু তিনিই সে বিবাহে খেলেন না। মতে ও কাজে যাতে পার্থক্য না থাকে, এই হ'ল "সমাজ সংস্কারকের" প্রথম কাজ। সেই সঙ্গে মাদক সেবন নিবারণ, দুশ্চরিত্র নারীদের নাচগান শ্রবণ ও দর্শন করা, সর্ব্ববিধ সামাজিক অপবিত্রতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন "সংস্কারকের" কাজ হ'ল। প্রথমত চারিদিকে বাধা বিঘ্ন, প্রবল প্রতিকূল স্রোত ছিল। এখন, এই ২৫ বৎসরে দেশের কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

এখন, অল্পবিস্তর সকলেই সংস্কারক। মত অনুসারে কাজ করা এখন অনেক সহজ হয়েছে। সমুদ্র যাত্রা, বিবাহের বয়স, নারীজাতির স্থান ও শিক্ষা, শিক্ষা-বিস্তার, অবনত জাতির উন্নতি, জাতিভেদ, জনসাধারণের হিতসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়েই দেশের লোকের দৃষ্টি প'ড়েছে। এই সকল বিষয়ে সত্য প্রচার করতে সত্যের সমর্থন করতে "ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার" চিরদিন তৎপর ও নির্ভীক। এখন পূর্ণবয়স্ক "সমাজ সংস্কারক" আরও বেশী পরিমাণে সমাজের হিতসাধনে সমর্থ হোন, আমাদের এই প্রার্থনা।

নারীর কাজ।

গুজরাটি মহিলারা দ্যূত-ক্রীড়ার জন্য বিখ্যাত। বিশেষতঃ ভাটিয়া এবং বানিয়া জাতির মহিলাগণের অবস্থা এবিষয়ে অতি শোচনীয়। গুজরাটের সামাজিক জীবনে এ একটি অতি কদর্য্য ব্যাপার। দেবমন্দির এবং ধর্ম্মশালা এই জুয়াখেলার আড্ডা বিশেষ। এ পাপ সমাজ হ'তে দূর করবার জন্য গুজরাটের শিক্ষিতা হিন্দুমহিলাগণ বোম্বাই এর হিন্দু-স্ত্রী মহামণ্ডল হলে একটি সভা আহ্বান করেন। শ্রাবিকা আশ্রমের শ্রীমতী মগনবাহেন সভানেত্রীর পদে বৃত হন। বহু সংখ্যক মহিলা সভায় উপস্থিত হ'য়েছিলেন। দুইজন মহিলা জুয়াখেলার পরিণাম বর্ণনা করে বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী তাঁর বক্তৃতায় দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালা সকলের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন সে সব স্থানে খেলা করতে না দেন। এই সভায় বহুসংখ্যক ছবি, পুস্তিকা, এবং মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ করা হ'য়েছিল। সমাজের কুপ্রথা দমনে মহিলাগণ এমন ক'রে লাগলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হ'তে বেশী দেরী লাগবে না। নারীজাতির কল্যাণময় সহায়তা ব্যতীত জগতের কোন ক্ষেত্রে কল্যাণ নাই। সামাজিক দুর্নীতি ও কুরীতি দমন করতে নারীশক্তির আবশ্যক। কি মাদক সেবন, কি বারাঙ্গনার নৃত্যগীত সম্ভোগ, কি জুয়াখেলা প্রভৃতি সকল পাপেরই বিষময় কুফল ভোগ করেন প্রধানতঃ নারীগণ। এই সকল পাপের বিরুদ্ধে, নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দেশের নারীগণ জাগ্রত হউন।

অলঙ্কারের বিপদ।

যেখানে সেখানে মূল্যবান অলঙ্কার পরে যাওয়ায়, অনেক সময় অনেক লোকের বিপদ হ'য়েছে। সামান্য ৫।৭ টাকার জিনিষের লোভে কত দুষ্ট লোক অসহায় শিশুকে হত্যা ক'রেছে। সব দেশেই এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। সম্প্রতি আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশে গয়না-পরা শিশুহত্যার সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। শিশুহত্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুর এদেশের অর্থশালী ব্যক্তিদিকে কয়েকটি কথা বলেছেন। তার মর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল।০ তিনি

বলেছেন, "অলঙ্কারের জন্য শিশু হত্যার মত পাপ আর নাই। দুঃখের বিষয় এই মহাপাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পাপে লিপ্ত অনেক হতভাগ্য আমার দয়া ভিক্ষা করে। কয়েকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই পাপের ভীষণতা বুঝা যায়। মানব প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় চুরি ডাকাতি একবারে থামানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই পাপের পথ বন্ধ করা সম্ভব। ছোট ছেলেদের গায়ে গয়না পরানোর সঙ্গে ধর্ম্ম বা নীতির কোন সংস্রব নাই। ছেলেদের সুন্দর দেখাবে ব'লে আদর করেই সকলে গয়না পরান, কিন্তু এই ব্যাপারে ছেলেকে যে কত দূর বিপন্ন করা হয় তা তাঁরা ভাবেন না। কয়েকটি টাকার জন্য অসহায় শিশুর প্রাণ যাওয়া কি দুঃখের বিষয়। এই পাপ দমন করতে হ'লে, পিতা মাতাদের মধ্যে এই ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে যে, বাড়ীর বাহিরে কোন ছেলে-মেয়েকে গয়না গায়ে দিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। ভদ্রলোকেরা যদি এই দৃষ্টান্ত দেখান, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তার অনুসরণ করবে। যাঁরা দেশের কল্যাণ সাধনাকাঙ্ক্ষী তাঁরা এবিষয়ে অভিভাবকদিগকে বুঝিয়ে দিবেন।" এই সবকথা বলে তিনি সকলকেই এবিষয়ে মনযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। বঙ্গদেশেরও চারিদিকে অন্ন কষ্ট হাহাকার, এসময় সন্তানদের গয়না পরিয়ে কোথাও পাঠাবেন না। এই সেদিন জন্মাষ্টমীর সময়ে ঢাকার একটী সম্ভ্রান্ত গৃহের একটী বালিকার জীবন অলঙ্কারের জন্য বিপন্ন হইয়াছিল। ভাগ্যে বালিকাটী প্রাণে বাঁচিয়াছে। চোর বিকালে বালিকাটীকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, পরদিন অলঙ্কারমুক্ত দেহে তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল।

দেশের অবস্থা।

নানাদিক দিয়ে দেশের অবস্থা দেখা আবশ্যক। (১) বর্ত্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি পড়ে দেশের জনসাধারণের সাংসারিক অবস্থার উপর। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন, অন্নবস্ত্র হীন, কর্ম্মহীন। অন্যদিকে কত স্থানে অনাবৃষ্টির জন্য ভাল আবাদ হয় নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। অন্ন-বস্ত্রের অভাবে জনসাধারণ জীর্ণ শীর্ণ।

(২) তারপর স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখলেও অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কলিকাতায় স্বাস্থ্য-রক্ষার কত বিপুল আয়োজন, তবুও সাহেবপাড়া ছাড়া অন্যান্য পাড়ার স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল নয়। মফস্বলের লোকের তো কথাই নাই। মুনিসিপ্যালিটিকে স্বায়ত্ব শাসন বলে, কিন্তু সে যে কার আয়ত্তে তাহা বোঝা কঠিন। যারা কর দেয়, তারাই যেন চোর। দেখার পর্য্যন্ত নিজেকে এক এক জন মনে করে। বহু অর্থ ব্যয় হয়, অনেক ধুমধাম, নির্ব্বাচন সব হয়, মোটা বেতনভোগী কর্ম্মচারী থাকে, কেবল সহরের ময়লা আবর্জ্জনা নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা হয় না। সুতরাং সহরেও মশা, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতি যথেষ্ট আছে। পাড়া গাঁয়ের তো কথাই নাই। কোন কোন জায়গা ভগবানের কৃপায় এখনও আপনা আপনি স্বাস্থ্যকর আছে; কিন্তু অনেক জায়গায় ম্যালেরিয়া ও কলেরার রাজত্ব। অসংখ্য লোক নানা ব্যাধিতে ভুগে চিকিৎসা অভাবে মারা যায়, আর যারা থাকে তাদেরও অধিকাংশ নির্জ্জীব অবস্থায় জীবন কাটায়।

(৩) তারপর শিক্ষার অবস্থা যে কি শোচনীয় তা বলাই অনাবশ্যক। জাপানে শতকরা ৯৯ জন লোক লিখতে পড়তে জানে, আর ভারতবর্ষে শতকরা ৯৯ জন লেখা পড়া জানে না। শিক্ষাবিস্তারের নানা আয়োজন সত্ত্বেও, শিক্ষার অবস্থা এত শোচনীয়। কত সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরাও সুশিক্ষিত হয় না, মেয়েদের তো কথাই নাই। নানা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি ও চিন্তার প্রসার ও ক্রিয়া, যারা লেখা পড়া শিখেছে তাদের মধ্যেও খুব কম দেখা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষা যেন কয়েকটি বুলি মুখস্থ করা—পাখী যেমন "রাধাকৃষ্ণ" মুখস্থ করে! শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"।

(৪) তারপর সমাজ। "ভাঁড় আছে তার কপূর্র নাই, সব গেছে উড়ে।" ব্রাহ্মণাদির তর্জ্জন গর্জ্জন আছে, কিন্তু জীবন নাই। "গুণ কর্ম্ম বিভাগ" অনুসারে জাতি বা শ্রেণীভেদ নাই। কেবল দলাদলি আর ঘৃণা আছে। পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থা একবারে প'চে গিয়েছে, অকল্যাণকর হ'য়ে উঠেছে। তবুও সংস্কারের

নামে কত ভয়। কেও কিছু মানি না। অথচ ভণ্ডং করি যে মানি—এমন কপটতা, কাপুরুষতা, ভীরুতা লজ্জাজনক এবং ক্ষতিকর। সমাজে এখন এই কপটতা এবং ভীরুতার জোয়ার। সমাজের কুরীতি দুর্নীতি কুসংস্কারের জন্য প্রাণ যায়, মান যায়, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যারা তারাও যায়, তবুও হৃদয় গলে না, প্রাণ জাগে না! হাঁচি টিকটিকি, ছোঁয়াছুঁয়ি, ছোট বড়, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ভেদাভেদ নিয়ে আমরা ত্রস্ত। ছেলে মেয়ের বিয়ের বয়স, কৌলীন্যের মর্য্যাদা, অবরোধের কঠোরতা প্রভৃতি নিয়ে সকলে ব্যস্ত। একদিন একটী বড় সভা ডেকে কয়েকজন বক্তৃতা করলেই সমাজের উন্নতি হয় না। সমাজের উন্নতির প্রমাণ নারীদের উন্নতি,—গৃহপরিবারের বিধিব্যবস্থার উন্নতি, গৃহে গৃহে উন্নত ভাব ও কাজের সমাবেশ। আমাদের স্বতন্ত্র গৃহ ও পরিবারের অবস্থা দিয়ে দেখ্‌তে হবে আমাদের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার।

(৫) তারপর ধর্ম্ম ও নীতি। ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়ে দেখ্‌লে তো অবাক হ'তে হয়। ঈশ্বরে ভক্তি, জীবে প্রেম, এবং সত্যপরায়ণতা যদি ধর্ম্ম ও নীতি হয়, তা হ'লে আমাদের দেশে এখন নাস্তিকের সংখ্যাই বেশী। পূজা অর্চ্চনার স্থলে কেবল বাহ্যাড়ম্বর দেশের সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক মহামারীরূপে বর্ত্তমান। নীতিবোধই এখনও ভাল ক'রে জাগে নাই।

সব দিক দিয়েই দেশের অবস্থা শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যেও আশার কারণ, কয়েকটি জাগ্রত জীবন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর জননী, কেশব জননী, শ্রীমতী রাণাডে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, বিবেকানন্দ, গোখলে প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনের জ্যোতি আমাদের জাতীয় অন্ধকারে ধ্রুবতারা।

যুদ্ধের বিষময় ফল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেন যে, যুদ্ধের বয়স যাদের পার হ'য়ে গিয়েছে এমন শত্রুপক্ষের যত লোক এদেশে আছে তাদের সকলকে নিজেদের দেশে চলে যেতে হবে। এই আদেশ অনুসারে একটি বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

ক্যাপ নামক একজন জার্ম্মান বালক অনেক দিন পূর্ব্বে, ১৩ বৎসর বয়সের সময় স্বদেশ ছেড়ে ডাব্লিন্ যায়। সেখানে প্রায় দশ বৎসর লেখাপড়া শিখে। তারপর প্রায় ৩৪ বছর পূর্ব্বে কলিকাতায় "বোর্ণ এণ্ড সেকার্ড" এর দোকানে চাকরী নিয়ে ভারতে আসেন। ১৮৯৯ সালে ঢাকার নবাব বাহাদুর তাঁকে ঢাকায় এনে বসান। সেই হ'তে তিনি ঢাকায় সুপরিচিত। "ক্যাপ্ আপনাকে স্ত্রী পুত্র কন্যা সুদ্ধ বৃটিশ প্রজা বলেন। তবুও পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে ক্যাপ্ এবং তাঁর পত্নীকে জার্ম্মাণীতে যেতে হবে অথচ তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে বৃটিশ্ সীমায় থাকতে হবে। এ কেমন অবস্থা! যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্যাপ্ একজন ভলাণ্টিয়ার্ ছিলেন। বাপ মা এক পক্ষে আর ছেলেমেয়ে অন্য পক্ষে থাকতে হবে, এ কি ভয়ানক অবস্থা। শেষ কি হ'য়েছে জানি না। আশা করি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জান্‌তে পারলে বৃদ্ধ ক্যাপ ও তাঁর পত্নীকে বৃটিশ প্রজারূপে এখানে থাকতে অনুমতি দিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃত হ'চ্ছে, তবুও গতবৎসরের রিপোর্ট অনুসারে সমস্ত ভারতবর্ষের বালিকাদের মধ্যে শত করা মাত্র ৬ জন স্কুলে পড়ে! যারা ক খ পড়ে তাদেরও ধ'রে ৬ জন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার জন্যে যে ব্যয় হয় এবং যে সকল ব্যবস্থা আছে, কম পক্ষে তার দশ গুণ ব্যয় ও ব্যবস্থা বৃদ্ধি না করলে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কত দিনে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হবে বলা দুষ্কর।

মান্দ্রাজের বিশেষত্ব।

আমরা সাধারণতঃ মান্দ্রাজকে অতি অনুন্নত প্রদেশ বলে জানি। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মান্দ্রাজও বাংলার চেয়ে অগ্রসর। নানা বিষয়ে জেলা সম্মিলন মান্দ্রাজের একটি বিশেষত্ব। রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানেই সামাজিক সম্মিলন

হয়। সম্প্রতি কোয়েম্বাটোরে জেলা-সামাজিক-সম্মিলন উপলক্ষে সভাপতিরূপে মিষ্টার .এ মাধবিয়া যে কয়টি কথা ব'লেছেন, তা সকল ভারতবাসীরই চিন্তার বিষয়।

তিনি বলেছেন যে সমাজ সংস্কারের জন্য শাস্ত্রের শ্লোক অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন। আমরা সংস্কার ক'রে অতীত যুগে যেতে চাই না। যা যায় তা আর আসে না। আমাদের ধন সম্পদ যেমন বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ক'রে ব্যবহার করি, তেমনি আমাদের প্রাচীন বিধি ব্যবস্থাদিও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ক'রে নিতে হবে। কোন এক যুগের লোকেরই এমন অধিকার নাই যে তারা অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য পাকা বিধি ব্যবস্থা করে যেবেন, বা আর কেও বদলাতে পারবে না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অতি জ্ঞানী ও নমস্য ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান আমাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি হতে বঞ্চিত করেন নাই। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারাই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। কেও কেও বলেন যে শাস্ত্র ছেড়ে সমাজ-সংস্কার কেবল বিলাতী অনুকরণ। তা আমাদের কংগ্রেস, হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল, সাহিত্য পরিষদ সবই অল্প বিস্তর পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। কিন্তু আমাদের সমাজ সংস্কার কেবলমাত্র বিলাতের অনুকরণ নয়।

সমাজ সংস্কারের কথা উঠিলেই সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথমে আমরা স্ত্রীশিক্ষার কথা বলি। কিন্তু আমি বলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান চিন্তার বিষয় জাতিভেদ। জাতিভেদ সকল অকল্যাণের মূল; জাতিভেদ সকল উন্নতির প্রতি-বন্ধক, জাতিভেদ স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় এবং বাল্য বিবাহের পোষক। জাতিভেদ এবং শিক্ষার অভাবের জন্য নারীগণ শূদ্র মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণের কন্যা ও পুত্রের সমান অধিকার নয়! এবিষয়ে জাপানের সামুরাইগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণীয়। তাঁরা স্বইচ্ছায় নিজেদের উন্নত জাতির সকল অধিকার ত্যাগ ক'রে স্বদেশের মহা কল্যাণ সাধন ক'রেছেন। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের সে অধিকার নাই। এখন সব জাতিই ডাক্তার উকিল হ'চ্ছে, চাকরী করছে। জাতি কেবল উন্নতির পথরোধকারী জীর্ণ স্তূপ। তারপর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বালাবিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ ও বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু ব'লে তাঁর মন্তব্য শেষ করেন।

স্বয়ং হিন্দু, হিন্দুদের সহায়, এমন ক'রে জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে বলা, কম তেজস্বিতার পরিচয় নয়। এক বিয়ের সময় ছাড়া, কেও তো জাতিভেদ মানে না। প্রকাশ্যে সকলের সঙ্গে খেতে অনেকে ভয় পায়। কিন্তু এখন শুরু করেন সকলেই, যেন জাতের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। মহিলাগণ জাত ভাঙতে হাত দিলে, কাজ সহজে সম্পন্ন হবে।—একাজে সাহস চাই।

বঙ্গনারীর শক্তির পরিচয়।

ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের কলিকাতা শাখা গত বর্ষে যুদ্ধের জন্য বিশেষ চিন্তায় পড়েছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অনেক চাঁদা বন্ধ হ'ল বা ক'মে গেল,—খরচ চালান কঠিন হ'ল। কেবল মাত্র ভগবানের উপর নির্ভর রেখে, ব্যয় সংকোচ করে কোনরূপে কাজ চলতে লাগ্‌লো। এই দুঃসময়ে ছাত্রীদের অভিভাবকগণ কেহ কেহ গাড়ী বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল; এবং শিক্ষয়িত্রীগণও কেহ কেহ কম বেতন নিয়েছেন। সকল সম্প্রদায়ের নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষাব্যবস্থাই এই সমিতির কাজ। গত বৎসর এই সমিতির সংশ্রবে একটি নিরাশ্রয়া ভবন খোলা হয়েছে। এখানে অসহায় স্ত্রীলোকগণ আশ্রয় ও শিক্ষা লাভ ক'রে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন এমন ব্যবস্থা হয়েছে।

গত বৎসরের মোট আয়—৮১৫৬ টাকা।

এবং মোট ব্যয়—৮১৬০ টাকা।

অর্থাৎ ৬ টাকা ঋণ হ'য়েছে।

সমিতির বার বৎসর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হ'চ্ছে। কলিকাতায় এই সমিতি একটি শক্তিশালী শিক্ষাবিস্তার কেন্দ্র। এই ব্যাপারের মূলে প্রধানতঃ একজন বঙ্গনারীর প্রাণগত চেষ্টা বর্ত্তমান; তিনি স্বর্গীয় অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস। ভগবান এই সমিতির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি করুন।

নারীশক্তি।

নারী যে সত্য সত্যই অবলা বা দুর্ব্বলা নয়, তা আমাদের পক্ষে অনেক ভেবে, চিন্তা করে, যুক্তি দিয়ে স্থির কর্‌তে হয়; কারণ বাংলা দেশে তেমন তেজস্বিনী নারী বড় দেখা যায় না। যদি দু একজন দেখা যায়, আমরা মনে করি তাঁরা স্ত্রীজাতির সীমার বাইরে পদার্পণ ক'রেছেন। বাংলা দেশের পর্দ্দা ও অবগুণ্ঠন অতিক্রম ক'রে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই নারীশক্তির পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। একবার বারাণসীতে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মগণ, দলবেঁধে নগর সংকীর্ত্তন করেছিলেন। অনেক বঙ্গমহিলা এবং একজন মাত্র মারাঠী মহিলা সেখানে গিয়েছিলেন; কিন্তু সংকীর্ত্তনে পুরুষদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন একমাত্র সেই মারাঠীমহিলা। তাঁকে দেখে বাঙ্গালী বাবুদের মনে হ'য়েছিল ইনিও মানুষ। যে সব প্রদেশে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন নাই, সে সকল জায়গায় মহিলাগণ স্বভাবতঃই কত দৃঢ়, কত সজীব।

কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। এদেশের পুরুষদের যে অবরোধ নাই, তবুও তারা এত হীন, এত দুর্ব্বল কেন! পল্লীগ্রামের কৃষক প্রভৃতি তো মুক্ত বাতাসেই বাস করে তবুও তারা এত দীনহীন কেন? মানুষ যদি মাথা না খাটায়, জগতের গতির সঙ্গে চলবার উপায় নির্ণয় কর্‌তে না পারে, তা হ'লে তার পক্ষে এজগতে বাস পদে পদে বিড়ম্বনাময় হ'য়ে উঠে। সনাতন প্রথার খুঁটি ধরে একস্থানে একভাবে যুগযুগ সুস্থ জীবন্ত থাকা জগতের বিধি নয়, মানুষের ধর্ম্ম নয়, বোধ হয় জড়ের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ভারত-সমুদ্র পার হ'য়ে গেলে স্বাধীন দেশ গুলিতে নারীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের ভ্রমজীবিদল একটি মহাশক্তিতে পরিণত হ'য়েছে। গোড়ায় কিন্তু এই দলের মধ্যে নেতাগণ উপহাসের বিষয় ছিলেন। লোকে মনে ক'রতো, "পরিবের ছেলের ঘোড়া রোগ।" এখন সেই ঘোড়া রোগ দেশের জাতির স্বাস্থ্যের কারণ হ'য়েছে। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে অতি অল্প দিন আগেও এই রকম ধারণা ছিল। বহু সংগ্রাম করে স্ত্রীশিক্ষার পথ পরিষ্কার ক'রতে হয়েছে। এখন সংগ্রাম চল্‌ছে—স্ত্রীজাতির অধিকার নিয়ে। নারীগণের উচ্চ শিক্ষা পাওয়া উচিত কিনা, শিক্ষা পেলেও উপাধি দেওয়া উচিত কি না, ডাক্তার হওয়া ঠিক কি না, তাদের আইন পড়বার অধিকার দেওয়া হবে কি না, ইত্যাদি সকল বিষয়ে সংগ্রাম ক'রে নারীগণকে অধিকার লাভ ক'র্‌তে হ'য়েছে, এবং এখনও হচ্ছে।—সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন জাতীয় জীবনে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, কর্ম্ম ক্ষেত্রে নারীজাতির অধিকার। শিক্ষিত জাগ্রত নারীগণ বল্‌ছেন—আমাদের স্বামী, ভাই, সন্তান, পিতা, প্রভৃতির মত আমরাও তো মানুষ,—আমাদেরও শক্তি আছে, জ্ঞান আছে, প্রেম আছে, আমরাও দেশের জন্য ভাবি, আমরা কেন দেশের শাসন পালন শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার হ'তে দূরে থাকবো! দেশ তো আমাদেরও, দেশের ভালমন্দ তো আমাদেরও ভালমন্দ, তবে আমরা যেন কেও নই, এমন হ'য়ে থাক্‌বো কেন?

যাঁরা এমন কথা বলেন, আমরা মনে করি তাঁরা স্ত্রীলোকই নন—তাঁরা পুরুষ-ধর্ম্ম নারী; সাধারণ ধারণাটা এই যে, যে সব মহিলা ঘর কন্নার কাজ কর্ম্ম ছেড়ে বাইরের কাজে মন দেয়, তারা বড় সুবিধার মেয়ে নয়—ও নারী-প্রকৃতির বিকার। কারণ, সমস্ত জগতেরই হাজার হাজার বছরের ধারণা এই যে—স্ত্রীলোকের কাজ ঘর করা রান্না বান্না ছেলেকে ঘুম পাড়ান, সেবা করা—সব ঘরের মধ্যে। কত দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে যে ঘরের কাজ ক'রেও বাহিরের কাজ করা যায়—করা আবশ্যক হয়; তবুও এই সংস্কার বদলাচ্ছে না।

পুরুষগণ কি মনে করেন যে, গৃহের ভিতরে তাঁদের কোন কাজই নাই! তা তো নয়। বাইরের অতি গুরুতর কাজ করেও পুরুষগণ, গৃহের অন্তর্গত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা আবশ্যক বোধ করেন এবং করতেও পারেন। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন্ ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীদের সঙ্গে খেলা করতেন, পিতা পিতামহ ও মাতামহের কর্ত্তব্য পালন করতেন; বাহিরের সব কাজ সত্ত্বেও কর্‌তেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক বড় বড় লোক, বহু গুরুতর জাতীয়

কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেও গৃহের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি, সন্তান ও বন্ধুগণের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাও সম্পন্ন করেন। মহাত্মা ম্যাট্‌সিনী জীবনের মহাব্রত পালনের কঠোর সাধনার সময়েও বলেছিলেন—যত কাজই থাকুক স্নেহ ভালবাসার আকর্ষণজাত পরিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য গুলির জন্য সময় রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। বাহিরে পুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্র, তবুও ঘরকন্নার কথা ভাবতে হয়। তেমনি গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু তবুও সমাজের ও দেশের কথাও তাঁদের ভাবতে হয়। স্ত্রী রান্না করবেন এবং স্বামী পুত্রগণ খাবেন (অর্থাৎ স্ত্রী স্বয়ং অনাহারে থাকবেন)—এইরূপ কর্ম্ম বিভাগ যদি ঠিক না হয়, তাহলে ঘর ও বাহিরে নরনারীর দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র যেমন বর্ত্তমান আছে তাও ঠিক নয়। সর্ব্বত্র নরনারীর পরামর্শ ও সহায়তার আবশ্যকতা আছে—অধিকার ও প্রভুত্বের দিক হ'তে নয়, প্রেম ও সেবার দিক হ'তে।

যে সকল নারী "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার" প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই গৃহিণী, জননী, ঘরকন্না করেন; কেবল কোমর বেঁধে, বক্তৃতা দিয়ে, ঝগড়া করে বেড়ান না। তাঁদের শক্তি, শিক্ষা, চরিত্র, মানব প্রেম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পরিচালন-ক্ষমতা বহু ক্ষেত্রে অসাধারণ, কোন স্থলেই সাধারণ পুরুষগণ অপেক্ষা কম নয়। এঁদের কয়েক জনের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের পক্ষে শিক্ষার বিষয়।

এই সংখ্যার মুদ্রিত চিত্রে যে কয়টী মহিলার ছবি আছে তাঁদের মধ্যে প্রথম ডাক্তার অ্যাডেলা কেকব্। ইনি হল্যাণ্ড বাসী, একজন ডাক্তারের কন্যা। কিন্তু ইনি স্বয়ং সহজে ডাক্তার হ'তে পাননি। ডাক্তারী পড়বার অধিকার লাভের জন্য তাঁকে হল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়েছিল। মন্ত্রী খুব উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি এই বালিকার শিক্ষা ও শক্তির বিষয় জানতেন, তিনি মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, এঁর আবেদন পত্রে তাঁর সম্মতি লিপিবদ্ধ ক'রে নাম স্বাক্ষর ক'রেছিলেন। তারপর অ্যাডেলা প্রেনিঙ্গন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্বদেশে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। হল্যাণ্ডে তিনিই প্রথম মহিলা ডাক্তার। তিনি শিক্ষা ও স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ ক'রে দেশের অপর মহিলাদের জন্যও পথ মুক্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, তাই নারীসমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি এখন এই সমিতির প্রাণ। তাঁর চেষ্টায় হল্যাণ্ডের রমণীগণ জাগ্রত হ'য়ে উঠেছেন—দেশের সকল কাজে তাঁরা পুরুষগণের সহায় ও সঙ্গিনী হওয়ার দাবী করিতেছেন। সেখানেও সংকীর্ণচেতা পুরুষগণ তাঁদের বিরোধী হ'য়েছেন। কিন্তু তাদের জয়ের আর দেরী নাই। গত বৎসর রাজা ও রাণী রাজসভায় মহিলাদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন; হয় ত এতদিনে মহিলাগণ প্রার্থিত অধিকার লাভ ক'রেছেন। এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের মূলে একজন নারী। ইনিও চীন জাপান ভারতবর্ষ প্রভৃতি ঘুরে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় চিত্র মেরী হুইট নামক জার্ম্মান মহিলার। তাঁর পিতা হাঙ্গারীর একজন প্রসিদ্ধ লোক, রাজসভার একজন সভ্য। তিনি সুশিক্ষা লাভ ক'রে একজন প্রসিদ্ধ গায়ককে বিবাহ করেন। কিছু দিন থিয়েটারে অভি-নেত্রীর কাজ ক'রে শেষে একখানি কাগজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি নারীজাতিকে সর্ব্ববিধ অনধিকার বন্ধন হ'তে মুক্ত করবার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এখন তিনি জার্ম্মাণীর নারী-সমিতির সভানেত্রী এবং আন্তর্জাতিক নারী-সমিতির পরিচালিকা।

সকল বিষয়ে অগ্রগামী আমেরিকাবাসী শ্রীমতী চ্যাপ্‌ম্যান্ ক্যাট্ (তৃতীয়-চিত্র) সান্-ফ্রান্সিস্কোনগরে প্রথমে একটী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন; কয়েক বৎসর পরে তিনি এক জন পরিদর্শক (Inspector) নিযুক্ত হ'ন; এই সময় তাঁর বিবাহ হয় এবং দম্পতি একখানি দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু হ'লে তিনি একাকী সেই ভার বহন করতে লাগলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষিত সমাজে তাঁর যোগ্যতা প্রকাশিত হ'য়ে পড়লো। ক্রমশঃ তিনি নারীশক্তির মুক্তির জন্য দাঁড়ালেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি আবার একজন উদারহৃদয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তিনিও নারীজাতির সম্পূর্ণ মুক্তির পক্ষপাতী। তিনি স্বামীর

পত্নী, গৃহে গৃহিণী, এখনও আইওয়া প্রদেশের স্কুল সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, নারীসমিতির সভানেত্রী এবং সংবাদ পত্রের লেখিকা। দুইতিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন; তখন এদেশেও এসেছিলেন।

পঞ্চম চিত্র শ্রীমতী রোসিকা শিমারের। তিনি হাঙ্গারী মহিলা সমিতির পরিচালিকা, একখানি সংবাদ পত্রের সম্পাদিকা, এবং কয়েকখানি জার্ম্মান ও হাঙ্গারীয়ান ভাষার গ্রন্থের লেখিকা। এখন তিনি হাঙ্গারীর একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখিকা; এবং তাঁর মহিলা সমিতিগুলি দেশের মধ্যে অতি শক্তিশালী সভাগুলি। তিনি সুগৃহিণী ও সুজননী। তাঁর সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়, সংস্কারের বিষয়, সন্তান-পালন ও গৃহের সুব্যবস্থা বিধানের সংস্কার সাধন। এই মহাকাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নারী-জাতির সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত করবার জন্য দণ্ডায়মান। এজন্য তিনি ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই গিয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন, লিখেছেন। তিনি এখনও সেই কাজে লিপ্ত আছেন।

শেষ চিত্র কুমারী আনী সুরুয়েন্স্ এর। ইনি ফিন্‌ল্যাণ্ডের পার্লেমেণ্ট্ মহাসভার একজন সভ্য। পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার বহুপূর্ব্ব হ'তে ইনি নারীদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে আস্‌ছেন। স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক নারী সমিতি স্থাপন করেছেন, প্রত্যেক সমিতির সঙ্গে পুস্তকাগার সভা গৃহ, ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ আছে; সন্তানদের জন্য বিশেষ পাঠ ও খেলার বন্দোবস্ত আছে। মহিলাগণ সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এই সব সভায় যেতে পারেন, সেখানে সন্তানগণ বই পড়ে, ছবি দেখে, খেলা করে, এবং তাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবিধ প্রসঙ্গ করেন। কুমারী সুরুয়েন্স্ সাত ভাষায় কথা বল্‌তে পারেন। তিনিও বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন।

আরও শত শত বিজ্ঞ মহিলা বিভিন্ন দেশে নারী জাতির মুক্তি ও উন্নতির জন্য, স্বদেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য কত পরিশ্রম করিতেছেন, কত শক্তির পরিচয় দিতেছেন, সময়ে সময়ে আমরা তাঁর আভাষ মাত্র পাই। গত বৎসর ইংল্যাণ্ডে নানা দেশের মহিলা-গণের একটি মহাসম্মিলনী হ'য়েছিল। ইংল্যাণ্ডের উচ্চপদস্থ বহু নরনারী তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন। এবৎসর হেগ নগরে সম্মিলনী হবার কথা ছিল। যুদ্ধের জন্য বোধ হয়, তা সম্ভব হয় নাই।

মরুভূমিতে তিনটি স্বপ্ন

(আলো ও ছায়া রচয়িত্রী লিখিত)

আমি একদিন অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নিদাঘ-তাপে বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। একটা বট-বৃক্ষ সম্মুখে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম এবং তাহার পৃষ্ঠ হইতে পৃষ্ঠাসন খুলিয়া লইয়া তাহাকে নিদাঘতপ্ত লতাগুল্মের ভিতর স্বেচ্ছায় বিচরণ পূর্ব্বক আহার-অন্বেষণে ছাড়িয়া দিলাম। আমার দক্ষিণে ও বামে সূর্য্যতাপদগ্ধ বিস্তৃত মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। চতুর্দ্দিক-ব্যাপ্ত ভীষণ উত্তাপ ও বায়ুর দিগন্তব্যাপী উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস হইতে কথঞ্চিৎ আশ্রয় পাইবার আশায়, আমি বট-বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম। অনতিবিলম্বেই নিদ্রাকর্ষণ অনুভব করাতে, আমি অশ্বের পৃষ্ঠাসনোপরি মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম এবং নিদ্রিতাবস্থায় এক অভিনব স্বপ্ন দেখিলাম।

আমার বোধ হইল, যেন আমি এক বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমির পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। সেই স্থানে দুইটি প্রকাণ্ড ভারবাহী জন্তুও বিদ্যমান রহিয়াছে; দুইটির মধ্যে একটী গ্রীবা বিস্তারপূর্ব্বক বালুকার উপরেই পড়িয়া আছে; অপরটি তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আমি ভূপতিত জন্তুটিকে বিশেষ কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিলাম, কেননা তাহার পৃষ্ঠদেশের লোকাটির উপর বালুকারাশি স্তরে স্তরে এমন ভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে, যে তাহা দেখিয়া মনে হইল যে সমগ্র বালুকাস্তূপের বর্ত্তমান আয়তন প্রাপ্ত হইতে বহুযুগ লাগিয়াছে।

আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া আমার পার্শ্বস্থ সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূমিতলশায়ী প্রকাণ্ড জীবদেহটি কোন জাতীয় প্রাণীর?

তিনি বলিলেন, "ইহা রমণীদেহ। রমণী, যিনি সমুদয় পুরুষ জাতির জননী।"

আমি বলিলাম, "বালুকাপরিবেষ্টিত হইয়া নিশ্চল ভাবে ইহা এখানে কেন পড়িয়া রহিয়াছে?"

সঙ্গী বলিলেন "শোন, ইহার কথা তোমাকে আমি বলিতেছি। যুগযুগান্ত পূর্ব্ব হইতে ইহা এই খানেই পড়িয়া রহিয়াছে; কত রৌদ্র ও ঝড় ঝঞ্ঝার উপদ্রব ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। প্রাচীন হইতে প্রাচীনতম মনুষ্যও ইহাকে চলিতে দেখে নাই। প্রাচীনকালের পুরাবৃত্ত পাঠে আমরা এই টুকুই জানিতে পারি যে আবহমান কাল হইতে এই জীবদেহ ভূপৃষ্ঠে বালুকাপরিবেষ্টিত হইয়া এই ভাবেই শায়িত রহিয়াছে। কিন্তু মন দিয়া শ্রবণ কর:- সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম পুরাবৃত্ত যে সময়ের ইতিহাস লিখিতেছে, তাহার বহু—বহু পূর্ব্বে লোক-পরম্পরায় যে সকল জনশ্রুতি জগতের আরম্ভ হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহারও পূর্ব্বে, তাবারূপ পর্ব্বতপাত্রে ও সময়ের প্রকোপে ধূলিসাৎপ্রায় দগ্ধ কর্দ্দমপৃষ্ঠে ইহার পদচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রমণী ও তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান সঙ্গীর উভয়ের পদচিহ্ন এই দুই স্থলে পরস্পর পার্শ্বে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আজ যে ধূলিশয্যায় শায়িতা সেও একদিন তাহার পদ-দ্বয়ের ব্যবহারে সমর্থা ছিল ও স্বীয় সঙ্গীর সহিত সর্ব্বত্রই অবাধে বিচরণ করিত।"

আমি বলিলাম, "এখন কেন তবে সে এমন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে?" সঙ্গী বলিলেন "শারীরিক শক্তির প্রভুত্বের যুগে উহা যখন মস্তক আনত করিয়া স্বীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল, তখন উহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে পুরুষ অধীনতার বোঝা উহার উপর চাপা-ইয়া দিয়া অপরিহার্য্য নিয়তির বন্ধন রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া দিল। পৃষ্ঠে বোঝা অনুভব করিবামাত্র রমণী একবার পৃথিবীর আবার আকাশের দিকে চাহিল কিন্তু মুক্তির আশা কোথাও না দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া বোঝার ভারে বালুকাশয়নেই শুইয়া পড়িল। সেই সময় হইতে সে এখানেই রহিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু অপরিহার্য্য নিয়তির বন্ধন পূর্ব্ববৎ দৃঢ়ই রহিয়াছে।

আমি তাহার চক্ষে যুগযুগান্তরের অসীম ধৈর্য্য দেখিতে পাইলাম। প্রতীক্ষার সমস্তে নিরাশাজনিত নীরব সহিষ্ণুতাব্যঞ্জক ভাব তাহার চক্ষু দুইটি এমনভাবে প্রকাশ করিতেছিল, যে আমার তাহা দেখিয়া বেদনা বোধ হইতে লাগিল। সে যে স্থলে শয়ন করিয়াছিল তাহা তাহার চক্ষের জলে আর্দ্র হইয়াছিল; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তপ্ত বালুকা উদ্গীরণ করিতেছিল।

আমি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা কি কখনও নড়িতে চেষ্টা করিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "কখন কখন কোন একটা অঙ্গের স্পন্দনমাত্র দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বুদ্ধি আছে, এজন্য ঐ প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া উঠিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।"

আমি বলিলাম, "উহার পার্শ্বস্থিত পুরুষটি কেন উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না?"

সঙ্গী বলিলেন, "সে সামর্থ্য থাকিলে ত? ভাল করিয়া দেখ—" আমিও তাহার অঙ্গুলী নির্দ্দিষ্টস্থানে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম যে, একটা স্থূল রজ্জু-বন্ধন রমণীর ভূমিশয্যা হইতে পুরুষের শরীর পর্য্যন্ত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং এই বন্ধন দ্বারাই উভয়ে উভয়ের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

আমার সঙ্গী বলিলেন, "রমণী যতদিন ধূলিশয্যায় শায়িত থাকিবে, তাহার সঙ্গী পুরুষকে এই ভাবেই মরুভূমির দিকে আবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষটি কি জানে, কেন সে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না?"

সঙ্গী বলিলেন, "না।"

অকস্মাৎ আমি একটা বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার শব্দ পাইয়া চকিত-নেত্রে রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, যে দৃঢ় বন্ধনে উহা তাহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল তাহা ভগ্ন হইয়া বোঝাটা ভূমিতে পড়াইয়া পড়িল।

আমি সঙ্গীকে বলিলাম, "কি হইতেছে?"

তিনি বলিলেন "শারীরিক বলের যুগের অবসান হইয়াছে। শারীরিক বলের যুগের অন্য নাম মাংসপেশী-প্রধান যুগ। এই যুগে যাহার শরীরের বল অধিক সে-ই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শরীরীকে পদদলিত করিয়া রাখে। এই যুগের জীবনী-শক্তির লোপ হওয়াতে উহা জড়পিণ্ডবৎ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মায়বীয় যুগ—যে যুগে শরীরের বল অপেক্ষা মায়বীয় শক্তিরই প্রাধান্য অর্থাৎ মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুসমূহেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, সেই যুগে মস্তিষ্ক অথবা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ-হেতু সকল বিষয়েই অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয়। সেই জন্যই মায়বীয় যুগ স্বীয় তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে শারীরিক বলের যুগের বধ সাধন করিয়াছে। ধীর পাদবিক্ষেপে ও সকলের অলক্ষিতে মায়বীয় যুগ রমণীর সন্নিকটস্থ হইয়া শিল্প-আবিষ্কার স্বরূপ ছুরিকা দ্বারা যে বন্ধনরজ্জু গুরুভার বোঝাকে রমণীপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছেদন করিয়া দিয়াছে। অপরিহার্য্য নিয়তির বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, এখন রমণী চেষ্টা করিলে হয়ত উঠিতে পারে।"

রমণী কিন্তু নিশ্চলভাবে ধূলিশয্যায়ই বিস্ফারিতনেত্রে কণ্ঠ বিস্তার পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া আমার একবার অনুমান হইল যে, সে যেন মরুভূমির সুদূর প্রান্ত হইতে কাহার সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছে; আবার সে নিদ্রিত কি জাগ্রত সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। আমি নির্নিমেষ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই আমার বোধ হইল, যেন তাহার দেহের ঈষৎ স্পন্দন আরম্ভ হইল। অন্ধকারগৃহে একটিমাত্র আলোক-রশ্মির প্রবেশও কেমন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহার প্রভাহীন চক্ষেও সেইরূপ অকস্মাৎ আশার আলোকরশ্মি সুস্পষ্ট দেখা দিল।

আমি কম্পিত কণ্ঠে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হইতেছে?" তিনি বলিলেন, "কথা কহিও না; কি হইতেছে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ! এই মাত্র রমণীর হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে, আমার উঠিবার শক্তি কি একেবারেই গিয়াছে?"

আমি অনিমেষ পূর্ব্বক সকল ঘটনা দেখিতে লাগিলাম। রমণী ধীরে অতি ধীরে, বালুশয্যা হইতে তাহার মস্তক উত্তোলন করিল; আমিও দেখিলাম যেখানে বালুকার উপরে তাহার গ্রীবা ন্যস্ত ছিল, দীর্ঘ অবস্থান নিবন্ধন সেখানে একটা গভীর দাগ পড়িয়া গিয়াছে। সে একবার পৃথিবীর দিকে চাহিল, একবার নীলাকাশের দিকে চাহিল ও একবার সঙ্গীর দিকে চাহিল। কিন্তু সঙ্গীটির দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ মরুভূমির দিকেই সংযুক্ত রহিল।

রমণী কম্পিত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে তাহার জানুদ্বয় ন্যস্ত করিল। অনভ্যস্ত পরিশ্রমে তাহার শরীরের শিরাগুলি রজ্জুবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি উৎসাহোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "এতদিন পরে রমণী উঠিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে দেখিতে পাইলাম যে সে শত চেষ্টায়ও উঠিতে পারিতেছে না, তাহার পার্শ্বদ্বয় নড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু শরীর উঠিল না। অর্দ্ধোত্থিত মস্তক তদবস্থই রহিল।

আমার সঙ্গী বলিলেন, "রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। কত যুগ তাদের ব্যবহার হয় নাই কাজেই অবশ হইয়া গিয়াছে।"

আমি দেখিলাম রমণী উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; অনবরত চেষ্টার ফলে সে ঘর্ম্মসিক্ত কলেবর হইতেছে, তথাপি সফলকাম হইতেছে না। আমি বলিলাম:—তাহার পার্শ্বস্থিত সঙ্গী কি দেখিতে পাইতেছে না যে রমণীর সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে? একটুও কি সাহায্য করিতে নাই?

আমার সঙ্গী বলিলেন "তাহার সঙ্গীর তাহাকে সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই। রমণী কেবল মাত্র স্বীয় অবিশ্রান্ত চেষ্টা দ্বারাই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতিরেকে তাহার পক্ষে মুক্তির অন্য পন্থা নাই। অবিরাম চেষ্টা ও অবিশ্রাম সংগ্রামেই সে উপযুক্ত বল লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

আমি সাশ্রুনেত্রে বলিলাম "সাহায্য না করিতে পারে না করুক; কিন্তু উহার চেষ্টায় কেন সে বাধা দেয়?

একবার দেখুন সে কি করিতেছে। রমণী যতই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, সে ততই দূরে যাইতেছে। অজ্ঞেয় বন্ধন দ্বারা উভয়ে উভয়ের সহিত সংযুক্ত থাকাতে রমণী অর্দ্ধোত্থিত হইবা মাত্র পুরুষ যেমন দূরে যাইতেছে, রমণী সজোরে ভূতলে পতিত হইতেছে।"

সখী বলিলেন, "পুরুষ অজ্ঞানতা বশতঃই এইরূপ করিতেছে, রমণী উঠিবার চেষ্টা করিলেই রজ্জুর যে অংশটা পুরুষের গাত্র-সংলগ্ন তাহাতে টান পড়ে; টান পড়িলেই কষ্ট বোধ হয়। কেন টান পড়ে সে তাহা জানে না, সে শুদ্ধ নিজের কষ্ট লাঘবের জন্য দূরে সরিয়া যায় ও সরিয়া যাইয়া রমণীকে নিজের দিকে টানিয়া আনে। রমণীও সেই সময়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল কাজেই সে ভূতলে পতিত হইল। ইহারা এই প্রকারে অজ্ঞানতা বশতঃ উভয়ে উভয়ের কষ্টের কারণ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধন রহিয়াছে তাহার অস্তিত্ব যাহারা যেদিন জানিতে পারিবে, সে দিন আর একে অন্যের বিপরীত পথে যাইবে না। একবার যদি রমণী কোন প্রকারে সাহসের করিয়া উঠিয়া পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলেই উভয়ে উভয়ের মধ্যস্থিত বন্ধন দেখিতে পাইবে যেদিন, যে মুহূর্ত্তে এই ঘটনা সংঘটিত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই পুরুষ রমণীর অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইবে ও দীর্ঘকালব্যাপী কষ্টের জন্য সহানুভূতিপূর্ণনেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।"

এই সময়ে দেখিলাম, রমণী তাহার গ্রীবা অতি কষ্টে একটু বাড়াইল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই স্বেদাক্ত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল।

বারংবার তাহাকে ব্যর্থপ্রয়াস দেখিয়া আমি বলিলাম, "বৃথা চেষ্টা! ইহার উঠিবার শক্তি সামর্থ্য একেবারেই গিয়াছে!"

আমার সখী বলিলেন "দেখ দেখ, তাহার পূর্ব্বকার নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে এখন কি অপার্থিব জ্যোতিই স্ফুরিত হইতেছে।"

মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই রমণী সাহস অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিল।

এই সময়ে আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যে, আমার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উভয়পার্শ্বেই তৃণবিহীন শুষ্ক লতাগুল্ম বিশিষ্ট মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। পিপীলিকা শ্রেণী কোথাও কোথাও শুষ্কিম বর্ষের 'বালুকাবৎসা' ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; প্রখর সূর্য্যকিরণে তখনও সর্ব্বস্থান প্লাবিত। বটবৃক্ষের শাখার মধ্য দিয়া মস্তকোপরি নীল নভোমণ্ডল দেখিতে পাইলাম। আমি পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া আরামে শয়ন করিয়া আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে, অন্যের পৃষ্ঠাসনেই মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় নিদ্রিত হইলাম, এবং এই দারুণ উত্তাপের মধ্যে পুনরায় একটি স্বপ্ন দেখিলাম।

সম্মুখে দিগন্তব্যাপী মরুভূমি। মরুভূমির মধ্য দিয়া একাকিনী এক রমণী অদ্ভুতোদ্যমে মরুভূমি প্রান্তবাহিনী এক বিশাল তরঙ্গবহা নদীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নদীর কূল অতিশয় খাড়া ও উচ্চ। নদীতীরে একজন দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি যষ্টিখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলাম, সে খানির উপর লেখা ছিল—"বিচার শক্তি।"

বৃদ্ধ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ?"

রমণী বলিল "আমার নাম, রমণী। স্বাধীনতা রাজ্যের অন্বেষণে আমি এখানে আসিয়াছি। পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার সম্মুখেই সে রাজ্য রহিয়াছে।"

রমণী বলিল, "আমার ত কোন রাজ্যই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আমি কেবল সম্মুখে এক খরস্রোতা তরঙ্গবহা নদী দেখিতেছি। নদীর তীর খাড়া ও উচ্চ। তটস্থিত প্রস্তরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কেহ তাহার উপর কোনকালে কিছু খুদিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন সে গুলি খসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ বলিলেন "নদীর অপর পাড়ে কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?"

রমণী বলিল, "স্পষ্ট কিছুই দেখিতেছি না; তবে এক একবার যখন আমার চক্ষুকে চতুর্দ্দিকের আলোক হইতে হস্তাবরণ দ্বারা রক্ষা করিয়া দেখিতেছি তখন মনে

হইতেছে যেন নদীর পর পারে নয়ন-প্রীতিকর শ্যামল তরুরাজি ও পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন "তুমি যাহা বর্ণনা করিলে তাহাই "স্বাধীনতা প্রদেশ।"

রমণী বলিল "আমি কোন্ পথ দিয়া সে রাজ্যে যাইব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "একটি ব্যতীত সেখানে যাইবার দ্বিতীয় পথ নাই। অধ্যবসায়ের উপকূল দিয়া কতকদূর যাইয়া দুঃখসলিলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া পরপারে যাইতে হয়।"

রমণী বলিল, "জলের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে, পার হইবার কোন সেতু নাই?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না।"

রমণী। জল কি খুবই গভীর?

বৃদ্ধ। অতিশয় গভীর।

রমণী। নদীগর্ভে কি পদস্খলনের ভয় আছে?

বৃদ্ধ বলিলেন "হাঁ। প্রতিপদেই পদস্খলনের, সুতরাং মৃত্যুভয় বর্ত্তমান।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেহ কি নদী অতিক্রম করিয়া অপর পারে গিয়াছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।"

রমণী বলিল, "পার হইবার পক্ষে কোন্ স্থল সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও অগভীর তাহার নির্ণয় হইয়াছে কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না।"

রমণী পুনরায় হস্ত দ্বারা আলোক হইতে চক্ষু আবরণ করিয়া স্বাধীনতা রাজ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, "আমি যাইব।" বৃদ্ধ বলিলেন "মরুভূমিতে পরিহিত বস্ত্রাদি সব খুলিয়া ফেল। এই সকল বস্ত্রের ভারে তুমি নদীতে ডুবিয়া যাইবে।"

রমণী সাগ্রহে দেশপ্রচলিত মতের আবরণ যাহা পথে আসিতে আসিতে শতছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা খুলিয়া ফেলিল। তাহার কটিদেশের জীর্ণ বন্ধনও পরিত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "পদদ্বয় হইতে 'অধীনতার পাদুকা' খুলিয়া ফেল।"

রমণী এই প্রকারে সমুদয় বাহ্য-আবরণ-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল শরীরলগ্ন একটি শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া বৃদ্ধের সম্মুখীন হইল। বৃদ্ধ বলিলেন "এই পরিচ্ছদ তুমি রাখিতে পার। স্বাধীনতা প্রদেশের সকলে এই পরিচ্ছদই পরিধান করে। জলে ইহা ডুবে না। পরিধানকারীকে ইহা জলের উপর ভাসাইয়া রাখে।"

আমি দেখিলাম, পরিচ্ছদের উপর লেখা রহিয়াছে "সত্য।" বস্ত্রখানি অতি শুভ্র, সূর্য্যকিরণও কখন বোধ হয় ইহাতে পতিত হয় নাই, কেননা উপরিস্থিত বদন দ্বারা ইহা সর্ব্বদাই আবৃত থাকিত। বৃদ্ধ নিজ হস্তস্থিত যষ্টিখানি তাহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইহা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিবে, যেদিন ইহা তোমার হস্তচ্যুত হইবে, সেই দিনই বিপদে পড়িবে। প্রত্যেক পাদবিক্ষেপের পূর্ব্বে যষ্টিখানি তোমার সম্মুখে রাখিয়া জলের গভীরতা নির্ণয় করিবে। যে স্থলে তল পাইতেছ না দেখিবে, সে পথে কদাপি যাইবে না।"

রমণী বলিল, "আমি প্রস্তুত, অগ্রসর হই তবে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর।"

তাহাকে অপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার বক্ষোপরি ওটা কি দেখা যাইতেছে?"

রমণী নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উহা কি, আমাকে দেখাও।"

রমণী অতি ক্ষুদ্র, ঈষজ্জাতপক্ষ মনুষ্যমূর্ত্তিধারী একটা জীবদেহ বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি? কেনই বা ইহা তোমার বক্ষে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে?"

রমণী বলিতে আরম্ভ করিল "ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়"—বৃদ্ধ রমণীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "উহাকে তোমার বক্ষ হইতে উৎপাটন কর।"

রমণী বলিল "কি আশ্চর্য্য উহা নিদ্রা যাইতেছে কেন উহার নিদ্রাভঙ্গ করিব? আমি মনে ভাবিয়াছি উহাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রাজ্যে প্রবেশ করিব। এতকাল পর্য্যন্ত তাহার শিশুভাব রহিয়াছে বলিয়াই ত

তাহাকে বীর বক্ষের আশ্রয়ে রাখিয়াছি। স্বাধীনতা রাজ্যে তাহার শৈশব দূর হইয়া সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। সেখানে তাহার অপরিণত শ্বেত পক্ষদ্বয়ের পূর্ণ বিকাশ হইলে পর সে আমাকেও তাহার পক্ষপুটের আশ্রয়ে রাখিতে সমর্থ হইবে। স্বাধীনতা রাজ্যে আমরা উভয়ে জীবন-পথে উভয়ের সহযাত্রী হইয়া সর্ব্বত্র একত্র পরিভ্রমণ করিব এবং পার্থিব প্রণয়ের পরিবর্ত্তে সে আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে শিখিবে।"

বৃদ্ধ অধিকতর দৃঢ়স্বরে বলিল, "উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রমণী বলিল, "আপনি মনে করিতেছেন, উহাকে লইয়া আমি নদী পার হইতে পারিব না, আমি কিন্তু একহস্তে উহাকে ধারণ করিয়া অন্য হস্ত দ্বারা সন্তরণ করিব।"

বৃদ্ধ তথাপি বলিলেন, "উহাকে পরিত্যাগ কর। নদীতে যখন জলের সহিত তোমার সংগ্রামের সময় আসিবে, তুমি তখন সংগ্রামের কথা ভুলিয়া গিয়া উহার কথাই ভাবিবে, সুতরাং পূর্ব্বেই উহাকে পরিত্যাগ কর। উহা তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কখনই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে না বরং শীঘ্রই তাহার পক্ষপুটের সঞ্চার হইবে ও তাহার সহায়তায় তোমার অগ্রেই সে তোমার উদ্দেশে স্বাধীনতা রাজ্যে প্রবেশ করিবে। স্বাধীনতা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তোমার বক্ষে সে কখনই পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে না। স্বাধীনতা রাজ্যের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইবা মাত্রই প্রেমের হস্ত নদীবক্ষ হইতে তোমাকে কূলে উঠাইয়া লাবে।"

রমণী যেমন তাহাকে বক্ষ হইতে নামাইতে গেল, সে সক্রোধে তাহাকে দংশন করিল, রক্তস্রোতে ভূমিতল আর্দ্র হইয়া গেল। তৎপরে সে সেস্থান হইতে উড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

এই সময়ে আমি বিস্মিত নেত্রে দেখিলাম, যে রমণীর সুন্দর, ঘন কৃষ্ণ কেশদাম তুষারবৎ শুভ্র হইয়া গেল। সে সহসা তরুণ বয়স হইতে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইল।

তৎপরে সে নদীতটে উপস্থিত হইয়া স্বগত বলিতে লাগিল, "কিসের জন্যই বা আমি এই অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত রাজ্যে যাইতেছি? কেহই ত সেস্থানে আজ পর্য্যন্ত যায় নাই। আমি যে নিতান্তই একা, চতুর্দ্দিকেই শূন্যতা। এই অন্ধকার-পরিবেষ্টিত মহাশূন্যতার মধ্যে আমি আজ একা—সম্পূর্ণ একা।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "চুপ কর। নিঃশব্দ ও নিস্পন্দভাবে শ্রবণ কর। কিছু শুনিতে পাইতেছ কি?"

রমণী অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল "আমি পদধ্বনি শুনিতেছি—সহস্র, সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পদধ্বনি যেন এই পথ দিয়া আসিতেছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন "এই পদধ্বনি তোমার পরবর্ত্তিনী রমণীদের পদধ্বনি। অগ্রসর হও, পথ করিয়া যাও, নদীতটে পদচিহ্ন স্থাপন কর। আজ এইক্ষণে তুমি যেস্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সেই বন্ধুর স্থান কোটি কোটি পদদলনে কালে মসৃণতা লাভ করিবে। পঙ্গপালদল কি প্রকারে জলাশয় পার হয় লক্ষ্য করিয়াছ কি? প্রথমে একদল জলাশয়ের কূলে আসিয়া স্রোতে ভাসিয়া যায়, তাহার পর অপর একদল আইসে, তৎপরে অন্যদল। এইরূপ প্রথমে যে দলের পর দল আইসে, তাহারা প্রাণত্যাগ করে এবং তাহাদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া যে সেতু নির্ম্মিত হয়, সেই সেতুর সাহায্যে অবশিষ্ট পঙ্গপাল অবাধে ও অতি সহজে তাহা পার হইয়া যায়। পথপ্রদর্শিকাদেরও তাহাই করিতে হইবে। নিজ লাভালাভের চিন্তা ত্যাগ করিয়া, প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কৃতসংকল্প হইয়া নদীবক্ষে অবতরণ করিতে হইবে।"

রমণী বলিল "যাহারা প্রথমে আইসে, তাহারা প্রথমাগত পঙ্গপালের ন্যায় পৃথকভাবে ভাসিয়াই যায়। তাহাদের মৃতদেহের চিহ্নও কোথায়ও পাওয়া যায় না, এমন কি তাহাদের দেহ সেতুনির্ম্মাণ কার্য্যেও লাগে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন "নাই বা লাগিল? যে সকল মৃতদেহ জলের ধারেই পড়িয়া থাকে তাহারাও ত কাহাকে না কাহাকেও পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।"

রমণী বলিল "সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত আমাদের মৃতদেহ

যারা যে সেতু নির্ম্মিত হইবে, তাহা কাহার কাজে লাগিবে? তাহার উপর দিয়া কে এই খরবহা নদী পার হইবে? আমাদের আত্মোৎসর্গে কাহার উপকার হইবে?"

বৃদ্ধ বলিলেন "তোমাদের আত্মোৎসর্গের, তোমাদের প্রাণদানের ফলস্বরূপ। সমুদয় জগতের হিতসাধন হইবে, সমগ্র মানবজাতির উপকার হইবে। তোমাদের দেহনির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া সমগ্র মানবজাতি স্বাধীনতা রাজ্যে যাইতে সক্ষম হইবে।"

রমণী আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধপ্রদত্ত যষ্টি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিল। আমি বিস্ময় ও আনন্দের সহিত তাহাকে নদী অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিলাম।

আমি এই সময়ে জাগ্রত হইলাম। আমার চতুর্দ্দিকে অপরাহ্নের পীতাভ আলোক; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণ মনদাগুল্মের অঙ্গুলীগুলির উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। আমার অশ্ব নিকটেই দণ্ডায়মান থাকিয়া শুষ্ক লতাগুল্ম ভক্ষণ করিতেছিল। আমি পার্শ্বপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সম্মিলিত সহস্র সহস্র পিপীলিকা শ্রেণীর রক্তিমবর্ণ বালুকার উপর দিয়া গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। উত্তাপের কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়াতে এই মৃদু শীতল বায়ুতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব মনে করিলাম, কিন্তু সহসা আবার নিদ্রাকর্ষণ হইল; মস্তক পূর্ব্বরক্ষিত স্থানে স্থাপন করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাবস্থায়, আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব্ব রাজ্য দেখিলাম। সে রাজ্যের পর্ব্বতপৃষ্ঠে অসীম সাহসী পুরুষ ও রমণী পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক একই মহৎ লক্ষ্য লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। পরস্পর পরস্পরের দিকে সরল ও সুন্দর দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের মন বিশুদ্ধ নিষ্পাপ, কাজেই ভীতি সে রাজ্যের ত্রিসীমায় উঁকি দিতে সাহস পায় না।

রমণীদের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের বিশ্বাস ও প্রীতি অসীম, তাঁহারাও পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কোন্ রাজ্য? এ রাজ্যের নাম কি?"

তিনি বলিলেন "ইহাই স্বর্গরাজ্য।"

আমি বলিলাম "এই স্বর্গরাজ্য কোথায় অবস্থিত?"

তিনি বলিলেন "পৃথিবীতে।"

আমি বলিলাম "এই স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে?"

তিনি বলিলেন "ভবিষ্যতে।"

আমি জাগ্রত হইলাম। আমার চতুর্দ্দিকে সায়াহ্নের আলোক। অস্তমিতপ্রায় সূর্য্য অত্যুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে শায়িত ছিল এবং আরামদায়িনী মৃদু শীতলতা ধীরে ধীরে সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। পিপীলিকাশ্রেণী বীর গমনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। আমি আমার অশ্বসমীপে গমন করিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই পর্ব্বতগাত্রে শায়িত অস্তমিতপ্রায় সূর্য্য পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাতে অদৃশ্য হইল, কিন্তু অন্যান্য দিন অস্তমিত হইলেও আমি নিশ্চিতই জানিতাম যে পরদিন প্রত্যূষেই তাহার আবার উদয় হইবে।

শ্যামনগরের জমিদার

(উপন্যাস)

যমুনা দেবীর কথা।

(১)

আমি আশৈশব ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিতা। পিতা ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালীর ঘরে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। যখন আমার বিবাহ হয় সেই সময়ে আমার শ্বশুরের জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল তের লক্ষ টাকা। আমার স্বামীই সেই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। আমার স্বামীর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমার শাশুড়ী পরলোক গমন করিলেন। তাহার পর শ্বশুর মহাশয় আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই অবধি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন (তাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে) ব্রহ্মচারীর ন্যায় আচরণ করিতেন। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে," গীতার এই বাক্য আমার শ্বশুরে সফলতা

লাভ করিয়াছিল। আমার স্বামীর বয়ঃক্রম যখন একুশ বৎসর তখন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হয়। সে সময় আমার বয়স দশবৎসর মাত্র।

আমার বিবাহের দুইবৎসর পরে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার কয়েকমাস পরে, বারবৎসর বয়সে সেই যে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি, পিতৃগৃহে যাইতে পাই নাই। তাহার কারণ, শ্বশুরের আপত্তি সত্ত্বেও পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিমাতার কোপন স্বভাবের বিষয় শ্বশুর অবগত ছিলেন।

শ্বশুরগৃহে আসিলাম। শাশুড়ী ছিলেন না। এক বিধবা পিসশাশুড়ী আমাকে কন্যার অধিক স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। এই পিসশাশুড়ীকে পাইয়া মাতৃ-শোক ভুলিলাম। শ্বশুর মহাশয়ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমার নিজের কিছু গুণপনা ছিল বলিয়াই হউক অথবা আমার শ্বশুরগৃহের সকলেই ভাল বলিয়াই হউক, শ্বশুরালয়ে আমি বরাবর আদর পাইয়াছি।

শ্বশুর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও সংসারে অনাসক্ত ভাবে বাস করিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি বিষয় কর্ম্ম বুঝিতেন না বা তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন, একথা কেহ বলিতে পারিতনা। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিচক্ষণ অধ্যাপকের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল।

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শুনিতে পাই, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকেও শ্বশুর মহাশয় সযত্নে ভাষার রীতিমত শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী সাহিত্য, গণিত, ও দর্শনেও তাঁহার অধিকার ছিল। পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য শ্বশুর মহাশয় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বাংলাদেশের বিত্তশালী লোকদিগের পুত্রদিগের বিদ্যা লাভের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা কেহ অনুভব করিতেন না। শ্বশুরালয়ে আসিয়া আমাকেও বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিখিতে হইয়াছিল। আমার শিক্ষক ছিলেন আমার স্বামী।

(২)

শ্বশুর মহাশয় তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনের জন্য উচ্চবেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে উৎকোচ গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে অধিকাংশ স্থলেই অভাবেই স্বভাব নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মচারীদিগের উপযুক্ত বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, তাঁহাদের সংসার যাত্রা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবার উপায় হয় এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগের উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কার্য্যে রত হইবার সম্ভাবনাও কম হয়। ফলেও তাহাই হইত। তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রজা কখনও কোন অভিযোগ করিত না। প্রজাদিগের দুঃসময় উপস্থিত হইলে শ্বশুর মহাশয় তাহাদের যে কেবল খাজানা মাপ দিতেন, তা' নয়, বিবিধ প্রকারে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন।

শ্বশুর মহাশয়ের বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে এমন গ্রামই ছিল না যেখানে তিনি আবশ্যকমত নিজব্যয়ে নূতন পুষ্করিণী খনন বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার না করাইয়াছিলেন এবং দেবালয় ও অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা না করাইয়াছিলেন। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাঁহার মীমাংসায় কেহ কখন অসন্তুষ্ট হইয়াছে এমত শুনি নাই। তিনি তাঁহার সুবিস্তৃত জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, প্রয়োজন বুঝিয়া, কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীতে এবং এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী প্রণালী মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিত।

শ্বশুর মহাশয় প্রতিবৎসর একবার তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন করিতেন। সেই সময়ে যে যে গ্রামে যাইতেন সেই সেই গ্রামের প্রধানদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই সকল গ্রামের সকল প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামের উন্নতির ভার

জমিদারের উপর দিয়া যে গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাঁহার প্রজারা কখন একথা মনে করিত না। তাহারা মনে করিত যে তাঁহাদের গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা তাহাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রজারা যাহাতে দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন করিয়া অবসর মত নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পারে এজন্য তিনি তাহাদিগের যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা কীর্ত্তন প্রভৃতি শুনিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এখনকার অনেক জমিদার তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়া প্রজাদিগের নিকট দর্শনী, ভিক্ষা ইত্যাকার নাম দিয়া নানা প্রকার অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্বশুরমহাশয় তাঁহার জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়া প্রজাদিগের নিকট সেরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করিতেন না।

আমার শ্বশুরালয় যে গ্রামে সে গ্রামের নাম শ্যামনগর। শ্যামনগর গ্রামটী খুব বড়। এতবড় গ্রাম সচরাচর দেখা যায় না। এই গ্রামও শ্বশুর মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্গত। এই গ্রামে দুইটী চতুষ্পাঠী, একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়, ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এই সকলের ব্যয় আমার শ্বশুর বহন করিতেন। ইস্কুলে রামায়ণ ও মহাভারত নিয়মিতরূপে পড়ান হইত। কৃষিজীবী প্রভৃতি লোকদিগের সন্তানদিগের জন্য গ্রামে দুইটী পাঠশালাও ছিল। তাঁহার নিজ গৃহে একটী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার ছিল। পাঠার্থীদিগকে ব্যায়াম শিখাইবার জন্য দুই জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে খুব ভাল কুস্তীগির ছিলেন এবং অশ্বারোহণে ও তরবারী চালনে তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ লোক সে সময়ে বাংলা দেশে বড় বেশী ছিল না।

তিনি স্বেচ্ছায় রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত মিশিতেন না। তবে লাট হইতে জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পুলিসের লোকেরা এবং যেসকল জমিদারের জমিদারীর সংলগ্ন আমার শ্বশুরের জমিদারী ছিল তাঁহারা, আমার শ্বশুরের উপর বড় একটা সদয় ছিলেন না এইরূপ শুনিয়াছি।

আমার স্বামী সকল বিষয়েই তাঁহার পিতার অনুরূপ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নিজগ্রামের ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও চতুষ্পাঠীতে পাঠ করেন, তৎপর কলিকাতা গিয়া পাঠ সমাপন করেন। তিনি সুখ্যাতির সহিত সংস্কৃত ভাষায় এম্, এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৪)

আমার স্বামীর বয়ক্রম যখন আটাশ বৎসর ও আমার বয়ঃক্রম সতের বৎসর সেই সময় আমাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। পুত্রটী জন্মিবামাত্র গৃহে উৎসবের সীমা রহিল না। শ্বশুর মহাশয় পৌত্রজন্মের উৎসবে তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গেলেন বোধ হইল। এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি তাঁহার প্রজাদিগের এক বৎসরের সমগ্র খাজানা মাপ দিলেন। দীন দরিদ্রদিগকে অকাতরে দান করিলেন এবং কত রকমেই যে আনন্দোৎসব হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের পুত্রের জন্ম উপলক্ষে যে সমারোহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশনের সময় ততোধিক সমারোহ হইল। নবকুমারের নাম রাখা হইল কৃষ্ণপদ।

অন্নপ্রাশনের পর হইতেই কৃষ্ণপদ তাহার পিতামহের সহচর হইল। ঠাকুরদাদা না হইলে নাতির চলে না, নাতি না হইলে ঠাকুরদাদার চলে না। যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত খোকা কিছুতেই তাহার ঠাকুরদাদার কাছছাড়া হইতে চাহিত না। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর পরম সুখে কাটিয়া গেল।

(৫)

একদিন শ্বশুর মহাশয় স্বামীকে ও আমাকে ডাকিয়া কহিলেন যে, যিনি আর শ্যামনগরে থাকিবেন না, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর যে কয়টা দিন বাঁচিবেন শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়া হরিনাম করিয়া কাটাইবেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "আপনি গেলে আমরা কেমন করিয়া থাকিব? আমি পিতা মাতা জানিনা, আপনাকে জানি। আপনি খোকাকে ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইবেন?" স্বামীর চোখ ছল ছল করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

শ্বশুর মহাশয় আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,

"তোমরা কাতর হইও না। আমার বয়স হইয়াছে। অনেক দিন সংসারে আছি। এতদিন কেবল সংসারের চিন্তাই করিয়াছি। একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ডাকিতে পারি নাই। আমার বয়ঃক্রম সাতষট্টি হইতে চলিল। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" এই হইতেছে শাস্ত্রবাক্য। আর বেশীদিন বাঁচিব বলিয়া বোধ হয় না। ইতি পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাইতাম, কেবল এই ভাইজীর মায়ায় পড়িয়া আছি। কি জানি যদি আবার একটী ভাইজীর শুভাগমন হয়, তাহা হইলে তাহার মায়া আর কিছুতেই কাটাইতে পারিব না। সুতরাং আগে হইতেই সাবধান হইয়া সরিয়া পড়া ভাল। কি বলছে ভাই।" এই বলিয়া আমার কোল হইতে খোকাকে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। খোকা মনে করিল যে বুঝি খুব একটা কৌতুকের বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, তাই সে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার ঠাকুরদাদার শিখা ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন ঠাকুরদাদা অনেক কৌশলে নাতির হাত হইতে তাঁহার শিখা বাঁচাইয়া খোকাকে আবার কোলে বসাইয়া দিলেন।

শ্বশুর মহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবনবাসে যাইবার কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একবার ধরিয়া কত লোক যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অধমর্ণদিগকে ঋণমুক্ত করিয়া দিলেন।

(৬)

শুভদিন দেখিয়া, গৃহ দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জিউকে প্রণাম করিয়া, কয়েক'জন পরিচারক সঙ্গে লইয়া শ্বশুর মহাশয় বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। স্বামী ও আমি তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর স্বামী সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। শ্বশুর মহাশয় আমাকে বলিলেন, "মা, তোমাকে যাইতে দিলাম না বলিয়া দুঃখ করিও না। খোকা তাহার ভয়ে এমন করিলাম।"

শ্বশুর মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বামী ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক মাস আমাদের কিছুই ভাল লাগিত না। অবশেষে সহিয়া গেল। বৃন্দাবন হইতে সর্ব্বদাই শ্বশুর মহাশয়ের সংবাদ পাইতাম। তিনি নিজে কোন সংবাদ দিতেন না, তাঁর পরিচারকেরা দিত। শ্বশুর মহাশয়ের বৃন্দাবনবাসে যাইবার ছয়মাস পরে স্বামী মহাশয় এক দিন এক টেলিগ্রাম পাইলেন। সেই টেলিগ্রাম বৃন্দাবন হইতে শ্বশুর মহাশয়ের একজন পরিচারক করিয়াছে। সেই টেলিগ্রামের অর্থ এইরূপ ;—"কর্ত্তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যদি শেষ দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে অবিলম্বে আসিবেন।" বলা বাহুল্য, টেলিগ্রাম পাইবামাত্র আমরা বৃন্দাবনধামে যাত্রা করিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম শ্বশুর মহাশয় তুলসীতলায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ শীর্ণ হইলেও তেজঃপুঞ্জ রহিয়াছে। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, আমি আজ রাত্রিশেষে প্রাণত্যাগ করিব। তোমাদের কাহারও যদি আমাকে কোন কথা বলিবার থাকে এখন বলিতে পার। আর এক ঘণ্টা পর আমি যে যোগাসনে বসিব, তাহা হইতে আর উঠিব না। আমার পুত্র আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবে। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত এই গৃহে হরিনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হউক। এই কথার পর স্বামী ব্যতীত শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। তার পর আমরা তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। খোকাও তাহার ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করিল। আমি তাঁহার পদধূলি লইয়া খোকার মাথায় দিলাম। এবার খোকা তাহার ঠাকুরদাদাকে দেখিয়া কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্বশুরমহাশয় প্রাণত্যাগ করিলেন। যথাবিধি তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করিয়া আমরা ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম। শ্বশুরমহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র বাংলা দেশের লোক হায় হায় করিতে লাগিল। সকলেই একবাক্য বলিল যে "এমন লোক হয় না, হইবে না, দেশ অন্ধকার হইয়া গেল।"

মহাসমারোহে শ্বশুরমহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল। আমাদের অঞ্চলে সেই সমারোহের কথা এখনও অনেকে বলিয়া থাকে।

শ্বশুরমহাশয়ের পরলোক গমনের পর স্বামী স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনের ভার লইলেন। তিনি সকল বিষয়েই তাঁহার পিতার প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তবে এক বিষয়ে তাঁহার কিছু খরচ বাড়িল। শ্বশুরের আমলে সাহেব লোকদিগের দরুণ কোন খরচ ছিল না। স্বামীর আমলে সেইটি হইল। এখন মধ্যে মধ্যে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি আমাদের আতিথ্য স্বীকার করিতেন। স্বামী তাঁহাদিগের আতিথ্যের উপযোগী করিয়া বহু ব্যয়ে শ্যামনগরে একটী বৃহৎ বাংলো নির্ম্মাণ করাইলেন।

শ্বশুরের সময়ে যে ব্যয় হইত এখন অনেক বিষয়েই তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু একদিকে আমাদের আয় আশার অতিরিক্ত রূপে বাড়িয়া গেল। আমাদের জমিদারীর মধ্যে কয়েক স্থানে কয়লার খনি ও কয়েক স্থানে অভ্রের খনি বাহির হইল। এই কয়লার খনি ও অভ্রের খনি বন্দোবস্ত করিয়া স্বামীর প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল এবং এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত অনেক ইংরেজ বণিকের পরিচয় হইল।

কয়লার খনি ও অভ্রের খনি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ব্যবসা চালাইবার জন্য স্বামী স্বদেশীয় অনেককে উৎসাহিত করিলেন কিন্তু সামান্য কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যতীত আর কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখা পড়া শিখিয়া ডাক্তারী, ওকালতী ও চাকরী করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন।

(৮)

কৃষ্ণপদ জন্মিবার পর উপর্য্যুপরি আমাদের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিল কিন্তু তাহারা অতি শৈশবেই আমাদিগের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। তারপর আর আমাদের সন্তান হইল না। কৃষ্ণপদই আমাদের সাতরাজার ধন এক মাণিক হইল। আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিতাম না। এই কারণে, কৃষ্ণপদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, তাহাকে কলিকাতা কিম্বা অন্যত্র কলেজে পড়িবার জন্য পাঠাইতে হইবে বলিয়া, আমরা স্বামী স্ত্রীতে যুক্তি করিয়া, আমাদের গ্রামের স্কুলটীকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিলাম। কৃষ্ণপদ স্বগ্রামে থাকিয়াই কলেজে পড়িতে লাগিল। উচ্চবেতনে উপযুক্ত অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হইলেন। স্বামীর বিশ্বাস ছিল যে পাশ্চাত্য দেশ আধুনিক বিজ্ঞান বলেই আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং এজন্য একজন জর্ম্মনীদেশীয় পণ্ডিতকে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। স্বামী নিজেও তাঁহার কলেজের ছাত্রদিগকে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত দেশহিতকর এমন কাজই ছিল না যাহাতে স্বামী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত না থাকিতেন।

একুশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণপদ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন তাহার বিবাহ দিবার জন্য আমি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

(১)

একুশ বৎসর বয়সে আমাদের নিজ গ্রামের নিজ কলেজ হইতে ইংরেজী সাহিত্যে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনার্স লইয়া বি. এ, পাশ করিলাম। এই বার আমার বিবাহ দিবার জন্য মাতাঠাকুরাণী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নব্যতন্ত্রের যুবকদিগের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করিতাম যে বাল্যবিবাহ অনিষ্টকর এবং উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া কাহারও বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এসব নিয়ম খাটানো শক্ত। আমার বয়স বাইশ বৎসর হইতে চলিয়াছে। এখন আমাকে বালক বলা যায় না। আমার পিতার জমিদারী প্রভৃতির বার্ষিক আয় পনের লক্ষ টাকারও অধিক। আমাকে জীবিকা

নির্ব্বাহের চেষ্টায় ফিরিতে হইবে না। বি, এ, পাশ করিয়াছি, সুতরাং বিবাহ করিতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? আমার ইচ্ছা ছিল যে কলেজের পড়া শেষ করিয়া বিবাহ করিব। দুই একজন সহাধ্যায়ীর দ্বারা এ সম্বন্ধে আমার মত মাতাঠাকুরাণীকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে যখন জানিতে পারিলাম যে পিতাঠাকুরও শীঘ্র আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, তখন নিরুপায় হইয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

(২)

আমাদের সমাজে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হওয়া না হওয়ার কোন অর্থ নাই। পিতা মাতা বা অন্য অভিভাবকবর্গ যে পাত্রী স্থির করিবেন, তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে। আমাদের সমাজে সাধারণতঃ এই নিয়ম। আজকাল দুই এক স্থলে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটিতেছে এমন নহে। আমার পিতামাতা আমার চক্ষে দেবতাতুল্য। তাঁহারা আমার জন্য যে পাত্রী স্থির করিবেন তাহা যে আমার মনের মত হইবে না, একথা কল্পনা করিতেও আমার মনে কষ্ট হয়। তথাপি যেন মনে হইতেছে যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটু কি রহিয়া গেল। মনে হইতেছে যে পিতা মাতা অবশ্যই আমার জন্য উপযুক্ত পাত্রী অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন; কিন্তু অতি নিকটে কি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে? তাঁহারা দূর দূরান্তেই লোক পাঠাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের সাম্নেই যে একটী পাত্রী রহিয়াছে তাহা কি তাঁহারা দেখিবেন না? আমাদের কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা মালবিকাকে কি তাঁহারা দেখেন নাই? দেখিবেন না কেন, মালবিকা ত ইতিপূর্ব্বে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিত। এখন তাহার বয়স তের বৎসর হইয়াছে বলিয়া কিছু দিন হইতে সে আর বড় একটা বাড়ীর বাহির হয় না। শুনিয়াছি পরেশবাবুরা আমাদের পাল্টী ঘর। এরূপ অবস্থায় মালবিকার সহিত আমার বিবাহের কি আপত্তি উঠিতে পারে? মালবিকা আমার চক্ষে পরমা সুন্দরী। যদি আমাকে তাহার রূপ বর্ণনা করিতে বল তাহা হইলে কালিদাস আবৃত্তি করিয়া বলিব, "স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।" তাহার গুণের কথা যদি বল তাহা হইলে সে সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই অত্যন্ত আশাপ্রদ। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী এই তিন ভাষায় মালবিকার অধিকার আছে। সে গৃহকর্ম্মে নিপুণা। তাহার ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি স্নেহশীলা, গুরুজনে ভক্তিমতী, পরদুঃখে কাতরা। এহেন রূপবতী ও গুণবতী মালবিকা কি আমার পিতামাতার পুত্রবধূ হইবার যোগ্য নহে? এক আপত্তি হইতে পারে যে পরেশ বাবু ঐশ্বর্য্যে আমার পিতার সমকক্ষ নহেন। তিনি আমার পিতার কলেজের অধ্যাপক। অত শত ভাবিতে গেলে কুলীন ব্রাহ্মণের সামাজিক ক্রিয়া বন্ধ করিতে হয়। পরেশ বাবুতো উচ্চ শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপক, এমন অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি যাঁহারা যাত্রার দলে বেহালা বাজান কিম্বা পাচক বৃত্তি করেন, অথচ খোঁজ করিলে জানা যায় যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদের অতি নিকট সম্পর্ক। এখন করি কি? মালবিকার সহিত আমার বিবাহ না হইলে আমার মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া যাইবে।

পরেশ বাবুও যে এই এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া মালবিকার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না তাহার কারণ কতকটা অর্থাভাব ও কতকটা সুপাত্রের অভাব। আমার সহিত মালবিকার বিবাহের প্রস্তাব যদি পরেশ বাবুর নিকট কেহ করেন, তাহা হইলে কি তিনি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিবেন না? তা' বলা যায় না। কারণ পরেশ বাবু লোকটী অতি বিচিত্র চরিত্রের। তিনি লোকজনের সঙ্গে মিশেন খুব কম। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার পিতার সহিতও সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসেন না। কলেজে অধ্যাপনার পর তাঁর যে টুকু অবসর থাকে তাহার অধিকাংশ সময়ই তিনি হয় ভ্রমণ করিয়া না হয় উপনিষৎ পড়িয়া যাপন করেন। তাঁহার মর্য্যাদাজ্ঞান অতি প্রবল। শুনিয়াছি তাঁহার পিতার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। জাতির সহিত বিরোধে সে সমস্তই গিয়াছে।

তাই পরেশ বাবুকে চাকরী করিতে হইতেছে। তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি যে হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়ার ভাব প্রকাশ করিবেন, এমত মনে হয় না। বরং তিনি বলিতে পারেন যে যাঁর সহিত প্রভুকৃত্য সম্বন্ধ তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া শোভন হইবে না। তাহা হইলেই ত গিয়াছি। আচ্ছা দেখা যাউক।

(৩)

এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে হইতে আমার বন্ধু হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকল কথা বলিলাম, তাহার পরামর্শ-অনুসারে তাহার এক বিবাহিতা ভগিনী কমলার দ্বারা কৌশলক্রমে, আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট কথাটা পাড়িলাম। কমলা একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ কাকীমা, কেষ্টদাদার জন্য কত জায়গায় ত কনে দেখিবার জন্য লোক যাইতেছে. আমি বলি কি আমাদের মালবিকার সঙ্গে কেষ্টদাদার বিয়ে দিলে হয় না? আমার মা সেদিন বলছিলেন, 'যদি পরেশবাবুরা আমাদের স্বগোত্র না হইতেন তাহা হইলে হরকুমারের সঙ্গে মালবিকার বিয়ে দিতাম।' মালবিকা মেয়েটী বড় ভাল।" মাতাঠাকুরাণী কমলার কথা শুনিয়া একটু চমকিত হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা কর্ত্তাকে বলিব।"

ইহার কয়েক দিবস পরে একটী ব্রত উপলক্ষে মাতাঠাকুরাণী পরেশ বাবুর বাড়ীর মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। মালবিকার মাতা মালবিকাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। মাতাঠাকুরাণী মালবিকার মাতাকে মালবিকার বিবাহের কি হইতেছে না হইতেছে তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দুচার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মালবিকার মাতা বলিলেন, "এপর্য্যন্ত মালবিকার বিবাহের কোন সম্বন্ধ স্থির হয় নাই, এবং সে জন্য আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।"

কয়েক দিবস পরে শুনিলাম যে আগামী শ্রাবণ মাসে মালবিকার সহিত আমার বিবাহ হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইল। বিবাহে যে কি প্রকার আনন্দোৎসব হইল তাহার বর্ণনা করিয়া পুঁথি বাড়াইব না। আমাদের বর-বধূর বেশ দেখিয়া আমাদের কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক বলিলেন, "পরস্পরেণ শ্লাঘনীয়ং শোভং নচেদিদং বন্ধয়ং যোজয়িষ্যৎ। অস্মিন্দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽ ভবিষ্যৎ॥"

(৪)

বিবাহের হাঙ্গামা মিটিলে পর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এম, এ পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতার কলেজে পড়িবার ইচ্ছা পিতাঠাকুরকে জানাইলাম। আমাদের কলেজের দার্শনিক অধ্যাপক বলিলেন যে, "আমাদের কলেজে বিজ্ঞানে এম্, এ পড়াইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং কৃষ্ণপদকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। নচেৎ তাহাকে বিজ্ঞানে এম্, এ দিবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু কৃষ্ণপদ বিজ্ঞান শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় যে সে এম্, এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া গণিত ও বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিতে পারিবে; বৃত্তির টাকার কথা ভাবিতেছি না। ভাবিতেছি যে বিজ্ঞান শাস্ত্র অভিলাষানুরূপ আলোচনা করিতে না পাইলে সে বিষয়ে কৃষ্ণপদর যে এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইবে।"

আমার কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল। আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে মাতাঠাকুরাণী এখন আর তেমন আপত্তি করিলেন না। তাঁহার পুত্রবধূ এখন তাঁহার স্নেহে ভাগ বসাইয়াছে।

(৫)

কলিকাতায় আমাদের একটী প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে উপযুক্ত লোকজনসহ বাস করিতে লাগিলাম। হরকুমার এবং আমাদের গ্রামের আরও কয়েকজন ছাত্র সেই বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় এম্,এ পড়িতে লাগিলেন। হরকুমার গণিতে এম্, এ দিবে স্থির হইল। মালবিকাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া বন্ধুমহলে আমি অগ্নিমিত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইলাম।

কলিকাতায় গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার পাণ্ডারূপে খ্যাতিলাভ

করিলাম। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার সভাসমিতিতে গিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করা আমাদের বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। বড় লোকের ছেলে বলিয়া অনেকেই আমাকে কায়েন পাকড়াইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল যে এবড় কঠিন ঠাঁই, সুতরাং সরিয়া পড়িল। আমরা যে কয়েকটীতে কলিকাতার বাড়ীতে থাকিতাম নিজেদের মধ্যেই নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতাম। বাহিরের কোন লোকের সহিত আমরা তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতাম না। আমাদের কলিকাতার বাসা-বাড়ীর সকল ছাত্রই মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করিত।

(৬)

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা সেই সময়ে বৎসরে দুইবার করিয়া কোন কোন ভাল নাটকের অভিনয় করিতেন। আমরা কয়েকজনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতাম। ছাত্রদের সেই অভিনয় করা দেখিয়া আমার ঝোঁক উঠিল যে সেইবার শারদীয়া পূজার সময় আমাদের গ্রামে থিয়েটার করিতে হইবে। মামুলি যাত্রা ও হইবেই। আমাদের কলিকাতার বাসার আর সকল ছাত্রেরাও আমার এই প্রস্তাবে নাচিয়া উঠিল। আমাদের গ্রামের কলেজের একজন নবীন অধ্যাপককে দিয়া কথাটা পিতাঠাকুরের নিকট পাঠান হইল। তিনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। গম্ভীরপ্রকৃতির পরেশবাবুও ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তখন রঙ্গভূমি নির্ম্মাণের ধুম পড়িয়া গেল।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে কলেজাদি বন্ধ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে আমাদের ঘাড়ে থিয়েটার করিবার বাতিক চাপিয়াছিল। এই দুই মাসের মধ্যেই অভিনয়ের উপযোগী রঙ্গভূমি, দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যোগাড় করা হইল। এই সকল ব্যাপারে টাকারই শ্রাদ্ধ হয়। পিতাঠাকুর টাকা ব্যয় করিতে কৃপণতা করিলেন না। স্থির হইল যে দুই রাত্রি অভিনয় হইবে। প্রথম রাত্রিতে সংস্কৃত ভাষায় শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইবে। দ্বিতীয় রাত্রিতে সেই শকুন্তলা নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অভিনীত হইবে। সংস্কৃত শকুন্তলার অভিনয়ে আমাদের গ্রামের চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরাই অধিকাংশ ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, আমরা কলিকাতা-প্রবাসী কয়েকজন অপ্রধান কয়েকটী ভূমিকা লইলাম। বাঙ্গালা-শকুন্তলার অভিনয়ে কলেজের ছাত্রেরাই অধিকাংশ ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। দুই রাত্রি অভিনয় হইল। এই ব্যাপার সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমরা কয়েকজনে কয়েক দিবস ধরিয়া কিরূপ উৎসাহের সহিত যে পরিশ্রম করিলাম, তাহা বলিবার নহে। মার্শাল অধ্যাপক মহাশয় অভিনয় ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইলেন এবং দুই রাত্রির অভিনয়ই আগা গোড়া দেখিলেন। এই দুই রাত্রির অভিনয়েই আমি সাজিয়াছিলাম দুর্ব্বাসা এবং হরকুমার সাজিয়াছিলেন শার্ঙ্গরব। এই দুই রাত্রির অভিনয় দেখিবার জন্য আশাতীত লোকসমাগম হইয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের অভিনয় সাধারণ লোকে যে বড় একটা বুঝিয়াছিল এমন মনে হয় না, তথাপি তাহারা আগা গোড়া অভিনয় দেখিয়াছিল। বাঙ্গলা শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দের কি আনন্দ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। মহিলাদিগের দেখিবার জন্যও উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। আমাদের অভিনয়-নৈপুণ্যে সকলই হইয়া এবং ইহাতে সকলেই তৃপ্ত হইতেছে দেখিয়া, পিতাঠাকুর মহাশয় প্রতিবৎসর এইরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিলেন।

(৭)

যথা সময়ে এম্, এ পরীক্ষা দিলাম। হরকুমার, আমাদের কলিকাতার বাসার আরও তিন জন ও আমি, আমরা এই পাঁচ জনে এম্, এ পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল যে হরকুমার গণিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। আমাদের বাসার আর তিন জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয় বিভাগে একজন ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিতীয় বিভাগে এবং আর একজন মনোবিজ্ঞানে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যেমন করিয়াই হউক আমাদের কলিকাতার বাসার

পাঁচজন এম্ এ, পরীক্ষার্থীর সকলেই যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ইহাই আমাদের পরম আনন্দের কারণ হইল।

কনভোকেশনের সময় ভাইসচেন্সেলার মহাশয় হরকুমার ও আমার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া আমাদের দুই জনের নিজ নিজ পরিগৃহীত বিষয়ের ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করিয়া আমাদের অশেষ প্রশংসাবাদ করিলেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের গ্রামের কলেজের অধ্যাপকগণের এবং বিশেষ ভাবে আমার পিতার প্রশংসা করিলেন।

অতঃপর গণিত ও বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য হরকুমারের ও আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল।

(৮)

পিতাঠাকুর মহাশয় ও আমাদের গ্রামের কলেজের অধ্যাপকগণ আমাদের পূর্ব্ব সংকল্পের কথা শুনিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন; কিন্তু পিতাঠাকুর বলিলেন যে "এখন তোমরা কয়েক মাস বিশ্রাম কর। নচেৎ অনবরত কঠিন মানসিক পরিশ্রমে তোমাদের স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে। যে কয়েক মাস বিশ্রাম করিবে সে সময়টা বাড়ীতে বসিয়া না থাকিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া কাটাইলে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে শিক্ষালাভও হইবে। আমারও কিছুদিন হইতে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা হইয়াছে। আমি অতি শীঘ্রই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইব। সেই সঙ্গে তোমরাও চল।" এইরূপ প্রস্তাবে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। হরকুমার ও আমি তো হাতে আকাশের চাঁদ পাইলাম।

পিতাঠাকুর মহাশয় তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবার আয়োজন করিলেন: সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। আমার মাতাঠাকুরাণী, আমার স্ত্রী, আমার এক গ্রাম সম্পর্কীয়া পিসী, হরকুমারের এক পিসী, হরকুমারের পিতা, আমাদের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামকমল বিদ্যালঙ্কার হরকুমার, আমাদের আর একজন সহাধ্যায়ী প্রমথনাথ, আমি, একজন ডাক্তার, একজন কবিরাজ, কয়েকজন পাচক, কয়েকজন ভৃত্য, কয়েকজন দাসী এই সকলকে সঙ্গে লইয়া পিতাঠাকুর তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। আমরা যেন একটী ক্ষুদ্র পলটন চলিলাম।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া আমরা ভারতবর্ষের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিলাম। এ সময় আমাদের অতিশয় আনন্দে কাটিল। ইহাতে আমাদের শরীর ও মনের আশাতীত উন্নতি হইল। তাহার পর হরকুমার ও আমি, আমরা দুই জনে কলিকাতায় থাকিয়া গণিত ও বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। অধিকাংশ সময়েই কলিকাতায় থাকিতাম, মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতাম। এই সময়ে এক নূতন রেল লাইন খোলায় কলিকাতা হইতে আমাদের বাড়ী যাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছিল।

(৯)

দুই বৎসর পরিশ্রমের পর আমরা দুই জনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। আমাদের সঙ্গে আরও তিনজন সেই পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল যে হরকুমার ও আমি আমরা দুই জনে সেই বৃত্তি লাভ করিয়াছি। দুই জনে বৃত্তি লাভ করিবার কারণ এই যে ইতি পূর্ব্বে এক বৎসর কোন ছাত্রই উক্ত বৃত্তিলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় সেই বৎসরের বৃত্তির টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ইহাতে আমাদের গ্রামের ও আমাদের গ্রামের কলেজের প্রশংসার সীমা রহিল না। এই সংবাদে পিতাঠাকুর মহাশয়ের আনন্দের অবধি রহিল না। আমার বৃত্তিলব্ধ টাকা আমি আমাদের গ্রামের কলেজের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। পিতাঠাকুর আনন্দের সহিত আমার সেই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। ইহার পর আমাদের গ্রামের কলেজে ইংরেজী, গণিত, দর্শন, ইতিহাস ও রসায়নে এম্, এ, পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। সে জন্য পিতাঠাকুর অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেন।

এই সময় পিতাঠাকুর আমাদের গ্রামে একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও একটি বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিলেন। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বেতনে কয়েক জন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এবং সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে বিজ্ঞানাগারে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে পারেন তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা

হইল। বিজ্ঞানাগারের অধ্যাপকদিগের মধ্যে একজন প্রাচীন ভারতের রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণার ভার লইলেন।

(১০)

এই সময়ে হরকুমার ও আমার মনে হইল যে আমাদের দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত টেক্‌নিক্যাল (Technical) শিক্ষার বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কলের জিনিষে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই কলে হইতেছে। অথচ সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কলের আমাদের দেশে একান্ত অভাব। কলের কাপড়ে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, দেশের তাঁতিরা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। কলের কাপড়ওয়ালাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া দেশের তাঁতিরা তাঁত ছাড়িয়া কেহবা হাল ধরিয়াছে, কেহবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সামান্য দিয়াশলাই পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসিতেছে। দিয়াশলাই বিক্রয় করিয়াই ভিন্ন দেশীয় বণিকেরা অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অথচ আমাদের দেশে একটীও দিয়াশলায়ের কারখানা নাই। সাবান, পুষ্পসার প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যে বিদেশ হইতে প্রতিবৎসর এদেশে কত আসিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এলোপ্যাথী ঔষধই যে এদেশে প্রতিবৎসর কত টাকার আইসে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অথচ অধিকাংশ স্থলেই এই সকল দ্রব্যের উপকরণ আমাদের দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। দেখিতে দেখিতে আমাদের দেশ রেলে ছাইয়া গেল। এই রেলের জন্য প্রতিবৎসর কত টাকার যে লৌহের জিনিষ আমাদের দেশে আমদানী হয় তাহার সীমা নাই। শীঘ্র এই সকল বিষয়ের প্রতিকার না করিলে দেশের লোক ক্রমশঃই নিঃস্ব হইয়া যাইবে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত টেকনিক্যাল স্কুলাদি স্থাপন এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানাদির প্রতিষ্ঠা। নচেৎ দেশের লোক উত্তরোত্তর "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাভরে জীর্ণ এবং অশনে ক্ষীণতনু" হইতে থাকিবে।

আমরা দেখিলাম কয়েক বৎসর হইতে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের প্রতিকারের জন্য নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া এজন্য গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া ও কংগ্রেস সভা-মঞ্চে বক্তৃতা করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেছেন। আমরা সংকল্প করিলাম যে এই বিষয়ের প্রতিকার কল্পে কাঁদা আওয়াজ না করিয়া যাহাতে প্রকৃত কাজ হয় তাহাই করিব।

আমাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য, হরকুমার, আমি ও আরও কয়েক জন বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া সেই সকল দেশের বিজ্ঞানের আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল।

এই বিষয় কয়েক দিন চিন্তা করিবার পর আমরা দুই জনে এক দিন পিতাঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার পাঠাগারে নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহার নিকট আমাদের সংকল্পের কথা অকপটে খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আগামী রবিবারে অপরাহ্নে তোমরা এইখানে আসিও। সেই সময় পরেশ বাবু ও রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এখানে উপস্থিত থাকিবেন। সেই সময় তোমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া যাহা সমীচীন বিবেচিত হইবে, তদনুসারে কার্য্য করা হইবে।"

(১১)

এই কয় দিবস আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত কাটাইলাম। তাহার পর, নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা দুই জনে পিতার পাঠাগারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পিতাঠাকুর, পরেশ বাবু ও রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তৎপূর্ব্বেই আসিয়াছেন। আমাদের সংকল্পের বিষয় পিতাঠাকুর মহাশয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত কল কারখানা স্থাপিত হইলে আবশ্যকীয় অনেক দ্রব্য সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার একটী কুফল এই হয় যে ইহার দ্বারা বহু লোককে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে হয়।

পাশ্চাত্য দেশে ইহা একটী মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের সমূহ ক্ষতি। কৃষ্ণপদ প্রভৃতি যে উদ্দেশে বিলাত যাইতে চাহিতেছে আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই তাহারা বিলাত গেলে তাহাদিগের সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। সেই আশঙ্কা কিসে নিবারিত হইতে পারে; উহারা যে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজচ্যুত হইয়া থাকিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। বিদ্যাসংকার মহাশয় কি বলেন? বিদ্যাসংকার মহাশয় বলিলেন, বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাতায়াতে আমার আপত্তি নাই। বিলাত গেলে আমাদের বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু যদি কোন হিন্দু বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দুসমাজে পুনরায় গৃহীত হইতে পারেন; আমার মত এই, অবশ্য অনেক পণ্ডিত আমার এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে অনেক গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। এমত অবস্থায় বিলাতগমনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেন হইবে না তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

আমি অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষিত-হিন্দু বিলাতযাওয়ার দরুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে শুনিলে খড়্গ-হস্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, "বিলাত গিয়া আমরা কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমরা নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিব না।" আবার যদি বা কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠেন, তাহা হইলে তিনি মনে করেন যে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি অসামান্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ তাঁহার মত ব্যক্তিকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এবং তিনিও প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরও সকল বিষয়ে বিজাতীয় আচার অবলম্বন করিয়া স্বদেশীয় সামাজিক আচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বিন্দু বোধ করেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সমাজশক্তির নিকট ব্যক্তিগত শক্তি কিছুই নয়। হয় সমাজকে ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় সমাজের বিধান মানিতে হইবে। সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সমাজসংস্কার করিতে পারা যায় না। এখনকার ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিরা সকল বিষয়েই ইংরেজদের দোহাই যেন বলিয়া আমাকে ইংরেজদের একটা সামাজিক নিয়মের উল্লেখ করিতে হইল। অনেকেই জানেন যে ইংলণ্ডে মৃতদার প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান তাঁহার মৃতা স্ত্রীর ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারেন না।* আমাদের চক্ষে এই নিষেধ বিধি অত্যন্ত হাস্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের লোকেরা বহু চেষ্টাতেও এই নিয়ম রহিত করিতে পারিতেছেন না। যাহারা এই নিয়মের অযৌক্তিকতা বুঝিতেছেন তাঁহারাও এই নিয়ম মানিতে বাধ্য হইতেছেন। সেই জন্যই বলিতেছি যে যতদিন কোন সামাজিক নিয়ম প্রবল থাকিবে ততদিন তাহা মানিতেই হইবে, তাহা যতই কেন অসঙ্গত হউক না কেন? তবে ঐ নিয়ম রহিত করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া সামাজিক বিধি সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিলে সমাজদ্রোহিতা করা হয় এবং তাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস এই যে যদি কেহ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেশীয় আচার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি সমাজে চলিয়া যাইবেন।

সেই জন্য, কৃষ্ণপদ, হরকুমার প্রভৃতি যে বিদ্যালাভের জন্য বিলাত যাইতে চাহিতেছে আমি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। তবে এসম্বন্ধে আমার একটী বক্তব্য আছে। যাহারা বিলাত যাইতেছে, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া যাইতে হইবে। প্রতিজ্ঞা এইরূপ:— বিলাতে গিয়া তাহারা যথাসম্ভব দেশীয় ভাবে থাকিবে। হিন্দুর অখাদ্য আহার করিবে না, সর্ব্বদা দেশের হিতচিন্তা তাহাদের হৃদয়ে জাগ্রত

* কয়েক বৎসর হইল এই নিয়ম রহিত হইয়াছে।

থাকিবে। বৃহস্পতিপুত্র কচ যেমন সঞ্জীবনী বিদ্যা-লাভের জন্য স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্যে বাস করিয়াছিলেন, তেমনি তাহারাও মনে করিবে যে তাহারা বিলাত হইতে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়াই বিলাত যাইতেছে। বিলাতে অবস্থান কালে প্রতিদিন ধর্ম-গ্রন্থ পাঠ করিবে এবং মাতৃভাষার আলোচনা করিবে। এখানে যে সকল পত্রাদি লিখিবে তাহা বাংলা ভাষায় লিখিবে। বিলাতের লোকদিগকে তাহারা কিছুতেই বুঝিতে দিবে না যে তাহারা সকল বিষয়ে বিলাতের লোকদিগের অন্ধ অনুকরণে ব্যগ্র। তাহারা সর্ব্বদা মনে রাখিবে তাহারা সেই দেশে জন্মিয়াছে যে দেশ রামলক্ষ্মণ, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদির জন্মে পবিত্র। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং অতঃপর চালচলনে কোন প্রকার বিলাতী ভাবের পরিচয় দিবে না। বিলাতগমন-প্রয়াসীদের মধ্যে যদি এপর্য্যন্ত তাহারও বিবাহ না হইয়া থাকে তাহা হইলে বিলাত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। পিতাঠাকুর মহাশয় ও পরেশবাবু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কথার সমর্থন করিলেন। আমরাও বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে চলিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলাম। আমাদের বিলাত যাওয়া স্থির হইল।

আমাদের বিলাত যাত্রার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। স্থির হইল যে আমাদের সঙ্গে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, এবং দুইজন ভোজপুরী ভৃত্য যাইবে। এই দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ ও ভোজপুরী ভৃত্যের আমাদের সহিত বিলাতে যাইতে সম্মত হইবার কারণ এইরূপ হইতে পারে যে তাহাদের আপনার বলিতে সংসারে কেহ ছিল না এবং আমাদের নিকট বিলাতের নানা প্রকার গল্প শুনিয়া বোধ হয় তাহাদেরও সেই দেশ দেখিবার সাধ হইয়াছিল যে দেশের লোকদিগের বর্ণ দুধের-শুভ্র এবং যাহারা সকল বিষয়েই এখন আমাদের দেশে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে।

আমরা বিলাতে গিয়া যে কি ভাবে থাকিব, পরেশ বাবু তাহার একটা কর্দ্দম করিয়া দিলেন।

আমরা পাঁচজন বিলাত যাইব স্থির হইল। সেই পাঁচজন হইতেছেন :—সৈলেন্দ্র কুমার গুহোটী, বিনয়চন্দ্র বসু, রমানাথ সেনগুপ্ত, হরকুমার ও আমি। আমরা এই পাঁচজনই আমাদের গ্রামের কলেজের ছাত্র। হরকুমার ও আমি গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিব। বিনয় ব্যারীষ্টারী পড়িবেন এবং সিবিলসার্ভিস-পরীক্ষা দিবেন। পাশ করিতে পারেন উত্তম, না পারেন ক্ষতি নাই। সৈলেন্দ্রকুমার এমজিনিয়ারীং পড়িবেন। রমানাথ আমাদের গ্রামের কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দুই বৎসর যাবৎ পড়িতেছিল। সে বিলাতে গিয়া ডাক্তারী পড়িবে—আই, এম্, এস্ হইবার চেষ্টা করিবে। বিলাত গিয়া সে রসায়ন শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিবে। তাহারা বংশানুক্রমিক চিকিৎসাব্যবসায়ী। সে বিলাত হইতে আসিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের আলোচনা করিবে। আমাদের এই কয়জনের বিলাত যাওয়া, সেখানে থাকা এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সমস্ত খরচ আমার পিতা বহন করিতে সম্মত হইলেন। আমরা বিলাতে গিয়া মাসিক কি পরিমাণে খরচ করিতে পারিব এবং সেখানকার কোন্ ব্যাঙ্ক হইতে যে আমরা আবশ্যক মত টাকা লইতে পারিব তাহা স্থির হইয়া গেল। আমরা বিলাত-যাত্রার উপযোগী নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। টাকার সচ্ছলতা থাকিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার নয়। আমাদের দেশেও প্রবাদই আছে যে, "টাকায় বাঘের দুধ মিলে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রাজা রামমোহন রায়।

A stranger? No; thy caste was human kind;
Thy home—whenever Freedom's beacon shone.

রামমোহন বর্ত্তমান ভারতের যুগ-প্রবর্ত্তক। তাঁহার জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম ও ধর্ম্ম বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় জীবনের শোণিত ধারায় প্রবাহিত হইয়া উহার প্রতি পেশীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

এই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য আমাদের দেশ এখনও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহার জীবন অতি জটিল ও বৈচিত্র্যময়। কোন একটা বিষয়ের তপস্যায় যদি তিনি সমস্ত জীবনকে নিয়োজিত করিতেন তবে তাঁহাকে বোঝা সহজ হইত। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের জীবনের সকল দিকেই সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রকাশের সহায় হইয়াছে বলিয়া, বর্ত্তমান যুগের সকল মহাপুরুষ অপেক্ষা তাঁহার স্থান এত উর্দ্ধে। সাধনার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এযুগে আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের বিচিত্র তপস্যাকে একই ব্যক্তির জীবনে উদ্বুদ্ধ করার প্রচণ্ড শক্তি ইঁহার জীবনে যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে আর কাহারও মধ্যে তাহা তেমন ভাবে দেখিতে পাই না। ধর্ম্ম সাধনের প্রধান লক্ষ্য যদি হয় সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন, তবে রাজা রামমোহন রায়ই বর্ত্তমান যুগের এই মহান আদর্শের শ্রেষ্ঠ উপাসক।

ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি আমাদের শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের নবীন পন্থা প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মকে লাভ করিবার জন্য তিনি সংসার ছাড়িয়া অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত পার্থিব উন্নতির কোন বিরোধ ছিল না। তিনি ধর্ম্মের সঙ্গে সংসারের বিরোধ না ঘটাইয়া সংসারকেই ব্রহ্মের মন্দির করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেইজন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, যে কোন ক্ষেত্রে মানবের কল্যাণের যোগ রহিয়াছে, রামমোহনের হৃদয়ের ধারা অপ্রতিহত বেগে সেদিকেই প্রবাহিত হইয়াছে। ব্রহ্মই ছিল তাঁর হৃদয়ের উৎস, তাহা হইতে প্রতিনিয়ত তিনি যে প্রেমধারা পান করিতেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই প্রেমের ধারাতে মানবের কর্ম্মের ক্ষেত্রকে তিনি অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিদের মত ব্রহ্মানুভূতির উদার ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বিশ্ববাসীকে সত্যের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। জগতের যে-কোন প্রান্তে যে-কোন জাতির মধ্যে যে-কোন সত্যের আভাস পাইয়াছেন—ব্রহ্মাবনত হৃদয়ে তিনি তাহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। তেমনই আবার স্বদেশেই হোক কি বিদেশেই হোক, স্বধর্ম্মই হোক বা পরধর্ম্মই হোক—যেখানেই অসত্যের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে নির্ভীক চিত্তে, যুক্তির অমোঘ আক্রমণে তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি পবিত্র জ্ঞানের উজ্জ্বল অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছেন।

সত্যকেই গ্রহণ করিবার জন্য একদিকে তাঁহার যেমন ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল তেমনই অন্যায় ও অসত্যকে আঘাত করিবার উপযুক্ত পৌরুষও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি হইতে তিনি সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন বলিয়া যে কোন ধর্ম্মের সত্যকে উন্মুখিত হৃদয়ে বরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা না করিয়া গতানুগতিকের ন্যায় তিনি কোন দেশের কোন শাস্ত্রকেই মানিতেন না, শাস্ত্র ও আচার-জর্জ্জরিত ভারতবর্ষে এই চিন্তার স্বাধীনতা নূতন প্রাণ আনয়ন করিয়াছে। রামমোহন রায় বর্ত্তমান ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন যে শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু, বিচারবুদ্ধি-বিবর্জ্জিত হইয়া অন্ধের মত তাহার অনুসরণ করিও না। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম—বিধান মানিয়া চলাই স্বর্গে যাওয়ার সহজ রাস্তা। সমাজের আচার এবং শাস্ত্রের বিধান এই উভয়ের নাগপাশ বন্ধনে আমাদের ব্যক্তিত্ব অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। জ্ঞানের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া রামমোহন আমাদিগকে সেই নাগপাশ হইতে

মুক্তিদান করিয়াছেন। আমরা নিজের শাস্ত্রকে নিজের আলোকচিত্র-আলোকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে শিখিয়াছি। এবং একথা বলিতে শিখা করিয়াছি—সমাজে ব্যবহার জন্য, আমার ব্যক্তিত্বের যে টুকু বন্ধন আবশ্যক ততটুকু আমি আমার নিজের আত্মবিকাশের জন্যই গড়িয়া তুলিব। বাহির হইতে পাষাণ চাপা দিয়া আমার ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট হইতে দিব না। এই মুক্তির বাণীর স্পর্শেই বহুশতাব্দীর অসাড়তার পরে ভারতের নিস্পন্দ জীবনে দিকে দিকে আশার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। যে শাস্ত্র একটি জড় পাষাণের মত আমাদের বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল সেই শাস্ত্রই আবার নবীন আলোকে নবজীবন লাভ করিয়া আমাদের নবীন সাধনার সহায় হইয়াছে। রামমোহন রায় কেবল প্রাচীনকে ভাঙ্গিবার পন্থাই অবলম্বন করেন নাই—প্রাচীনের ভিত্তির উপরে নবীনকে কি করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত আমরা তাঁহারই কাছে পাইয়াছি। প্রাচীনের প্রাণকে তিনি বহু শতাব্দী-সঞ্চিত কলুষের হস্ত হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। তিনি খুব জোরের সহিত একথা বলিয়াছেন, "আমার তর্কে বিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।"

প্রাচীনের প্রাণধারাকে কারাগারমুক্ত করিয়া তিনি অনন্তের দিকে উন্মুখীন করিয়াছেন। কঠোর তপস্যার বলে আত্মার স্বাধীনতারূপ ভাগীরথীকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়া তমাচ্ছাদিত ভারতের মরণোন্মুখ প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারই নিজের ভাষায় বলা যায়, তিনি সমগ্র ভারতকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই তন্দ্রা জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্মধামে! দুই নেত্র করি আঁধা
জানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ! সমস্ত তিমির
ভেদ করি' দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধ শির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে!"

রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গসমাজ প্রেতভূমি ছিল, তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেত মাত্র রাজত্ব করিতেছিল, তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথ শ্মশানে, সেই ভয়ের বিপক্ষে "মাভৈঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের অন্যায় ও অসত্যকে আঘাত করিতে গিয়া তিনি কেবল বিপ্লবের প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া উহার আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন করেন নাই। খৃষ্টীয় সভ্যতার প্রবল আঘাত হইতে হিন্দু সভ্যতার প্রাণ-শক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমাদের জাতীয় সভ্যতার মূল শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আলোক আমরা তাঁহার কাছে পাইয়াছি।

প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁহার যে সংঘর্ষ তাহার উদ্দেশ্য ছিল "বাহ্য অনুষ্ঠান" ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্ত সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন। যে মৃতভাবে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড় পাষাণ স্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দু ধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল সেই জড় স্তূপকে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন। তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দু ধর্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেব প্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না। কেবল মন্দিরের কাঁচা লোষ্ট্র মৃত্তিকা স্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোট, বড় নানাবিধ সরীসৃপ তথা নির্মাণ করিতেছিল, তথায় ইতস্তত,

প্রতিদিন, কণ্টকাকীর্ণ শুষ্ক সকল উদ্ভিন্ন হইয়া, সহস্র শিকড়ের দ্বারা, নূতন নূতন বন্ধনে, সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্ন মন্দির ভাঙ্গিলেন, সকলে বলিল, "তিনি হিন্দু ধর্ম্মের উপর আঘাত করিলেন।" কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তখন একদিকে হিন্দু-সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল আর একদিকে বিদেশী সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বের সহিত মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, খৃষ্ট-বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

তাই বলিতেছিলাম তিনি আমাদের জাতীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে অনেকে তাঁহার সংগ্রামপূর্ণ জীবনের কর্ম্মের দিকটাকেই একান্ত ভাবে দেখিয়া থাকেন। কর্ম্মজীবনের অন্তরালে আধ্যাত্মিক জীবনের যে গভীর প্রবাহ বহিয়াছে অনেকের নিকট তাহা ততটা পরিস্ফুট হয় না, রামমোহনের কর্ম্মজীবন তাঁহার সমসাময়িক দেশবাসীর তুলনায় অতি উন্নত ছিল, জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধিতে তিনি তাঁহার সমসাময়িক সুধী বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনকে বাদ দিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের অসাধারণ সৃজন লীলাকে অবলোকন করা প্রাণকে অস্বীকার করিয়া প্রাণী মাত্রের জীবনলীলার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানের ন্যায় অসার এবং অসত্য।

আমাদের দেশের কোন কোন সমালোচক রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক সাধনাকে খাট করিয়া তাঁহার জীবনকে বাহির হইতে শুধু একটি সংগ্রামের জীবন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রভের দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার History of Bengali literature নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"He appears to me rather as a warrior bound for the battle field, than as a pious religious man—the part he chose to play in life." তাঁহাকে দেখিলে ততটা ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি মনে না হইয়া বরং সমরাঙ্গন-প্রস্থিত যোদ্ধার মত মনে হয়। আমরা তাঁহার এই মন্তব্যটীর আলোচনা করিয়া দেখিব। মানুষের মধ্যে কি কি লক্ষণ দেখিলে দীনেশ বাবু তাঁহাকে pious religious man বলিবেন তাহা আমরা জানি না। তিলক, ফোঁটা, আলখেল্লা প্রভৃতি ধর্ম্মের বাহ্যিক বিজ্ঞাপন গুলি যদি মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের অত্যাবশ্যক লক্ষণ হয় তবে রাজা রামমোহন রায়ের ভিতরে তাহার প্রকাণ্ড অভাব ছিল, অথবা সংসারের কামিনী কাঞ্চনের প্রতি অবজ্ঞার সহিত বিমুখ হইয়া অধ্যাত্ম সাধনের প্রয়াসই যদি ধর্ম্ম সাধনের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলেও রামমোহন রায়ের মধ্যে সে লক্ষণের অভাব ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাত্ম সত্যের অনুসন্ধান, তাহার প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং সেই সত্যকে সমগ্র জীবনের সাধনার বিষয় করাই যদি ধর্ম্ম-জীবনের প্রধান লক্ষণ হয় তবে রামমোহন রায়ের মত ধর্ম্মসাধক অতি অল্প লোকেরই ছিল। তিনি সংসারকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে গিয়া ধর্ম্ম-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। তিনি মানব সাধারণের মধ্যে থাকিয়া মানবের মধ্যেই ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া, মানব সমাজের সেবার ভিতর দিয়াই ধর্ম্ম-সাধন করিয়াছেন। এজন্য আমরা দেখিতে পাই যেখানেই মানবের দুঃখ সেখানেই রামমোহনের প্রাণ ছুটিয়া গিয়াছে, নারীর অশ্রুমোচনের জন্য তিনি শ্মশানে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছেন, আয়র্লণ্ডের পশ্চিম প্রান্তে দরিদ্র কৃষকবর্গের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্নানাগারে প্রবেশ

করিয়া তিনি যখন দেহের উপরে সলিলধারা বর্ষণ করিতেন তখন তাহার মধ্যে জননীর স্নেহের স্পর্শ অনুভব করিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন, পথে ঘাটে চলা-ফেরার মধ্যে যখনই অবসর পাইতেন তখনই ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া হৃদয় মনকে স্নিগ্ধ সবল করিয়া লইতেন। তাঁহার হৃদয়ে জীবন্ত ব্রহ্মানুভূতি ছিল বলিয়াই জগতের যে কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মের যে কোন আলো প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বেষানলকে কেবল আঘাত করেন নাই হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত তাহাকে নবীন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই আলোকেই আমরা নূতন করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতে শিখিয়াছি, সমাজের সম-সাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার আদর্শের মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আঘাতের দ্বারা তাঁহার জীবনের সাধনাকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় সত্যের অচল প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর যাবতীয় আঘাত এবং লাঞ্ছনাকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে মস্তকে বরণ করিয়া লইয়াছেন. তিনি ইহা জানিতেন যে এই ব্যর্থতার আবরণের মধ্যেই তিনি সত্যের বীজকে রাখিয়া যাইতেছেন ; সময় আসিবে যখন তাঁহার স্বদেশ-বাসী তাঁহার সাধনার ফলের উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করিবে।

তিনি খৃষ্টীয় শাস্ত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন সেই সম্প্রদায়ের অন্ধ সংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা গুলিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মকে নবীন গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া প্রেমের উদার পথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইলেন, তখন বাংলা দেশের মিশনারী-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি নীচ ব্যবহার করিয়াছিল. এবং কলিকাতার লর্ড বিশপ মান সম্ভ্রমের বিচিত্র লোভে প্রলোভিত করিয়া তাঁহাকে সত্যের পথ হইতে স্খলিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মানুভূতির আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া, তমসাচ্ছন্ন নিচ্ছিদ্র বন্ধুর পথে একাকী বীরের মত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভক্তের জীবন, সংগ্রামের জীবন। প্রেম সেবাতেই আপনাকে ব্যক্ত করে। সেই জন্যই যাঁহারা যথার্থ ভগবৎ ভক্তিকে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই মানবের দুঃখকে নিজের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া সমগ্র জীবন পরের জন্য সংগ্রাম করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। বাহিরে তাঁহাদের তেজপূর্ণ দেহ, পৌরুষের কঠোর বর্ম্মে আবৃত। কিন্তু তাহাদের অন্তরে ফল্গুর বারিধারার ন্যায় অতলস্পর্শী প্রেম চির প্রবাহিত। রামমোহন রায়ের বাহিরের কর্ম্ম-কঠোর পৌরুষের পশ্চাতে কোমল প্রেমধারা নিত্য প্রবাহিত হইত। মৃত্যুর সময়ে যাঁহারা তাঁহার কাছে ছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই একথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। দীনেশবাবু, রামমোহনের সমগ্র কর্ম্মের উৎস যেখানে সেখানে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতেই তাঁহাকে শুধু কর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি রামমোহনের সঙ্গীতগুলির মধ্যে যে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনের দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই দীনেশবাবু সেগুলির প্রতিও সুবিচার করিতে পারেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন—

The combative element is found ever in the hymns of God. He (Raja) could not forget the fighting and controversial spirit even when he was addressing praises to Diety." অর্থাৎ রামমোহনের দৈনিক আধ্যাত্মিক সাধনের সঙ্গীত গুলিতেও তিনি কেবল সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বিভীষিকা দেখিয়াছেন। শতাধিক সঙ্গীতের মধ্যে বাছিয়া একটি সঙ্গীত তিনি বাহির করিয়াছেন এবং সেইটিকে লক্ষ্য করিয়া দীনেশ বাবু বলিয়াছেন যে ভগবৎ উপাসনার সময়ও রামমোহন তাঁর লড়াইয়ের spirit ভুলিতে পারিতেন না। গানটি এই :—

মন একি ভ্রান্তি তোমার !
আবাহনে বিসর্জ্জন কর তুমি কার !
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত,
যে চালায় অবিরত
তারে ভোলাইতে কত করহ যতন। ইত্যাদি।

এই একটি সঙ্গীতকে লক্ষ্য করিয়াই দীনেশ বাবু

প্রকারান্তরে রামমোহন রায়ের আধ্যাত্মিক জীবনকে ধর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রামমোহনের যে সকল সঙ্গীতের মধ্যে তাঁহার অতল গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, তাহার একটিকেও উদ্ধৃত করার কোন আবশ্যকতা দীনেশ বাবু অনুভব করেন নাই। নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

ভুলনা বিষাদ কাল,
পাতিয়াছে কর্ম্মজাল
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ

(২)

এত ভ্রান্তি কেন মন
দেখ আপন অন্তরে
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসী সর্ব্বান্তরে।

(৩)

ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁরে

(৪)

ভয় করিলে যারে, না থাকে অন্যের ভয়,
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়
তুমি ভুল তারে এত ভাল নয়।

(৫)

অচিন্ত্য রচন যিনি যে করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়া মন, বারেক তারে ভাব না।

উপাসনা সঙ্গীতগুলির মধ্যে কোথাও লড়াইয়ের ভাব রহিয়াছে কি?

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।"

কবিত্বের খাতিরে রামমোহন এ সঙ্গীত রচনা করেন নাই, স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁহার জীবনযাত্রার মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা এ কথার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে রামমোহন স্বদেশে যাঁহার তপস্যার জীবনের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বিদেশে অবস্থান কালে অন্ত আন্তির জীবন সংগ্রামের মধ্যেও তাঁহারি প্রেমলীলা অনুভব করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন:—

"আমি হই আমি করি ত্যজ ঐ অভিমান" ইত্যাদি।

এই সঙ্গীত তাঁহার জীবনের সাধনার কথা প্রকাশ করিতেছে। যাঁহারা তাঁহার জীবনী তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে বিপুল কর্ম্মের চকল সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার সাধনাপরায়ণ স্থির মূর্ত্তি, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আত্মাভিমান বা আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, রামমোহনের সঙ্গীতে "আমি হই আমি করি ত্যজ ঐ অভিমান" একথা শুধু কেবল ভাবের উদ্বেলতা অথবা ভাষার উচ্ছ্বাস নহে, ইহা তাঁহার অন্তরের অনুভূত সত্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দীনেশ বাবু রামমোহনের এই অমৃতময়ী সঙ্গীতগুলিকে তাঁহার সমালোচনায় উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামমোহন রায় বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের কল্যাণ কল্পে কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন একথা আমি অস্বীকার করিতে চাই না, কিন্তু দীনেশ বাবু তাঁহাকে যে কেবল মাত্র লড়াইয়ের বীর রূপে দেখিয়া তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতাকে খাটো করিয়া প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, এসম্বন্ধে অধিক তর্কবিতর্ক না করিয়া মোক্ষমূলারের ভাষায় দীনেশ বাবুকে বলিতে ইচ্ছা হয়—"But why should you grudge their greatness and their fame to those whom the world likes to honour?" Dr: Booth নামক একজন আমেরিকান তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছেন, "I have studied his (Raja's) writings with a subdued feeling since his death, and risen from their perusal with a more confirmed conviction of his having been unequalled in past and present time.

Presbyterian congregationএর অধিবেশনে Rev. Porter বলিয়াছিলেন, "He was the most extraordinary man whom the world has

witnessed for centuries. এই মহাপুরুষের মৃত্যুর পরে বিলাতের Finsbury Chapelএ Rev. Fox তাঁহার উপাসনায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "His presence has passed away as a poietic image fades from the brain and "being dead, he yet speaketh" with a voice not only India but Europe & America will listen for generations. মৃত্যুর পরেও তাঁহার বাণী জাগ্রত রহিয়াছে এবং বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত, কেবল ভারতবর্ষ নহে Europe এবং Americaর কর্ণেও সেই বাণী ধ্বনিত হইতে থাকিবে। আর একজন ভক্ত ইংরেজ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্বীকার করিয়াছেন যে The name of Rammohan Roy will endure as long as the history of the religious truth. যে সকল বিদেশী মৃত্যুকালীন রাজার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা শিশুর ন্যায় রোদন করিয়াছেন। তিনি কেবল তার্কিক ছিলেন না। অসাধারণ প্রেমিক ছিলেন এবং সেই প্রেমের বলেই তিনি বিদেশীয় বন্ধুবর্গেরও হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। ব্রিষ্টলের রাস্তার দরিদ্র বালকেরাও তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত।

আমাদের জাতীয় মন্দিরের এমন প্রকোষ্ঠ নাই যাহার ভিত্তিমূলের স্তরে তাঁহার সুনিপুণ হস্তের কারিগরি নাই। তিনিই সাহিত্যের জন্মদাতা। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Literature of Bengal পুস্তকে রামমোহনকে Father of Bengali literature বলিয়াছেন।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকগণ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা সকলেই রামমোহন রায়ের ইঙ্গিত পথে তাঁহাদের সকল প্রয়াসকে চালনা করিতেছেন। তিনি সার্ব্বজনীনতার মুক্ত উদার আকাশে বিচরণ করিয়াও তাঁহার স্বদেশবাসীকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and
home."

তিনি সর্ব্বদা সকল মানবের কল্যাণকে অন্তরে পোষণ করিতেন। তাই বলিয়া নিজের দেশের দরিদ্র প্রতিবেশীদের দুঃখ, দৈন্য তিনি ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। বিলাতে ১৮৩১ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভার সম্মুখে ভারতের প্রজাবর্গের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক উক্তিতে ভারতের দরিদ্র প্রজা ও জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তিশালী জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অত্যাচারে প্রজাসাধারণ যেখানে নিষ্পীড়িত হইতেছিল, সেখানেই তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সম্যক আলোচনা করিয়া তিনি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কামনা করিয়াছেন। পৃথিবীর নানা ধর্ম্মের অনীষ শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিতে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ক্ষণকালের জন্য ভারতের পল্লীনিবাসী দরিদ্র চাষাভূষার কঠোর জীবন সংগ্রামের প্রত্যেক ছোট খাট বিষয় চিন্তা করিতেও বিরত হন নাই। তিনি তাহাদের মধ্যে পঞ্চায়তের প্রথা স্থাপন করিয়া তাহাদের সুবিচার কামনা করিয়াছেন। প্রবলের অত্যাচার হইতে তাহারা যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহার জন্য অনুকূল বিধানের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাই জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান উপায় ইহা অনুভব করিয়া ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগপ্রবর্ত্তনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। শত বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষায় ও মনুষ্যত্বে, চরিত্র ও ধর্ম্মবলে এই বঙ্গদেশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই সময়েও রামমোহন রায় আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দিহান হন নাই। আমাদের ভারতীয় প্রজা বৃন্দের উন্নতি সম্বন্ধে যখন ইংলণ্ডে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখন তিনি তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, "They have the same capability of improve-

ment as any other civilised people" সেই দিন Royal Commission এর সাক্ষ্য দিতে যাইয়া অনেক নেতৃস্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তি আমাদের স্বদেশের পক্ষে উচ্চ রাজপদ গ্রহণের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন—"It will not be very difficult I think, with proper management to find qualified persons amongst the natives for any duty that may be assigned to them."

ধর্ম্ম জীবনে ভারতীয় শাস্ত্রে যাহা কিছু সত্য তাহার প্রতি রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এবং সেই সকল সত্যের বাণীকে জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার জন্য তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন।

একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন —"He (The Raja) asserts that he has found nothing in European books equal to the scolastic philosophy of the Hindus. হিন্দুদিগের পাণ্ডিত্য-পরিপূর্ণ দর্শন শাস্ত্রের সমকক্ষ অন্য কোন পুস্তক তিনি ইউরোপে দেখেন নাই। হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শনের উপরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যাহা কিছু সত্য তাহাকে স্বীকার করিতে কখনও তিনি অনুদারতা প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু নিজের জাতীয় ধর্ম্মের উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, অনায়াসে জগতের সকল ধর্ম্মের সার সত্যকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের দিক দিয়া তাঁহার স্বধর্ম্ম প্রীতির সঙ্গে যেমন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের কোনও বিরোধ ছিল না তেমনি তাঁহার জীবনে স্বাদেশিকতার সঙ্গে সার্ব্বজনীনতার কোন বিরোধ ছিল না। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার সঙ্গে একটা উগ্র স্বার্থপরতা রহিয়াছে। তাহা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা হইতেও ভীষণ। দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া, প্রতিবেশী মানব সমাজকে লুণ্ঠন করিয়া, নিজের জাতাভিমানকে স্ফীত করিয়া তোলাই হইতেছে তাহার পরিণতি। ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বদেশকে একান্ত করিয়া দেখার ফলেই পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, প্রতিবেশীর স্বাভাবিক অধিকার লুণ্ঠন করিয়া নিজের পরিবারে ভোগকে স্ফীত করিয়া তোলা যেমন অধর্ম্ম এবং অকল্যাণকর ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, প্রতিবেশী জাতিসমূহকে বঞ্চিত করিয়া, নিজেদের জাতীয় শক্তিকে স্ফীত করিয়া তোলা তেমনি অধর্ম্ম এবং অকল্যাণকর, ভারতবর্ষের উপর এই স্বাদেশিকতা ও সার্ব্বজনীনতার সামঞ্জস্যের ভার পড়িয়াছে। রাজা রামমোহন রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন জাতি প্রবলের পাশবিক শক্তিতে নিপীড়িত হইয়াছে, রাজা রামমোহন তাহাদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন, নেপল্‌স স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া যখন যুদ্ধে পরাজিত হইল রামমোহন তখন মনোবেদনায় শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। দুর্ব্বল নেপল্‌স প্রবলের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না বলিয়াই তিনি এত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সার্ব্বজনীনতার অর্থ এই ছিল, জগতের প্রত্যেক জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের যাহা অনুকূল তাহাকেই শ্রদ্ধা করিতে এবং ভালবাসিতে হইবে। তাহার সর্ব্বাঙ্গীন আত্মবিকাশের প্রতিকূল যে কোন বিধান, তাহা ধর্ম্মেই হৌক, সমাজেই হৌক, অথবা রাষ্ট্রেই হৌক তাহার সংস্কার সাধন করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে সংস্কারের কণ্টকময় পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে কোন আঘাতকে বীরের মত ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, বাহিরের সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মনকে মুক্ত রাখিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি সমাজের সংস্কার কামনা করিতেন এবং রাষ্ট্রীয় বিধান ও সমাজ বিধান এই উভয়ের মিলিত শক্তি দ্বারা জাতীয় সমাজের উন্নতি ও অবনতি নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কারের প্রয়াসী ছিলেন।

আমরা যেন সেই শক্তি লাভ করিতে পারি, যে শক্তিদ্বারা বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া, ভগবৎ প্রেমের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া, আমরা আমাদের এই পবিত্র জন্মভূমির সেবা করিব এবং তৎসঙ্গে জগতের সকল মানবের কল্যাণ কামনাকে অন্তরে পোষণ করিব।

জগতের প্রত্যেক জাতি যদি রামমোহনের মত এই সার্ব্বজনীন প্রেমের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া স্বদেশের সেবায় নিরত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতিই আত্ম-বিকাশের দ্বারা সমগ্র মানবসমাজকে (Humanity) মহিমান্বিত করিতে সমর্থ হইবে. প্রত্যেক জাতির যথার্থ আত্মবিকাশই সমগ্র মানব জাতির বিকাশ জাতীয় বিদ্বেষকে বর্জ্জন করিয়া, জাতীয় আত্মম্ভরিতাকে উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বমানবের বিকাশ সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না।

হে বর্ত্তমান যুগের আচার্য্য, তুমি যে মহামিলনের পথে তোমার স্বদেশকে আহ্বান করিয়াছ, সে ডাক শুনিয়া ভারতবর্ষ যেন তোমারই প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনা করিয়া তাহার জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে। যাবতীয় আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া, উন্নতির পরিপন্থী যাবতীয় মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এই পবিত্র ভারতবর্ষ যেন ধর্ম্ম মন্দিরের ন্যায় অনন্ত আকাশ তলে উন্নত মস্তকে বিধাতার বিজয় নিশান উড্ডীন করিতে পারে। ভারতবাসী তাহার স্বদেশকে যেন কালিমা মুক্ত করিয়া ব্রহ্মের মন্দির করিয়া তুলিতে পারে। হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে ভৈরব মন্দ্রে তোমার যে উদার আহ্বান প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয় দ্বারে আঘাত করিতেছে, আমরা যেন সেই ডাকে সাড়া দিতে পারি। তোমারই অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা যেন আচণ্ডাল সকলকে প্রেমের দ্বারা একতার সূত্রে গ্রথিত করিতে পারি। জড়ত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, তোমারই প্রদত্ত পতাকা হস্তে আমরা যেন জগতের যাত্রিদলের সঙ্গে তোমারই উদার সঙ্গীত গান করিতে করিতে যাত্রা করিবার যোগ্য হই।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

চয়ন

কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান

রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, বি,এল ; সি.আই.ই। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলা বর্দ্ধমানে। জন্ম ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরও বাঙ্গালীর রাজ্যশাসন ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

যে মনস্বীর মহাপ্রস্থানে বঙ্গমাতা আজ ঊনদারা, বর্দ্ধমান শোকাতুরা, কুচবিহার বিধবাপুরীতে পরিণত, সংক্ষেপে তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর স্বনামধন্য পুরুষ ; তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বজনবিদিত ; বহুবার ইংরেজী বাঙ্গলা পত্রপত্রিকায় তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিসের তিনি লোকপ্রিয় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কি মন্ত্রে তিনি কর্ম্মজীবনে সাফল্যের জয়মাল্যে ভূষিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইলেও, আজ তাহাই কেবল মনে পড়িতেছে। কার্য্যে একাগ্রতা, তাহা সুসম্পন্ন করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা, শৃঙ্খলা, কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রাণপণ চেষ্টা, তাহাতে অতুল আনন্দ অনুভব, অবসর বুঝিয়া বাবস্থা। তাঁহার মধুর স্বভাব, মিষ্টভাষণ, গুণের সমাদর, অন্যায়ের অনাদর প্রভৃতি তাঁহার প্রতি কার্য্যে প্রতিভাত। আপ্যায়ন সমাদরে, অমায়িকতা প্রকাশে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন ; সময়ের সদ্ব্যবহারে, যথাসময়ে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কার্য্যসম্পাদনে, রাজকীয় কার্য্যকলাপে, আহারে নিয়মে, তিনি ছিলেন ইংরেজের মত। প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করিতেন অতি প্রত্যূষে, ঠিক নির্দ্দিষ্ট ঘড়িয়া একই সময়ে, প্রাতঃকৃত্যেও সেই নিয়ম, ভগবানের আরাধনাতেও তাই। প্রার্থনাতেও। তৎপর লিখিতেন চিঠিপত্র, নিজের ও অন্যদরকারী। বাহিরে আসিতেন ঠিক সাতটায় ; অর্দ্ধঘণ্টা সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত আলাপ, আপ্যায়ন, এবং ব্যক্তিগত কার্য্যের কথা হইত। ৭॥ টায় সদর বৈঠকখানায় সমাগতজনের প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ শুনিয়া মিষ্ট কথায়

সকলকে তুষ্ট করিতেন; উপস্থিত ভিক্ষার্থীদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন। প্রার্থীর অভাব মোচন করিতে সর্ব্বদা তিনি সচেষ্ট থাকিলেও, সকল সময় সকলের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিতেন না, বলাবাহুল্য; কিন্তু নিরাশ ব্যক্তিকেও বলিতে শুনিয়াছি, "লোকটার মুখ কি মিষ্টি, কথা শুনলে আর কোন ক্ষোভ থাকে না।" কাহার কোথায় অসুখ, কোন্ পাঠশালা, ঠাকুরবাড়ী, অনাথআশ্রম কেমন চলিতেছে, সহরের কোনস্থানে কি হইলে সুবিধা হয়,, ইত্যাদি তথ্য ভ্রমণকালে স্বয়ং স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া সংগ্রহ করিতেন। বাসায় ফিরিতেন ঠিক সময়; স্নান করিতেন প্রতিদিন সমভাগবিশিষ্ট জলে, আহার রোজ সমওজনের তণ্ডুলের অন্ন, নিয়মিতসংখ্যক ব্যঞ্জন সহকারে। বিশ্রামের পর আদালতে যাইতেন ঘড়ির কাঁটার মত; ফিরিতেনও প্রায় এক সময়ে। বিশ্রাম, ছুক্কা বায়ুসেবন, সন্ধ্যাবন্দনা, সকল কার্য্যেই তাঁহার বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল—বিশেষ কোন কার্য্য ব্যতীত তাহার অন্যথা কখনও হয় নাই। কর্ম্মবীর মহা শোকের কালেও কর্ত্তব্যকার্য্যে নিয়মিত সম্পাদন করিয়াছেন,—কার্য্যে তিনি সংসারের সকল চিন্তা বিস্মৃত হইতেন, কর্ম্মই ছিল তাঁহার সুখ, শান্তি। রাত্রিতে রাজকার্য্য অতি অল্পই হইত। সে সময় বন্ধু-বান্ধব, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী লইয়া নানাবিষয়ের আলোচনায়, সাময়িক পত্র, ইংরাজী বাঙ্গালা মাসিক, নবপ্রকাশিত পুস্তকাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। নিজে পড়িতেন: ছেলেরা পড়িয়া শুনাইত; এজন্য একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি বিবিধ তত্ত্বের সার সঙ্কলন করিয়া সেই আসরে পাঠ করিতেন। ফলে, সভ্য জগতের জ্ঞাতব্য ঘটনা মতবাদ, সাহিত্য প্রভৃতির নিত্য তাজা সংবাদ (up-to-date information) সংগ্রহে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কোন বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকাকে তিনি অতি লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল অগ্রসর হও; নিজেকে সম্পূর্ণতা দান কর, আরব্ধ কার্য্যকে প্রাণপণ করিয়া ও সম্পূর্ণতা দিয়া অতুল আনন্দের অধিকারী হও।' এই মন্ত্রের বলেই, তিনি জীবনে অল্পবয়সে বাল্যে 'বল্লার' পাঠশালায়, কৃষ্ণনগরের কলিজিয়েট স্কুলে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; বি. এ. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। কি আইন পরীক্ষায়, কি মুন্সেফিতে, ডেপুটী গিরীতে, কুচবিহারের দেওয়ানরূপে, এই নীতিতেই তিনি সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ যখন তিনি কুচবিহারের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন উক্ত রাজ্যের অবস্থাই বা কি ছিল, আর এখন ১৯১১ সনে ৪২ বৎসরের উপর দেওয়ানী করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনই বা কুচবিহারের কি উন্নত অবস্থা, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই এই মনস্বীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যের আয় তাঁহার কালে ১৪ লক্ষের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পূর্ব্বে যেখানে ব্যাঘ্রভল্লুকের আবাসভূমি ছিল, এখন সৌন্দর্য্যে, স্বাস্থ্যে ও নানা সুবিধার জন্য তাহা উত্তর বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। দেওয়ান বাহাদুর নিজে খুঁটিয়া খুঁটিয়া যে স্থানে যেটি হইলে নগর সুসজ্জিত, সুরম্য, ও সম্পূর্ণ হয়, সেখানে সেইটির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলেজ, মোর্চ্ছি অনাথ-আশ্রম, অতিথিশালা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, হিন্দুর ধর্ম্মশালা, জেল, মন্দির, মহম্মদীয় মস্‌জিদ ইত্যাদি তাঁহারই চেষ্টার ফল,—তাঁহারই মস্তিষ্কের কীর্ত্তি। কোথাও ভেটের সাহায্যে, কোথাও বা ধনীকে উৎসাহিত করিয়া, অন্যত্র নিজ অর্থ সাহায্যে তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিকার্য্যই স্থায়ী ভাবে সম্পাদন করিবার চেষ্টা ছিল। ইহার ফলে কুচবিহাররাজ্য রাস্তাঘাটে, অট্টালিকা ইমারত প্রভৃতিতে এরূপ উন্নত। সাধারণ হিতকর কার্য্যে অধিবাসীগণ অপেক্ষা তাঁহার উৎসাহই বেশী ছিল, ধর্ম্ম-মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকল্পে সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী ভাবুক তৎপরতাপ্রদর্শনে বিমুখ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "সে কি হয়? আপনাদের একটা সাধারণ উপাসনার স্থান থাকিবে না। লাগিয়া পড়ুন, পশ্চাতে আমিই আছি।" সকল কার্য্যেই ছিল তাঁহার এইরূপ উৎসাহ-উক্তি।

কর্ম্মীপুরুষ কর্ম্মে আত্মহারা হইতেন। তাঁহার মধ্যে কবিত্বেরও অভাব ছিল না; আশ্রমাদির অবস্থান ও ব্যবস্থা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন সিভিলিয়ান হইয়া স্বদেশে ফিরিবেন, তখন দেওয়ান পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, বিলাতের চিহ্ন আমার জন্য কি আনিবে? আনিও সেই পবিত্র রেণু মহাকবি সেক্সপিয়র যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন—তাহার তুলনা আছে কি?" তাঁহার জন্মভূমি তাঁহার চক্ষে স্বর্গ ছিল, দেশের নিজ ক্ষেত্রের ধান্য তিনি ব্যবহার করিতেন, বলিতেন, "মেড়াগের তৃণগাছটিও আমার পক্ষে পবিত্র সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু!" মেড়াগে, তাঁহার স্ত্রীর স্মৃতি-মন্দির বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রেম ও পুণ্যের নিদর্শন। কালিকাদাসের হৃদয় ছিল, ক্ষমতা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্য—তিনি বিস্তৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; প্রভুরূপে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিও ছিলেন মহাপ্রাণ, নানাগুণে ভূষিত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। এহেন মুক্তহস্ত কর্ম্মবীরের সহায়তায় কালিকাদাস এরূপভাবে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রশংসা সহানুভূতির সহিত গভর্ণমেণ্টের প্রশংসা ও সি. আই, ই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহারাজা দেওয়ানকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, কালিকাদাসও প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রভু পরলোকে, প্রভু-ভক্ত অমাত্যও তাঁহার সহিত চির সুখময় রাজ্যে মিলিত হইলেন। ভগবান তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ করুন।

"দেওয়ান বাহাদুরের দুইটি কৃতী পুত্র ও তিনটি কন্যা এক্ষণে বর্ত্তমান। তাঁহাদের কর্ম্মবীর পিতা স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মহাসুখে স্বর্গরাজ্যে অবস্থিত,—ইহাই তাঁহাদের শান্তি।"

জাপানের উন্নতির দু একটি কারণ।

বোম্বাইয়ের অধ্যাপক নেল্‌সন্ ফ্রেজার জাপানে বেড়াইয়া আসিয়া তৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহা হইতে জাপানের উন্নতির কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়। তিনি বলেন জাপানীরা সাধারণতঃ ভাত ও মাছ খায়। লিমের চাটনী দিয়া তাহারা কাঁচা মাছ খায়। ধনী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ইহা লইয়া কোন হাঙ্গামা করে না। তাহারও ভাত, মাছ, চাটনী এবং এক পেয়ালা চায়ে সন্তুষ্ট, বাংলা দেশের ধনীদের ৫০ ব্যঞ্জন না হইলে চলে না। কখন কখন শতাধিক রকমের রান্নাও হয়। বঙ্গের সাধারণ গৃহস্থেরা যত রকম তরকারী খান, পশ্চিমের হিন্দুস্থানী ধনী লোকেরাও ততটা ঔদরিকতা দেখান না। স্বর্গীয় ভাই প্রকাশ দেবজী একজন পাঞ্জাবী প্রচারক ছিলেন। তিনি বাংলা জানিতেন, এবং বাঙ্গালীদিগকে ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি বলিতেন, বাঙ্গালীর মেয়েদের নানা রকম তরকারী কুটিয়া রান্না করিতে এবং বাঙ্গালী পুরুষদের সেই সব জিনিষ খাইয়া হজম করিতে যেরূপ সময় ও শক্তি যায়, তাহাতে তাহারা ভাল কাজ করিবেন কখন ও কিরূপে? ইহার মধ্যে পরিহাস ছিল, সত্য কথাও ছিল। বাস্তবিক, রান্না খাওয়ার এতটা বাড়াবাড়িতে যে কেবল সময় ও শক্তি যায় তা নয়, অকারণ অর্থনাশও হয়, এবং বিলাসিতা অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় মানুষ একটু অকেজোও হইয়া যায়। অবশ্য আমরা কাহাকেও জাপানীদের মত কাঁচা মাছ খাইতে বলিতেছি না, শুধু ভাত খাইয়াও থাকিতে বলিতেছি না। যথেষ্ট পরিমাণে অল্প কয়েক রকমের পুষ্টিকর খাদ্য খাইলেই হয়; পেটের পূজা জীবনের প্রধান বা অন্যতর উদ্দেশ্য নয়।

নেল্‌সন্ ফ্রেজার সাহেব জাপানীদের সম্বন্ধে আরও বলেন, যে, তাদের মেয়েদের গয়নার উপর কোন আসক্তি নাই। তাহারা গয়না পরে না বলিলেও চলে।

জাপানীরা সর্ব্বপ্রকার শিল্পে পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিয়া নিখুঁত জিনিষ প্রস্তুত করিতে চায়। ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। চরম উৎকর্ষ লাভের এই যে ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহাই তাহাদের শিল্পে সিদ্ধিলাভের মূল কারণ। আমাদের দেশে যিনি যে কাজ করেন, তাঁহাকে তাহার দোষ দেখাইলে অনেক সময় তিনি "অপমান" বোধ করেন। যদি বলা যায়, ভারতবর্ষেই ইংরেজের দোকানে, কারখানায়, বা ছাপাখানায়, ইহা অপেক্ষা

ভাল কাজ হয়, অমনি উত্তর পাওয়া যায়, আমাদের দ্বারা এর চেয়ে ভাল হইবে না। অথচ ভারতপ্রবাসী ইংরেজেরাও দেশী লোকের দ্বারা কাজ করান, এবং আমরা যে সব যন্ত্র এবং মালমসলা ব্যবহার করি, তাহারাও তাহাই করে। উচ্চ আদর্শ না থাকিলে, এবং নিজেদের শক্তির বিকাশের সম্ভাবনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে কোন জাতি কখন বড় হইতে পারে না। বিদেশীরা ত বলিবেই যে তোমরা অতি অপদার্থ অকর্ম্মণ্য; তোমাদের দ্বারা কখন কিছু বড় বা সুন্দর কাজ হইবে না। কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া লইব কেন?

ক্রেজার সাহেব বলেন, চীনাদের দেহ জাপানীদের চেয়ে বলিষ্ঠ, এবং জাপানীরা রোগ ভোগ বড় করে কম নয়। তাহার একটা কারণ, চীনাদের খাদ্য জাপানীদের চেয়ে পুষ্টিকর। ক্রেজার সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চীনারা জাপানীদের চেয়ে বলিষ্ঠ দেহ ও সুস্থ হইলেও, চীনারা সংখ্যায় ৪০ কোটি এবং জাপানীরা মোটে ৫ কোটি হইলেও, এখন চীনকে জাপানের দমক সহিতে হইতেছে, জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন জাতীর সমকক্ষ, চীনারা স্বাধীন থাকিতে পারিবে কি না, তাহা এখনও সন্দেহস্থল। জাপান একাগ্র স্বদেশপ্রেম দ্বারা, এবং সর্ব্ববিষয়ে যে শিক্ষা ও যে কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক তাহা অবলম্বন করিয়া, শক্তিশালী হইয়াছে। নিজেদের মধ্যে দুর্ব্বলতার কারণ যাহা দেখিয়াছে ও দেখিতেছে, জাপানীরা তাহা নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে ও করিতেছে, সবলতার কারণ বিদেশে যাহা দেখিয়াছে ও দেখিতেছে, তাহা সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। স্বদেশের কোন প্রথা, কুসংস্কার বা বিশ্বাস তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

(প্রবাসী)।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ

চিকিৎসা শাস্ত্র সকল, রোগের বিবরণ, লক্ষণ ও নিদান নিরূপণেই ব্যস্ত। স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও বিবরণ অতি কম দেখা যায়। লোকের যাহারা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডাক্তার বা বৈদ্যের প্রয়োজন নাই। রোগ আরোগ্য করিবার জন্যই চিকিৎসকের প্রয়োজন। "আমরা শারীরিক ভাল আছি এবং এইরূপ ভাল কিরূপে থাকিতে পারি" এই পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য কেহ চিকিৎসককে পয়সা খরচ করিয়া ডাকে না। লোকে পীড়ার অপেক্ষা করে এবং পীড়িত হইলে তাহা সারাইবার জন্য চিকিৎসক ডাকে। এই জন্য স্বাস্থ্য-চর্চ্চা করায় চিকিৎসকের কোন স্বার্থ নাই। রোগচর্চ্চায়ই তাঁহার স্বার্থ। জনসমাজের রোগের উপরই চিকিৎসকের জীবিকা নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সাধারণের যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি হয় সে বিষয়ে একাগ্র হইলে চিকিৎসকের আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারা হয়। সংসারে চিকিৎসক, উকীল, এবং সিপাহী ইহারা অমঙ্গলজীবী। রোগ না হইলে লোকে চিকিৎসক ডাকে না, ঝগড়া না বাধিলে উকীলের দরকার হয় না, আবার যুদ্ধ না বাধিলে সিপাহীর দু পয়সা আয় বাড়ে না। সুতরাং ইহাদের জীবিকা জনসমাজের অমঙ্গলের উপর নির্ভর করে। যথায় দেখিবে উকীল বা চিকিৎসকেরই প্রভূত সম্মান ও প্রচুর ধন সমৃদ্ধি, তথায় বুঝিয়া লইবে যে সমাজ বিস্তর অধোগত।

যদি এমন কোন আইন থাকিত যে, যে পল্লীতে বা সমাজে ঝগড়া বিবাদ কম বা উকীলের দ্বারা ঝগড়া বিবাদের শান্তি হইতেছে অথবা যে পল্লীতে রোগ শোক কম বা চিকিৎসকের গুণে সংক্রামক রোগ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, সেই পল্লীস্থ চিকিৎসক বা উকীলকে রাজা ধন মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন, তাহা হইলে দেখিতে সমাজের অবস্থা অন্যরূপ হইত। পৃথিবীতে এত রোগ শোক বাদ বিসম্বাদ থাকিত না। চিকিৎসকের ইচ্ছা নয় যে জনসমাজ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করে অথবা কোন ব্যক্তি রোগমুক্ত থাকে কিম্বা কাহারও রোগ শীঘ্র সারে। তাহা হইলে প্রতিদিন তাহার বত্রিশ টাকা দর্শনী কে দিবে অথবা তাহার মটর

পাড়ী বা দুষ্টীর খরচ কি প্রকারে চলিবে? অতএব স্বাস্থ্য কিসে থাকে, কিসেই বা এই স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়, কিসেই বা রোগে পড়িতে না হয়, স্বাস্থ্যের লক্ষণ কি কি, এই সকল কথা যাঁহারা মন দিয়া শুনেন তাঁহাদিগকে রোগে পড়িতে হয় না ও চিকিৎসকের অধীনতা ভোগ করিতে হয় না।

যেরূপ আচরণ দ্বারা দেহমন আত্মার সামঞ্জস্য উন্নতি বিধান হয়— তাহার নাম স্বাস্থ্য। যাহাতে মনের কোন প্রকার অশান্তি বা দেহের কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত না হয় তাহার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই শরীরের সৌন্দর্য্য, মনের শক্তি, আধ্যাত্মিক পবিত্রতা এবং পরম সুখ। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিময় ভাব মনুষ্যমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম স্বাস্থ্য। যখন মনুষ্য তাহার আত্মস্বভাবে পরিপূর্ণ থাকে, শরীর ও আত্মায় পরিপূর্ণ থাকে, যখন তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ সমুদয় যন্ত্র যাহা প্রকৃতির সহিত সমস্বরে বাজিতে থাকে, তখনই তাহাকে সুস্থ বলা যায়। শরীরের সমুদয় যন্ত্র যে অবস্থায় সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত ও কার্য্যতৎপর থাকে— যখন অন্তরস্থ ক্রিয়া আপনাপনিই সামঞ্জস্যভাবে চলিতে থাকে তখন মনুষ্য সমগ্র মনুষ্যের সহিত, সমগ্র প্রকৃতির সহিত ও সেই প্রকৃতির নিয়ন্তার সহিত একযোগে একই নিয়মে এক-তানে কার্য্য করিতে পারে। কাহারও সহিত তাহার বাদ বিসম্বাদ হয় না।

সৌন্দর্য্যই স্বাস্থ্যের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ। স্বাস্থ্য কর্ত্তৃকই মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যভাবে যে অভিব্যক্তি তাহাকে সৌন্দর্য্য বলে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, উদ্ভিদ্— জগতীস্থ যাবতীয় জীব জন্তু স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করে বলিয়া সকলেই আপনাপন অধিকারে দেখিতে রমণীয় ও সুন্দর। বিশেষতঃ যৌবনকালে যখন তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহারা কিরূপ রমণীয় দর্শন ও মনোহর দেখায় মনুষ্যই স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত বলিয়া মনুষ্যের ভিতর সুন্দর প্রায়ই নাই। কোন না কোন রোগ তাহার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছে। যদি তাহার শরীর ভাল থাকে, তাহা হইলে হয়তো রাগ দ্বেষ তাহার মনকে দগ্ধ করিতেছে। যদি মন ভাল থাকে, তাহা হইলে হয়তঃ লক্ষিত পাপবশতঃ তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে। আমরা সকলেই সুন্দর হইতে চাহি কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকিলে যে সুন্দর হওয়া যায় না তাহা জানি না।

স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় লক্ষণ—কর্ম্মতৎপরতা। যে ব্যক্তি প্রকৃত সুস্থ সে কখন আলস্যে কাল কাটাইতে চাহে না। সে দিবাভাগে অনবরত সূর্য্যের ন্যায় অক্লান্ত ভাবে শ্রম করিতে থাকে। তাহার শরীরের প্রতি শিরা, প্রতি ধমনী, পাক যন্ত্রের ক্রিয়া, রক্তবহ স্রোতের ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি দৈহিক সমুদয় ক্রিয়াই অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্যতৎপর থাকিয়া দেহ যন্ত্রের সুখ উৎপাদন করে। অপর পক্ষে দেখ—অলস ব্যক্তি এক প্রকারের রোগাক্রান্ত। তাহার শরীর ও মন উভয়ই স্ফূর্ত্তিহীন। অলস ব্যক্তি আবার যখন স্বাস্থ্যলাভ করিবে দেখিবে, সে অলসভাবে কোন মতেই দিন যাপন করিতে চাহিবে না। পৃথিবী যদি স্বাস্থ্যধাম হইত তাহা হইলে দেখিতে ইহাতে সকল লোকেই শ্রমশীল হইয়া ইহার কত ধনধান্য বৃদ্ধি করিত।

স্বাস্থ্যের তৃতীয় লক্ষণ—শারীরিক ও মানসিক শক্তি। হঠকারিতা শক্তি যদিও পাপজনক বটে কিন্তু নিয়ত স্থিরভাবে কি শারীরিক কি মানসিক এই উভয় শক্তির যে দৃঢ় ধারণা তাহা প্রকৃত সুস্থের লক্ষণ। যাহাদের মানসিক ইচ্ছাশক্তি সাতিশয় বলবান অথবা মনের বেগ অনিবার্য্য তাহারাই সংসারে দীর্ঘজীবী হয়। ইহাদিগকেই শাস্ত্রে অব্যাহত বলবীর্য্য পরাক্রম বলিয়াছেন।

স্বাস্থ্যের চতুর্থ লক্ষণ—সুখ। স্বাস্থ্য ব্যতীত সংসারে সম্পূর্ণ সুখী হওয়া যায় না। সুখলাভই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। যাহাদের আয়ু দ্বিতয়ন্ন তাহারাই এই সুখ-ভোগের অধিকারী হইতে পারে আবার যাহারা বৃথাজীবী তাহারা কেবল দুঃখ ভোগ করিয়াই সংসার হইতে চলিয়া যায়।

পৃথিবীতে যত রোগ শোক ঘাত বিসম্বাদ, ঈর্ষা দ্বেষ কাম ক্রোধ প্রভৃতি দেখিতেছ—সকলই হয় মনের, না

হয় শরীরের অস্বাস্থ্যমূলক। সুতরাং বর্ষ অর্থ কাম যোক্ষ সকলই স্বাস্থ্য কর্ত্তৃক বিধৃত রহিয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধতা

অন্ন মধ্যস্থ পদার্থের অসম্বাক্ নিঃসরণ হওয়া অর্থাৎ মলাশয়ে অস্বাভাবরূপে মল সঞ্চিত থাকাকে কোষ্ঠবদ্ধতা বলা যাইতে পারে। কাহার কাহারও মল-ত্যাগের বিরলতা অভ্যাসগত ও স্বাভাবিক হইলেও লোকে তাহাদিগকে কোষ্ঠবদ্ধ রোগী বলিয়া ভ্রম ধারণা করেন। সকলেরই জানা থাকা উচিত যে, আমরা শরীরের গ্রহণীয় অপেক্ষা যে পরিমাণ অধিক খাদ্য আহার করি, মলের পরিমাণও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। আহার বিষয়ে সাবধান ও সংযমী এমন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা ৩।৪ দিন অন্তর মলত্যাগ করেন।

সাধারণতঃ লোকে কেবল বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করে না। শরীর যাহা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক পরিমাণ খাদ্যই আহার করিয়া থাকে। খাদ্যের আধিক্যের জন্য শরীর কতকটা উত্তেজিত হয় এবং দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদনের স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। খাদ্য ভাল লাগার জন্যই আহারের পরিমাণ অধিক হইয়া যায়। পরিমাণের আধিক্যের মধ্যে খাদ্যের অসার অংশ থাকে। অসার অংশ স্বভাবতঃই অপাচ্য বলিয়া তাহা পরিপাক করা যায় না। শাকসবজি ও ফলমূলাদির তন্তুভাগ এবং খাদ্যের অন্য কয়েকটী উপাদানের উপর পাচকরস ক্রিয়া করিতে পারে না। খাদ্যের এই সকল অতিরিক্ত অসার উপাদানেই মল গঠিত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা সাময়িক অথবা অভ্যাসগত হইতে পারে। সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতা শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক না হইলেও অনেক সময় চিকিৎসার দোষে অভ্যাসগত কোষ্ঠবদ্ধতায় পরিণত হয়। সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতায় সকল সময় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, বাজার প্রচলিত নানাপ্রকার ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিজে না বুঝিলেও সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতাই যাহার প্রধান কারণ এমন কোন শারীরিক অসুস্থতার জন্য লোকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে পারে। উদরাময়, অর্শ এবং সচরাচর পরিপাকের গোলমাল এই কারণে হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হাঁপানি, হিষ্টিরিয়া ও মৃগি প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইতে পারে। এবং যতক্ষণ না এই সাধারণ কারণ দূর করা যায় ততক্ষণ চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য প্রচলিত তিনটি ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই তিনটী ঔষধ সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতার পক্ষে যোগ্য ও বিশেষ ফলপ্রদ হইলেও অভ্যাসগত কোষ্ঠবদ্ধতার পক্ষে নিষ্ফল ও অনিষ্টকর। তিনটীর প্রথম ক্যাষ্টর ওয়েল (Castor oil) দ্বিতীয় ক্যালোমেল (Calomel) তৃতীয় সাবানের জলের দ্বারা অনুবৌতি।

ক্যাষ্টর ওয়েল একটী মৃদু বিরেচক। ইহা সেবনে পেট কামড়ায় না, সকল বয়সের লোককেই ইহা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার বিস্বাদজনক আস্বাদই ইহা ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাজারে অনেক অনেক প্রকারের তথা কথিত স্বাদ-হীন তৈল বিক্রীত হয়। কিন্তু সে সকলের কোনটিই একবারে স্বাদহীন নহে এবং উপযুক্ত ফললাভের জন্য সাধারণ তৈল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। যথাসম্ভব আস্বাদ দূর করিতে হইলে, তৈল দুগ্ধ দিয়া গ্রহণ করা উচিত। পাত্রের কাণাও পূর্ব্ব হইতে দুগ্ধে লাগান থাকা আবশ্যক। দাঁতের সংস্পর্শে আসিতে না দিয়া সাবধানে সেবন করিলে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি একবারে গালের মধ্যে ঢালিয়া দিলে, অতি অল্পই আস্বাদ পাওয়া যায়। ডাক্তার বিংসারের মতে—Castor oil 1oz, Fresh Mucilage of Acacia 3 dr., Distilled water 3dr. আর ৩ ফোঁটা Oil pipperment একত্র Mixture করিয়া সেবনে তৈলের অতি সামান্যই আস্বাদ পাওয়া যায়।

যত প্রকারের বিরেচক আছে তন্মধ্যে 'ক্যালো-মেলকে' সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিরেচক বলিয়া বিবেচনা করা

হয়। ইহার প্রধান কারণ ক্যালোমেল বিরেচক ও তৎসঙ্গে অন্ত্রমধ্যের বিশেষ পচন নিবারক। সাধারণতঃ ইহা অধিক মাত্রায় (২ হইতে ৫ গ্রেণ) দিয়া ডুস করা হয়। অল্প মাত্রায় (½ কিংবা ¾ গ্রেণ) ব্যবহারেই সুফল পাওয়া যায়। যে পর্য্যন্ত না কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, চার ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা করিয়া ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ সেবনে ইহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ত্রমধ্যে থাকে, এবং পচন নিবারক ক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ সুফল লাভ হয়। সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতায় চিকিৎসায় ক্যালোমেলের এই পচন নিবারক গুণের প্রয়োজনীয়ত্ব সকলে হৃদয়ঙ্গম করেন না। সাধারণে মনে করেন বিরেচনের কোষ্ঠ পরিষ্কার ক্রিয়ার দ্বারাই অন্ত্র পরিশোধিত হইয়া যায়। এরূপ হইলেও অনেক স্থলেই ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। বৃহৎ অন্ত্রে অধিকক্ষণ সঞ্চিত মল নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে, কিন্তু যখনই বিরেচক ঔষধের দ্বারা তাহাকে আলোড়িত করা হয় তখনই তদুৎপন্ন বিষ বাহির হইয়া পড়ে এবং বিরেচকের বিষনাশক গুণ না থাকিলে তাহা দ্বারা শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। ক্যালোমেল অন্ত্রের বিশেষ পচন নিবারক এবং যকৃতের ক্রিয়ার নিয়ামক বলিয়া সাময়িক কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিরেচক। সাধারণতঃ রাত্রে এক মাত্রা ক্যালোমেল গ্রহণ করিয়া প্রাতে এক মাত্রা Apperient water সেবন করা যুক্তি সঙ্গত।

ক্ষুদ্র অন্ত্রকে উত্তেজিত না করিয়া মলাশয় ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হইলে কিংবা গৃহীত বিরেচনের কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে হইলে, সাবানের জলের ডুস লওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। ডুসের সঙ্গে সকল সময়েই কোন প্রকার পচন নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করা ভাল। এই জন্য সাবানের জলের সহিত ৩।৪ ফোঁটা Eucalyptus oil (ইউক্যালিপ্টস্ তৈল) উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইয়া লওয়া উচিত।

ডুস দিবার (অন্ত্রশোধনের) একটী প্রকৃষ্ট উপায়ের বিষয় লিখিত হইল।—জলের উত্তাপ প্রায় ১০০° ডিগ্রী হওয়া উচিত এবং আস্তে আস্তে ডুস লইলেই সুফল পাওয়া যায়। প্রচলিত ডুসের নলের মুখ এই কার্য্যে ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুপযোগী এবং সহজেই অন্য সুবিধাজনক উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। সাধারণ ডুসের যে অংশটী (Nozzle) মলদ্বারে প্রবেশ করাইতে হয় তাহা অতি অল্প লম্বা, এজন্য অনেক সময়েই জল বাহির হইয়া আসে। ইহার পরিবর্ত্তে নলের মুখে ১২ নং একটী রবার Catheter (ক্যাথিটার) পড়াইয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। রবারের ক্যাথিটার তৈলাক্ত করিয়া মলদ্বারে আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে কোনই কষ্ট হয় না এবং ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাওয়ায় জলও বাহির হইয়া আসে না।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)।

শিশু-শিক্ষা

আমেরিকায় এখন শিশু-শিক্ষা লইয়া একটা নূতন আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, শিশু-শিক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি ঠিক নয়। পৃথিবীর যে সকল ব্যাপার যে-সময়ে জানা দরকার, শিশুরা ঠিক সেই সময়টীতে সে-সব ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগলাভ করে না। শিশুরা এখন আট বৎসর বয়সে যতটা জ্ঞানলাভ করে, আরও অল্প বয়সে তাহাদিগকে ঠিক ততটা পরিমাণেই জ্ঞানবান হইতে হইবে। অনেকে শিশুদের জন্য নব আদর্শের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানে আগে নানা বিষয় শিখিয়া, শিশুরা উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। উচ্চতর বিদ্যালয়গুলির কার্য্যকালও সংক্ষিপ্ততর করিবার কথা উঠিয়াছে। এই কথা কার্য্যে পরিণত হইলে, ছাত্রেরা এখনকার চাইতে অল্পবয়সে কলেজে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এখনকার প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনেক অকারণ বাহুল্য আছে। সেই বাহুল্যকে পরিহার করিয়া শিশুদের প্রথম শিক্ষাকালটা আসল কাজে খাটাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে;—এইটি হইতেছে উপর-উক্ত নব-পদ্ধতির মূল কথা।

সংপ্রতি উইনিফ্রেড স্যাক্‌ভিল ষ্টোনারের "Natural Education" নামে যে নূতন ও বিখ্যাত বইখানি বাহির হইয়াছে, তাহাতে নব শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি ও তাহার আশ্চর্য্য ফললাভ সম্বন্ধে চিত্তগ্রাহী আলোচনা আছে। লেখিকা বলেন, "শিশু-জীবনের প্রথম পাঁচ ছয় বছর বাজে কাজে লাগাইয়া, আমরা সময়ের অত্যন্ত অপব্যবহার করি। নিয়মিত শিক্ষা দিতে পারিলে ঐ সময়টাতেই অন্য সময়ের চেয়ে ঢের বেশী ফল পাওয়া যায়। তাহাতে পরজীবনের ছয়,—এমন কি দশ বৎসরব্যাপী অকারণ শিক্ষার পেষণ যন্ত্র হইতে ছাত্রগণ পরিত্রাণ পাইতে পারে! আমাদের মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জোর করিয়া লেখাপড়া শিখানো উচিত নয়। তারা একটু-আধটু যাহা শিখে, তাই ভাল; কারণ, তাদের হাল্‌কা মস্তিষ্ক গুরুতর শিক্ষার গুরুভার সহিতে পারে না। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা,—এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।"

শ্রীমতী ষ্টোনার কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া কোন কথা বলেন নাই; তিনি তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিকে হাতে-নাতে কাজে খাটাইয়াছেন। তাঁহার কন্যার নাম উইনিফ্রেড। তাহার বয়স বারো বৎসর। এই বয়সে সে এত বিষয় শিখিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিণতবয়স্ক গ্রাজুয়েটের কাছ হইতেও ততটা আশা করা যায় না।

উইনিফ্রেড, গ্রেক, জার্ম্মান ও ইংরাজী ভাষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা কহিতে পারে। স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষাতেও তাহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। এম্পারেণ্টোতে সে দুই-তিনখানি ছোট-ছোট বই লিখিয়াছে। বই না দেখিয়া ভার্জিল ও সিসেরোর রচনা হইতে সে দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ আবৃত্তি এবং তার ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারে। নামজাদা অধ্যাপকেরা তাহাকে নানারূপে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কোন-মতেই কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারেন নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খুব ভাল ছাত্রও যে তাহার চাইতে ভাল প্রশ্নোত্তর দিতে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

শুধু লেখাপড়াতে নয়, উইনিফ্রেড নানা ললিত-কলাতেও সিদ্ধব্রত। পিয়ানো ও বেহালায় তার হাত ভারি মিষ্ট। নাচেও তাহার পটুতা বড় কম নয়। নাচে ও বাজনায় সে এতটা দক্ষ যে, ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলে সে রঙ্গমঞ্চে নাচিয়া-বাজাইয়া অনায়াসে নাম ও পয়সা করিতে পারে। চিত্র অঙ্কনেও সে যথেষ্ট নিপুণ।

পিটস্‌বার্গে যত দাবাবোড়ে-খেলোয়াড় আসিয়াছে উইনিফ্রেড তাহাদের সবাইকে হারাইয়া দিয়া নাম কিনিয়াছে। অনেক ওস্তাদ দাবাবোড়ে খেলোয়াড়কেও তাহার ক্রীড়াদক্ষতার দ্বার মানিতে হইয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীতত্ত্বের উপরে সে যে কয়খানি নোট বই লিখিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন অধ্যাপক বলিয়াছেন, অনেক ভাল কলেজেও ঐ নোটবইগুলি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে।

অনেকে এখানে ভাবিতে পারেন, এত অল্পবয়সে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করাতে উইনিফ্রেডের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু তা নয়। চল্লিশ বৎসর বয়সে যে-রকম ক্ষমতা স্বাভাবিক, বারো বৎসর বয়সে সে ঠিক সেইরকমই শক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে,—ইউনাইটেড ষ্টেটসে তাহার মত সমবয়স্ক আর কোন বালিকার গায়ে এত বেশী জোর নাই। উইনিফ্রেডের গড়নও খুব বাড়ন্ত। দেখিতে তাহাকে ষোল, সতেরো বছর বয়সের যুবতীর মত। তরবারি খেলায়, দৌড়ানোতে, মুষ্টিযুদ্ধে অনেক পুরুষও তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

উইনিফ্রেড এই বয়সেই নানা বিষয় লইয়া দশ-এগারোখানি ছোট ছোট বই লিখিয়া ফেলিয়াছে। গত বৎসর কলমের জোরে সে দেড় হাজার টাকারও বেশী রোজগার করিয়াছে। তাহাকে অনেক বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, নহিলে সে আরও ঢের বেশী টাকা রোজগার করিতে পারিত। তুমি কয়মাস দিলে সে যে-কোন বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিতে পারে। প্রফেসর ও-সিয়া একবার কোন ছাত্ররচিত একটি প্রবন্ধ উইনিফ্রেডের হাতে দিয়া বলেন, "এই গদ্যটাকে পদ্যে পরিণত কর দেখি!" টাইপরাইটারের সুমুখে বসিয়া উইনিফ্রেড সেই গদ্য-প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া

যায়ো মিনিটের ভিতরে একটি চুয়ান্নিশ পংক্তির কবিতা লিখিয়া ফেলিল।

শেষ দুই-তিন বৎসর ছাড়া, উইনিফ্রেড বরাবর তার মায়ের কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখিয়াছে। শ্রীমতী ষ্টোনার বলেন, "স্বাভাবিক শিক্ষা-পদ্ধতি"র প্রথম কথা কি? এক রকম জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই শিশু-শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। উইনিফ্রেড যখন একবছর কচি মেয়ে, শ্রীমতী ষ্টোনার তখন তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া ভার্জিলের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘুম পাড়াইতেন। কবিতার সুরে শিশু কান্না ভুলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত। উইনিফ্রেডের বয়স যখন একবৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখনি সে আধো-আধো স্বরে ভার্জিলের Æneid হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত! শ্রীমতী ষ্টোনার একটি বল লইয়া মেয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিতেন, "Arma"! উইনিফ্রেড আবার বলটি মায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিত, "Virumque!"

এইরূপে, খেলাধূলার সঙ্গেসঙ্গে উইনিফ্রেড ভার্জিলের কবিতার পর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিল।

মিসেস ষ্টোনার বলেন, শিশুদের অজ্ঞাতসারে এইরূপ খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শৈশবশিক্ষা ক্রমেই অগ্রসর করিতে হয়। দেশের ভাষাই হউক, আর বিদেশের ভাষাই হউক,—সমস্তই এই উপায়ে শিশুদিগকে শিখাইতে হইবে। অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, বানান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিশুদের দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য মিসেস ষ্টোনার এক-এক বিষয়ের উপযোগী এক একরূপ ক্রীড়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেন্টদের কথা জানাইবার জন্য মিসেস ষ্টোনার প্রেসিডেন্টদের লইয়া একখানি নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। তারপর উইনিফ্রেডের সামনে উক্ত নাটিকার অভিনয় হয়। ফলে, সে প্রেসিডেন্টদের নাম ও কার্য্যাবলী সমস্ত ঠিকঠাক জানিয়াও সন্দেহ করিতে পারে নাই যে, তাহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে!

মিসেস ষ্টোনার আর এক উপায়ে মেয়েকে শিক্ষা দিতেন। তিনি নানারূপ জ্ঞানের কথা গল্পাকারে মেয়েকে শুনাইতেন—এমন-কি অঙ্কশাস্ত্রের নীরস কথাগুলিও! তাঁহার গল্পের পাত্রপাত্রীরূপে যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ প্রভৃতি দৈত্যনামে বিরাজ করিত এবং এই অদ্ভুত দৈত্যগুলির কার্য্যকলাপ দেখিয়া উইনিফ্রেড তাহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি মোটামুটি একরকম জানিতে পারিত। মিসেস ষ্টোনারের মতে, যাহার ভিতরে গল্প আছে, তাহার প্রতি শিশুদের টান্ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অনেকে মনে করিতে পারেন, উইনিফ্রেডের মত অপূর্ব্ব বিদুষী বালিকা জগতে একটি কি দুইটির বেশী জন্মিতে পারে না। কিন্তু মিসেস ষ্টোনার এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, "আমার মেয়ের চরিত্রে সাধারণ বালিকা-চরিত্র অপেক্ষা বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমি আমার কন্যাকে শিক্ষাদান করিয়াছি, সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে জগতের সকল শিশুই উইনিফ্রেডের মত বিদ্বান হইতে পারিবে।"

মিসেস ষ্টোনারের শিশুশিক্ষাপদ্ধতি যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে চান, তাঁহারা তাঁহার "Natural Education" নামে নবপ্রকাশিত পুস্তক পড়িয়া দেখিতে পারেন। —Mudure's Magazine হইতে। (ভারতী)

য়ুরোপের রাজনৈতিক গুপ্তচর

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান-যুদ্ধের পর হইতেই, জার্ম্মাণ রাজসরকার ফরাসীদেশে গোয়েন্দার পর গোয়েন্দা পাঠাইতে সুরু করেন। এই গোয়েন্দার দল দোকানদার, জহুরী, স্বর্ণকার ও বিশেষ করিয়া হোটেলওয়ালার বেশে সারা ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম-প্রথম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের গোয়েন্দাদলের কাছে পুরুষ-প্রতিনিধি পাঠাইয়া সমস্ত খবর জানিয়া লইতেন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই ফরাসীরা সমস্ত ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলিলেম। তখন, পুরুষ প্রতিনিধির বদলে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য স্ত্রী-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। এই স্ত্রীলোকগুলি আধাবয়সী ও ভদ্রবংশীয়া ছিল।

এই রমণী-চরেরা রেলপথে ফ্রান্সের নানান জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে থাকিয়া, তাহারা ফ্রান্সের গোয়েন্দাদের সঙ্গে দেখা করিত। কথাবার্ত্তা বড় হইত না,—ট্রেণ ছাড়িবার আগেই তাহারা যে যার আপন-আপন বক্তব্য চিঠি-পত্রের দ্বারা পরস্পরকে জানাইয়া যাইত।

গত দশবৎসর ফরাসীদের গুপ্তকার্য্যবিভাগ জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদলকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। পঙ্গপালের মত সমস্ত ফ্রান্সটা আচ্ছন্ন করিয়া শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা যে কিরূপ গুপ্তচক্রান্তে নিযুক্ত হইয়া আছে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহার সব কথা জানিতে না পারিলেও কতক কতক আন্দাজ করিতে পারিলেন। দেশের গুপ্তকথা যাহাতে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া শত্রুরাজ্যে গিয়া পৌঁছিতে না পারে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সেইজন্য ডাকবিভাগের কর্ত্তাদের নিকটে এক হুকুমনামা পাঠাইলেন।

কিন্তু হুকুমনামা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের কাছে গোপন রহিল না। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন ডাকে এখন কোনরকম সঙ্কেতলিপি বা সন্দেহজনক পত্র পাঠানো বিবেচনার কাজ নহে। অতএব তাঁহারা চিঠিপত্র লিখিবার এক নূতন কায়দা বাহির করিলেন। চিঠিগুলির ধরণ-ধারণ প্রায় এমনিধারাই হইত :—

"প্রিয় ডর্জ,

তুমি আমাকে যে টাকা ধার দিয়াছিলে, আমি তাহার সুদ পাঠাইলাম।

তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, আমরা তাহা ভুলিব না।

এখানকার খবর বড় মন্দ নয়, আগামী বৎসরে লাভের অংশ থেকে তুমি বোধ হয় কিছু বেশী টাকা পাইবে।

আমরা এ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, জানিবে।

সর্ব্বদাই পত্র লিখিবে; তোমার সমস্ত খবর আমরা জানিতে চাই।

চার্লস খুড়াকে মিছাই তুমি অবিশ্বাস করিয়াছ, তিনি খুব ভাল লোক। তাঁর উপরে তুমি অনায়াসে নির্ভর করিতে পার।

আমার স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসা নাও। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিকের আলিঙ্গনও গ্রহণ করিবে।"

চিঠিখানির আসল মানে :—

"আমি তোমাকে তোমার পেন্সনের মাহিনা পাঠাইলাম। তোমার দেওয়া খবর সন্তোষজনক। তুমি যদি এইভাবে বরাবর কাজ চালাইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আগামী বৎসরে তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব। সংবাদ আরও বিশদভাবে ও তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। চার্লসকে অবিশ্বাস করিও না,—সে আমাদেরই লোক। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিক নামে আমাদের যে তিনজন সংবাদদাতা আছে, তুমি তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিও।"

সাধারণতঃ গোয়েন্দাদের মাহিনা দিবার সময়েই জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্য-বিভাগের কর্ত্তারা ডাকঘরকে পত্রব্যবহার করেন। নহিলে, বিশেষ কোন দরকারি কথা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত রমণী-গোয়েন্দাদের দ্বারাই কাজ চালাইয়া লওয়া হয়। কারণ, তাহাই অধিক নিরাপদ।

ফ্রান্সে যত জার্ম্মাণ গোয়েন্দা আছে, তাহাদিগের জন্য জার্ম্মাণ গুপ্তকার্য্য-বিভাগকে বৎসরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ডলার (এক ডলার প্রায় তিন টাকা দুআনা) খরচ করিতে হয়।

আগেই বলা হইয়াছে, গোয়েন্দারা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে থাকে। সময়ে সময়ে ফরাসীর ডিটেকটিভেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ব্যবসায়ে গোয়েন্দাদের যে আয় হয়, ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষ সেই আয়ের সঙ্গে গোয়েন্দার খরচের তুলনা করেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী দেখিলেই ধৃত গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য সে কোথা হইতে টাকা পাইল? সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলে ধৃত গোয়েন্দা বিপদে পড়ে। কিন্তু সে প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত পত্রের মত চিঠি দেখাইয়া প্রমাণিত করে যে, অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য তাহার দেশ হইতে টাকা আসিয়াছে।

জার্মাণদের মত ফরাসীরাও গোয়েন্দা পোষণ করে, কিন্তু জার্মাণ গোয়েন্দাদের চাতুরীর কাছে তাহাদিগকে অনেকবার হার মানিতে হইয়াছে। ফরাসীরা যখনই জার্মাণীতে গোয়েন্দা পাঠাইয়াছে, তখনই জার্মাণ গুপ্তকার্য্য বিভাগে সে সংবাদ আগে থাকিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে! একবার ফরাসীদের নৌবিভাগ হইতে জার্মাণীর হেলিগোল্যাণ্ড ও কিয়েল খাল প্রভৃতি জায়গার মানচিত্র আনিবার জন্য দুজন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীকে চর নিযুক্ত করা হয়। এই গুপ্তসংবাদ গুপ্ত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সৈনিক কর্ম্মচারীরা অসামরিক পোষাক পরিয়া একখানি পাল্কী ভাড়া করিলেন—সচরাচর লোকে যেমনভাবে জলবিহারে বাহির হয়, তাঁহারাও যেন তেমনি ভাবেই সমুদ্রে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। যথেষ্ট সাবধানে থাকিয়াও তাঁহারা কিয়েল খালের কাছে যাইবামাত্র বন্দী হইয়া, বিচারার্থে সিলেসিকে প্রেরিত হইলেন। বিচারকালে ফরাসী কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, জার্মাণরা শুধু যে তাঁহাদিগকে গোয়েন্দা বলিয়া জানে তাহা নহে; পরন্তু, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অতি গোপনীয় কথাগুলিও আগে থাকিতেই সম্রাটপক্ষের কর্ণগোচর হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন যে বহু বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি কেল্লার নক্সা লইবার জন্য জার্মাণীতে আসিয়াছিলেন, এ খবরটাও লুকানো নাই!

আর একজন ফরাসী কাপ্তেন গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য ছদ্মবেশে বার্লিনে গিয়া হাজির হন। তাঁহার উপরে যাহাতে সন্দেহ হইতে না পারে, সেজন্য তিনি অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। বার্লিনের এক বিখ্যাত হোটেলে আহারাদি করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী মহিলা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। ভিড়ের ভিতরে তিনি তাঁহার সঙ্গের লোককে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং পথ না জানার দরুণ বাড়ী যাইতে না পারিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মহিলাটিকে দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়া।

ফরাসী কাপ্তেন এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোকের যাহা করা কর্ত্তব্য—তাহাই করিলেন। তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া, তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া আসিলেন।

হোটেলে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি দেখিলেন, একজন ভদ্রলোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কাপ্তেনকে দেখিয়া সেই ভদ্রলোক আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"আমি এখানকার পুলিশ কমিশনার।"

কাপ্তেন আপনার "পাসপোর্ট" বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পুলিশ কমিশনার ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এই 'পাসপোর্টে' আপনার ছবি থাকলেও এখানি যে আপনার ভাইয়ের, আমরা তা জানি।"—তারপর তিনি বিস্মিত ও হতভম্ব ফরাসী কাপ্তেনকে একে একে জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্সের কোন্ কোন্ রেজিমেণ্টে, কোথায় তিনি কাজ করেন, কবে, কোন্ তারিখে তিনি যুদ্ধবিভালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ সময়ে সৈন্যদলে তিনি কোন্ কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং কোন্ তারিখে কোন্ জায়গায় তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল—এক কথায় তাঁহার সমস্ত জীবনচরিতটি পুলিশ কমিশনার একনিশ্বাসে বলিয়া গেলেন,—এমন কি কাপ্তেন ঠিক কোন্ সময়ে বার্লিনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত।

জীবনচরিত সমাপ্ত করিয়া পুলিশ কমিশনার আপনার পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিলেন, তাহার উপরে কাপ্তেনের নাম ইত্যাদি লেখা ছিল। সেখানি কাপ্তেনকে দেখাইয়া পুলিশ কমিশনার আবার বলিলেন, "আপনি যখন দয়া করে আমাদেরই এক স্ত্রী-গোয়েন্দাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে আমরা মহাশয়ের ঘরে ঢুকে আপনার পোর্টম্যাণ্টো'র কৃত্রিম তল্লা সরিয়ে এই প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আসুন মশাই, ফ্রান্সে যাবার ট্রেণ শীঘ্রই ছাড়বে,—আমি আপনাকে সসম্মানে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব। বেশী ভাববেন না, আমরা আপনার জন্যে প্রথম শ্রেণীর কামরাই ভাড়া করেছি।" (ভারতী)

নারীর সৈনিক হওয়া উচিত কি না

আজকাল সভ্যজগতের প্রধান দুটি সমস্যার মধ্যে একটি শ্রমজীবী-সমস্যা অপরটি নারী-সমস্যা। শ্রমজীবী-সমস্যাটা লইয়া শুধু মূলধনী ও শাসনকর্ত্তারা মাথা ঘামাইলেই চলে, কিন্তু নারী-সমস্যাটা সকলের মস্তকই ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যাটা লইয়া দুইটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে। একদল বলেন "পুরুষ ও নারীর অভেদ অধিকার"; অপরদল বলেন "অসম্ভব!"

অধিকারপ্রার্থিনী নারীর দল বলিতেছেন—"সকল বিষয়েই আমরা পুরুষের মত সমান ও অবাধ অধিকার চাই—শাসনকার্য্যেই বল, ডাক্তারী ওকালতি ইঞ্জিনিয়ারী ব্যবসাবাণিজ্য, পুলিশ রেল বা সৈন্যবিভাগের যে-কোন রাজকর্ম্মই বল—সকল বিভাগেই পুরুষের মত অবাধ অধিকারের আমরা দাবী করিতেছি। কারণ পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে আমরা হীন নই।"

অপরপক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে নারী ও পুরুষের অভেদ অধিকার সম্ভব নয়, যেহেতু নারী—নারী, ও পুরুষ - পুরুষ,—গোড়াতেই এই বিষম প্রভেদ! চিরদিনের অভ্যাস যেমন নারীকে গৃহকার্য্য ও এই শ্রেণীর কাজকর্ম্মে পটু করিয়া তুলিয়াছে, পুরুষও ঠিক ঐ কারণেই বাহিরের অন্যান্য কার্য্যে বিশেষভাবে দক্ষ। সুতরাং হঠাৎ কর্ম্মভেদের মামলা রুজু করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে গেলে উদ্যোক্তার সিঁড়ি বুধোর ঘাড়ে গিয়া চড়িবে। এরূপ চেষ্টাটা নিতান্তই হাতের পক্ষে মুখের অধিকার কাড়িতে যাওয়ার মত। আরও, ইহা ছাড়া নারীর কতকগুলা শারীরিক ও মানসিক অযোগ্যতা আছে যেজন্য তাহার পক্ষে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু পুরুষ ও নারীকে ঠিক একই প্রকার কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে—উভয়ের গঠন দেখিয়া সেরূপ তো আদৌ মনে হয় না।

প্রতিপক্ষের শেষের যুক্তিটার পাশ কাটাইয়া ইহারা প্রতিবাদের এই উত্তর দেন যে—নারী পুরুষের চেয়ে দৈহিক বলে কোনো মতেই খাট নয়। যেহেতু বর্ত্তমানে অনেক মেয়ে-পালোয়ান দৈহিক বলে পুরুষের মতই কৃতিত্ব দেখাইতেছে। রাষ্ট্রজগতে রাণী এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, রুশিয়ার রাণী ক্যাথারিন, অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা প্রভৃতি, সাহিত্য-জগতে জর্জ্জ ইলিয়ট, জর্জ্জ স্যাণ্ড, মাদাম দে স্তেইল, সার্লট ব্রণ্টে, জেন অষ্টেন প্রভৃতি; বিজ্ঞানজগতে মাদাম কুরী; শিক্ষার মন্তেসরী; এবং ইতিহাস-খ্যাত অন্যান্য নারীগণও পুরুষের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নয়। জোয়ানঅফ্‌আর্ক, মার্গট কর্ডেট, জ্যারাগোজার বীরাঙ্গনা, ক্লোরেন্স ন্যাইটিঙ্গেল, মাদাম রোল্যাণ্ড প্রভৃতি আরো কত বিখ্যাত নারীর নাম করা যায়। সুতরাং নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইবে না কেন? ডাহা মেল বৃদ্ধ রাজা জর্জ্জের সেনাবিভাগে বহুকাল ধরিয়া দক্ষতা ও বীরত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। আরো আধুনিক সময়ের কথা, গ্রীক-বীরাঙ্গনা হেলেন কলটাণ্টিনাইডিস তুর্কীদের বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতা ও উৎপীড়িত স্বজনবর্গের জন্য অশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বীরত্বে এথেন্সের সেনাদল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমানকালেও কত নারী যুদ্ধকার্য্যে অশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

যে শারীরিক শক্তির অনুশীলন এতদিন পুরুষদের একচেটিয়া ছিল, আজ স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া, তলোয়ার খেলা, ঘুষোঘুষি, পথচলার বাজী প্রভৃতি সকল প্রমিক ব্যাপারেই আজকাল স্ত্রীলোকদের দেখা যায় এবং এ-সকল বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমও নন। প্রশ্নটা অনেকদিন হইতেই ছিল, তবে সম্প্রতি এই মহাযুদ্ধের মরশুমে চাঙ্গা হইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে যে "স্ত্রীলোকদের যুদ্ধ করা উচিত কি না।" একদল ইহার উত্তরে বলেন—"তা আর বলিতে! একান্ত উচিত—অবশ্য কর্ত্তব্য।" অপরপক্ষ প্রতিবাদ করিতেছেন "কখনই তা হইতে পারে না।"

একজন স্ত্রীলোক বলেন যে—যুদ্ধটা আজকাল তো আর গায়ের জোরের কাজ নয়—নিতান্তই বিজ্ঞানের বাহাদুরী। আমি দেখিয়াছি একজন নিতান্ত ক্ষীণাঙ্গী অবলা নারী নায়েগ্রার লক্ষ অশ্বশক্তির তড়িৎ প্রবাহটাকে সামান্য একটি বোতাম একটুখানি টিপিয়াই চালাইয়া

দিল। সুতরাং আজকালকার যুদ্ধে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ করা বৃথা।

চল্লিশবৎসর আগে আমেরিকার দুই রোক তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দৈহিক বলে আমরা অযোগ্য নই—জোরানঘার্ক, ফরাসীবিপ্লব, পোলিশ ও মার্কিনবিদ্রোহের রমণীগণ তাহার দৃষ্টান্ত। জোর যার মুলুক তার—এই জোর নারীদের চাই, নইলে ভোট অধিকারের মুলুকে আমরা ঢুকিতে পারিব না।

সম্রাজ্ঞী মেরী ইভানোভ্না মানবজাতিকে চারভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। পুরুষ, মেয়ে, পুরুষ-মেয়ে ও মেয়ে-পুরুষ। তিনি বলিতেন—"চরকা যদি না কাটিতে পারে তো মাঠে গিয়া ওরা কুচকাওয়াজ করুক। স্বামী লাভ করিবার যদি ক্ষমতা না থাকে তো যুদ্ধে গিয়া জয়লাভ করুক। আমি বরঞ্চ তাদের অধ্যক্ষ হইতে রাজী আছি।"

তাঁহার কথা-মত তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনুসন্ধানে গিয়া এই সংবাদ লইয়া ফেরে ফিরিয়া আসিয়াছিল যে—যুদ্ধে যাইবার মত মোটে বারোটি স্ত্রীলোক জুটিয়াছে। নাম দিয়াছিল প্রথমটা অনেকেই—তবে অনুসন্ধানে একে একে বাহির হইয়া পড়িল যে তাহাদের মধ্যে কেহ বাগ্দত্তা, কাহারো বিবাহ কার্য্য শীঘ্রই সমাধা হইবে—আর কেহ কেহ বা ইতিমধ্যে গোপনে বিবাহ কার্য্য সারিয়াই রাখিয়াছে।

অনেকে জানিতে ইচ্ছা করেন যে আজকালকার প্রধান প্রধান যুদ্ধব্যবসায়ী ও বিখ্যাতনারীদিগের এ সম্বন্ধে মত কি। এ সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত সেনানায়ক ও মহিলার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেককে নিম্নলিখিত কয়টি প্রশ্ন করিয়া পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহারা যে উত্তর দিয়াছেন তাহাও প্রকাশিত হইল।

প্রশ্ন ক'টি এই—

১। স্ত্রীলোক অবিবাহিত, কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইলে তাহার পক্ষে সৈনিক হওয়া উচিত কি না।

২। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী স্ত্রীলোকেরা যেমন দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল আপনিও সেইরূপ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। (এই প্রশ্নটি শুধু স্ত্রীলোকদিগের জন্য)।

৩। "আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ ও বন্দুকচালান করাটা কি আপনি কিছু অসম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করেন? আপনি মেয়েদের ও ছেলেদের মতই শারীরিক শক্তির অনুশীলন দরকার মনে করেন কি?

ইহার উত্তরে সেনাধ্যক্ষ লর্ড রবার্টস লিখিয়াছেন—দেশের জন্য যে মেয়েরা যুদ্ধ করিতে যাইবে ইহা আমি কস্মিন্ কালেও সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তবে মেয়েদের ও ছেলেদের মত শারীরিক শক্তির অনুশীলন দরকার—কিন্তু তাহা যুদ্ধ করা বা পুরুষের কাজ কাড়িয়া করিতে যাইবার জন্য নয়—শুধু প্রকৃত স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিশালী জাতির জননী হইবার জন্য। তবে মেয়েরা যুদ্ধে আহতদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিতে শিক্ষা করে—এটা খুবই বাঞ্ছনীয় বটে—এবং যদি তাহারা কোন দেশের কোনো কাজ করিতে পারে তো এই দিক দিয়াই পারিবে।

সেনাধ্যক্ষ সার ফ্রেক তাহার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—দরকার পড়িলে মেয়েরা যে নিঃস্বার্থভাবে সাহসের সহিত দেশের জন্য লড়িবে তাহাতে তিনি সন্দেহ করেন বটে, তবে, অন্যদিকে করিবার মত নারীদের যথেষ্ট কাজ আছে; যথা আহত সেনাদের সেবা শুশ্রূষা করা।

নারীদলের একজন সুযোগ্য নেত্রী মিসেস এম ই ব্যাক্সটার লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকদের কাজ সব সময়েই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ থাকা উচিত—তবে দরকার পড়িলে যুদ্ধকার্য্য হইতে তাহারা পশ্চাৎপদই বা হইবে কেন?

ভাইকাউন্টেস হার্বার্টন—যে স্ত্রীলোক যুদ্ধকার্য্য গ্রহণ করিতে চায় তাহাকে তাহাতে বাধা দেওয়াই বা হইবে কেন? বড় বড় বিষয়ে পুরুষের বা নারীদের চাইতে মনুষ্যত্বটাই আগে দেখা উচিত। মেয়েদের দৈহিকশক্তি অনুশীলনে আমি লজ্জার বিষয় কিছু দেখি না—বাস্তবিক লজ্জা ও অসম্মানের বিষয় যদি কিছু থাকে তো সে অবুঝের মত অর্থলোভী লোকদের পাল্লায় পড়িয়া হুজুগের মাথায় কিম্ভূতকিমাকার মত সব পোষাক পরিয়া

সঙ্ সাজিয়া নিতান্ত হাস্যাস্পদ হওয়ায়। যে বিষয় দেশের দিকে নারীদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তাহাতে বাধা না দেওয়াই সমস্ত দেশের ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর সন্দেহ নাই।

বিখ্যাত সন্তরণকারিণী মিসেস্ এইচএম প্রাইসজোন্স মেয়েদের দৈহিক শক্তির অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাবেক ব্যবস্থাটাই ঠিক—পুরুষরা যুদ্ধ করিতে যাইবে ও স্ত্রীলোক কান্নাকাটি না করিয়া তাহাতে তাহাদের উৎসাহিত করিবে। তবে প্রস্তুত থাকাটা ভালো। সেইকারণে ছেলে মেয়ে সকলকেই রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বিখ্যাত অভিনেত্রী ও উপন্যাস লেখিকা মিস এলিজাবেথ রবিন লিখিয়াছেন—পুরুষের চেয়েও স্ত্রীলোকের শারীরিক শক্তির অনুশীলন বেশী দরকার, যেহেতু পাশবিক অত্যাচারে পুরুষদের চেয়ে ভুগিতে হয় মেয়েদেরই বেশী এবং বিশেষতঃ পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ভিতর অন্যায় ও পোষাক প্রভৃতি অযথা কৃত্রিমতা এখনো ঢের বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। সেটা যাওয়া দরকার। পৃথিবীতে যুদ্ধই যদি রহিয়া গেল তো পুরুষ স্ত্রী সকলেরই তাহাতে সমভাগী হওয়া উচিত। তবে একটা দিকে খুবই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে স্ত্রীলোকদের সঞ্চিত শক্তির অপব্যয় না হয়, শুধু লোক ও সমাজের ধ্বংসকার্য্যে তাহা ব্যবহৃত না হইয়া তাহাদের গঠনকার্য্যে যেন নিয়োজিত হয়।

বিখ্যাত লেখিকা রেণ্টল এজলারের মতে প্রকৃত গুণবতী রমণীর পক্ষে যুদ্ধের চাইতে শান্তির ভিতরেই বেশী করিবার মত কাজ আছে। তবে যুদ্ধ ঘটিলে, ইতিহাসের বীরাঙ্গনাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার মনে হয় যে, স্ত্রীলোকেরা বোধ হয় নিতান্ত অযোগ্যতা দেখাইবে না। ইংলণ্ড শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে স্ত্রীলোকের সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিয়া পুরুষসৈন্যরা যদি দেশের জন্য লড়াই করিয়া মরে তখন বিজিত জাতির নারীদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করার চেয়ে যুদ্ধে হত পুরুষদের স্থানে গিয়া লড়াই করিয়া মরা তিনি খুব ভালো মনে করেন।

সফ্রেজিষ্টদের একজন বিখ্যাত নায়িকা উল্‌ষ্টেনহোম এল্‌মি লিখিয়াছেন—সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া যুদ্ধে যাইবে এরূপ আশা আপনারা নিশ্চয়ই কখনই করেন না। লর্ড রবার্টসের কথার উত্তরে আমি এই বলি যে, দেহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যুদ্ধশিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আর-এক কথা মেয়েদের পর্য্যন্ত লড়াইয়ের দিকে টানিয়া শেষটা ফল হইবে এই যে দেশের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির প্রবৃত্তিটাকে অনর্থক অযথা বাড়াইয়া তুলিয়া শান্তি নামক পদার্থটার একেবারে বিলোপ সাধন করা হইবে।

হকি খেলার ওস্তাদ ও পুরাদস্তর পালোয়ান মিস্ অলব্যালডিষ্টন বলেন—প্রশ্নটা সময়োপযোগী বটে। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের ভিতর যেন একটা যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ক্রমশই দৈহিক শক্তিতে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে আর পুরুষরা ক্রমশই বুকপকেট সিকলিকে তালপাতার সেপাই হইতেছে। কথাটা 'অবলা' না হইয়া 'অবল' হইলেই মানেটা ঠিক হয়। শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা ভালো সৈনিক হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকদের যুদ্ধে যাওয়ার সপক্ষে আর-একটা যুক্তি এই যে সেবা ও শুশ্রূষার কার্য্যে পুরুষরাই নাকি আজকাল খুব ভালো বলিয়া জানা গিয়াছে এবং যেহেতু ইংলণ্ডে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা এক লক্ষেরও কিছু বেশী এবং এই একলক্ষ স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে স্বামীলাভ যখন সম্ভব নয় তখন বাধ্যতামূলক যুদ্ধপ্রথা হইলেই বা যুদ্ধে যাইতে বাধা কি? অন্ততঃ আমি তো পিছপা নই।

মিস ইলেইন টেরিস—দরকার পড়িলে স্ত্রীলোকদেরও যুদ্ধে যাওয়া উচিত বটে এবং আমি নিজেও যাইতে প্রস্তুত। তবে আহতের সেবা ও শুশ্রূষার দিকে স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা পরিচালনা করাটাই আমি বেশী দরকার মনে করি। তাহাদের দৈহিক শক্তির অনুশীলনও বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলি। আমার মনে হয় যে স্ত্রীলোকের দেহ খুব কঠিন কাজ করিবার মত করিয়া গঠিত নয়। পরস্পর দ্বন্দ্ব না করিয়াও পুরুষ ও নারী বেশ সহজভাবে আপন আপন কাজ করিয়া যাইতে পারে

বলিয়া আমার বিশ্বাস। পুরুষেরা যে যুদ্ধকার্য্যে বেশী দক্ষ ও স্ত্রীলোকেরা যে সেবা ও শুশ্রূষার কার্য্যেই বেশী পটু তাহাতে সন্দেহ নাই।

মিস উইনফ্রেড এমিরি—আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রীলোকদের ব্যায়াম, বন্দুকছোড়া অভ্যাস করা দরকার বটে। তবে দেশ রক্ষার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতে যাইবে ইহা আমি কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না। সৈন্যসংখ্যা পুষ্ট করিবার জন্য এক পুরুষজাতিই যথেষ্ট।

রাইফেল চালানোর ওস্তাদ মিস এগনিস হার্ব্বার্ট লিখিয়াছেন—না, স্ত্রীলোক যে কখনও সৈনিক হইতে পারে এ আমি একেবারেই সম্ভব মনে করি না এবং সৈনিক হইবার জন্য নারীর যে নিরানন্দ জীবন যাপন করাটা এত প্রয়োজন কেন তাহাও বুঝিনা। সাধারণতঃ অবিবাহিতা ও বিধবাদের চেয়ে বিবাহিতা রমণীদেরও বেশী সাহস দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাস্তবিক তাহারাই বেশী যুদ্ধপটু যেহেতু সংসারের সহিত তাহারা নিত্যই যুদ্ধ করিতেছে। আপনারা যে কৌমার্য্যের কথা বলিয়াছেন, কণ্ঠ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও স্থিরচিত্ত হইতে হইলে তাহা ছাড়া আরো কিছুর প্রয়োজন আছে। পাঁচশত স্ত্রীলোকের ভিতর একজন কুমারী বাছিয়া লইলে হয় তো আপনারা যে আদর্শ চাহিতেছেন তাহার অন্ততঃ কাছাকাছিও হইতে পারে, কিন্তু যদি আপনারা এহেন কুমারীর দল কলের বলে হাজার হাজার তৈরি করিতে চান তাহা হইলে তাহার মূল্য ও কার্য্যকারিতা রহিল কোথায়? যুদ্ধে পুরুষসৈন্য নারীসৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে এরূপ কখনোই হইতে পারে না। কারণ সেটা প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত বিদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ত্রী-পুরুষের জাতিগত যুদ্ধ একটা ঘোর প্রাকৃতিক বিপ্লব ছাড়া আর কি? কাযে কাযেই প্রমীলাদলকে প্রমীলার দলের বিরুদ্ধেই দাঁড় করাইতে হইবে। তার পর দেখিবেন, দুইদল মুখোমুখি করিয়া দাঁড়করাইয়া প্রস্তুত হইতে হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবার আগেই বিবাদের কারণটা যে কি তাহার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া যাইবে না—পরস্পরের প্রতি জিঘাংসাও কোথায় উবিয়া যাইবে। কোথায় তখন যুদ্ধ আর কোথায় কি। বিশ্বের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকেরা ঠিক এই এক ছাঁচেই তৈরি। তবে বিবাদের ব্যাপারের সমস্যাটা সমাধান করিবার পক্ষে এ ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। মেয়েদের যুদ্ধে পাঠাইলে আমাদের বর্ত্তমানের পুরুষ-পিছু-সাতটা স্ত্রী-অবস্থাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া যায়। আর একটা জিনিস—স্ত্রীলোকেরা মোটেই দলবদ্ধ জীব নয় অথচ জগতের একমাত্র মাংসাশী দলবদ্ধ জীব হইতেছে সৈনিকগণ। যাহা হৌক ছেলেদের মত মেয়েদেরও শারীরিক শক্তির অনুশীলনের পরামর্শটা মন্দ নয়, ইহার দ্বারা তাহাদের মানসিক উন্নতিও হইতে পারে। ইংলণ্ডে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকরা তাহার মূঢ় ও অশিক্ষিত এবং মানসিক অবস্থায় তাহারা একই স্তরের পুরুষদের চাইতেও ঢের নীচে। এবং ইহাদের পুত্রসন্তানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কন্যা-সন্তানদের চাইতে ঢের বেশী মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে। স্ত্রীলোকদের যুদ্ধ করিতে হইলে সব সৈন্যই কিছু বড়-ঘর হইতে লওয়া চলিবে না—ডাকপিয়নের দিদি, কনেষ্টবলের পিসি, টমি এট্‌কিনের বোন এই-সব অশিক্ষিত মোটাবুদ্ধি নিম্নশ্রেণী হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে—ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। এইসব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগুলাকে যুদ্ধশিক্ষা দিয়া তাহাদের যদি ওয়েলিংটনের মত করিয়া তোলা যায় তথাপি ইহাদের উপর নির্ভর করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কারণ এক মুহূর্ত্তের বিপত্তিতে কত বছরের শিক্ষাদীক্ষা চকিতে কোথায় ভাসিয়া যাইতে পারে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। বন্দুকছোড়া আমি লজ্জার কথা তো মনেই করি না বরং দরকারী মনে করি। কি-আনির কথা বলা যায় না—উহারই উপর হয় তো একদিন পেটের ভাত নির্ভর করিতে পারে। তার দেখাইয়া দুই লোকেরা যে ইংলণ্ড-আক্রমণের কথা রটাইতেছে বাস্তবিকই যদি তাহাই ঘটে তবে সে বিপদকালে আমি অবশ্যই কামানের পিছনে পুরুষসৈন্য তার পিছনে যে নারী-সৈন্য তার পিছনে থাকিয়া ইংরেজ-নারীর গৃহরক্ষার জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিতে রাজী আছি। (প্রবাসী)।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free:
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow? (Tennyson.)

মর্ম্মানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard." (William Lloyd Garrison.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ | অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২২ | [illegible] সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে নারীহত্যা।

ভারতবর্ষে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা তুলনা করিলে দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প। অপর জন্মের সংখ্যা আলোচনা করিলে দেখা যায় হাজার করা বালক অপেক্ষা ৩৮টী অধিক বালিকা জন্ম গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের সদ্যোজাত শিশু হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু পর্য্যন্ত সংখ্যা গণনা করিলে এই বর্দ্ধিত সংখ্যা অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার উপরেই বালিকাদের মৃত্যু শতকরা বাড়িতে থাকে। ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সে—অর্থাৎ জীবন ও স্বাস্থ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়ে অসংখ্য নারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদেশের স্ত্রীলোকদের উপর যমের কোন রাগ নাই, সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া যম যে ভারত নারীদিগের ভবের লীলা অকালে সাঙ্গ করিয়া দেয়, এমন মনে করিবার কারণ নাই। এদেশের সমাজই এই নারীহত্যার কারণ। সমাজে নারীর দুরবস্থা, বিবাহ দিবার সময়ে বালিকা যাহা পিতামাতার সম্মানার্হ হইবার আশঙ্কা সূতিকা গৃহেই বালিকার বিরুদ্ধে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। একটী বালকের অসুখ হইলে তাহার রোগমুক্তির জন্য যেরূপ ব্যস্ততা দেখা যায়, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, বালিকার অসুখে খুব কম পরিবারেই তাহা দেখা যায়। প্রাচীনা গৃহিণীদিগকে কথায় কথায় বলিতে শোনা যায়, "ওরে বাছা, মেয়ের প্রাণ, সহজে যাবে না, ভয় নাই।" তারপর অবরোধ প্রথা প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে এদেশের নারী-জাতিকে দূরে রাখিয়া তাহার জীবন বিষময় করে। এভাবেও যে এদেশের স্ত্রীজাতি আরো দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছেনা, ইহাই আশ্চর্য্য।

সমাজের এই অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার পন্থা নারীকেই করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এই রোগের একমাত্র ঔষধ। নারীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে নারীগণকেই পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রীমহামণ্ডল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; মহামণ্ডলের আদর্শ গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত হউক।

দেবোত্তর অর্থের সদ্ব্যবহার।

আমাদের দেশে কত দেবালয়ে কুবেরের অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে, কত অর্থ দেবালয়ের সেবকদিগের ভোগবিলাসে নিরন্তর ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছে। কত ভক্তের ভক্তিপূত অর্থ নরকের সেবায় ব্যয়িত হইতেছে, জড়তাগ্রস্ত হিন্দুসমাজ নীরবে এই পাপের প্রশ্রয় দিতেছে। দেশের কত অভাব কত দুঃখ! এই সকল দেবোত্তর সম্পত্তি যদি তাহার মোচনে ব্যবহৃত হয় তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে, ভক্তের দানও সার্থক হয়। কিন্তু এই সকল দেবালয় তাহা না করিয়া দেশের পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেছে। সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভবনগরের গ্রোপীনাথজিউর মোহান্ত দেবালয়ের তহবিল হইতে ৪০ হাজার টাকা একটী সৎ কাজে অর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার সাহায্যে ভবনগরে একটী প্রসূতি-হাসপাতালের (Maternity Hospital) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু এই টাকাতেই হাসপাতাল পরিচালন কার্য্য চলিবে না, এজন্য প্রতিবৎসর দেবাদ্বের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে আরো অর্থ প্রদত্ত হইবে। জামনগরের আর একটী দেবালয়ের ট্রাষ্টিগণ জনসাধারণের উপকারার্থে কতকগুলি স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। এই দুইটী দেবমন্দিরের কর্তৃপক্ষ যে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন ভারতের অন্যান্য দেবমন্দিরের অধ্যক্ষগণ যদি তাহার অনুসরণ করেন তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যায়।

ভারতবাসীর ভদ্রতা।

বোম্বাইএর গবর্ণর ওইলিংডেন সে দিন বোম্বাই-এর একটী কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় ভারতবাসীর ভদ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন:—"যে সকল ছাত্র কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবে তাহাদের ব্যবহার ভদ্র হওয়া বিশেষই উচিত। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, আমার বিশ্বাস, ভারতবাসী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুভদ্র জাতি। একথাও আমি না বলিয়া পারি না, যে তাহারা এতই ভদ্র যে অপরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তাহারা শুধু অপরের মনস্তুষ্টির কথা বলিবার জন্যই অতিশয় ব্যগ্রতা দেখাইয়া থাকে। ইহা আমার নিকট সমীচীন মনে হয় না। ব্যবহারে যতটা সম্ভব ভদ্রতা দেখাও, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে তোমার মতামত নির্ভীক ভাবে প্রকাশিত করিতে কুণ্ঠিত হইও না। তোমার নিকট তোমার মত যদি যুক্তিযুক্ত মনে হয় তবে সে সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণে অথবা ব্যক্তিবিশেষে কি বলিবে ভাবিয়া তাহা প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইও না।"

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করা আমাদের দেশের অনেকের নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের বুদ্ধি ও শক্তির বলেই উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ নহেন। ভারতবাসী অনেক ভদ্রলোক যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগের তোষামোদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনোরঞ্জন কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহা বুঝেন, সুতরাং তাঁহাদের মূল্যও তাহাদের অজ্ঞাত থাকে না। প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর সকলেই করিয়া থাকে—যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে তাহারা, আরো বেশী করিয়া মনুষ্যত্বের সম্মান ও অপদার্থতাকে ঘৃণা করিতে জানে।

পঞ্চমা।

গীতায় লিখিত আছে ঈশ্বর গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ হিন্দু সমাজেই পঞ্চমা অর্থাৎ চারি জাতির অতিরিক্ত পঞ্চম এক জাতি দেখা যায়। পারিয়া প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিগুলি মান্দ্রাজ অঞ্চলে "পঞ্চমা" নামে অভিহিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই অস্পৃশ্য জাতীয় লোক আছে। শাস্ত্র-

বহির্ভূত এই শ্রেণী কোথা হইতে আসিল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেনযে সকল অনার্য্য জাতীয় লোক হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে তাহারাই এই "পঞ্চম" শ্রেণী। হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক অনার্য্য জাতীয় লোক যে হিন্দু সমাজ ভুক্ত হইয়া চলাচরণীয় হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে এই উন্নয়ন ক্রিয়া এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নতুবা আরো কত অনার্য্য জাতীয় লোক হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজকে বলশালী করিতে পারিত।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস রাও নামক একজন লেখক লিখিয়াছেন, এক এক সময় এক একজন ব্যক্তি বা এক একটী দল যে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া গিয়াছে পুরানাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে শ্রীকৃষ্ণ দাসী-পুত্র বিদুরের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যেও বিতরণ করিয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত সমভাবে মিশিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনি চণ্ডালী অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই অরুন্ধতী আদর্শ পত্নীরূপে হিন্দু নারীসমাজের পূজা এখনও লাভ করিতেছেন। ঋষ্যমুনি মিশর দেশে গিয়া এক হাজার ম্লেচ্ছকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন এবং তাহাদিগকে দ্বিজ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে কঙ্কন উপকূলে একটী সমগ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। অযোধ্যার একজন রাজা লক্ষাধিক শূদ্রকে যজ্ঞোপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভোজন করাইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হিন্দু সমাজ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

শিক্ষা-বিস্তার।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। স্বাস্থ্যহীনতায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ম্যালেরিয়ায় বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। প্রজাসাধারণের পিতামাতা স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী হইয়া দেশবাসীকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার উপায় করিবেন ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বেশী আর কি করিতেছেন—আর এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থই বা এই দুর্দ্দিনে মিলিবে কোথা হইতে? গবর্ণমেণ্ট যতটুকু করিতেছেন আমরা তাহার জন্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আমাদের মনে হয় গবর্ণমেণ্টই বল আর দেশের নেতাগণই বল, দেশের প্রধান অভাব, সকলের বড় কথা—শিক্ষাবিস্তারের প্রতি যথোচিত মনোযোগ কেহই দিতেছেন না। অনেকে বলেন, আগে স্বাস্থ্য—পরে শিক্ষা। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? জনসাধারণ শিক্ষিত না হইলে শুধু বাহির হইতে শিক্ষা দিয়া কি দেশের স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি-সাধন সম্ভব? আমরা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মপ্রণালী প্রচার করিতে পারি কিন্তু যাহাদের জন্য প্রচার করা তাহাদের সেগুলি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার শক্তি না থাকিলে কি তাহা ফলপ্রসূ হয়? "আয়ত্ত করা" শুধু-কথাটা বুঝিতে পারা নয়, প্রাণের ভিতর হইতে বিষয়টীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা। শিক্ষালাভ না করিলে খুব অল্প লোকই তাহা পারে। এক একটা জাতির মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নিয়ম-প্রণালীর অধীন হইয়া চলা প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। হিন্দুদের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল আহার বিহার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেকটা প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়া-ছিল, কারণ শিক্ষার আলোকে যে সকল বিধিনিয়ম প্রাচীনকালে স্বাস্থ্যের অনুকূল বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া-ছিলেন ধর্ম্মের বাঁধন দিয়া সেগুলিকে তাঁহারা জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জন্য লোকে সেগুলিকে পালন করিত। উষাকালে উঠিয়া বাড়ীঘর ঝাট দিয়া গোবর ছড়া দিলে গৃহে লক্ষ্মী বাস করে গৃহিণীরা তাহা বিশ্বাস করিতেন। এজন্য প্রত্যহ অন্তরে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল এই কার্য্যটি তাঁহারা সম্পাদন করিতেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর জননীর খাদ্যদ্রব্য অমার্জ্জিত না রাখা সম্বন্ধে নিম্নে যাহা বলা হইতেছে তাহাও এই ভাব হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু ধর্ম্মের ভাবটী চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপকারী বিধিটীর প্রতি শ্রদ্ধাটীও চলিয়া যায়। শিক্ষা থাকিলে এইটী হইবার যো নাই।

শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা কেন, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক কোন সংস্কারই সম্ভব নয় যদি সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হয়। জমি চাষ না করিলে যত উৎকৃষ্ট বীজই বপন না কর কেন ফল ফলিবে না। শিক্ষাবিস্তার দ্বারা সাধারণের মন প্রস্তুত না করিলে তাহারা কোন সংস্কারই গ্রহণ করিবে না। দেশের নেতৃগণের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা একটু আন্তরিকতার সহিত দেশের কথা ভাবুন। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির প্রতি দেশ-নায়কদিগের বর্ত্তমান অমনোযোগ দেখিলে হৃদয় ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়,—মনে হয়, এ পোড়া দেশের কথা কেহ ভাবে না, আমাদের দেশহিতৈষিতা শুধু বাক্যে পর্য্য-বসিত। ভাবিতেন গোখলে, তিনি অকালে চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার মতন—অন্ততঃ তাঁহার পদানুসরণ করিবার মতন লোক কি দেশে নাই?

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী।

সুমাতা না হইলে সুপুত্র হয় না। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ দেশবাসী শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতার চরিত্র সম্বন্ধে সম্প্রতি এডুকেশন গেজেটে কিছু লেখা বাহির হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি সংকলন করিলাম।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতা অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন। কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীট যেখানে খোলা হই-য়াছে—সেইখানে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতামহালয় ছিল।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতার শিক্ষাপ্রণালী উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন যে শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়েদিগের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ওগুলি মাটির পুতুল নহে, যে যা'মনে করিয়া নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার দ্বারা প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আকাশ অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে। তিনি কোন পৌত্রবধূকে বলিয়া-ছিলেন ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে; কিন্তু ও যখন দেখিবে যে প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমনটি উচিত ঠিক সেইটুকু শাসন কর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার এডুকেশন বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক এই উদাহরণটীই দিয়াছেন—উভয় শিক্ষকই এই উপদেশ দিতে পারিয়াছেন—সত্যপ্রিয়তা হইতে। যাহা যাকে মিথ্যা-সংস্পর্শ দেখিলে ছেলের সুশিক্ষা যে হইতে পারে না—উভয়েই ধরিতে পারিয়াছেন—সত্যপ্রিয় মানব মাত্রেই এই সূত্র ধরিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু শৈশব হইতে আম খাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্মরণ আছে যে তাঁহার চারি বৎসর মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ়ে তাঁহাকে আম দিলেন না; বলিলেন আষাঢ় মাসে আম খাইতে হইবে না; যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই; তুমি বল আষাঢ় মাসে আম চাহিবে না; অনেক কান্না কাটি করিলেও তিনি ঘরে আম থাকিতেও তাহা দিলেন না। "আম চাহিব না" এই কথা—মারপিট প্রভৃতি কিছুই না করিয়া—শুধু পাখী পড়ানর, চেষ্টার ন্যায় নিজেই বলিতে থাকিয়া দেখে শিশুকে দিয়া কথা বলাইলেন। দাওড়ী তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দিলেই বা—অত জিদ করিতেছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধ ভাবে উত্তর দিলেন, "মা! আপনি বলিলে এখনই দিব, কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশ কাল ভাল নয়; ব্রাহ্মণের ঘর।" সমেত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার—একান্ত বশীভূতা বধূর—অতিশয় নম্রতা সহ অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই; এক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত

মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু মাতার সহিত পাখিপড়ার মত বলিল "আম চাহিব না ; আমাচু মাল।" সেই দিন রাত্রে শাশুড়ীরও কথারক্ষা সম্পূর্ণভাবে করা উচিত বোধে শিশুকে একটী আম দিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়া দেন "তুমি চাহিবে না—এ বারে আমিও আর দিব না।" বাটী শুদ্ধ একমত না হইলে শৈশবের সুশিক্ষা হয় না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট আপীলে সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ় হয় না। আদি গুরু পিতামাতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

আর একবার একটী পৌত্র জিদ ধরে যে একটী পিস্তলের কুলুপ লইবে। তিনি বলেন আর একটী আনাইয়া দিব, তাদটী খেলায় নষ্ট করিও না। তাহার পর ঐ কথা ভুলিয়া যান। মাতার কথা সত্য রাখার জন্য সন্ধ্যার পর লোক পাঠাইয়া ঐ কুলুপ আনাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি চাকর প্রতিপালন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের এবং কর্ত্তা ও গৃহস্থ সাধারণের যেন একই চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়। ভাতের সম্বন্ধে কোন তারতম্য না হয়; তরকারি সম্বন্ধে না হয় দুই একটা তাহারা কম পাইবে। কতটা সাংসারিক সুবিধা এই উদার গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় নিহিত। (১) কি চাকরেরা দেখে যে উহারা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাবেই ব্যবহৃত: এ উদারতা উহাদিগকে প্রীত করিবেই করিবে এবং উহাদের কার্য্যও ভাল হইবে; (২) আহারাদির বৃথা আড়ম্বর সমস্ত পরিবার মধ্যেই কম থাকায় অনাবশ্যক ব্যয়ে অর্থনাশ হইবে না (৩) স্বচ্ছল বাঙ্গালীর মধ্যে বর্ত্তমানকালে বর্দ্ধনশীল মারাত্মক রোগ প্রাত্যহিক ভোজন-বিলাসিতা—সঙ্কুচিত থাকিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার সাহায্য করিবে। তিনি বলিতেন যে বাটীতে পাচক বা অপরাপর যে কোন ব্রাহ্মণ থাকে তাহাকে একটু একটু দুধ দিতে হয়।

ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য তিনি কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলি কীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য; দেহাভ্যন্তরস্থিত নারায়ণের সেবারও অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। নিজেরা যাহা খাইব না—কি চাকরকেও তাহা দিব না, তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। ঐ ক্রটিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দুভাবে প্রত্যক্ষই করিতে পারিতেন—শুধু দেহের স্বাস্থ্য জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণও তাহাই বলিতেছেন—ভোজ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা ভারত-মহিলায় ভ্রম ক্রমে "মরুভূমিতে তিনটী স্বপ্ন" নামক প্রবন্ধটী "আলো ও ছায়া রচয়িত্রী" লিখিত বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই রচনাটী ব্রন্টের আলো ও ছায়া রচয়িত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী যামিনী সেন এম, বি, কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত।

অন্বেষণ

১

তৃষিত হৃদয় মম খুঁজিছে ভুবনে
তৃষিত হৃদয়,
এত হাসি এত গান, আর না জুড়ায় প্রাণ,
লাগে বিষময়!
গোপন মরমতলে
আকুল নয়ন-জলে
কত সাধ, কত আশা জাগে অনিবার!
কে শুনিবে, কারে কব, কারে পেয়ে তৃপ্ত হব,
কে হবে আমার!
সারা নিশি-দিনমান
মোর শুধু এই ধ্যান,
এই অন্বেষণ—
শীতল হইবে কবে তৃষিত হৃদয়
বিরহী জীবন!

২

কে আজি আমার মত বিশাল ধরায়
পিপাসা-কাতর,—
কার হৃদি উপেক্ষায় ভগ্ন হয়ে গেছে যায়,
রহিছে অন্তর !
জীবন-যৌবন কার
অভিশাপ বিধাতার,
কহিতে প্রাণের কথা নাহি অধিকার !
সংসার-মরুর পথে সারাটী জনম হতে
একা কেবা আর ?
আকুল পরাণ-টানে
নিরখিতে মুখ পানে
কেহ নাই কার ?—
তৃষিত হৃদয় লয়ে রহিয়াছি আমি
পথ চেয়ে তার !

৩

কোথা সে তাপিত হৃদি চির-তৃষাতুর !
এস আজি ধায়,—
একান্ত মরম পাশে সুনিবিড় তুজ-পাশে
বাঁধিব তোমায় !
আমার এ শূন্য-বুক
তব লাগি স্বতোমুখ
রহিয়াছে চিরকাল, এস তুমি আজ !
সঙ্কোচের অবসর নাহি হেথা তিলতর,
নাহি বিধা-লাজ !
তু'জনা যে একমত
তৃষিত তাপিত কত
নিঠুর ধরায়,—
মিলে মিশে তু'জনা যে হব একাকার
হিয়ায় হিয়ায় !

৪

অচেনা অজানা আমি, কোটি জনমের
পরিচিত-ধন !
কোথা তুমি মোর তরে, জাগিছ প্রতীক্ষা করে,
রয়েছ গোপন ।
এস, আজি ধরা দাও,
মুখ তুলে শুধু চাও,
মধুর মিলন-সুখে জুড়াক্ হৃদয় !
বিজন কানন মাঝ রচিব কুটীর আজ
শান্তি-সুধাময় !
কেবলি পাখীর গানে,
তটিনীর কল-তানে,
ফুলের হাসিতে,
তু'জনা ডুবিয়া রব ভরিয়া হৃদয়
জ্যোছনা রাশিতে ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

প্রবাসী বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা-সাহিত্য

বাঙ্গালী বাঙ্গালায় থাকিলেও বাঙ্গালী আর প্রবাসী হইলেও বাঙ্গালী, আর বাঙ্গালাই আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গালায় বাঙ্গালা শিক্ষার বা মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের যথেষ্ট উপায় আছে কিন্তু সুদূর প্রবাসে সেটী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন হয় না? সেই বাঙ্গালী, সেই তাহাদের মাতৃভাষা তথাপি এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ আছে। প্রথমতঃ যেখানে যাহার উৎপত্তি সেই খানেই তাহার পরিণতি ও বিস্তৃতি যতদূর সম্ভবপর হইতে পারে অন্যত্র সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও সহজসাধ্য নয়। মাটীর গুণ থাকা চাই অর্থাৎ মাটী উর্ব্বরা হওয়া চাই, উপযুক্ত পরিমাণে তাপ ও জল প্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত থাকা চাই। অঙ্কুর উদ্গমেই যাহাতে কীটদষ্ট না হয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা চাই এবং পরিশেষে "ছাগে না মুড়ায়" তদ্বিষয়েও যত্ন করা উচিত। এত করে যদি সেই ক্ষুদ্র বীজটী হইতে অঙ্কুর এবং সেই অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃক্ষে পরিণত হয় তবেই তাহা হইতে সুফল প্রাপ্তি আশা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে অনেকের বাগান

আছে, সে সব বাগানে অনেক রকমের ফলের গাছও আছে। সীলেটের কমলার গাছও আছে, আর মোকাম্‌-পুরের লীচুর গাছও আছে কিন্তু তেমন ফলটী পাওয়া যায় কি? না পাইবার কারণ শুধু মাটীর গুণ। লক্ষ্ণৌ এর সফেদা খরবুজা বাঙ্গালা দেশে জন্মে না। একথা বলিতেছি না যে বাঙ্গালা দেশে খরবুজা হয় না—হয়, কিন্তু ঠিক এমনটী হয় না; এও সেই মাটীর গুণ। তেমনই যেখানে যে ভাষার উৎপত্তি পরিণতি এবং বিস্তৃতি সেইখানে সেই ভাষার অনুশীলন ও উন্নতি যেরূপ ভাবে হইতে পারে অন্যত্র সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। সঙ্গ, আচার ব্যবহার রীতি-নীতি প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে সাহিত্য অনুশীলনেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বাঙ্গালীর প্রবাসবাসের কারণ সাধারণতঃ তিনটী। প্রথম পেটের দায়ে, দ্বিতীয় সখের জন্য, তৃতীয় রোগের জন্য। এই তিনটী কারণের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে কিন্তু প্রথমটী দীর্ঘকাল বা চিরকালের জন্য। কাজেই এই প্রবাসী প্রথম দলের সংখ্যা তত্রত্য অধিবাসীগণের অনুপাতে নিতান্ত অল্প। সুতরাং এই অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীকে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের "সেখানকার সমাজের অনুরূপ আপনাদিগকে করিয়া লইতে হয়। শিক্ষা এবং সাধনা ব্যতীত কোনও বিষয়ে উন্নতি করা যায় না। সুতরাং সেখানকার প্রথম শিক্ষাই ভিন্ন ভাষা। সেখানে মাতৃভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাক বরং দিন দিন অবনতি হইয়া থাকে। প্রবাসী বাঙ্গালীরও ঠিক সেই অবস্থা। মাটী সিলেটের কমলার বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ফল হইয়াও মাটীর গুণে টক।

আজকাল শিক্ষার প্রধান স্থল বিদ্যালয় কাজেই তরুণ শৈশব হইতেই শিশুগণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্থানীয় ভাষার সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইয়া নিজের মাতৃ ভাষাকে বিমাতার ন্যায় দূরে রাখিয়া দেয়। সতীর্থগণের সহিত আচার ব্যবহার কথোপকথন প্রভৃতিতে তাহাদের স্বভাবও নিতান্ত ভিন্ন ভাবাপন্ন করিয়া তুলে। এক্ষেত্রে কিরূপ ফল হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দোষ শুধু মাটীর। আবার কোনস্থলে মাটীর গুণে হয় ত অঙ্কুর উদ্গত হইল কিন্তু যত্নের অভাবে তাহা অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হইল। চারা হইয়াও অনেক সময়ে যত্নের অভাবে মরিয়া যায়। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সন্তানদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে এইরূপেই অবনতি ঘটিয়া থাকে। যাঁহাদের আদর্শ করিয়া সুকুমারমতি শিশুগণ এই বিষয়ে আপনাদিগকে উন্নত করিবে সেই পিতামাতাগণের দোষেই প্রায়শঃ এইরূপ কুফল ফলিয়া থাকে। প্রথমতঃ তাঁহাদের নিজেদের বাঙ্গালা ভাষার উপযুক্ত অনুশীলন করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। অনেকে অনেক সময়ে কাজে কাজে অতিবাহিত করিয়া সময়াভাবের যথেষ্ট হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং এই একটী মাত্র কারণ দর্শাইয়া সন্তানদের শিক্ষার পথও কণ্টকিত করিয়া তুলেন। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠের সঙ্গে যদি তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানগণকে একটু একটু করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার সহায়তা করেন তাহা হইলেও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কিছু কিছু আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। রুগ্নশিশু যেমন ঔষধের গুণ না বুঝিয়া ঔষধ সেবন করিতে বিরক্ত হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদের জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ভাল মন্দ বুঝিতে শিখে তখন রোগের প্রতিকারের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঔষধ সেবন করে; শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক সেরূপ নিয়ম খাটিতে পারে কিন্তু সোজার গলদ হইলে কখনই সুফল ফলে না।

আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি, বাঙ্গালীর ছেলে তাহার মাতার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা না কহিয়া খাঁটী উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? ইহা কি সন্তানের দোষ? বোধ হয় না। এমন বয়োবৃদ্ধ প্রবীণকেও দেখিয়াছি যিনি আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার সময়ে গর্ব্বভরে বলিয়াছেন "হামি বি বাঙ্গালী আছে।" "বাঙ্গালা দেশ কলকত্তায় আমার বি মোকাম আছে।" এমন অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁহারা মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বেশ কহিতে পারেন

বটে কিন্তু তাহাদের নিজের নাম সহি করিতে গলদ্ ঘর্ম ঘটিয়া যায়।

যে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনের পথে এতগুলি অন্তরায় তাহাদের দ্বারা কি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা একেবারেই অসম্ভব? কখনই না। ইচ্ছা ও একাগ্রতা থাকিলে সকলই সম্ভব। সমবেত চেষ্টায় কত অসাধ্য সাধন হইতেছে আর শুধু জাতীয় ভাষার অনুশীলন হইতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। এই লক্ষ্ণৌ সহরের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল কাজেই বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার কোনও উপায় ছিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখানকার বাঙ্গালীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই পরস্পরের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার পথ একটু একটু করিয়া পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। সাধারণের জন্য পাঠাগার, বাঙ্গালীদিগের, বাঙ্গালী বালক বালিকাদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। অধুনা বালক ও বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার উপযোগী দুই তিনটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

আমাদের আর একটী মহৎ দোষ এই যে আমরা বড় অনুকরণপ্রিয়। আমরা অনেক সময়ে পরের অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের মাতৃভাষার উপর ঘৃণা করিয়া থাকি, কিন্তু আর কোনও দেশের বা প্রদেশের লোক সেরূপ করে না। বিলাতে কত মহামহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন কিন্তু তাঁহারা কি তাঁহাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াছেন? কলিকাতা সহরে কত মারওয়াড়ী, পাঠান, ফ্রেঞ্চী আছেন যাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া ভ্রম হয়, তাঁহারা কি তাঁহাদের মাতৃভাষা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? কখনই না। কেবল মাত্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সহিত আপনাদিগকে এতটা পরিচিত করিয়াছেন মাত্র। ঠিক সেই হিসাবে দেখিতে গেলে আমরা ঠিক তাহার উল্টা করিয়া ফেলি; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা আমাদের একটা মহৎ দোষ এবং এ দোষের জন্যই আমাদের অনুকরণপিপাসা মাতৃভাষার আলোচনার পক্ষে অন্যতম অন্তরায় হইয়া পড়ে।

যেখানে এতগুলি অন্তরায় সেরূপ স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? সমবেত চেষ্টায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালীর নাম, বাঙ্গালীর মর্য্যাদা, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিতে ধৈর্য্য ও একাগ্রতা সহকারে সমস্ত জড় কাপট্য ঠেলিয়া মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। সামান্য বাধা বিঘ্নে নিরাশ হইলে চলিবে না। যদি আমরা ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের জাতীয় ভাষার উন্নতির পক্ষে আরও সহায়তা হইবে। আজ এই সভ্যতার যুগে বাঙ্গালার বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দৈনন্দিন উন্নতি হইতেছে সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও সেই ভাষার পরিণতি ও বিস্তৃতির জন্য আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হইবে। তাহার অভাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব আর কিছুই থাকিবে না। প্রবাসী বাঙ্গালী তালবৃক্ষহীন "তাল পুকুরের" মত বাঙ্গালীত্ব বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে ইহা কি আমাদের বাঞ্ছনীয়?

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

আক্ষেপ

অনন্ত সুনীল গগনের গায়,
ব্রহ্মাণ্ডের ধ্রুব আলোক তায়;
নবীন দুকূলে, কুসুম-নিকরে,
জলে-স্থলে তার প্রতিষ্ঠা করে;
সে জ্যোতি পরশে মুগ্ধ জগজন,
শোকে ভরা শুধু এ পোড়া মন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পরমেশ্বরের সিংহাসনসমীপে

(কুমারী বামিনী সেন এম, বি কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত।)

আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি পরমেশ্বরের সিংহাসন সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছি এবং তিনি আমাকে আমার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি বলিলাম, "আমি আমার ভ্রাতা পুরুষের নামে অভিযোগ আনিয়াছি।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "পুরুষ তোমার কি করিয়াছে?" আমি বলিলাম, "আমার স্বীয় ভগিনী রমণীকে প্রহার করিয়াছে, শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছে এবং তাহাকে রাজপথে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখনও সে সেইস্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। আমি এই দুষ্কৃতির প্রতীকারার্থে এখানে আসিয়াছি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত পুরুষের নিকট হইতে রাজ্য ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রদান করা হউক, কেননা আমার হস্তদ্বয় নিষ্কলঙ্ক।" এই বলিয়া আমি তাঁহাকে আমার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হস্তদ্বয় প্রদর্শন করাইলাম।

পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার হস্তদ্বয় নিষ্কলঙ্ক বটে, কিন্তু তোমার পরিধেয় বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক তোমার পদদ্বয় আমাকে দেখাও ত।"

আমি তাহাই করিলাম। পরিধেয় বস্ত্র উত্তোলন করিবামাত্র আমার রক্তবর্ণ পদদ্বয় বাহির হইয়া পড়িল, আমার পদদ্বয় দৃষ্টে যেন আমি রক্তবর্ণ নদিরার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি বোধ হইতেছিল।

পরমেশ্বর বলিলেন, "পদদ্বয় রক্তরাগ রঞ্জিত কেন?" আমি বলিলাম, "প্রভো, পৃথিবীর পথগুলি ধূলি ও কর্দ্দম-পরিপূর্ণ সে পথ দিয়া চলিলে পরিধান বস্ত্র মলিন হইবে, সেইজন্য অতি সাবধান পাদবিক্ষেপে আসিয়াছি। আমার পরিধান-বস্ত্র কেমন শুভ্র ও নির্ম্মল দেখুন দেখি।"

পরমেশ্বর বলিলেন, "কিসের উপর পদ স্থাপন করিয়াছিলে।"

আমি কোন উত্তর না দিয়া উচিত বস্ত্র পদপ্রান্তে নামাইয়া দিলাম। তৎপরে শরীরাচ্ছাদনে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম। আমার ভয় হইতেছিল পাছে স্বর্গের অধিবাসীরা আমাকে দেখিয়া ফেলে।

২

আবারও আমি স্বর্গদ্বারে দণ্ডায়মান, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় একেলা নহি, পার্শ্বেই একটি সঙ্গিনী। আমরা পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়াছিলাম—উভয়েই শ্রান্তিক্লান্তি-ক্লান্ত। আমাদের দৃষ্টি স্বর্গের সুবিশাল তোরণদ্বারে সংলগ্ন। স্বর্গীয় দূতেরা দ্বার খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত ছিল। শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের উপর দিয়া আমরা পরমেশ্বর-সমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সিংহাসন-প্রান্তে উপনীত হইবামাত্র স্বর্গীয় দূতেরা আমাদের পৃথক করিয়া দিল। আমার সঙ্গিনীকে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার সোপানের উচ্চতম ও আমাকে নিম্নতম স্থানে রাখিয়া দিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে "এই রমণী পূর্ব্বে একবার এইখানে আসিয়া শ্বেত-প্রস্তরের উপর ইহার রক্ত-রঞ্জিত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল আমরা অনেক কষ্টে আমাদের অশ্রুবারি-সিঞ্চনে সেই দাগগুলি ধৌত করি, সুতরাং এবারে ইহাকে এই-স্থানে রাখাই শ্রেয়ঃ।"

কিন্তু আমার সঙ্গিনী পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার দিকে তাহার হস্ত প্রসারণ করিল, আমিও তাহার আহ্বানে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আর সংসারের পাপ দুঃখ ও প্রলোভন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, স্বর্গের দ্যুতিমান অধিবাসীরা আমাদের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। আমরা উভয়ে একত্র না থাকিলে এই জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকুল পরিবৃত হইয়া বড়ই একা একা লাগিত।

পরমেশ্বর আমার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি আমার ভগিনীটিকে একটু সম্মুখে টানিয়া আনি-লাম। ঈশ্বর বলিলেন, "আজ যে তোমরা দুইজনে আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "আমার ভগিনী রাজপথে

পড়িয়া রহিয়াছে ও সকলে তাহাকে পদদলন করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি তাহারই পার্শ্বে শয়ন করিলাম। সে দুইহস্ত দ্বারা আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিবামাত্র আমি তাহাকে উঠাইয়া লইলাম।"

ঈশ্বর বলিলেন, "এইবারে তুমি কাহার নামে অভিযোগ আনিয়াছ?" আমি বলিলাম, "আমরা এবারে আর পুরুষের নামে অভিযোগ আনি নাই।" ঈশ্বর আমাদিগের অভিমুখে ঈষৎ নত হইয়া বলিলেন, "আমার সন্তানগণ, তোমাদের কি প্রার্থনীয় আছে?"

আমার পার্শ্বস্থিতা ভগিনী ইঙ্গিতে আমাকেই উত্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে বলাতে আমি বলিলাম, 'আমাদের এই প্রার্থনা যে আপনি আমাদের ভ্রাতা পুরুষের সহিত কথা বলিবেন ও আমাদের দ্বারাও তাহার নিকট কোন অনুজ্ঞা প্রেরণ করিবেন—যাহা দ্বারা তাহার বিশদরূপে উপলব্ধি—"

ঈশ্বর বলিলেন, "যাও তোমরা পুরুষের নিকট ধরাধামে আমার অনুজ্ঞা লইয়া যাও।"

আমি বলিলাম, "কি অনুজ্ঞা?"

তিনি বলিলেন, "অনুজ্ঞা তোমাদের হৃদয়ে লিখিত দেখিবে।"

আমরা ধরাতলে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইলাম; স্বর্গীয় দূতেরা দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তাহারা নিবিষ্টচিত্তে আমাদের দর্শন করিতেছিল।

একজন বলিল, "ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র কি সুন্দর!" আর একজন বলিল, "স্বর্গে প্রবেশকালে আমার মনে হইয়াছিল যে ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র কর্দ্দমপূর্ণ কিন্তু এখন দেখিতেছি কর্দ্দমপূর্ণত নহে, সুবর্ণ-সূত্র-নির্ম্মিত। তৃতীয় জন বলিল বস্ত্র সুবর্ণ-সূত্র-নির্ম্মিত নহে। ইহাদের মুখের দিব্যজ্যোতি বস্ত্রের উপর পতিত হইয়াই পরিচ্ছদকেও সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে।

অবরোধ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভ্যালেন্সিয়ার কোন রাজপথের পার্শ্বে একটি মন্দির। মন্দিরের প্রাঙ্গণে কয়েকজন নগরবাসী ও সৈন্য উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান। তাদের চারিদিকে অস্ত্র শস্ত্র। বৃদ্ধ নাগরিক—বিজলী-আকীর্ণ মেঘ, স্তব্ধ নভোতল।

গৃহ ছেড়ে আসিলাম উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
মুক্ত বায়ু মাঝে যদি কষ্ট দূরিবারে:
কিন্তু বৃথা, তপ্ত বায়ু আরো কষ্টকর।
হত পুত্র, একা আমি এ বৃদ্ধ বয়সে।
শুষ্ক কণ্ঠ তালু মম; তোমরা কি কেও
দয়া করে এনে দেবে এক বিন্দু জল?

[এক জন নাগরিকের প্রস্থান]

২য় নাগরিক—দুখানল সম এই দীর্ঘ অবরোধ,
তোমারে ক'রেছে তাত, শ্মশান নিবাসী,
পুত্রগণে পূর্ণ তব সুখময় গৃহ
নীরব নির্জ্জন এবে, হায় পরিতাপ!

৩য় নাগরিক—এও ভাল; অন্নহীন জীর্ণ দেহ হ'তে
ক্ষুধার্ত্ত কাতর ধ্বনি নহে সহনীয়!

বৃদ্ধ— পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক বিধি বিধাতার।
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে ঢেকেছে সকলে;
আমি একা নই বাছা এ অনল মাঝে?

৪র্থ নাগরিক—তোমাতেম ঘুচে গেছে, সব একাকার,
সেই এক সান্ত্বনার স্থল এদুর্দ্দিনে।
ধনীর সুরম্য গৃহে, কৃষক কুটীরে,
এক দৃশ্য, এক ভাব, করুণ কাহিনী!
দরিদ্র নীরবে যায় মৃত দেহ ল'য়ে,
বিপুল বিবাহ সজ্জা পড়েনা সমুখে;
অথবা প্রাসাদে ধনী রোগ শোকাতুর
তৃষাতুরে নাহি চায় দীন জনপানে।
কাল স্রোতে সব ভেদ দূর হ'য়ে গেছে,
বুঝেছে মানব এক নিয়তি সবার।

৪র্থ নাগরিক—শুনেছিলে কাল রাত্রে যবে দুর্গ হ'তে
কি ভীষণ ঘণ্টা ধ্বনি হ'য়েছে নিয়ত?

৪র্থ নাগরিক—আর জান কোন লোক ছিল না সেখানে
যখন সে শব্দে কেঁপেছিল দশ দিক!
বৃদ্ধ— খুব জানি, ওরে নিয়তির ঘণ্টাধ্বনি,
এরাজ্যে রাজার মৃত্যু ঘনায় যখন
ঘণ্টা বেজে ওঠে ভেদিনীর ঘ রজনী,
কে বাজায় নাহি জানি! হায়, এজগতে
ঘটে কত অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার
অর্থ তার বোঝা ভার! এই ঘণ্টা ধ্বনি
কি আশ্চর্য্য। কেহ নাহি যায় ওর কাছে,
নীরব, নির্জ্জন, তবু, রাজ মৃত্যু যবে
সন্নিকট বেজে ওঠে গভীর গর্জ্জনে
নিশীথের নীরবতা বিদারি সঘনে।
কখনো নিষ্ফল নয় এ দৈব নির্ঘোষ।
৫ম নাগরিক—পরিত্যক্ত এ নগর; নাগরিক সবে
তিল তিল ক'রে যায় কালের কবলে,
সন্তানের রক্ত দিয়ে এমন নগর
রক্ষা করিবেন রাজা দুদিনের তরে!
বৃদ্ধ নিশ্চয়, সন্দেহ নাই। হ'য়ো না নিরাশ,
এখনো শোণিত দানে সম্ভব উদ্ধার।
যায়, হায়, পরিতাপ,—যশবিমণ্ডিত
এমন সম্ভ্রান্ত বংশ ধরাতল হ'তে
মুছে যাবে একবারে। রাজার নন্দিনী,
সেও যেন দেবীতুল্য নহে পৃথিবীর।
৫ম নাগরিক—রাজ কন্যা যায় যদি, দুর্ভাগ্য মোদের!
শোক-তাপ-পূর্ণ গৃহে করুণ বচন
মৃদুপদ শব্দ তার উৎস সান্ত্বনার।
কে দেবে নিরাশ প্রাণে আশা তার মত!
বৃদ্ধ— থাম, চুপ কর; ওই আসেন জননী,
একি মূর্ত্তি একি দৃষ্টি উদাস গম্ভীর!
উজ্জ্বল বদন কান্তি, চঞ্চল চরণ!
এরূপ কিসের চিহ্ন? শান্ত হও সবে।
[কয়েক জন পতাকাবাহীসহ জিমেনার প্রবেশ।]
জিমেনা—নাগরিকগণ, আজ এঘোর দুর্দ্দিনে,
এখানে কিহেতু, বল কি করিছ সবে?
নাগরিক—মরণের অপেক্ষায় পড়ে আছি, দেবি!
জিমেনা—তোমরা সকলে বীর, বীরের সন্তান,
কর্ত্তব্যের দ্বারদেশে চাও যাইবারে,
রজনীর সমাগমে পথিক যেমন
ক্লান্ত হয়! মহাকাল ঘিরেছে যাদের,
তাদের এমন মৃত্যু শোভা নাহি পায়।
দুর্য্যোগ দুর্দ্দিনে শোকে মগ্ন মাতৃভূমি,
পবিত্র শোণিত ধারা নদী বয়ে যায়,
এসময়ে অস্ত্র বর্ম্ম ফেলি ধরাতলে
কীটানুর মত চাও মরিতে সকলে,
ক্ষুদ্র পুষ্প যুদে আঁখি রবিতাপে যথা?
নাগরিক— দেবি তব ত্রাণ সবে, কি করিব বল।
জিমেনা—উঠ সবে ধর অস্ত্র বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ।
তোমাদের অধিপতি সেনাপতি যিনি
সর্ব্বজন প্রিয়, তাঁর বীর পুত্রদ্বয়ে
নিয়ে যায় মুরসেনা বধ করিবারে।
এও হবে! ক্ষণস্থায়ী সঙ্গীতের মত,
আকাশে মিলায়ে যাবে ক্ষুটন্ত জীবন,
যুগযুগান্তের শত গৌরব পৌরুষ
দেশের বিজয় স্তম্ভে যাদের জনম।
ভগবান-দত্ত শক্তি স্বকার্য্য সাধিতে
মরণের পথে যেতে মহাভাব লহে,
এখনো জীবন রূপে রহিছে এদেহে,
সেই প্রাণ ধারা রবে বহুক্ষণ সম,
ধীরে ধীরে শুষ্ক হবে, শুনিবে না কালে
কর্ত্তব্যের আবাহন! আর, এও হবে?
নাগরিক—রোগ শোক নিরাশায় জর্জ্জর জীবন,
শক্তি হীন দেহ, মন, অসার অনড়!
জিমেনা—এত হীন-আত্মা সবে দেশের সন্তান!
ধাতু শিরা হৃদপিণ্ডের প্রবাহ স্পন্দন
তাছাড়া কি নাই কিছু শক্তি প্রস্রবণ?
যুগে যুগে কোমলাঙ্গী দুর্ব্বল রমণী
নীরবে সয়েছে কত কঠোর যাতনা
মহাব্রত লক্ষ্য ধরি', কোন্ শক্তি বলে?
সে কি এদেহের শক্তি—এই পৃথিবীর?

অত্যাচারী কর্ত্তা শক্তি সীমা আছে তার ;
অসীম সে ঐশী শক্তি প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
চাও মোর পানে, দেখ এজীবন মম
মৃত্যুকর-স্পর্শে শুষ্ক, ঝ'রে পড়ে' যাবে
আজ কি দুদিন পরে, এই সূর্য্যালোকে
মৃদু বায়ু মাঝে শুষ্ক হবে মোর ঠাঁই :
কিন্তু তবু এই বক্ষে, এহেন দেহে
জ্বলিছে যেবীর অগ্নি, যে অনল শিখা
মৃত প্রায় জাতি প্রাণে এনেছে চেতনা,
দীনতা হীনতা মাঝে মহৎ প্রেরণা !
তাকাও আমার পানে,—কেন এজীবনে
দুর্ব্বল কোমল ক্ষীণ রমণী জীবনে
প্রজ্বলিত এ অনল কি লক্ষ্য সাধিতে !
তোমাদের মৃতদেহে নবীন শকতি,
নিরাশা কাতর মনে নব উদ্দীপনা,
করিতে সঞ্চার এই বিধির কৌশল।
এখনো জাগ্রত হও, উঠ, অস্ত্র ধর,
এখনো সময় আছে অরাতি শাসনে।

নাগরিক— ক্ষুদ্র তুচ্ছ, হীনবল, জীর্ণ শীর্ণ সবে,
দুষ্টিবের,—মহাবল সংখ্যাহীন অরি ;
আমরা কি পারি দেবি, এ শত্রু নাশিতে ?

জিমেনা— সর্ব্বশক্তিমান যিনি তাঁহার বিধানে
মহাবলী তৃণ সম হয় ধরা-শায়ী,
নিরাশ্রয় রক্ষা পায় ; সে শক্তির লীলা
কার তরে ? দুর্ব্বলেরে করিতে সবল।
আছে সত্য, আছে তায় অন্যের জগতে।
কার তরে চক্র সূর্য্য করে জ্যোতি দান ?
মুকুট ভূষিত শিরে, কিম্বা বাহুবলে
ভীষণ ঝটিকা ধায়ে সাগর মাঝারে ?
বিশাল বাহিনী সনে মহাবারী যোগে,
কি হেতু এসব লীলা ? দেখাতে মানবে,
দুর্ব্বল নিরাশ নরে—নহে অসহায়
বিশ্বাসীর চিরশক্তি, নির্ভরের বল,—
বিশ্বাসের বলে বাঁধ বুক, ওঠ সবে,
স্বদেশ উদ্ধারি'রাখ কীর্ত্তি চিরতরে !

পরিত্যক্ত নহ, দেখ সর্ব্ব শক্তিমান,
সেনাপতি তোমাদের, সহায় সমরে,—
পরিত্যক্ত অবিশ্বাসী আততায়ী জন,—
তোমরা বিশ্বাসী ; দেখ, কার এপতাকা !
(পতাকা প্রদর্শন)

নাগরিকগণ—(পরস্পরের প্রতি মৃদুস্বরে)
এযে স্বর্গ জ্যোতি চক্ষে, কণ্ঠে দেব ভাষা,
একি সত্য ভগবান করেন আহ্বান !

জিমেনা— ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, কার এ পতাকা !

নাগরিকগণ—মহাত্মা সিডের এই বিজয় পতাকা !

জিমেনা— মহাত্মা সিডের এই বিজয় পতাকা !
সে নাম স্মরণে মৃত দেহে জাগে প্রাণ,
শুষ্ক হিয়া নেচে উঠে আশার উল্লাসে।
শুন্যে এই পতাকার সঞ্চালন মাঝে
শোন বিজয়ের ধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া ;
সিড, নামে মহামন্ত্র ; সিডের পতাকা
কখনো আকাশ তলে হয় নাই নত !

বৃদ্ধ— এখনো নীরব স্থির, হে নগরবাসী !
এই ভগ্ন জীর্ণ দেহে নবীন যৌবন
জাগিতে চাহিছে আজ নূতন জনমে !

জিমেনা— এখনো নীরব স্থির ! জাননাকি সবে,
এ আকাশ পূর্ণ ক'রে নগরে প্রান্তরে
সিডের বিজয়ী আত্মা র'য়েছে ছড়ায়ে !
তাঁর মৃত দেহ'পরে এই বায়ু বেগে
উড়েছিল এ পতাকা বিজয় গৌরবে !
মৃতবীর,—তবু চির মহে পরাজিত,
নহে শোক, শোকবেশ,—সেনাপতি বেশে,
বিজয়ীর রণরঙ্গে চতুরঙ্গ যোগে,
নিয়ে গিয়েছিল দেহ গভীর নিশীথে,
তখনো এমনি অবরুদ্ধ এ নগর !
ধীরে ধীরে শব নিয়ে যায় সৈন্যগণ,—
কোথা হ'তে এলো বীর শ্বেত অশ্বারোহী,
উজ্জ্বল বরণ, বক্ষে রক্তফুল আঁকা,—
বিদ্যুতের মত গেল শত্রুসৈন্য মাঝে,
শত্রুরাজ ভূমিশায়ী সৈন্যগণ সহ

রক্তনদী বহে গেল, পালাল যবন :
উড়িতে লাগিল ঊর্দ্ধে সিঙের নিশান।

নাগরিকগণ—(উঠ্‌তে উঠ্‌তে) এখনো জীবনপণে ধরিব পতাকা।

জিসেনা— তাঁর বংশে জন্ম, তাঁর দেশের গৌরব,
যুগে যুগে দুর্য্যোগের উজ্জ্বল প্রদীপ,
শ্বাস হবে এতদিনে, দেখিবেন তিনি!
রবেন নীরব? আজ এঘোর দুর্দ্দিনে
সন্তানের সহায়তা বিমুখ সে দেব?
কখনো সম্ভব নয়। সাধু উপরত
মহৎ জীবন ধরে বিপুল শকতি,
এমন সময় আসে সমাধির সীমা
অতিক্রম ক'রে যায় জীবন অঙ্গনে।
ভুলে গেছ সবে, সেই প্রাচীন সময়ে
স্পেনের দুর্দ্দিন স্মরি তাঁর জাগরণ,
বহু শতাব্দীর ঘোর নিদ্রা পরিহরি!
গভীর নিশীথকালে বিজন প্রহরী,
নিদ্রাভঙ্গে ত্রস্ত সবে, জাগ্রত স্বপন,
সহস্র সহস্র সৈন্য অশ্ব পদাতিক
ধায় নগরের পথে, দিক প্রতিধ্বনি!
পুনঃ জেগেছেন—তিনি বীর "ক্যাস্পিডর,"
ছায়াময় দেহধারী সৈন্যগণ সহ
ধাবিত সমর ভূমে জন্মভূমিতরে,
তখনো আফ্রিক এসে ঘিরেছিল পুরী।
রজনীর অবসানে বাধিল সংগ্রাম,
তুমুল সংগ্রাম যেন প্রলয় পয়োধি,
দিবাশেষে শত্রুকুল হ'ল পরাজিত,
দেবতার হল জয়, সে বিজয়ধ্বনি,
বিজয়ীর সিংহনাদ উঠিল চৌদিকে
প্রতিধ্বনি পূর্ণে পূর্ণে বিদারি আকাশ!

নাগরিকগণ—(বর্ম্মপরিধান করতে করতে)
উঠ সবে, পর বর্ম্ম, অস্ত্র লও তুলে,
চল যাই রাজপাশে; মৃত নই সবে,
এখনো তো আছে শক্তি অস্ত্র ধরি করে
মরিতে বীরের মত! সব ভুলে যাই,
কেবল সিঙের জয় গেয়ে চল তাই।

জিসেনা— তোমরা কি জান তাঁর সমর সঙ্গীত?
প্রাচীন সে মহাগীতি, যার মন্ত্র বলে
মৃতপ্রায় পেয়েছিল নবীন জীবন,
অশেষ শত্রুরে করেছিল পরাজিত?
গাও সেই গান তবে, জাগুক সকলে:—

(গান)

ঘুর সেনাপতি আসিছে আবার।
তুরী ভেরী বাজে তুলি মহারোল,
শিঙ্গা সহ নাচে সাগরে কল্লোল;
বিপুল বাহিনী হাঁকে মার মার!
হুঙ্কারি সবারে জানাও একথা,
যে যেখানে আছে সকলে শুনুক,
তীর তরবারি ধারাল করুক,
যুদ্ধে যুদ্ধে হোক গভীর একতা।
(নাগরিক গণের যোগদান)
উড়িছেরে ওই পতাকা বিশাল!
জাগ ধনীগণ, ছাড় ভোগসুখ,
ছাড় গৃহ, ছাড় প্রিয়জন মুখ,
কবি বাঁধ বুকে পিতৃদত্ত ঢাল!
ঘুর সেনাপতি আসিছে আবার!
ছাড় কৃষিকুল চাষের ক্ষেত্র,
গরু ভেড়া হ'তে উঠাও নেত্র,
বড় গুরুতর কাজ আজকার!
কর চারিদিকে ঘোষণা নিনাদ,—
বর ফেলে দিক বিবাদ টোপড়,
ধরুক অস্ত্র,—হরিষে বিষাদ!
ধায় ধায় আজ রণ-বাহী দল,—
ভবের মন্ত্র আজকে পাশরি,
সবাকার আজ পাশে রেখে যাও,
ধর অস্ত্র আজ শোকার্ত্ত সকল!

(গান গাইতে গাইতে, পতাকা তুলে নিয়ে সকলের প্রস্থান :—নেপথ্যে সঙ্গীত।)

রক্ত সিক্ত হবে এই তরবারি,—
শোক, অশ্রু তরে নহে এসময়;

বর্ম্ম অসি চর্ম্ম ধর যেইজন :
কাল মৃত তরে ফেলো অশ্রুবারি।
সময় সজ্জায় সিঙ মহাবার !
বর্ম্মধারী হয়, উচ্চশিখি তাজ,
উজ্জ্বল আকাশে পতাকা বিরাজ,
আজ, ওই ক্রুশে আনন্দ নিবিড়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

শ্যামনগরের জমিদার

(১২)

সকল আয়োজন স্থির হইয়াছে। আর একমাস পরে আমরা বিলাত যাত্রা করিব, এমন সময় এমন একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমাদের নির্ব্বিঘ্ন ব্যাপারে বিঘ্ন বলিয়া মনে হইল।

আমাদের গ্রামে আমাদের এক দূর জ্ঞাতি বাস করিতেন। তিনি কিছু সম্পত্তি, একটী পুত্র ও বিধবা পত্নী রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। সেই পুত্রটীর নাম ভবানীচরণ। ভবানীচরণ তাহার মাতার অত্যধিক আদরে বিগড়াইয়া যায়। যে কোন রকমে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর সে কলিকাতায় গিয়া কিছু দিন এফ এ, পড়িয়াছিল, তাহার পর সে সব ছাড়িয়া দিয়া কেবল ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি শ্রমসাধ্য খেলার মত থাকিত এবং সকল প্রকার হুজুগে মিশিত। ইংরেজী ভাষায় তাহার মন্দ অধিকার ছিল না। তাহার ইংরেজী উচ্চারণ শুনিয়া মনে হইত বুঝি কোন ইংরেজ কথা কহিতেছে। তাহার বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। এবং সে বিখ্যাত ইংরেজ লেখকদিগের পুস্তক হইতে উৎকৃষ্ট অংশ সকল মুখস্থ করিয়াছিল। তাহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল। বিলাত যাইবার সখ তাহার বরাবর ছিল। সে বলিত যে, তাহার মত প্রতিভাশালী লোকের কদর ভারতবর্ষের লোকেরা বুঝিবে না। সে যদি একবার বিলাত যাইতে পারে, তাহা হইলে এদেশের লোককে তাক লাগাইয়া দিতে পারে। স্কুল কলেজের পরীক্ষায় পাশ করা তো সাধারণ বুদ্ধির ছেলেদের কর্ম্ম। যাহাদের বুদ্ধি অসাধারণ, যাহারা প্রতিভাশালী, তাহারা কি স্কুল কলেজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে? এই কেশব সেনের কথাই ভাবনা কেন? কেশব সেনের মত অত বড় বক্তা, অত বড় ধর্ম্মপ্রচারক, অত বড় সমাজসংস্কারক, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কয়জন জন্মিয়াছেন, অথচ সেই কেশব সেন যে এণ্ট্রান্সও পাশ করেন নাই, তাহা কি দেশের লোকে খবর রাখে? ইত্যাদি।

ভবানীচরণ অধিকাংশ সময় বাটীতে থাকিত না। তাহাদের বৈষয়িক অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না; সে সাধ্যপক্ষে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিত না। তার মাতা অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। সে বয়সে আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট ছিল।

ভবানীচরণ যখন আমাদের বিলাত যাত্রার আয়োজনের কথা শুনিল তখন সে তাহার মাতাকে ধরিয়া বসিল যে সেও বিলাত যাইবে। ভবানীচরণের মাতা বলিলেন, তোমার বিলাত যাইবার সব তো বরাবর আছে। কিন্তু যাইবে কেমন করিয়া? খরচ চালাইবে কে? আমার কাছে যা ছিল তার সমস্তই তুমি আগেই খরচ করিয়া ফেলিয়াছ।

ভবানীচরণ বলিল, "কৃষ্ণপদ দাদারা বিলাত যাইতেছে, আমি ওদের সঙ্গে যাইতে চাই, তুমি যদি কাকাকে একটু মিনতি করিয়া বল, তাহা হইলে তিনি আমাকেও কৃষ্ণপদ দাদাদের সঙ্গে বিলাতে পাঠাইবেন। তখন আর খরচের জন্য ভাবিতে হইবে না।" ভবানীচরণ আমার পিতাকে কাকা বলিত।

ভবানীচরণের প্রস্তাবে প্রথমতঃ তাহার মাতা স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু যখন ভবানীচরণ ভয় দেখাইল যে, যদি তাহার মাতা তাহার কাকাকে গিয়া ভাল করিয়া না বলে, এমন কি যদি তার কাকার তাকে বিলাতে পাঠাইবার মত করিতে না পারে, তাহা হইলে হয় সে বিষ

খাইয়া মরিবে, নয় গলায় দড়ি দিয়া মরিবে। তাহা হইলে তার প্রাণ ত যাইবেই, পুলিশে বাড়ী ভরিয়া যাইবে। গ্রামের লোকদিগকে এমন কি তার মাতাকে পর্য্যন্ত ইংরেজ-জলম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জবানবন্দী দিতে হইবে। ইত্যাদি।

ভবানীচরণ বাল্যাবধি যাহা চাহিয়াছে তাহার মাতা সাধ্যপক্ষে তাহাকে তাহাই দিতে ত্রুটী করেন নাই। চাহিয়া না পাওয়া ভবানীচরণের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে নাই। তাহার মাতা তাহার পূর্ব্বোক্ত কথায় ভয় পাইয়াই হউক অথবা ভবানীচরণের সাধ মিটান সম্বন্ধে তাঁর চিরকালের অভ্যাস বশতঃই হউক তিনি আমার পিতার নিকট গিয়া ভবানীচরণকে বিলাতে পাঠাইবার দরবার করিতে সম্মত হইলেন।

(১৩)

একদিন দুই প্রহরের কিছু পরে ভবানীচরণের মাতা আমাদিগের বাটীতে গিয়া পিতাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন। ভবানীচরণের মাতা পিতার সহিত কথা কহিতেন।

পিতা আসিলে ভবানীচরণের মাতা কহিলেন, "ভবানীচরণকে কৃষ্ণপদদের সঙ্গে বিলাতে পাঠাইতে ও সেই খরচ তোমাকে দিতে হইবে। আমার এই অনুরোধ রাখিতেই হইবে। তোমাদের নিকট ইহার পূর্ব্বে কখন কোন অনুরোধ করি নাই। এ অনুরোধ না রক্ষা করিলে তোমার ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যার পাতক হইবে। এই সুযোগে বিলাত যাইতে না পারিলে ভবানীচরণ গলায় দড়ি দিবে, তাহা হইলে আমিও গলায় দড়ি দিব কিম্বা বিষ খাইয়া মরিব। ভবানীচরণ আমার বিলাত গেলেই বড় লোক হইয়া আসিতে পারিবে।" ইত্যাদি। পিতা স্বভাবতঃ মিতভাষী। ভবানীচরণের মাতার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে যে ভাবই হউক না কেন, তিনি বাহিরে কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আপনি আজ যান, আমি বিবেচনা করিয়া আগামী কল্য আপনাকে জানাইব। এ সকল বিষয়ে উতলা হওয়া ভাল নয়।" ভবানীচরণের মাতা সে দিন আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ভবানীচরণের কার্য্য কলাপের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি পিতা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহাকে আমাদিগের সহিত বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাবও যে কেহ তাঁহার নিকট করিতে পারে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সেই জন্য, ভবানীচরণের মাতার কথায় তিনি চিন্তিত হইলেন। তৎপর দিবস ভবানীচরণের মাতা আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া পিতাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন। পিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভবানীচরণের মাতাকে বলিলেন, "আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে ভবানীচরণের বিলাত যাওয়ার দরকার নাই। তাহাকে বিলাতে পাঠাইতে আমার মন সরিতেছে না। বুঝিয়া দেখুন—" পিতা কথা শেষ করিতে পাইলেন না। ভবানীচরণের মাতা সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুঁকিতে লাগিলেন। তাঁহার কপালের একস্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আমার মাতা তাড়াতাড়ি ভবানীচরণের মাতাকে ধরিয়া ফেলিলেন। পিতা এমন বিপদে কখনও পড়েন নাই। তিনি ভবানীচরণের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৌঠাকুরাণী, আপনি উতলা হইবেন না। এসকল বিষয়ে হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়। আপনি আজ বড় কাতর হইয়াছেন। আজ থাকুক। কাল যাহা হয় করা যাইবে।" ভবানীচরণের মাতা কহিলেন, "না ঠাকুরপো, তাহা হইবে না। যাহা হয় তুমি আজই ঠিক করিয়া বল। তুমি যদি ভবানীচরণকে বিলাতে না পাঠাও তাহা হইলে আমি এই খানে হত্যা দিব। আমি এখন পর্য্যন্ত জল-বিন্দু মুখে দিই নাই। কিছু না খাইয়া এইখানে পড়িয়া থাকিব। কিছুতেই উঠিব না। দেখি, তুমি আমার অনুরোধ রাখ কি না।

পিতা বলিলেন "আপনি বুদ্ধিমতী, অবোধের মত কথা কহিতেছেন কেন? উতলা হইলে কোন কাজ হয় না। আপনি আজ বাড়ী যান। আমি বিবেচনা করিয়া দেখি।" এমন সময় ভবানীচরণ সেখানে আসিয়া পিতাকে বলিল, "কাকা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে কেষ্ট দাদাদের সঙ্গে বিলাতে পাঠাইয়া দিউন।

আপনি দেখিতে পাইবেন, আমি সেখানে গিয়া কেমন ভাল হইয়া থাকি। আমি ঠিক কেষ্ট দাদাদের মত হইয়া থাকিব। তাহারা যাহা বলিবে তাহাই করিব, এই বলিয়া পিতার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর কিছুর জন্য হউক আর নাই হউক ভবানীচরণ ও তাহার মাতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পিতা বলিয়া ফেলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুই ও না হয় কৃষ্ণপদদের সঙ্গে বিলাত যাস্।" এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ পিতার পা ছাড়িয়া দিল। তিনি বাহিরে পলায়ন করিলেন।

(১৪)

পিতা যখন কথা দিয়াছেন তখন তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে ভবানীচরণকে বিলাত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। ভবানীচরণ পিতার পা ছুঁইয়া দিব্য করিল, "কৃষ্ণপদ দাদারা যে ভাবে যে নিয়মে থাকিবে, আমিও ঠিক সেই ভাবে, সেই নিয়মে থাকিব। এখন হইতে লোকে আমাকে নূতন মানুষ মনে করিবে।" এই কথার পর দিবস হইতে ভবানীচরণের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে তাহার পূর্ব্বের অভ্যাস সকল একবারে ছাড়িয়া দিল। ভবানীচরণকে বিলাত যাইবার অনুমতি দিবার পরই পিতাঠাকুর কলিকাতা চলিয়া গেলেন, এবং আমাদের বিলাত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, যাহাতে কেহ সহজে কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করতে না পারে তাহা করিলেন। ভবানীচরণ বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবে স্থির হইল।

দেখিতে দেখিতে আমাদের বিলাত যাত্রা করিবার দিন আসিয়া পড়িল।

হরকুমার, বিনয়, বিজয়, রমানাথ, ভবানীচরণ ও আমি আমরা এই ছয় জন এবং আমাদের সহিত দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুই জন ভৃত্য সর্ব্ব সমেত দশ জন আমরা বিলাত যাত্রা করিলাম। যতই যাত্রা করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই মনের ভিতর যে কেমন করিতে লাগিল তাহা আর কি বলিব। মনে হইল যে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া কত দূর-দেশে যাইতেছি, আর স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইব কি না কে বলিতে পারে?

পিতা বোম্বাই পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গেলেন। ভগবানের নাম করিয়া, জন্মভূমিকে প্রণাম করিয়া, পিতার পদধূলি মাথায় লইয়া আমরা সকলে বোম্বাই জাহাজে উঠিলাম। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। আমরা অশ্রুপূর্ণনেত্রে তটভূমির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তীরবর্ত্তী পিতাকে দেখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া তাহাতে বাধা দিল। এইরূপ মানসিক উদ্বেগের উপশম হইলে পর দেখিলাম যে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়ায় তটভূমির বৃক্ষরাজী ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। তখন আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া মধুসূদনের "রেখোমা দাসেরে মনে, এমিনতি করি পদে, সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, মধুহীন ক'রোনা গো তব মনঃ কোকনদে।" এই কবিতাটী ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিলাম।

তাহারপর মধুরকণ্ঠে রমানাথ উচ্ছ্বাসের সহিত গাহিল, "বন্দেমাতরম্। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।" ইত্যাদি, গানের সহিত আমি বেহালা বাজাইতে লাগিলাম, ভবাণীচরণ ফ্লুটে ফুঁ দিল। হরকুমার হার্ম্মোনিয়ম ধরিল। বিনয় ও বিজয় নিবিষ্টচিত্তে গান বাজনা শুনিতে লাগিল। এই গান বাজনা এতই জমিল যে আমাদের কক্ষের সম্মুখে বহুলোকের সমাগম হইল। অনেকেই মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় আমাদের গান বাজনা শুনিতে লাগিল।

(১৫)

আমরা কয়েকজনে নানাকারণে জাহাজের অন্যান্য আরোহীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

আমরা বিলাত যাইতেছি অথচ হ্যাট কোট না পরিয়া ধুতি চাদর পরিহিত হইয়া চলিয়াছি। জাহাজের হোটেলে যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা নিজেদের লোক দিয়া নিজেদের খাদ্যদ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত করাইয়া লই। ইহাতে প্রথম প্রথম জাহাজের কত লোক যে আমাদের

প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু আমরা সেদিকে দৃকপাতও করি নাই। কাজেই বিদ্রূপকারিগণকে শীঘ্রই নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও গান বাজনা করিতাম। বন্দোবস্তমত গাধাটী প্রতিদিনই পাওয়া যাইত।

এই জাহাজের আরোহীদিগের মধ্যে একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। তিনি জজ ছিলেন।

একদিন দুই প্রহরে আমরা আমাদের কক্ষে বসিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত জজ সাহেব ধীরে ধীরে আমাদের কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহার সৌম্য-মূর্ত্তি দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম এবং বসিবার জন্য তাঁহাকে একখানি চেয়ার দিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া হাস্যমুখে আমাদিগকে বসিতে বলিলেন এবং আমরা কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি জানিতে চাহিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে তিনি বাংলাদেশের কোন কোন জেলার জজ ছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশে ফিরিতেছেন।

আমরা তাঁহাকে সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় দিলাম ও আমাদের বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্য বলিলাম। জজ সাহেব আমাদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, "আমি তোমার পিতাকে উত্তমরূপে জানি। আমি তাঁহাকে বাংলা দেশের একজন আদর্শ জমিদার মনে করি। আমি যে সকল জেলায় জজিয়তী করিয়াছি তন্মধ্যে কোন কোন জেলায় তোমার পিতার বিস্তৃত জমিদারী আছে, কিন্তু তোমার পিতার জমিদারীর তত্ত্বাবধারণ অতি অল্প মোকদ্দমাই আমাকে করিতে হইয়াছে। তোমার পিতাকে আমি রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়াই জানিতাম। তিনি যে বিদ্যালাভের জন্য তোমাদিগকে বিলাতে পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম। কিন্তু সকল বিষয়েই যেন তোমাদের অসাধারণত্ব আছে; তাই তোমাদের দেশের অন্যান্য লোকদের মত বিলাত যাইবার সময় তোমরা একবারে সাহেব না সাজিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেছ। বিলাতে গিয়াও কি তোমরা এই প্রণালীতে চলিবে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আমার পিতা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।"

জজ সাহেব। এজন্য তোমাদিগকে কিন্তু প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। বিলাতের কতকগুলা লঘু-প্রকৃতির লোক তোমাদিগকে বড়ই উত্যক্ত করিবে কিন্তু তোমাদের যেরূপ মানসিক বল ও শারীরিক বল দেখিতেছি, তাহাতে তোমাদের কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক, তোমাদিগের সহিত পরিচয় হওয়াতে বড়ই সুখী হইলাম। আমার কার্ড তোমাদিগকে দিতেছি, তোমাদের যদি থাকিবার স্থান ঠিক না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার উপর নির্ভর করিতে পার।

আমি। সে সকল পূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া রহিয়াছে।

জজ। উত্তম, কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইলে যখন ইচ্ছা হয় আমার নিকট যাইবে, বা আমাকে পত্র লিখিবে। তোমাদের ঠিকানাও আমাকে দাও। আমিও সুবিধামত তোমাদের সংবাদ লইব। আমার সন্তানাদি নাই। দুইটী পুত্রই মারা গিয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে তোমাদের মত হইত। তোমাদের প্রতি আমার বড় মমতা জন্মিয়া গেল।

আমরা বৃদ্ধ জজ সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ করিয়া বলিলাম যে, "বিলাতে যাত্রা করিবার প্রারম্ভেই আপনার মত সদাশয় ব্যক্তির সহিত পরিচয় হওয়া আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা আপনাকে আমাদের অভিভাবক স্বরূপ জ্ঞান করিব।"

ক্রমে ক্রমে আমাদের আচরণ জাহাজের লোকদিগের সহিয়া গেল। কেহ বা আমাদিগের সহিত অগ্রসর হইয়া মিশিতে আরম্ভ করিলেন।

এই জাহাজের আরোহীদিগের মধ্যে একজন বাঙ্গালী এবং দুই জন মারাঠি ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা আমাদিগের সহিত পরিচিত হইবার পর, আমাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া, তাঁহাদের সাহেবী ধাচ, একবারে ত্যাগ করিয়া, আমাদের চাল চলন অবলম্বন করিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের দেশীয় তিন জনকে আমাদের মতাবলম্বী করিতে পারিয়াছি মনে করিয়া আমাদের মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্বের উদয় হইল। পূর্ব্বোক্ত মারাঠি যুবকদ্বয়ের নাম পুরুষোত্তম কপর্দী ও মহাদেব গোপাল ব্রাহ্মক, দুই জনেই ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালী যুবকের নাম ধনপতি দত্ত, গন্ধবণিক।

পুরুষোত্তম গণিত শিক্ষার্থ, মহাদেব অর্থনীতি শিক্ষার্থ এবং ধনপতি সাবান, পেন্‌সিল, দিয়াশলাই প্রভৃতি নির্ম্মাণের রহস্য শিক্ষার্থ বিলাত যাইতেছেন।

(১৬)

লণ্ডনে আমাদের জন্য যে বাড়ী পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট ছিল আমরা সেই বাড়ীতে উঠিলাম। পুরুষোত্তম, মহাদেব ও ধনপতিও আমাদের সহিত আমাদের প্রণালী অনুসারে বাস করিবেন স্থির করিলেন। আমরা যে কয়জন ভারতবাসী এইরূপে লণ্ডনে বাস করিতে লাগিলাম তাঁহাদের প্রত্যেকেই "বৃদ্ধোয়ংবোঢ়ুবন্ধুবো-পালপ্রায়োঽর্ম্মহাভূজঃ" এবং রীতিমত ব্যায়ামে অভ্যস্ত থাকায় দৃঢ়, পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু।

লণ্ডন পিয়াই আমাদিগকে একটি ইংরেজ ভৃত্য রাখিতে হইল। তার কাজ ছিল আমাদের স্বদেশীয় ভৃত্যদিগকে রাস্তা ঘাট দোকান পাট চিনাইয়া দেওয়া এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করা। এই ইংরেজ ভৃত্যটীর নাম টম্। টম্ সামান্য লিখা পড়া জানিত, সে কোন দিন বা হোটেলে খাইত কোন দিন বা আমাদের পাচকদিগের রান্না করা খাদ্য খাইত। বৃদ্ধ জজ ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া আমরা ধুতি চাদর পরিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া বেড়াইতাম। প্রথম প্রথম সেখানকার লোকেরা আমাদিগকে নগ্ন মনে করিয়া আমাদের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিত এবং দুষ্টপ্রকৃতির লোকগুলা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করিত এবং নানা উপায়ে আমাদিগকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে কয়েক মাস কাটিল। ইহাতে হাঙ্গার অসুবিধা হইলেও আমরা তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। আমাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিগৃহীত বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলাম। এই সময়ে একদিন এমন একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমাদের ধুতি চাদর পরিহিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগকে ঠাট্টা করা বন্ধ হইয়া গেল।

(১৭)

আমাদের বাসা একটী গলির মধ্যে ছিল। সেই গলি পার হইয়া একটী চৌমাথা রাস্তায় পড়িতে হইত। সেই চৌমাথা রাস্তার অতি নিকটে এক কামারের দোকান ছিল। সে লোকটার চেহারা দানবের মত। তাহার হাত পা যেন লোহার। সে আমাদিগকে বড় বিরক্ত করিত, আমাদিগকে দেখিবা মাত্র, দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া, "ওইরে কালা আদমিরা যাইতেছে, ওইরে হনুমানেরা যাইতেছে" ইত্যাকার সম্বোধন করিত, কখন বা আমাদের চাদর ধরিয়া টানিত, কখন বা আমাদিগকে যেন দেখিতে পায় নাই, এমনি ভাব করিয়া, আমাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়িত। তাহার প্ররোচনায় কতকগুলা ছোট ছেলেও আমাদিগকে উত্যক্ত করিত। আমরা প্রথম প্রথম কামারটার অত্যাচার উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম যে আমাদের উপেক্ষা দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলা অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমরা ইহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম। এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে একটু পরামর্শও চলিল। স্থির হইল যে আমরা কেহই যখন শারীরিক বলে হীন নই তখন বোধ হয় যে কামার-টাকে একদিন বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া তাহাকে কিছু শিক্ষা দিলেই সে বুঝিবে যে আমাদিগকে বিরক্ত করা বড় সোজা ব্যাপার নয়।

আমাদের মধ্যে, রমানাথের শারীরিক বল সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক ছিল। একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রমানাথ কামারটার দোকানের সম্মুখ দিয়া আসিতেছে : তখন সে তাহার দোকানে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ রমানাথের নিকটে আসিয়া তাহার মাথা হইতে পাগড়িটা খুলিয়া লইল। রামনাথ অমনি বজ্র মুষ্টিতে এক হস্তে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া অপর হস্তে তাহার সওদেসে বিরাশী সিক্কার ওজনে এক চপেটাঘাত করিল। কামার-প্রবর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহার হাত হইতে রমানাথের পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া রমানাথের নাকে মুখে যেখানে পারিল কয়েকটী ঘুসি বর্ষণ করিয়া বেগে সেস্থান ত্যাগ করিল।

রমানাথের শরীরের দুই একটা স্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সে সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া খানিকটা কামারটার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। তারপর যখন দেখিল যে কামারটাকে আর ধরিতে পারা যাইবে না, তখন ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগের নিকট তাহার ক্ষুদ্র যুদ্ধের বর্ণনা করিল। রমানাথ বলিল, "কামারটা আমার সঙ্গে জোরে কিছুতেই পারিবে না। যাহাধন আমার এক চড় খাইয়াই মজা দেখিয়াছিল। কিন্তু আমি তার ঘুসি মারিবার কায়দা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ওইরূপ ঘুসিমারা বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত না হইলে এখানকার গুণ্ডাদের সঙ্গে পারা যাইবে না। ঐ বিদ্যাটা যেমন করিয়াই হউক অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে হইবে।"

(১৮)

টম সন্ধান দিল। আমরা একব্যক্তির নিকট ঘুসিমারা বিদ্যা শিখিতে লাগিলাম। প্রথম কয়েক দিন একটু কষ্ট হইল। তারপর সহিয়া গেল। যত দিন পর্য্যন্ত ঘুসিমারা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি মনে না করিলাম, ততদিন পর্য্যন্ত সাধ্য পক্ষে হাঁটিয়া পথ চলা বন্ধ করিয়া দিলাম। ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া কালেজাদিতে যাইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় তিন মাস শিক্ষা দিয়া আমাদের শিক্ষক আমাদিগকে বলিলেন যে, "তোমাদের সকলেই ঘুসিমারা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছ। এখন তোমরা বিদ্যালয়ের যে কোন লোকের সহিত ঘুসি লড়িতে পারিবে।" আমরা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলাম।

তাহার পর পুনরায় পথে বাহির হইলাম। কামারটার দোকানের সম্মুখ দিয়া বুক উঁচু করিয়া চলিলাম। এইরূপ দুই এক দিন যাতায়াতের পর একদিন কামারটা হঠাৎ রমানাথকে এক ধাক্কা দিল। রমানাথ অতি কষ্টে ধাক্কার বেগ সামলাইয়া লইয়া কামারটাকে বলিল, "ওরে ভীরু, তুই যদি ফের আমার সহিত এইরূপ বাঁদরামি করিস তাহা হইলে এক ঘুসিতে আমি তোর মাথার ঘিলু বাহির করিয়া দিব।" কামারটা অমনি তাহার জামার আস্তিন গুটাইয়া বলিল, "কুছ পারোয়া নাই।" এবং রমানাথকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই তাহার উপর ঘুসি বর্ষণ করিতে লাগিল। রমানাথ এজন্য প্রস্তুত ছিল। তুমুল ঘুসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জুটিল। অবশেষে রমানাথ কামারটার মুখের উপর এমন জোরে এক ঘুসি মারিল যে তার উপর পাটির একটী ও নীচের পাটির দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল ও তাহার নাক মুখ দিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, কামারটা পরিশ্রান্ত হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। লিখিতে যতক্ষণ লাগিল, এই ঘটনা ঘটিতে ততক্ষণ লাগে নাই।

দেখিতে দেখিতে ঘটনাস্থলে পুলিশের আগমন হইল। পুলিশ রমানাথ, কামারটা ও দর্শকবৃন্দের নাম লিখিয়া লইয়া ভিড় সরাইয়া দিল এবং কলহকারী রমানাথ ও কামারটাকে বলিল, "তোমরা নিজের নিজের বাড়ী যাও। আর রাস্তায় মারামারি করিও না। যা করিয়াছ সেজন্য তোমাদিগকে জবাবদিহী করিতে হইবে। পুলিশ আদালতে হাজির হইবার জন্য তোমাদিগের উপর সমন হইবে।" কামারটার নাম জ্যাক্।

সাতদিনের পর রমানাথের উপর পুলিশ আদালত হইতে এক সমন আসিল। জ্যাক নামক এক কামারকে গুরুতররূপে প্রহার করিবার জন্য পুলিশ রমানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। সমনে দেখিলাম যে মোকদ্দমা হইতে আর পাঁচদিন বিলম্ব আছে, আমরা তখন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধ জজের নিকট গিয়া

এ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লওয়া স্থির করিলাম। তৎপর দিবস বৃদ্ধ জজের নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত হও, হুমানাথের কিছুই হইবে না। নিতান্তই যদি কিছু হয় ত দু চার শিলিং জরিমানা হইবে। পুলিশ অনর্থক এই মামলা উপস্থিত করিয়াছে। যাহাই হউক, পুলিশ-কোর্টে আমার এক বন্ধুর পুত্র ব্যারিষ্টারী করে। তার নাম হইতেছে আর্থার গেল কি মনে হইতেছে না যে, হাঁ হাঁ মনে হইয়াছে, তার নাম হইতেছে আর্থার মরীস্ পুলিশকোর্টে তার বেশ পশার। আমি তাকে এইখানেই ডাকাইতেছি। না হয় চল তোমাদিগকে লইয়া তার কাছে যাই। তার পিতা ভারতবর্ষে চাকুরী করিতেন। ভারতবর্ষের প্রতি তার অনুরাগ আছে। সে রীতিমত সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়া থাকে এবং শুনিতে পাই সে নাকি হিন্দু আইন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছে। চল মরীসের কাছেই যাই।"

(১৯)

মিনিট দশের মধ্যেই আমরা মিঃ মরীসের অফিসে উপস্থিত হইলাম। মিঃ মরীস বৃদ্ধ জজকে খুব খাতির দেখাইয়া কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদিগের দিকে চাহিলেন। বৃদ্ধ জজ আমাদিগের সহিত মিঃ মরীসের পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাঁহার নিকট আগমনের কারণ বলিলেন। ইংরেজী প্রথামত শিষ্টাচারের পালা সাঙ্গ হইলে পর আমরা আসন গ্রহণ করিলাম এবং মিঃ মরীস সমনখানি দেখিতে চাহিলেন। সমন দেখিয়া মিঃ মরীস বলিলেন, "দেখুন মিঃ নাথ সেন গুপ্ত, আপনার কিছুই হইবে না। আপনি আত্ম-রক্ষার জন্যই ড্যাককে ঘুসি মারিয়াছিলেন। এই কথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেই হইবে।"

হরানাথ বলিল, হাঁ, কতকটা আত্ম-রক্ষার্থ এবং কতকটা ড্যাককে শিক্ষা দিবার জন্যও বটে। কেবল আত্মরক্ষার্থ হইলে বোধ করি বেচারি ড্যাকের দাঁত কয়টি এ যাত্রা রক্ষা পাইত। ইহা শুনিয়া মিঃ মরীস হাসিয়া বলিলেন, " একথা বলিলে বোধ হয় আপনার দুই এক শিলিং জরিমানা হইবে। যাহাই হউক আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিব। ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুচার কথা বুঝাইয়া বলিলে আপনার কিছু নাও হইতে পারে। আপনার কোন চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু কথা কহিবেন মহাশয়েরা, আপনাদের এই ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদেই একটা কাণ্ড ঘটাইয়াছে। আপনারা যখন এদেশে আসিয়াছেন, তখন এদেশের লোকে যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে, আপনারা সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পথে বাহির হইবেন। আপনাদের দেশের আর সকলেইত এখানে আসিয়া আমাদের মত পরিচ্ছদ পরিধান করেন। হরকুমার বলিলেন, "তাঁরা ভুল করেন। এদেশে আসিয়া আমরা আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিব কেন? ইংরেজরা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ ভারতবর্ষে গিয়া ধুতি চাদর পরেন, না কোট পেণ্টালুন পরিয়া গরমে নাজেহাল হ'ন?"

জজ বলিলেন, "ভারতবর্ষে ধুতি চাদর পরিয়া বেড়াইতে পাইলে আমি বড় সুখী হইতাম, কিন্তু লোকে কি বলিবে ভাবিয়া তাহা করিতে সাহস করি নাই।"

হরকুমার। দেখুন, আমাদের দেশের একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সাক্ষাৎ হইত। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ধুতি চাদর পরিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন কেন? উহা সভ্যতার চিহ্ন নহে।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশের লোকের পরিচ্ছদইত এই। ইহা ছাড়িতে পারিব না। এদেশের পক্ষে এইরূপ পরিচ্ছদই উপযোগী।" সে দিন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে সেই মহাপুরুষ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। সাহেব বেলায় বাহিরে ছেন। ধুতি চাদর পরিহিত মহাপুরুষকে দেখিয়া সাহেব বলিলেন, "আপনার মত যদি ধুতি চাদর পরিতে পাইতাম তাহা হইলে এই গ্রীষ্মকালে বাঁচিয়া যাইতাম।" তিনি বলিলেন, "পরুন না কেন?" সাহেব বলিলেন, "তা কি পারি, আমাদের স্বদেশীয় সমাজের লোকেরা কি বলিবেন?" সেই

কথা শুনিয়া আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিলেন, "সাহেব আপনার নিজের বেলায় এই কথা, আর আমাদের বেলায় অন্য ব্যবস্থা হইবে কেন? আপনিই না সেদিন আমার ধুতি চাদরের নিন্দা করিয়াছিলেন? আপনারা আমাদিগকে এরূপ আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য মনে করেন কেন?" সাহেব লজ্জিত হইলেন। মিঃ মরীস বলিলেন, "সে কথা যাইতে দিন। আপনারা যাহা ভাল বুঝিবেন, অবশ্য তদনুসারে চলিবেন।" আমি মিঃ মরীসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি মত?"

মিঃ মরীস্। এই সকল সামান্য মোকদ্দমায় সচরাচর ব্যারিষ্টার লাগে না। আপনাদিগকে এজন্য কোন ফি দিতে হইবে না। যে কোর্টে আপনাদের মোকদ্দমা আছে, সেইদিন সেই কোর্টে আমার একটী মোকদ্দমা আছে। আমাকে অনেকক্ষণ সেই কোর্টে থাকিতে হইবে। সেই সময়ের মধ্যে আপনাদের মোকদ্দমা উঠিবে। আবশ্যক হইলে আমি আপনাদের পক্ষে দুই চার কথা বলিব। সে জন্য আপনাদিগকে কোন ফি দিতে হইবে না।

আমি। না না, তা কি হয়!

মিঃ মরীস। খুব হয়। কিছু মনে করিবেন না। আমাকে আপনাদের বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন।

ইহার পর আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

(২০)

মোকদ্দমার দিন মিঃ মরীসের সহিত পুলিসকোর্টে উপস্থিত হইলাম। সেই কোর্টে সেই দিন প্রথম কার্য্যারীতেই মিঃ মরীসের একটী মোকদ্দমার সওয়াল জবাব ছিল। মিঃ মরীস একজন আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া সওয়াল জবাব করিলেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গিটি অতি সুন্দর। অল্পকথায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বেশ ধীর ভাবে বলিতে পারেন। মিঃ মরীস আসন গ্রহণ করিলে পর, সরকার পক্ষের একজন ব্যারিষ্টার উত্তর দিতে উঠিলেন। তিনি টেবিল চাপড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া, গাঁ গাঁ করিয়া অনেক কথা বকিয়া গেলেন। তাঁর কথা বিচারক মন দিয়া শুনিতেছেন বোধ হইল না। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার বসিলে পর মিঃ মরীস প্রত্যুত্তরে দুচারিটি কথা বলিলেন। তারপর বিচারক রায় প্রকাশ করিলেন। মিঃ মরীসের মক্কেল খালাস পাইল।

ইহার প্রায় আধঘণ্টা পরে রমানাথের মোকদ্দমা উঠিল। একজন কনেষ্টবল সাক্ষ্য দিল যে, "এই ব্যক্তি (রমানাথকে দেখাইয়া) জ্যাককে অনর্থক মারিয়া তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। উহারা রাস্তার মাঝখানে যেরূপ ঝগড়া করিতেছিল তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসামী রমানাথের দিকে তাকাইয়া তাহার পোষাক দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?"

রমানাথের যাহা বক্তব্য সে তাহা অতি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে স্বল্প কথায় বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আইন পড়িতে আসিয়াছ?" রমানাথ বলিল, "না, আমি এখানে রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি।" তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যাক্, আসামী যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কি না? তুমিই কি আসামীকে প্রথমে ঘুসি মারিয়াছিলে?" জ্যাক্ বলিল, "হুজুর সে কথা সত্য। আমি এ মামলা করিতে চাহি নাই। পুলিসে অনর্থক এই মামলা বাঁধাইয়াছে। আমি এই মামলা চালাইতে ইচ্ছা করি না। আসামী এখানে আসিয়া সত্য কথা বলায় উহার উপর আমার আর রাগ নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে মিঃ রমানাথের ঘুসিতে আমার তিনটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার উচিত আমার দাঁত বাঁধাইয়া দেওয়া।"

রমানাথ বলিলেন, "জ্যাক্, আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্যই অত জোরে ঘুসি মারিয়াছিলাম। তথাপি আমার এমন ইচ্ছা ছিল না যে তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব। তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমি দুঃখিত। তোমার দাঁত বাঁধাইবার খরচ আমি দিতে প্রস্তুত রহিলাম।"

জ্যাক্। এখন হইতে আমাকে তোমাদের অনুগৃহীত ভৃত্য বলিয়া জানিবে। তোমরা আমীর লোক। ইহার পর আর কেহ তোমাদিগকে বিরক্ত করিবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সংক্ষেপে এই হুকুম দিলেন ;— "জ্যাক্ মার খাইয়াছে। তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। সে মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক নহে। সেই প্রথমে আসামীকে উত্তেজিত করিয়াছিল। আসামী আত্মরক্ষার্থই জ্যাক্‌কে ঘুসি মারিয়াছিল। তবে মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়াছিল। সেজন্য আসামী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। আসামী উচ্চশিক্ষিত। তাহাকে খালাস দেওয়া হইল।" ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। অতঃপর আমরা মিঃ মরীসের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলাম এবং জ্যাক বাস্তবিকই আমাদের একান্ত অনুগত হইল। আমরা তাহার দাঁত বাঁধাইয়া দিলাম।

এখন জ্যাকের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাতায়াতের সময় আমাদিগকে জ্যাকের দোকানে মধ্যে মধ্যে বসিতে হইত। সে আমাদের অনেক ফরমাস খাটিত।

ক্রমশঃ আমরা জানিতে পারিলাম যে সে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি মেরামত করিতে বেশ জানে। সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় যাইত এবং প্রয়োজন হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি মেরামত ও ফিট্ করিয়া দিত। আমরা মধ্যে মধ্যে তাহাকে খুব খাওয়াইতাম। সে পরমার খাইতে খুব ভালবাসিত।

(২১)

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। আমরা স্ব স্ব পরিগৃহীত বিষয়ে আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে লাগিলাম।

এখানে আসিবার সময় যে প্রণালীতে চলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম ঠিক সেই প্রণালীতেই আমরা চলিতে লাগিলাম। আমাদের দেখাদেখি সেই সময়কার বিলাতপ্রবাসী অনেক ভারতবর্ষীয় ছাত্র পোষাক পরিচ্ছদে আচার ব্যবহারে বিলাতি ভাব পরিত্যাগ করিল। অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও আহার সম্বন্ধে আমাদের মত চলিতে পারিল না। আমরা তাহাদিগকে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মধ্যে মধ্যে খাওয়াইতাম। সেই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমাদের বাসায় বহু ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সম্মিলন হইত এবং বক্তৃতা, গীতবাদ্য আবৃত্তি প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত। এই সকল ব্যাপারে দুই চারি জন ইংরেজও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন।

এই স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন হইতেছে। আমাদের লণ্ডনে পৌঁছিবার পাঁচ মাস পরে সংবাদ পাইলাম যে আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছে। এবং রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে সেই কন্যার নাম রাখা হইয়াছে সাগরিকা।

(২২)

আমাদের বিলাত প্রবাসের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। বিনয়চন্দ্র সিবিলসার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ব্যারিষ্টারী পাশ করিল। আমার মনে হয় শেষ দিকটায় বিনয়চন্দ্রের সিবিল সার্ভিসের দিকে তেমন ঝোঁকও ছিল না। নানাকারণে চাকরীর উপর তার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল।

এই সময়ে একটী ঘটনায় বিনয়চন্দ্রকে লইয়া বিলাতে খুব হৈ চৈ হইয়াছিল। একজন ইংরেজ কয়েক মাস ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বিলাতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন, বিলাতের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ জজ সাহেবও নিমন্ত্রিত হন। এতদুপলক্ষে আহূত সভায় সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। বৃদ্ধ জজ সাহেব আমাদিগকে এই সভায় যাইতে অনুরোধ করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ছয় মাসে সাহেবের কি অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না, সুতরাং বৃদ্ধ জজ সাহেব না বলিলেও আমরা সেই সভায় যাইতাম। যথাসময়ে বৃদ্ধ জজ সাহেব ও মিঃ মরীসের সহিত আমরা কয়েক জন সভায় উপস্থিত হইলাম, যথারীতি সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর বক্তা তাঁহার প্রস্তাবিত বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। বক্তার প্রদত্ত বক্তৃতার সার-মর্ম্ম এই ;—ভারতবর্ষের লোকেরা ভয়ানক অসভ্য। সভ্যজনোচিত কোন গুণ তাহাদের নাই। তাহারা সত্যের মর্য্যাদা বুঝে না। নারীজাতির উপর

তাহারা তাহাদের অত্যাচার করিয়া থাকে। মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরী প্রভৃতি তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। বর্ত্তমান সময়ে যদি ভারতবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সত্যের মর্য্যাদা বুঝিয়া থাকে ত তাহা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়া ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে বক্তা-মহাশয়কে লর্ড মেকলের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বক্তৃতা শেষ হইলে পর সভাপতি মহাশয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে এই বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য এই অপূর্ব্ব বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলাম। বিনয়চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়াছিল। সভাপতির আহ্বান শুনিবা মাত্র বিনয়চন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি একজন ভারতবাসী। এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়াছি। সভাপতির অনুমতি অনুসারে এইমাত্র প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে দুচার কথা বলিতে চাহি।" সভাপতি মহাশয় আনন্দের সহিত বিনয়চন্দ্রকে বলিবার অনুমতি দিলেন। বিনয়চন্দ্র, সাহেবের প্রদত্ত বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তার প্রতিবাদের অর্থ এইরূপ:—যারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানেনা তারাই ভারতবর্ষের নিন্দা করে। বক্তা ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষ-বাসীদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ও নির্জ্জলা মিথ্যাকথা। এইরূপ বক্তৃতার ফলে ইংরেজবাসী ও ভারতবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত আর কোন শুভের আশা করা যাইতে পারে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিনয়চন্দ্রের পর আরও দুএকজন ইংরেজ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহারা মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিলেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য্যের উপসংহার করিলেন। ইনি অতি ধীর ও স্থির ভাবে অল্পকথায় প্রধান বক্তার ভুল বুঝাইয়া দিলেন এবং বিনয়চন্দ্রও যে উত্তেজিত হইয়া কতকগুলি অসার ও অনাবশ্যক রূঢ় কথা বলিয়াছেন তাহাও বলিলেন। সভাপতির আচরণে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। ভঙ্গ হইল। তারপর দিন খবরের কাগজে এই সভার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইল। কয়েক দিবস ধরিয়া বিনয়চন্দ্র খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের সহিত দেখা করিয়া তাহার নিজের বিবরণ বলিতে বলিতে বিরক্ত হইয়া পড়িল। অনেক সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে বিনয়চন্দ্রের ছবি বাহির হইল।

(২৩)

ইহার কিছুদিন পরে এক ইংরেজ কুস্তীগির সংবাদ পত্রে ঘোষণা দিল যে তাহাকে যে কুস্তীতে হারাইতে পারিবে সে তাহাকে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দিবে, আর যে তার কাছে হারিবে, তাহাকেও দুই হাজার টাকা দিতে হইবে,—অনেক কুস্তীগির সেই কুস্তীগিরের সঙ্গে বাজি রাখিয়া হারিতে লাগিল। একদিন রমানাথ আমাকে বলিল যে সে বাজি রাখিয়া ঐ কুস্তীগিরের সহিত লড়িবে। আমি বলিলাম, "আর অতটে কাজ নাই। যদি হারিয়া যাও, মিছামিছি দুই হাজার টাকার ঘাড়ে জল দেওয়া হইবে। রমানাথ বলিল, "আমি ও কুস্তীগিরের কুস্তীর কায়দা কানুন বুঝিয়াছি। সে আমার সঙ্গে কিছুতেই পারিবে না। নেহাৎ হারি ত দুই হাজার টাকা লাগিবে; সে টাকা না হয় আমার বৃত্তির টাকা হইতে দিব। ঘর হইতে ত আর দিতে হইবে না।" আমি তাহার আগ্রহ দেখিয়া আর কিছু বলিলাম না। রমানাথ সেই কুস্তীগিরের সহিত লড়িবার জন্য একটী দিন স্থির করিল." নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদের লড়াই দেখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু লোকের সমাগম হইল। কুস্তীগিরের সহিত লড়ায়ে রমানাথ জিতিল। তাহার দুই হাজার টাকা লাভ হইল। তদুপরি সে সময়ে যত ভারতবাসী লণ্ডনে প্রবাসী ছিলেন তাঁহারা রমা-নাথের এই সম্মান লাভের জন্য রমানাথকে একটী মেডেল দিলেন। এবং এই মেডেল দেওয়া উপলক্ষে আমাদের বাসায় নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ ও ভোজনাদির আয়োজন হইল। এবার নানা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রে রমানাথের বিবরণ ও ছবি ত উঠিলই এমন কি আমরাও পরিত্রাণ পাইলাম না।

আমাদের বিলাত প্রবাসের তৃতীয় বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাড়ীর ঘর তাঁহাদের নির্ব্বাচিত বিষয়ের

পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। বনস্পতি দত্ত আমেরিকা ও জাপান হইয়া দেশে ফিরিয়া গেল এবং আমার পিতা ও দেশের আরও কয়েকজন বড় লোকের অর্থ সাহায্যে একটী দিয়াশালাই, ও একটী পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করিল, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার কারখানার দিয়াশালাই ও পেন্সিলের খুব কাটতি হইতে লাগিল।

এদিকে বিলাতে আমাদের তিনবৎসর কাটিয়া গেল। আমরা দেশে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। এখানে একটী কথা বলা হয় নাই। ভবানীচরণ এক বৎসর যাবৎ আমাদের বাসাতে আমাদের ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার সবের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বহু অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয় ও বিনয় উপেক্ষা করিয়া এক ভ্রমণকারী রিয়েটারের দলে যোগ দিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আমাদের স্বদেশে ফিরিবার আর বিলম্ব নাই। আর দুই তিন মাসের মধ্যেই আমরা যাত্রা করিব। বহুদিন পরে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনকে দেখিবার আনন্দ কল্পনায় অনুভব করিতেছি। এমন সময় পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক টেলিগ্রাম পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথী গুপ্ত।

চয়ন

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীযুক্তা নীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই :—

একদল লোক বলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামিসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর একদল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘর-সংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলেই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মত ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোন উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। ঘরকন্নার নিশ্চিন্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উদ্বৃত্ত রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পংক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্ত্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্য্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত পতানুগতিক হইলে চলিবে

না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। একথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী সামান্য ললনা নহেন, তিনি তাহার সঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তার অংশী, এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসার-পথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে,—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে, তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব-প্রকৃতিকেই দুর্ব্বল করি এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন; যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিম্বা নক্ষত্রলোকের নাড়ি-নক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড় বড় অঙ্ক কাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না, পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে কাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীশুদ্ধ আমরা চ্যাপ্‌টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ ক্ষয়ে না; তেমনি বাস্তুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন এটা তাঁর একটা আশ্চর্য্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটি ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুলমাষ্টার কিম্বা টেক্‌স্‌বুক কমিটি তাঁহাদের এরেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর বিধাতা এবং ইস্কুলমাষ্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা বহিবা কাণ্ট্ হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দুর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে পুরুষের পার্থক্য নাই কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে এ কথা মানিতে দোষ কি?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে একদল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ঝোঁকের কথা। ঝোঁকের

কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্ম্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে কিন্তু মেয়েদের কর্ম্ম যেখানে, সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্ব্বদেশে সপ্রমাণ থাকে যে, দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্দ্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম বাঁধিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবী করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে।—তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই, সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্ম্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয়, যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অসম্মান।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে—এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর কোনো দেশে আছে কিনা কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া

দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও যাদের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ব্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানেনা, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই সৌন্দর্য্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা-ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়; পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্য্যন্তই যাক্ সৃষ্টির গোড়া পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার "সঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তার অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।"

(সবুজপত্র)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সীতার স্বপ্ন

উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কটিকেই একখানি পূরা নাটক বলিলে হয়। কারণ ভবভূতি মহাবীরচরিতে রামায়ণের যে কয় কাণ্ড লইয়াছেন এক চিত্রদর্শনে প্রায় সেগুলি সব হওয়া হইয়াছে তবে এই চিত্রদর্শনের দরকার কি—একথার জবাব দিবার জন্য আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না। চিত্রদর্শনের পর সীতার নিদ্রা—সীতার স্বপ্ন, রামের সীতাপরিত্যাগ, সীতার নিদ্রাভঙ্গ এই সব লইয়া প্রথম অঙ্ক। প্রথম অঙ্কেরও সব কথা আমরা বলিব না। কবি কেমন কৌশলে সীতাকে ঘুম পাড়াইয়াছেন ও কেমন সময়ে কি অবস্থায় তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন শুদ্ধ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

চিত্র খুব লম্বা। বিশ্বামিত্রের নিকট রামের অস্ত্রলাভ হইতে আরম্ভ হইয়া সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত। চিত্র সব দেখান হয় নাই। সব দেখাইবার ভবভূতির ইচ্ছাও ছিল না। যাহাতে রামের চরিত্র ফুটে, যাহাতে সীতার চরিত্র ফুটে যাহাতে রামসীতার অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রেম ফুটে, ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া সেইগুলিই দেখাইয়াছেন। তাহারও মাঝে মাঝে রামচন্দ্র ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, পরশুরামের ব্যাপারটা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কৈকেয়ীর কীর্ত্তি একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং খুব সংক্ষেপেই করা হইয়াছে। চিত্রটা বোধ হয় একালকার ম্যাপের মত গুটান ছিল। লক্ষ্মণ একটু একটু খুলিতেছিলেন, ও দেখা হইলেই অমনি গুটাইতেছিলেন। রাম যেখানটা দেখাইতে বারণ করিলেন সেখানটা লক্ষ্মণ না দেখাইয়াই গুটাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে পঞ্চবটী আসিল; সূর্পণখা আসিল; অমনি সীতা বলিয়া উঠিলেন, আর্য্যপুত্র, এই তোমার আমার শেষ দেখা।" রাম বলিলেন, "ভয় কি! এত ছবি বই কিছু নয়।" সীতা বলিলেন, "যাহাই হউক, দুর্জ্জনের ছবি দেখিলেও কষ্ট হয়।"

সীতাহরণের পর রামের যে দুঃখ, কান্না, হা হতাশ, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখানো হইল। রাম আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। সীতা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ অস্ত্রসস্ত্র আনিবার চেষ্টা করিলেন—জটায়ুর বৃত্তান্ত আনিলেন, হনুমানের চিত্র দেখাইলেন—রামের দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সীতা একে পূর্ণগর্ভা নড়িতে চড়িতে, ভাবিতে চিন্তিতে, সকল অবস্থাতেই

তিনি ক্লান্ত বোধ করেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে অনেক পুরাণ কথা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই। শেষ রাম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"ৎৎসৈতস্মাৎ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি
প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ।"

লক্ষ্মণ দাদাও বড়বৌএর এইরূপ ভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ছবি গুটাইয়া বলিলেন, "এর পর আরও ছিল ;এর পর আরও ছিল। বানর ও রাক্ষসদের অদ্ভুত যুদ্ধ ইত্যাদি অনেক ছিল। তা আর্য্যা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন— আপনারা বিশ্রাম করুন।"

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে রাম সীতাকে বলিলেন, "চল আমরা জানালার ধারে একটু বসি।" সীতা অমনি বলিলেন, "বড় ক্লান্ত হইয়াছি—ঘুমে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে।" রাম বলিলেন, "আমারই গায়ের উপর গা দিয়া শয়ন কর, তোমার হাত আমার গলায় জড়াইয়া দাও। আমার মৃত শরীরে জীবন আসুক।" এই বলিয়া তিনি সীতার হাত দুখানি আপনার গলায় জড়াইয়া লইলেন। সীতা যতই নিদ্রায় কাতর হইতে লাগিলেন, তাঁহার হাত ক্রমেই রামের শরীরে বসিতে লাগিল এবং সীতার করস্পর্শে রাম আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "একি! সুখ বা দুঃখ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, আমি জাগিয়া আছি না ঘুমাইয়া আছি; বিষে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে, না নেশায় আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমার অঙ্গ যতই আমার অঙ্গে গাঢ় হইয়া বসিতেছে ততই আমার ইন্দ্রিয়-সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আমার মনের ভাব আর এক রকম হইয়া গিয়াছে—আমার চেতনা লোপ হইতেছে, ভ্রম উপস্থিত হইতেছে।"

সীতার ঘুমের ঘোরে, অধিক কথা কহিবার ইচ্ছা নাই—তাই তিনি গোটাকতক কথা কহিলেন,—"পর-প্রসাদা ভূমে, ইত্যেবানিং কিমবরং" একটি কথার বাঙ্গলা করা বড়ই কঠিন। ইহার সব ভাবগুলি ফুটাইয়া বাঙ্গলা করিতে গেলে লম্বা হইয়া পড়ে। ঘুমের ঘোরে তত কথা কেহ কয় না, তাই মোটামুটি বাঙ্গলা করিতেছি "তুমি বড় ভালবাস—তা ছাড়া আর কি?" তখন সীতার চোখদুটি ঘুমে গোল হইয়া আসিতেছে তাই রাম বলিলেন, "হে সরোরুহাক্ষি! জাগিয়া থাকিলে যে চোখ পদ্মের পাপড়ির ন্যায় বা চেরা পটলের মত হয়—ঘুম আসে আসে এমন সময়ে সেইটি গুটাইয়া একটু গোল হইয়া আসে।" তাই রাম এখানে "সরোরুহাক্ষি" বলিয়া সীতাকে সম্বোধন করিয়াছেন। সম্বোধন করিয়া রাম বলিলেন, "জীবনের ফুল যখন মলিন হইয়া আসে, তোমার এই মধুর কথা শুনিলে তাহাকে আবার ফুটাইয়া দেয়—আত্মা, শরীর ও মন সকলের তৃপ্তি করিয়া দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সুস্থ ও সিগ্ধ করিয়া দেয়, কাণে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দেয় এবং মনের বল আনিয়া দেয়।"

সীতার ঘুমের ঘোর ক্রমে অধিক হইয়াছে—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না,—বলিলেন, "পিঅংবদ। এহি সংবিসস্ক"—আমি ঘোর বলিয়া চারিদিকে কি খুঁজিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন, "কি খুঁজিতেছ?—বালিশ!—এই ত আমার হাত আছে, শোও। যেদিন বিবাহ হইয়াছে সেইদিন হইতে ঘরে বল, বনে বল, বালো বল, যৌবনে বল, এইখানেই তুমি শয়ন করিয়াছ—এই তোমার বালিশ—আর কেহ কখনও এ বালিশে শোয় নাই।" ঘুমে সীতার কথা আরও জড়াইয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—"একথা ঠিক একথা ঠিক"—তখনই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাম বলিলেন, "সীতা সত্যসত্যই আমার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল?" তিনি স্নেহের চক্ষে সীতাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী, চক্ষে অমৃতের বাতি, ইঁহার স্পর্শ যেন আমার শরীরের ঘন চন্দন। এই যে আমার গলায় ইঁহার হাত রহিয়াছে, ইহা মুক্তার মালা, সরস, শীতল, এবং সুখস্পর্শ। ইঁহার কোন্ জিনিসটি আমার প্রিয় নহে? কেবল একমাত্র আমার পক্ষে অসহ্য—ইঁহার বিরহ।

রামের মুখে এই "বিরহ" শব্দটি বাহির হইবার

পরক্ষণে দ্বারী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেব, উপস্থিত।" 'বিরহ' শব্দটি উচ্চারণ হইবার পরই 'উপস্থিত' শব্দটি শুনিয়া রামের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে! কে উপস্থিত?" দ্বারী বলিল, "দুর্মুখ—আপনার খানসামা।" রাম মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দুর্মুখ আমার ভিতর বাড়ীর চাকর, আমি তাহাকে চর করিয়া পাঠাইয়াছি। নগরের লোক ও দেশের লোক আমার সম্বন্ধে কে কি বলে সে আমায় তাহাই জানাইয়া যাইবে।" বলিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

দুর্মুখ আসিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিল আমি কেমন করিয়া রামের কাছে সীতার সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত অপবাদের কথা বলিব। অথবা আমি বড় হতভাগা! আমার চাকরিই এই।

দুর্মুখ এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় সীতা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হা আর্য্যপুত্র! তুমি কোথায়?" রাম বলিলেন, "ছবি দেখিতে দেখিতেই বিরহের একটা উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তিনি সেই বিরহই স্বপ্নে দেখিতেছেন। বলিয়া সীতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সুমানুষের এমন প্রেম অতি কষ্টেই পাওয়া যায়। ইহা এক, এক ছাড়া দুই নহে; ইহা সুখে ও দুঃখে একরূপ; সকল অবস্থাতেই অনুকূল কখনও প্রতিকূল হয় না—ইহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম হয়; বৃদ্ধবয়সেও ইহার আনন্দ হ্রাস হয় না বরং যত কাল যাইতে থাকে, উভয়ের মধ্যে যে আবরণ ছিল তাহা সরিতে থাকে, তখন ঘন ও নিবিড় স্নেহে গিয়া দাঁড়ায়।"

গর্ভাবস্থায় বিশেষ পূর্ণগর্ভ অবস্থায় স্ত্রীলোকের মনে কোনরূপ ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ না হয়—এটি সকলেই দেখিয়া থাকেন। লোকের মনের ধারণা ওরূপ অবস্থায় ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ হইলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে, সেইজন্য জনক বাড়ী যাইবেন শুনিয়া পাছে সীতার মনে উৎকণ্ঠা হয় তাই রামচন্দ্র ধর্ম্মাসন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত হইবার পরই সীতার মনে স্ফূর্ত্তি হইবে বলিয়া ভবভূতি অষ্টাবক্রকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অষ্টাবক্র আসিয়া উঁহাকে তাঁহার গুরু গুরুপত্নি শাশুড়ী ও ননদ সকলে ভাল আছেন একথা বলিলেন। সীতা ব্যস্ত হইয়া প্রত্যেকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা আমাদের মনে করেন কি?" অষ্টাবক্র বলিলেন, "তাঁহারা মনে করেন—সর্ব্বদাই কামনা করেন তোমার যাহাতে একটি বীরপুত্র হয়।" অষ্টাবক্র বেশ চতুর লোক—সীতার যাহাতে স্ফূর্ত্তি হয় এমন কথাই করিয়া গেলেন। তিনি যাইতে না যাইতেই ভবভূতি লক্ষ্মণকে ছবি লইয়া উপস্থিত করিলেন। রামের তাহাতে বড়ই আনন্দ—আপনাদের পুরাণ বৃত্তান্তের ছবি দেখিলে, বাপ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সীতা আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না—বলিলেন, "দেবীর উৎকণ্ঠা হইলে কেমন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে হয়, তাই লক্ষ্মণ, তুমিই তাহা জান।" প্রথমেই ব্রহ্মাস্ত্রের ছবি। রাম বলিলেন, এসব অস্ত্র এখন তোমার ছেলেদেরই হইবে। সীতা মা হইতে যাইতেছেন, ছেলেদের ভাল হইবে শুনিলে কোন্ মায়ের না আনন্দ হয়? সীতারও তাহাই হইল। তাহার পর বিবাহের ছবি। বিবাহের দিনের কথা মানুষের যত মনে থাকে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কথাই তাহার তত মনে থাকে না। মনে থাকে কেন?—সেদিন বড় আনন্দের দিন,—সেকথা যতবার স্মরণ হয় ততবারই আনন্দ হয়। সীতারও তাহাই হইল। সীতার বিবাহের সময় একটা ভয়ের কারণ হইয়াছিল—পরশুরামের আসা। রাম সে ছবি দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি এক চিলে দুই পাখী মারিলেন। সীতার মনে পাছে ভয় হয়, সেটা তিনি বন্ধ করিলেন আর আপনারও যেটা গৃহি-মাত্র কথা সেটা লইয়াও আলোচনা করিতে দিলেন না। এইরূপ চলিতে লাগিল। পাছে কৈকেয়ীর দুর্ব্যবহার মনে পড়িলে সীতার দুঃখ হয়,—সে ছবিও রাম দেখিতে দিলেন না—আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষ লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক করিলেন। দুঃখেও যেমন লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—আনন্দেও সেইরূপ লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—বিশেষ সীতার মত অবস্থায়। সূর্পণখা দেখাইবার আগেই যদি সীতা ক্লান্তিবোধ করিতেন, বোধ হয় এতটা

ঘটিত না—বিরহ বিরহ বলিয়া মনে একটা ত্রাস জন্মিত না। কিন্তু নিষ্ঠুর কবি সেকথা শুনিবেন কেন? তিনি তাহার কলাকৌশল দেখাইতেই ব্যস্ত। ঐ সময়ে সূর্পণখাকে না আনিলে যে ভৎর্সনার নাটক দেখা হয় না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের মুখে সূর্পণখার নাসাটি করাইলেন—ছবিও দেখাইলেন। এতক্ষণে বাপের জন্ত সীতার যে উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা ত দূর হইয়াছিল; নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া কেহ ছিল না—তিনজনে আনন্দে ভোর হইয়া যাইতেছিলেন। তখন যে সূর্পণখার নাম উপস্থিত করিলেই সীতার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইবে লক্ষ্মণের তাহা মনেই ছিল না। তিনি পঞ্চবটীর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্পণখার নাম করিলেন ও তাহার ছবি দেখাইলেন—হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। সীতার বিরহে রামের যে কি অবস্থা হইয়াছিল সীতা ত তাহা দেখেন নাই—সেগুলি দেখাইয়া সীতাকে খুসী করিতে গেলেন; আবার বিপরীত ফল ফলিল—রাম সে সব কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। রামের দুঃখে সীতারও দুঃখ বাড়িয়া উঠিল। রসান্তর উপস্থিত করিয়া রামকে অন্তদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতেও তত কৃতকার্য্য হইলেন না। শেষ ছবি গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

রাম পুরুষ মানুষ, বিশেষ তিনি একটা প্রকাণ্ড পুরুষ, তিনি সহজেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। সীতা কিন্তু পরিশ্রমে, ভাবনায় ও উৎকণ্ঠায় ঘুমে ঢলিয়া পড়িলেন। রাম আরম্ভ করিবার জন্ত তাঁহাকে কত মিষ্ট কথাই কহিতে লাগিলেন। রাম একটি একটি কবিতা বলিতে লাগিলেন। সীতা দুইটি কথায় প্রথম কবিতাটির উত্তর দিলেন, দ্বিতীয়টির তিনটি কথায়। রাম যখন তৃতীয়টি বলিলেন,—তখনও সীতা দুইটি ছোট ছোট কথায় জবাব দিলেন. কিন্তু সে দুটি দুবার করিয়া বলিলেন। নিদ্রার আগে লোকে এইরূপ এককথা দুইবারই বলে—তাহার পরই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুর্মুখ প্রবেশ করিয়া যখন সীতার সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতেছিল, তখনই সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র তুমি কোথায়?" সূর্পণখার নাম শুনিয়া অবধি সীতার মনে যে বিরহের উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা নিদ্রায়ও যায় নাই। তাই এই স্বপ্ন। এই স্বপ্নই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া। কিন্তু আমরা সীতার নিদ্রার ও স্বপ্নের কথাই কহিতেছি—ভবিষ্যৎ বিপদের কথা এখন তুলিব না।

(নারায়ণ)

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নূতন শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি

আজকাল আমেরিকাতেই শিশু-শিক্ষা লইয়া বেশী আলোচনা চলিতেছে। ফলে, শিশুশিক্ষার জন্ত তথায় অনেকগুলি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ-সকল পদ্ধতি ঠিক একরকমের না হইলেও. উহাদের মূলকথা এক। শিশুদের শৈশবকালটা যাহাতে অকেজো শিক্ষায় বিফল হইয়া না যায়, সকল পদ্ধতিতেই প্রধানতঃ সেই চেষ্টাই করা হয়।

ডাঃ বোরিস সিডিস্ নামে আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত একরূপ নূতন পদ্ধতিতে তাঁহার পুত্রকে এমন শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে. এগার বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বালকপুত্র হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষালাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই নবপদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকে অনেকেরকম মত জাহির করিয়াছেন। কেহ বলেন, "কচি ছেলেকে এমন জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইলে বয়সকালে তাহার দৈহিক ও মানসিক অবনতি ঘটিবে।"—কেহ বলেন, "ইহাতে শিশুর শিশুত্বের উপরে ডাকাতি করা হয়।"—কেহ বলেন, "নবপদ্ধতির গুণে এরূপ শিক্ষালাভ হয় না,—ছাত্রের বিশেষ একটা শক্তির গুণেই হয়। সকল শিশুর ভিতরেই কিন্তু এই বিশেষ গুণটি নাই"; —এই মতগুলির কোনটিই কাজের নয়।

নূতন পদ্ধতি শিশুকে ঔষধ গিলাইবার মত করিয়া লেখাপড়া শিখায় না, বা তাহার শিশুত্ব হরণ করিয়া তাহাকে 'ইঁচড়ে পাকায়' না। এ শিক্ষা দেওয়া হয় আনন্দের সহিত, শিশুকে খেলায় মাতাইয়া, ক্রীড়াচ্ছলে। প্রতি শিশুর ভিতরেই সুপ্ত ভাবে যে

স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার বিকাশ সাধন করাই নবপদ্ধতির উদ্দেশ্য।

এর্ভিন পাণ্ডা নামে একটি শিশু ছবছর বয়সের সময় সমস্ত ইংরাজী বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ঘরে বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা লেখাপড়া করিত, এর্ভিন সেই ঘরে উপস্থিত থাকিত। ছেলেদের পড়াশুনা এর্ভিন যে মন দিয়া শুনিত, তার ভাব দেখিলে তাহা আদৌপেই টের পাওয়া যাইত না। অবশেষে তার বাপ-মা বৈশবগতিকে হঠাৎ একদিন টের পাইলেন যে, এর্ভিন আপনা আপনি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছে।

এই সত্যটা জানিতে পারিয়া পিতা মাতার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল; তাঁহারা উৎসাহের সহিত এর্ভিনকে বানান ও অঙ্ক শিখাইতে লাগিলেন। এর্ভিনও খুব খুসি হইয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। মাস-কতকের ভিতরেই এর্ভিন বানান ও অঙ্ক সম্বন্ধে এতটা জ্ঞানলাভ করিল, যে সকলেই তাহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

কিন্তু এর্ভিনের বয়স যখন তিন বৎসর, তাহার পিতামাতা তখন শিশুর অনিষ্ট-আশঙ্কায় লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

এর্ভিনের পিতা বলিতেছেন, "আমার ছেলে পাছে শিশুত্বের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই ভয়েই আমি তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এর্ভিনও অতি শীঘ্রই যা-কিছু শিখেছিল, সব ভুলে গেল। তার পরে যখন তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল, তখন তাকে আবার নূতন করে সমস্ত শিখতে হয়েছিল। শিশুকালে যে-সব বিষয় সে খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে অনায়াসে শিখতে পেরেছিল, বালকবয়সে সেই বিষয়গুলিও সে তেমন সহজে শিখতে ও বুঝতে পারে নি। এখন তার বয়স আঠারো বছর। সে উপাধি পেয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ বালকের চেয়ে আমার পুত্র বেশী কোন শক্তি দেখাতে পারে নি। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, শিশুকালে তার লেখাপড়া বন্ধ না করলে, সে ঠিক ডাক্তার সিডিসের পুত্রের মত শক্তির পরিচয় দিতে পারত।"

ঠিক নিয়মে শিক্ষা দিতে পারিলে, এমন শিশু নাই, যে অল্পবয়সে অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ দিতে না পারিবে। রেভারেণ্ড এ. এ. বার্ল্ নামে এক পাদরী তাঁহার চারিটি সন্তানকেই নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, পিতামাতারা আপনাদের দায়িত্ব ভুলে মাষ্টিনীকরা মাষ্টারের হাতে ছেলেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন বলেই ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে অক্ষম হয়। আমার বড় মেয়ে লিনার বয়স যখন তিন বছর, আমরা তখনি তাকে লেখাপড়া শিখাতে সুরু করি। স্কুলে যাবার আগেই শিশুদের লেখাপড়া সুরু করা উচিত; এ শিক্ষায় শিশুরা কষ্ট বোধ করে না, আর বৈশবের হাসিখুসিতেও বঞ্চিত হয় না। আমার মেয়ে লিনা পুতুলখেলাও করত, লেখাপড়াও শিখত। আমরা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, লেখাপড়াও একরকম খেলা। সেও তাই বুঝেছিল।"

মিঃ বার্লের বড় মেয়ে লিনার বয়স এখন ষোল বৎসর; সে র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে পড়ে; আপাতত 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট'। তাঁহার প্রথম পুত্রও হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির আণ্ডার গ্রাজুয়েট'। তাহার বয়স পনেরো বছর।

হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর লিও উইনারও শিশুশিক্ষার নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার পুত্রকন্যারাও অপূর্ব্ব বিদ্যার পরিচয় দিয়াছে। অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠপুত্র নরবার্ট এগার বছর বয়সে কলেজে প্রবিষ্ট হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই গ্রাজুয়েটের সম্মান লাভ করে। এখন সে Ph. D. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ বালকেরা যে বয়সে সর্ব্বপ্রথম কলেজের শিক্ষা আরম্ভ করে, সেই বয়সেই নরবার্ট যে Ph. D. ডিগ্রি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নরবার্টের পিতা বলিতেছেন:—বাঁরা মনে করেন আমার ছেলেমেয়েরা বিশেষ একটা গুণ পেয়েছে, তাঁরা নির্ব্বোধ। অন্যান্য বালক-বালিকারা আমার পুত্রকন্যার

মত জ্ঞানলাভ করতে পারে না, তার প্রধান কারণ এই যে, আমার সন্তানেরা যেভাবে শিক্ষা পেয়েছে, অন্যান্য বালক-বালিকা সেভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয় না।

"পিতা মাতারা তাঁদের শিশু সন্তানকে যতটা নির্বোধ মনে করেন, তারা ততটা নির্বোধ নয়। শিশুদের স্বাভাবিক বুদ্ধি কাজে খাটাইলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও শিক্ষা-প্রবৃত্তিকে চেপে রাখলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হয় না। শিশুর কথা ও কার্য্যের উপরে পিতা-মাতার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশুর সামনে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে, ছেলে-মেয়েরা যাতে বাপ-মায়ের সঙ্গে সমানভাবে আলোচনার সুযোগ পায়, তাও করতে হবে, তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সকল বিষয় উপভোগ করবার ক্ষমতা তাদের আছে। এক কথায়, যাতে তাদের বিচারবুদ্ধি বিকাশলাভ করে, সর্ব্বদাই সেইদিকে মনোযোগী থাকতে হবে।

"তারপর, প্রতি শিশুদের মনের টান যে বিষয়ের প্রতি, সেই বিষয়ই তাদের শেখানো দরকার। কেউ আঁক কষতে ভালবাসে, কেউ পড়তে ভালবাসে, কেউ ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাদের ভালবাসা উপেক্ষা করলে চলবে না। আমার ছেলে নরবার্ট যখন আঠারো মাসের, তখন তার ধাত্রী একদিন তাকে নিয়ে সাগরতীরে গিয়ে বালিতে এ, বি, সি, ডি লিখে খেলা করছিল। নরবার্ট খুব মন দিয়ে সব দেখছে শুনছে দেখে ধাত্রী বালির উপর আঁচড় কেটে তাকে বর্ণমালা শেখাতে লাগল। দুদিন পরে সে আমার কাছে এসে বলে যে, নরবার্ট সমস্ত বর্ণমালা শিখে ফেলেছে!" (ভারতী)

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-নীতি।

খাদ্য।

সংসারে গৃহস্থের প্রধান কার্য্য খাদ্যের সংস্থান করা। খাদ্য বিনা জীবনধারণ করা অসম্ভব। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। খাদ্যের দোষে নানা রোগ ভোগের এমন কি মৃত্যু ঘটিবারও সম্ভাবনা। গৃহস্থের খাদ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ শরীর ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাঁহার যেরূপ খাদ্যের আবশ্যক, তাঁহার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইলে গৃহস্থ অনেক রোগ ও শোকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারেন।

বিভিন্ন খাদ্য ও তাহার উপাদান।

বাঙ্গালীর খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে সাধারণতঃ ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী ও দুধই প্রধান। আটা ময়দার প্রচলনও কম নহে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকে যে পরিমাণ দুধ পাইত এখন আর সেইরূপ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী চিরকালই মৎস্য প্রিয় কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। এখন অনেক পল্লী গ্রামে মৎস্য একেবারেই পাওয়া যায় না। দুধ ও মৎস্যের ন্যায় দুইটি পুষ্টিকর সামগ্রীর অভাব বশতঃ বাঙ্গালীর খাদ্যের ও স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে।

শরীর গঠনের জন্য যে আমিষ উপাদানের আবশ্যক তাহার অধিকাংশই আমরা সাধারণতঃ মৎস্য, মাংস দুধ ও ডাল হইতে পাইয়া থাকি, এজন্য দুধ মৎস্যাদির অভাব যাহাতে অন্যরূপে পূরণ হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ডাল ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যে শরীর গঠনোপযোগী আমিষ উপাদানের পরিমাণ অতি অল্প। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে সাধারণতঃ আমাদের অত্যাবশ্যকীয় শর্করা ও লবণ উপাদানের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। মাখন, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্যও আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

চাউল—চাউল আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। বঙ্গদেশে নানা প্রকার চাউলের প্রচলন আছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রকার চাউলে উপাদানগত অতি সামান্য প্রভেদই দৃষ্ট হয়। মোটা চাউলে আবরক ত্বকটি বর্ত্তমান থাকায় কতকগুলি বিশেষ পুষ্টিকর উপাদানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আতপ ও সিদ্ধ চাউল সহজ পরিপাক পায়। নূতন চাউল পুরাতন চাউল অপেক্ষা দুষ্পাচ্য।

ময়দা—আটা ময়দার চাউল অপেক্ষা আমিষ জাতীয় উপাদান কিঞ্চিৎ অধিক। কলের আটা ময়দা অপেক্ষা যাঁতার ভাঙ্গা আটা ময়দা ভাল। কারণ কলের আটা ও ময়দার গমের অনেক আবশ্যকীয় উপাদান বাদ যায়। সুজিতে আটা ময়দা অপেক্ষা আমিষ জাতীয় উপাদান অধিক আছে।

ডাল—সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা ডালে আমিষ উপাদানের পরিমাণ অধিক। উপযুক্তভাবে রন্ধন না করিলে ডালের অধিকাংশ আমিষ উপাদানই পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। বিভিন্ন প্রকারের মুগ, মসুর, অড়হর, খেঁসারি, কলাই, মটর প্রভৃতির ডাল প্রচলিত আছে।

মৎস্য, মাংস—মৎস্য মাংসের আমিষ উপাদান সহজেই পরিপাক পায়। মাংস অপেক্ষা মৎস্য লঘুপাচ্য। পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে মাংসের প্রচলন অনেক অল্প। ছাগ, মেষ, হরিণ ও নানা প্রকার পক্ষীর মাংস প্রচলিত আছে। মাংস লঘুপাক হইলেও আমাদের রন্ধনের দোষে অনেক সময় তাহা দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে। মৎস্যের মধ্যে কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, মৌরলা প্রভৃতি শীঘ্র জীর্ণ হয়। এই সকল মৎস্য রোগীর বিশেষ উপযোগী। ডিম অর্দ্ধসিদ্ধ বা কাঁচা অবস্থায় অতি সহজে পরিপাক পায়, পূর্ণসিদ্ধ বা ভাজা ডিম গুরুপাক।

তরকারি, ফল—তরিতরকারিতে লবণময় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। তরকারির অপার অংশ কোষ্ঠ পরিষ্কারের বিশেষ সহায়ক। খাদ্যে টাটকা ফলমূল বা শাকসব্জি না থাকিলে রক্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আলু, রাঙ্গাআলু, কচু, কাঁচকলা, ওল প্রভৃতি তরকারিতে শ্বেতসার অংশ যথেষ্ট পরিমাণ আছে। কুমড়া, লাউ, পটল, বেগুন, ঝিঙ্গে প্রভৃতিতে জলীয় উপাদানই অধিক এবং ইহাদের পুষ্টিকারিতা নিতান্ত অল্প। পেস্তা, বাদাম, আখরোট, পাকা কলা, আদ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যরূপে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আঙ্গুর ও বেদানার রসে শর্করা ও আমিষ উপাদান উভয়ই বর্ত্তমান আছে ও ইহা সহজেই পরিপাক পায়। নারিকেলের শাঁসও পুষ্টিকর কিন্তু ইহা রোগীর উপযুক্ত নহে। তরমুজ, ডাব প্রভৃতিতে সারাংশ নিতান্ত অল্প হইলেও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোন ফলই ইহাদের সমতুল্য নহে। পাকা পেঁপে ও পাকা পেয়ারা কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। সকল প্রকার ফলই কোষ্ঠপরিষ্কার ও রক্তের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে।

খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণে সাধারণতঃ ৫ প্রকার উপাদান পাওয়া যায়। যথা—আমিষ উপাদান, স্নেহ উপাদান, শালি উপাদান, লবণ উপাদান ও জল।

খাদ্য সংগ্রহ।

অসুবিধা নিবারণের জন্য গৃহস্থকে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে সুবিধা মূল্যে পাওয়া যায়। যে সকল খাদ্য দ্রব্যাদি সহজে নষ্ট হয় না কেবল মাত্র তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মৎস্য, মাংসাদির ন্যায় পচনশীল পদার্থ প্রত্যহ ক্রয় করা কর্ত্তব্য। তরকারি দুই একদিন ভাল অবস্থায় রাখা যাইলেও উপায় থাকিলে প্রতিদিন টাটকা ক্রয় করা ভাল। যত্ন করিয়া রাখিলে আলু অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিতে পারে। পাকা কুমড়া, পাকা পেঁপা প্রভৃতিও অনেকদিন ভাল থাকে। তেঁতুল, আমলকী, সজিনার ফুল প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য শুষ্ক করিয়া রাখিলে অনেক দিন নষ্ট হয় না। এই সকল দ্রব্য মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। চাল, ডাল, ময়দা, আটা, ঘী, তেল, চিনি, গুড় ইত্যাদি দ্রব্য বহু দিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইতে পারে।

খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহকালে গৃহস্থকে অনেকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্য মুখরোচক ও টাট্‌কা হওয়া উচিত। ভেজাল, পোকাধরা, শুষ্ক ও পচা দ্রব্য মূল্যে সুলভ হইলেও ক্রয় করা উচিত নয়। কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করা অপেক্ষা, সামান্য পরিশ্রমে গৃহস্থের নিজের প্রস্তুত করাইয়া লওয়া ভাল। গম ভাঙ্গাইয়া বাড়ীতে আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে জিনিষও ভাল হয় এবং গৃহস্থেরও অনেক সাশ্রয় হয়। ডাল, কলাই প্রভৃতি ঘরে ভাঙ্গাইয়া

লওয়া যাইতে পারে। ঘৃত তৈলাদি যথাসাধ্য বিশুদ্ধ দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। কলের তৈলে নানারূপ ভেজাল দেওয়া হয়। মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও ঘানির তৈলই ক্রয় করা উচিত। বিশুদ্ধ ঘৃতের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইলেও অল্প মূল্যে অবিশুদ্ধ ঘৃত ক্রয় করা কখনও উচিত নয়। দূষিত ঘৃত ব্যবহার না করিয়া বরং ভাল তৈল ব্যবহারই উত্তম।

আমরা এতক্ষণ কেবল বিশুদ্ধ খাদ্য সংগ্রহেরই আলোচনা করিয়াছি। খাদ্য বিশুদ্ধ কি অবিশুদ্ধ তাহা নিরূপণের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

খাদ্য পরীক্ষা।

চাউল—চাউলে অনেক সময় কুঁড়া, কাঁকর, ধূলা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। অল্প যত্ন করিয়া দেখিলেই এই সকল দোষ ধরা যায়। চাউলে অধিক পরিমাণ ক্ষুদ থাকিলে তাহা ক্রয় করা উচিত নয়। পুরাতন চাউলই ক্রয় করা যুক্তি সঙ্গত। নূতন চাউলে অনেক সময়ে পেটের পীড়া হইয়া থাকে। অধিক মাজা চাল স্বাস্থ্যের হিসাবে উত্তম নহে। সকল ডাল সমান সিদ্ধ হয় না। এজন্য অধিক পরিমাণ কিনিবার পূর্ব্বে তাহা রাঁধিয়া পরীক্ষা করা উচিত। ডালেও অনেক সময়, কাঁকর, ক্ষুদ ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে।

ময়দা—ভাল ময়দা ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের হয়। ময়দা মুটা করিয়া ছাড়িয়া দিলে ছড়াইয়া পড়া উচিত। চাপ বাঁধিয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ময়দায় জলের পরিমাণ অধিক আছে। সামান্য পরিমাণ ময়দা দুই অঙ্গুলীর মধ্যে ঘষিলে অতি মিহি দানা অনুভূত হওয়া উচিত। যে ময়দার দানা একবারেই অনুভব করা যায় না তাহা তত ভাল নহে। মুখের মধ্যে সামান্য ময়দা দিয়া চিবাইলে মিহি দানা অনুভূত হয়। ভাল ময়দা একবারে মিলাইয়া যায় না। ময়দার স্বাদ অল্প মিষ্ট হওয়া উচিত। ময়দায় একপ্রকার সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। যে ময়দায় সামান্য পরিমাণেও অম্লস্বাদ পাওয়া যায় তাহা ভাল নহে।

ঘৃত—ঘী বিশুদ্ধ কি না নিরূপণ করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। তবে মোটামুটি কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা ঘী ভাল কি মন্দ তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। খাঁটি ঘী হরিদ্রাভ ও দানাদার হয়। এক্ষণে ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম উপায়ে ঘী দানাদার ও হরিদ্রাভ করিতেছে। এক মাত্র ঘীয়ের গন্ধই ভাল কি মন্দ তাহা নিরূপণ করিবার সহজ উপায়। হাতে অল্প ঘী লইয়া ঘষিলে যদি কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঘী বিশুদ্ধ নহে। ঘী খারাপ হইলে কড়ায় চড়াইলে তাহা ধরা পড়ে। অধিক পরিমাণ ঘী ক্রয়ের পূর্ব্বে অল্প লইয়া পরীক্ষা করা উচিত।

তৈল—অনেকে মনে করেন তৈলে ঝাঁজ থাকিলেই তাহা খাঁটি। ব্যবসায়ীরা সরিষার ছাল, লঙ্কা প্রভৃতির সংযোগে সরিষার তৈলের ঝাঁজ বাড়াইয়া থাকে। কলে সরিষার সহিত অন্যান্য নানা প্রকার দ্রব্যাদি ভেজাল দিয়া তৈল বাহির করা হয়। এজন্য কলের তৈল ক্রয় না করিয়া অধিক মূল্য দিয়াও ঘানির বিশুদ্ধ তৈলই ক্রয় করা উচিত। আলুভাতে বা মুড়ি প্রভৃতির সহিত কাঁচাতৈল মাখিয়া খাইলে তাহা ভাল কি মন্দ অনেকটা বুঝা যায়।

চিনি—বাজারে যে কয় প্রকার চিনি পাওয়া যায় তন্মধ্যে দোবারা চিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। কাশীর চিনি নামে যাহা বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ যাভা দ্বীপ হইতে আমদানী। যাভার চিনির সহিত ভূষা মিশ্রিত করিয়া এদেশে কাশীর চিনি প্রস্তুত করা হয়।

গুড়—খেজুর ও আকের এই দুই প্রকার গুড় প্রচলিত আছে। যে গুড় কাল রঙ্গের, যাহাতে সুগন্ধ নাই অথবা যাহাতে তিক্তস্বাদ আছে এরূপ গুড় ভাল নহে।

তরকারি—শুষ্ক, অধিক পাকা, পচা, ধোঁকা, পোকাধরা তরকারি ক্রয় করা উচিত নহে। ভাল করিয়া দেখিলেই এই সকল দোষ নিরূপণ করা যাইতে পারে। পটল বা আলু আকারে অধিক বড় হইলে তাহার স্বাদ প্রায়ই ভাল হয় না। যে আলুতে অধিক চোক আছে তাহা খাইতে ভাল হয় না। পচিতে খাওয়া বা খেতলান বা ঘাসী ফল মূল ক্রয় করা উচিত নহে।

মাংস—অধিক বয়স্ক ও রুগ্ন পশুর মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। মাংস সহজেই পচিয়া যায়, এবং পচা মাংস শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। কলিকাতা সহরে যে মাংস বিক্রীত হইয়া থাকে মিউনিসিপালিটি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে গুণানুসারে নম্বর দিয়া থাকেন। এজন্য ক্রেতার ঠকিবার সম্ভাবনা কম। অপর স্থানে পরীক্ষা ব্যতীত মাংস ক্রয় করা উচিত নহে। যে মাংস টিপিলে আঙ্গুল অধিক বসিয়া যায়, বা যাহাতে সামান্য দুর্গন্ধ আছে এবং যাহার বর্ণ অতিশয় ফেকাসে তাহা ক্রয় করা উচিত নয়। মাংসের মধ্যে সরু ছুরি প্রবেশ করাইয়া আঘ্রাণ লইলে যদি দুর্গন্ধ পাওয়া যায় তাহা হইলে সে মাংস পরিত্যাগ করা উচিত।

মৎস্য—মাংসের ন্যায় মৎস্যও সহজে পচিয়া যায়। মৎস্য টাটকা কি না জানিবার কতকগুলি সহজ উপায় আছে। টাটকা মৎস্য টিপিলে কঠিন বোধ হয় ও আঙ্গুল বসে না। টাটকা মৎস্যের কানকোর ভিতর লাল থাকে ও কাটিলে রক্ত বাহির হয়। চক্ষু খাড়া ও চক্ষু উজ্জ্বল থাকে। মৎস্যের মুড়া ও পেটি প্রথম পচিতে আরম্ভ হয় এজন্য এই দুই স্থানে সরু কাটি, শুণছুঁচ বা সরু ছুরি প্রবেশ করাইয়া আঘ্রাণ লইলে, মৎস্য ভাল কি খারাপ বুঝা যাইবে। একরূপ কৃমির আক্রমণ ফলে কৈ, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের গাত্রে ছোট ছোট গুটিকা হইতে দেখা যায়। সাধারণে ইহাকে মৎস্যের বসন্ত বলিয়া থাকে। এই প্রকার রোগগ্রস্ত মৎস্য খাওয়া উচিত নহে। জলাশয়ে কখন কখন মৎস্য মরিয়া ভাসিয়া উঠে, সে প্রকার মৎস্য অব্যবহার্য্য।

দুগ্ধ—দুগ্ধে জল, বাতাসা, চিনি, এরারুট ও সময় সময় খড়ি পর্য্যন্ত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা আছে যে লাক্টোমিটার (Lactometer) নামক যন্ত্রের দ্বারা দুগ্ধে জল মিশ্রিত আছে কিনা নিরূপণ করা যায়। দুগ্ধের মাখন তুলিয়া জল মিশ্রিত করিলে অথবা জল মিশ্রিত দুগ্ধে বাতাসা বা চিনি দিলে এই যন্ত্র দ্বারা কিছু ধরা যায় না। এজন্য অধিক মূল্য হইলেও যে স্থানে খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায় জানা আছে সেই স্থান হইতেই দুগ্ধ সংগ্রহ করা উচিত।

খাদ্য সংরক্ষণ।

ভাণ্ডারগৃহ—খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ভাণ্ডারগৃহ আবশ্যক। ভাণ্ডারগৃহে যাহাতে ইন্দুরের উপদ্রব না হইতে পারে তজ্জন্য মেঝে ও দেওয়ালের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সিমেণ্ট দেওয়া উচিত। ভাণ্ডারগৃহ যাহাতে সেঁত-সেঁতে না হয় এবং আলোক ও বায়ুর অভাব না থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যই আবৃত পাত্রে রাখা উচিত, ইহাতে ঘরে মক্ষিকা ও আরসুলা প্রভৃতির উপদ্রব হয় না এবং খাদ্যদ্রব্যাদি দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ভাণ্ডারগৃহে তারের জালের আলমারি থাকিলে তাহাতে অনেক প্রকার খাদ্যাদি রাখিবার সুবিধা হয়। জিনিষ পত্রাদি রাখিবার জন্য মাটির জালা, কলসি বা হাঁড়ি, কেরোসিনের টিন, বিস্কুটের বা চায়ের বাক্স, বালি ও এরারুটের কৌটা এবং মেলিন্স্ কুড্ প্রভৃতির বোতল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভাণ্ডারগৃহ মাসে অন্ততঃ একবার উত্তমরূপে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ভাণ্ডারগৃহের নর্দ্দমা প্রভৃতিতে জাল দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ইন্দুর আরসুলার উপদ্রব কম হয়।

চাল—চাল প্রথমে পরিষ্কার করিয়া ঝাড়িয়া মাটীর জালা বা অন্য কোন আবৃত পাত্রে রাখা যাইতে পারে। চটের থলেতে চাল রাখা যুক্তি সঙ্গত নহে। চাল মধ্যে মধ্যে মুক্তস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে পোকা ধরিতে পায় না। চালের জালায় কাপড়ে বাঁধিয়া অল্প কর্পূর রাখিয়া দিলেও পোকা ধরা নিবারণ হয়।

ডাল—কেরাসিনের টিনে অথবা মাটির হাঁড়িতে শরা ঢাকা দিয়া ডাল রাখা যাইতে পারে। ডাল মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ময়দা—ময়দা, আটা, সুজী প্রভৃতি টিনে রাখাই শ্রেয়। হাঁড়িতে, বিশেষত বর্ষাকালে, এই সকল জিনিষ ভাল থাকে না; মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া ও খাদ্যের মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ঘৃত, তৈল—ঘী, তেল কানেস্তারাতে বা জারে রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অল্প পরিমাণ হইলে বোতলে রাখা যাইতে পারে। ঘী, তেলের পাত্র সর্ব্বদাই আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। পিতলের বা তামপাত্রে তেল বা ঘী অধিক দিন থাকিলে কলঙ্কিত হইয়া যায়। মৃত্তিকা-পাত্রে এরূপ দোষ না ঘটিলেও ধুলা লাগিয়া তাহা অতি সহজেই মলিন হইয়া পড়ে। তবে মাটির মটকিতে মুখ ঢাকিয়া রাখিলে বেশ ভালই থাকে। জিনিষ ফুরাইয়া গেলে পুনরায় রাখিবার পূর্ব্বে পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

চিনি—চিনি টিনের কানেস্তারাতেই রাখা ভাল। কারণ কানেস্তারা ভাল করিয়া বন্ধ করা যায়। হাঁড়িতে সরা ঢাকা দিলেও পিপীলিকা প্রবেশ করিয়া থাকে। তবে জলের উপর বসাইয়া রাখিলে পিপীলিকা নিবারিত হয়। পাত্রের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিলে এবং পাত্রের গায়ে চিনি লাগিতে না দিলে, জলে বসাইবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

গুড়—চিনির পাত্র অপেক্ষা গুড়ের পাত্রে সহজে পিপীলিকা ধরে। গুড়ও চিনির ন্যায় সাবধানে রাখা উচিত। গুড়ের পাত্রের মুখ কিছু বড় হইলে তুলিবার সুবিধা হয়।

মিষ্টান্নাদি—তারের জালের আলমারি থাকিলে তন্মধ্যে মিষ্টান্ন রাখিবার বিশেষ সুবিধা হয়। "জলের খুরায়" আলমারি বসাইয়া রাখিলে খাদ্যদ্রব্যে পিপীলিকা বা মক্ষিকা ধরিতে পারে না। ভাণ্ডার গৃহে এইরূপ একটি আলমারি থাকিলে অনেক প্রকার দ্রব্যাদি রাখিবার সুবিধা হইয়া থাকে। অনেকে মিষ্ট দ্রব্যাদি সিকায় ঝুলাইয়া রাখেন কিন্তু ইহাতে মক্ষিকা নিবারণ করা যায় না এবং পিপীলিকাও নিবারিত হয় না। সিকা বাহিয়া কখন কখন ইন্দুরও আসিয়া থাকে।

মসলা—মসলা ইত্যাদি টিনের বাক্স, কৌটা বা শিশিতে রাখাই উত্তম। এই সকল দ্রব্য মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক।

তরকারি—তরকারি প্রভৃতি ঠাণ্ডায় ঝুড়ি করিয়া রাখিয়া ভিজা ন্যাকড়া চাপা দিলে ২।১ দিন ভাল থাকে। আলু বাঙ্গলাদেশ যুক্ত অন্ধকার স্থানে বালির উপর সাজাইয়া রাখিলে বহুদিন অবিকৃত থাকে। পেঁয়াজ কুমড়া প্রভৃতি বায় করিয়া রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। অনেকে পাকা পেঁপা সিকায় ঝুলাইয়া বৎসর অনেক পর্য্যন্ত রাখিয়া দেন। শ্বেতসুল বিচি ছাড়াইয়া হাঁড়ি করিয়া রাখিয়া দিলে অনেক দিন ঠিক থাকে। সজিনার ফুল শুষ্ক করিয়া টীনের কৌটায় রাখিলে বহুদিন ভাল থাকে।

আচার—আচার চাট্‌নি প্রভৃতি মৃত্তিকা বা কাচ পাত্রে ঢাকা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া উচিত। তৈলের পরিমাণ অধিক থাকিলে আচার অনেক দিন ঠিক থাকে। হস্ত উত্তম রূপে ধৌত না করিয়া আচারে হাত দিলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

ভাণ্ডার গৃহে কুকুর বিড়াল প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। ইন্দুর মারিবার জন্য ভাণ্ডার গৃহে সেঁকো বা অন্য প্রকার বিষ রাখাতে ক্রমক্রমে তাহা খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় গৃহস্থের বিষম অনর্থ ঘটিতে দেখা গিয়াছে। ইন্দুর মারিতে এরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া কল রাখা উচিত।

খাদ্য প্রস্তুতকরণ।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি আমরা বিনা রন্ধনে ভক্ষণ করি। এই সকল দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। ফল মূল প্রভৃতি উত্তমরূপে না ধুইয়া খাওয়া উচিত নহে। ছোট ছেলেরা অনেক সময় না ধুইয়াই আটা ও ধুলিমাখা ফল খাইয়া থাকে, ইহাতে দুখে যা হইতে পারে ও কৃমি রোগের সম্ভাবনা আছে। আম, লিচু, ফুল প্রভৃতি ফলে অনেক সময় পোকা থাকে এজন্য উত্তমরূপে না দেখিয়া এই সকল ফল খাওয়া উচিত নহে। ফল ছাড়াইয়া খাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তরিতরকারিতেও অনেক সময় পোকা থাকে। এজন্য রন্ধনের পূর্ব্বে সে গুলি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। নুনের জলে তরকারি ডুবাইয়া রাখিলে ভিতরে কোন পোকা থাকিলে তাহা বাহির

হইয়া যায়, ঘুন-কপি বা বাঁধাকপির ভিতর পোকা লুকায়িত থাকিলে এই উপায়ে তাহা বাহির করিতে পারা যায়।

তরকারি কুটিবার সময় তাহার অব্যবহার্য্য অংশ গুলি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অধিক খোসা থাকিলে তরকারী দুষ্পাচ্য হয়। অনেকে খোসা সমেত আলু লাউ বা কুমড়ার খোসা ইত্যাদি খাইয়া থাকেন। ভাল করিয়া রন্ধন না হইলে, এই সকল দ্রব্য পেটের পীড়া উৎপন্ন করে। অধিক ছোট ছোট করিয়া কুটিলে রন্ধনের সময় তরকারি গলিয়া যায়। আবার অধিক বড় থাকিলে ভাল সিদ্ধ হয় না। তরকারি কুটিয়া রন্ধনের পূর্ব্বে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। কোটা তরকারি অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহার উপাদানের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। চাল ডাল ইত্যাদি উত্তমরূপে বাছিয়া কাঁকর মাটি বাছিয়া ফেলা উচিত। চাউল বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক না ধুইলে ভাত ভাল হয় না। এজন্য তাহা পুনঃ পুনঃ ধুইয়া পরিষ্কার করা উচিত।

মাছ কাটিয়া ভাল করিয়া ধোওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ রন্ধনের পরও আঁসটে গন্ধ থাকে। অনেকে বলেন যে মাংস ধুইলে স্বাদ খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া মাংস পরিষ্কার না করিয়া রন্ধন করা উচিত নহে।

রন্ধনের পূর্ব্বে নুন, গুড়, চিনি মসলা প্রভৃতিও দেখিয়া দেওয়া উচিত যেন তাহাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে। অনেক সময় আরসুলার বিষ্ঠা ইহাদের সহিত মিশ্রিত থাকে।

রন্ধনের পাত্রাদিতে যাহাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ব্যবহৃত বাসন পাত্রাদি রন্ধনের পর উত্তমরূপে মাজিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। মাটীর পাত্র প্রত্যহ পরিষ্কার করা ও মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া ফেলা উচিত।

রন্ধন করা খাদ্য দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা ধূলা, মাছি, পোকা ইত্যাদি পড়িয়া তাহা দূষিত হইয়া থাকে।

রন্ধনগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। রন্ধন গৃহে যথেষ্ট আলোক না থাকিলে খাদ্য দ্রব্যে ময়লা পড়িলে তাহা দেখা যায় না। কেরোসিনের ডিবা বা যাহাতে অধিক ধূম হয় এরূপ আলোক রন্ধনগৃহে রাখা উচিত নয়। রন্ধনগৃহে শীঘ্র শীঘ্র ঝুল জমে এজন্য অল্প দিন অন্তর গৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

রন্ধনকারীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক। অধিকাংশ স্থলেই পাচক ব্রাহ্মণদের অপরিচ্ছন্ন থাকিতে দেখা যায়। তাহারা পাত্র চুল-কাইয়া ঘাম মুছিয়া বা নাক ঝাড়িয়া নিঃসঙ্কোচে সেই হাত খাদ্য দ্রব্যে দেয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অগ্নির উত্তাপে রন্ধনকারীর প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়। সামান্য অসাবধান হইলে খাদ্য দ্রব্যাদিতে ঘর্ম্ম সংযোগের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। জামা পরা থাকিলে এই সম্ভাবনা অনেকটা নিবারিত হয়। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণকালে বিভিন্ন ব্যক্তির স্পর্শে এরূপে খাদ্য দ্রব্যাদি যে কিরূপ দূষিত হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

থালাদি পাত্রের একদিক হইতেই তুলিয়া পরিবেশন করা কর্ত্তব্য। খাদ্য সামগ্রী বাঁটিয়া গেলে তাহার স্বাদ ও সুগন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং খাদ্যদ্রব্য সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে। বাঁটা না হইলে রন্ধনকরা সামগ্রী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। অনেকে সকালের রন্ধন করা সামগ্রী রাত্রে আহার করিয়া থাকেন। খাদ্য দ্রব্যাদি অবিকৃত থাকিলে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু তাহাতে গন্ধ বা স্বাদের সামান্য বিকৃতি ঘটিলেই আর ব্যবহার করা উচিত নহে।

খাদ্য গ্রহণ।

ভোজন স্থান—ভোজনের স্থান বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ভোজনের স্থানের নিকটে নর্দ্দমা বা আস্তাকুড় থাকা উচিত নয়। নিকটে অপরিষ্কৃত স্থান থাকিলে মক্ষিকা এবং কীটাদির উপদ্রব হয় এবং দুর্গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে ভোজনের বিঘ্ন হয়। আমাদের দেশে আহারের পূর্ব্বে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া জলছড়া দেওয়া হয়।

এই প্রথা অতি উত্তম। ইহাতে ভূমিস্থ বীজাণু ও ধূলিকণা প্রভৃতি উড়িয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। অপরিষ্কার স্থানে আহারে তৃপ্তি হয় না।

মুসলমানেরা কাপড়ের উপর ভোজন পাত্রাদি রাখিয়া আহার করেন। ইহাতে ভূমিতে পাত্রাদি রাখার অনেক দোষ নিবারিত হয়। কিন্তু অনেকে কাপড় পরিষ্কার না করিয়া তাহা তুলিয়া রাখেন ও পরদিন পুনরায় ব্যবহার করেন। এরূপ করা উচিত নহে। আহারের সময় অন্নাদির অংশ কাপড়ে লাগিয়া যায়, তাহা প্রতিদিন কাচিয়া পরিষ্কার না করিলে কাপড়ে বিশেষ দুর্গন্ধ হয় ও নানা প্রকার কীটাণু জন্মিয়া থাকে। এই কাপড় প্রতিদিন উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা টেবিলে আহার করেন তাঁহাদেরও টেবিলক্লথ প্রত্যহ কাচা আবশ্যক।

উচ্ছিষ্ট ভোজন—অনেক বাটীতে এক পাতে পরে পরে ৩। ৪ জন ভোজন করিয়া থাকে। উচ্ছিষ্ট ভোজন বিশেষ দোষনীয়। উচ্ছিষ্ট ভোজন দোষেই যক্ষ্মা ও অন্যান্য নানা প্রকার ব্যাধি পিতা হইতে পুত্রে এবং পতি হইতে পত্নীতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। অনেক সময় পিতা মাতা গাল চিবাইয়া পুত্র কন্যাকে দিয়া থাকেন; এরূপ করা বিশেষ অন্যায়।

ভোজন পাত্র—ভোজনের পাত্রাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত। অপরিষ্কৃত পাত্রে ভোজনে তৃপ্তি হয় না ও নানা প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ভোজনপাত্র পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধোয়া আবশ্যক। পানীয় ও রন্ধনের জল বিশুদ্ধ হইলেও অবিশুদ্ধ জলে পাত্রাদি ধৌত করাতে কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার ড্রেন ও নর্দ্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার জন্য যে অপরিষ্কৃত গঙ্গার জলের কল আছে তাহাতে পাত্রাদি ধৌত করাতে কলেরার আক্রমণ হইয়াছে এরূপ ঘটনাও বিরল নহে। পরিষ্কৃত জলের ব্যবস্থা থাকিতে এরূপ জল ব্যবহার বিশেষ অন্যায়।

পরিবেশন—পরিবেশনের পাত্র ও পরিবেশনকারীর বিশেষ পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। খাদ্য দ্রব্যাদি হাতে করিয়া না উঠাইয়া হাতা বা চামচা করিয়া উঠান উচিত। অনেক স্থানেই দেখা যায় যে পরিবেশনকারীর কাপড় অতি মলিন তৈলাক্ত ও দুর্গন্ধময়। এরূপ পরিবেশনকারী সুখাদ্য দিলেও তাহা ভোজনে অতৃপ্তি জন্মে। অধিকাংশ নিমন্ত্রণ স্থলেই পরিবেশনে বিশেষ সাবধানতা লক্ষিত হয় না। পরিবেশনকারী হস্তে করিয়াই খাদ্যাদি উঠাইয়া দেন, তাঁহার গাত্র নিঃসৃত ঘর্ম্ম খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহাতে খাদ্য সামগ্রী দূষিত হয় এবং ভোজনে অতৃপ্তি জন্মে। পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতার সামান্য খাদ্যও ভোক্তাকে তৃপ্তি দান করে।

খাদ্য সামগ্রী ভূমিতে পড়িয়া গেলে তাহা পুনরায় উঠাইয়া লওয়া উচিত নয়। ভূমিতে অনেক সময় কীট, বীজাণু ও তাহাদের ডিম্বাদি থাকে, এই সকল খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের অনেক সময় মেঝের উপর খাবার দেওয়া হয়, ইহাই আমাদের কৃমি রোগের একটী প্রধান কারণ। (স্বাস্থ্য-সমাচার)

আয়েষা

রমণী বিধাতার এক রহস্যময় অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হিমালয়ের উচ্চতার পরিমাণ করা যায়, অতল সমুদ্রেরও তলস্পর্শ করা যায় কিন্তু রমণীহৃদয়ের গভীরতা বা বিশালতা সম্যক্ অনুভব করা যায় না। রমণীহৃদয় অতলস্পর্শ। পৃথিবীতে নারীচরিত্র এক বিষম প্রহেলিকা। পরের বুকে শেল বিদ্ধ করিয়া, পরের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া পরের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া অপরিচিত নরনারীর অঙ্কপাতে যারা প্লাবিত করিয়া পুরুষ অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়া থাকে। আর রমণী, গৃহপিঞ্জরবদ্ধা, পরাধীনা, প্রেম-নির্ঝর-করুণার উৎস, মূর্ত্তিমতী সুখ ও শান্তি-স্বরূপিনী—সংসারের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের ভিতর দিয়া, সমস্ত অন্যায়, শত নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিয়া যে সংযম, ধৈর্য্য ও অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে তাহার তুলনায় আলেকজান্দার, সীজার, নেপো-

লিয়ন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মহাবীরগণের চির আকাঙ্ক্ষিত বীরত্ব-কীর্ত্তিও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া যায় না কি? একে কঠোরতা, অপরে কোমলতা। পুরুষ ভোগে শ্রেষ্ঠ, নারী ত্যাগের মহিমায় গৌরবান্বিতা।

আজ আমরা বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর এতাদৃশ একটি আদর্শ নারীচরিত্রের আলোচনা করিব। শুধু, ক্ষণিক আমোদ বা চিত্ত বিনোদন ভিন্ন যদি উপন্যাস রচনা বা উপন্যাস পাঠের অন্য উদ্দেশ্য থাকে তবে 'আয়েষার' আলোচনাও নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

আয়েষা নবাব কতলুখাঁর কন্যা। নির্দ্দয়, নির্ম্মম, কঠোর, দুর্দ্ধর্ষ পাষাণপ্রকৃতি পাঠানগৃহে কিরূপে যে এই কোমল কুসুম কোরকটী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাই একটা মস্ত সমস্যার বিষয়। এই অনাঘ্রাত পারিজাতটি আপন সুবাস বিতরণে সমস্ত পাঠান পুরীটিকে আমোদিত ও আমাদের চক্ষে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট কতলুর পাঠান-হিয়া যতই কঠোর যতই কর্কশ হউক না কেন এই স্বপ্নসুন্দরী স্নেহপ্রতিমাটির সংস্পর্শে আসিলেই তিনি একেবারে জল হইয়া যাইতেন। শুধু কতলু নয়, দাসদাসী, আমলা ওমরাহ সকলের হৃদয়েই অবাধে সে আপনার হৈম সিংহাসনখানি প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিল। রাজপুরীর আমোদ উৎসব আয়েষাকে লইয়া। আয়েষার যেখানে পদার্পণ না হইত সে স্থান দিবালোকেও অন্ধকার। সাপুড়িয়ার বংশীধ্বনিতে যেমন দুরন্ত সর্প আপনা হইতে বশীভূত হয়, তেমনি আয়েষার ভিতরও কি একটা অনির্ব্বচনীয় সুষমা ছিল যাহার জন্য সমস্ত রাজ অন্তঃপুর অতি সহজেই তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আয়েষার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বা তাহার আদেশ অমান্য করে এমন শক্তি বা সাহস কাহারও ছিলনা, স্বচ্ছন্দচারী বনবিহঙ্গীর মতই তাহার সর্ব্বত্র অবাধ স্বাধীন বিচরণ ছিল।

আয়েষার এই অনায়াস প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার মূল তাহার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য। সৌন্দর্য্যের সহিত পবিত্রতার যোগ হইলে যে ঔজ্জ্বল্য জন্মে সেই ঔজ্জ্বল্য—যাহার নিকট প্রেম ও ভক্তিভরে হৃদয় আপনা হইতে লুটিয়া পড়ে। সংসারের আবিলতা, ঘৃণ্য কলুষতা, পশুবৃত্তি বা কুটিলতা তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পবিত্রতাহীন সৌন্দর্য্য পরিণামে ঘৃণা ও জুগুপ্সার উদ্রেক করে. কিন্তু আয়েষা স্বভাব সৌন্দর্য্যের উপর পবিত্রতার ধারা তাহার চরিত্রকে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিল যে সেখানে পাপের ছায়া স্পর্শ করিতে পায় নাই।

আয়েষার আর একটি গুণ এবং সকলের প্রধান গুণ সমবেদনা। কালিদাসের অনুকরণ করিলে বলিতে পারি "এ যেন মূর্ত্তিমতী সমবেদনা।" অনুকূতি হইতেই অনুবেদনা বা সহমর্ম্মিতা জন্মে। পরের সুখে সুখী পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, পরকে আপন করা ও আপনাকে পরের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া ইহাই সমবেদনার কাজ। সমবেদনা পরের শোকে অধীর হইয়া পরের হাত ধরিয়া বলে 'আমিও শোকার্ত্ত ও তোমার দুঃখে দুঃখিত, তাই শান্ত হও।' কায়ক্লেশ ক্লৈব্য দম্পতীর একের বিনাশে তমসায় ম্রিয়মান বৃদ্ধ ঋষির অন্তঃকরণ হইতে স্বতঃস্রাবী করুণার উৎস প্রবাহিত হইয়া যে অমর কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা চটুল বিলাস বাসনার কাব্য নহে—উহা সমবেদনার কাব্য। তাঁহার প্রতি ছত্রে ছত্রে গভীর সমবেদনা: আয়েষার হৃদয়ও তেমনি সমবেদনায় ভরা। সে আশৈশব সুখ ও ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বিলাস বাসনার মধ্যে পালিতা ও বর্দ্ধিতা বটে কিন্তু ভোগ ও বিলাসিতা তাহার কাম্য বস্তু নহে। সে আপনাকে লইয়া থাকিতে জানে না—থাকিতে পারে না, কোথায় কে আর্ত্ত, দুঃখী, রুগ্ন, আহত, আয়েষার করুণ নারীহৃদয় তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। তাহার অকিঞ্চিৎকর সাহায্যে যদি কাহারও বিন্দুমাত্রও উপকার হয় তবে আয়েষা সুখী ও তাহার নারীজীবনকে ধন্য মনে করে। শত্রু মিত্র ভেদ নাই, জাতি ধর্ম্মের প্রশ্ন নাই। আয়েষা অবিরাম সেবা করিয়া যাইতেছে। ইহাই তাহার সুখ, ইহাই তাহার জীবন-ব্রত। আর সে সেবাই বা কেমন! আয়েষার পদশব্দ রোগীর সান্ত্বনা, তাহার করস্পর্শ মূর্চ্ছিতের চেতনা, তাহার বাক্য মুমূর্ষুমুখের সঞ্জীবনী সুধা, তাহার উপস্থিতি সকল দুঃখ জ্বালার নিবৃত্তি, তাহার

হাতে দেওয়া পানীয় অমৃত মনিয়া। পাঠক জগৎসিংহের আহত ও কৃতজ্ঞতায়, তিলোত্তমার কারাগৃহে মূর্চ্ছাকালে কতদূর মৃত্যুসময়ে আয়েষার এই নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও তাহার মনে একটু গর্ব্ব বা অভিমান নাই। ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া আবার নিদ্রা ভুলিয়া আয়েষা জগৎসিংহের শুশ্রূষা করিতেছেন। তাহারই ফলে রাজকুমারের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ওসমান বলিতেছেন আয়েষা এ জগতে তোমার তুলনা নাই, তুমিই জগৎসিংহের প্রাণ দিয়াছ —।" আয়েষা বাধা দিয়া বলিল, "ওস্মান আশ্রিত স্বভাবতই রমণী, পীড়িতের সেবাই আমার ধর্ম"— আয়েষা তাহার কার্য্যে নিজে গৌরবানুভব করা দূরে থাকুক অন্যের মুখেও নিজের প্রশংসাটুক শুনিতে নিতান্ত কৃপণ। ইহা হইতে মহত্তর, রমণীর আর কি হইতে পারে! এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবাব্রত গ্রহণ করিতে কয়জন পারে!

আমরা এতক্ষণ একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বলিয়াছি আয়েষা সুন্দরী। পাঠক জানেন আয়েষা শুধু সুন্দরী নহে। আয়েষা যুবতী, আয়েষা অনূঢ়া! ভগবান মকরকেতন অলক্ষ্যে থাকিয়া কখন কাহাকে সন্ধান করিয়া বসেন তাহার স্থিরতা নাই। তবে উল্কির যৌবন যুবক যুবতীর উপরই যে তাহার দৌরাত্ম্যটুকু, অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ একটা শর আসিয়া অকস্মাৎ আয়েষার বুকে লাগিল। আহত কৃত জগৎসিংহকে সেবা করিতে আসিয়া দেখিল সে তাহার অজ্ঞাতসারে জগৎসিংহকে ভালবাসিয়াছে। পরিচিত হউক অপরিচিত হউক পীড়িতমাত্রকেই ভালবাসা তাহার স্বভাব। কিন্তু তবু অন্যান্য অপরিচিত আহতের সহিত আজিকার এই বিশিষ্ট আহতটীর অনেক প্রভেদ ছিল। আর পরের প্রতি ভালবাসার সহিত আয়েষার এ নূতন ভালবাসারও বিস্তর প্রভেদ ছিল। তাহার এ ভালবাসার নাম আত্মসমর্পণ। এ সেবার নাম আত্মবিক্রয়, মন প্রাণ অপরের পদে উৎসর্গ! জগৎসিংহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন আয়েষার এখন না আসিলেও চলে। কিন্তু তবুও দিনান্তে একবার তাহার তত্ত্ব গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। একবার আসিলে উঠিয়া যাইতে পা সরেনা। কিসের এ প্রেরণা যাহা নরনারী জাতি ধর্ম্ম দেশ কাল সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। কিসের এ আবেগ! জগৎসিংহের ভিতর কি অমৃত লুকায়িত আছে যাহার জন্য তাহার চির-বন্ধুকর এমন সহসা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক জানেন এই সময় হইতেই আয়েষার পরীক্ষা বা দুঃখের আরম্ভ হইল।

মানুষ মাত্রেরই জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তাহাদের দেহ-নদীতে বন্যার জোয়ার আসে, সে জোয়ার যৌবনসুলভ চপলতা। তখন পৃথিবীতে দুঃখ বলিয়া একটা জিনিসের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে দিকে তাকাই সকলই সুন্দর ও স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। বিচার বা সূক্ষ্ম দর্শন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। যাহা আপাত মনোরম, মন আগুপিছু বিবেচনা না করিয়া তাহারই দিকে ধাবিত হয়। যদি শক্ত বাঁধ থাকে, তবে কোন মতে রক্ষা মনুষ্য সে চঞ্চলতার প্লাবনে অনেকেই নিজকে সামলাইতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া যায়।

আয়েষার যৌবনেও হঠাৎ একদিন এইরূপ একটা চঞ্চলতার জোয়ার খেলিয়া গেল। সে জোয়ারের আবেগ তাহার হৃদয় কন্দরের অতি নিভৃত স্থানটীও কানায় কানায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আয়েষা এতদিন ধরিয়া যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া আসিতেছিল আজ হঠাৎ তাহারা কোন যাদুমন্ত্রে আশ্চর্য্যরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উঠিল। আয়েষা প্রমাদ গণিল।

আয়েষার ভাগ্য বড়ই ভাল। তাহার হৃদয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। তাই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিলেও সে জোয়ার তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না, আয়েষা শুধু সুন্দরী, শুধু যুবতী বা শুধু প্রেমিকা নহে, সে শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। শুধু যে ভালবাসিতে বা আত্মবিক্রয় করিতে শিখিয়াছিল তাহা নহে সে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুরন্ত হৃদয়াবেগ প্রশমিত করিতেও তাহার যথেষ্ট শক্তি ছিল। যাহা উত্তেজনার সৃষ্টি করে কিন্তু চিন্তার অবসর দেয়না, যাহাতে ভাবনা আসে কিন্তু ভাবিয়া কূল কিনারা

পাওয়া যায় না, যাহাতে একটা মোহ আসে কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপ কি বুঝিবার অবসর দেয় না। আয়েষা এরূপ ভালবাসার উদ্দাম প্রলোভনকে জয় করিবার যথেষ্ট সংযম ও ধৈর্য্য আহরণ করিয়াছিল; আজ তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত সেই শিক্ষা ধৈর্য্য ও সংযমই তাহার সহায় হইল। গভীর স্রোতোজলে সাঁতার দিবার পূর্ব্বেই সে দেখিল তাহার সাঁতার শিক্ষা আছে কি না! চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইয়া দাহ আলার ছট ফট করা অপেক্ষা পূর্ব্বে দীপশিখাতেই অঙ্গুলিকুতার পরীক্ষা লওয়া বাঞ্ছনীয়। আয়েষা আজ যে প্রণয়সাগরে ঝাঁপ দিতে যাইতেছে তাহাতে সুধা কি গরল কি আছে কে জানে, সে পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করিল।

তবে কি জগৎসিংহ একেবারেই আয়েষার হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন! তা নয়। আয়েষা উদ্দামতাকেই রুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার হৃদয়-যমুনার বিপুল প্রেমাবেগ প্রশমিত করিয়া তাহাকে ধীর শান্ত ও সংযত করিল মাত্র, তাহার প্রবাহ বন্ধ করিল না। পূর্ব্বের সকলই রহিল কিন্তু সকলই ভিতরে ভিতরে: আয়েষার সেই ভালবাসা তাহার সেই হৃদয় ভরা প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাহার ভিতরে ভিতরেই প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে এজন্য কাহারও নিকট উপযাচিকা হইল না, কোন দূতী প্রেরণ করিল না, কোন হা হুতাশ এমন কি একখানা লিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিল না। বোধ হয় এজন্য অনেকেই গ্রন্থকারের উপর অভিসম্পাত করিয়া থাকিবেন। আয়েষা জগৎসিংহের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী একথা আয়েষা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না—এমন কি জগৎসিংহও নহেন।

মানুষ যাহা ভাবে ঠিক তদনুযায়ী কাজ হইলে হয় খুব ভালই হইত নয় খুবই অনিষ্ট হইত। কিন্তু সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার। কাজেই মানুষ অনেক সময় ভাবনার বিপরীত ফল পাইয়া থাকে। আয়েষা ভাবিয়াছিল তাহার প্রণয়বার্ত্তা আর কেহই জানে না। জানিবেই বা কেমন করিয়া? কই সে ত কোনও দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই! কিন্তু তবু সে যে জগৎসিংহের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী একথা একজন জানিতে পারিল। আয়েষার গোপন চেষ্টা সকলকেই ফাঁকি দিয়াছিল কেবল তাহারই দৃষ্টি কোন মতেই এড়াইতে পারিল না। সে ওসমান্।

ওসমানের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আয়েষা ও ওসমান উভয়েই কতলুর তুল্য স্নেহে পালিত ও আশৈশব উভয়েই ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে পরিবর্দ্ধিত। তবে তাহাদের চরিত্রে এইটুকুই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওসমান সম্পূর্ণ বদ্‌লিয়া গেল, কিন্তু আয়েষা পূর্ব্বের সেই আয়েষাই রহিল। ক্রমে যৌবন সমাগমে আয়েষার চল চল রূপলাবণ্য অপরূপ রমণীয়তায় ফুটিয়া উঠিল। সে রূপ দেখিয়া যুবক ওসমান্ মুগ্ধ ও আত্মহারা হইল। তাহার হৃদয় হইতে চিরসঙ্গিনী আয়েষার ভগ্নীবৃত্তি অপসারিত হইয়া গেল ও তৎ পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব সুষমাময়ী পত্নীবৃত্তি আসিয়া জুড়িয়া বসিল। ওসমান মনে করিয়াছিল যে আজ হউক বা দু দিন পরে হউক আয়েষা তাহারই গলে বরমাল্য দিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু আয়েষার পূর্ব্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। ওসমান তাহার ভ্রাতাই রহিল। আজীবন যাহাকে ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছে তাহাকে আজ হঠাৎ নূতন করিয়া কেমনে স্বামী ভাবে পূজা করিবে তাহা আয়েষার বুদ্ধির অতীত, ওসমান কিন্তু তাহাতে সুখী হইতে পারিল না। জগৎসিংহের আগমনাবধি সে আয়েষার ভিতরে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতে পারিল এবং পাছে আয়েষা অন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী হয় এই ভয়ে আয়েষা সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য কেবলি সুযোগ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। গভীর রাত্রে একদিন আয়েষা জগৎসিংহের শুশ্রূষা করিয়া ফিরিতেছে ওসমান সেই সুযোগে পথ চলিতে চলিতে আয়েষার হৃদয়দ্বারে তাহার অধীর ঘর্ষিত ও কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিল। কিন্তু নবাবনন্দিনী যেরূপ ঘৃণা ও দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন তাহাতে ওসমানের মস্ত বিস্ময় হইল। হঠাৎ তাহার চোখের একটা পরদা খুলিয়া গেল।

বুঝিতে পারিল কি একটা মৃগতৃষ্ণিকার—একটা অন্ধপ্রতারণার অন্বেষণে বৃথাই সে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। আয়েষা এত দূরে! কিন্তু আয়েষারও বুঝিতে বাকী রহিলনা ওসমানের ভালবাসা অস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণিক স্বপ্ন মোহমাত্র। নতুবা কি করিয়া সে এত সহজে সেই পবিত্র তন্ত্রী সহজে ভুলিতে পারিল!

কিন্তু ওসমানও পাঠান! তাহার হৃদয়ে একবার অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। সেদিনকার আয়েষার সেই গর্ব্বিত প্রত্যাখ্যান তাহাকে শান্ত ও লজ্জিত করা দূরে থাকুক বরং তাহার উত্তপ্ত, বাসিত হৃদয়কে প্রতিশোধ লইবার জন্য বিগুণ বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। ওসমানকে পদদলিত করিয়া, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া আয়েষা অন্যের অঙ্কশায়িনী হইবে ওসমানের ইহা একেবারে অসহ্য। গর্ব্বিতা বান্দিকা রমণীর এ অবহেলা এ অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইবে তাহার এ উচ্চাভিমান ক্ষুণ্ণ করিতেই হইবে। সেই অবধি আয়েষা ওসমানের চক্ষুশূল হক। সেই অবধি ওসমান কিরূপে আয়েষাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবে তাহার সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিল এবং শীঘ্রই সে সুযোগ উপস্থিত হইল। আয়েষা বুঝিতে পারিলনা কি ভীষণ অগ্নি পরীক্ষাই না তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

গভীর রাত্রি; রাত্রি অতিশয় পরিষ্কার। চন্দ্রদেব সুপ্ত জগতে কৌমুদীধারা ঢালিতেছেন। চরাচর সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ। কেবল একটি মাত্র তরঙ্গের উচ্চ কোলাহল ধ্বনি রজনীর সেই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। কতলুখাঁর রাজকীয় প্রাসাদ আজ সহস্র দীপমালায় উদ্ভাসিত। সভাগৃহ নানাবিধ সুচারু রচনা-দ্বারা শোভিত ও সজ্জিত নর্ত্তনশীলা রমণীবৃন্দের হাস্য পরিহাসে মুখরিত। মধ্যে কতলুখাঁ আসীন। আজ তাঁহার জন্মোৎসব তিথি। পাঠানপুরী আনন্দের বিপুল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। নিশাসে নিশাসে সুরাপাত্র নিঃশেষিত হইতেছে। তাঁহাদের কি তৃপ্তি কিবা চাহনি, কিবা মাদকতা। একটা রক্ত বাসনা যেন উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেছে। কিন্তু কই আয়েষাকে ত সেখানে দেখা গেল না। আয়েষা তখন আপন কক্ষে বসিয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে; এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া জানাইল কুমার জগৎসিংহ আয়েষাকে স্মরণ করিয়াছেন। আয়েষা কারণ বুঝিতে না পারিয়া—ত্বরিতপদে কারাগৃহে উপস্থিত হইলেন, ভাবিল না যে তাহার দুরদৃষ্ট অট্টহাস্য করিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল। আয়েষা কারাগৃহে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহা অভাবনীয়—অচিন্তিতপূর্ব্ব! দেখিল জগৎসিংহ মৌন স্তম্ভিত ও কিঞ্চিৎ ভীত, আর তাহার পদতলে পড়িয়া দিব্য কুসুম-কোরক-সদৃশী ধূল্যব-লুণ্ঠিতা মূর্চ্ছিতা অপূর্ব্ব এক রমণী! জগৎসিংহ বলিলেন, 'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।' আয়েষা তাহার মুখেই তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া লইয়াছিল, তৎপর জলসিঞ্চনাদি ও শুশ্রূষা দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দাসী সমভিব্যাহারে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। কি কারণে কখন তিলোত্তমা কারাগৃহে জগৎসিংহের নিকট আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিলোত্তমা বা জগৎসিংহকে কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে করিল না। তিলোত্তমা চলিয়া গেলে তারপর আয়েষা ও জগৎসিংহের অনেক কথা হইল। তাহা জগৎসিংহের কারাযন্ত্রণার কথা—তাহার জীবনের সুখ দুঃখের কথা। আয়েষা ভ্রমেও নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বলিলেন না। আয়েষা কথায় কথায় জানিতে পারিলেন মূর্চ্ছিতা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা জগৎসিংহের প্রণয়িনী। জগৎসিংহের বিশ্বাস তিলোত্তমা পাঠান-গৃহে আসিয়া তাহার চরিত্রের সেই অক্ষুণ্ণ গৌরবটুকু রক্ষা করিতে পারে নাই, সে কতদূর ভোগ বিলাসের সামগ্রী—ভ্রষ্টচরিত্রা। গজপতিই ইহার মূল। কাজেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পাপীয়সী তিলোত্তমার আর মুখদর্শন করিবেন না বা তাহার নাম মুখে উচ্চারণ করিবেন না। তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। রাজপুত্রের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে নবাবনন্দিনীর প্রাণ করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে অশ্রুপালা হইতে অশ্রু মোচন করিয়া জগৎসিংহকে কারামুক্ত করিয়া দিতে চাহিল। কারণ তাহার এ কারাযন্ত্রণা আয়েষার পক্ষে অসহ্য। এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় যার

দেশে গম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল, "আয়েষা উত্তম!" আয়েষা চাহিয়া দেখিল স্বয়ং ওসমান্ দ্বারে দাঁড়াইয়া! ওসমান পরিচারিকার মুখে আয়েষার সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল, এবং এতদিন ধরিয়া আয়েষার সেই একদিনের গর্ব্বিত অবহেলার প্রতিশোধ লইবার সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। আজ ওসমানের রূঢ় কথা শুনিয়া আয়েষার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। চিন্তার সময় থাকিলে হয়ত আয়েষা আশ্চর্য্যান্বিতা হইত কেমন করিয়া ওসমানের মত ভাই এমন জঘন্য ইতর পশুর মত ব্যবহার করিতে পারে! কিন্তু তাহার সে ভাবনার অবসর ছিলনা। প্রধান চিন্তা, এ অপমানের হাত হইতে রক্ষা পায় কিরূপে।

সামান্য নারী হইলে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইত অথবা দীনতা প্রকাশ করিত, অথবা লজ্জায় মরিয়া যাইত। প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। কিন্তু আয়েষাকে সামান্য দুর্ব্বলচিত্তা নারী মনে করিলে ভুল মনে করা হইবে। তাহার হৃদয় যেমন কোমল হইতে কোমলতর ছিল তেমনি ঘটনার স্রোতে সময় বিশেষে কঠিন হইতেও কঠিনতর হইত। নারীসুলভ কোমল বৃত্তির সহিত পুরুষোচিত দৃঢ়তা সাহস ও একটা আধিপত্যের ভাব তাহার চরিত্রকে অন্যান্য রমণী-সাধারণ হইতে একটা বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। আয়েষা ওসমানের দুরভিসন্ধি সকলই বুঝিয়া লইল, কিন্তু ওসমানের অন্তঃস্থলে আরও কি গোপন ষড়যন্ত্র আছে, ওসমান আরও কত বিষ উদ্গীরণ করিবে, তাহাই জানিয়া লইবার জন্য ওসমানেরই মত গর্ব্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উত্তম, ওসমান?" পাঠক দেখিবেন আয়েষার হৃদয়ে কত বল কত ধৈর্য্য! ওসমান উত্তরে যাহা বলিল তাহা অতি ঘৃণিত, অতি হেয়, আয়েষার মর্ম্মন্তুদ। ওসমান্ পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন,"নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম! বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম!" আয়েষা প্রত্যুত্তরে যাহা বলিল তাহাও অতি উত্তম। আমরা সে স্থানটুকু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

আয়েষা কহিলেন, "এ নিশীথে একাকিনী কারাগারে যদি আসিয়া বন্দীর সহিত আলাপ করা আমার ইচ্ছা; আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" ওসমান বিস্মিত হইল, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইল, "প্রয়োজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিতে পাইবে।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিল যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি তখন তাহার উত্তর দিব, তোমার চিন্তা নাই। ওসমান পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি!"

ওসমান ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছে; আয়েষাও পিছাইবার নয়। সে এতদিন ধরিয়া যে দৃঢ় বাঁধে আপনার হৃদয়াবেগ প্রশমিত করিয়া আসিতেছিল তাহা ওসমানের বিদ্রূপ বর্ষণে আয়েষাকে নয়, ওসমানকেই আহত করিবার জন্য সহসা ভাঙ্গিয়া গেল! আয়েষা এই বিদ্রূপে আপনাকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত মনে করিল। ওসমানের উদ্দেশ্যই যে আয়েষার চরিত্রকে লোকসমক্ষে, বিশেষতঃ জগৎসিংহের সমক্ষে ঘৃণিত প্রতিপন্ন করা এটা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং সে এই বাক্যে যে শুধু নিজের চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ দেখিল তা নয়, তাহারই ভিতর দিয়া সে সমস্ত নারীজগৎকে লাঞ্ছিত ও নারীচরিত্রকে অপমানিত দেখিতে পাইল। তাই আয়েষা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না: তাই তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত নারীর সম্মান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহারই ভিতর দিয়া নারীর মহিমা নারীর অপমান নারীর শত ব্যথা ওসমানরূপী মানবের পাশবিক অত্যাচার ও ঘৃণিত লালসার প্রতিশোধ শাস্তির জন্য—গর্জ্জিয়া উঠিল। আয়েষাকে সসম্মানে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহাকে ইহার প্রতিকূলে দাঁড়াইতেই হইবে। তাই সে তখন আর কিছুই গোপন রাখিল না। যাহা আয়েষা কখনও প্রকাশ করিবে বলিয়া নিজেই ধারণা করে নাই, ওসমান যাহা কখনও আশা করে নাই—জগৎসিংহ যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই—সেই অতি নিগূঢ়, অতি মাত্র ভয়ানক অভাবনীয় কথা সমস্তই নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল। আমরা সে স্থানটী উদ্ধৃত করিলাম।

"আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ণবৎ স্থির দৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ একদিকে হেলিল। হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবাল জলবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওসমান! যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়"—বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিল—"তথাপি দেখিবে হৃদয় মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব, এই মুহূর্ত্তের পর যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত-মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।" ইত্যাদি।

বলিতে পারিনা ওসমান সব কথা শুনিতে পাইল কি না। সে স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি! এই কি আয়েষা! যাহাকে সে দীনা দুর্ব্বলা সামান্য নারী ভাবিয়া পদদলিত করিতে চাহিয়াছিল সে-ই যে ক্রুদ্ধা ফণিনী! আয়েষার হৃদয়ে এত বল এত তেজ, চক্ষুতে এমন দীপ্তি, রসনায় এমন ক্ষুরধার কোথা হইতে আসিল? সে আজ এই জয়মুগ্ধে যাহাকে মর্দ্দিত নিষ্পেষিত করিবে বলিয়া ক্ষণপূর্ব্বে আস্ফালন করিতেছিল—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে না হইতেই দেখিতে পাইল আয়েষা অপেক্ষা সে কত দুর্ব্বল, কত হেয়। তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত দম্ভ আত্মাভিমান আয়েষার আত্মাময়ী বাক্যবাণে একেবারে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিলনা। আয়েষা কিছুই বলিতে অসম্পূর্ণ রাখে নাই। কিন্তু পাঠক আয়েষার দিকে পুনঃ দৃষ্টিপাত করুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আয়েষা মূর্ত্তিমতী একটা রহস্য। তাহার চরিত্রের গাম্ভীর্য্য তাহার হৃদয়ের গভীরতা বা বিশালতা সম্যক অনুভব করি এমন স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। বাস্তবিক নারীহৃদয় দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়। ইহাতে কখন কি ভাবের উদয় হয় কে জানে; মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমরা আয়েষার যে গর্ব্বিত ক্রোধস্ফুরিত বহ্নিরূপিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা আর নাই। আয়েষা এখন শান্তিময়ী, একান্ত বিনীতা দয়াপ্রতিমা। এ যেন ভীষণ সংহাররূপিনী কালীর পার্শ্বেই হাস্যময়ী মাতৃরূপিনী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা! ক্রোধ ও ক্ষমা, অগ্নি ও জল, আবেগ ও ধৈর্য্য পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। বলিতে বলিতে আয়েষা উত্তেজনাজনিত ক্রোধ বশে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। কুরুসভায় অপমানিতা, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী যে ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাপসগৃহে পরিপালিতা তপোবনবর্দ্ধিতা কমনীয়া দুহিতা দুষ্কৃতগৃহে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া যেরূপ ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন আয়েষারও আজ আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় সেইরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আয়েষার প্রকৃতি ক্রোধপরায়ণ নহে। সহজেই তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল।

আয়েষা যখন দেখিল ওসমান্ বিষণ্ণ মৌন—যখন তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে তখন তাহার প্রতি সেই পূর্ব্বকার ভ্রাতৃস্নেহ ফিরিয়া আসিল। তখন ওসমানের দুঃখে তাহার করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একটা প্রবল ঝোঁকের উপর ওসমানের হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত দিয়াছে সে জন্য আয়েষাই আবার ক্ষমা ভিক্ষা করিল। সেই ক্ষমাভিক্ষাই বা কি সুন্দর!

আয়েষা আবার অশ্রুজল মুছিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্যপ্রকার স্বরে কহিতে লাগিল, "ওসমান্, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে কোন অপরাধ করুক আয়েষা অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাতে বলিলাম, প্রয়োজন হয় কাল পিতার সমক্ষে বলিব।" ওসমান্ নিরুত্তর। আয়েষা আবার বলিতেছে, "ওসমান্, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্ব-

মত স্নেহপরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ণ স্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে কাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অগৈ ডুবাইও না।" আয়েষার বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ প্রণিধান যোগ্য।

এ ত গেল ওসমানের কথা। আয়েষা জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিল, "রাজপুত্র! তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান্ আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইতনা, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইতনা।"

জগৎসিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কারণ—আয়েষা উত্তেজিত হইয়া যে গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছে তাহা জগৎসিংহের নিকট বলা সঙ্গত হয় নাই। আয়েষা জানে জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রণয়ী—তিলোত্তমা জগৎসিংহের প্রতি একান্ত অনুরক্তা। সত্য বটে জগৎসিংহ তিলোত্তমার চরিত্রে সন্দিহান। কিন্তু সন্দেহ কাটিয়া গেলে তাহাদের পরস্পরের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে পারে ও উভয়েই পুনঃ মিলনে সুখী হইতে পারে। কিন্তু সেই সন্দেহ দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে যদি জগৎসিংহ জানিতে পারেন যে আয়েষা তাহার প্রণয়াভিলাষিণী, তাহার প্রতি অনুরক্তা তবে তিলোত্তমাকে ছাড়িয়া আয়েষাকে লাভ করিতে ব্যগ্র হওয়া পুরুষ জগৎসিংহের পক্ষে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। আয়েষা জানে তাহার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তাও তিলোত্তমার ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তিলোত্তমাকে পথে দাঁড় করাইয়া আয়েষা জগৎসিংহকে লইয়া সুখী হইতে চাহে না। এ কল্পনা তাহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। আয়েষার প্রেমে স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না। সে জগৎসিংহকে ভালবাসিত, তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিল—লাভের বা প্রতিদানের আশায় নহে। ভালবাসিয়া যে সুখ সেই সুখের জন্য। সে জগৎসিংহকে ভালবাসে তাই বলিয়া যে অন্যে তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে না আয়েষার মন এতদূর নীচ নহে: তাই আয়েষা শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়েষা অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না। সেই একদিনকার মুহূর্ত্তের আলাপেই সে বুঝিয়া লইল, জগৎসিংহ হৃদয়ে কি একটা দারুণ কষ্ট বহন করিতেছেন। একটা অমূলক সন্দেহ আসিয়া তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের মাঝখানে মস্ত একটা প্রভেদ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। জগৎসিংহকে সুখী করিতে হইলে প্রথমেই এই সন্দেহ-কণ্টকটী উৎপাটন করা আবশ্যক। আয়েষা এটা তাহার একটা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিল। সকলেই জানেন সংসারের একমাত্র অবলম্বন স্নেহময় পিতা কতদূর অন্তিম শয্যায় বসিয়া আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন-কোলাহল ও শোকধ্বনির ভিতর কিরূপ অসীম ধৈর্য্য ও করুণা বলে আয়েষা জগৎসিংহের হৃদয় হইতে চিরসমনোসুখ পিতার মুখে অপূর্ব্ব কৌশলে সে সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার জীবনকে ভবিষ্যৎ সুখের পথে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

আয়েষা মনে করিয়াছিল, জগৎসিংহ রাজপুত্র—পুরুষ, সংসারের কাজের ভিতর তিলোত্তমার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু তিলোত্তমার কি হইবে? সে ত সামান্য দুর্ব্বলা রমণী। জগৎসিংহের "আমার সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে"—এই কথার মূল্য তিলোত্তমার জীবনব্যাপী বিরহ-বেদনা, বিলাপ ও নিরাশা। তিলোত্তমা যাহাকে আশ্রয়তরু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে, সেই আশ্রয়তরুই যখন তাহাকে পদদলিত করিতেছে তখন তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়! সাধারণ নারী হইলে এ সুযোগে তিলোত্তমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আপনার একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ।

মোগল-পাঠানে সন্ধি হইয়াছে; জগৎসিংহ মুক্ত; দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতেছেন, একে একে সকলেই বিদায় সম্ভাষণ করিতে আসিল। যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত শুধু সে-ই আসিল না। রাজপুত্র আজ বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও আয়েষার সাক্ষাৎ পাইলেন না। যে পূর্ব্বে অনাহূত হইয়াও আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না, জগৎসিংহকে দিনান্তে একবার না দেখিলে সাগর ভিন্ন

অধীর হইয়া উঠিত সেই আয়েষা, জগৎসিংহের—যাহার জন্য সে ওসমানের বিষপর্যাণ অকাতরে বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল—সেই প্রিয়তম জগৎসিংহের বিদায়কালে তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও আসিলনা কেন? পাঠক যদি তাহার কারণ জানিতে চান তবে আয়েষার প্রাণ লইয়া আয়েষার অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া তাহার পত্রখানি পাঠ করুন। সমস্ত লিপিখানা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠক উনবিংশ পরিচ্ছেদটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া লইবেন।

আয়েষা প্রথম লিখিয়াছিল 'প্রাণাধিক' পরে কাটিয়া লিখিল, 'রাজকুমার'—রাজকুমার লিখিতে তাহার অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পত্রে পড়িল। সে পত্র ছিঁড়িয়া ক্ষণেক রোদন করিলেন। তারপর পুনরায় লিখিলেন—তাহার মর্ম্ম এই "রাজকুমার! আমি যে সাক্ষাৎ করি নাই সে আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া নহে। মনে করিওনা যে আয়েষা অধীরা···ওসমান নিজ হৃদয়-মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়াছে, কি জানি আমি সাক্ষাৎ করিলে যদি সে স্নেহ পায় এই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। ···নিজের স্নেহ—সে সকল সুখদুঃখ জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছি। তবে এ পত্র কেন? যদি শুনিয়া থাক আমি তোমায় স্নেহ করি তবে তাহা বিস্মৃত হও। আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, প্রতিদান চাহিনা। ·····আমার সহিত আর সম্বন্ধ হইবে না। রমণী-হৃদয় হেরূপ দুর্দ্দমনীয় তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত ··· যদি এদেশে বিবাহ কর তবে তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব···জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন। আয়েষার কথা স্মরণ করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।" যদি তোমার হৃদয় থাকে, আর প্রাণভরিয়া যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া ত্যাগ করিতে বাধা হইয়া থাক তবেই বুঝিবে আয়েষার প্রাণে কি ভীষণ দাহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাও শ্রেয়ঃ, তবু আর এ মনকে প্রলোভিত করিবে না। তাহাতে ওসমানের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, তিলোত্তমার সর্ব্বনাশ হইবে। কাজেই সে পূর্ব্বের সেই কঠোর সংযম আশ্রয় করিল। সাক্ষাৎ করিল না।

আয়েষার কথা কত বলিব। এক কথায় তাহাকে বুঝানো বা বুঝা বড় শক্ত। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে তাই আমরা আয়েষাকে আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিদায় লইব।

অভিরাম স্বামীর মঠে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পুনর্মিলন হইয়াছে. জগৎসিংহের চিন্তাকাশে যে একখানা কাঁকা মেঘ জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহা আয়েষার মতে পূর্ব্বেই অপসারিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বিবাহ-বাসর উপস্থিত। বহু দিনের বহু দুঃখ কষ্টের, পরীক্ষা ও পীড়নের পর এ মিলন বড়ই সুখের, বড়ই রমণীয়। আসলা ওমরাহ অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যোগল পাঠান অনেকেই উপস্থিত। পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত আয়েষাও আসিয়াছে। এই আগমনের কারণ শুধু নিমন্ত্রণরক্ষা নহে। আয়েষা আজ তিলোত্তমাকে আপনার মনোমত আভরণে সাজাইবে, আর তার চেয়ে, সকলের চেয়ে বড় কাজ, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের কাছে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। আয়েষা একটি একটি করিয়া তিলোত্তমার অঙ্গ হইতে বিমলাপ্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতেছে। আর তৎপরিবর্ত্তে তদপেক্ষা বহুমূল্য বহুগুণে শ্রেষ্ঠ চরণদ্বারে তাহার অঙ্গ শোভিত করিতেছে। তিলোত্তমা তত্তাবতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন; নবাব-নন্দিনী বাধা দিয়া বলিল, "ভগিনী,এ সকলের প্রশংসা করিওনা, তুমি আজ যে হৃদয়ে ধারণ করিলে এ সকল তাহার চরণ-রেণুর তুল্য নহে। ভগিনি, আমি চলিলাম, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি—তুমি অক্ষয় সুখে কাল যাপন কর।" ক্ষণপরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আয়েষা পুনরায় বলিল, "তিলোত্তমা, আমি চলিলাম। তোমার স্বামী যদি থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ু করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সাদরের হৃদয় মধ্যে রাখিও।" আয়েষার এ বাক্যের তুলনা নাই। ইহা সমগ্র স্ত্রীজাতির গৌরবের বিষয়! হৃদয়ে ধ্যান করিবার বিষয়!

আয়েষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলন-সুখ দেখিতে চাহিয়াছিল, আত্মসুখ

কামনা করে নাই। তাহা হইয়াছে। আজ সে বড় সুখী, তাহার সারস্বত, প্রাণেশ্বর, চিরজীবন সুখে থাকিবেন, এ ভাবনাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী করিবে। তাহার আর দুঃখ নাই। সে যাহা করে সম্পূর্ণরূপেই করে। অনেকের বিশ্বাস মরিলেই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং আত্মহত্যা একটা মহাত্যাগ। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আত্মহত্যার মৃত্যুতে ত্যাগনাই, মহত্ব নাই। এরূপ ত্যাগ ভীরুতার নামান্তর। সারা জীবন অসীম ধৈর্য্যের সহিত বেদনার ভার নীরবে সহ্য করিয়া দিন দিন করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার যে ধৈর্য্য—জীবনের ভিতর মৃত্যুর কল্পনা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করার যে বীরত্ব, প্রাপ্য-বস্তুকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া অচল নির্ব্বিকার থাকার মধ্যে যে ত্যাগ, আকস্মিক আত্মহত্যার তাহার শতাংশের একাংশও বীরত্ব বা ত্যাগ নাই। এরূপ আত্মহত্যা মহাপাপ, আয়েষাও তাহা জানিত। তাই জীবন দুর্ব্বিসহ হইলেও আত্মহত্যা করিয়া মরিল না। আর আত্মহত্যার কি দরকার! যাহার সুখের জন্য তাহার অস্তিত্ব তাহাকে যদি সুখী করিতে পারিল তবে আর আত্মহত্যার কি প্রয়োজন! তাই আয়েষা মরিবার কথা মনে করিয়াও আত্মহত্যায় বিরতা হইল। তবে কি জানি দুর্ব্বল রমণীচিত্তে কখন কি খেয়াল হয়, কে জানে। ভাবিয়া চিন্তিয়া আয়েষা পরলোকের হীরকাঙ্গুরী যাহা কোন দিন আত্মহত্যার সহায় হইতে পারিত সেই অঙ্গুরীয় কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এইরূপ নিজের জীবনের উপরে প্রত্যেকের যে একটু অধিকার—সেই আত্মহত্যার স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সংসারের ভিতর বৈরাগ্য, জীবনের ভিতর মৃত্যু কল্পনা করিয়া অসীম ধৈর্য্যে সমস্ত দৈহিক সুখদুঃখ একবারে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্বটুকু পরের মঙ্গল মন্দিরে বলিদান করিয়া পরের সুখে সুখ মনে করিয়া সমস্ত পাপ কল্পনা ও চেষ্টায় নিজেকে নিরস্ত করিয়া আয়েষা বাঁচিয়া রহিল। জীবনে আর জগৎসিংহের নাম লইল না। আর জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিল না। এইখানেই আয়েষার চরিত্রের উৎকর্ষ—এইখানেই তাহার পূর্ণ মহত্ব, এইখানেই তাহার করুণ কাহিনীর শেষ। এইখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

আয়েষার কথা শেষ হইল। আমরা অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এমনটী বোধ হয় আর দেখি নাই। বঙ্কিমবাবু অনেক চিত্র আঁকিয়াছেন কিন্তু এমনটী বোধ হয় আর আঁকেন নাই। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর নগেন্দ্রনাথকে লইয়া কাড়াকাড়ি ব্যাপার ও অবশেষে উভয়ের শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছি। গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের দারুণ অভিমান ও ক্রোধ এবং তাহার অন্তিম দশা দেখিয়াছি, দেবী চৌধুরাণীকেও জঙ্গলে জঙ্গলে ত্রিস্রোতার বাঁকে বাঁকে অনুসরণ করিয়াছি। রাজসিংহ, সীতারামের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছি কিন্তু কই আয়েষার মত এমন কমনীয় মূর্ত্তি, শান্ত, কোমল, কমনীয় এমন 'উজ্জ্বল মধুরে' এমন স্নেহময়ী রমণী মূর্ত্তি দেখিলাম কই। যাহারা বলেন বঙ্কিমবাবুর মুসলমান বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় প্রবল ছিল তাহারা আয়েষার চরিত্র পাঠ করিয়া দেখিবেন।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কোমলতা, দয়া, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, মাধুর্য্য, তেজ, গর্ব্ব, সমবেদনা, ত্যাগ, পরোপকার প্রভৃতি বৃত্তিসমবায়ে তিনি যে আদর্শ নারী-মূর্ত্তি গঠন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আয়েষার ভিতর সমস্তই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। পাঠক আর আয়েষাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু বঙ্গসমাজ হইতেও কি আয়েষা অন্তর্হিত হইয়াছে?

সর্ব্বশেষে দুঃখের বিষয় বঙ্কিমবাবু যাহাকে এইরূপ বিদ্বেষের মধ্যে আমাদের সঙ্গে চিরতরে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন সেই আয়েষাকেই পরবর্ত্তী অদূরদর্শী অন্য এক গ্রন্থকার নবাবনন্দিনী রূপে পুনরায় উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী উপন্যাস লিখিল, উপন্যাস পড়িল, কিন্তু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলনা, উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলনা—এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।

শ্রীনরেশচন্দ্র সরকার।

কবে গো জগতস্বামি

সে দিন আমার আসিবে কখন
হে মোর অন্তরযামি,
অন্তরে বাহিরে হেরিব তোমারে,
সকল সময়ে আমি।
ফুলের হাসিতে তব মধু-হাসি,
ভাতিবে নয়নে মোর দিবানিশি,
স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর পরশে,
তোমারে বুঝিব আমি,
কবে গো জগতস্বামি ?

২

রবি শশী, গ্রহ-তারকা-কিরণে,
তোমার আলোক হেরিব নয়নে,
হেরিব সুনীল উদার গগনে,
তোমার স্বরূপ আমি,
কবে গো জগতস্বামি ?

৩

বিটপীর প্রতি পাতায় পাতায়,
শাখা প্রশাখায়, চারু লতিকায়,
কাননে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে গুহায়
হেরিব তোমারে আমি,
কবে গো জগতস্বামি ?

৪

জলধির ভীম ঊর্ম্মিতে কবে,
তোমার নিক্কণ হেরিব এ ভবে,
শুনিব পাখীর মধুমাখা রবে,
তোমারি সঙ্গীত আমি,
কবে গো জগতস্বামি ?

৫

এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যাহা কিছু আছে,
হে দেবতা আমি সবাকার মাঝে,
হেরিব তোমায় সুমধুর সাজে,
সতত অন্তরযামি,
কবে গো জগতস্বামি ?

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

তুমি ও আমি

তুমি তোমারি মহিমা আমার মাঝারে
যখন যা' ফুল ফুটায়ে,
আমি তুলিয়া তোমারে, গৌরব-মুকুট
লই তা' আপনি উঠায়ে।

তুমি ধরা পড় তবে ভাবিয়া আকুল
রহগো সতত গোপনে,
আমি ধরা দিতে সদা ব্যাকুল ধরায়
প্রকাশি আপনা যতনে।

তুমি সুখে দুখে মোরে রাখ নিতি বুকে
পাছে বা হারাই পাথারে,
আমি সুখে কভু তব নামটিনাক আর
বিপদে ডাকিগো তোমারে।

তুমি আমার ভাবনা ভাবিছ সতত
রহিব আরামে কেমনে ?
আমি করে হাসি শির কহি যে "নিঠুর
নাহিক এমন ভুবনে।"

তুমি বাড়াইয়ে বাহু লও মেহে কোলে
ভবের কালিমা মুছায়ে,
আমি অভিমান খেলা শেষ আগে
কেন গো খেলানী ভাঙ্গায়ে ?

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free:
If she be small, slight-natured miserable,
How shall men grow? (Tennyson.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (ব্রিটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest——I will not excuse. I will not retreat a single inch——and I will be heard." (William Lloyd Garrison.)

বঙ্গানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই একতিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১১শ ভাগ | মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩২২ | ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা

বুদ্ধ

সে অনেক দিনের কথা। তখন কপিলবাস্তুর রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন আর রাণী ছিলেন মহামায়া। মাঠে মাঠে শস্য ভরা, প্রজাদের মনে আনন্দ! চুরি ডাকাতি নেই, লুটপাট নেই, ঘরে ঘরে শান্তি আর সুখ! হৃষ্ট পুষ্ট গাই বলদ ন্যাজ নাড়িয়ে সানন্দে ঘাস খাচ্ছে, রাখাল ছেলে আপনার মনে গাছের ফুল পাতা নিয়ে খেলা করছে, বাঁশী বাজাচ্ছে; কুল কুল করে রোহিনী নদী বয়ে চলেছে, তার ছোট ছোট ঢেউ গুলি তীরে এসে হেসে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে! পাখীরা পুচ্ছ নাচিয়ে ঘন সবুজ পাতার আড়ালে ডাকাডাকি করছে, মাঠের উপর দিয়ে দলে দলে হরিণ ছুটা ছুটি করছে। এমনি ভর দেশের রাজা ছিলেন পুণ্যবান্ শুদ্ধোদন।

রাণী গর্ভবতী হয়েছেন। প্রজারা আনন্দে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, কে জন্মায়! পূর্ণিমা-রাত্রির চাঁদের আলোয় চারিদিক ধব্‌ধব্ করছে,—একেবারে যেন দুধসাগরে বলক এসেছে। বসন্তের ফুলে রাজবাগান গুলজার। গাছের তলায় আলোছায়ার ঝিক্‌মিক্, ঝির্‌ঝির্ করে স্নিগ্ধ বাতাস বইছে আর ফুলগুল যেন হেসে লুটোপুটি করছে। রাণী মহামায়া সখীদের হাত ধরে বাগানে বেড়াতে এলেন, আলতা আঁকা পা ফেলে ফেলে ফুল দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। মস্ত বড় শাল গাছ দুলে দুলে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে। রাণী তাঁর চুড়ী পরা কোমল দক্ষিণ হাত খানি তুলে সেই শাল ফুল তুলতে গেছেন, এমনি সময়ে তাঁর ছেলে ভূমিষ্ট হল! সে কি ছেলে! অতটুকু একরত্তি ছেলে কিন্তু তার প্রভায় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ম্লান হয়ে গেল। পূব

আকাশের কোণ দিয়ে সুষ্মি যেমন জ্যোতিঃ নিয়ে দেখা দেয়, রাজপুত্রের মাঝেও যেন সেই জ্যোতি জলছে. সুন্দর স্নিগ্ধ তার কচি মুখখানি। মাটিতে যেন আলোর পদ্ম ফুটে উঠল, চারিদিক যেন আলোয় ঝলমল্ করতে লাগল। সেই বসন্তের রাত্তিরে শাল গাছের তলায় পৃথিবীর মনভুলান, কোলজুড়ান ছেলে জন্মাল। স্বর্গের দেবতারা যেন খুসী হয়ে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতে লাগলেন, ফুল গন্ধ দিয়ে গেল, বাতাস হাত বুলিয়ে গেল আর আকাশ খানা অবাক্ হয়ে নীল চোকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল!

রাজা শুদ্ধোদন ছেলের মুখ দেখে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন। দু'হাতে অর্থ দান করেও তিনি মনে তৃপ্তি পেলেন না। বাজনদারেরা নগরময় আনন্দের নহবৎ বাজিয়ে বেড়াতে লাগল কচি আমের পাতা আর ভরা কলসীতে রাজদ্বারে ভিড় লেগে গেল। প্রজাদের বাড়ী দীপালী হল, নাচ গান হোজে কপিলবাস্তু জমজমাট হয়ে উঠল। প্রজারা প্রচুর অর্থ পেলে, দরিদ্রও ধনী হয়ে উঠল। রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারের নাম রাখলেন সিদ্ধার্থ।

সাত দিনের কচি টুক্‌টুকে ছেলে, সেই দুধের বাছাকে ফেলে রাণী মহামায়া রাজাকে কাঁদিয়ে, প্রজাদের কাঁদিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। কচি ছেলে সিদ্ধার্থ মার স্মৃতি নিয়ে রাজবাড়ী আলো করে রইল।

(২)

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। চাঁদ যেমন করে বড় হয়, ফুল যেমন করে ফোটে! কত শাস্ত্র শিখলেন, অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন, রথ চালনা করতে, ঘোড়ায় চড়তে তাঁর মত আর কেউ ছিল না। কিন্তু শিকার করতে গিয়ে কখনও প্রাণীহত্যা করতে পারতেন না, এত দয়া ছিল সিদ্ধার্থের মনে।

একদিন রাজবাগানে সিদ্ধার্থ বেড়াচ্ছেন আর তাঁর মাথার ওপর দিয়ে এক পাল কলহংস ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে এমন সময়ে একটি তীরবিদ্ধ হাঁস তাঁর সামনে মাটিতে এসে লুটিয়ে পড়ল। বেচারার বুক রক্তেতে ভেসে যাচ্ছিল. দেখেই সিদ্ধার্থের মন দয়ায় ভরে গেল, তিনি তাকে বুকে তুলে নিয়ে তীরটিকে টেনে তুলে ফেলুলেন। তারপর স্নেহভরা হাত বুলিয়ে, আর সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। দেবদত্ত ছিল সিদ্ধার্থের জ্ঞাতি ভাই, তার তীরের আঘাতেই হাঁসটি আহত হয়েছিল। সে এসে যখন হাঁসটির উপর দাবী করলে তখন সিদ্ধার্থ বললেন, "আমিই হাঁসটিকে বাঁচিয়েছি ভাই ও আমার!" এই নিয়ে অনেক তর্ক হল, শেষে রাজসভার এর বিচার হয়েও এই স্থির হল, যে আহত প্রাণীর প্রাণরক্ষা করবে সেই প্রাণীর উপর তারই অধিকার। এমনি করে বাল্যকালেই সিদ্ধার্থের দয়া প্রকাশিত হয়ে পড়তে লাগল।

মানুষের আনন্দোৎসবে জীবজন্তু কত কষ্ট পায় এই দৃশ্যই তাঁর প্রাণকে পীড়িত করত। এমনি করে কত প্রাণই যে নিহত হচ্ছে তার সংখ্যা নেই। তিনি বসে বসে ভাবতেন এই প্রাণীহত্যা কেমন করে দূর করা যায়, তার উপায় খুঁজে না পেয়ে তাঁর মন বিষাদিনী করুণায় ভরে উঠত। জীবের দুঃখ ভেবে তিনি ব্যথিত হয়ে উঠতেন, তাঁর চোখ দিয়ে চোখের জল পড়িয়ে পড়ত, মুখ নিরানন্দ হয়ে যেত! রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ম্লান মুখ দেখে চিন্তিত হতেন, ব্যথিত হতেন, কিন্তু উপায় কি—উপায় কি? শেষে অনেক পরামর্শ করে চিন্তা করে তিনি সিদ্ধার্থের বিয়ে দিলেন।

রাজপুত্র বধূ গোপার যেমন রূপ তেমনি গুণ, একেবারে লক্ষ্মী সরস্বতী যেমন একটি মূর্ত্তি ধরে নেমেছেন। সিদ্ধার্থ গোপাকে লাভ করে সত্যই সুখী হয়েছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন ছেলের মনের বৈরাগ্য দূর করবার জন্যে রোজ নতুন গান, নতুন নাচ, নতুন আমোদ, নতুন প্রমোদ করাতে লাগলেন। সকলকে আদেশ দেওয়া হ'ল আনন্দ কর, আনন্দ কর!

এমনি করে কতদিন যায়, ক্রমে সিদ্ধার্থের মনে ভোগসুখ বিষাদ হয়ে আসতে লাগল। এত বড় বাইরের পৃথিবী খানা কত দুঃখ, কত কষ্টভরা, কত ব্যাধি জরা মৃত্যুতে ভীষণ তার রূপ। সিদ্ধার্থ যেন সেই প্রমোদ ভবনের ভিতর থেকে পৃথিবীর আহ্বান শুনতে

পেতেন আর এই সব দুঃখ থেকে জীবদের মুক্ত করবার জন্যে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত।

বসন্তকাল। রাজকুমার সিদ্ধার্থের নগর বেড়াবার সাধ। রাজা শুদ্ধোদনের আজ্ঞায় পাতায় ফুলে পতাকায় নগর সজ্জিত হল। সারথি ছন্দককে নিয়ে সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণ করতে চলেছেন। প্রথম দিন দেখলেন এক-জন অরাজীর্ণ বৃদ্ধ, তার মাথার চুল সাদা থরথর করছে, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, দেহ বেঁকে গেছে, চোখে জ্যোতি নেই, মুখে দাঁত নেই, পা-কাঁপছে। দেখে তাঁর মন ব্যথিত হল। তিনি ছন্দককে বল্‌লেন, "সারথি, ওর কি হয়েছে? ছন্দক বল্‌লে, "রাজকুমার এরই নাম জরা, এই জরার হাত থেকে কারুর উদ্ধার নেই।" সিদ্ধার্থ বললেন, "ছন্দক, বাড়ী চল।" তার পর দিন তিনি দেখলেন এক রোগশীর্ণ লোক, তার চলবার শক্তি নেই, নড়বার শক্তি নেই, অসহায় অবস্থায় পথের ধারে মাটির ওপর পড়ে আছে! মূত্র তার শিয়রে বসে প্রহরা দিচ্ছে, নিকটে আর কেউ নেই। সিদ্ধার্থের মন অধীর হয়ে উঠল, তিনি কাতর হয়ে ছন্দককে জিগেস করলেন, "এর কি হয়েছে, ছন্দক?" সে বললে, "রাজকুমার ওর অসুখ করেছে। অসুখ দেখে আত্মীয় স্বজন সকলে পালিয়েছে।" সিদ্ধার্থ ম্লান মুখে বল্‌লেন, "চল ছন্দক বাড়ী চল।"

তারপর তৃতীয় দিন দেখলেন এক মৃত দেহ। সব দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে, সকলে জনতা করে বিলাপ করছে; শোক করছে। সে দিনও তিনি ছন্দককে জিগেস করে শুনলেন এই মৃত্যু! যে মৃত্যুর হাত থেকে একটি প্রাণীরও উদ্ধার নেই! সিদ্ধার্থের চোখে জল এল। এত বড় পৃথিবী যে এই মৃত্যুর মুঠার মাঝে একথা ভাবতে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ তাঁর প্রাণের মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তাঁকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করে ফেললে। যে চিন্তা এতদিন ভস্ম ঢাকা আগুনের মতন জ্বলছিল, সে আজ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তাঁর সমস্ত বিষয় বাসনাকে আগাগোড়া দগ্ধ করে দিলে। নিজের সমস্ত সুখ সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেও যদি তিনি জীবের দুঃখ দূর করতে পারেন তবে তিনি তখনি তা-করতে প্রস্তুত এমনিতর তাঁর মনের অবস্থা হ'ল।

চতুর্থদিন তিনি দেখলেন এক সন্ন্যাসী। সে কি প্রশান্ত মূর্ত্তি, সংযত স্থির, আনন্দে গম্ভীর যেন এই জরা ব্যাধি মৃত্যু পীড়িত পৃথিবীর উপরে চলে গেছেন, এই সমস্ত তুচ্ছ সুখ দুঃখ যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। সিদ্ধার্থের প্রাণ আকুল হয়ে উঠল, এই সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যে শ্রেয় এ তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের মমতা আর কর্ত্তব্যের ডাক এ দুইয়ে মিলে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিলে। এদিকে ত্যাগ না করলে সিদ্ধি কোথায়? সিদ্ধার্থ ত্যাগের জন্যে মনকে দৃঢ় করে নিলেন।

(৩)

গোপা একটি ছেলে প্রসব করেছে। রাজবাড়ী আনন্দে ভরে রয়েছে। নর্ত্তকীদের পায়ের ঘুঙুর বেশী করে বাজছে, গানে বাজনায় সমস্ত আকাশ মাতাল হয়ে রয়েছে। এই সব মিথ্যা আমোদ প্রমোদের মাঝে সিদ্ধার্থের প্রাণ আরও বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল, সংসার ত্যাগ করবার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু পিতাকে না জানিয়ে গেলে যে পাপ হবে; তিনি পিতার কাছে গিয়ে বললেন, "জরা ব্যাধি মৃত্যুতে পৃথিবী কাতর হয়ে উঠেছে, এই দুঃখ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করবার জন্যে উপায় চাই! আমি সন্ন্যাস নেব, পিতা আপনি অনুমতি দিন!" রাজা শুদ্ধোদন ছেলের কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, অনেক বারণ করলেন, অনেক বোঝালেন, জরা ব্যাধি মৃত্যুকে কখনও দূর করা যেতে পারে না কিন্তু সবই নিষ্ফল হ'ল! সিদ্ধার্থ বললেন, "পিতা মৃত্যুতে যদি তফাৎ হতেই হবে তবে আর আমার সাধনায় বাধা দিচ্ছেন কেন?" সিদ্ধার্থ পিতাকে প্রণাম করে চলে এলেন। এদিকে রাজার হুকুমে দ্বারে দ্বারে প্রহরী দাঁড়াল সিদ্ধার্থকে প্রহরা দেবার জন্যে।

স্বামীর মুখ দেখে গোপার মন ভয়ে ভাবনায় কেঁপে উঠল! সে সুন্দর সাদা হাসি নেই, কে যেন মুখে কালী ঢেলে গেছে। সাধ্বী-গোপা জিগেস করলেন,

"তোমার কি হয়েছে, স্বামী? মুখ এত ম্লান কেন?" সিদ্ধার্থ বললেন, "গোপা এই যে তোমায় দেখে আমার সুখ হচ্ছে এই আমার দুঃখ। এ জরা ব্যাধি মৃত্যুভরা পৃথিবীতে এ মায়া আর কেন? গোপা মনে ব্যথা পেলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ বুঝলেন পৃথিবীর দুঃখ দূর করবার উপায় না খুঁজতে পারলে তাঁর শান্তি নেই, শান্তি নেই।

নিশুতি রাত্তির! চারিদিক নিঝুম, গাছ নড়ছে না, পাতা পড়ছে না? জীবজন্তু প্রাণী সব সুপ্ত পৃথিবীটা যেন বুকফাটা হাহাকার নিয়ে একেবারে সুপ্ত হয়েছে। কেবল আকাশ যেন একটা জ্যোতির্ময় ইঙ্গিতের মতন সিদ্ধার্থকে আহ্বান করছিল। তাঁর প্রাণের ভিতরের দরার সমুদ্র জোয়ারের মতন তা'রে দুলে উঠল। এই ত সন্ন্যাস নেবার সময়! গোপা আর তার কচি টুকটুকে ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার সস্নেহে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছন্দককে নিয়ে সিদ্ধার্থ সেই নিশুতি রাত্তিরে অনেক দূর চলে গেলেন। যখন তারা নিতুল আলো আগল সুষি হাস্‌তে হাস্‌তে পূব দিক থেকে উঠে আকাশের মাথায় জরের মুটকি পরিয়ে দিলেন তখন সিদ্ধার্থ ছন্দককে বললেন, "তুমি বাড়ী যাও সারথি বাবাকে আর পুরবাসীদের আমার খবর দিও!

সিদ্ধার্থের মনে একই ভাবনা, এই পৃথিবীকে কেমন করে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবেন? তিনি চলতে লাগলেন, চলতেই লাগলেন। শেষে অণোমা নদীর তীরে তিনজন ঋষির সঙ্গে দেখা, স্বর্গ নিয়ে অনেক কথা হ'ল কিন্তু সিদ্ধার্থ যে স্বর্গের কল্পনা করেছেন সে স্বর্গের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সিদ্ধার্থ ভাবতে ভাবতে একবার মগধ রাজ্যে গেলেন। বিম্বিসার সেখানকার রাজা। বিন্ধ্য-পাহাড়ের ওধারে ভেতরে সিদ্ধার্থ বাস করতে লাগলেন আর এক মনে ভাবতে লাগলেন পৃথিবীর দুঃখ দূর করবার ভাবনা! ভিক্ষা করে যে অন্ন পান সেই অন্নে কোনমতে ক্ষুধা দূর করে তিনি এক মনে ভাবতে লাগলেন।

হিরণ্যবতী নদীর ধারে আকাড় কাশার ঋষি থাকতেন। শাস্ত্রে জ্ঞানী এই ঋষির তিন শ শিষ্য! সিদ্ধার্থ এসে যোগ দিলেন, সব শাস্ত্র আয়ত্ত করলেন কিন্তু মুক্তি কিসে? তারপর রুদ্রক ঋষির কাছে কত শাস্ত্র পড়লেন, কত বিদ্যা শিখলেন কিন্তু তবু মুক্তিপথের সন্ধান পাওয়া গেল না। যখন তিনি রুদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলেন তখন রুদ্রকের পাঁচজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে এলেন।

সমস্ত রকম ইন্দ্রিয় সুখ থেকে শরীরকে বঞ্চিত করলেই তিনি সত্যলাভ করবেন এই বিশ্বাস সিদ্ধার্থের মনে উদয় হ'ল। তখন তিনি গয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর ধারে তপ করতে বস্‌লেন। সে কি সাধনা। ছ বছর ধরে মনকে বাসনা মুক্ত করে নিবিষ্ট হয়ে তিনি সাধনা করলেন! ছ বছরের গ্রীষ্মের রোদ্দুর, ছ বছরের বর্ষার জল, ছ বছরের শীতের হিম তাঁর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল তবু তাঁর খেয়াল নেই, তিনি মনকে আয়ত্ত করে ভাবছেন। গুরু নেই, শাস্ত্র নেই, নিজের মনকে আশ্রয় করে ছ বছর তিনি ভাবছেন! সে সোণার শরীর মাটি হয়ে গেল, দিনে দিনে আহার কমিয়ে একটি চালের কণায় এসে ঠেকল, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল তবু তিনি ছ বছর ধরে ভাবছেন, সে কি সাধনা!

তবু ত জ্ঞান লাভ হল না। তখন সিদ্ধার্থ বুঝলেন শরীরকে বলিষ্ঠ করা চাই, তা নইলে মনে বল থাকবে কেন? তিনি নদীতে স্নান করলেন, তারপর তীরে উঠলেন কিন্তু দুর্বলতার জন্যে তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্নের ভিতর দিয়ে তিনি এই বোধটি লাভ করলেন যে ভোগ বিলাসে মানুষের মন যেমন দুর্বল হয়, দেহকে পীড়া দিলেও তেমনি হয়। দেহকে সবল রেখে তিনি নির্বাণ লাভের উপায় ভাববেন এই ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল।

বণিকের মেয়ে সুজাতা। বহু কষ্টে কোলে ছেলে পেয়েছে। সোণার বাটিতে করে পায়েস এনেছিল বনদেবতার পূজা করতে। গাছের তলায় সিদ্ধার্থের ধ্যান-সুন্দর মুখ দেখে ভাবলে এই ত বনদেবতা! তারপর যখন ভক্তি করে, সিদ্ধার্থের পদ্ম হাতে সোণার বাটি

তুলে দিলে তখন সিদ্ধার্থ খুসী হয়ে তা খেলেন আর, বল্‌লেন, "আমি দেবতা নই, আমি মানুষ! তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, আমায় সত্যের পথের পাথেয় দিয়েছ। হে কল্যাণী, তোমার কল্যাণ হ'ক।" তারপর থেকে তিনি নিয়মিত আহার করতেন।

এদিকে সেই পাঁচজন শিষ্য তাঁর ওপরে শ্রদ্ধা হারিয়ে তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন; কিন্তু সিদ্ধার্থের প্রাণ যে পবিত্র আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল সেই আনন্দে তিনি বোধি-গাছের তলায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যেন বুঝতে পারলেন এইবার সিদ্ধিলাভের সময় এসেছে। গাছের তলায় বস্‌বার সময়ে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করে বস্‌লেন, "যদি এই দেহ পাত হয় হ'ক, তবু বোধিলাভ না করে উঠব না!" তাঁর সঙ্কল্প দৃঢ় ছিল; মন শক্তিশালী ছিল।

তাঁর মনের ভিতরের পাপ তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখালে কিন্তু তিনি মেঘ গর্জ্জনের মত গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "হে পাপ, যদি এই সুধা, চাঁদ তারা, মাটিতে পড়ে যায়, যদি পৃথিবী অদৃশ্য হয় তবু আমি স্থির থাকব। যদি তোমার মতন লক্ষ লক্ষ পাপ আমায় ভয় দেখায় তবু আমি নড়ব না, আমি টল্‌ব না!" পাপ পালাল, প্রলোভন পালাল, সিদ্ধার্থ জয়ী হলেন।

তিনি বুঝলেন পৃথিবীতে দুঃখ আছে, ইচ্ছা থেকেই দুঃখ, ইচ্ছা দূর করাতেই দুঃখ দূর। তার উপায় দৃষ্টি, ভাবনা, কথা, কাজ, জীবিকা, পরিশ্রম, স্মৃতি আর ধ্যানকে পবিত্র করা। আর বুঝলেন ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্মতেই পৃথিবী চল্‌ছে, ধর্ম্মই সমস্ত দুঃখ, সমস্ত পাপ, সমস্ত ভুল থেকে উদ্ধার হবার একমাত্র উপায়।

এখন এই কল্যাণের ধর্ম্ম কেমন করে প্রচার হবে এই ভাবনা! পৃথিবী যদি এই পবিত্র ধর্ম্মকথা না শুন্‌ল তবে ত বুদ্ধের সাধনাই মিথ্যা! কিন্তু বাসনান্ধ লোকেদের এধর্ম্ম কথা শুনিয়ে কি লাভ? তাঁর মনে পড়ল সেই পাঁচ শিষ্যের কথা। তাহারা কোথায়? তিনি তাদের সন্ধানে ছুটলেন। তারা ভেবেছিল বুদ্ধদেবকে গুরু বলে মান্‌বে না কিন্তু তাঁর পবিত্র মুখের আনন্দ জ্যোতি দেখে তারা ভক্তিতে তাঁর পায়ে ললাট লুটিয়ে দিলে! বুদ্ধদেব বললেন, "এতদিনে আমি মুক্তির পথ পেয়েছি," এস এস মুক্তিপথের যাত্রী, তোমাদের সেই পথের দিশা দেখিয়ে দিই।" তারা নতুন ধর্ম্মের সঙ্গে অধীর হয়ে উঠল।

বুদ্ধদেব তাদের নিয়ে ঋষি পত্তনের হ্রদে নাম্‌লেন, বললেন, "আজ দেহ মনকে পবিত্র করে স্নান কর।" তাই হ'ল। তখন বুদ্ধদেব বললেন, "তৃষ্ণা কলসীর মতন এই ধর্ম্মকথা তোমাদের মনে ভরে নাও, যে তৃষিত, যে তাপিত তাকে এই জলে শীতল করো!" সেই রাত্তিরের চুপচাপের মাঝে পাঁচ শিষ্যের কাণে বুদ্ধদেবের বাণী অমৃতধারার মত ঝরে পড়তে লাগ্‌ল! কি জ্ঞানের কথা, চিন্তার কথা, প্রেমের কথা! তারপর সত্যকে প্রণাম করে, গুরুকে প্রণাম করে, তাঁরা দীক্ষা নিলেন। বুদ্ধদেব বল্‌লেন, "তোমরা সত্যে এক, পবিত্রতায় এক, প্রেমে এক। তোমরা পরস্পরের সহায় হও, তোমরা পরস্পরের ভাই হও!"

যশ নামে একটি বণিকের ছেলে এল সংসারে বীতরাগ হয়ে। বুদ্ধদেব তাকে নতুন ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। যশ ধর্ম্মে মুগ্ধ হয়ে গুরুর চরণে আশ্রয় নিলে। যশের পিতাও এসে ছেলের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব নিলেন।

বুদ্ধদেবের খ্যাতিতে দেশ ছেয়ে গেল। দলে দলে লোক এসে নির্ব্বাণের ধর্ম্ম নিলে। কৃপণ তার টাকার থলি ফেলে ধনী তার ধন ফেলে ছুটে এল। এই প্রেমের ধর্ম্ম, মৈত্রীর ধর্ম্ম প্রচার কর্‌বার জন্যে বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা দেশে দেশে বেরিয়ে পড়্‌ল! উরুবিল্বতে গেলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং! বুড় আচার্য্য কাশ্যপ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধদেবের করুণা ভরা মুখ আর মুক্তির ধর্ম্মকথা শুনে বৌদ্ধধর্ম্ম নিলেন। তারপর বুদ্ধদেব বিম্বিসারের রাজ্যে গিয়ে বল্‌লেন, সমস্ত পাপ দূর করে মনকে পবিত্র করে মঙ্গল কাজ করাই ধর্ম্ম, আর মতন স্নেহে সমস্ত জীবকে প্রীতি দিয়ে পোষণ করাই ধর্ম্ম। বিম্বিসারও বুদ্ধদেবের শিষ্য হলেন।

শ্রাবস্তীনগর থেকে ধনবান অনাথ পিণ্ডদ এলেন বুদ্ধদেবকে দর্শন করতে। তিনি নিজে দয়াশীল, গরীবের বন্ধু! বুদ্ধদেবকে বল্‌লেন, "প্রভু আপনার ধর্ম্ম সংসারের

অশান্তি আর সন্ন্যাসের শান্তির কথা বলে। তাই আমি লোকহিত করেও মনে শান্তি পাই নে। আমি কি সংসার ত্যাগ করব, প্রভু!" বুদ্ধ বল্‌লেন, "না তাই তোমার সংসারত্যাগ করতে হবে না। যে নিজে যার মনের অহঙ্কার নেই, লোকহিতে যার মন, সে কেন সন্ন্যাস নেবে? অহঙ্কার, পাপ, আর সুখভোগের ইচ্ছাকে ত্যাগ করাই ধর্ম। যিনি মনে ধর্ম্মকে রাখ্‌বেন তিনিই শান্তি পাবেন, আনন্দ পাবেন। যিনি দান করেন তাঁর সুখের অন্ত নেই, মরণ তাঁর কাছে আনন্দ! দুঃখীর অভাব দূর করলেই আমাদের মনের সম্পদ বাড়্‌বে! যিনি যোগ্য লোককে ভালবাসার সহিত দান করেন তাঁর মনে হিংসে থাকে না, ঘৃণা থাকে না, রাগ থাকে না। মঙ্গল কাজেই মানুষের মুক্তি! অনাথপিণ্ডদ ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ সাধুদের জন্তে একটি আশ্রম করিয়ে দিলেন।

এদিকে ছেলের খ্যাতি শুনে রাজা শুদ্ধোদন বলে পাঠালেন, "আমি এখন বুড় হয়েছি, মৃত্যুর আগে তোমায় দেখ্‌তে চাই। হাজার হাজার লোক তোমার ধর্ম্ম শুন্‌ছে, তবে তোমার আত্মীয়েরাই কি শুধু বঞ্চিত হবে?" বুদ্ধদেব এই কথা শুনে সেই দিনই শিষ্যদের নিয়ে কপিলবাস্তুতে গিয়ে একটি বাগানে রইলেন। পিতা যখন সাত বছর পরে বুদ্ধদেবকে সংসারে ফের্‌বার জন্তে অনুরোধ করলেন, বুদ্ধদেব বল্‌লেন, "পিতা, আমার উপর আপনার যে অসীম স্নেহ, সেই স্নেহ যদি আপনি পৃথিবীতে বিলিয়ে দিতে পারেন তবে আপনি এক খুব বড় সিদ্ধার্থকে পাবেন!" ছেলের কথা শুনে শুদ্ধোদনের চোক জলে ভেসে গেল। তারপর যখন সিদ্ধার্থ ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন, শুদ্ধোদন বললেন, "পুত্র, এ কি কাণ্ড? আমার অন্ন তুমি খাও।" বুদ্ধদেব বললেন, "নিজের অন্ন খেলে মনে অহঙ্কার হয় কিন্তু ভিক্ষার দানে তা হয় না, এই আমার শ্রেয়।" তারপর বুদ্ধদেব গোপার সঙ্গে দেখা করলেন, ধর্ম্মকথা শোনালেন, গোপা স্বামীর চরণ বন্দনা ক'রে সেই ধর্ম্মের আশ্রয় নিলে।

একদিন গোপার কথায় বুদ্ধের ছেলে রাহুল পিতার কাছে এসে বল্‌লেন, "বাবা তোমার যা ধন আছে তা-আমায় দান কর।" বুদ্ধদেব বললেন, "ধর্ম্মধন ছাড়া আর আমার কি আছে বাবা? তাই হ'ল। পিতা পুত্রকে ধর্ম্ম দান করলেন।

বুদ্ধের প্রধান ভক্তদের মাঝে ছিল আনন্দ। সে যেমন মন প্রাণ ঢেলে গুরুর সেবা করত এমন আর কেউ না। আমরণ তাঁর সেবা করে সে ধন্ত হয়েছিল।

(৫)

বুদ্ধদেব বললেন, "জীবহত্যা করো না, সর্ব্বজীবে দয়া কর, পাপ দূর করে মনকে সাদা কর, পবিত্র কর। মুখের কথা, দেহের কাজ আর মনের ভাবনাকে পরিষ্কার কর, নির্ম্মল কর। মনকে স্থির কর, কামনাকে দূর কর, ইচ্ছাকে বশ কর। চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর, ধর্ম্মনীতি পালন কর, সত্যকে লাভ কর, আলস্ত করো না, শুভ কাজ কর, সমস্ত জীবের মঙ্গল কর, কল্যাণ কর!" তিনি বল্‌লেন, "নিজের ইচ্ছে দিয়ে ভাল কাজ করবে, বারবার ভাল কাজ করবে, ভাল কাজকে ভালবাস্‌বে। গান গাওয়া যেমন পাখীর আনন্দ, ফুটে ওঠা যেমন ফুলের আনন্দ, ভাল কাজ তেমনি আমাদের আনন্দ হ'ক! মনের ইচ্ছে দিয়ে এই সব নিয়ম পালন করবে, শুধু বাইরে দেখাবার জন্তে নয়; সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখবে। যে তোমার খারাপ করে তার ভাল কর, যে শত্রু তাকে প্রেম দাও! রাগ দূর কর, স্বার্থ দূর কর, মিথ্যা দূর কর। মনকে সংযত কর, সমাহিত কর, সকলকে প্রেম দাও, প্রেম দাও। তিনি বল্‌লেন, "চুরি করো না, মিথ্যা বলো না, মদ খেও না, খারাপ কাজ করো না। মনকে পবিত্র করলে সত্যকে দেখতে পাবে।"

তিনি গৃহীকে বললেন, "বাপ মার সেবা কর, গুরুকে ভক্তি কর, স্ত্রীকে সম্মান দাও, ছেলে মেয়েদের ভাল শিক্ষা দাও, বন্ধুদের ভালবাস, আশ্রিতদের দয়া কর। পরের ধনে লোভ করো না, আর্ত্তের সেবা কর, গরীবকে ভিক্ষা দাও, ধর্ম্মকে ভালবাস। ইন্দ্রিয়কে দমন কর, প্রবৃত্তিকে শাসন কর, তাহলে সংসারে থেকেও মুক্তি পাবে, শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে।" তিনি বললেন, "এই যে আমরা নিজেদের আলাদা করে বিশেষ করে দেখি এই আমাদের দুঃখের কারণ। এই যে আমরা

সুখকে খুঁজি, আরামকে খুঁজি এই আমাদের দুঃখের কারণ। সকলের সঙ্গে নিজেকে সমান করলে; সত্যের সঙ্গে নিজেকে মেলালে, অখণ্ডের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করলে যে আনন্দ সেই সত্য। মনের তৃষ্ণাকে দূর কর, সকলের মাঝে নিজেকে বড় করে দেখ। প্রীতিকে সব দেশে, সব কালে ছড়িয়ে দাও নিজের শক্তিকে জাগাও, সুখ দুঃখ মরণকে না মেনে লোকের ভাল কর। নিজেকে ভুলে গিয়ে পরের ভাল কর। হে সত্যপথের যাত্রী, তুমি জাগ, তুমি ওঠ, মোহ থেকে জাগ, অজ্ঞান থেকে জাগ, ওত্তিষ্ঠত, জাগ্রত!" তিনি বললেন, "অহংকে দূর না করলে দুঃখ দূর হবে না। পদ্মফুল যেমন সমস্ত পাঁকের উপরে ফুটে থাকে তেমনি সংসারের ওপরে নিজেকে ফুটিয়ে তোল, শরীরকে সুস্থ রাখ, কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না। নিজের মাঝে যে সত্য আছেন তাঁকে বুঝতে পারাই হ'ল বুদ্ধের লাভ!" তিনি বললেন, "মন যদি পবিত্র না হয় তবে শরীরকে শুচি করে কোন লাভ নেই; যিনি সব চেয়ে বড়, তাঁর সঙ্গে যদি আমরা যা-কিছু ছোট তা-মিলিয়ে নিতে পারি তাহ'লে সেই আমাদের মুক্তি! তোমরা নিজের ওপর নির্ভর করতে শেখ, নিজেরাই নিজেদের গুরু হও! নিজের মন থেকে ধর্ম্মকে নিতে হবে, এত ভিক্ষের দান নয় পরের হাত থেকে কেমন করে নেবে? দুঃখীর দুঃখে কাতর হও, সুখীর সুখে সুখী হও।" তিনি বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, জীব, জন্তু, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা কর। নিজেকে বিনীত কর, নম্র কর, সরল কর ও সকলকে প্রীতি দাও।"

(৬)

বুদ্ধদেব বুড় হয়েছেন। আশি বছর তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে চলে গেছে। সেই সময়ে তিনি একবার বৈশালীতে গিয়েছিলেন। আম্রপালী নামে এক পতিতা নারী বুদ্ধদেবকে নেমতন্ন করলে। এদিকে লিচ্ছবি বংশের রাজারাও তাঁকে রাজবাড়ীতে নেমতন্ন করলেন; কিন্তু বুদ্ধদেব বললেন তিনি আম্রপালীর কাছে কথা দিয়েছেন। যাকে সকলে ঘৃণা করে তার বাড়ীর অন্ন বুদ্ধদেব খুশী মনে খেয়ে এলেন, আর এমন ভাল কথা বললেন যে আম্রপালীর মনে ধর্ম্ম জেগে উঠ্‌ল।

এই সময়ে বুদ্ধদেবের বড় শক্ত অসুখ করে। তা থেকে যখন তিনি আরোগ্য হলেন, আনন্দ কাতরতা প্রকাশ করায় বুদ্ধদেব বললেন, "আনন্দ, আমি যে সত্যকে বুঝেছি তা সকলকে বলেছি। আমার দিন ফুরিয়েছে। ধর্ম্মের আলো হাতে নিয়ে তোমরা পথে চলো, নির্ব্বাণ পাবে। তোমরা এই কল্যাণের ধর্ম্ম প্রচার করো, এ ধর্ম্ম যাতে চিরস্থায়ী হয় তাই করো। মনকে সর্ব্বদা প্রলোভন থেকে দূরে রাখবে, সর্ব্বদা ধর্ম্মের সাধনা করবে। যা অমৃত তার খোঁজ করো!"

কুন্দ নামে এক কামার ছিল, সে পাকত পাত্রাগারে। বুদ্ধদেব যখন শিষ্যদের নিয়ে সেখানে এলেন, সে তাঁদের নেমতন্ন করলে। সে যখন শূয়রের মাংস দিতে এল, বুদ্ধদেব একলা অম্লান মুখে তা খেলেন। ভক্তি করে কেউ কিছু দিলে তিনি কখনও ফেরাতেন না। তারপর তাঁর রক্তামাশা হয়। তিনি ক্লান্ত ক্লিষ্ট হয়ে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন এমন সময়ে পুক্কস নামে এক যুবক এসে তাঁর প্রশান্ত ভাব দেখে মুগ্ধ হ'ল। তাঁর মুখে তার ধ্যানের কথা শুনে শিষ্যত্ব নিলে। মৃত্যুর সময় যতই কাছে এল, বুদ্ধদেব আনন্দকে বললেন, "আনন্দ, আমার মহানির্ব্বাণে তোমরা কেউ শোক করো না। কুন্দকে এমন কথা বলোনা যে তার আহারে আমি প্রাণত্যাগ করেছি। বলো, "আমি জীবনে দুটি আহার দান বলে পেয়েছি। সুজাতার অন্ন আমায় বোধি দান করেছিল, আর কুন্দের আহার আমায় মহানির্ব্বাণ দিয়েছে!" তিনি বললেন, "আমার মরণের পর মনে করো 'সত্যই' তোমাদের চালক, তোমাদের গুরু! ছোট শিষ্যেরা যেন তোমাদের 'সুজনীয়' বলে, আর তোমরা 'বন্ধু' বলে ডেকো। তারপর তিনি বারবার তিন বার জিগেস করলেন ধর্ম্মবিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ আছে কিনা। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। শেষে আনন্দ বললে, "না প্রভু, কোন দ্বিধা নেই!" বুদ্ধদেব শান্ত গম্ভীর স্বরে শেষ বাণী বললেন, "যা জন্মায় তার মৃত্যু হইবেই। তোমরা মনকে স্থির রেখে নির্ব্বাণ

লাভ করে! তারপর সেই মহাজ্ঞানী, মহাকবি চিরদিনের মতন মহাধ্যানে ডুবে গেলেন।

কুমারী নিরুপমা দেবী।

নোটের-তাড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবতোষ 'এণ্ট্রান্স' পাশ করিয়া প্রথম যখন কলিকাতায় পড়িতে যায় তখন সে পঞ্চদশবর্ষীয় বালকমাত্র। পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক,—আশৈশব অন্যের গৃহে, অপরের সাহায্যে লালিত ও বর্দ্ধিত। দূরদেশে তাহাকে পাঠাইয়া ভাবিবার কাঁদিবার কেহ ছিল না, তাই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সুদূর কলিকাতা যাইতে কেহ বাধা দেয় নাই। তখনকার দিনে রেল জাহাজের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না, কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান হইতে কলিকাতা যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ছিল। এই সকল কষ্টস্বীকার করিয়া ভবতোষ কলিকাতা গেল। গ্রামের পড়া শেষ হইয়াছিল, কলেজে পড়িতে হইবে।

পূর্ব্বকার সাহায্যদাতা কলিকাতার কোনও পরিচিত ব্যক্তির নিকট পত্র দিলেন,—বড় বড় লোক হইতে এই মেধাবী বালককে যেন সাহায্য লওয়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বহুদিন কলিকাতার পরিচিত ব্যক্তিটির সহিত চিঠিপত্র বিনিময় না থাকাতে তাঁহার ঠিকানা বলিতে পারিলেন না, ঠিকানার জন্য ভবতোষও বিশেষ ব্যস্ত হইল না। এতদিন যাবত যাহার কলিকাতায় বাস তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা-যাইবেই। গ্রামে ছোট, বড় সকলে সকলকে চিনে, কাহারও অনুসন্ধান করিতে বিলম্ব হয় না, সহর বড়—না হয় একদিন খুঁজিতে হইবে। এই ত! ভবতোষ কলিকাতা আসিল। চিরকাল গ্রামে থাকিয়া তাহার নগরের ধারণা ছিল না। পুথিগত জ্ঞান, আর পরীক্ষার সময় একবার চট্টগ্রামে গিয়াছিল,—এইমাত্র। শিয়ালদহ আসিয়া সে স্তম্ভিত হইল। প্রশস্ত রাজপথ দিয়া অবিরাম গড় গড় করিয়া গাড়ী, ট্রাম চলিয়াছে,- ভোঁ ভোঁ হুঁকিয়া মোটর ছুটিয়াছে,—দুই পার্শ্বের ফুটপাথে বন্যার মত জনস্রোত। ঠেলাঠেলি নাই, হুড়াহুড়ি নাই,—অথচ কাতারে কাতারে অসংখ্য-লোক জমাট বাঁধিয়া চলিয়াছে। ভবতোষ অবাক হইল। চড়ক পূজার সময় তাহাদের গ্রামে মেলা বসিত,—নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে তিন চারি শত লোক একত্রিত হইত,—তাহাতে হৈহৈ চীৎকার, হুড়াহুড়ি, মারামারি হইত। কিন্তু এই যে কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে তথাপি উচ্চ বাচ্য নাই, মারামারি নাই, সব যার যার মনে চলিয়াছে,—কেমন একতা, কেমন সদ্ভাব!!—ভবতোষ বিস্মিত হইয়া ভাবিল, বোধ হয় কোনও স্থানে মেলা বসিয়াছে। রাস্তার একটি ভদ্রবেশী লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মেলা কোথায় হইবে? এত লোক কোথায় যায়?" লোকটি একবার তাহার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইল, তারপর উচ্চহাস্য করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গীটিকে বলিল, "ভাই, বাঙ্গাল দেখ।" ভবতোষ অপ্রতিভ হইল। সঙ্গী একপা ফুটপাথে ও অন্যপা একটা সুদৃশ্য ষ্যাণ্ডোর পাদানে রাখিয়া, হাটুর উপর সমস্ত দেহ হেলাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রথোক্ত ব্যক্তিটী এক দোকানীর নিকট হইতে কি একটা নৌখীন জিনিষ আনিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছিল। তিনি কোমল স্বরে বলিলেন, "তুমি সহরে নূতন এসেছ বুঝি?"

স্নেহপূর্ণ উপহাসের পর এই কোমল কথাগুলি ভবতোষের বড়ই মিষ্টি লাগিল, সে সকরুণ দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে চাহিল। চাহিয়া দেখিল কেমন সুশ্রী যুবকটি। কাঁচা সোণার মত টক্‌টকে দেহের বর্ণ, পরিপুষ্ট সুঠাম দেহের গঠন, মুখখানি কেমন হাস্যোৎফুল্ল। এক মুহূর্ত্তের ব্যবহারেই ভবতোষের মনে হইল লোকটি বড়ই দয়ালু, অমায়িক, বড়ই আপনার। প্রথম দর্শনেই সরল লোকের হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আজীবন ব্যাপী পরিচয়েও কুটিলের স্বভাব বুঝা যায় না। সরল ব্যক্তি খাঁটি সোণা, হৃদয়ে বাহিরে এক, আর কুটিল লোক গিল্টী করা সোণা, মনে এক মুখে আর; বাহ্যিক ব্যবহারে হৃদয়ের তিলমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। ভবতোষের মনে হইল ইনি খাঁটি সোণা। ভাবিল, ইহাকে সব খুলিয়া

বলি; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বেশের পারিপাট্য, গাড়ীর জাকজমক ও দর্পটিকে দেখিয়া কেমন দমিয়া গেল। ভয়ে ভয়ে বলিল, "হা আমি নূতন আসিয়াছি, আর কোনও দিন সহরে আসি নাই। রামাচরণ দত্তের বাসা কোথায় জানেন?" প্রথম ব্যক্তি অধিকতর উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "তাহা বাঙ্গাল! রামাচরণ কেতা কি করে বলব হে, তার ঠিকনা ক'টি পার?"

ভবতোষকে সঙ্কুচিত দেখিয়া দ্বিতীয় যুবক স্নেহাদ্রস্বরে বলিলেন, "এত বড় সহরে ত ঠিকানা ছাড়া কারু সন্ধান করা যায় না। তার ঠিকানা বলতে পার?" ভবতোষ ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমি সহরে নতুন আসিয়াছি। গ্রামের মত এখানেও বুঝি শুধু নামেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়, ভাবিয়াছিলাম। তিনি ত দশ বৎসর যাবত কলিকাতা থাকেন।"

প্রথম ব্যক্তি বিকৃত স্বরে বলিল, "হ, হ, তুমি যে নতুন সহরে আইছ তা তোমার কথাবার্ত্তায়ই টের পাইছি।" দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "ছি, ছেলে মানুষের সঙ্গে কি দুষ্টুমি কর! সরল গাঁর বেচারা।" তৎপর ভবতোষকে বলিলেন, "তুমি এখানে কেন এসেছ? কে আছে তোমার?" ভবতোষ সব বলিল, চিঠিটা দেখাইল! সব শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "ঠিকানা ছাড়া ত তাঁর সন্ধান পাওয়া কঠিন। তবে আমার সঙ্গে এস, আমি দু একজনকে দিয়ে তোমার থাকবার পড়বার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।" প্রথম ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিয়া বলিল, "আহা বাঙ্গাল, এই মুরুব্বি বড় ভালো। ইহারে ছাইড়ো না।" পরিহাস-সন্তপ্ত বালক ছলছল নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য! সহরের সুসভ্য লোক ইহারা, তথাপি অপরকে এত ঘৃণা, পরিহাস করেন!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম ব্যক্তির নাম কালীকৃষ্ণ, দ্বিতীয়ের নাম হরিতকুমার। হরিতকুমার ধনী যুবক, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বড় বাড়ী। অগাধ সিভ্বন, এবং আজীবন কলিকাতার বুকে লালিত হইয়াও তাহার প্রকৃতিতে ক্রূরতা বা দাম্ভিকতা জন্মে নাই, এই গুণ ইহাদের বংশগত। অমায়িক উদার ব্যবহার, দান ধ্যান ও পরোপকারিতার জন্য এই মিত্রবংশ চিরপ্রসিদ্ধ। দৌভাগ্যক্রমে ভবতোষ এরূপ লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। কালীকৃষ্ণ হরিতকুমারের 'বন্ধু' বা চাটুকার। কলিকাতার ধনী যুবকদের এক শ্রেণীর বন্ধু জোটে, তাহারা অনেকটা মধুকর শ্রেণীর। যতদিন ধনী যুবকদের মধুরূপ অর্থ থাকে ততদিন এই সকল 'বন্ধু' গুন্ গুন্ করিয়া ইহাদের কাছে আনাগোনা করে, তোষামোদ করে, নানা উপায়ে এই সকল অভিভাবকহীন যুবকদিগকে প্রলোভনের পথে টানিয়া নেয়, তারপর মধুরূপ টাকা লুটিয়া প্রস্থান করে। ভ্রমর যেমন যতক্ষণ ফুলের মধু থাকে ততক্ষণ ফুলের কাছে গুন্ গুন্ করিয়া তাহার গভীর প্রেমের কথা জানায়, মধু ফুরাইলে অন্য ফুলে উড়িয়া যায়, তদ্রূপ এই সকল 'বন্ধু' যতদিন ধনীযুবকদের টাকা থাকে ততদিন বন্ধুত্ব জানায়, টাকা ফুরাইলে আর কাছে ঘেঁসে না। কালীকৃষ্ণও কিছুটা এই শ্রেণীর বন্ধু। তবে হরিত নিজের মনের বলে আপনাকে এই সকল চাটুকারের কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। হরিতকে ইহারা পাপের পথে টানিয়া নিতে পারে নাই, তবে হরিতের মাথায় হাত বুলাইয়া মোড়শোপচারে খাওয়া, বায়স্কোপ সার্কাস দেখা, গাড়ী মোটর দৌড়ান, বাবুগিরি বেশ চলিত। হরিত সকলি বুঝিত, বুঝিয়াও মুখে কিছু বলিত না। মো-সাহেবদের চাটুবাক্যে তাহার বড় কৌতুক বোধ হইত। অনেক সময় ভাবিত 'আশ্চর্য্য! মানুষ সামান্য টাকার লোভে এমনি করিয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতে পারে, এমনি করিয়া অন্যের পায়ে পড়িয়া থাকিতে পারে!" তাহার মনে হইত পৃথিবীতে বুঝি স্বাধীনচিন্ততা, নির্ভীকতা, ও সরলতা নাই।

আজ ঘটনাক্রমেই বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া হরিতের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। হরিত ভ্রাতাভগ্নীহীন অবিবাহিত যুবক। ইহাদের অভাব পূরণ করিতে পারে এরূপ একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু

সে চাহিত, কিন্তু এই কালে বন্ধু পাওয়া দুষ্কর। সরল অকপটপূর্ণ ব্যবহার, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, আজকালকার বন্ধু হইতে পাওয়া কঠিন। এখনকার বন্ধুগণ প্রায়ই স্বার্থের বন্ধু। যতদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে ততদিন নিজকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, স্বার্থসিদ্ধির উপায় বন্ধ হইলেই সরিয়া দাঁড়ায়। হরিতের মনে হইল প্রাণ দিয়া ভালবাসে এমন একটি বন্ধু চাই।

আজ ভবতোষকে দেখিয়া হরিতের মনে হইল এই যথার্থ বন্ধু। অনেক সময় অনেক লোককে দেখিয়া মনে হয় লোকটি যেন চির পরিচিত, যেন কত আপনার। অনেকে বলেন 'ইহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি, এই জন্মে সহসা সেই কথা মনে পড়িয়া এইরূপ লাগে।' হরিত ভবতোষের প্রতি আকৃষ্ট হইল। জানিনা তাহার মনেও সেরূপ স্মৃতি জাগিয়াছিল কি না। তার টলটলে মুখখানার কমনীয় ভাব দেখিয়া হরিত বড়ই মুগ্ধ হইল। সে বালককে ধরিয়া সাগ্রহে নিজের পার্শ্বে বসাইল, তাহার বগলা পুটুলীটি নিজের কোলের উপর রাখিল। দেখিয়া কালীকৃষ্ণের মনে কেমন হিংসা জাগিয়া উঠিল; কিন্তু হরিতের ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না।

সাগ্রহে রাজপথ কাঁপাইয়া চলিল। ভবতোষের মনে হইল যেন বাতাসে উড়িয়া চলিতেছে। বাল্যকালে 'পক্ষীরাজ ঘোড়ার' গল্প শুনিয়াছিল, ভাবিল ইহাই পক্ষীরাজ ঘোড়া।

দুই ধারে বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত বিপণীশ্রেণী তাহার স্বচ্ছ কাচের জানালা ভেদ করিয়া সুদৃশ্য দ্রব্যগুলি পথিকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, বাদ্যযন্ত্রের দোকানে গ্রামোফোন, হার্মোনিয়াম বাজাইয়া দোকানীরা ক্রেতা জড় করিতেছে, সমস্ত সহর যেন এক উৎসবের আনন্দে মাতিয়া রহিয়াছে, ভবতোষ মুগ্ধভাবে দেখিতে দেখিতে চলিল। হরিত সরল বালকের কৌতূহল দেখিয়া প্রীত হইল, কালীকৃষ্ণ হরিতের উপর বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'একটা অচেনা বাঙ্গালের এত সমাদর!' ভবতোষ ভাবিল, 'বুঝি পুষ্পকরথে চড়িয়া স্বর্গদূতের সঙ্গে স্বর্গ রাজ্যে চলিয়াছে!'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ.

বাড়ী পৌঁছিয়া হরিত ভবতোষের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া যাইয়া ডাকিল, "মা, মা।" এক বর্ষীয়সী বিধবা রমণী বাহিরে আসিলেন। অপরিচিত বালককে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে!" "আমার একটি ছোট ভাই,"—হরিত চোখের ইসারা করিয়া সম্প্রতি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বারণ করিল। ভবতোষকে বলিল, "ইনি মা।" বালক পায়ের জীর্ণ জুতাটি খুলিয়া রাখিয়া রমণীকে টিপ করিয়া একটি প্রণাম করিল। রমণী তাহার সরল সুন্দর মুখের পানে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হরিতকে বলিলেন, "কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি?" হরিত বলিল, "না মা। ভবতোষকে কিছু খাবার দাও।" মা ভবতোষকে বলিলেন, "এখন চা বিস্কুট খাবে এস, পরে স্নান করে গরম ভাত খাবে।" বালক স্মিতমুখে বলিল, "বিস্কুট খাই না ত।"

হরিত হাসিয়া বলিল, "কেন স্নেহের তৈয়েরি বলে।" বালক মাটীর দিকে তাকাইয়া মাথা নাড়িল। "আচ্ছা তবে লুচি মোহনভোগ খাবে এস" বলিয়া মা তাহাকে খাবার ঘরে লইয়া গেলেন। ততক্ষণে হরিত নিজের ঘরে ভবতোষের পুটুলী রাখিয়া আসিল, চাকরকে উত্তরের জন্য সুগন্ধী তৈল, সাবান, কাপড় ইত্যাদি স্নানের ঘরে রাখিতে বলিল।

বৈকাল বেলা ভবতোষ বিনীত ভাবে বলিল, "রামাচরণ বাবুর খোঁজে একবার যাইব।" হরিতকুমার বলিল, "পাগল আর কি,—ঠিকানা ছাড়া কোথায় তার খোঁজ করবে?" ভবতোষ বলিল, "তা পারব।" হরিত হাসিয়া বলিল, "তবে যাও।" ভবতোষ যাইয়া ফুট পাথের উপর দাঁড়াইল,—একবার পূর্ব্ব একবার পশ্চিম দিকে গেল, কিন্তু কোন্ দিকে যাইতে হইবে কিছু বুঝিতে পারিল না। রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, সহসা পেছনে 'হেইও হেইও' চীৎকার শুনিল। শব্দ শুনিয়া পেছন ফিরিতে ফিরিতে একটা বড়লার গাড়ীর গরুর ধাক্কা লাগিয়া ফুটপাথের উপর উপুড়

হইয়া পড়িল। রাস্তার লোকেরা হা হা করিয়া উঠিল, কেহ কেহ সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "বাঙ্গাল, কোন দিন সহরে আসে নি।" হরিত দ্বিতলের বারান্দা হইতে কৌতুক দেখিতেছিল, ভবতোষের বিপদ দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহাকে ঘরের ভিতর নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ, কেমন বিপদ! আর খোঁজ কর্‌বার ইচ্ছা কর?' ভবতোষ ম্লান মুখে বলিল, "তবে কি করিব? আমি যে এখানে আর কাহাকেও জানি না।" হরিতকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কিছুই করতে হ'বে না। খাবার সময় খাবে, ঘুমুবার সময় ঘুমুবে, দুপুরে কলেজে যাবে, পরীক্ষায় পাশ করবে,—সম্প্রতি এই, বস্।"

অগত্যা ভবতোষ হরিতের বাড়ী থাকিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল। হরিত তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অল্পদিনেই ভবতোষ হরিতের বাড়ীর সকলকে আপন করিয়া ফেলিল। আত্মীয়স্বজন হীন, সহায়সম্পদ বিরহিত এই দুঃখী বালকের উপর হরিত ও তাহার মাতা বড়ই আকৃষ্ট হইলেন। কাছে বসিয়া খাওয়ান, গল্প করা, গায়ে হাত বুলাইয়া দেওয়া। হরিতের মাতা ভবতোষের সঙ্গে আপন ছেলের মত ব্যবহার করিতেন। মাতৃস্নেহে বঞ্চিত বালক এত স্নেহ পাইয়া বিস্মিত হইল। এই সংসারের লোকের হৃদয়ে যে স্নেহনামে কোন কোমল প্রবৃত্তি আছে এতদিন বালকের সে বিশ্বাস ছিল না। আজ এই স্নেহ পাইয়া বালকের মনে এক বিমল আনন্দ জাগিল। মনের স্ফূর্ত্তিতে তাহার দেহের লাবণ্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিয়া হরিত আনন্দিত হইল। হরিত তাহাকে বন্ধুর মত ভালবাসিত, ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিত। তাহার এইরূপ ব্যবহারে ভবতোষের সঙ্কোচ লজ্জা ক্রমশঃ দূর হইল,—ভবতোষ হরিতকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসিল, প্রাণ খুলিয়া বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে শিখিল। হরিত ভবতোষকে পাইয়া পূর্ব্ব বন্ধুদের সংসর্গ ছাড়িয়া দিল; তাহাদের হৃদয়হীন হাসি ঠাট্টা, রহস্য পরিহাস ও চাটুবাক্য ভাল লাগিত না। বাগানের সদ্য ফোটা ফুলের ঘ্রাণ পাইলে যেমন কৃত্রিম গন্ধ ভাল লাগে না, তেমন হরিতের প্রেমপ্রীতিপূর্ণ সরল-হৃদয় এই বালককে পাইয়া কুটীলতা ও কৃত্রিমতাপূর্ণ 'বন্ধুদের' আর ভাল লাগিত না। হরিতের হৃদয় ভবতোষের স্নেহে ভরিয়া গেল,—সে ভাব উত্তরোত্তর গাঢ়তর হইল।

বন্ধুরা আসিত,—আসিয়া দেখিত হরিত ভবতোষের সহিত আলাপে মগ্ন, সে তখন তাস আর তাকে না, তাহারা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িত। কিন্তু একজন সরিল না,—সে কালীকৃষ্ণ। কালী হরিতের টাকার আমীরি করিত। 'কাল শোধ দিব' বলিয়া টাকা নিয়া আর শোধ করিত না। সে কাল ইহ জন্মের কি পর-জন্মের, কর্জ্জ নিবার সময় ত আর সে কথা বলে নাই, কাজেই হরিত আর সে টাকা চাহিত না, কে জানে, পরজন্মে ও ত শোধিতে পারে। কালী হরিতের বাড়ী আসিত, ছেলের বন্ধু বলিয়া হরিতের মাতা নানা প্রকার সুস্বাদ আহার্য্য নিজ হাতে তৈয়েরি করিয়া খাওয়াইতেন। এখন ভবতোষ আসাতে সে খাওয়াও ঘুচিল। হরিতের মাতা হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ হরিত ও ভবতোষের উপর ঢালিয়াছিলেন, পৃথিবীর আর কাহার জন্য সেই সুধার এক ফোটাও রাখেন নাই। কালী আসিয়া হরিতের আদর পাইত না, তাহার মায়ের স্নেহ পাইত না, অন্তরে অন্তরে পুড়িত। এই ভবতোষই তাহার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছে, 'বাঙ্গালটা'কে শিক্ষা দিতে হইবে, নাকের জলে চোখের জলে ভাসাইতে হইবে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ান, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া,—সে ইহার উপযুক্ত শিক্ষা দিবে, তবে তাহার নাম কালীকৃষ্ণ।

কালীকৃষ্ণ স্থির করিল ভবতোষের হৃদয়ে কঠিন ঘা দেওয়া চাই, যেন সেই ঘাতে অস্থির হইয়া সে হরিতের সংসর্গ ছাড়িয়া যায়। সে জানিত পূর্ব্ববঙ্গের কেহ কেহ (বিশেষতঃ যাহারা দুকূল হৃদয়) 'বাঙ্গাল' বলিলে মর্ম্মাহত হয়, কলিকাতার লোকেরা বাঙ্গালদের ঘৃণা করে এই জন্য দুঃখ বোধ করে,—কালীকৃষ্ণের মনে হইল ইহাই উপযুক্ত পন্থা। ভবতোষের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে সে বাঙ্গাল, হরিত কলিকাতার লোক, কাজেই

হরিত মুখে মুখে যতই ভাল মানুষী দেখাক, মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং পরোক্ষে উপহাস করে।

কালীকৃষ্ণ ভবতোষের অন্তরে আঘাত দিয়া বলিল, "কি হে বাঙ্গাল, বড় যে লাট সাহেব হইয়া বসিছ। পরের টাকায় বাবুগিরি,—এত অহঙ্কার ভাল নয়। রাস্তায় ভিখারী আছিলা এখন হরিতের কৃপায় মস্ত ধনী অইছ, তা আমাগো লগে কথা কইতেও লজ্জা হয় নাকি? হরিত ত কয় 'বাঙ্গালটার লগে একটু তামাসা কইয়া লই, কইলকাত্তার লোকের ত ধারাণ জানে না, একটু বান্দর নাচাইয়া তামাসা দেখি। অগো বাঙ্গালগুলিই এমন অলস।" হরিত বাড়ী ছিল না, তাই কালী সাহস করিয়া এরূপ কথা বলিল।

ভবতোষের মুখ চোক লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "আমাকে যা খুসী বলুন কিন্তু একটা দেশের সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে এরূপ ঘৃণাপূর্ণ কটূক্তি প্রয়োগ করিবেন না।"

কালী। কেন হে বাপু, আমাগো গরীব পাইয়া বড় চোট বাড়। এই কথা ত আমি কই না, হরিতই কইছে।"

ভবতোষের মনে কেমন খট্‌কা বাধিল। হরিত বলিয়াছে, ইহা কি সম্ভব! এত অমায়িক, উদার প্রকৃতি যাঁর তিনি কি সামান্য সাম্প্রদায়িক দলাদলির বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিরুদ্ধে এমন কটূক্তি করিবেন! অসম্ভব—ইহা কালীর ঠাট্টামী।

ভবতোষ বলিল, "দেখুন কথার ভাষা আলাদা বলিয়া কি একদেশের লোককে এত ঘৃণা করিতে হয়? এক জাতি, এক বংশ, এক আচার ব্যবহার,—কেবল এত দিন রেল জাহাজের অভাবে যাতায়াতের সুবিধার যোগাযোগ না হওয়াতে তাহার ভাবের ও সহৃদয়তার আদান প্রদান সম্বন্ধে অন্তরায় ছিল, সে জন্য কি আপনার মত শিক্ষিত লোকেও নেহাৎ অশিক্ষিত চাষাভূষার মত এরূপ বিদ্বিষ্টভাব মনে পোষণ করিবেন, ছিঃ!" কালী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কেন, আমি ত এমনা কই না, হরিতও ত কয়।

"বাঙ্গাল বহুত নয় উড়ে এক জন্তু,
লাফ দিয়ে গাছে চড়ে লেজ নাই কিন্তু।"

ভবতোষের চক্ষু অভিমানে সজল হইল। "ছি ছি, এত ঘৃণা এত উপহাস!"

কালী। ঠাট্টা করুম না? বাঙ্গালরা অসভ্য জঙ্গলী জাত। আসামী, গারো, খর্ব্বা বাঙ্গাল এক রকমই,—অসভ্য বুত। কেন্ দীনবন্ধু মিত্রির 'রামমাণিক্য' আর 'আদ্যাসুন্দরীর' কথা পড় নাই? দীনবন্ধু অনেক দিন বাঙ্গাল দেশে আছিল,—সব জানে। বাঙ্গাল হইয়া কইলকাত্তার লোকের লগে মিশতে আইছ, জব্দ হইবাই।

ভবতোষ কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, "মহাশয় মাপ করিবেন। এরূপ নিন্দা সহিবার মত বল আমার হৃদয়ে নাই। আমার দেশ, আমার জন্মভূমি বলিয়া এত চীৎকার করিয়া তারপর এত সঙ্কীর্ণতা! আশ্চর্য্য! অবশ্য বঙ্গভূমির গৌরবে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করি, কিন্তু যখন বাঙ্গালদের জঙ্গলী অসভ্য বলিয়া এত ঘৃণা করেন তখন সেই অসভ্য বাঙ্গালদের পক্ষে বলি—।" সহসা হরিত ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, "তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সমস্ত ভারত আজ তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত। প্রেমাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব যিনি প্রেমের বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়ে গেছেন যাঁর বিশ্বপ্রেমের কথা আজ দেশ বিদেশে কীর্ত্তন হচ্ছে তিনি সেই অসভ্য দেশের। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তিনি তোমাদের ঘৃণিত উড়ে দেশের। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র, যাঁহাকে অগ্রণী করে আজ সমগ্র এসিয়া ইয়ুরোপের বিজ্ঞানমণ্ডলীর নিকট বসবার স্থান চাচ্ছে তিনিও বাঙ্গাল। দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ মোহন, প্রবীন বিচারক গুপ্ত, চন্দ্র মাধব, প্রসিদ্ধ আইনজীবী মনোমোহন, চিকিৎসক বিজয়রত্ন, কবি নবীনচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন এরাও বাঙ্গাল। আর কত বল্‌ব, আরও কত বল্‌ছে! ছি ছি কালী, তুমি পশ্চিম বঙ্গের নাম হাসালে।" কালীকৃষ্ণ মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে বলিল, "অ্যাঁ-অ্যাঁ, এঁরা-এঁরা?"

হরিত। বাঙ্গাল। আর ক'দার বলব। ভেবেছিলে শাস্ত বেচারা ভবতোষ—একা একা খুব জব্দ করবে। ছি ছি!—এর কাছে ক্ষমা চাও, আর কক্ষণো 'বাঙ্গাল' বলবে না, উপহাস করবে না।

কালীকৃষ্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খল ও হিংসুক, ইহারা এক শ্রেণীর.—কিছুতেই ইহারা অন্যের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভবতোষকে তাড়াইতে না পারিয়া কালী আর একটি ভীষণ ষড়যন্ত্র করিল।

ক'দিন পর একদিন মিষ্টকথায় ভবতোষকে ভুলাইয়া বলিল,"ভাই. মনে কিছু ক'রো না, আমি ঠাট্টা কচ্ছিলেম। তুমি যে এতে মনে ব্যথা পাও জান্‌তেম না"—ইত্যাদি। সরল ভবতোষ ভুলিল।

ক্রূর কালী বলিল, "ভাই আমার আঙ্গুলটা কেটে গেছে। স্ত্রী অনেক দিন চিঠী না পেয়ে বড্ড ব্যস্ত হয়ে চিঠী লিখেছেন। এখন চিঠী না দিলে ত বড্ড মুস্কিল। বড় জরুরী। আমি বলে যাই তুমি আমার হয়ে ক'লাইন লিখে দাও।"

ভবতোষ বিস্মিত হইয়া বলিল, "চিঠী,—পরস্ত্রীর কাছে!"

কালী হাসিয়া বলিল, "নেহাৎ ছেলেমানুষ তুমি হে। স্বামী নিজে সুমুখে দাঁড়িয়ে কি কি লিখ্‌তে হবে বলে দিচ্ছেন,—এতে তুমি লিখ্‌চ না, আর আমার আঙ্গুল কাটা, লিখ্‌তে পারি না বলে। জরুরী, চিঠীটা না গেলে ওরা বড্ড ভাব্‌নায় পড়্‌বেন, কি জানি কি করে বসে। লিখনা তুমি,—লজ্জা কি—আর ক'লাইন-ই-বা। বাধ্য হইয়া ভবতোষ লিখিতে বসিল। কালী লিখাইল—

"প্রাণের প্রভা,

তোমায় যে কত ভালবাসি তা আর নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা তোমার ঐ চাঁদপানা মুখখানা মনে পড়ে। তুমি আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে ব্যস্ত হবে তা ত স্বাভাবিক। কিন্তু লোকলজ্জার ভয় আছে. সুযোগ ছাড়া তোমার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিলে লোকে কুৎসা করিতে পারে।—"

ভবতোষ লিখা বন্ধ করিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে কালীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "চিঠী কাহাকে লিখাইতেছেন। দেখা সাক্ষাৎ করিলে লোকে কুৎসা করিবে,—কেন স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ, সেত পবিত্র ভাব,—তাতে কুৎসার কি আছে?" ধরা পড়িবার ভয়ে কালীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি নিজকে সামলাইয়া, মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, "তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি? ভয় নাই। কালীকৃষ্ণ মুখে যতই ইয়ারকি দিক, মনে মনে বড্ড নীতিবাগীশ হে! চিঠী শ্রীমতী প্রভাবতী ঘোষ ওরফে কালীকৃষ্ণের পত্নী ঠাকুরাণীর সমীপেষু হবে ভয় নাই। নূতন বিয়ে করেছি,—আমাদের দেশে নূতন স্ত্রীর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করলে নিন্দা হয়, বুঝলে।—তাই ওকথা লিখ্‌চি।"

সরল ভবতোষের সন্দেহ কাটিয়া গেল। কালী চিঠীখানা লইয়া নিজের কোটের পকেটে রাখিয়া দিল।

পরদিন ভবতোষ পড়ার ঘরে জানালার ধারে বসিয়া পড়িতেছিল; কালীকৃষ্ণ অন্য ঘরে আড়ালে দাঁড়াইয়া কি লক্ষ্য করিতেছিল। পক্ষীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য জাল ফেলিয়া শিকারীর মুখে যেমন উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, কালীকৃষ্ণের মুখেও তেমন একটা ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। কালীকৃষ্ণ অস্থিরচিত্তে জানালার পাখী খুলিয়া দেখিতেছিল। যখন দেখিল শিকার ফাঁদে পড়িবার সময় হইয়াছে তখন সে ভবতোষের লিখিত চিঠীখানা নীচে নিক্ষেপ করিল। নীচে হরিতের ঘৃত সম্পর্কীয়া যুবতী বিধবা ভগ্নী স্নান সারিয়া শিবপূজা করিতেছিলেন। ভবতোষের জানালার নীচে স্নানের পুকুর। যুবতীর গায়ে চিঠী পড়াতে সে চমকিত হইয়া উপর দিকে চাহিল। দেখিল ভবতোষ বসিয়া আছে। ভবতোষও তখন সহসা জলের শব্দ শুনিয়া নীচে চাহিয়াছিল, নীচে স্নানরতা যুবতীকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সরিয়া গেল। যুবতী একবার বিরক্তি ভরে উপর দিকে চাহিল, তারপর চিঠী খুলিয়া পড়িল। তাহার মুখ রাগে, দুঃখে, অভিমানে লাল হইয়া উঠিল। এই

ভবতোষের এই কীর্ত্তি! তাহার ভ্রাতার দয়ায় লালিত পালিত, তাহার এই ব্যবহার!' এ যে দুষ্ট ব্রণের কাল সাপ পোষা! বিধবার মন রোষে ফুলিয়া উঠিল, লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে লজ্জায় অভিমানে হরিতের মাতার নিকট ছুটিয়া গিয়া সমস্ত কথা বলিল, চিঠী দেখাইল। হরিতের মাতার কেমন কেমন মনে হইল, ভবতোষ দ্বারা কি এমন কার্য্য সম্ভব! এমন সরল সুন্দর, স্বর্গীয় মুখ যাহার তাহার মনে কি এমন পাপ থাকিতে পারে? কে জানে? অনেক সময় ত মুখ দ্বারা মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, এ যদি সোণা না হইয়া খিল্টী করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিধবা প্রভা ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিল সে ঐ চিঠী ভবতোষকে লিখিতে দেখিয়াছে। তখন হরিতের মাতা কথাটা বিশ্বাস করিলেন, হরিতকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন. হরিত বিশ্বাস করিল না। সে লোকের হৃদয় চিনিত, বলিল "সূর্য্য যদি পশ্চিমে উদিত হয়, পৃথিবী যদি গড়াতে গড়াতে রসাতলের দিকে যায় তবুও ভবতোষ দ্বারা এমন কাজ সম্ভব হবে না।" প্রভা কাঁদিতে লাগিল, "তোমরা আমায় অবিশ্বাস কর। যে হতভাগিনী বিধবা হয় পৃথিবীতে তাহাকে কেহই সহানুভূতি জানায় না। আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি? এত বড় কলঙ্কের কথা কেউ কি সাধ করিয়া বলে? নিঃসহায়া বিধবা আমি, কি আমি কপালে কি হয় তাই এত সাবধান হই। এখন তোমরা যদি ওকে এখানে রাখ বাধ্য হয়ে আমাকেই অন্যত্র যেতে হবে।"

অগত্যা হরিত ভবতোষকে মিথ্যা কহিয়া এক মেসে রাখিয়া আসিল। "মেসে ভাল ছেলেরা থাকে উহাদের সঙ্গে পড়া ভাল হয়, বাড়ীতে অনেক বাধা বিঘ্ন" ইত্যাদি। ভাবিল "কদিন প'রে তখন তার রাগ পড়িলে তাহাকে বুঝাইয়া তবকে আনিবে। ভবতোষ একটুক অবাক হইল, আজ এ বন্দোবস্ত কেন?"

হরিতের সন্দেহ হইল—"কাজটা কালীর। সরল ভবতোষকে তাড়াইবার মৎলবে এরূপ করিয়াছে।" কিন্তু হরিত কিছুতেই বুঝিতে পারিল না "চিঠীটার ভবতোষের হস্তাক্ষর এমন বেমালুম নকল করিল কি করিয়া।—" ভবতোষ মেসে থাকিয়া পড়িতে লাগিল, হরিত প্রত্যহ দুবেলা তাহাকে দেখিয়া আসিত।

এইরূপে কয়েকবৎসর অতীত হইল। ভবতোষ এম্, এ পাশ করিয়া হরিতের উদ্যোগে শিমলায় ৪০০৲ মাহিনার একটা ভাল কাজ পাইল। ঘটনাচক্রে কালীকুষ্ণেরও শিমলাতে একটা ৩০৲ মাহিনার চাকুরী হইল। কালী ভাবিয়াছিল ভবতোষকে তাড়াইতে পারিলে বিনা বাধায় হরিতের মাথায় হাত বুলাইয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত ঘটনার পর হরিত তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক তাহার সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল, তখন বাধ্য হইয়া কালী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল,কিন্তু কোথাও ২০৲ টাকার বেশী মাহিনার চাকুরী মিলিল না। বহু কষ্টে, বড় লোকের সুপারিশ চিঠী যোগাড় করিয়া, হাটাহাটি করিয়া কালী শিমলায় চাকুরী যোগার করিল :—সপরিবারে শিমলা গেল। ভগবান কৃপা করিয়া তাহাকে বেশী পোষ্য দেন নাই।—বিবাহ প্রায় আট বৎসর যাবত হইয়াছে,—মা ষষ্ঠী কৃপা করিলে এপর্য্যন্ত পুত্রকন্যার বন্যায় তাহাকে ভাসাইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। এজন্য কালী তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিত।

কালী জানিত না ভবতোষ শিমলাতে আছে, তাহা হইলে তাহার নিয়তন কর্ম্মচারী হইয়া শিমলা আসিত না। তাহার বুক কাঁপিয়া যাইতে লাগিল,—ছিঃ এই 'বাঙ্গলটার' নীচে কাজ করিতে হইবে।

কালীকে দেখিয়া ভবতোষ অত্যন্ত আনন্দিত হইল, —সে হরিতের বড় যে! চেয়ার হইতে নামিয়া তাহার সহিত কোলাকোলি করিল। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বলিল, "ভবতোষ বাবু অমায়িক। ৪০০৲ টাকার চাকুরে, একটা ৩০৲ টাকার কেরাণীর সঙ্গে এতটা—না করেও ত পার্ত্তেন।" কালী সুখী হইল না, তাহার মনের ভিতর আগুন ধাউ ধাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু নিরুপায়; ভবতোষ বিদ্বান, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, বড় সাহেবের পেয়ারের।

ভবতোষ প্রত্যহ কালীকে নিমন্ত্রণ করিত, কালী

হলহুজ্জা করিয়া এড়াইত। কালীর মনে হইত, "ইহা আর কিছু নয়,—পূর্ব্ব ব্যবহারের পাল্টা নেওয়া,—অপমান করা। বামুনের কি দর্প! ভগবান ইহার দর্পচূর্ণ করেন না,—বজ্রাঘাতে অথবা সর্পদংশনে ইহার—।" কি ভয়ানক! ভবতোষ কিছু জানিত না, বুঝিত না। অফিসের পর যখন সমশ্রেণীর হাকিমদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইত এবং কালীকৃষ্ণের জীর্ণ গৃহের নিকট দিয়া যাইত তখন ভবতোষ ডেপুটি মুন্সেফদিগকে বলিত, "তোমরা একটু আস্তে আস্তে এগোও ভাই, আমি চট্ করে কালী-দার সঙ্গে দেখা করে আসি।" হাকিমরা বলিতেন, "না, ভবতোষ বাবু এমন করে আমাদের অপমান করবেন?" কালী বাড়ীর ভিতর হইতে শুনিত, লজ্জায় অভিমানে তাহার সমস্ত হৃদয়টা জ্বলিয়া উঠিত এ যে তাহাকে অপমান করা! সে কথা কহিত না, মুখ ফিরাইয়া থাকিত। ভবতোষ ভাবিত খাটুনীর পর একটু বিশ্রাম করিতেছে। সে অন্দরের ভিতর ঢুকিয়া ডাকিত, "বৌদি।" একটি স্নেহরূপিণী নারীমূর্ত্তি রান্না ঘরের ভিতর হইতে মলিন বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন, "কি ঠাকুর পো!" ভবতোষ বপ্ করিয়া রান্না ঘরের দুয়ারে বসিয়া বলিত, "একটা আলুর চপ্ খাওনা বৌদি, খাই।" কালীর পত্নী ব্যস্ত হইয়া পিঁড়ি আনিতে ছুটিতেন। তাড়াতাড়ি বসিবার জন্য পিঁড়ির স্থানে জলের কলস দিতেন, আলুর চপের স্থানে পাকের খন্তা দিতেন। ভবতোষ হাসিয়া বলিত, "বৌদির কাণ্ড, আমি যেন কুটুম্ব এসেছি, এখন কেমন জব্দ!" বৌদি মধুর হাসিয়া বলিতেন, "হাকিম দেবরত!" ভবতোষ উচ্চহাস্য করিয়া বলিত, "কিন্তু হুকুম শক্তি ত অতটা এখনো হয় নি। তুমি খেয়াও না বৌদি।"

একদিনে ভবতোষ তাহার সরল অমায়িক ব্যবহারে কালীর পত্নীটিকে আপন করিয়া ফেলিয়াছিল, কালীর পত্নীও তাহার কোমল হৃদয়ের স্নেহ আত্মীয়হীন ভবতোষের উপর ঢালিয়া দিয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া কালী বিরক্ত হইত, মনে মনে পত্নীর উপর অসন্তুষ্ট হইত। এই ছোকরা তাহার কে যে তাহার উপর এত টান? আশ্চর্য্য! ছোকরাটারও কি যে গুণ যেখানে যায় সেখানেই সকলকে আপন করিয়া ফেলে!

কালী পত্নীকে বলিল, "ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারবে না।"

পত্নী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? কলিকালে এমন দরদী বান্ধব কি মিলে? তোমায় আপন ভাইয়ের মত ভালবাসে; আমায় মায়ের মত ভক্তি করে, ভালবাসে ওকে আমার মনে হয় যেন—" কালী বিরক্ত হইয়া বলিল, "থাক্, থাক্, আর বল্‌তে হবে না।—বুঝেছি। হাকিম বলেইত এত আদর!" পত্নী অবাক্ হইয়া ভাবিল, "আশ্চর্য্য লোক!" বড়দিনের সময় ভবতোষ কালীর জন্য ভাল জুতা, কোট, কালীর স্ত্রীর জন্য খুব দামী সাড়ি, বডিস্, এসেন্স সাবান উপহার লইয়া গিয়া বলিল, "তোমায় সোণার বালা দিব ভেবেছিলাম বৌদি, তা এবারে পারলাম না। কল্‌কাতা যাকে ৫০০৲ প্রণামী দিলাম, হারুদাকে ৩০০৲ টাকার এক জোড়া শাল দিতে হ'ল। পুজায় তোমায় দেব।" কালীর স্ত্রী উপহারগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া ম্লান মুখে বলিল, "এগুলো নিয়ে যাও ঠাকুর পো—আমার আছে।" ভবতোষ বলিল, "থাকনা, আরও এক সেট হ'ল।" কালীর স্ত্রী ছল ছল চোখে বলিল, "তোমার স্নেহের ঋণ শোধ দিবার নয় ঠাকুরপো। কিন্তু এগুলি যে রাখ্‌তে পারি না। সে কথা বলবারও নয় সইবারও নয়। তুমি ওর মেজাজ ত জানই, তোমার আদাটা ভত পছন্দ—" তাহার চক্ষু হইতে প্রবলবেগে জল নামিয়া আসিল। ভবতোষের চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল, নিজকে সামলাইয়া বলিল, "আশ্চর্য্য লোক! আচ্ছা যদি তোমায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন 'এসব কে দিয়েছে?' তুমি বোল 'আমার ছেলে।' নাও, এগুলো তুলে রাখ।" কিন্তু সেই হইতে ভবতোষ আর কালীর বাড়ী যাইত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ত্রিশ টাকায় শিমলাতে বাড়ী ভাড়া, খোরাক পোষাক ইত্যাদি চালাইয়া দুজন লোকের কিছুতেই চলে না, বিশেষতঃ কালীকৃষ্ণ ভাল খাইতে পরিতে ভালবাসিত।

ভবতোষ পূর্ব্বে বৌদির হাতে জোর করিয়া ৫০।৬০৲ গুঁজিয়া দিত। কিন্তু এখন কালীর স্ত্রী স্বামীর অনভিমতে টাকা লইতে স্বীকৃত হইল না, ভবতোষও সে বাড়ীতে যাইত না, কাজেই কালীর প্রতিমাসে ঋণ হইতে লাগিল। ক'মাসে প্রায় ৫০০৲ ঋণ হইয়া পড়িল: সে সাহেবী ছাড়িলে থাকিত। পাওনাদারেরা ঋণের তাগাদায় তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। কালী একটু মুখের কথা কহিলেই ভবতোষের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারিত কিন্তু ঐ 'বাঙ্গালের' কাছে টাকা ভিক্ষা করিয়া নীচ হইবে! তার চেয়ে অনাহারে মরা ভাল। কিন্তু পাওনাদারের তাগাদা যে মৃত্যুর অপেক্ষা অনেক বেশী যাতনাদায়ক। কালী তাগাদা ও অপমানের চোটে অস্থির হইয়া পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিল, নিজের গৃহের সাজ সরঞ্জাম বিক্রয় করিল, তাহা বাজালী হইল, ৪০০৲ টাকা ঋণ রহিল।

একদিন আফিসের বড় সাহেব তাহার হাতে একটা বিল দিয়া বলিলেন, "ভবতোষ বাবু হইতে ১০০০৲ টাকা লইয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকট মনিঅর্ডার করিয়া আইস।" কালী বিল দিয়া ভবতোষ হইতে 'নোটের তাড়া' আনিল। পোষ্টাফিসে যাইতে যাইতে একটা দুর্ব্বুদ্ধি হইল, "এই নোটের তাড়া আত্মসাৎ করিলে ধরা না! কেবল একশ টাকা মনিঅর্ডার করি, রিসিটে একশ স্থানে হাজার লিখিয়া সাহেবকে দি। সারিতে পারিলে ভালই, ধরা পড়িলে না হয় জেল হইবে। আর পাওনাদারের তাগাদা, অপমান, অনটন সহ্য হয় না। পত্নী দুদিন অর্দ্ধাশনে আছে, আমার এই ছিন্ন ভিন্ন বেশ। চারিদিকে দারিদ্র্যের কালিমা, অভাবের ভ্রূকুটি,—আর পারি না। এখন দুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছি। এ অবস্থায় লোকে জাল, জুয়াচুরি, খুন করে, আমিও করি।"

তাহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিল, সে অগ্রপশ্চাৎ ভুলিল। পথে কয়েকটি পাওনা দারের সাক্ষাৎ মিলিল, তাহারা কটূক্তি করিতে লাগিল। কালীকৃষ্ণ ভাবিল 'হাতের মুঠায় টাকা থাকিতে কেন ধাক্কাধান সহ্য করি!' সে অর্থশোষ করিতে করিতে চলিল।

বাড়ীতে যখন পৌঁছিল তখন হাতে ১০৫৲ টাকা। পত্নীকে বলিল, "উপুরি খাটিয়া ইহা মিলিয়াছে। বহুদিন পরে আজ একটু লুচি মোহনভোগ খাওয়া যাক।" সে ময়দা, ঘি সুজি কিনিয়া আনিল। পত্নী লুচি ভাজিল। কালীকৃষ্ণ একটি লুচির কোণা ভাঙ্গিয়া কেবল মুখে দিবে এমন সময় কে বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিল, "কালীকৃষ্ণ!" কালীকৃষ্ণ বুঝিল পুলিশ আসিয়াছে, খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ছুটিল, কিন্তু এড়াইতে পারিল না।

কালীর পত্নী সব শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। হায় আজ এই বিদেশে কে রক্ষা করিবে! একমাত্র বান্ধব ভবতোষ, কিন্তু স্বামীর ব্যবহারে সেও ত লাঞ্ছিত হইয়াছে।

একা গৃহের মেঝে লুটাইয়া লুটাইয়া কালীর পত্নী কাঁদিতে লাগিল; ভগবান এ কি করিলে! সহসা মনে হইল, "একবার ভবতোষকে লিখি যদি সে পূর্ব্ব অপমান ভুলিয়া সাহায্য করে।" কালীর পত্নী একটি চিঠী লিখিয়া পাশের বাড়ীর ঝিয়ের খোসামুদী করিয়া লোক দ্বারা চিঠী ভবতোষের নিকট প্রেরণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কালীকৃষ্ণকে মনিঅর্ডার করিতে পাঠাইয়া সাহেব রিসিটের জন্য বসিয়াছিলেন। ক্রমে দুটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা বাজিল কালী ফিরিল না। সাহেবের সন্দেহ হইল। সাহেব থানার দারোগাকে সংবাদ পাঠাইল,—কালী ১০০৲ টাকা সহ ধরা পড়িল। বেচারা ৫৲ টাকার ময়দা, ঘৃত কিনিয়া আহারের উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু একটু খাইতেও পারিল না,—অদৃষ্ট।

কালী দেখিল বাঁচিবার উপায় নাই, মিথ্যা বলিলে বেশী শাস্তি হইবে। সে সব খুলিয়া বলিল। সাহেব বলিল, "কেন এরূপ দুর্ম্মতি হইয়াছিল?" ক্ষীণস্বরে কালী বলিল, "অভাবে।" বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা হাসিয়া বলিল, "অভাব যেন কার একলার।" দু একটি সহৃদয় কর্ম্মচারী সাহেবকে বলিল, "অনুতাপ হইয়াছে, ছাড়িয়া দিন।" সাহেব করুণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দারোগা সাহেবকে বল, আমার আপত্তি নাই।"

যাগোগ্য সাহেবের চোখের ইঙ্গিত বুঝিয়া কহিল, "আমরা জাতের চাকর। নিরুপায়,—অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারি না।" কালীকে হাজতে রাখা হইল। বৈকালবেলা ভবতোষ কালীর পত্নীর চিঠী পাইল। পাইয়া একটু ভাবিল। বেয়ারা হইতে একটা খাতা খুলিয়া কি একটু কাটাকাটি করিল, একটু লিখিল। তারপর পোষাক পরিয়া, গাড়ী ডাকাইয়া ব্যস্তভাবে বড় সাহেবের বাঙ্গলায় উপস্থিত হইল। বড় সাহেবকে ইংরাজীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিল।

সাহেব বলিল, "সত্যি, এমন ভুল?"

ভবতোষ চোক গিলিয়া বলিল, "হা সাহেব। আমি ১০০৲ টাকার বিল পাইয়া অমনি দশখানা নোট তাহার হাতে দি। আমার ধারণা ছিল উহার প্রত্যেক নোটই একশ টাকার। কিন্তু এখন তহবিল খুলিয়া দেখিলাম ১০০৲ টাকার নোটগুলি সব আমার বাক্সে রহিয়া গিয়াছে, তাহার বদলে ১০৲ টাকার দশখানা নোট দিয়াছি।" সাহেব যেন ভবতোষের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, ভবতোষের মুখ কেমন লাল হইয়া গিয়াছিল, স্বর কেমন কাঁপিতেছিল। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া অন্যমনস্ক ভাবে, বলিলেন, "তবে কালী বাবু অমন স্বীকার করিল কেন?"

ভবতোষ বলিল, "ভয়ে। অস্বীকার করিলে যদি পুলিশে উৎপীড়ন করে। সহায়হীন গরিব বেচারা, বিদেশে কে তাকে সাহায্য করিবে? আমি যাহা দিয়াছিলাম সে বিশ্বাস করিয়া আর গণে নাই; পোষ্টাফিসে' মনিঅর্ডার করিতে যাইয়া নোট গণিয়া মাথায় হাত দিয়া পড়িয়াছে,—সাহস করিয়া তোমাকেও বলিতে পারে নাই।"

সাহেবের দয়া হইল, বলিল, "এমন? আচ্ছা আমি ওকে খালাস দিতেছি,—এবং আরও ১০৲ টাকা বাহিনা বাড়াইয়া দিতেছি।" ভবতোষ সাহেবকে তাঁহার দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইল। কালীকৃষ্ণ খালাস পাইল।

খালাস পাইয়া কালীকৃষ্ণ সব শুনিল। সে জানিত তাহার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব কিন্তু যখন সাহেব যাইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিল, "আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম বাবু। তুমি যে উৎপীড়নের ভয়ে 'চুরি করিয়াছি' বলিয়াছিলা তাহা আমি বুঝি নাই। কিন্তু এখন ভবতোষ বাবু বলিলেন তিনি তোমায় ১০০৲ দিয়াছেন। বাবু তোমায় মিছামিছি হয়রাণ করিলাম, এমন ভুল অনেকের হয়—আমায় ক্ষমা কর।—"

কালীকৃষ্ণের হৃদয়ে আজ এক অপূর্ব্ব ভাব জাগিল। ভবতোষ এতদিন তাহার নিকট যে মূর্ত্তিতে ছিল আজ তাহা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গেল। আজ তাহার মনে হইল ভবতোষ স্বর্গের দেবতা, তাহাকে ছলনা করিতে মর্ত্তে আসিয়াছে। আজ তাহার হৃদয় অনুশোচনায় পুড়িয়া যাইতে লাগিল, এই দেবতার বিরুদ্ধে সে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাকে কত প্রকারে উৎপীড়ন করিয়াছে! লজ্জায় কোথে তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে যাইয়া ভবতোষের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিল, হায় এমন দেবতাকে সে কত লাঞ্ছিত করিয়াছে!

ভবতোষের মনে হইল "ঐ নোটের তাড়ার এই গুণ। তাইত আজ এত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে! আশ্চর্য্য। এতুচ্ছ জিনিষ হইতে আজ এ কি মধুর পরিবর্ত্তন ঘটিল।" ভবতোষ আজ উৎফুল্ল হৃদয়ে কালীর বাসায় যাইয়া যৌথির তৈয়েরী আলুর চপ খাইয়া আসিল, কালী আজ স্বয়ং তাহাকে পিড়ি পাতিয়া বসিতে দিল।

নবম পরিচ্ছেদ

(উপসংহার)

পূজার বন্ধে সকলে কলিকাতা মিলিত হইল। ভবতোষের প্রতি কালীর হিংসার ভাব দূর হইয়াছে শুনিয়া হরিত অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কালী অকপটে তাহার ক্রূর ব্যবহারের কথা বলিল—হৃদয়ের পাপ ব্যক্ত করিয়া মুক্ত হওয়া উচিত। হরিত আজ বুঝিল ঐ চিঠীতে ভবতোষের হস্তাক্ষার কিরূপে আসিয়াছিল। তাহার ভগ্নী সমস্ত শুনিয়া লজ্জিতা হইলেন। কালী যাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

শান্তির অগ্নিতে পুড়িয়া কালীর পাপপূর্ণ হৃদয় আজ নির্ম্মলা হইল। হরিত তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ

করিল। ভবতোষের এক দাদা ছিল, দুই দাদা পাইল।

হরিতের মাতা ও ভবতোষের মাতা স্বশ্রূষা হইতে দুটি সজীব পরী আনিলেন। বুধবারের সহিত দুই পুত্রের বিবাহ দিলেন।

কালী আসিয়া বলিল, "এতদিন ভ্রাতারা যদিন মুখে জীবন যাপন কচ্ছিল, আজ এদের হাসি দেখে নয়ন জুড়াবে।—" কালীর পত্নী দুষ্টুমী করিয়া বলিল, "ইহা ঐ নোটের তাড়ার গুণ।—" অর্থাৎ সেই কাণ্ড না হইলে কালীর হিংসার আগুন এ জন্মে নিবিত না—সকলে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

৺উপেন্দ্রকিশোর

"সৌরভের" "সাহিত্য-সেবকে" যখন আমি উপেন্দ্র বাবুর কথা লিখি—তখন জানিতাম না ঐ সংবাদ পাইয়াই চিত্রগুপ্ত হাসিয়াছিলেন।

উপেন্দ্র বাবু চলিয়া গিয়াছেন,—যেমন আর দশজন যায়—তেমনই গিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবুর বিশেষত্ব কোথায় তাহা বুঝিবার মত মানুষ আমরা নহি—এই বাঙ্গলা দেশেই বিরল। তাঁহার প্রতিভার বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি, উপেন্দ্রকিশোরের মত সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি বড় বেশী দেখা যায় না। এই শক্তির উন্মেষ বাল্যকালেই হইয়াছিল। যে ব্যক্তি কৈশোরে বিদ্যালয়ের পথে খেয়ালার গৎ শুনিয়া বাড়ী আসিয়া, নূতন খেয়ালা কিনিয়া আপন চেষ্টায় সেই গৎ আয়ত্ত করে—তাহার ক্ষমতা বড় সাধারণ নহে। এইরূপ শক্তি ছিল বলিয়াই উপেন্দ্রকিশোর রাত্রিতে পরম কাকার উপর পাঠের ভার দিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া থাকিতেন এবং কাকা মহাশয়ের আবৃত্তি শুনিয়া আপন পড়া তৈরি করিতেন। সেবারের সময় উপেন্দ্রকিশোর পরম বাবুকে ডিঙাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৲ টাকার বৃত্তিও লাভ করিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের পিতার নাম কালীনাথ রায়। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জের মসুয়া গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইনি তামসুন্দর মুন্সী নামেই সমধিক পরিচিত। উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ সহোদর অধ্যাপক দারদারঞ্জন রায় ও কনিষ্ঠ অধ্যাপক সুকুমারঞ্জন, চিত্র-শিল্পী সুনয়নরঞ্জন এবং রায়সাহেব প্রমদারঞ্জন। উপেন্দ্রকিশোরকে কালীনাথ রায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা জমিদার হরিকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর হরিকিশোর বাবুর দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। এক পুত্র শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। পৈত্রিক সম্পত্তি উপেন্দ্রকিশোর ও নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগ বণ্টনে উভয় ভ্রাতা যে সৌজন্য ও উদারতা দেখাইয়াছেন, তাহা অর্থ-বিভাগে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

উপেন্দ্রকিশোর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটন কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বর্গীয় কালীকান্ত দাস (কাশীবাবুর) মহাশয় বলিতেন, "উপেন্দ্রবাবু বি, এ পরীক্ষার সময় বড় বেশী পড়াশুনা করেন নাই। কিন্তু পরীক্ষা দিয়া আসিলে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপেন্দ্র, তুমি কোন্ সাহসে পরীক্ষা দিতে গেলে?" উপেন্দ্র বাবু অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "যে সকল প্রশ্ন হইয়াছে তাহাতে উত্তীর্ণ না হইয়াই পারিতেছি না। ঐ ঐ 'লেকচার' আমি শুনিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম।" উপেন্দ্রবাবু উত্তীর্ণ হওয়ার পর উক্ত বাবু না কি বলিয়াছিলেন, "উপেন্দ্রও বি, এ, পাশ হইল দেখিতেছি! ইহাকে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ভিন্ন আর কি বলা যায়?

যখন স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন বাঙ্গালীর শিশুদিগের জন্য "সখা"র প্রচার করেন উপেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায়। শিশু-সাহিত্যে উপেন্দ্রবাবুর সমকক্ষতা করিবার মত আর কেহ নাই। তাঁহার লেখনীমুখে যে সরল ও সহজ ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে এমনটী আর নাই। তাঁহার ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত, মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই, সেকালের কথা বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে অপূর্ব্ব সামগ্রী। উপেন্দ্রবাবুর 'সখা','সখা ও সাথী' এবং 'মুকুলে' যে সকল

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের আনন্দের অবধি থাকিত না। মধ্যে মধ্যে হাস্য রসাত্মক গল্পও প্রকাশিত হইত। ঐ গল্প একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য উপেন্দ্রবাবুকে আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম, হায় তিনি আমাকে যে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না।

উপেন্দ্রবাবু কবিতা লিখিতে পারেন এ ধারণা কাহারও ছিল না। কিন্তু তাঁহার "ছোট রামায়ণ" পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচয় তাঁহার "ব্রহ্মসঙ্গীতে"ও প্রকাশিত।

ললিতহস্তায় উপেন্দ্রবাবুর অসাধারণ খ্যাতি তাঁহার চিত্রাঙ্কন পারদর্শিতায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপেন্দ্রবাবুর তুলিকায় যেমন হুবহু ফুটিয়া উঠিত, তেমনটি আর দেখা যায় না। যখন উপেন্দ্রবাবুর 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে অতি কদর্য্য চিত্র দেওয়া হয়। এই খানেই তাঁহার হৃদয়ে হাফটোন ব্লক প্রস্তুত করিবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। তাহার ফলে—একমাত্র উপেন্দ্রবাবুরই যত্ন, অর্থব্যয় ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ বঙ্গের মাসিক পত্র সমূহ মনোহর চিত্রসমূহে সুসজ্জিত হইতেছে। এই কার্য্যে সফলতা লাভের জন্য তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন।

এই ভাবে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের চিত্রশিল্পীগণ উপেন্দ্রবাবুর চিত্রশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গালী চিত্রকরের ভাগ্যে এই শ্রেণীর প্রশংসা এই প্রথম। আপন চেষ্টা, অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে উপেন্দ্রকিশোর চিত্রশিল্পে যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সঙ্গীত ও বাদ্যে উপেন্দ্রবাবুর অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঁহার মত উৎকৃষ্ট বেহালাবাদক বাঙ্গালী আর কয়জন আছেন জানি না। তাঁহার বেহালাখানির মূল্য এত বেশী, যে অনেকে তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া যায়। উপেন্দ্রবাবু উত্তম বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার "হারমোনিয়ম শিক্ষা" ও "বেহালা শিক্ষা নামে দুই" খানা বহি আছে। হারমোনিয়ম শিক্ষায় ভারতীয় সঙ্গীতের অবাপতন হইতেছে বুঝিয়া, তিনি ঐ গ্রন্থের আর সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিতেন, "বেহালা, সেতার, বীণা, বাঁশী প্রভৃতি শিক্ষনীয় এবং ইহাতে সঙ্গীত বিদ্যার অঙ্গ পরিপুষ্ট হয়। হারমোনিয়মে উহার অঙ্গহানি হইয়া থাকে।" "প্রদীপ" পত্রে উপেন্দ্রবাবু বেহালা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রবাবু অর্থ উপার্জ্জনকে জীবনের মুখ্যউদ্দেশ্য থাকুক—গৌণউদ্দেশ্যও যেন ভাবিতেন না। একবার আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনি শিশুপাঠ্য-সাহিত্য লিখিলে ছেলেদের উপকারও হইত, প্রভূত অর্থও পাইতেন।" উপেন্দ্রবাবু কহিলেন, "এই জন্যই এদিকে হাত দিই নাই। বই লিখিয়া তাহা পাঠ্য করাইবার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখি না।" বস্তুতঃ যে সময় তিনি ছেলেদের রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তখন শিশুপাঠ্য-সাহিত্য লিখিলে আজ তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইতেন।

উপেন্দ্রবাবু যখন প্রদীপে "সৃষ্টির বিশালত্ব" প্রবন্ধ লিখেন তাহার কিছুদিন পর তাঁহাকে একটী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আকাশের কথা" নামে এক খানি ছেলেদের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতেছেন। ঐ গ্রন্থের কতক অংশ মুকুলে প্রকাশিত হয়। শুনিতে পাই উপেন্দ্রবাবু কোনও আত্মীয়ের অনুরোধে ঐ পুস্তক প্রচারে বিরত রহেন। ঐ আত্মীয় ঐ শ্রেণীর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কি উদারতা! কি ত্যাগ স্বীকার!

উপেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমারবাবু চিত্র শিল্পশিক্ষা সমাপনার্থ ইংলণ্ডে গমন করিলে, তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন, "মিঃ রায় যে তাঁহার পুত্রকে চিত্র-বিদ্যাশিক্ষার্থ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আমরা গৌরবান্বিত।

এমন মনস্বী ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ ধন্য। যেদিন উপেন্দ্রবাবুর মনীষার পূজা করিবার মত যোগ্যতা আমরা লাভ করিতে পারিব সে দিন আমারও ধন্য হইব। শিল্পকলায় পাণ্ডিত্য হিসাবে

তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অন্যতম, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বঙ্গে চিত্রশিল্পের নবজাগরণ যাহা এই ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার স্থান নির্ণয়ের দিন এখনো আইসে নাই। কবি বলিয়াছেন :—

"যথায় বাল্মিকীব্যাস, কালিদাস, কাশীদাস
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।"

উপেন্দ্রবাবুও চিত্রশিল্পিগণের সঙ্গে সমান আসনে স্বর্গলোকে বিরাজ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মোসলেম বীরাঙ্গনা

আমতলহাবিব বা হামিদাবানু

আমতলহাবিব, ওস্মানীয় সোল্‌তান বায়জিদ এলদেরেমের সেনাপতি সোলতান এজদানীর প্রিয়তমা কন্যা। এজদানীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাঁহার কন্যাকে তিনি সর্ব্বদা সামরিক পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করিতেন এবং সামরিক কৌশল, রণনীতি, অস্ত্রশস্ত্রাদন, অস্ত্রব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি বিবিধ সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দিতেন পক্ষান্তরে হামিদাবানু রাজাবগুরে অবস্থান নিবন্ধন রাজপরিবারের ছেলে মেয়েদের সংস্রবে থাকিয়া তিনি লিখা পড়াতেও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। হামিদাবানু যৌবনের প্রারম্ভে তাহার স্নেহশীল পিতার সাহায্যে সোলতান বায়জিদের সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। সোলতান বায়জিদ প্রথমাবস্থায় তাহাকে পুরুষের পোষাক পরিধানে এবং সামরিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণে সম্মতিদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে হামিদাবানুর গুণগরিমা, তাহার অসাধারণ যোগ্যতা, বাকচাতুর্য্য, কর্ম্মনিপুণতা ও সাহস বিক্রম দর্শনে সোলতান নিতান্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে সমর বিভাগে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

হামিদাবানু অত্যল্পকাল মধ্যে, স্বীয় প্রতিভা এবং সামরিক যোগ্যতার প্রভাবে ক্রমোন্নতি করিয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হন। হামিদাবানু বিভিন্ন যুদ্ধে এবং সামরিকপ্রদর্শনী ক্ষেত্রে যেরূপ কর্ম্ম-কৌশলতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-মত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সোলতান বায়জিদ তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পড়েন। হামিদাবানু তাঁহার সামরিক কর্ম্মনিপুণতা ও যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ সময় সময় রাজকীয় পুরস্কার লাভে সম্মানিত হইতেন। তিনি ২৪ বৎসর যাবৎ কৌমার অবস্থায় সোলতানের সামরিক বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সৈন্য চালনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেশময় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন।

ইত্যবসরে আমীর তৈমুরের সহিত তুরস্কের সোলতান বায়জিদ এলদরেমের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়। হামিদাবানু এই মহাযুদ্ধে স্বীয় পিতার সহিত যৌর্য্যবীর্য্য ও রণপ্রতাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বলা বহুল্য পরিণামে বায়জিদ এই ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত এবং রণক্ষেত্রে হৃত হন। তৎসঙ্গে হামিদাবানু তাঁহার সেনাদলের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসহ আমীর তৈমুরের হস্তে বন্দী হন। পরদিবস আমীর তাঁহার চির-স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতানুযায়ী বন্দীদিগকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। আমীরের আদেশ পালনে বিলম্ব করার উপায় ছিল না। ঘাতক বন্দীদিগকে হত্যা করার জন্য শৃঙ্খলিত করিতে লাগিল, ইতঃমধ্যে হামিদাবানু সাহসে বুক বাঁধিয়া পূর্ণ নির্ভীকতার সহিত আমীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। আমীর তৈমুর যদ্যপি এক হতভাগ্য বন্দীর ঈদৃশ নির্ভীক ভাবপ্রবণ এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর বাকচাতুর্য্য দর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তদীয় বক্তব্য প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিলেন। হামিদাবানু তরবারির পাশ কাটিয়া নিঃসঙ্কোচভাবে আমীর তৈমুরের অত্যাচার উৎপীড়ন এবং নিরীহ বন্দীদলের সহিত তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার

ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও তৎপ্রতি কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহাকে পূরকালের পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বিশ্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক খোদাতাআলা যে পরকালে অত্যাচারীর নিকট দুর্ব্বলের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয় তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি উল্লেখ করিয়া আমীরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, নিরীহ নিঃসহায় দুর্ব্বল বন্দীদিগকে নৃশংসতার সহিত হত্যা করা কোন্ বীরোচিত কার্য্য? ইহা কি কাপুরুষতা ও চরম নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে? এরূপ ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা কি মোগলবংশের যশোগৌরবের মস্তকে কলঙ্ক-কালিমা লেপিত হইবে না? তোমার দিগ্বিজয়ের ইতিহাস কি চিরকাল নির্দ্দোষ জনসমূহের হত্যাজনিত শোণিতধারায় রঞ্জিত হইয়া থাকিবে না? ঈশ্বরভীতি কি তোমার অন্তরে আদৌ স্থান পায় না? এই বলিতে বলিতে হাবিদাখাতু স্বীয় মস্তক হইতে পুরুষোচিত সামরিক মস্তকাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন এবং শরীরের সামরিক বহিরাবরণ খুলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক নারীবেশ ধারণ করিলেন এবং তিনি যে একজন তুর্কীনারী তাহার পরিচয় প্রদানান্তে পুনরায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন, আমীর প্রবর! মাদৃশ যে জাতির শত শত বীরাঙ্গনা স্বদেশের সম্মান রক্ষা এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়গৌরব বজায় রাখিবার নিমিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে রণক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য ও জাতীয়গৌরব সংরক্ষণ এবং আত্মসম্মান জ্ঞান যে জাতির ভূষণ স্বরূপ, সেই জাতির রাজ্যাধিকার করা এবং সে জাতির পতন কখনও সম্ভবপর নহে তাহা আপনি স্থির নিশ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করুন। তাহারা স্বদেশের সম্মান ও স্বাধীনতা সংরক্ষণকল্পে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একে একে প্রাণদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, অতএব তুরস্ক জয়ের কল্পনা আপনার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আপনি তুর্কীজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাতে যে কেবল তুর্কীজাতির অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা নহে, বরং তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে এস্লামের ও মুসলমান জাতির মহা অধঃপতন সংঘটিত হইবে তাহা নিশ্চিত। আমীর বাহাদুর! আপনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন, সমগ্র ইউরোপে একমাত্র তুর্কীরাই ইউরোপের প্রবল খৃষ্টান শক্তি সমূহের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়া এস্লাম সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিতেছে। ইউরোপে যে এক মাত্র তুর্কীজাতি দ্বারা এস্লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তুর্কীজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ইউরোপভূমি হইতে চিরকালের নিমিত্ত এস্লাম প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, আপনি মোসলেম জাতি ও পবিত্র এস্লাম ধর্ম্মের প্রতি সদয় হইয়া তুর্কীজাতি এবং যুদ্ধের নিরীহ বন্দীগণের সম্বন্ধে সুবিচার করুন। বন্দীদিগকে বধ করার প্রথা জগতের কোন জাতির সমর্থনীয় নহে। কোন সুসভ্য জাতি বা জ্ঞানীলোক যে নিরীহ বন্দীগণের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে পারে তাহা কল্পনায় আসে না। আশ্রিতজনের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন কাপুরুষতার চরম নিদর্শন, অতএব মনুষ্যত্ব, সভ্যতা ও ধর্ম্মতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে আপনার যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় হতভাগ্য বন্দীদের সহিত সেরূপ ব্যবহার করুন ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

আমীর তৈমুরের দরবারে মুখ ফুটিয়া কখনও কেহ কোন কথা উচ্চারণ করিতে সাহস পাইত না, তাঁহার দরবারের মন্ত্রীবর্গের পক্ষেও কোন বিষয় মন্তব্য প্রকাশ করার উপায় ছিল না, তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার সদনে কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না। পৃথিবীর স্বাধীন নরপতিগণ তৈমুরের নাম শ্রবণে এবং তাঁহার কঠোর ব্যবহার ও নৃশংস অত্যাচার কাহিনী শ্রবণে থরথরি কম্পিত হইতেন। এমতাবস্থায় একটী বন্দিনী নারীকে প্রবল প্রতাপশালী আমির তৈমুরের প্রতিকূলে তীব্র সমালোচনা ও তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দাবাদ করিতে দেখিয়া তৈমুর ও তাঁহার সভাসদগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমীর বহুক্ষণ ব্যাপিয়া নারীর সাহস ও

মনের বল দর্শনে স্তম্ভিত ও নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকিলেন এবং পরিণামে বীরাঙ্গনার ন্যায়সঙ্গত সত্য মন্তব্যজনিত প্রার্থনানুযায়ী সমুদয় বন্দীগণের প্রাণদান করিলেন। অতঃপর আমীর হামিদাবানুর রূপলাবণ্য ও তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ সাহস ও রাজনিপুণতা ইত্যাদি গুণ পরিষায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। হামিদাবানু প্রথমতঃ তাঁহার সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু পরিণামে উপায়ন্তর না দেখিয়া আমির হুমায়ুনের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

হামিদাবানু আরবী, ফার্সী, তুর্কী ও জয়দন্তী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কবিত্বশক্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি নীতিজ্ঞান ও বীররসের কবিতা লিখিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

সম্রাট হুমায়ুনের আগ্রাস্থ দুর্গের শাসনকর্ত্তা শরিফ হাসন বিদ্রোহাচরণ করিলে, আমীরের অনুমতিক্রমে, হামিদা বেগম বাদশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়িকারূপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি প্রবল ঝটিকাবৎ দ্রুতগতিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আগ্রাস্থ দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং বিদ্রোহী গবর্ণরের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে বীরধর্ম্মানুযায়ী তাহাকে বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণের জন্য পত্র লিখিলেন। শরিফ হাসন প্রত্যুত্তরে নিতান্ত বিনয় সহকারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া বশ্যতা স্বীকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সরলা বেগম তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চাযোগে নিশ্চিন্তমনে সসৈন্য নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে কপট ও ধূর্ত্ত শরিফ হাসন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কূটনীতির পরিচয় দিতে বিরত হইল না। তিনি গভীর রাত্রিতে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক একদল প্রবল রণনিপুণ বাহিনী লইয়া হামিদাবানুর নিদ্রিত সৈন্যদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। হাসনের সৈন্যদল হামিদাবানুর সৈন্যশিবির অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিজ শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে, ইতামধ্যে সৈন্যগণের কোলাহল পরম্পরায় এবং অস্ত্রশস্ত্রের সংঘর্ষ ঝঙ্কারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি অতিকষ্টে তাঁহার সামরিক পোষাক পরিধানের সুযোগ পাইলেন। তিনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বুক বাঁধিয়া রণবাদ্য বাজাইয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে জাগ্রত করিলেন এবং অবিলম্বে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক, শত্রুসংহারে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে রণসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। হাসনের সৈন্যগণ বেগমকে চতুর্দ্দিক হইতে অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। হাসন তাঁহার সৈন্যদিগকে পুনঃপুনঃ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, সাবধান, হামিদা বেগম যাহাতে জীবিতাবস্থায় ধৃত হয় তাহার ব্যবস্থা কর, অস্ত্রাঘাতে যাহাতে সে নিহত না হয় তৎপ্রতি সকলেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বেগম অশ্বারোহণে নিতান্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। তিনি একাকিনী সকলের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শরিফ হাসনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বেগমের সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হইল। হামিদাবানুর নিক্ষিপ্ত অব্যর্থলক্ষ্য তীরের আঘাতে হাসনপুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন। হাসন এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে শোকে ও ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোরতর রব করিয়া বেগমের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া বেগমকে গ্রেফতার করিতে পুনঃপুনঃ আদেশ জারী করিতে লাগিলেন। বেগম বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে অস্ত্র চালনা করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছিলেন। ইতঃ মধ্যে তাঁহার নিদ্রিত ও ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া রণনিনাদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বেগম অস্ত্র পশ্চাৎ বামে দক্ষিণে, চতুর্দ্দিকে অধাবিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকমতে বাণবর্ষণ, তরবারি সঞ্চালন, বর্শা চালনা ইত্যাদি নানা সামরিক কৌশলে আত্মরক্ষা ও শত্রু-সংহারে তৎপরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

সারারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তীর, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রাঘাতে বেগমের শরীরের নানাস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যুদ্ধের অবসান হইল। শরীফ হাসনের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। বেগম যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে যেমন তিনি স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন তদ্রূপ তাঁহার বহু সৈন্য হতাহত হওয়ায় তিনি নিতান্তই চিন্তাতুর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিহত সৈন্য সংখ্যা তিন সহস্রে পরিণত হইয়াছিল। তিনি নানা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অত্যন্তীভাবে দুর্গাবরোধ উঠাইয়া লইলেন। সেখান হইতে ৩০ মাইল ব্যবধানে সরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে লইয়া বিশ্রাম এবং আহত সৈন্যদলের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় আরখর দুর্গ অধিকার করা আবশ্যক মনে করিয়া সেদিকে অভিযান করিলেন। দুর্গ হাসন সর্ব্বদা বেগমের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। তিনি বেগমের অভিযান সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া দুর্গ হইতে ৭ মাইল অগ্রসর হইয়া বেগমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হামিদা বেগমের রণকৌশল, অদম্য উৎসাহ এবং অসীম সাহসের কল্যাণে শত্রুসৈন্য সম্মুখসমরে পরাজিত হইল। শত্রুদলপতি হাসন শরিফ রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র কন্যা সকলেই বন্দী হইল। হামিদা বেগম তাহাদের সহিত নিতান্তই উদার ও ভদ্র ব্যবহার করিলেন। আরখর দুর্গ একজন বিশ্বাসী সামরিক পুরুষের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক হামিদা বেগম বিজয়োল্লাসে মহা সমারোহের সহিত তৈমুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তৈমুরবংশীয় মোগল সম্রাট ও সম্রাট-পুত্রগণ শৌর্য্যবীর্য্যে ও সাহস বিক্রমে অতুলনীয় ছিলেন ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, কিন্তু মোগল রাজপরিবারের নারীগণও যে সাহস বিক্রমে ও রণকৌশলে তাঁহাদের স্বামী ও ভ্রাতৃগণের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "বাবর নামা" "হুমায়ুন নামা" "তবকেতে আকবরী" ইত্যাদি মোগল রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৈমুরবংশীয় মহিলাগণ পুরুষগণের অনুকরণে সর্ব্বদা যুদ্ধের পোষাকে নিজদের অঙ্গ ভূষিত করিতেন, সামরিক অস্ত্রচালনায় অভ্যাস করিতেন, অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, শিকার কার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন, ব্যাঘ্রহত্যায় আমোদ উপভোগ করিতেন, ধনুর্ব্বিদ্যায় এবং বলক্রীড়ায় তাঁহারা বেশ পারদর্শিতা লাভ করিতেন। ফলতঃ সামরিক-জীবনের অনেক গৌরবজনক কার্য্যই মোগলমহিলাগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত। (আল এস্‌লাম)

নারীর অধিকার

বিগত কার্ত্তিক মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'নবদ্বীপে মাতৃমন্দির' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"তুমি সমাজ—তুমি ত শুধু পুরুষের সমাজ। পুরুষ সর্ব্ববিধ পাপ ও লালসাতে ডুবিয়া-ভাসিয়াও তোমার মধ্যে মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তোমার যত শাস্তি, যত নির্য্যাতন, দুর্ব্বল নারীর উপর।"

আরও একস্থলে লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তুমি সমাজ যতই চোখ রাঙ্গাও না কেন, আমি জোর করিয়া বলিব, ইহা তোমার সৃষ্টি। তোমার বিধি, তোমার ব্যবস্থা, তোমার প্রথা, অনুশাসন—ইহারাই এই সকলের মূল।"

বাস্তবিক দুর্ব্বল নারীর উপর সমাজ কোন নির্য্যাতন করিতেছে কি না, পুরুষের পক্ষে সর্ব্ববিধ পাপ ও লালসায় ডুবিয়া থাকিয়া মাথা উন্নত করিয়া থাকিবার অধিকার আছে কি না এবং সমাজই বিধিব্যবস্থা প্রচার করিয়া এই সমস্তের সমর্থন করেন কি না—তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে।

অধুনা আমাদের নব্য সমাজের তেমন কোন ক্ষমতাই নাই যে নূতন করিয়া বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া নারীর নিপীড়ন করিবে। নারীর নির্য্যাতন জন্য নব্য

সমাজের কোন বিধিনিষেধ যে এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই—তাহা সকলেই জানেন। তথাপি সমাজে যদি নারী-নির্য্যাতন হয়, তবে তাহা প্রাচীন সমাজের বিধি, নিষেধ, অনুশাসনের ফলেই হইয়াছে, বলিতে হইবে। এবং পুরুষের পাপলালসায় ডুবিয়া থাকিয়া মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইবার অধিকারেরও যে প্রাচীন সমাজ বিধি-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহাও মানিতে হয়।

কথা যখন এই, তখন সমাজের পুরাতন পুঁথি ঘাঁটিয়া, ইতিহাসের দ্বারা বাহির করিয়া—অবশ্য নজির বাহির করা—তেমন শক্ত কথা নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার আছে। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের ফলে—দুই একখানা স্মৃতি-সংহিতার বাঙ্গলা অনুবাদ দেখিয়া এবং পরের মুখে ঝাল খাইয়া অনেক মীমাংসা করা যায় বটে; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি লইয়া আলোচনা করিতে বসিলে অনেক সত্য বাহির হইয়া পড়ে।

আমাদের আধুনিক সমাজে এমন কতকগুলি কুসংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, সমাজের কোথাও একটা কোন কিছু দুর্ব্বলতা দেখা গেলে সেটাকে হিন্দুজাতির একটা প্রকাণ্ড অনুদারতার ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বিশেষতঃ হিন্দুজাতির বিশেষত্বের ও উদার সমাজ-তত্ত্বের কষ্টিপাথরে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘসিয়া মাজিয়া না লইয়া একটা আজগুবী যাহা-হউক-সত্যের উপর নির্ভর করিয়া এবং পাশ্চাত্য অপরিপুষ্ট অসংগঠিত সমাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া যাঁহারা একটা বিরাট্ মতবাদ চালাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে গোড়ায় মস্ত ভুল করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভুলের ফলেই একটা প্রবল জিজ্ঞাসাও যেন অনবরত চারিদিকেই ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সেই জিজ্ঞাসার অনুরূপকল্পে সমাজেরও যে সাড়া পাওয়া যাইতেছে না—তাহা নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসার উপযোগী এখনও সমগ্র উত্তর প্রস্তুত হইয়া না উঠিলেও এবং থাকিয়া সেই উত্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদুপযোগী চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোক প্রস্তুত হইয়া না উঠিলেও তদ্বিষয়ক আলোচনা বন্ধ কি?

নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে যখন কথা উঠিয়াছে, তখন নারীর শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের আলোচনা করা যাইতে পারে।

পুরুষ ও নারী সমাজের নিকট তুল্যাধিকার পাইবার যোগ্য কি না, এবং পুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা নারীর পক্ষে সম্ভব কি না, এবং পুরুষের চিত্তবৃত্তির মত নারীর চিত্তবৃত্তি ঠিক একই উপাদানে গঠিত কি না, তাহা লইয়া বিচার করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় অনেকটা আলোচনা সহজ হইয়া আসে। পুরুষ যে জিনিষটা ভালবাসে, পুরুষের প্রকৃতিতে যে বস্তুটা ঠিক খাপ খায়, পুরুষের চিত্তবৃত্তি যতটা গ্রহণ করিবার উপযোগী, হয় ত নারীচরিত্র তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। এস্থলে উভয়ের ওজন বুঝিয়া অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিলেই সমাজে তুল্যাধিকার দেওয়া হয়। পুরুষ দশ ক্রোশ হাঁটিতে পারিলে নারীর পাঁচ ক্রোশ হাঁটার শক্তির সঙ্গে তুল্যাধিকার। দশ ও পাঁচ সমান না হইলেও, হাঁটার পরিমাণগত শক্তিটা কিন্তু উভয়ের সমান। এই জন্য এই দিক দিয়া স্ত্রীপুরুষের অধিকার ঠিক রাখা কর্ত্তব্য। সংসারধর্ম্মটার ভিতরও এই দিক দিয়াই স্ত্রীপুরুষের অধিকার বিবেচনা করিতে হয়। আজকাল ইহা একবাক্যে অনেক পাশ্চাত্য সুধীগণও স্বীকার করেন যে, পুরুষপ্রকৃতির সহিত নারীপ্রকৃতির পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে বলিয়াই পুরুষের কর্ত্তব্যের সঙ্গে নারীর কর্ত্তব্যের বৈষম্য বিধি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম। এই বৈষম্যই বস্তুতঃ স্ত্রীপুরুষের সাম্যের ও তুল্যাধিকারের মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠে। এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য আছে বলিয়াই যত বিরোধ, যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যত অনর্থক, এক কথায় ভারতীয় সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এখনকার কথা স্বতন্ত্র। আমরাও এই অধিকার বিচারের ভিতর দিয়াই নারী-জীবন আলোচনা করিব।

"কন্যপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন-সমন্বিতা॥"

এই বচনে শৈশব-কালে নারীর পালন ও শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য নারীর এই শিক্ষা পুরুষের সহিত আমিতি পরিমিতি বা ভূয়োদ ইতিহাসের সঙ্গে সমান না হউক—তাহার অন্তঃকরণের উপযোগী—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইত। এখানেও সেই অধীকারের কথা।

তারপর—

"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধূশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভৈক্ষ্যচর্য্যা চেতি। সদ্যোবধূনাং উপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ।" (হারিত)

এই বচনে অধিকার হিসাবে নারীর মধ্যে দুই রকম ভাগ দেখা যাইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী হইবার অধিকার লাভ করিতেন, তাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি পুরুষোচিত সমস্ত কর্ত্তব্যকর্মই করিতে পারিতেন; যাঁহাদের সেরকম অধিকার ছিল না, তাদৃশ নারীগণের জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা, এবং বেদে অনধিকার বলিয়া যে একটা কথা আছে—তাহারও ব্যবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে নারীর বেদাধ্যয়ন কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং সহধর্ম্মিণী। বেদনির্দ্দিষ্ট সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে যখন সংসারী মানবের কর্ত্তব্যতা আসিয়া পড়ে, তখন স্ত্রীপুরুষে পৃথক্ ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি করিলে, ধর্ম্মাচরণের বৈধিষ্য আসিয়া পড়ে। পুরুষের একটা ধর্ম্ম এবং নারীর একটা আলাহিদা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নারী আর পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সংসারের কর্ত্তব্যরাশির ভিতরে স্ত্রীপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিধিব্যবস্থা থাকিলে দুইটা আলাহিদা সংসারই গড়িয়া উঠে। এইজন্য স্ত্রীর বেদে অধিকার থাকিলেও স্বাধীনভাবে অধিকার নাই। বেদ বলিলে শুধু গ্রন্থখানা পড়া বুঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের কথাও আসিয়া পড়ে। কাজেই

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং
পতিং শুশ্রূষতে যস্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

এই মনুর বচনটা আসিয়া পড়ে। এখানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে পুরুষের সঙ্গে নারীর এই যে বৈষম্য তাহা অনুদারতার ফল নহে—অধিকারেরই সুন্দর ফল। কাজে এখানেও 'স্ত্রীণাং' বলিতে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীর কথা বলা হয় নাই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবাদিনীদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই জন্যই সেদিনকার—"ন্যায়প্রকাশে"র টীকাকার ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন'—

"আত্রেয্যাদীনামিব যাসাং স্ত্রীণাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জায়তে তাসামুপনয়ন-বেদাধ্যয়নাদাবধিকারাৎ যাগেঽপি স্যাদেবাধিকারঃ।"

(ন্যায়প্রকাশের টীকা।)

এই জন্যই তদ্বস্তুতির উত্তরচরিতে "আত্রেয়ী"র বেদান্ত পড়ার কথা পাই। এবং সীতা সাবিত্রীদের ন্যায় নারীগণের বধূ হওয়ার কথাও রামায়ণ মহাভারতে পাওয়া যায়। বধূজীবনে নারীগণের এই যে পতিশুশ্রূষা, ইহার মধ্যে দাসীবৃত্তির একটা উৎকট কল্পনা অনেকে করিতে পারেন বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে সে কথা মনে আনাও অন্যায়। মনুতেও—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে" বলিয়া নারীপূজারও বিধান দেখা যায়। ফল কথা, পতিশুশ্রূষা বা নারীপূজার অর্থ এমন নহে যে স্বামী দাসের ন্যায় জীবন যাপন করার বিধি দেওয়া হইয়াছে। পরস্পর শ্রদ্ধাপ্রীতিই এই বচনদ্বয়ের তাৎপর্য্য। তথাপি পাতিব্রত্যহিসাবে নারীর অধিকারের মধ্যে একটু নম্রতা থাকিলেও তাহাতে কিছুই অপমানের বিষয় নাই। দেবতার উপাসনায়, পিতৃভক্তিতে বা গুরুভক্তিতে মানবের যেমন অপমানের কথা দূরে থাকুক সম্মানের কথাই পাওয়া যায়, এখানেও পতি-দেবতার শুশ্রূষায় তেমনি অপমানের কথা কেন আসিবে —তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই উচ্চনীচতাই এখানে স্ত্রীপুরুষের ভিতরে অধিকারের সমতা আনিয়াছে। এই জন্যই পুরুষের কার্য্যের সঙ্গে নারীর কার্য্যের তুল্যাধিকার দেখিতে গেলে উভয়ের দিক্ দিয়াই দেখিতে হয়। সন্তানপালন হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহক্ষেত্রের উপযোগী নারীর সমস্ত কার্য্যাবলির সঙ্গে পুরুষের কঠোর কর্ম্মজীবনের অধিকারের পরিমাণটা তাহার দিক্ দিয়া না দেখিয়া বিবেচনা করিলে কোন

জায়গায় বৈষম্য পাওয়া যায় না। এখানে নারী আফিসে চাকুরি করিয়া সংসার পালনের, বা বাগানে কোদাল পাড়িয়া গাছপালা রোপণ করিয়া কঠোর কর্ম্মরাশির, পুরুষের সঙ্গে কেন সমান অধিকার পাইবে না, একথা ভুলাই অন্যায়। দুই জনেই পুরুষ হইলে, একের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। নারী নারীই থাকিবে, কদাপি পুরুষ হইবে না, এবং পুরুষও কদাপি নারী হইবে না। উভয়ে পরামর্শ করিয়া কর্ম্মের ব্যতিক্রম করিলে নিজের নিজের অধিকার হারাইবে। অবশ্য সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া কোন দিন যদি পুরুষকে নারীর কর্ম্ম করিতে হয়, এবং সময় বিশেষে নারীকেও পুরুষের কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতে অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমাদের সমাজেও এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্তের কথা ধরিয়া এই অধিকার-পদ্ধতির প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নহে। পাশ্চাত্য সমাজ এই অধিকার-পদ্ধতি মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সংসারধর্ম্ম এই অধিকার-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়াই সেখানকার মানবজীবনের কোন সীমন্তন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্যই ভগবান্ মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

হিংসৌষধীনাং স্ত্রীজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ।
ইক্ষ্বার্থমস্থানাং ক্রমাণামুপপাতকম্॥

অর্থাৎ 'অপক্ক অবস্থায় ধান্য নাশ করা, স্ত্রীদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা; পরহিংসার্থ অপহোমাদি কর্ম্ম করা, এবং বশীকরণাদি কার্য্য করা, এবং কাষ্ঠের নিমিত্ত অতরু বৃক্ষের ছেদন করা, প্রত্যেকটাই উপপাতক।'

উক্ত বচনে পত্নীদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহও যে একটা পাপ তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এখানে যেমন একদিকে নারী অধিকারের সম্মান দেওয়া হইয়াছে, অপর দিকে পুরুষকে তাহার অধিকারের হিসাবটাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে পাপের দণ্ডের ভিতর দিয়াও স্ত্রীপুরুষের অধিকারটা দেখা যাউক।

"অশীতির্বৎসরাণি বালোবাপ্যমষোড়শাঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্হমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ॥"

অর্থাৎ 'অশীতিবর্ষের অন্যূনবয়স্ক, বৃদ্ধ, ষোড়শবর্ষের ন্যূন বালক সাধারণ স্ত্রী এবং রোগীদিগের সম্বন্ধে অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত অনুগ্রহ করা যাইতে পারে।'

"স্ত্রীণামর্দ্ধং প্রদাতব্যং বৃদ্ধানাং রোগিণাং তথা।
পাপেষ্বাদেষু দাতব্যঃ সর্ব্বপাপেষ্বয়ং বিধিঃ॥"

(লঘুবিষ্ণু)

এই বচনেও সমস্ত পাপেই স্ত্রীদিগের অর্দ্ধদণ্ডের বিহিত হইয়াছে। পুরুষের পূর্ণদণ্ডের সঙ্গে স্ত্রীদিগের এই অর্দ্ধদণ্ডের সাম্য আছে। পুরুষের হাতেই ত ব্যবস্থা তৈয়ারীর ভার ছিল, পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে কি নিজের কোলের দিকেও কোল টানিতে পারিতেন না?

এ ত হইল সাধারণ পাপের কথা—এখন ব্যভিচারের দিক দিয়াও নারীদিগের দণ্ডের হিসাবটা দেখা যাউক।

"বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্ত্তা নিরুন্ধ্যাদেক-বেশ্মনি।
যৎপুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্ব্রতম্॥"

(মনু)

অর্থাৎ "যেস্থলে যে স্ত্রীগমন করিলে পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে সেই পুরুষগামিনী স্ত্রীরও সেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এবং ভর্ত্তা সেই ব্যভিচারিণী নারীর অঙ্গসংস্কার করিতে দিবেন না, এক ঘরে সেই নারীর সহিত থাকিয়া প্রাণধারণের মাত্র উপযোগী তাহাকে আহার দিয়া কিছু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।"

এস্থলে পুরুষের ব্যভিচারের সঙ্গে নারীর ব্যভিচারও যে সমান পাপজনক, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় —"তুমি ত সমাজ শুধু পুরুষের সমাজ" বলিয়া সমাজকে গালি দিয়াছেন, কিন্তু কথাটা তাঁহাকে এইবার ভাবিয়া দেখিতে বলি।

"ক্ষেত্রাধিকারাং মনিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামবংশস্থাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্॥'
ব্যভিচারে ঋতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্ত্তৃবধাবৌ তু তথা মহতি পাতকে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

এই বচনে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভ উৎপাদন হইলে

সেই পত্নীকে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি ব্যভিচার করা হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে না, ইহা বুঝা যাইতেছে—এ সম্বন্ধে প্রমাণও আছে। অবশ্য পরপুরুষের দ্বারা উৎপাদিত গর্ভস্থলে সামাজিক হিসাবে গুরুতর অপরাধ করা হয়, এইজন্য তাহাকে ত্যাগ করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না। এই সব স্থলে যে ব্যভিচারের কথা বলা হইল, তাহা উত্তমবর্ণের সঙ্গে ব্যভিচার স্থলেই বুঝিতে হইবে। কারণ,—

"চতুষ্প্রস্থ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্টগা গুরুগা তথা।
পতিঘ্নী চ বিশেষেণ দুষ্টিতোপগতা চ যা॥"

(অঙ্গিরাঃ।)

অর্থাৎ চারিটি অপরাধ করিলে মাত্র স্ত্রী পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে, সেই চারিটি অপরাধ এই—শিষ্টগমন, গুরুগমন, পতিহত্যা, এবং দুষ্টিত-হীনবর্ণগমন। অবশ্য এই সব স্থলে নারী যদি স্বেচ্ছাক্রমে অনুরাগ-বশে হীনবর্ণ গমন করে তবেই সে পরিত্যাজ্যা, বলপূর্ব্বক উপভুক্তা হইলে পরিত্যাজ্যা নহে।

"বলাৎ প্রমথ্য ভুক্তা চেৎ বহুমানেন চেতসা।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাত্তস্যা পাবনং পরম্॥
ব্রাহ্মণ্যাঃ শূদ্রসম্পর্কে কথঞ্চিৎ সমুপাগতে।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ তস্যাঃ পাবনং স্মৃতম্॥
চাণ্ডালং পুল্কসং ম্লেচ্ছং শ্বপাকং পতিতং তথা।
এতান্ গত্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং পরম্॥"

(সম্বর্ত্ত)

এই সমস্ত বচনের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, নারী যদি ভিন্নধর্ম্মী যবন ম্লেচ্ছাদি কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বকও উপভুক্তা হয়, তবেও সে পরিত্যাজ্যা নহে। অধমবর্ণের দ্বারা বলপূর্ব্বক উপভোগের কথা ত ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক। পুরুষেরাও মহাপাতকাদি বৃহৎ পাপ করিলে অব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন। নারীদের প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ নির্য্যাতনেও পক্ষপাত নাই, কারণ পুরুষেরাও নিজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আজকাল আমাদের সমাজে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সম্বন্ধে বড় নির্দ্দয় ব্যবহার করা হয়—ইহা মানি। অনেকস্থলে যে একটা কুসংস্কারও এই নির্দ্দয় ব্যবহারের কারণ নহে। কিন্তু অনেক স্থলেও যে এই নির্দ্দয় ব্যবহারের ফলে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা কম হয়—তাহাও বুঝা যায়। ইহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষেরা ব্যভিচার করিলে আজকাল আর কোন দণ্ড পায় না। পায় না বলিয়াই পুরুষের মধ্যে ব্যভিচরিতের সংখ্যা বেশী। পুরুষেরা যে পাপ করিয়াও দণ্ড পায় না, তাহা তাহাদেরই স্বয়ং-কৃত সমাজের প্রতি অবজ্ঞারই বিষময় ফল। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা বিধিব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়া যাহারা সর্ব্ববিষয়ে স্বৈরাচার করিবে তাহারা ত নিজেদের বেলায় পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখিবে না—এই সমস্ত স্বেচ্ছাচার পুরুষের দ্বারাই নারী-নির্য্যাতন যত বেশী হয়, "গোঁড়া" নামধারী পুরুষের দ্বারা তত হয় না, কারণ তাহারা নিজেরাও সমাজকে মানে—নারী-দিগকেও মানাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বেচ্ছাচার পুরুষেরা ত তাহা করে না, তাহারা ত স্ত্রীর এদিক ওদিক সহিবে না।

আমাদের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর অবজ্ঞার ফলে আমাদের সমাজের অনেক স্থলেই ইংরাজি আইন ঢুকিয়াছে, ইংরাজি আইনের আমলে আসিয়াও আমাদের সমাজের আইনগুলি অবজ্ঞের হইয়া পড়িয়াছে। ফলে হইয়াছে এই—পুরুষেরা স্বেচ্ছাচারের পথ পাইয়াছে, নারীরা পায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের মধ্যে একটা সমাজগত বৈষম্যও আসিয়া পড়িয়াছে। এই বৈষম্যের ফলে নারী যদি সমাজবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুরুষের পদানুবর্ত্তিনী হয়, তবে ত না হয় একরকম সাম্য পাওয়া গেল; যেখানে তা পাওয়া যায় না সেখানেই নারী নিপীড়িত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নারীর বেলাই বিধি ব্যবস্থার বোঝা স্কন্ধেই থাকিয়া যায়।

ইংরাজি দণ্ডবিধি আইনে এই আত্ম-ব্যভিচার দোষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, আমাদের আইনে ইহা দোষের। এইখানেই ইংরাজের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। আমরা চাই অন্তঃশুদ্ধি, ইংরাজেরা চায় বহিঃ-শুদ্ধি। তাই ইংরাজি ভাষায় অভক্ষ্য ভক্ষণ পাপ নহে, অগম্যা গমনও তেমন পাপ নহে। তাই তাহার দণ্ডও

সৃষ্টি হয় নাই। সুরাপান করিলে আমাদের আইনে থানায় পড়িলে পাঁচ টাকা জরিমানা। তদপেক্ষা এই স্থানে।

রক্তমাংসের শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমাজের বিধি-ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় নাই। শাস্ত্রও কখন মানবকে অতিপ্রাকৃতের ভজনা করিতে উপদেশ দেয় নাই। এইজন্য পাপ-তাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অধিকার অনধিকার বিবেচনা করিয়া আমাদের শাস্ত্র স্ত্রী পুরুষের সহজ জীবনকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শাস্ত্রের শাসন কেবল মানবকে বড় করিবার জন্য। যে বড়—প্রকৃতই বড়—শাস্ত্র তাহাকে কোনদিনই আঁটিতে পারে নাই। এইজন্য প্রকৃত বড়র দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ মানবের জীবনকে তুলিত করা কদাপি উচিত নহে।

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নিঃ সর্ব্বভুজো যথা"

এই কথাটাই, শাস্ত্রের বড়কে না আঁটিয়া পারিবার কথা।

ধনাধিকার লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আপাততঃ একটু বৈষম্য দেখা যায়। পুত্র ও কন্যার এককালে পিতৃধনে সমান অধিকার থাকে না। পুত্রেরই অগ্রে অধিকার, পুত্র না থাকিলে কন্যার। আবার মাতার যৌতকধনে অগ্রে কন্যার অধিকার, পরে পুত্রের। এ ছাড়া মাতার অযৌতক ধনেও কন্যাপুত্রের সমান অধিকার।

এদিকে স্বামীর ধনে পত্নীর প্রথমাধিকার না থাকিলেও, পুত্রেরাও মাতার বিনানুমতিতে পৈতৃক ধন বিতরণ করিবার ধর্ম্মতঃ অধিকারী নহে। অন্যদিকে পত্নী, পুত্রাদির অভাবে স্বামীর ধনে অধিকারিণী হইলেও স্বচ্ছন্দে দান বিক্রয় করিবার অধিকারিণী নহে। আবার অন্যত্র—

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাতাভবিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকান্ধ যে চ কেচিৎ নিরিন্দ্রিয়াঃ॥

(মনু।

"পতিতস্তৎসুতা ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ।
অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগার্ত্তো ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য)

এই সমস্ত বচনে পতিত ব্যক্তির ধনাধিকার নাই যেমন বলা হইয়াছে—আবার—

"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাস্তেষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবন্ন স্যুঃ স্বয়ংকৃতয়॥
অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ।
নির্দ্দোষাস্তু ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ 'ক্লীব প্রভৃতির ক্ষেত্রজ ও ঔরসপুত্র ক্লীবত্বাদি দোষরহিত হইলে ভাগহারী হয়, আর ইহাদিগের কন্যা যাবৎ বিবাহিতা না হয়, তাবৎ ভরণীয়া হয়। আর ইহাদের পুত্রহীনা ভার্য্যা যদি সচ্চরিত্রা হয়, তবে তাহারা শ্রাদ্ধাচ্ছাদনের অধিকারিণী। ব্যভিচারিণীকে দূর করিয়া দিবে, শ্রাদ্ধাচ্ছাদন কিছুমাত্র দিবে না।' এই সমস্ত বচনে ব্যভিচারিণী নারীরও ধনাধিকার দেখা যায় না। পাতিত্য হিসাবে স্ত্রীপুরুষের ধনাধিকার হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে কোথাও নাই। অথচ আজকালকার হিন্দুদিগের প্রতি প্রযোজ্য দেওয়ানী আইনের মধ্যে পাতিত্য হিসাবে ধনাধিকার-রাহিত্য কথাটা বোধ হয় উঠিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক নারীর ধনাধিকার সম্বন্ধে এই যে বৈচিত্র্য, ইহাতেও নারীকে নিষ্পীড়িত করা হয় নাই। "হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে "পিণ্ডং দদ্যা হরেদ্ধনং" কথাটার উপর নির্ভর করিয়া ইহার বিচার করিলে, নারীর প্রতি এই ধনাধিকারের একটু বাধাবাধি নিয়মের রহস্যটা পরিষ্কার হইয়া যায়। পুরুষেরই পিণ্ডদানের প্রথম অধিকার, এইজন্য ধনাধিকারটাও তাহার প্রথমে। পুরুষের পিণ্ডদানের কেন প্রথমে অধিকার থাকিল, ইহার আলোচনা করিতে বসিলে অনেক সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে হয়।" সে সব কথা ছাড়িয়া দিয়া, মোটামুটি পুরুষের নামেই যে বংশের পরিচয় থাকে, পুরুষের ধারাই যে বংশের ধারা, তাহা মনিয়া লইয়া ইহার বিচার করিতে হইবে। এই সমস্ত বিচার করিলে পুরুষের এই প্রথমাধিকার লইয়া নারীর অধিকারের সাম্য আছে বলিতে হইবে। তথাপি কোন কোন স্থলে নারীর প্রথমে অধিকার আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল।

ধর্ম্মজীবনের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষের অনেক বৈষম্য

আছে। দ্বিজাতির ভিতরে পুরুষের দশসংস্কার আছে। নারীর মাত্র বিবাহই প্রধান সংস্কার। উপনয়নাদি নারীর নাই। অনেক ব্রত উপবাসেও নারীর কায়-ধর্ম্ম আছে বটে, তাহাও আবার স্বামীর আদেশ না থাকিলে না করিলে ক্ষতি নাই। দ্বিজাতির এক সন্ধ্যে দুইবার অন্নভোজন নাই। নারীর তাহাতে বাধা নাই। দ্বিজাতির গুরুপক্ক অনোদন পদার্থ ভোজনে বাধা আছে। নারীর সেরূপ বাধা নাই। স্পর্শবোধ দ্বিজাতিরাই মানেন, নারীরা ততটা মানেন না। এই সমস্ত বিষয়ে পুরুষকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধা আছে, নারীকে ততটা বাঁধা নাই।

আবার অন্যদিকে পুরুষের পক্ষে বাল্যবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, নারীর পক্ষে তাহাই আবার ধর্ম্ম। পুরুষ ভার্য্যাপুত্রবিহীন হইলে, আটচল্লিশ বৎসরের ভিতরে দারান্তর করিতে বাধ্য, নারী কিন্তু স্বামীপুত্রবিহীন হইলেও পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশ্য পুরুষ যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মোহে পুত্রাদি থাকিতেও আবার বিবাহ করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে শাস্ত্র বাধা দিতে পারেন না বটে, কিন্তু এরূপ বিবাহ যে কামনামূলক অধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিবাহগত অধিকার-পদ্ধতির পার্থক্য লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেকেই একটা ভয়ানক বৈষম্য লক্ষ্য করেন। এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতি-বাদও হইয়াছে বিস্তর। বিবাহটা যেকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বার ছিল না, বিবাহটা যেকালে মানব-জীবনের একটা প্রধান সংস্কার বলিয়াই বিবেচিত হইত, তখনকার কালে অবশ্য ইহাতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না। আজকালকার কথা স্বতন্ত্র, আজকাল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই প্রধান। তাই ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধক বস্তুমাত্রেই যেখানে স্বেচ্ছাচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, সেখানেই সেই ব্যাঘাতক আইনের প্রতি একটা তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে। কাজেই নারীর ভাইভোর্স প্রথায় দ্বিতীয় বিবাহ না হউক, অন্ততঃ বিধবার বিবাহটায় অনেকেরই সহানুভূতি দেখা যায়। আজকাল যে দেশকালপাত্রের ধুয়া উঠিয়াছে, সেই ধুয়ার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুর বিশিষ্টতা নষ্ট করা উচিত, না দেশকালপাত্রটার কবল হইতে হিন্দুর দৌর্ব্বল্যটাকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে, সবল করা উচিত, এ সম্বন্ধে অনেক বিবেচনা আছে। আমরা তথাকথিত গোঁড়া হিন্দু, আমরা শাস্ত্রের শাসনকে পদদলিত করিতে ভয় পাই। আমরা বিশ্বাস করি—শাস্ত্রের শাসন মানিয়াও সকল উন্নতিকর কার্য্যই করা যায়। অবশ্য উন্নতিকর কার্য্যেও অনেক গোলযোগ আছে। সে যাহা হউক বিধবার উপর নির্দ্দয় ব্যবহারের মূলে একটা কাল্পনিক চিত্র খাড়া করিয়া তাহাতে রং ফলাইয়া যাঁহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই। হিন্দুর পল্লীসমাজে এখনও বিধবার আসন অনেক উচ্চে। এখনও বিধবা সেখানে দেবীর ন্যায় পূজিতা হইয়া থাকেন, এখনও বিধবার রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে অনবরত একটা পাপ উত্তেজনা প্রবেশ করাইবার মত পল্লীসমাজের অবস্থা হয় নাই। যখন তাহা হইবে তখন হিন্দুত্বও বিনষ্ট হইবে। তখনকার জন্য এখন চিন্তার আবশ্যকতা নাই।

প্রাচীনকালের সহমরণ প্রথার ভিতরে নারীজাতির প্রতি একটা ভয়ানক নৃশংস পীড়নের ভাব যাঁহারা লক্ষ্য করেন, তাহাদেরও এই ভাবেরও কোন মূল্য নাই। সহমরণ কথাটাও অবশ্য অনেক উচ্চধর্ম্মের কথা। যখন "যদেব হৃদয়ং মম, তদেব হৃদয়ং তব" বলিয়া হৃদয়ে হৃদয় এক হইয়া যায়, যখন নারীর সহিত পতির একটা পার্থক্যজ্ঞান থাকে না, তখনকার এই অবস্থায় স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর মৃত্যু অস্বাভাবিক নহে। এই সহমরণও আবার নারীর স্বেচ্ছায় হওয়া চাই।

"যথা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া পতিনা সহ"

নারীর যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তাহাকে জোর করিয়া পোড়াইবার অধিকার কাহারও নাই।

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বা।"

(বিষ্ণু)

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণই নারীর ধর্ম্ম। এখানে নারীর অধিকার লইয়াই কথা। যাহার সহমরণে অধিকার আছে, সে-ই সহমরণে যাইবে। আবার এই সহমরণের ভিতরে বাধাবাধি নিয়মও আছে। যে নারীর

পুত্র অল্পবয়স্ক, যে নারী রজস্বলা, যে নারী গর্ভবতী, সূতিকা ও অল্পবয়স্কা তাহাদেরও সহমরণে যাইবার অধিকার নাই।

এ ছাড়া বিদেশে যদি পতির মৃত্যু হয়, স্ত্রী যদি সেখানে না থাকেন, তবে সেই নারীও স্বামীর অনুগমন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণী নারী সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা। অবশ্য অন্য নারীদের অনুমরণের ব্যবস্থা আছে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নারীকে কখন জোর করিয়া অগ্নিতে দাহ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দেন নাই। আজকাল অনেকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিবার কথা বলেন বটে, কিন্তু আমরা উহা মোটেই বিশ্বাস করি না। হয় তাহার মধ্যে অন্য গূঢ় কারণ আছে, না হয় উহা মিথ্যা। অধুনাও অনেক সাধ্বী নারীর বিষয় মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে, তাহারা ভর্ত্তার মৃত্যুর পর শরীরে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করেন। এইরূপ আত্মহত্যার কথা সংবাদপত্রাদিতে বৎসরে দুই চারিটাও শুনা যায়। যদি এইরূপ সাধ্বীর এইরূপ মৃত্যু সত্য হয়—পতিশোকই যদি তাহার কারণ হয়—তবে তাহাদের যে সহমরণের অধিকার ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অথচ ইহাদের প্রকৃত সহমরণ হয় না, আত্মহত্যা হয়। ইহার জন্য এক্ষণে দায়ী কে?—শাস্ত্র তাহাদের বৈধ মৃত্যুতে অধিকার দিয়াছিল,—অথচ আইন করিয়া সেই অধিকার রুদ্ধ করা হইয়াছে। তাই সমাজে পাপও বাড়িতেছে।

এখানে কথা উঠিতে পারে—পত্নীর বেলায় সহমরণের ব্যবস্থা, স্বামীর বেলায় তাহা নাই কেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে—অধিকার সুখের কথায় হয় না। জোর-জবরদস্তি করিয়াও কেহ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। উহা অন্তরের বস্তু। যদি পুরুষের সেইরূপ প্রকৃতি হইত, তবে শাস্ত্রেও তাহার সহমরণের ব্যবস্থা থাকিত। এই অধিকার-পদ্ধতি লইয়া আরও অনেক আলোচনার বিষয় ছিল—কিন্তু এবার এই পর্য্যন্ত। (নারায়ণ)

চয়ন

শিশুর প্রাণরক্ষা

নিউ-জীল্যাণ্ড দ্বীপে শিশুদের অকালমৃত্যু-নিবারণের চেষ্টা যেরূপ সফল হইয়াছে, এরূপ আর কোন দেশে হয় নাই। সেখানে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ৮০, ১৯১২ তে উহা হয় ৪১। বঙ্গে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হাজারে ২২১ জনের উপর শিশু মরিয়াছে, অর্থাৎ নিউ-জীল্যাণ্ডের চারিগুণেরও বেশী। নিউ-জীল্যাণ্ডের ডানেডিন সহরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শিশুর মৃত্যুর হার হইয়াছিল হাজারে মোট ৩৮, অর্থাৎ বঙ্গের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। এইরূপ সুফল কেমন করিয়া ফলিল?

নিউ-জীল্যাণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়াছে প্রধানতঃ একটি সমিতির চেষ্টার ফলে। উহার নাম নিউ-জীল্যাণ্ডবাসী নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য-সমিতি। এই সমিতির অধিকাংশ কর্ম্মচারী স্ত্রীলোক। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে অর্থ সাহায্য করেন ও ইহার কার্য্য পরিদর্শন করেন। মিউনিসিপালটি সমূহ নানা প্রকারে ইহার শাখাগুলির সাহায্য করেন।

শিশুর জননীদিগকে এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীগণকে তাঁহাদের নিজের ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে শিক্ষা দিয়া শিশুদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা হয়। শিশুকে খাওয়ান ও তাহার যত্ন করা নামক একটি বহি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা ১৬২ পৃষ্ঠা পরিমিত; ৬০টী ছবি আছে। মূল্য এক শিলিং বা বার আনা। গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাভাবিক খাওয়ান, কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান, শিশুর দ্বিতীয় বৎসরে খাওয়ান, কেমন করিয়া শিশুকে বিছানা হইতে তুলিতে হয় এবং বহন করিতে হয়, শিশুর খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে কি প্রকারে নিয়মিত অভ্যাস জন্মাইতে হয়, প্রচলিত ভ্রম, সাধারণ স্বাস্থ্য, সাধারণ ব্যাধি, সাবধানতা, প্রভৃতি বিষয়ে ইহাতে সোজাভাষায় উপদেশ দেওয়া আছে। তা ছাড়া শিশুর কি আবশ্যক, ঘড়ি ধরিয়া খাওয়ান শিশুর পক্ষে সকলের চেয়ে ভাল কি প্রভৃতি ছোট

ছোট পুস্তিকা আছে। সমিতির সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা-গুলি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং এই বক্তৃতাগুলি ও সমিতির রিপোর্টসমূহ সর্ব্বসাধারণ পাইতে পারে।

সমিতির দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকপুস্তিকাদি ছাড়া গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তিকাও পাওয়া যায়। সরকারী একটি বহির নাম 'শিশুর প্রথম মাস'। কোন শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী হইবামাত্র তাহার মাকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বহি একখানি বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫; দশখানি ছবি আছে।

এইসব সুবিধা থাকায় নিউ-জীল্যাণ্ডের কোন মাতার বলিবার যো নাই যে আমি সুযোগের অভাবে জানিতে পারি নাই, যে আমার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে কি করিতে হইবে, কিম্বা আমার শিশুটিকে সুস্থ রাখিতে হইলে এবং উহাকে সবল ও বুদ্ধিমান্ মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে কি করিতে হইবে।

নিউ-জীল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা সাড়ে এগার লক্ষ মাত্র; প্রায় বাকুড়া জেলার সমান; চব্বিশপরগণা, রংপুর বা বাখরগঞ্জ জেলার অর্দ্ধেক; এবং ময়মনসিংহের সিকি। এই অল্পসংখ্যক লোকের জন্য ৭০টির উপর স্থানীয় কমিটি আছে। এই কমিটিগুলি স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পার্শ্বজীবনের প্রতি ছাত্রী-দিগকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শিশুপালন সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল উদ্রেক করেন, এবং শিক্ষা দেন।

নিউ-জীল্যাণ্ডের প্রত্যেক সংবাদপত্রে প্রতিসপ্তাহে শিশুদের কল্যাণবিষয়ক নানা প্রশ্নের আলোচনার জন্য ২।১ স্তম্ভ জায়গা নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাঙ্গালাদেশে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটীসমূহ, সম্ভ্রান্তকুল ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি নিউজীল্যাণ্ডের মত উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সত্বরই কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে হইলে নারীদিগকে লেখাপড়া শিখান আবশ্যক। মতুবা যাহা ছাপিবেন, তাহা পড়িবে ক জন? বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে যে ১৯ জন বালিকা ও নারীর মধ্যে কেবলমাত্র একজন লিখনপঠনক্ষম, এবং ১৮ জন নিরক্ষর।

নিউ-জীল্যাণ্ড কেবল পুস্তকপুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার এবং বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন নাই। বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র জেলার সমান লোকের জন্য ২০ জনের উপর সুদক্ষ ধাত্রী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান, এবং মাতা ও সন্তানসম্ভাবিতাদিগকে যথোপযুক্ত উপ-দেশ ও পরামর্শ দেন। খুব দূরবর্ত্তী দুর্গমস্থানবাসী লোকদিগকে তাঁহারা পত্রদ্বারা পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই-সকল ধাত্রীদের স্থায়ী ঠিকানা এবং তাঁহারা কখন কোথায় যাইবেন থাকিবেন, তাহার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহাদের সেবা ও সাহায্য সম্পূর্ণরূপ বিনামূল্যে ধনী নির্ধন সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত নির্বিশেষে সকলে পাইতে পারিবেন। অবশ্য, ইহাঁরা ছাড়া বিস্তর চিকিৎসক ও ধাত্রী আছেন যাঁহা-দিগকে লোকে, প্রয়োজনমত, টাকা দিয়া ডাকিয়া থাকে। ডানেডিন সহরে একটি শিশুচিকিৎসাগার আছে। তথায় একজন সুশিক্ষিতা ধাত্রী শিশুদিগকে পরীক্ষা ও ওজন করেন, এবং অপুষ্টি বা পীড়া লক্ষিত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পরামর্শ দেন। সমিতি কেবলমাত্র শিশুদের জন্য একটি হাসপাতাল চালান। সেখানে প্রসূতিগণ সন্তানসহ গিয়া ও থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভ-বিষয়ে সর্ব্ববিধ পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের অনেক গুলি সাধারণ সূতিকাগার আছে, এবং প্রত্যেক জেলায় জন্য ধাত্রী আছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক ধাত্রীকে রেজিষ্টরীভুক্ত হইতে হয়; গবর্ণমেণ্টনির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কাহাকেও ধাত্রীর কাজ করিতে দেওয়া হয় না। প্রসবান্তে রক্তদুষ্টি হইলে ধাত্রীকে জরিমানা দিতে হয়। সাধারণ সূতিকাগারসমূহে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে। তথায় অনেক নারী ধাত্রীবিদ্যা শিখিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে নিউ জীল্যাণ্ডের প্রতি হাজার মানুষে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী হইবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহে শিশুরক্ষার চেষ্টা প্রধানতঃ রাষ্ট্র এবং মিউনিসিপালিটিগুলি দ্বারাই হইয়া থাকে। অনেকগুলি রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বহুসংখ্যক শিশুমৃত্যুনিবারণ-বিষয়িণী পুস্তিকা বিতরিত হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর কি কি করা উচিত, সমুদয় লেখা আছে। অনেক গুলি পুস্তিকা নানাভাষায় লেখা। পেন্‌সিলভেনিয়া রাষ্ট্রে ইংরেজী, ইতালীয়, জার্মেন, পোলিশ, হিব্রিশ, এবং স্লোভাক্ ভাষায় মুদ্রিত পত্র বিতরিত হয়। নানা সহরের স্বাস্থ্য বোর্ডগুলি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সহিত শিশুদের প্রাণরক্ষাবিষয়ে সহযোগিতা করেন। তাঁহারা অনেকে যোগ্য ডাক্তার ও ধাত্রীর অধীনে শিশুচিকিৎসাগার এবং জননীদের পরামর্শগৃহ-চালাইয়া থাকেন, এবং অনেকে জননীদিগকে বাড়ী বাড়ী গিয়া পরামর্শ দিবার জন্য সুদক্ষ ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

শিশুজীবন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের এই যে শিশুদিগকে মাতৃস্তন্য পান করানই বিধি। যে সব ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়, তথায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ, চিকিৎসকের ব্যবস্থা-অনুযায়ী, চুণজল, যবজল, বা ওটজল মিশাইয়া খাওয়ান উচিত। এইরূপ আহারের ফল কিরূপ হয়, আমেরিকায় তাহা লক্ষ্য করা হয়, এবং অপুষ্টি ও উদরের পীড়ার প্রতিকার করা হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইবার জন্য আমেরিকার সহরগুলিকে খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। নিউইয়র্ক সহরে প্রত্যহ চল্লিশ হাজার মণ দুগ্ধ দরকার হয়। ইহার কিয়দংশ ৪০০ মাইল দূর হইতে আসে। শিকাগোতে প্রত্যহ ২৫,০০০ মণ দুগ্ধ খরচ হয়। তাহা ১০০ হইতে ২০০ মাইল দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে সংগৃহীত হয়। দুগ্ধ সুস্থ, স্বাস্থ্যকর স্থানে রক্ষিত, এবং ভাল খাদ্যে পুষ্ট গাভী হইতে প্রাপ্ত কি না, এবং গ্রামস্থ গোশালা হইতে সহরে আনিবার সময় উহা যাহাতে দূষিত না হয়, তাহা দেখিবার জন্য সহরের কর্তৃপক্ষকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়। কোন কোন আমেরিকান্ সহর এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ খুব কর্তব্যপরায়ণতার সহিত করে। যেরূপ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবস্থার মধ্যে দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং ক্রেতাকে দেওয়া হয়, তদনুসারে দুগ্ধের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। বিশুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে মূল্যেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। খুব ভাল, একেবারে খাঁটি বলিয়া সার্টিফিকেট-দেওয়া দুগ্ধ গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকেরা কিনিতে পারে না। কোন কোন সহরে মিউনিসিপালিটী দুগ্ধের দোকান খুলিয়াছেন; তথায় মাতাদিগকে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিক্রী করা হয়, কখন বা যে দামে কেনা তার চেয়েও কম দরে, এবং স্থলবিশেষে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

কোন কোন সহরের স্বাস্থ্যবিভাগ সহরের ও প্রত্যেক ওয়ার্ডের বড় মানচিত্র রাখেন, এবং কোন ওয়ার্ডে একটি শিশুর মৃত্যু হইলেই তাহার মানচিত্রে একটি আলপিন পুঁতিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে রঞ্জান মাথাওয়ালা আলপিন ব্যবহার করা হয়। এইরূপে সহরের কোন্ অঞ্চলে কোন্ রোগে কত শিশু মরিতেছে, তাহা অবিলম্বে জানা যায়, এবং ঐ রোগ নিবারণের জন্য উপায় অচিরে অবলম্বন করা যায়। শিশুর জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রারী করিবার কড়া নিয়ম যে যে স্থানে লোকদিগকে পালন করিতে বাধ্য করা হয়, কেবল সেখানেই এইরূপ বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয়। কিন্তু অন্যত্রও ইহাতে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে।

আমেরিকার কোন কোন সহরে বালিকাবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রত্যেক বালিকাকে মাতার কর্তব্য ও শিশুপালন শিখিতে বাধ্য করা হয়। ওহিও রাষ্ট্রের ষ্টীভেন্সাণ্ড সহরে নিম্নলিখিতরূপ পাঠনির্দ্দিষ্ট আছে :—

পাঠ ১। শিশুকে কেমন করিয়া সুস্থ রাখিতে হয়। মৃত্যুর হারের উচ্চতার কারণ, এবং তাহা নিবারণের উপায়।

পাঠ ২। স্বাভাবিক শিশুর বাড় এবং বিকাশ।

পাঠ ৩। শিশুর কাপড় চোপড়, বিছানা আদি কাটিতে ও সেলাই করিতে শিক্ষা।

পাঠ ৪। শিশুকে খাওয়ান। স্তন্যদান, কৃত্রিম আহার, পেটেন্ট খাদ্যে বিপদ।

পাঠ ৫। স্নান। স্নানের জন্য কি কি জিনিষ চাই;

স্নানের আপেক্ষার আয়োজন; স্নানে শিশুর কত উপকার হয়।

পাঠ ৬। শিশুদের সাধারণ রোগ। উদরের পীড়ার প্রারম্ভে বাড়ীতে কিরূপ চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

অনেক সহরে বালিকাদিগকে খোকাখুকীদের লালন-পালন করিতে শিখাইবার জন্য "ছোট মা'দের সমিতি," "ছোট মা'দের শ্রেণী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের অনেক সহরেরও শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা বহু পরিমাণে সফল হইয়াছে।

এখন নানা দেশের লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, কতকগুলি শিশুকে এক বৎসরের হইবার আগেই মরিতেই হইবে, ইহা বিধিলিপি নয়, যত্ন করিতে জানিলে শিশুদের মৃত্যু খুব কমান যায়। আমাদের এই ধারণা কবে হইবে? কবে আমরা বুঝিব, যে, দেশের দরিদ্রতা নিবারণ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ত করিতেই হইবে; তাহা ছাড়া, শিশুদিগকে বাঁচাইতে হইলে, জননীদিগকে সন্তানপালন শিক্ষা দিতে হইবে এবং শিশুর প্রধান খাদ্য খাঁটি দুধের অভাব দূর করিতে হইবে। শিশুপালন বহি পড়িয়া বা কাণে শুনিয়া শিখিলেই শুধু হইবে না। নিতান্ত বালিকা বয়সে হৃদয়ে মাতৃস্নেহের বিকাশ হয় না। শিশুপালন শিক্ষার জন্য বয়স হওয়া চাই, জননী হইবার নিমিত্ত দেহের যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহার জন্য বয়স হওয়া চাই। আবার মাতৃস্নেহ বিকাশের জন্যও বয়স চাই। যে দিক দিয়াই দেখা যাক, বাল্যবিবাহ ও অকালমাতৃত্ব দূরীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখন একান্নবর্ত্তী পরিবার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। চাকরী ও অন্যবিধ বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে পৈতৃক আবাস ছাড়িয়া দূরেও বেশী লোকে যাইতেছে। এইসব কারণে এখন অনেক অল্পবয়স্কা জননী সন্তান পালনে বাড়ীর প্রবীণাদের সাহায্য পান না এইজন্যও সন্তানপালন শিক্ষা বেশী আবশ্যক হইয়াছে।

ইউরোপের যুদ্ধে এখন প্রত্যেক জাতি মানুষের অভাব অনুভব করিতেছে; ভাবিতেছে, আরও যদি মানুষ থাকিত তাহা হইলে সেনাদল-ভুক্ত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া নিশ্চয় জয়লাভ করিতাম। কিন্তু শান্তির সময়ের জন্য মানুষের প্রয়োজন আরও বেশী। সুস্থ, সবল, সাহসী, শিক্ষিত লোক যাহাদের যত বেশী, তাহারা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে তত ধন আহরণ করিতে পারে; শুধু জড় ঐশ্বর্য্য নয়, জ্ঞান ও অন্যবিধ আধ্যাত্মিক সম্পদেও তাহারা তত ধনী হয়। এক একটি শিশু বাস্তবিকই এইজন্য, শুধু মায়ের চোখে নয়, স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিকদের চোখেও, এক একটি অমূল্য রত্ন:—কে জানে কাহার মধ্যে কি শক্তি সঞ্চিত আছে!

ইংলণ্ডের হাডার্সফীল্ড সহরের লংউড্ পল্লীতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১ই নবেম্বর হইতে ১৯০৫ এর ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যতগুলি শিশু জন্মিয়াছিল, কোন প্রকার বাছাই না করিয়া প্রত্যেকের জন্মের তারিখ, পিতা-মাতার নাম ধাম, লিখিয়া লওয়া হয়। প্রথমটি জন্মে ১০ই নবেম্বর, ১৯০৪, শেষটি ৮ই নবেম্বর, ১৯০৫। প্রত্যেক শিশুর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র সে বাঁচিয়া আছে কিনা খবর লইবার জন্য তাহার বাড়ী যাওয়া হয়। শেষ যাহার জন্ম হয়, সে ১৯০৬ সালের ৮ই নবেম্বর পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক হয়। তখন দেখা গেল মোটে ১১২ জন জন্মিয়াছিল; তাহার মধ্যে ১০১ জন এক বৎসরের হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল, ৪ জন তৎপূর্ব্বেই মারা পড়িয়াছিল, একজনের বাপ মা সে স্থান ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল স্থির করিতে পারা যায় নাই। যে ১০৭ জনের ১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, তাহার পরও তাহাদের উপর নজর রাখা হয়। ১৯১৪ নবেম্বরে যখন তাহারা বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, তখনও ৯৭ জন সুস্থ ও সবল ছিল। বাকী ১০ জনের মধ্যে ৬ জন স্থানত্যাগ করিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ তখনও বাঁচিয়া ছিল। এই শিশুগুলি সব রাজা বাদশার ছেলে নয়, আর দশজন খোকা-খুকীর মত; কিন্তু মানবজীবন এখনই অমূল্য বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে যে সাতরাজার ধন-মাণিকের মত ইহাদের প্রত্যেকের খবর ও গতিবিধি দশ বৎসর ধরিয়া রাখা হইয়াছে।

যে জাতি বড় হইতে চায়, তাহাকে শিশুদের খবর রাখিতে হইবে। (প্রবাসী)

আমাদের শিক্ষা

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের সকল শিক্ষা যার উচ্চ, বাঙ্গলাভাষাতেই হওয়া উচিত। কথাটা অদ্ভুত নয়, কেননা এক ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল দেশে, দেশভাষাতেই দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা নূতনও নয়, কেননা আর কেউ না হোক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ কথা পূর্ব্বেও বলেছেন; —একবার নয়, বহুবার। মাতৃভাষার স্বপক্ষে এক কথা যে একশোবার করে বলতে হয় সে দোষ বক্তাদের নয়, এর জন্যে দোষী যাচ্ছেন সেই শ্রোতার দল যাঁরা এক কানে বিলেতি আর-এক কানে সংস্কৃত গুলো দিয়ে বসে আছেন। বাঙ্গলার কথা বাঙ্গলায় বললে সে কথা শিক্ষিতসম্প্রদায় কানে তোলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য কথা যদি ইংরাজি ভাষায় বলতেন তাহলে বাঙ্গালীর তা মনে ধরত। আমাদের কাছে যে খাঁটি বাঙ্গলার চাইতে মেকি সংস্কৃত ও ভাঙ্গা ইংরাজির মূল্য ঢের বেশি তার পরিচয় ত আমাদের সাহিত্যে সংবাদ-পত্রে সভাসমিতিতে দু'বেলা পাওয়া যায়। সে যাই হোক, শিক্ষিতসম্প্রদায় যে রবীন্দ্রনাথের কথায় মনোযোগ দেননি তার প্রমাণ—তাঁরা অনেকেই বলছেন—ও সব কবিত্বের কথা, কাজের কথা নয়। অনেকের বিশ্বাস যাঁর কবি-প্রতিভা আছে তাঁর বিষয়বুদ্ধি নেই। এ কথা যদি সত্যও হয় ত একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে যাঁর কবি-প্রতিভা নেই তাঁরই বিষয়-বুদ্ধি আছে। কোনও একটি মানসিক-শক্তির অভাব থেকে অপর একটি মানসিক-শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতে কবির মন আকাশে ওড়ে, মাটির খবর রাখে না। একথা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এ দেশের ইউনিভার্সিটি-ফেরৎ লোকের মনের গতি আকাশের দিকেও নয়, মাটির দিকেও নয়,—বাটীর দিকে। আমাদের সকল ভাবনা সকল চিন্তা পরিবারের গণ্ডীর ভিতরই আবদ্ধ। আমরা আকাশের খবর দূরে থাক্, দেশের খবরও রাখিনে; কেননা আমাদের মনের পক্ষে ঘর হতে আঙিনা বিদেশ। দেশের দিকে, ঘরের দিকে একটু ফিরে চাইলে আমরা প্রকাশ্যে এ কথা বলতে লজ্জিত হতুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্যা আমরা লাভ করি তা অর্থকরী বিদ্যা। বাঙ্গালার মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবিত্ত এ ত প্রত্যক্ষ সত্য অথচ একমাত্র এই সম্প্রদায়ই উচ্চ শিক্ষিত। এবং এই উচ্চ শিক্ষা যত প্রসার লাভ করছে উচ্চশিক্ষিত দলের পশার তত কমে আসছে; এক বিয়ের বাজার ছাড়া আর সকল বাজারেই বি-এর দর পড়ে যাচ্ছে। এরূপ হবার প্রধান কারণ এই যে,—যেবিদ্যা আমরা শিখি তা অর্থকরী বিদ্যা নয়। আমাদের সকল শিক্ষিত লোকের সমবেত বিদ্যার ফলে এই ভূভারতে ধনের একটি শিষও বাড়েনি। আমাদের যা অর্থকরী বিদ্যা হচ্ছে আসলে অর্থ-হস্তান্তরকরী বিদ্যা। এ বিদ্যার গুণে এর পকেটের টাকা ওর পকেটে যায়। আসল ঘটনা এই যে, আমরা দেশে বিদেশে কোরে যাইনে, আপিসে আদালতে চোরে যাই। যাঁরা শিক্ষার সংস্কার করবার প্রস্তাব করেন তাঁরা এ কথাটিও মনে রাখেন যে যে-দেশে যথার্থ শিক্ষা আছে সে দেশে জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধনেরও বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে—জাতীয় শিক্ষার গুণে তদ্দেশবাসীরা এক দাসদাসী ব্যতীত অপর সকল ধনে অপূর্ব্ব ধনী হয়ে উঠেছে। দেশের বিষয় কবি হয় ত দিবাস্বপ্ন দেখেন আমরা কিন্তু নিশাস্বপ্নও দেখিনে—কেননা আমাদের নব শিক্ষার প্রভাবে আমরা স্বার্থের নেশায় দিবারাত্র বেহোঁস হয়ে থাকি।

(২)

কাজের লোকেরা বলেন যে, অন্ততঃ পেটের দায়ে আমাদের ইংরাজি শেখা দরকার, অতএব বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। ভাবুক লোকেরা এর উত্তরে বলেন, শুধু পেটের দায়ে নয়, মনের দায়েও আমাদের পক্ষে শুধু ইংরেজী নয়, জর্ম্মান ফ্রেঞ্চও শেখা

আবশ্যক; অতএব বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা যার কোন একটি ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার নেই তার পক্ষে অপর কোনও ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। আমরা তাই অর্দ্ধেক জীবন ইংরেজীর সঙ্গে কুস্তাকুস্তী করেও সে ভাষাকে কায়দা করতে পারিনে—ফলে অধিকাংশ সময় বি-এ এবং এম-এর মুখ এবং হাতে থেকে যা বেরোয় তা ইংরাজি নয়, তার অপভ্রংশ—ইংরেজেরা যাকে বলেন—'বাবু ইংরেজী'। আমরা যদি পৃথিবীর যত জ্ঞান বিজ্ঞান বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা করি তাহ'লে দুটি তিনটি ইউরোপীয় ভাষা কেবল মাত্র ভাষা হিসেবে শিক্ষা করবার সময় আমাদের হাতে যথেষ্ট থাকবে। বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হলে আমরা অবশ্য বক্তৃতায় বার্ক ব্রাইট্‌এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারব না কিন্তু ইংরাজিতে কেরাণীগিরি এবং ওকালতী করতে পারব। সাংসারিক হিসেবেও তাতে আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না, কেননা ইতিমধ্যে এদেশে এত বার্ক ব্রাইট্ জন্মগ্রহণ করেছেন যে তাঁদের আর বংশবৃদ্ধির দরকার নেই। দেশ উদ্ধার যদি কখনও না হয় ত সে ইংরাজি কথাতেও হবে না। নুখস্থ বাক্য মাত্রেরই অন্তরে যে মন্ত্রশক্তি আছে—এ ভুল আমাদের এতদিনে ভাঙ্গা উচিত ছিল।

(৩)

আমাদের নবশিক্ষার ফলে আমরা যে জাতীয় অভ্যুদয় সাধন করতে পারিনি তার প্রমাণ আমাদের দেশ-হিতৈষীরা নিজের ছেলেকে কথার জাল বুনতে শিখিয়ে আর-সকলের ছেলেকে তাঁতের কাপড় বুনতে শিখতে বলেন। আমরা যদি স্বজাতির বাইরের না হোক মনের দৈন্যও দূর করতে পারতুম তাহলেও নয় আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে কতকটা অহঙ্কার করতে পারতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা কিছু করতে অক্ষম বলেই এই ধুয়ো ধরেছি যে আমাদের জাতীয় মনের কোনরূপ দৈন্য নেই। যদি চিকিৎসা করতে না জানি তাহলে কারও রোগ নেই এই কথাটা বলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এবং বিদ্যার অভাবে বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আমরা দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমার ঐশ্বর্য্যে আমাদের সমতুল্য জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই,—অতএব উপোস করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ কেননা খালি পেটের ভিতরই আত্মা বাড়বার স্থান পায়।

এ সব কথা বলায় আমরা এই সত্যেরই পরিচয় দেই যে, আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আমাদের নবশিক্ষার ভাগ দিতে পারিনে, আমরা বিদ্যা-ধনে নিজেরা ধনী হইনি বলে, অপরকে তা দান করতে পারি নে। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে দেশের শিক্ষক হননি তার কারণ আমরা এ শিক্ষা আনন্দ-সহকারে লাভ করিনি। বি-এ পাস করা আমাদের পক্ষে একটা দায় এবং কায়ক্লেশে সেই দায় হতে উদ্ধার লাভ করতে পারলেই আমাদের মাথার উপর থেকে একটা ভার নেবে যায় এবং আমরা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এই পাস-করার ফাঁড়া কেটে গেলে আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুমাত্র বিদ্যার চর্চ্চা করি—তার বাদবাকী অংশের সঙ্গে জন্মের মত রোকসোধ হই।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেখাপড়া শিখতে যে কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়েছে তার হাত থেকে একবার অব্যাহতি পেলে আমরা লেখাপড়ার দিক্ দিয়েও আর ঘেঁসতে চাইনে। পঠদ্দশায় আমরা যে, সরস্বতীকে নিত্য বলি—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—তার কারণ তিনি বিদেশিনী। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে হয় বলেই আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটে এত নিরানন্দ। যার ভিতর আনন্দ নেই তা আমরা নিজের মন থেকেই দূর করতেই যখন ব্যস্ত তখন অপরের মনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। এবং যাঁদের এরূপ সাধুসংকল্প আছে তাঁরাও সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করতে অক্ষম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইংরাজির সাহায্যে আরোহণ করি বলে বাঙ্গলায় অবরোহণ করতে পারিনে। ইংরাজি সরস্বতী আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের আগ্‌ডালে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেন্। ফলে আমরা কেউ বা আইনের কেউ বা ডাক্তারির

পাখার বসে কল পাতা বা পাই তাই খেয়ে জীবন ধারণ করি, অথচ দেশের মাটি নীচে পড়ে রয়েছে, যার আবাদ করলে ফলত সোনা। নবশিক্ষিত মনের যে কৃষিকার্য্যে আসে না তার একমাত্র কারণ এই যে দে-মনকে মাতৃ-ভূমির কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে: এ কথা বলা বাহুল্য যে, মনের মাতৃভূমি হচ্ছে মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতিই দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। (ভারতী)

ছাত্রছাত্রীদের আহারের অনটন

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের পনেরটি সহরের ৪৪৭৯০২ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৯০১৯ জন প্রায় অর্দ্ধাহারে থাকে। ইহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের খাদ্যের অভাব এত বেশী যে তাহাকে অনাহার কিম্বা উপবাস বলিলেও চলে। সারাজীবন এইরূপ অনাহারে কাটাইয়া অকালে মৃত্যুর কোলে মুক্তি লাভ করিয়া ইহারা আপনারা শান্তি পায় ও সমাজকে ভারমুক্ত করে। বালকবালিকাদিগকে এই অনাহারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মূল জলপানি সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদক মিঃ এডওয়ার্ড এফ ব্রাউন সরকারী খরচে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে চান। নিউইয়র্ক স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন-আহারের বিষয়ে মিঃ ব্রাউন লিখিয়াছেন—"যেসকল বালকবালিকা গৃহে যথেষ্ট খাদ্য পায় না, বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন-ভোজন তাহাদের অভাব দূর করে। যাহাদের জননীরা দিনের বেলা কাজে বাহির হয়, তাহারা সচরাচর দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য মাতার নিকট দুই চারি পেনি পাইয়া থাকে; কিন্তু শিশুরা সাধারণতঃ সেই পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য না খাইয়া মিঠাইওয়া খাইয়া উড়াইয়া দেয়। খেলা গাড়ী কিম্বা বুড়ি করিয়া মিঠাই, কেক, ফল প্রভৃতি ছেলে-ভুলান খাবার লইয়া পাঠশালার নিকটস্থ স্থানসমূহ দখল করিয়া বসা খাবারওয়ালাদের বহুকালের ব্যবসায়। এইসকল খাবার সর্ব্বদা ধূলা ময়লার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকে এবং তাহাতে প্রায়ই ভীষণ রকম ভেজাল দেওয়া হয়। বিভিন্ন পরিবারের অল্প ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ভাড়াটে বাড়ীতে এইসকল খাদ্য প্রস্তুত হইয়া অনেক সময় সারারাত্রি খাবারওয়ালাদের ঘরে পোকা, মাকড়, মাছি ও অন্যান্য আবর্জ্জনার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকে। শিশুগণ খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে।

"নিউইয়র্কের ছাত্রছাত্রীদের একতৃতীয়াংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে ১০৯৯৯ জন অভাব অনুযায়ী পুষ্টি লাভ করে নাই। বাকি দুই-তৃতীয়াংশেরও যদি এইরূপ অবস্থা ধরিয়া লইতে হয় তবে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে ষোটের উপর ৪০,৫০০ বালকবালিকা পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্য হারাইতেছে বলিতে হইবে।" এই অপুষ্টির কারণ খোঁজ করিতে গিয়া যে পনেরটি সহরের বিদ্যালয়ের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

মিঃ ব্রাউন এই কারণগুলিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখাইয়াছেন—

ক। সামাজিক—

(১) জানালা ও রৌদ্রহীন গৃহে বাস।

(২) স্নানের সুযোগের অভাব।

(৩) গৃহে হাওয়া চলাচলের অভাব।

(৪) বিদ্যালয়ে পাঠের পর পরিশ্রম।

(৫) বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা।

(৬) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

খ। ব্যক্তিগত—

(১) খাদ্যের অযোগ্যতা ও অপ্রাচুর্য্য।

(২) স্বাস্থ্যহানিকর শয়নের ব্যবস্থা।

(৩) যথেষ্ট নিদ্রার অভাব।

(৪) অপরিচ্ছন্নতা।

(৫) মুখের রোগ, যকৃৎ-রোগ, ব্রঙ্কাইটিস্, ক্ষয়কাশ, হৃদ্‌রোগ, বাত, বসন্তাদিরোগ-জনিত দৌর্ব্বল্য, বাল্যকালে যত্নের অভাব প্রভৃতি।

"উপরোক্ত যে কোনটিই এই অপুষ্টির কারণ হইতে পারে এবং সেই কারণেরও অন্য কারণ থাকা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ পারিবারিক অর্থাভাব, গৃহিণীর সংসারজ্ঞানের অভাব, পরিবারের আহারাদি পর্য্যবেক্ষণে তাচ্ছিল্য কিম্বা অসামর্থ্য ও শিশুর জন্মগত দোষ কিম্বা পিতামাতার বংশগত রোগ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিবারের প্রধান উপার্জ্জক যদি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় কিম্বা কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা হইলে খরচ কমাইতে গিয়া দৈনিক আহারের উপরেই সর্ব্বাগ্রে টান পড়ে। ইহাতে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদেরই বিশেষ ক্ষতি হয়, যথেষ্ট পুষ্টির অভাবে তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির বিশেষ বাধা হয়।"

যথেষ্ট পুষ্টির অভাবে শিশুর জীবনী-শক্তি কমিয়া যায়, ইহার ফলে সে অতি সহজেই নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই ভীষণ বিপদ ত' আছেই, তাহার উপর আর একটি অসুবিধাও আসিয়া জুটে। এই সকল শিশু সংক্রামক বীজ ছড়াইয়া বেড়ানোতে সঙ্গীগণের বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের পড়াশুনাও নিতান্ত সামান্য হয়। ইহারা চটপটে একেবারেই হয় না এবং পরস্পর মনও সহজে দিতে পারে না। বালকবালিকাদিগকে গৃহে ও বিদ্যালয়ে যথেষ্ট খাদ্য, বিশ্রাম, বিশুদ্ধ বাতাস, রৌদ্র ও নিয়মিত স্নান এই কয়টি মাত্র দ্রব্য যোগাইতে পারিলেই তাহারা এই বিপদের হস্ত হইতে ত্রাণ পায়। মিঃ ব্রাউন মনে করেন যে পিতামাতাগণ খাদ্য যোগাইতে অপারগ হইলে কিম্বা সে বিষয়ে অবহেলা করিলে সরকারী খরচে বিদ্যালয় হইতে খাবার যোগানই উচিত। তিনি বলেন—

"যে ছেলের পুষ্টির একান্ত অভাব হইয়াছে, তাহাকে পড়িয়া তোলা অত্যন্ত শক্ত কাজ। এই রকম ছেলে-মেয়েরা সচরাচর অত্যন্ত জড়প্রকৃতি ও খিটখিটে হয় এবং ইহারা পড়াশুনা করিয়া উঠিতে না পারায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণীর বাকি ছেলেমেয়েদেরও পড়ায় পিছাইয়া রাখে। এই রকম এক একটি শিশুর লেখাপড়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহাতে শিশুর কিম্বা দেশের কোন উপকারই হয় না।

"খাদ্যের উপরেই বালকবালিকাদের শরীরের অবয়ব বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইলে এইসকল শিশুর যথাসময়ে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক আছে। বিদ্যালয়ে খাদ্য যোগাইতে হইলে একবার খাইতে দিয়া শেষ করিলেই চলিবে না। এই খাদ্যদানের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করা দরকার।

"বিদ্যালয়ে ছেলেদের খাইতে না দিলে কি ফল হয়, সে বিষয়ে ইংলণ্ডে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ব্রাডফোর্ড বিদ্যালয়ে ছুটির সময় ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইত না। এইসকল ছেলেরা যখন ছুটির পরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল প্রত্যেকে পড়ের উপর আধ সের করিয়া কমিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফল প্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি ছেলেকে ছুটির পূর্ব্বেও খাইতে দেওয়া হইত না। ছুটির পর দেখা গেল ইহারা প্রায় আড়াই পোয়া করিয়া কমিয়াছে। ছুটির ক্ষতিটা পূরণ করিতে প্রায় পনের দিন সময় লাগিয়াছিল। গ্রীষ্মের ছুটির সময় পরীক্ষা করিয়াও এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল।

"অনেকে বিদ্যালয়ে ভোজনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, ইহার ফলে নিঃসম্বল পিতামাতারা সন্তানপালনের বিষিদত্ত দায়িত্বের ভার অন্যের উপর অর্পণ করিবে। কিন্তু আমরা সেরূপ কিছু দেখি নাই। অধিকন্তু, অনেকে আমাদের নিযুক্ত লোকেদের সংস্রবে আসিয়া ছেলেদের কি খাইতে দেওয়া উচিত এবং তাহা কি প্রকারে প্রস্তুত করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে।"

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজনের আবশ্যকতা, দুর্নীতিপূর্ণ গৃহ, গৃহিণীর গৃহকার্য্যে অবহেলা অথবা সাংসারিক জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ। এইসকল স্থানে যথেষ্ট মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভোজনের ফলে যে সুফল উৎপন্ন হয়, বাড়ীতে অপার যত্ন থাকিয়া সে ফল নষ্ট হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য মিঃ ব্রাউন বলেন যে শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা সামাজিক সেবার একটি অঙ্গ হওয়া উচিত। (প্রবাসী)

মার্কিন মেয়েদের কথা।

প্রথম প্রস্তাব

আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে হিন্দুর নির্ব্বাসনের চেষ্টা চলিয়াছে। এ সময়ে মার্কিনের কথা বাঙালীর কাছে রুচিকর হইবে কি না জানি না; কিন্তু এ দেশে আমাদের সম্বন্ধে লোকের যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা দূর করিবার জন্য যেমন আমরা চেষ্টা করিতেছি তেমনি নিজেদের দেশেও যাহাতে এ দেশের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিতে পারে তাহার চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য বলিয়া বারবার অনুভব করিয়াছি।

আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে-সকল ভ্রান্ত ধারণা এ দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী বিশেষভাবে খৃষ্টীয় মিশনরী ও দু'দিনের পর্য্যটকগণ। আমরাও যে দায়ী সে কথা একশ' বার স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এই-সকল মিশনরী ও পর্য্যটকগণ আমাদের গৃহে কোনো দিন নিমন্ত্রিত হন না, এবং আমাদের সমাজ, গৃহপরিবার দেখিবার সুযোগ পান না, কাজেই ওঁহারা তাঁরা-তাঁরা যাহা দেখেন ও লোক-মুখে যাহা শোনেন তাহা কল্পনার রঙে চড়াইয়া কেতাবে লেখেন এবং তাহা বাইবেল অপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া এ দেশে গৃহীত হইয়া থাকে।

হটন্ ওয়েব্‌ষ্টার আমেরিকার একজন সুপরিচিত নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। যেদিন তিনি প্রকাশ্য সভায় হিন্দুকে "অর্দ্ধসভ্য" বলিয়াছিলেন সেদিন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাঁহার যুক্তি ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই; যৌন নির্ব্বাচন ও বিবাহচ্ছেদ প্রথা নাই; সাধারণ লোকশিক্ষা এখনো প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সতীদাহ, শিশুবলি, বহুবিবাহ ও জাতিভেদ এখনো সজীবপক্ষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার এই অভিযোগের উত্তরে ভারতবর্ষে আচরিত ঐ-সকল পাপের কোন্‌টি আমেরিকায় নির্ব্বিবাদে আচরিত হয় না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি "ঐ সকলের মধ্যে একটীও নয়" বলিবার পর উত্তরে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম এখানে দিলাম।

পাশ্চাত্য হিসাবে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে, মাদ্রাজে, রাজপুতনায়, কাশ্মীরে, বাঙলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে যে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে তাহা তিনি জানেন কি? বিরাট ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে অতীতে যৌন নির্ব্বাচন প্রথা সুপ্রচলিত ছিল এবং এখনো স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে তাহা তিনি জানেন কি? মুসলমান সমাজে ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে * (অনেকে ইহাদের "হিন্দু" নাম দিতে হয়তো আপত্তি করিবেন) বিবাহচ্ছেদ প্রথা সুপ্রচলিত তাহা তিনি জানেন কি? তা' ছাড়া বিবাহচ্ছেদ প্রথার বিদ্যমানতা সভ্যতার একটা উচ্চ অঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে কি? বিবাহচ্ছেদ প্রথা এ দেশে উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহাতে প্রত্যেক এগারটি বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে কি না? সাধারণ লোকের মধ্যে অক্ষর-পরিচয়ের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যে অসংখ্য জনমণ্ডলীর নিরেট মূর্খতা দূর হইয়াছে কি? সতীদাহ নাই বটে কিন্তু "লিঞ্চ" প্রথা (জীবন্ত নিগ্রোকে পুড়িয়া হত্যা করিবার প্রথা) প্রচলিত আছে কি না? প্রতিদিন অবাধে নারীহত্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে কি না? গঙ্গাসাগরে শিশুবিসর্জ্জন নাই বটে কিন্তু সহস্র সহস্র শিশু জননী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং সমীরের সময়ে নিহত হয় কি না? † বর্ব্বরদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল কি না, এবং এখনো আছে কি না? অসংখ্য পুরুষ এবং নারী পরস্পরের সহিত দুদিন ঘর করিয়া অবসাদ আসিলে চুক্তি করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতনের সন্ধানে বাহির হয় কি না? অথবা বিচ্ছেদের পূর্ব্বেই নূতনের সন্ধান ঠিক করিয়া লয় কি না?

* যথা ছোটনাগপুরের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে।

† শিশুর জীবন্ত সমাধি করিয়া প্রকারান্তরে বা সাক্ষাৎ-ভাবে তাহার প্রাণবধ করিয়া অর্থ লাভের চেষ্টার কথা পাশ্চাত্যদেশে কখন কখন শুনা যায়।

আমেরিকার সুবিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ডক্টর এলিয়ট হাওয়ার্ড এই পৌনঃপুনিক বিবাহচ্ছেদকে "ইকনমিক পলিগেমি" আখ্যা দিয়াছেন কি না? সমাজসঙ্গত বাল্যবিবাহ খুব সাধারণ না হইলেও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ এখনো প্রচলিত আছে কি না? সমাজ ও আইনঘটিত না হইলেও বালকবালিকার লৌকিক সমাগম ও সন্তানসম্ভাবনা যুক্তরাজ্যে অতি সাধারণ ঘটনা কি না? অ-শ্বেত যাত্রীদিগের জন্য যুক্তরাজ্যের দক্ষিণস্থ প্রায় সমুদয় ষ্টেটে স্বতন্ত্র ট্রামগাড়ীর ব্যবস্থা আছে কি না? রেলে নিগ্রো-লাঞ্ছনার প্রতিকারকল্পে নিগ্রোকুল ধুরন্ধর মিঃ বুকার টি ওয়াশিংটনকে সমরক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে কি না? টিউটনবংশীয় ব্যতীত অন্যান্য য়ুরোপীয় ও ঐশেয়ীয় জাতি-দিগকে এ দেশে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হয় কি না? সামাজিকতা ও বিবাহ ব্যাপারে ইহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা আছে কি না?

পণ্ডিত ওয়েবষ্টার জানিতেন না যে হিন্দু আমেরিকায় আসিয়া ছুড়িখাতা কিনিয়া, আমেরিকার যা' কিছু উৎকৃষ্ট ও যা' কিছু কুৎসিত দুয়েরই সংবাদ কাগজ হইতে কাটিয়া তাহাতে আঁটিয়া রাখে। যখন তিনি আমার প্রশ্নে আপত্তি করিলেন ও আমার অভিযোগ অস্বীকার করিবার চেষ্টা পাইলেন তখন আমি বলিলাম আমার ছুড়িখাতা আনিয়া দেখাইব?' পণ্ডিতকে তাঁহার তর্ক ত্যাগ করিতে হইল।

যখনি পারিব আমরা দেশকে সমর্থন করিব; কিন্তু যেহেতু আমেরিকায় এ সব আছে সুতরাং আমাদের লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই, আমরা যেন এরূপ একটা ধারণা করিয়া না বসি। আমরা যে কত বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছি, আমাদের মধ্যে কত গলদ রহিয়াছে তাহা কি আমরা একবারও অস্বীকার করিতে পারি? কিন্তু সে গলদ খ্রীষ্টান পাদ্রী চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে গেলে আমাদের অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। পৃথিবীর দেশসমূহের ক্রিয়াপ্রবাহ যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ গাত্রদাহ হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

মার্কিন মেয়েদের কথা কিছু বলিতে চাই। বিষয়টি অতি বড় ও অতি গুরুতর। এ সম্বন্ধে এ দেশে অসংখ্য বই লিখিত হইয়াছে এবং নিত্য নূতন বই বাহির হইতেছে, তবু উহা পুরাতন হইতেছে না। ভারতপ্রবাসী, হিন্দুর একান্ত মুক্তিকামী, সাধারণ খ্রীষ্টান পাদ্রীর চোখ লইয়া আমি এ দেশে প্রবেশ করি নাই। শ্রদ্ধা ও কৌতূহল-পূর্ণ হৃদয়ে এ দেশে আসিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে অনেক কুৎসিত, অকথ্য, অশ্রাব্য এমন কি অভাব্য জিনিষ আসিয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এমন অনেক জিনিষ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যাহাতে সমগ্র হৃদয়মন বিস্ময়ে, শুচিতায়, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় বহুবার ঊর্দ্ধে, কত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে! ভালোমন্দ দুইদিকের আভাস, ও বিশেষ ভাবে ভালো দিকটা ভালো করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব; কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যখন প্রথম দেখিলাম অসংখ্য সুন্দরীর মাঝখানে এক একটি পুরুষ বসিয়া একান্ত মনে পাঠে নিযুক্ত রহিয়াছে তখন একটু খটমট লাগিয়া গিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক। পাঠাগারের একটি আসনও খালি নাই বলিলে হয়, অথচ ভিড় সঙ্কট নাই। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে ক্লাশে যাইবার সময় পথে ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে একমাত্র সম্ভাষণ, "হেলো"! অল্পপরিচয়ে "গুডমর্ণিং"!

প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেলামেশার একটা-ধরাবাঁধা নিয়ম নাই; এরূপ মনে করিবার অবশ্য কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম অলিখিত কতকগুলি বিধি দ্বারা ইহারা সাধারণতঃ পরিচালিত হইয়া থাকে; তাহার ব্যতিক্রম হইলেই নিন্দা ইহাদের আক্রমণ করে। কোনো ছাত্র কোনো ছাত্রীর সহিত তাহার বাড়ীতে দেখা করিতে চাহিলে আগে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া ভদ্রমতি লইয়া, সময় ঠিক করিয়া তবে দেখা করিবে, নতুবা বে-আদবি হইবে। পথে কোনো ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হইলে, পরিচয়

থাকিলেও বলিবার মত বিশেষ কিছু না থাকিলে কথা ফুরিয়া দেওয়া অসঙ্গত। কোনো ছাত্রী সাধারণতঃ কোনো ছাত্রের বাসায় গিয়া দেখা করিতে পারে না; তবে ঐ ছাত্র পিতামাতা, ভাইভগ্নী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের পরিবারে থাকিলে তাঁহাদের উপস্থিতিতে ছাত্রী সে বাড়ীতে যাইতে পারে। প্রকাশ্য হোটেলে বা কাফেতে ছাত্রগণ ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে, উহা বিশেষ কারণ ব্যতীত নিন্দনীয় নয়। হার্ভার্ড, প্রিএস্, প্রিন্সটন্ প্রভৃতি পূর্ব্বদিকের বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়ম কিছু স্বতন্ত্র। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ছাত্রদের বান্ধবীগণ তাহা-দের বাসায় আসিয়া দেখা করিতে পারে, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও তাহাদের তেমনি অবাধ গতি। পরিচারিকা অথবা অভিভাবিকার উপস্থিতি নাম মাত্র। বান্ধবীদের লইয়া ছাত্রগণ নানা স্থানে বেড়াইতে গিয়া থাকে; তাহাতে কোনো বাধা নাই, অধিক রাত্রি না হইলেই হইল। থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই যুগলমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে অনেকে শঙ্কিত হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তবতঃ উহার মধ্যে যতটা শঙ্কার কারণ দেখা যায় সাধারণতঃ ততটা শঙ্কার কারণ উহার মধ্যে নাই। বাল্যকাল হইতে পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া মেয়েদের এমন একটা চারিত্রিক শক্তি, এমন একটা ব্যক্তিত্ব জন্মায় যে নিতান্ত প্রগল্‌ভ পুরুষ ছাড়া মেয়েদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতায় হাত দিতে কেহ সাহস পায় না। বস্তুতঃ বাসের পর বাস একটি অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত মিশিবার পরও একটি চুম্বন দিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে নতজানু হইতে হয় না এমন বিবাহার্থী পুরুষ বিরল। পূর্ব্বাঞ্চলে কৌতুকচ্ছলে যুবকগণ সকলের সম্মুখেই বান্ধবীদের সময়ে সময়ে চুম্বন দিয়া থাকে। কিন্তু মধ্য যুক্তরাজ্যে ও পশ্চিম যুক্তরাজ্যে বাগ্‌দানের পূর্ব্বে এরূপ চুম্বন রীতিবিরুদ্ধ। ইহা জানা কথা, যে, পাশ্চাত্যেরা চুম্বনকে ভারতবাসীদিগের হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখে। ভারতবর্ষেই দেখিয়া থাকিবেন, রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, ভগিনী ভ্রাতাকে বিদায়চুম্বন দিতেছেন। ব্যাঙ্ক, আপিস, আদালত, বিশ্ব-বিদ্যালয়, ডাকঘর, রেলওয়ে ষ্টেশন, রাজনৈতিক সভাগৃহ, হাসপাতাল, রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাক্ষেত্র, গির্জ্জাঘর যেখানে ইচ্ছা যাও, নারীর অধিকার প্রায় সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এ দেশে গৃহপরিবারের স্ত্রী সকল কর্ম্মের মূলশক্তি। প্রাচীন ভারতে নারীর যে অধিকার ছিল অধুনা তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকিলেও আমরা এখনো সে প্রভাব প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকি। আজ শিক্ষার অভাব, শক্তিতে সন্দেহ, ও বহুদিনের জড়তা আর্য্যগৃহলক্ষ্মীর পাদবিক্ষেপকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। সভয়ে ও কর্ম্মে ভীরু এই পাশ্চাত্য আর্য্য নারীর মূর্ত্তি কত শ্রদ্ধেয়, আমাদের নারীসমাজের কর্ম্মশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে কত আশাপ্রদ।

নারীর আত্মনির্ভরের আদর্শ এ দেশে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে এ পৃথিবীর আর কোথাও এমন ফোটে নাই। যেখানে পুরুষ বলিয়াছে, "এ কাজ নারীর দ্বারা সম্ভবপর নয়," নারী অমনি বদ্ধপরিকর হইয়া দেখাইয়া দিয়াছে পুরুষ যে সকল কাজ করিতে সমর্থ, নারী তাহা তো পারেই তাহা ছাড়া পুরুষ কোনোদিন করিতে সমর্থ হইবে না এমন কাজও নারীর প্রকৃতিতে সম্ভবপর। মোটর চালাইতে, বিদ্রোহ ও অশান্তির সময় শৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপন করিতে, বড় বড় যন্ত্রের কাজ পরিচালন করিতে, গুরুতর বিষয় সমূহের অধ্যাপনা করিতে, দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে, রাষ্ট্রীয় শক্তির সম্যক পরিচালনা করিতে নারী যে সমর্থ সমগ্র আমেরিকায় তাহা আজ, আর কেহ অস্বীকার করে না। এ বিষয়ে নারী পুরুষের সমকক্ষতা দেখাইয়া দিয়াছে এবং ইহার উপর আরো দেখাইয়া দিয়াছে যে নারীর জগৎমাতৃত্ব তাহাতে লোপ পায় না।

আমাদের দেশে ছাত্রগণ টুইশান করিয়া অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন; কায়িক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারুষ-পক্ষে কেহই রাজি হইবেন না। কিন্তু এ দেশে কায়িক শ্রমের ও শ্রমজীবীর যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর। এ দেশে আসিবার কিছুদিন পরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে

আমার নিমন্ত্রণ হয়। উক্ত পরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে গৃহকর্ত্রী তাঁহার পুত্র ও কন্যার সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন; তাহার পর একটি ফুটফুটে তরুণী ও একটি ১৬।১৭ বৎসরের বালকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহারা কে তাহা বলিলেন না। পরিচয়ের পর শেষোক্ত দুইজন পাশের ঘরে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিলাম তাহারা টেবিলে আহারের সব জিনিসপত্র আনিয়া রাখিতেছে। তখন উক্ত মহিলা অনুচ্চ স্বরে আমাকে বলিলেন, "ছেলেটি আমাদের চাকর, আর মেয়েটি উহার বোন্, এক সপ্তাহের জন্য আমাদের এখানে থাকিতে আসিয়াছে।"

অল্পক্ষণ পরে যখন সেই সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত পরিবারে উক্ত ভৃত্য বালক ও তাহার ভগ্নী আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে আহারে বসিল তখন বাস্তবিকই আমার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা সবসুদ্ধ সাতজন। গৃহকর্ত্তা মোহড়ায় ছিলেন। আহারের সময় বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ইহারা ঐ বালক ও তাহার শিক্ষিত ভগ্নীর প্রতি কেমন শ্রদ্ধা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিলেন। তাহার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নাই, কোনো অনুগ্রহের ভাব নাই। গৃহিণী নিজের ছেলেমেয়েকে এমন শিক্ষা দিয়াছেন যে তাহারাও যথেষ্ট সম্মান ও ভালবাসার সহিত ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। ইহা শুধু একটি পরিবারে দেখি নাই, প্রথম এই পরিবারে দেখিয়াছিলাম বটে কিন্তু তাহার পর অসংখ্য পরিবারে দেখিয়াছি এবং এই উচ্চ সাম্যের আদর্শকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়াছি।

আর একটি ঘটনা এই সঙ্গে মনে পড়িতেছে। যুক্ত-রাজ্যের ষ্টেট সেক্রেটারী মাননীয় ব্রায়ানের অনুজ মিঃ চার্লি ব্রায়ানের সঙ্গে হিন্দুনির্ব্বাসন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ইনি বিখ্যাত "কমনার" পত্রের সম্পাদক। মিঃ ব্রায়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে হাসির ফোয়ারা উঠিতে আরম্ভ হইল; তাহার পর নৃত্যের শব্দ, তাহার পর হাসির গান। বাড়ীর দাসীর জন্মদিনে ইহারা সমুদয় বৈঠকখানাটি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বাড়ীর শৃঙ্খলা ভাঙিতে দিয়াছেন জানিয়া একটু বিস্মিত হইয়া গেলাম। ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া তাহাদের কেহ কেহ সে রাত্রির মত উপরে পড়িতে চলিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ এই জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিয়াছে। শুধু সাধারণ পরিবারে নয়, মিঃ ব্রায়ানের মত সুবিখ্যাত পরিবারেও দাসীর এই অধিকার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ভৃত্যের প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি, এমন কি সখ্যভাব ভারতে বিস্তর মুসলমান বহুযুগ ধরিয়া দেখাইয়া আসিয়াছেন; পাশ্চাত্য জগতে ঐশ্বর্য্যের একাধিপত্যের মধ্যেও এই অনাবিল সাম্যের ছবি মনে গভীর আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শুধু যুবকগণ এ দেশে কায়িক শ্রম দ্বারা লব্ধ অর্থে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করে এমন নয়, মেয়েরাও করে। অসংখ্য মেয়ে, যাহাদের রূপ আছে, গুণ আছে, যাহারা ইচ্ছা করিলেই সুবিধামত বিবাহ করিতে পারে তাহারাও কত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শেখে তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এই-সব মেয়েদের দূর হইতে দেখিয়া এবং কাহারো সহিত পরিচিত হইয়া ইহাদের জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে শ্রদ্ধার ভাবই আসিয়াছে। কত সংগ্রাম ইহাদের, কত প্রলোভন প্রতিপদে, তবু ইহারা এই সংগ্রামকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লয়। ইহাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "নেব্রাস্কা ষ্টেট য়ুনিভার্সিটিতে সম্প্রতি প্রায় ৪০টি ছাত্রী স্বাবলম্বন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারা পরের বাড়ীতে শারীরিক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, সহজ ও স্বাস্থ্যকর উপায় বলিয়া বিবেচনা করে। • • • অনেকে নৃত্যের, বা অন্যবিধ গানের সাহায্য করিয়া লেখাপড়ার আংশিক ব্যয় উপার্জ্জন করে। কেহ কেহ বোর্ডিংএ বা রেস্তোরাঁয় পরিচারিকার কাজও করে। একজন টেলিফোঁর ভার লইয়াছে, ইহাতে রাত্রি জাগিতে হয়, সুতরাং ইহার যৌবনে-অকালবার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী। একজন জনৈক ডাক্তারের সহকারিণীরূপে বিষয়-বিশেষের তথ্যসংগ্রহে তাঁহার সাহায্য করিতেছে।

আর একজন জনৈক বধির স্ত্রীলোককে ইঙ্গিতে বই পড়িয়া শুনাইতেছে।"

কোনো কোনো বিষয়ে ইহারা ভুলের ঘারে মূর্চ্ছা যায় ইহা সত্য, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ লইয়া জীবন-সংগ্রামে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইবার আনন্দ হইতে ইহারা বঞ্চিত হইতে চায় না। বুকভরা সাহস ইহাদের, মুখভরা হাসি। অনেকের বিবাহের প্রতি তেমন অনুরাগ নাই, আবার অনেকের বেশ অনুরাগ আছে। যখনি সুযোগ পাইয়াছি তখনি এই-সব মেয়েদের ধর্মভাব, ইহাদের কর্ম্মের আদর্শ, ইহাদের সাহিত্যের অনুশীলন, ইহাদের বন্ধুত্ব, মোটের উপর সকল দিক হইতে ইহাদের বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাদের একজন লিভারপুল্ সহর হইতে দূরবর্ত্তী এক সহর হইতে তাঁহার জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"আমার মনে হয় আমেরিকার মেয়েরা আসলে কেমনতর তা আপনার বুঝতে অসুবিধা হয়। বস্তুতঃ আমার নিজের মনের ভাব যা তা' এই—নারীর পক্ষে মা হওয়ার বাড়া আর কোনো সৌভাগ্য নেই। এ পৃথিবীতে ভালো স্ত্রী ও ভাল মায়ের বড় প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে আমার একান্ত কামনা যেন মিসেস্ • • • র মত আদর্শ-মা হতে পারি। যদি মা হওয়ার দুর্লভ অধিকার হতে বঞ্চিত হই, তবে এমন কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত অথবা প্রচারসম্পর্কীয় কাজ নেব যাতে অন্যান্য জননীরা যে-সকল সন্তানের ভার নিতে পারেন না তাদের সামান্য সেবাতেও লাগতে পারি।" কি চমৎকার কথাগুলি! শুধু কথাগুলি যে চমৎকার তাহা নয়, ভাবটি কত সুন্দর! ইহাদের বয়স ২০।২১এর বেশি নয়, অথচ কেমন গাম্ভীর্য্যের পরিচয় উক্তিগুলির মধ্যে! কে বলিবে ইহা আদর্শ হিন্দুনারীর উক্তি নয়? আমাদের দেশের মেয়েরা যেদিন দলে দলে এই ভাবের ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন সেদিন কি সুখের দিন হইবে।

যাহারা পরিব ও নানাবিধ সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহাদের জীবন তো সাধারণতঃ সুন্দর বটেই, তা ছাড়া যাহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল গৃহের মেয়ে তাহারাও জীবনকে বেশ দায়িত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। ইহাদের কিছু "ফুলের মতন, হাসির মতন, কুসুমসম্ভারাশির মতন, ছাওয়ার মতন, নেশার মতন" এরি আসিয়া ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। ইহারা স্বেচ্ছায় গৃহে শ্রম করে, সমাজের সকল কাজে যথাশক্তি আপনার সেবার ফসল আনিয়া দেয়, প্রেমেও সংযমের সাধনা করে; ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি ইহাদের অনেকের জীবনে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের আর-একটি অনূঢ়া কুমারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টা কতকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। ইনি লিখিতেছেন:—"আমি প্রয়োজন হইলে যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি এ কথা স্মরণ রাখিয়া লেখাপড়া শিখিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি নিজের সংসার পাতিয়া যাহাতে জীবনের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে নিজেকে ফুটাইয়া তুলিয়া আমার পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থা ও ঘটনার একটি নিবিড় ঐক্য স্থাপন করিতে পারি সেই দিকেই আমার বিশেষ লক্ষ্য। আমি সেই সকল গুণ কামনা করি যাহাতে আমি স্ত্রী ও মাতৃরূপে আমার সকল কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারিব, ও গৃহের সকল অনুষ্ঠানে উদ্দীপনা আনিয়া দিতে সমর্থ হইব·····যদি স্বামী ও সন্তানলাভ আমার ভাগ্যে না থাকে তবে ভবিষ্যতে যে ভাবেই হউক অল্পবয়স্ক বালকবালিকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে আমার একান্ত কামনা।" (প্রবাসী)

অম্বা

'অম্বা' আলো ও ছায়া প্রণেত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ প্রণীত একখানি নাট্যকাব্য। কাব্যখানির ছাপা বাঁধাই সুন্দর। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রকাশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার, ৭৪।১।১এনং হ্যারিসন রোড কলিকাতা। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

'আলো ও ছায়া', 'পৌরাণিকী', 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' ও 'অশোক সঙ্গীতের' কবি আজ আবার 'অম্বা' উপহার লইয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে এ উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম। এ উপহার পাইয়া ভাষা ও ভাবসম্পদে যে বাঙ্গালী-সাহিত্য ধনী হইয়াছে তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কবি ভূমিকায় বলিয়াছেন, "……বাঙ্গালীর ভাষায়—বিশেষ কবিতার ভাষার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে জানিয়াও পুরাতন বেশেই অম্বা প্রকাশ করা গেল।" 'পুরাতন বেশই' যদি এমন সুন্দর, সহজ ও সংযত ভাষার উৎপত্তি হইতে পারে, নূতনের বিচিত্রতা সেক্ষেত্রে গ্রাম্য ভাষার দুষ্ট হইবারই আশঙ্কা অধিক। প্রকৃতপক্ষে কাব্যখানি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। তরী যেমন মৃদুল তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া অতি সহজভাবে আনন্দে ভাসিয়া যায়, আমিও তেমনি কাব্যের অপূর্ব্ব লেখায় মুগ্ধ হইয়া, মধুর কবিতা ও অনাহত ছন্দের তালে তালে, শ্রুতিমধুর সরল ভাষার একটানা স্রোতে ভাসিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গিয়াছি; কিছুতেই বিরাম নাই, বরং একটা গভীর আনন্দের ভিতরেই কাব্যখানি শেষ করিয়াছি। একবার দুইবার যত বারই পড়িয়াছি কাব্যসৌন্দর্য্যের এক একটা দিক আমার দিকে খুলিয়া গিয়াছে, চিত্রিত চরিত্রগুলির উজ্জ্বল রেখা মনের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র কলেবর কাব্যখানির ভিতর যে এত সম্পদ ও শক্তি লুকায়িত ছিল, পড়িবার আগে বুঝি নাই, কিন্তু পড়িয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। কাব্যখানির সমুদয় সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত—তাহা করিতে চেষ্টাও করিব না। এই প্রবন্ধে আমি কেবল কাব্যসুন্দরী অম্বা সম্বন্ধেই গুটিকয়েক কথা বলিব।

পুস্তকখানি খুলিয়াই আমরা বালিকা অম্বার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে পিতাপুত্রীর আলাপের মধ্যে অম্বার যা একটু পরিচয় পাই তাহাতেই তৎপ্রতি একটা প্রশংসা ও সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠে। তারপর প্রায় প্রতি দৃশ্যেই আমাদের সহিত অম্বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু এই ঘনিষ্টতার ফলে অম্বার প্রতি পূর্ব্বলব্ধ উচ্চ ভাবের কোন লাঘব না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। অম্বা দ্বাপরের মানুষ হইলেও বর্ত্তমান যুগের আদর্শ বালিকা। অম্বার প্রধান গুণ যাহা আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করে তাহা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান। শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী বালিকার পিতার প্রতি যথেষ্ট সম্মান, ভালবাসা ও ভক্তি আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পিতার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অম্বা সক্ষম। ইহাতে অম্বার যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পিতার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে অম্বাকে যে কত খানি স্বার্থত্যাগ করিতে ও দুঃখকে বরণ করিয়া নিতে হইয়াছিল তাহা পরিমাণের বহু ঊর্দ্ধে। বাধ্য হইয়া ভক্তিভাজন পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অম্বা যে মানসিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন দ্বাদশ বর্ষ তপশ্চর্য্যার ক্লেশও তার তুলনায় অম্বার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় এ দুঃখভোগ ও স্বার্থত্যাগ করিতে অম্বা সম্পূর্ণ রাজী। যিনি চিরাময় ছিলেন বলিয়া স্বগৃহে পিতার আগমন পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া বুঝিয়া তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান দেখান হয় নাই এই দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া—

"প্রণমি চরণে তাত, ক্ষম অপরাধ
শুনি নাই পদধ্বনি"

এই বলিয়া পিতার প্রতি অনন্যসাধারণ প্রীতি ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনিই আবার কর্ত্তব্য ও আত্মসম্মানের অনুরোধে পিতার অন্যায় ব্যবহারের প্রতি সাভিমান অভিযোগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহাতে অম্বার যে একটা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে তাহা আমাদের সমাজে নারীচরিত্রের একটা অভিনব বিশেষত্ব।

কাশীরাজ শাল্যপতি হয়ত অম্বাকে স্বয়ম্বরা হইতে অনুমতি দিতে পারেন না। কারণ অম্বা শোভরাজ শাল্যকে পতিত্বে বরণ করিলে রাজনৈতিক হিসাবে রাজা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সুতরাং যখন হস্তিনাপুর হইতে কুরুরাজ বিচিত্রবীর্য্যের প্রতিনিধি হইয়া অমিততেজা বীর ভীষ্ম বিবাহ সভায় আসিতেছেন সংবাদ পাইলেন তখন নীতিকুশল রাজা অম্বাকে 'বীর্য্যপণে' বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন, কেন না যুদ্ধে যে ভীষ্ম সর্ব্বজয়ী হইবে সে বিষয়ে রাজার একটুও সন্দেহ ছিল না। অম্বা যে রাজার ঐ উদ্দেশ্য বোঝেন নাই তাহা নহে এবং বুঝিয়া তর্কও করিয়াছিলেন।

সে দুঃখের স্মৃতি অম্বার প্রতি আমাদের করুণা ও সহানুভূতি ও পিতা যে দুহিতার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করিতেছেন এই ভাবই জাগাইয়া দেয়, এই কঠোরতা রাজা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা না হইতে পারে, কিন্তু ইহা রাজনীতির খাতিরে অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার কঠিন আঘাতে যে দুহিতার তরুণ-হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল তত্টা রাজা তলাইয়া দেখেন নাই। অম্বা রাজার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন—

'দেব এ হৃদয় জয়
করেছেন সৌভরাজ ; অপি তাঁর করে
সুখী কর তব কন্যা সুখী কর তাঁরে'

কেননা—

'ভাগ্যবশে কিংবা গ্রহদোষে যদি,
অতর্কিত পরাজয় ঘটে, অকস্মাৎ,
তখন কি হবে গতি ভাবো ত উচিত ?'

কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনের নিকট সে যুক্তি টিকিল না। ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে শাল্ব পরাজিত হইলেন। ভীষ্ম অম্বাকে রথে উঠাইয়া হস্তিনার দিকে লইয়া চলিলেন। পথে অম্বা ভীষ্মের নিকট আপনাকে অনুগত প্রাণা ও "শাল্বরাজে মনে মনে করিয়াছি বরণ" এই কথা প্রকাশ করিলে আর্ত্তের শরণ ও সত্যপ্রিয় বীর ভীষ্ম তাঁহাকে সসম্মানে কাশীরাজের নিকট ফিরাইয়া দিলেন। রাজা তখন অনন্যোপায় হইয়া সৌভরাজের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এবং অম্বাও শাল্বের প্রতি হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও বিষয়তার নিদর্শন দ্বারা একখানি লিপি গুপ্ত অনুচর দেবলকে দিয়া শাল্বের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাল্ব, "কাশীরাজ উচিত বিধানে রাখে নাই যাচকের মান" এই অভিমানে অম্বাকে নির্জ্জিতা, প্রত্যাপিতা" বলিয়া তাঁহার প্রেম ও রাজার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। শাল্বের এ প্রত্যাখ্যান আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কাশীরাজ যে শাল্বের প্রতি ব্যবহার ভাল করেন নাই, তাহা মানি এবং ইহাতে যে শাল্বের অভিমান জন্মিতে পারে তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু এ অভিমান ক্ষত্রিয় রাজাকে সাধারণ কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিল এই দুঃখ। নিজের প্রতি অম্বার গাঢ় অনুরাগ ও তাহার বিগলিত হৃদয়ের খাঁটি পরিচয় পাইয়াও লোকনিন্দার ভয়ে কিংবা ক্ষুদ্র অভিমানের বশ আত্মপ্রার্থী অম্বার প্রেম 'ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া শাল্ব ক্ষত্রোচিত বীরত্বের কার্য্য ত করেনই নাই বরং নারীর প্রতি ক্ষত্রোচিত একটী সাধারণ সম্মান দেখাইবারও ত্রুটী করিয়াছেন। এ সাধ্বী নারী-প্রেমের অবমাননা করিয়া শাল্ব হৃদয়ের যে ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিলেন তাহাতে অম্বা আপনাকে লজ্জিতা ও অপমানিতা মনে করিলেন। এবং এই অপমান বোধ হইতে তাঁর প্রকৃতিগত অসম্মানের যে তেজ জ্বলিয়া উঠিল তাহা নারীমর্য্যাদার প্রতি এ অন্যায় অপমানের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল। অম্বা তখন মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন তাঁর শত্রু কে। শাল্ব ? সে নহে, কেননা প্রত্যাখ্যান ব্যাপারে শাল্ব তার যে পরিচয় দিয়াছে তাহাতে তাহার প্রতি অম্বার ক্রোধ না হইয়া ঘৃণামিশ্রিত করুণার উদয় হইয়াছে। যে ঘৃণার পাত্র তা'কে মারিতে হাত উঠে না। তাই ক্রমে ভীষ্মই সেই ক্রোধ বহ্নির লক্ষ্যস্থল হইল। এখানে কবি যে পুরাতনকেই যথাযথ অনুসরণ করিয়া ভীষ্মকে অম্বার ক্রোধের লক্ষ্য স্থির করিলেন তাহাই মনে হয়। তবে ইহাতে মনে হয় যে অম্বার মত তেজস্বী নারীর পক্ষে ভীষ্ম ছাড়া অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর মনঃপূত হয় নাই। ভীষ্মকে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাছিয়া লইয়া অম্বা আপন যোগ্যতা ও উদারতারই পরিচয় দিয়াছেন এবং এই নির্ব্বাচন বাহ্যতঃ অযৌক্তিক হইলেও অসামঞ্জস্য হয় নাই। ভীষ্মকে বধ দেওয়াই যখন অম্বার কর্ত্তব্য স্থির হইল তখন অম্বা তৎসাধনকল্পে গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া দ্বাদশবর্ষ শিবারাধনা করিলেন এবং তপঃসিদ্ধ হইয়া শিবের নিকট ভীষ্ম বধের বরপ্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বর পাইয়াই অম্বা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভীষ্ম বধের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিলেন—পুরুষদ্বেষী অম্বার সত্য নারীত্বটুকুই শেষে জয়ী হইয়া উঠিল। হিংসা, ক্রোধ ও কঠোরতা এই পৌরুষবৃত্তিগুলি বল বাঁধিয়া অম্বার অন্তরে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বসা

হৈ চৈ করিতেছিল, সময় বুঝিয়া তারা সরিয়া পড়িল, কেননা নারী অম্বায় সত্যকার জিনিষ যাহা—কোমলতা, দয়া ও ক্ষমা তারা এখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। যতক্ষণ ভীষ্ম অম্বার আয়ত্তের বাহিরে ছিলেন ততক্ষণ তাঁর দণ্ড ভীষ্মের জন্য খাড়া ছিল; কিন্তু ভীষ্মকে মুঠার মধ্যে পাইয়া অম্বা সকল শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন, তাঁর ক্রোধ ও কঠোরতা প্রেমের প্রস্রবণে ভাসিয়া গেল। নারী অম্বা পুরুষ ভীষ্মকে আর দণ্ড দিতে পারিলেন না; কেননা নারী দণ্ড দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করিতেই জানেন ভাল। কিন্তু অম্বার তখন বাঁচা অসম্ভব হইল। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লইয়া জীবন চলিতেছিল তাহার যখন অবসান হইল, জীবনটাকে অম্বার নিকট একটা নিরর্থক বোঝা বলিয়া ঠেকিল। তাই অগ্নিকুণ্ডে এই আশা ও উদ্দেশ্য শূন্য নিরর্থক জীবনটাকে আহুতি দিলেন।

রাজনৈতিক বিবাহের চাপে পড়িয়া এ দেশে ও বিদেশে কত রাজপুত্র রাজপুত্রী ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যখন পিতা পুত্রীর হৃদয়ের দিকে না চাহিয়া কঠোর নির্মম ভাবে কন্যাকে পরিণীতা করিতে চাহিলেন তখন পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে অম্বার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তারপর সভার অপমানকর প্রত্যাখ্যানে তেজস্বী বালিকার কঠোর প্রতিশোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজের এমনি দুরবস্থা যে অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীর উদ্দীপ্ত রোষতেজ সমাজের অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে যাইয়া নিজেই ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভস্ম হইল।

আজ আমাদের দেশে শিক্ষিত নারীসমাজে ব্যক্তিত্ব বোধের একটা সাড়া পড়িয়াছে; তাদের চলিবার পথে আমাদের অম্বাকে আদর্শ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। অম্বা প্রণেত্রী অম্বাকে একটা কোন কিছুর আদর্শ বলিয়া সমাজে প্রচার করিবেন এই উদ্দেশ্যে অম্বা লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু মনস্তত্ত্বে গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ শিল্পকুশলতার সাহায্যে পুরাকালের একটা বালিকাকে বাছিয়া তার চরিত্রের বিশেষত্বটুকু পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এমনি সহজ নিপুণতার সহিত ফুটাইয়াছেন যে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অনূঢ়া বা পরিণীতা বালিকার চলিবার একটা সঠিক পথ বাছিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। যথাসাধ্য পিতামাতার ব্যবস্থা মানিয়া চলাই অনূঢ়া বালিকার কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন সে ব্যবস্থা বিবেক ও আত্মসম্মানকে আঘাত দেয় তখন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান বালিকার ভিতরে যে নারী আছে তাহারই সহজ প্রকাশ—তাহা অবাধ্যতা বা স্বেচ্ছাচার নহে। নারীদের যে কোন প্রকার স্বাধীন মত বা ব্যক্তিত্ব আছে আমাদের সমাজ কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করে না। আর মেয়েরাও অভ্যাসের গুণে ব্যক্তিত্বকে পরাইয়া দিয়া চিরাগত সংস্কারের একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলেন। অম্বা এই স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই, তাই অম্বা স্বতন্ত্র এবং নারীদিগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আমাদিগের প্রশংসা ও সম্ভ্রম অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতিহাবক ও ভক্তি ভাজন আত্মীয়ের কথা ভাল হউক মন্দ হউক, বিনা প্রশ্নে, নতশিরে পালন করিয়া যাওয়াই যে বাঙ্গালী নারীর কর্ত্তব্য, সমাজের এই বিষবৃক্ষ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাব্যখানির ভিতরে যে একটা নীরব বাঙ্গ রহিয়াছে তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। ইহা একান্ত স্বাভাবিক; কেননা কবি নারী এবং নারীদিগের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির চেষ্টার ভিতরে করির গভীর সহানুভূতি ও স্বার্থের একটা পূরা মিল রহিয়াছে যাহা পুরুষের থাকা প্রকৃতিগত অসম্ভব। আলোচ্য কাব্যখানিতে অম্বার চরিত্রের ভিতরে কবি এই একটা সুরই বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন —ইহা নারীদিগের ব্যক্তিত্ব বোধ ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান। এবং এই প্রতিকূল সামাজিক ব্যবহারের ভিতরে এ দুইটী ভাব রক্ষে সার্থক করিতে যে কতখানি আত্মত্যাগ ও মানসিক তেজের প্রয়োজন তাহাও দেখাইয়াছেন।

এই কাব্যখানিতে আর একটী নিপুণ সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। তাহা এই যে, কবির প্রিয় আলেখ্য গ্রন্থের নায়িকা অম্বাকে বড় করিতে গিয়া তাঁর প্রতি-

ধন্বী ভীষ্মকে কোন অংশে খাট করেন নাই। অম্বার মুখ দিয়াই কবি বলাইয়াছেন—

'মহান ভীষণ ভীষ্ম উদার প্রকৃতি
সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি প্রতিম,
নাহি মানবের হিংসা বাসনা পিপাসা।'

অম্বার মুখে ভীষ্মের এই প্রশংসা বড়ই শোভন হইয়াছে। যাহার গুণের যিনি পূজা করিতে পারেন তিনি বাস্তবিক মহৎ। এই কথা কয়টীতে ভীষ্মের চরিত্র যেমন সুন্দর ফুটিয়াছে, অম্বারও তেমনি মহাপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ভীষ্মের আর বিশেষ পরিচয় আমরা এক্ষেত্রে দিব না। মহাভারতে দেবর্ষিপ্রতিম ভীষ্মের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি কবি তার গ্রন্থে সে চিত্র নিখুঁত রাখিয়াছেন। গ্রন্থের আর একটী চরিত্র সত্যবতী। ইনি অপরাপর গ্রন্থে যেমন অবধা লাঞ্ছিতা হইয়াছেন এখানে তদ্রূপ হয় নাই। তাঁর চরিত্রটী সুন্দর ও নির্মল ভাবেই এখানে ফুটিয়াছে। পুরুষ হইয়া যাঁরা নারীচরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁদের বাহাদুরি কিছুই নাই বরং কুরুচি ও সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সত্যা একটু লাঞ্ছিতা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তার কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য। ঐ লাঞ্ছনাটুকু না হইলে, আমাদেরও একটু আক্ষেপ থাকিয়া যাইত। কাশীরাজ রাজনীতিজ্ঞ বৈষয়িক রাজা। রাজনীতির কাছে হৃদয়দান বা হতাশ ছেলেমানুষী—একেবারেই নগণ্য—তুচ্ছ। রাজনীতির খাতিরে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই অবশ্যপালনীয়। এ চিত্রটীতে কবি নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব,—তাহা অদৃষ্ট সম্বন্ধে কবির মত। পূর্ব্বে একস্থলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে কবির মতের যে পরিচয় অম্বাতেও তারই পরিবর্দ্ধিত প্রতিধ্বনি। কবির অদৃষ্ট সম্বন্ধে এই মত আমাদের সমাজে অভিনব ও প্রচার যোগ্য। কারণ ইহার প্রচারে আমাদের অতিমাত্রায় গত সমাজের নিষ্ক্রিয়তা দূর হইলেও হইতে পারে।

"অদৃষ্টের নাহি হস্তপদ, আপনি সে
স্বয়ম্বর সভা হ'তে নয় যায় কাড়ি
অম্বারে, অদৃষ্টে ধরি আনিব কেমনে?
সে যাহারে ক্রূরভাবে করেছে নিরোধ
তারে যদি অদৃষ্টেরে দিব প্রতিশোধ,
এই-ই বৈষম্যতা বিধাতার সাথে। অনুকূল বিধি
ভীষ্মে, প্রতিকূল নারী অম্বাপ্রতি,
ভীষ্মে নাশি আনিব ধাতায়।

যে দেশে এমন কি শিক্ষিত পুরুষসমাজে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অনেকে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, 'অদৃষ্টের লিখা না যায় খণ্ডন' এই মহাবাক্যের অনুহাতে আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার সেবা করেন সে দেশে নারীর পক্ষে 'অদৃষ্টের নাহি হস্তপদ সে কেবল মানুষেরই হাতে অপরের অদৃষ্টরূপে খাটে' এই নীতি মানিয়া অদৃষ্টের সহিত লড়াই করা নূতন ব্যাপার। এই নূতন আদর্শে অম্বিত হইয়া অম্বা আমাদের চক্ষে আরো উজ্জ্বল আরো গরিয়সী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কৃতজ্ঞতা

তুমি মোরে এই বিশ্বে যা' করেছ দান,
তাহার তুলনা নাই হে শক্তি-মহান্!
প্রতিদিন শশীভানু আলো দিয়ে যায়,
অনিল সদাই মম সেবে থাকে গায়!
বরষি করিলে তুমি পান করি জল,
গ্রীষ্ম দূরে যায় চলে, ধরণী শীতল!
ছয় ঋতু নানারূপ ফল প্রসবিয়া
আমারে করিছে দান, তৃপ্ত মোর হিয়া।
হে বিশ্বদেবতা, তব কাননের ফুল,
আমার পরাণ নিত্য করিছে আকুল!
যা' দিয়েছি তাহা মোর মহামূল্য ধন;
ভুলিতে দিয়োনা কভু থাকিতে জীবন।
কল্পতরু তুমি, দেব, চরণে তোমার
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজি করি নমস্কার।

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

বিচিত্র বিবাহ

এই প্রবন্ধে আমি বিবাহের বিষয় অবতারণা করিব, আশা করি ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, কারণ বিবাহে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও বিবাহ এরূপ "ডিলীর লাড্ডু" যে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, যে-কারণেই হউক, বিবাহের নামে প্রায় সকলেই উৎফুল্ল। তবে আমি অবশ্য সনাতন বিবাহের গল্প বা ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিশুদ্ধশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট আট প্রকার বিবাহের কথা বলিব না। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে এ আবার কি প্রকার বিবাহ! তাঁহাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য বলিতেছি, এই বিবাহ আসল নহে, নকল। নকল আজকালের জিনিষ নহে, উহা চিরকালই আছে, তবে আজকাল কিছু বেশীরেশী, পূর্ব্বে কিছু কম ছিল। বিবাহব্যাপারটি জীবের অস্তিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, বহু পুরাতন, সুতরাং ইহাতেও নকল জুটিবে বিচিত্র কি? এই সকল নকল বিবাহের একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা কতক বুঝিতে পারিবেন। শুনিয়াছি (সত্য মিথ্যা জানি না) কলিকাতার খুব নামজাদা একজন সাহেব অধ্যাপককে (তিনি এখনও জীবিত আছেন) কেহ তাঁহার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার বইএর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে" তিনি পুস্তক-বিবাহের উপযুক্ত লোকই বটে, কিন্তু তাঁহার এই পুস্তক-বিবাহ ঠিক নকল বিবাহ নহে, কারণ তিনি সত্য সত্যই বিবাহের রীতি-অনুসারে পুস্তকের সহিত বিবাহিত হন নাই, যদি তাহা হইতেন তাহা হইলে উহা পুরা নকল বিবাহ হইত। আমার বর্ণিত বিবাহ মানব-সমাজে প্রচলিত এইরূপ বিচিত্র বিবাহ।

উদ্ভিদের সহিত বিবাহ।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রথা আছে, বোধ হয় অনেকেই জানেন, যে, যদি কোন লোকের দুইবার স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং সে যদি তৃতীয় বার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অগ্রে কোন একটি ফলগাছের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া পরে নির্দ্ধারিতা কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। এরূপ পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ দিবার কারণ যাহার দুইবার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে তাহার "বার বার তিন বার" সূত্র-অনুসারে তৃতীয়বারও স্ত্রীনাশের সম্ভাবনা। সুতরাং বৃক্ষ তৃতীয় পত্নী হইল, মরে ত সেই মরিবে, চতুর্থের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

পঞ্জাবপ্রদেশে কাহারও শাস্ত্রমতে তৃতীয় বার বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং যদি কাহারও তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকে আকগাছ বা বাবলা গাছ বিবাহ করিতে হয়। তাহার পর নারীর সহিত বিবাহ হইতে পারে। কারণ ঐ বৃক্ষ কন্যা হইয়া তৃতীয়বার বিবাহের দোষ খণ্ডন করিয়া দিল।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যদি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহারও পত্নীবিয়োগ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ তৃতীয় বার বিবাহ করিতে হয়, তবে পুরোহিত অগ্রে তাহাকে একটি ইক্ষুক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তথায় ইক্ষুবৃক্ষের সহিত তাহার যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন। পরে সে স্থিরীকৃতা কন্যার পাণিগ্রহ করে।

সেইরূপ আবার বিন্ধ্যাচলপ্রদেশস্থ পার্ব্বত্য জাতি-দিগের কাহারও তৃতীয়বার বিবাহের বাসনা হইলে তাহাকেও অগ্রে আম গাছ বিবাহ করিতে হয়। উক্ত বিবাহের এইরূপ নিয়ম। কোন একটি আম্রবৃক্ষের নিকট একটি বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, অথবা বেদীর নিকট আম গাছ আনিয়া বসান হয়। তৎপরে সাধারণতঃ যেরূপ রীতি-অনুসারে বিবাহ হয়, ঐ বৃক্ষের সহিতও ঠিক সেইরূপ ভাবে লোকটির বিবাহ দেওয়া হয়। তাহার পর বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে একগাছি মঙ্গলসূত্র দশবার জড়ান হয়। বৃক্ষটি চারি দিবস এইরূপ অবস্থায় থাকে পঞ্চম দিবসে এই বৃক্ষবিবাহের অবসান হয় ও লোকটি তখন যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারে।

মাদ্রাজপ্রদেশে এক জাতির মধ্যে কোন লোকের প্রথম পত্নীবিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে একটি কলাগাছ বিবাহ করিতে হয়।

আমাদের দেশের কোন কোন নীচ জাতি বিবাহের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে আম্রবৃক্ষের সহিত পরিণীত হইয়া থাকে। ঘুণ্ডারি কোলগণ বিবাহের পাত্রহরিদ্রার পর পাত্রকে একটি আমগাছের সঙ্গে ও পাত্রীকে একটি মহুয়া (মৌয়া) গাছের সঙ্গে বা তাহার অভাবে আমগাছের সঙ্গে বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহের পর বরকন্যা বৃক্ষ দুইটিকে জড়াইয়া ধরে ও তাহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য বৃক্ষ দুইটির সহিত বন্ধন করিয়া রাখা হয়। তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া বর কন্যাকে বিবাহ করে। পশ্চিম অঞ্চলেরকুর্ম্মিদিগের বিবাহপ্রথাও প্রায় এইরূপ। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে বরকে একটি আম্রবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া একটি মঙ্গলসূত্র দ্বারা তাহাকে ঐ বৃক্ষটির সহিত বন্ধন করিয়া রাখা হয় এবং বর তাহার বৃক্ষ-বধূকে সিন্দুর পরাইয়া দেয়। কন্যাটিও ঠিক ঐরূপ ভাবেই একটি মহুয়া বৃক্ষের সহিত বদ্ধ থাকে। তাহার পর কিছুক্ষণ পরে তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া আম্রবৃক্ষের একটি পল্লব ঐ সূত্র দ্বারা কন্যার হস্তে ও মহুয়া-বৃক্ষের পল্লব বরের হস্তে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর-কন্যার বিবাহ হয়। এই সকল জাতির ধারণা, অগ্রে বৃক্ষের সহিত বিবাহ না হইলে কোন বিবাহই মঙ্গলজনক হয় না।

পঞ্জাব প্রদেশে ধনী লোকদিগের সন্তানাদি না হইলে তাহারা বাড়ীতে অতি যত্নসহকারে একটি তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে। তুলসীগাছটি বড় হইলে উহাকে বিবাহের যথাযথ রীতি-অনুসারে একটি ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেয় ও ব্রাহ্মণ তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের জামাতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

নবদ্বীপে তালবনের জন্য তালগাছ কাটিবার পূর্ব্বে লোকটি অগ্রে তালবৃক্ষটির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার পর বৃক্ষটিতে ছিদ্র করে। কারণ বিবাহিত তালবৃক্ষের সে তখন কর্ত্তা, সুতরাং তাহার উপর লোকটির তখন সম্পূর্ণ অধিকার!

কাঙ্গরা জেলায় যদি কন্যার অভিভাবকগণ তাঁহাদের কন্যার জন্য কোন পাত্র স্থির করেন কিন্তু কন্যার ঐ পাত্রকে বিবাহ না করিয়া তাহার নিজের মনোনীত কোন লোককে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কন্যা নিজ প্রিয়পাত্রের সহিত অরণ্যে পলায়ন করে। বনে গিয়া একটি বৃক্ষের নীচে অগ্নি জ্বালিয়া প্রিয়পাত্রের সম্মুখে ঐ বৃক্ষটিকে বিবাহ করে। ইহাতে পূর্ব্বের বিবাহ-সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যায় ও কন্যার বৃক্ষ-বিবাহ অনুমোদিত হওয়ায় সে তখন প্রিয়পাত্রকে বিবাহ করিতে পারে।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে কোন কোন জাতি যৌবনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করে, যে, যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহের পাত্র না জুটিলে কন্যাকে যথাবিহিতভাবে একটি কদলীগাছের সহিত বিবাহ দিয়া রাখে।

গুজরাটে এক জাতি আছে যাহাদের কন্যাদিগের বিবাহে কোন কারণে যদি কোন অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা কন্যার একটি আম্রবৃক্ষের বা অন্য কোন ফলবান্ বৃক্ষের সহিত বিবাহ দেয়। ঐ জাতির মধ্যেই আবার কোন কোন সম্প্রদায় বিবাহ-যোগ্যা কন্যার পাত্র সন্ধান করিতে না পারিলে একটি ফুলের তোড়ার সহিত মন্ত্রপূত বিবাহের নিয়ম-অনুসারে কন্যার বিবাহ দেয়। 'মিলনযামিনী গত হইলে, শুকান ফুলদল' রূপে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কন্যাও বিধবা হয়। তাহার পর বিধবা কন্যার বিবাহ যখন-তখন দেওয়া চলিতে পারে। ইহার জন্য পরাশরসংহিতার বচন খুঁজিবার প্রয়োজন হয় না।

অযোধ্যা প্রদেশে পাত্রপাত্রীর গ্রহ-নক্ষত্রাদির অসামঞ্জস্য হইলেও যদি ঐ বিবাহ একান্ত বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে অগ্রে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। এই অশ্বত্থবৃক্ষ-বিবাহে 'গ্রহের ফের' কাটিয়া গেলে বরকন্যার বিবাহ হইতে পারে।

নেপালে নেওয়ার জাতি তাহাদের কন্যাদিগের বাল্য-বয়সে একটি বিল্বফলের সহিত বিবাহ দেয় এবং বিবাহান্তে বিল্বফলটিকে নদীর জলে নিক্ষেপ করে। এই বিল্বফলের সহিত বিবাহই তাহাদের আসল বিবাহ। তাহার পর কন্যার যৌবনপ্রাপ্তিতে তাহারা কন্যার একটি মনুষ্যস্বামী বিবাহ দেয়। এই মনুষ্যস্বামীর

লোকান্তর হইলে কন্যা পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে বা মনুষ্যস্বামীর গৃহে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইলে সে এই স্বামীর মাথার বালিসের নীচে একটি সুপারি রাখিয়া স্বামীকে বৃক্ষাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যপুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করিতে পারে, কারণ নেওয়ার স্ত্রীলোক-দিগের প্রকৃত স্বামী বিল্বফল, উহা অবিনশ্বর, বৃক্ষ অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং নেওয়ার কন্যাগণ কখনও বিধবা হয় না, অন্য স্বামী তাহাদের পুত্রার্থে বা ভরণার্থে আবশ্যক সুতরাং কর্ম্মচারীর ন্যায় একজনের সঙ্গে না পোষাইলে তাহাকে অনায়াসেই জবাব দেওয়া চলে!

পোয়া ও গুজরাট প্রদেশে বারাঙ্গনা-কন্যাদিগের পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহের জন্য বাটীতে পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হয়। কন্যাগণ বিবাহের পর তাহাদের বৃক্ষস্বামীকে জলসেচন ও যত্ন করিয়া থাকে এবং বৃক্ষটি মরিয়া গেলে অশৌচ গ্রহণ করে।

সার্ডিনিয়ার কন্যার আপেলবৃক্ষের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। কন্যাকে সজ্জিত করার ন্যায় ওড়না দিয়া আপেলবৃক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। বৃক্ষতলে জলপূর্ণ একটি কলস রক্ষিত থাকে। ঐ কলসের মধ্যে মুদ্রা নিক্ষেপ করার পর ওড়নাখানি কন্যার মস্তক হইতে খুলিয়া লইয়া উহা ঐ বৃক্ষে বন্ধন করা হয়। কন্যা তৎপরে পদদ্বারা কলস ফেলিয়া দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বৃক্ষটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে বিবাহ সমাধা হয়।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, রুষিয়া প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় দেশসমূহে মে, হুইট্‌সানটাইড, মিড্‌ সামার প্রভৃতি উৎসবউপলক্ষে ছেলেমেয়েদের মে-রাণী প্রভৃতি সাজান হয়। এই উৎসবগুলিতে ফুলের ছড়াছড়ি ও মে-দণ্ড, মে-বৃক্ষ প্রভৃতিও থাকে। এগুলিতে এখন বিবাহের বরকন্যা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু থাকে না বটে কিন্তু সম্ভবতঃ এই উৎসবগুলি ইয়ুরোপের পুরাকালের বৃক্ষ-বিবাহের শেষ নিদর্শন।

(২) দেবতার সহিত বিবাহ।

এই বিচিত্র বিবাহ যে কেবল বৃক্ষের সহিতই হয় এরূপ নহে, দেবতাদিগের সহিতও হইয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে আমাদের দেশের বারণা যে বিবাহ না হইলে স্ত্রীলোকদিগের কন্যা শুদ্ধ হয় না। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যার সুপাত্র অনেক সময়ই মিলিত না, সুতরাং তাহাদিগকে অবিবাহিতা থাকিতে হইত। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার দেহ অপবিত্র থাকিয়া যাইবে ইহা কখনই হইতে পারে না, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে অবিবাহিতা কুলীনকন্যাদিগের শালগ্রাম ঠাকুরের সহিত বা তৎপ্রতিনিধি তুলসীবৃক্ষের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত। এখন অবশ্য আর এ প্রথা চলিত নাই।

আফ্রিকাদেশে আকাবা জাতির প্রত্যেক রমণীর দুইবার বিবাহ হয় ও দুইটি স্বামী থাকে। প্রথম বিবাহ হয় কন্যার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও স্বর্গগত আত্মার সহিত ও দ্বিতীয় বিবাহ হয় কোন পুরুষের সহিত। রমণী বিবাহের পর এই অশরীরী ও শরীরী দুই স্বামীরই ভজনা করেন ও সন্তানাদি না হইলে মনে প্রাণে অশরীরী পতির সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সন্তানলাভের চেষ্টা করেন। দুই স্বামী থাকাতে মনুষ্যস্বামী পরলোক গমন করিলেও আকাবা স্ত্রীলোকগণ বিধবা হয়েন না। 'সতী কি কখন বিধবা হয়?' এই কবিবাক্য ইঁহাদিগের সম্বন্ধে সার্থক।

পূর্ব্বকালে ব্যাবিলোনিয়া দেশের প্রধান দেবতার নাম ছিল বেল্‌। এই বেল্‌দেবের অত্যুচ্চ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে বেল্‌দেবের জন্য একখানি মণিখচিত মনোহর স্বর্ণপর্য্যঙ্ক থাকিত। ব্যাবিলোনিয়া দেশের স্ত্রীজাতির মধ্য হইতে বেল্‌দেবতা যাহাকে ইচ্ছা নিজ অঙ্কশায়িনীরূপে গ্রহণ করিতেন। এই রমণী এই শয্যার অর্দ্ধ-অধিকারিণী, যেহেতু তিনিই বেল্‌দেবের সহধর্ম্মিণী, তিনি এইখানেই জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং অন্য কোন পুরুষের সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকিত না। ইহা আমাদের দেশের দেবদাসী হওয়ার প্রথার অনুরূপ।

আসিরিয়ার রাজধানী কালানগরে, আসিরিয়ার দেবতা নাবুরও বেল্‌দেবতার ন্যায় মানবীভার্য্যা থাকিত ও প্রতি বৎসর একটি রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইত

ও এই বিবাহব্যাপার দেশের একটি প্রধান উৎসব ছিল।

মিসরেও তথাকার প্রধান দেবতা এমনের একটি করিয়া মানবীপত্নী থাকিত এবং তিনি এমনের মহিষী-হিসাবে মন্দির মধ্যে এমনের পার্শ্বে রাত্রি যাপন করিতেন, এবং তাঁহারও দেবতা ভিন্ন অন্য কোন মানবের সহিত বিবাহসম্পর্ক থাকিতে পাইত না। কিন্তু মিসরসম্রাট্ স্বয়ং এমন, তিনি মনুষ্য দেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিতেন মাত্র, এইজন্য প্রায়ই স্বয়ং রাজ্ঞীই এমনের দেবীরূপে মন্দিরে যামিনী যাপন করিতেন। কিন্তু মিসরসাম্রাজ্যের দেবতার সেরূপ কোন প্রতাপশালী রাজা না থাকায় রাজ্ঞীর অভাবে এমনের পুরোহিতগণ তাঁহাদের নিজনির্ব্বাচিত কোন রমণীকে এমনের দেবীরূপে মন্দিরে প্রেরণ করিতেন। মিশর রোম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে মিসরদেশস্থ কোন সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্তা সুরূপা কন্যাকে এমনদেবের পত্নীত্বে নিযুক্ত করা হইত। রাজ্ঞীদিগের পুত্র হইলে তিনি এমনই হইতেন, কারণ এমনের পুত্র এমনই হইয়া থাকেন—(আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ), কিন্তু মিসর রোমকর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পরে কেহ মিসরসম্রাট্ না থাকায় এমন-পত্নীদিগকে যৌবনপ্রাপ্তির পরেই বিদায় দেওয়া হইত, কারণ তাহার গর্ভে এমন জন্মগ্রহণ করিলে অনর্থের সম্ভাবনা। এমনের তখন আবার নূতন দেবী নির্ব্বাচিত হইত।

গ্রীসদেশের আপলো প্রসিদ্ধ দেবতা। তিনি শীতকাল পাটারায় ও গ্রীষ্মকাল ডেলসে যাপন করিতেন। তাঁহার আদেশ মনুষ্যগণকে জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার একজন করিয়া স্ত্রীপুরোহিত থাকিত। শীতকালে যখন তিনি পাটারায় থাকিতেন তখন তাঁহার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত এই রমণীকে প্রতিরাত্রে তাঁহার মন্দির মধ্যে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে হইত। আবার গ্রীসের ইফসাস্ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম আর্টেমিস্। তিনি গ্রীসের লক্ষ্মী, সুতরাং তাঁহার নারায়ণ আবশ্যক। এজন্য তাঁহার পুরোহিতগণ তাঁহাদের কার্য্যকালের মধ্যে কোন কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পাইতেন না ও প্রতিরাত্রে তাঁহারা আর্টেমিস্ লক্ষ্মীর 'নর-নারায়ণ' হইয়া তাঁহার নিকট শয়ন করিয়া থাকিতেন।

দেশের গতি ভালই হউক বা মন্দই হউক সুরাপানে অনেকেরই মতি অছে। আমাদের দেশের লোকেরা যথা দেবতারা পুরাকালে সোমরস-পানে আসক্ত ছিলেন। গ্রীসদেশবাসীগণও এতাদৃশ ব্রাণ্ডিরস-প্রিয় ছিলেন যে এথেন্স নগরে ডায়োনিসাস্ নামে এক ব্রাণ্ডির দেবতাই ছিলেন। প্রচুর পরিমাণে ব্রাণ্ডি জন্মাইবার জন্য প্রতি-বৎসর এই ডায়োনিসাস্ দেবের এথেন্সের রাষ্ট্রীর সহিত মহাসমারোহে শুভ-পরিণয় হইত।

গ্রীসের দেবতাদিগের পিতার নাম জিয়ুস্, তিনি গ্রীসের বজ্রপাণি ইন্দ্র। ইফসাস্ নগরে আর্টেমিস্ নামে যেমন একটি লক্ষ্মী ছিলেন, তেমনি ইলিউসিস্ নগরে ডিমিটার নাম্নী একটি লক্ষ্মী দেবী ছিলেন। জিয়ুসের একজন পুরোহিত থাকিতেন ও ডিমিটারের পূজা স্ত্রী-লোকের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। প্রতিবৎসর দেশের সমৃদ্ধিকল্পে জিয়ুসের সহিত ডিমিটারের বিবাহ হইত। জিয়ুসের পুরুষপুরোহিত মহাশয় জিয়ুস্ দেবের প্রতিনিধি হইতেন ও ডিমিটারের স্ত্রীপুরোহিত ডিমিটারের প্রতি-নিধি হইতেন। এই পুরুষপুরোহিত ও স্ত্রীপুরোহিতে বিবাহ হইত। প্রতিবৎসর যে একই লোক পুরুষপুরোহিত থাকিতেন এমন নহে।

সুইডেন্ অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ, শস্যাদি ভাল জন্মে না। এজন্য সুইডেনবাসীগণ তাহাদের দেশের মনুষ্য ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্ত্তা ফ্রেদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া শস্যাদি লাভের নিমিত্ত প্রতিবৎসর তাঁহার বিবাহ দিত। ফ্রে দেবতা বটেন, কিন্তু তাঁহার মানবীভার্য্যা আবশ্যক হইত। একটি পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী তাঁহার পত্নী হইতেন। প্রতি বৎসর এই দেবদেবীর পরিণয় মহোৎসবের সহিত সম্পন্ন হইত ও বিবাহান্তে ঐ যুবতী আপসালা নগরে ফ্রের প্রসিদ্ধ মন্দিরে তাঁহার পত্নীরূপে অবস্থান করিতেন। এই দেবদেবীর বিবাহ এতদ্দেশে অতি চমৎকার হইয়াছিল। গানার হেল্‌মিং নামক নরওয়েদেশবাসী একটি লোক কোন কারণবশতঃ কিছুকালের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। সে নরওয়ে পরিত্যাগ করিয়া সুইডেনের আপসালা

নগরে আসিয়া দেখে যে ফ্রেদেবের একটি সুন্দরী যুবতীর সহিত বিবাহ-উৎসব হইতেছে। সে দেবতা সাজিয়া সমবেত লোকসকলকে বলিল যে তিনিই ভগবান ফ্রেদেব, আপনালার অধিবাসীবৃন্দের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া এবার সশরীরে উপস্থিত হইয়াছেন। কপটতাশূন্য লোকেরা তাহার বাক্‌চাতুরীতে বিশ্বাস করিয়া ফ্রেদেবের কাষ্ঠমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জীবন্ত ফ্রেদেব ও তাঁহার নববধূকে রথে বসাইয়া নগরমধ্যে তাঁহাদের শোভাযাত্রা সম্পাদন করিল। তৎপরে ফ্রেদেব মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন ও আহার বিহার করিতেছেন দেখিয়া তাহারা আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল, তাহারা বুঝিল এতদিনে তাহাদের পাপ কাটিয়াছে, ঠাকুর বর দিয়াছেন! তাহার পর দুই চারি মাস পরে দেবীর সন্তানসম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদের আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল ও তাপ্য-ক্রমে সেই বৎসর প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা ভাবিল ভগবান যখন স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের কৃপা করিয়াছেন, তখন আর কিছুরই অসদ্ভাব থাকিবে না, পৃথিবীই স্বর্গ হইবে। দেশবিদেশ হইতে ফ্রেদম্পতির পূজার জন্য অর্থ অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য আসিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিন তাহারা মন্দিরে পূজা দিতে গিয়া দেখিল দেবদেবী উভয়েই অর্থ অলঙ্কারাদি লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছেন। বহুবিলম্বে তাহাদের চটকা ভাঙ্গিলে দেবদেবীকে ধরিবার জন্য লোক ছুটিল। কিন্তু তখন আর ঘরে কে? তখন যে বিজয়া শেষ হইয়াছে ও দেব দেবীকে লইয়া দক্ষপুরীকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া নরওয়ে-কৈলাসে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া-ছেন। তাহাদের দুঃখ করা সঙ্গত হয় নাই, কারণ "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" ক্ষণকালের নিমিত্ত মাত্র ইহা তাহাদের বুঝা উচিত ছিল।

ক্রিমিয়া দেশের দেবমাতার নাম ছিল সিবিল। তিনি সুইডেনের ফ্রেদের ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্রী ও কমলা। ফ্রেদেবের যেরূপ মানবীভার্য্যা আবশ্যক হইত, সিবিল দেবীরও সেইরূপ মনুষ্যভর্ত্তা আবশ্যক হইত। প্রতিবৎসর একজন করিয়া খোজার সঙ্গে সিবিল দেবীর শুভপরিণয় হইত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফরাসিদেশেও সিবিলপরিণয়ের ন্যায় এক দেবীর মানবের সহিত পরিণয় হইত। রুষের অসভ্য কৃষকদিগের মধ্যে অনেক স্থলে দেবীর এইরূপ মনুষ্য-বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্যে অনেক আদিম অসভ্য জাতি আছে। তথাকার কোন এক গ্রামে গ্রামবাসীদিগের একটি মনুষ্যাকৃতি প্রস্তরময় দেবতা আছে। তাহার একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাকে তাহাদের ঐ দেবতার সহিত বিবাহ দেয়। বিবাহ নৃত্যগীত ও বিবিধ আমোদ-প্রমোদসহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ বালিকাটি আর আর মনুষ্যকে বিবাহ করিতে পায় না ও গ্রামবাসীগণ তাহাকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকে।

উত্তর-আমেরিকার এক জাতীয় আদিম অধিবাসী সূর্য্যোপাসক ছিল। তাহারা প্রতিবৎসর বর্ষাকালে সূর্য্য-দেবের চন্দ্রমার সহিত বিবাহের উৎসব করিত। ঐ সময় সমস্ত লোক উপবাস করিয়া থাকিত এবং তাহাদের পুরোহিত মহাশয়ের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিত। সূর্য্য অবশ্য আকাশেই থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী চন্দ্র-মার স্থান গগনের শশী পূরণ করিতে পারিতেন না। পুরোহিত মহাশয় আকাশের চন্দ্রের পরিবর্ত্তে একটি চন্দ্রাননা রমণীকে চন্দ্রমা করিতেন। ঐ রমণী হয় কুমারী হইতেন অথবা একস্বামিকা হইতেন। কোন রমণী এই দুইটি সর্ত্তভঙ্গ করিয়া তাহা গোপন করিয়া যদি চন্দ্রমা হইতেন তবে উহা প্রকাশ পাইবামাত্র তাঁহাকে সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজের সদনে প্রেরণ করা হইত। এই চন্দ্রাননা মানব-চন্দ্রমা বিবাহান্তে সূর্য্য-মন্দিরে যামিনী যাপন করিতেন ও প্রাতঃকালে সূর্য্যের আদেশ পুরোহিত মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া বৎসরান্তে অবসর গ্রহণ করিতেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুরগাঁও জেলার বাসদোদা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রোৎসব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বিনওয়ার বালিকাগণ ঐ উৎসবের দেবতাদিগের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইত এবং তাহারা নাকি বৎসরের মধ্যেই দেবতাদিগের সহিত স্বর্গে বাস করিবার নিমিত্ত ইহলোক ছাড়িয়া যাইত।

বিহারে শ্রাবণ মাসে অনেক নাগিনীর আবির্ভাব হয়। তাহারা আপনাদিগকে নাগপত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া আড়াই দিন ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় ও ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীদ্বারা মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রামবাসীদিগকে বিতরণ করিয়া থাকে।

পশ্চিম আফ্রিকায় দেবতামাত্রেরই প্রায় মানবীভার্য্যা থাকে। দেশের শতকরা পঁচিশজন স্ত্রীলোক কোনা-না-কোন দেবতার দেবী। প্রতি নগরে অন্ততঃ একটি করিয়া বালিকাদিগের নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবসেবা শিখিবার বিদ্যালয় আছে। শিক্ষা শেষ হইলে কন্যাগুলির দেবতাদিগের সহিত বিবাহ হয় এবং বিবাহান্তে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির পর তাহারা সর্ব্বলোকে বিদ্যমান থাকে। তাহারা মনুষ্যবিবাহ করিতে পায় না বটে কিন্তু দেবানুগ্রহে তাহাদের পুত্রকন্যার অভাব থাকে না। তাহাদের এই পুত্রকন্যাগুলি আধুনিক সময়-শিক্ষার ন্যায় দেশের দেবশিশু ও দেবতার দাস তালুকের প্রজা।

আমাদের দেশে দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থে পুরীর জগন্নাথ দেব ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরে যে বহুসংখ্যক দেবদাসী থাকে তাহার বিষয় বোধ হয় সকলেই জানেন, উহা আর বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। এই দেবদাসীগণ দেবগণের মানবীভার্য্যাস্বরূপ, তাহারা কখনও মনুষ্যকে বিবাহ করিতে পায় না।

স্থল-দেবতার ন্যায় পৃথিবীতে জল-দেবতারও অভাব নাই। অনেক স্থলে হ্রদের, কূপের প্রভৃতি তাবতীয় জলসঙ্গ জল-দেবতার জীবন্ত প্রতিনিধি। জল দেবতাদিগেরও অনেক সময়ই মনুষ্য বিবাহ নহিলে পরিতৃপ্তি হয় না! দেবতা দেবী হইলে তাঁহার মনুষ্যস্বামী ও দেব হইলে তাঁহার মানবীভার্য্যা আবশ্যক। এবং তাঁহাদের পূজকগণ যাঁহার যাহা আবশ্যক তাঁহাকে তাহা দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।

উত্তর ব্রহ্মদেশস্থ সান্‌রাজ্যে য়ন্নং টাং নামক একটি হ্রদে একটি প্রতাপশালী জলদেব আছেন। প্রতিবৎসর বৎসরের অষ্টম মাসে তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার পূজা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তিন বৎসর অন্তর তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য চারিটি সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। অষ্টম মাসে রাজসরকার আদেশে দেশের কোন জাতির রমণীগণ য়ন্নং টাং হ্রদের তীরে সমবেত হইলে ও তাঁহাদের মধ্য হইতে অনিন্দ্যসুন্দরী দশজন অবিবাহিতা রমণীকে বাছিয়া লওয়া হয় এবং এই দশজনের মধ্য হইতে চারিজনকে মনোনীত করা হয়। পূজার পর এই চারিজন কুমারীকে দেবতার সহিত পরিণীত করা হয়। পূজা ও বিবাহান্তে তাঁহাদিগকে মন্ত্রী মহাশয় রাজভবনে পাঠাইয়া দেন ও তাঁহারা রাজপ্রাসাদে দুই চারি যামিনী যাপন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বিবাহের মেয়াদ তিন বৎসর মাত্র। তিন বৎসর গত হইলে কামিনীগণ ইচ্ছানুরূপ পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতে পারেন।

আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া ন্যান্‌জা হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোক-সকল ঐ হ্রদের দেবতাকে নৌকা-যাত্রার সময় অনর্থ ঘটান হইতে নিরস্ত রাখিবার নিমিত্ত দীর্ঘ নৌকাযাত্রার পূর্ব্বে কুমারীদিগের সহিত হ্রদস্থ দেবতার বিবাহ দিয়া থাকে। ঐ কুমারীগণ আর কখনও বিবাহ করিতে পায় না, কারণ তাহারা দেবতার বিবাহিতা পত্নী। এখন বোধ হয় এ প্রথা আর প্রচলিত নাই, কারণ তাহারা এখন খ্রীষ্টান।

ইংরেজ-অধিকৃত পূর্ব্ব-আফ্রিকার আকিকুয়ু জাতি নাগ উপাসক। তাহাদের দেবতার নাম নগই। কয়েক বৎসর অন্তর এই নাগদেবের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পাত্রী যুবতী কুমারী। বিবাহের পূর্ব্বে নাগদেবের নদীতীরে বহুসংখ্যক পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হয় ও সেই কুটীরে ঐ নারী দিগের সহিত নাগদেবের যথাবিহিত বিবাহ হয়। যদি যুবতীগণ স্বেচ্ছায় ঐ কুটীরে গমন করিয়া নাগদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে বল-পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। নাগদেবের দুই একটি দেবীতে মনস্তুষ্টি হয় না, তাঁহার একত্রে অনেকগুলি ভার্য্যা আবশ্যক হয়। এই নাগদেবের যে বংশবৃদ্ধি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি! তাঁহার পুত্রকন্যাগণ নাগদেবের সন্তান নামে পরিচিত হইয়া

থাকে, যেহেতু তাহাদের পিতা নাগ ও মাতা সাক্ষাৎ নাগিনী।

পূর্ব্বোক্ত জলদেবতাদিগের সহিত পরিণীত সুন্দরীগণ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থলে থাকিয়াই জলদেবতার ঘর-সংসার করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক স্থলে জলদেবতা-দিগের সহিত উদ্বাহের ফলে উদ্বহনে আবদ্ধ হইবার পরই তাহাদিগকে জল দেবতার জলগৃহে প্রয়াণ করিতে হয়।

নীল নদ মিসর দেশের জীবন-স্বরূপ। নীল নদ না থাকিলে মিসর দেশ সাহারা মরুভূমির অংশ মাত্র হইয়া থাকিত। নীল নদ প্রতি বৎসর জলপ্লাবন দ্বারা মিসর দেশ উর্ব্বর করিয়া না দিলে শস্যাদি কিছুই হয় না। এজন্য নীল নদের প্লাবন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রতি বৎসর জলপ্লাবনের প্রাক্কালে নীল নদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত মিসরবাসীগণ একটি অবিবাহিতা যুবতীকে সুন্দর বসনভূষণে ভূষিত করিয়া ঐ জল-দেবের সহিত বিবাহ দিত ও বিবাহান্তে তাহাকে স্বামীগৃহবাসের জন্য নীল নদের অতল জলে নিক্ষেপ করিত। মিসরে এখন আর এই নিষ্ঠুর বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, মুসল-মানগণ উহা বন্ধ করিয়া দেন।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এতাদৃশ কুম্ভীরের উৎপাত যে এমন কি কুম্ভীর কখন কখন সমুদ্র ও নদীতীরস্থ গ্রামে আসিয়া মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। এ কারণে তিমর দ্বীপবাসীগণ কুম্ভীরকে দুর্দ্ধান্ত দেবতা বলিয়া মানে ও তাহাদের রাজা কুম্ভীর-বংশসম্ভূত বলিয়া খ্যাত। সুতরাং কুম্ভীর-দেবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় অগ্রে কুম্ভীর-পূজা হইতে। কুম্ভীর-দেব কোন কামিনীকে ভার্য্যারূপ পাইলে সকলাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এজন্য পূজার সময় কুম্ভীর ঠাকুরকে একটি করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা হইত। রাজার আদেশে একটি বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আনয়ন করিয়া বিবাহসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে নদীতীরে একখানি পবিত্র উপল-খণ্ডে বসাইয়া বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কুম্ভীরকে ডাকা হইত। কুম্ভীরও অচিরে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া হতভাগিনীকে জলে টানিয়া লইয়া গিয়া আপন ভোগে লাগাইত। তটস্থ সকলে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিত, কারণ তাহাদের ধারণা যে ঠাকুরের যদি কন্যা পছন্দ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া যাইবেন, আর ফিরাইয়া না দিয়া যাইলে বুঝিতে হইবে তিনি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যা যে ঠাকুরের কখন অপছন্দ হইয়াছে এরূপ সংবাদ কেহ কখনও শুনে নাই। সভ্য ইয়ুরোপীয়-গণ এই নিদারুণ বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ দ্বীপেই অন্য উৎসবের সময় কখন কখন নবজাত কন্যাকে কুম্ভীরের সহিত বিবাহ দেয় ও এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুম্ভীর-দেবের প্রতিনিধি তাঁহার পুরোহিত এই কন্যাটিকে পত্নীস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তিমর দ্বীপের নিকটবর্ত্তী ফ্লোর্স নামক একটি দ্বীপে একবার কুম্ভীরের এতই উৎপাত হয় যে ঐ দ্বীপ জনশূন্য হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। অবশেষে এইরূপ দৈববাণী হইল যে কুম্ভীরদিগের রাজার কোন সুন্দরীর প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাকে পাইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। ইহাতে সকলে গিয়া ঐ কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে বিবাহসজ্জা করাইয়া দিতে আদেশ করিল ও কন্যাটি সজ্জিত হইলে তাহাকে কুম্ভীররাজের সহিত বিবাহ দিয়া হতভাগিনীকে জলমধ্যস্থ পাতালপুরে প্রেরণ করা হইল।

ভারত মহাসাগরস্থ মালদ্বীপে সমুদ্রে অনেক সময় এক প্রকার আলো দেখিতে পাওয়া যায়। মালদ্বীপ-বাসীদিগের ধারণা ছিল যে প্রতি মাসে তাহাদের দেশের অসুর জিন্ন আলোকময় অশ্ববাহনের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের দ্বীপে আসে। তাহাকে যদি অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করা না হয় তবে সে মহা অনর্থ ঘটাইবে। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ষোড়শী যুবতী। সুতরাং তাহারা প্রতিমাসে একটি কুমারীকে বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া জিন্নীর সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তাহাকে সমুদ্রতীরস্থ জিন্নীর মন্দিরে লইয়া গিয়া বিবাহাস্তে কন্যাটিকে রাত্রে ঐ মন্দিরে একা রাখিয়া চলিয়া আসিত। প্রাতঃকালে গিয়া দেখিত কন্যা আর কুমারীও নাই এবং তাহার আত্মাও আর ইহলোকে নাই; কন্যা

স্ত্রী-স্বামীর সহগামিনী হইয়াছে। এখন মালদ্বীপ-বাসীগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং সেই স্ত্রীও নাই, সে বিবাহও নাই।

চীনের টাং বংশের শাসনকালে প্রতি বৎসর একটি সুন্দরী যুবতী কুমারীর সহিত পীত নদের বিবাহ দেওয়া হইত। বিবাহান্তে কন্যাটিকে নদীর অতল জলে স্বামী-সদনে চিরকালের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইত। চীনা ভৈরবীগণ এই নৃশংস বিবাহের নিমিত্ত প্রতি বৎসর একটি করিয়া অনিন্দ্যসুন্দরী প্রাপ্তযৌবনা কন্যা ধরিয়া লইয়া আসিত ও বিবাহশেষে কন্যাকে পতি-সদনে প্রেরণ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। বহুকাল পরে ঐ প্রদেশে এক সদাশয় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। তিনি আদেশ করেন যে এই নদী-বিবাহ আর হইতে পারিবে না। কিন্তু পিশাচী ভৈরবীর দল এই নৃশংস আমোদে বঞ্চিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া শাসনকর্ত্তার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্বের মত বিবাহের আয়োজন করিল। শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ পাইয়া বিবাহের দিনে সদৈন্যে উপস্থিত হইয়া ভৈরবগুলিকে ধৃত করাইলেন ও তাহাদের বলিলেন যে জলদেবতা তাহাদের বহুকালের এই ঘটকালিতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্ন দিয়াছেন যে এবার তিনি আর অন্য কোন রমণীর পাণিগ্রহণ না করিয়া তাহাদের মধ্যেই কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকে দেবতা মনোনীত করিবেন তাহা তিনি ঠিক করিতে না পারায় তাহাদের সকলকেই দেব-সকাশে প্রেরণ করিবেন, তাহার পর তাহাদের অদৃষ্ট! এই কথা বলিয়া তিনি সৈন্যদিগকে ভৈরবীদিগের হস্তপদ বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। ভৈরবী ঠাকুরাণীরা এবার নিজেদের বিবাহের পালা আসিয়াছে শ্রবণে বীভৎস চীৎকার করিতে আরম্ভ করায় শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে অচিরে স্বামী সন্দর্শনের আশ্বাস দিলেন ও তাঁহার ইঙ্গিত পাইবামাত্র সৈন্যগণ তাহাদিগকে শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করিল। নদী-দেবতাদেরও ভৈরবী পাইয়া চিরকালের মত বিবাহবাসনা পরিতৃপ্ত হইল।

৫৩ জড়পদার্থের সহিত বিবাহ।

বৃক্ষ ও দেবতা ভিন্ন অনেক স্থলে জড়পদার্থের সহিত এইরূপ অদ্ভুত বিবাহ বামবনবাসে প্রচলিত আছে।

পশ্চিম অঞ্চলের হিমালয় প্রদেশে যদি কোন বর বা কন্যার রাহুর কিম্বা অন্য কোন অমঙ্গলজনক দশা হয় বা গ্রহনক্ষত্রাদি মন্দ হয়, অথবা বর বা কন্যা বিকৃতমস্তিষ্ক বা বিকলাঙ্গ হয় তাহা হইলে বর বা কন্যার সহিত জলপূর্ণ মাটির কলসীর বা মঙ্গল ঘটের বিবাহ হইয়া থাকে। এক গাছি মঙ্গল-সূত্র দ্বারা বর বা কন্যার গলা কলসীর গলার সহিত বাঁধা হয় ও পুরোহিত শাস্ত্র-মত কলসীর সহিত তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে।

পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া প্রদেশে নর্ত্তকী-কন্যারা নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে যথা-বিহিত নিয়মানুসারে তরবারির সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তৎপরে তাহারা নৃত্যব্যবসায় আরম্ভ করে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে উত্তর-আমেরিকার আলগন্-কুইনস্ নামক এক বীবর জাতি একবার বৎস ধরিবার কালে টানা-জাল ফেলিয়া কিছুতেই বৎস ধরিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে থাকে। এমন সময় জলের দেবতা মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বীবরদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি পত্নীহারা হইয়াছি এবং আমা-ভিন্ন অন্য-কোন পুরুষকে জানে না এমন কন্যাও পাইতেছি না যে পুনরায় দারপরিগ্রহ করি। একারণে আমার মন অত্যন্ত অস্থির। আমায় মনস্থির করিয়া যদি আমাকে জালে বসাইতে পার, তবেই তোমরা পুনরায় বৎস ধরিতে পারিবে নচেৎ নহে।" ইহা শুনিয়া বীবরকুল সমবেত হইয়া ছয়সাত-বৎসরবয়স্কা দুইটি সুরূপা বালিকাকে কন্যা সাজাইয়া জলদেবতার সহিত বিবাহ দিল। বালিকাদ্বয়ের তখনও পুরুষচিন্তা মনে আসে নাই, সুতরাং জলদেবতা তাহাদিগকে পত্নীরূপে পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন ও বীবরেরা জালফেলিবামাত্রই আশাতীত বৎস প্রাপ্ত হইল। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আল্‌গন্‌কুইনস্ বীবর-দিগের প্রতিবাসী হুরন জাতীয় বীবরগণও ঐরূপে দুইটি বালিকার সহিত জলদেবতার বিবাহ দিয়া প্রচুর বৎস

প্রাপ্ত হইল। প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক, সেই অবধি অদ্যাপি আল্‌গন্‌কুইনস্ ও হুরন বীরগণ প্রতি বৎসর মৎস্য ধরিবার কাল উপস্থিত হইলে অল্পবয়স্কা দুইটি বালিকাকে বিবাহের রীতি অনুসারে জলের সহিত বিবাহ দিয়া থাকে।

আপনারা বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণীতে পড়িয়াছেন যে ব্রজেশ্বরের সাগর বৌ ছিল কিন্তু সে বৌয়ের নাম সাগর হইলেও বৌ সত্য সত্যই সাগর ছিলেন না, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের একটি মেয়ে। সাগর আমাদের হিন্দুমতে স্ত্রী নহেন, পুরুষ। নদী তাঁহার পত্নী। কিন্তু প্রতীচ্য দেশে সাগর স্ত্রী। সুতরাং ইয়ুরোপে সাগর প্রকৃতই কাণ্ডারাও স্ত্রী হইবেন ইহা অসম্ভব নহে। মধ্যযুগে ভূমধ্য-সাগরে ভিনিসের প্রবল আধিপত্য ছিল। সমুদ্রের উপর এই আধিপত্যের স্মারকচিহ্নস্বরূপ প্রতিবৎসর ভিনিসের প্রধান শাসনকর্ত্তা ডোজের সহিত সাগরের বিবাহ হইত। ডোজ নিজ করস্থিত অঙ্গুরী খুলিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাতেই সাগর-বিবাহ সম্পন্ন হইত।

(৪) পক্ষীর সহিত বিবাহ।

পঞ্জাবে কোন কোন অঞ্চলে যদি কোন লোকের দুই কিম্বা তিন বার স্ত্রী বিয়োগ হয় তাহা হইলে ঐ লোকটি পুনরায় বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোককে একটি পক্ষী ধরিয়া পোষকন্যা গ্রহণ করিতে বলে। তাহার পর সে কন্যাপণ দিয়া ঐ পক্ষীটিকে আনয়ন করতঃ উহাকে যথারীতি বিবাহ করে। দুই চারি দিবস পরে সে ঐ পক্ষীটির সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন যুবতীর পাণিগ্রহণ করে।

(৫) মনুষ্যের সহিত বিবাহ।

আপনারা মনে করিতে পারেন যে মনুষ্যের বিবাহ মনুষ্যের সহিত হইবে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিবাহ বলিলে আমরা যাহা বুঝি বরকন্যার বিবাহে ঠিক তাহা সাধিত হয় না। এই বিবাহে বরকন্যা উভয়েই মনুষ্য হইলেও বৃক্ষ-বিবাহ, দেবতা-বিবাহ প্রভৃতির ন্যায় এইগুলিও নকল বিবাহ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি হইতে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের দেশের বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা-দিগের কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কুলীন সুপাত্র জোগাড় করা সুকঠিন। এই নিমিত্ত অনেক সময় কোন কোন কুলীনকন্যাদিগের বাল্যকালে যে-কোন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত নকল বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাকে 'করণ' বলে। এই বিবাহে কৌলীন্য রক্ষা হইল। পরে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার কুলীন বা অকুলীন যাহার সহিত সুবিধা বিবাহ দেওয়া চলে।

ইয়ুরোপে অনেক সময় বরকন্যার বয়সের অল্পতা-প্রযুক্ত বা অন্য-কোন অসুবিধাবশতঃ বর কন্যাকে বিবাহ করিতে কন্যার আলয়ে যাইতে অপারগ হইলে, কন্যাকে তাঁহার হইয়া বিবাহ করিয়া আসিবার জন্য বর প্রতিনিধি পাঠান। এই প্রতিনিধি গিয়া বরের হইয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া আইসে। এই বিবাহ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রতিনিধি পায়ের জুতা খুলিয়া পেণ্টুলানটাকে জানু পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া কন্যার শয্যায় শয়ন করে। তৎপরে তাহার দক্ষিণ কন্যার চরণকমলের সহিত রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করা হয়। তাহার পর পুরোহিত যথাস্থানে যথারীতি বিবাহমন্ত্র পাঠ করিলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় ও প্রতিনিধি দেশে প্রত্যাগমন করে। পরে যখন সুবিধা আসন বরবধূর মিলন হইয়া থাকে। মুসলমানদের মধ্যেও প্রতিনিধির দ্বারা বিবাহ হইতে পারে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের সময় এক আইন করিয়াছেন যে কোন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলেও তাহার মনোনীতা রমণীকে তাহার প্রতিনিধি বিবাহ করিতে পাইবে ও এই প্রতিনিধি দ্বারকত বিবাহে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে। এই আইন অনুসারে ১৮ই মে এম্ সাউকে নামক এক ব্যক্তি এম্ লাবিন নামক এক সৈনিকের প্রতিনিধিরূপে মিলি ম্যাটিরো নাম্নী এক কামিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

ইয়ুরোপে অনেক দেশে বিবাহের পূর্ব্বে প্রথমে নকল

কন্যা আনিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। যথা, পোলোনিয়ায় একজন চাপদাড়ি-ওয়ালা লোককে কন্যা সাজাইয়া বিবাহের পাত্রীস্বরূপ লইয়া আসে। পোলাণ্ডে একটি শুভ্রবস্ত্র-পরিধানা অবগুণ্ঠনবতী বৃদ্ধাকে প্রথমে কন্যা সাজাইয়া আনে। এসথোনিয়ায় কন্যার ভ্রাতা স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত হইয়া প্রথমে কন্যার স্থান অধিকার করে। ঐ দেশেই আবার কখন কখন একটি বৃদ্ধা ভূর্জপত্রের মুকুট পরিয়া কন্যা সাজিয়া আসেন। ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশে কন্যার পরিবর্তে প্রথমে বাটীর একটি অল্পবয়স্কা বালিকা, তাহার পর বাটীর কর্ত্রী-ঠাকুরাণী, তা তিনি মাতাই হউন বা তৎস্থানীয় আর যে কেহই হউন, এবং অবশেষে কন্যার পিতামহীকে কন্যা সাজাইয়া বিবাহে নামাইয়া দেওয়া হয়! একবারে একপিণ্ডে তিন কুল উদ্ধার!

অষ্ট্রেলিয়ার উরাবান্না, ভিউরি প্রভৃতি অনেক জাতি আছে, যাহাদের বিবাহপ্রথা অতি চমৎকার। অনেক দেশেই সাধারণতঃ বিবাহের 'পাল্টি-ঘর' আছে। অষ্ট্রেলিয়ার এই জাতিদিগের মধ্যে যে গোষ্ঠীর পুরুষদিগের সহিত যে গোষ্ঠীর কন্যার বিবাহ হইতে পারে, জন্মাইবার পরক্ষণেই কন্যা সেই গোষ্ঠীর সকল পুরুষের স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়। কন্যা বয়স্থা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও সহিত তাহার আসল বিবাহ হয় ও সাধারণতঃ সেই স্বামীর গৃহেই ঐ কন্যা সংসার করে। কিন্তু ঐ রমণীর গর্ভজাত পুত্র ঐ লোকটির একার পুত্র নহে, সকলের পুত্র, সকলকেই সে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে; কারণ কন্যা বড় হইলে যে লোকটি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে ঐ মহিলা সাধারণতঃ তাহার গৃহে বাস করিলেও মহিলাটির প্রথমে গোষ্ঠীবিবাহ হওয়াতে সে বৎসরের মধ্যে একদিন করিয়া গোষ্ঠীর সকল স্বামীর গৃহে বাস করিতে তাহারা বাধ্য। বৎসরে একদিন ব্যতীত অন্য কোন দিন গোষ্ঠী-স্বামীর মধ্যে কাহারও ঐ রমণীকে আপন ভার্য্যারূপে আবশ্যক হইলে ঐ রমণীর আসল স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। এই রীতি অনুসারে ঐ জাতির মহিলাগণের সকলেরই একটি করিয়া খাস-স্বামী ও গোষ্ঠী-বিবাহের বহু স্বামী থাকে ও কোন রমণী কোন একজন লোকের নিজস্ব নহে, সে গোষ্ঠীপত্নী। এরূপ গোষ্ঠী-বিবাহপ্রথা আমেরিকার কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে।

আমাদের দেশের কুলীন-কন্যাগণের বহুভূত-বিবাহের অভাবে শালগ্রাম ঠাকুরের সহিত কায়াগুদ্ধির জন্য বিবাহ দেওয়া হইত এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু নেহাৎ পাত্র না মিলিলে অভাব-পক্ষেই এই ঠাকুরের সহিত বিবাহ হইত। সুপাত্র মিলিলে যে অবস্থায়ই হউক তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া চলিত। অনেক সময় খাঁটি-কুলীন বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে তীরস্থ করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণ বাহির হইতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে, এরূপ পাত্রের সহিতও কুলীন-কন্যাদিগের (সময় সময় একসঙ্গে তিন-চারি জনের) বিবাহ দেওয়া হইত। কন্যা হাতে শাঁখা দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেন ও বিবাহান্তে স্বামীর সৎকার করিয়া শাঁখা ভাঙ্গিয়া থান পরিয়া বাড়ী ফিরিতেন। এরূপ বিবাহও নকল বিবাহের অন্তর্ভুক্ত বলিলে অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মান্দ্রাজে রেড্ডি জাতিদিগের মধ্যে এক বীভৎস বিবাহপ্রথা আছে। কোন এক ষোড়শী যুবতীকে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক একটি বালকের সহিত যথারীতি বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পর বধূ স্বামীগৃহে শিশু স্বামীর কোন আত্মীয়ের—যথা তাহার খুড়তুতো, জেঠতুতো ইত্যাদি ভ্রাতা, মামা বা পিতা অর্থাৎ কন্যার নিজ শ্বশুরের—সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাস করে। বিবাহ বরের মামা, পিতা ইত্যাদি লোকগুলির সুবিধার জন্যই দেওয়া হয়, বালকটি কেবল নিমিত্তের ভাগী হয় মাত্র। পুত্রবধূর পুত্রকন্যাদি হইলেও পুত্রকন্যাগণ ঐ বালক স্বামীর পুত্রকন্যাদি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। পরে বালকটি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাহার বাল্য-কালের স্ত্রী অনেক স্থলেই বৃদ্ধা হইয়া পড়ে। সুতরাং সে তখন ঐ পরিণতবয়স্কা স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে অন্য বালকের স্ত্রীকে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিজের সেবায় নিযুক্ত করে। এই বিবাহপ্রথা যে কেবল মান্দ্রাজ প্রদেশেই প্রচলিত এরূপ নহে। ইহা ভারতের উত্তর-

পশ্চিম ও বোম্বাই প্রদেশে, রুষরাজ্যের কোন কোন অংশে, কুকেসিয়ান জাতিদিগের ও নূতন গ্রানাডার চিবচাস জাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরিনির্দ্দিষ্ট এই কয়েক প্রকার সকল বিবাহই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে অবশ্য লোকে বৃক্ষের সহিত বৃক্ষের বা কূপের বা পুষ্করিণীর, পুতুলের সহিত পুতুলের, ঠাকুরের সহিত ঠাকুরের, জন্তুর সহিত জন্তুর ইত্যাদি বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু এই বিবাহগুলিতে বর বা কন্যা কেহই মনুষ্য না হওয়াতে এ প্রবন্ধে উহার বিষয় আলোচনা করিলাম না।

(প্রবাসী)

কি, সে ?

সলিল সে ? না, না, ভুল সে যে, হুতাশন,
অনলে নিভাতে প্রায়ো বারি বিন্দু দিয়া,
সপ্ত জলধির জল করিয়া সিঞ্চন
নিভাতে নারিবে এরে জগৎ ভ্রমিয়া !

অনল এ ? না, না, প্রিয়, তাও যে এ নয়,
বহ্নি ভস্ম করে এ যে করে প্রাণময় !

সুখ সে কি ? না, না, ভুল, কঠিন দুষ্কর,
সে যে দুঃখ দুর্ব্বিষহ দারুণ বেদনা
রাখিবারে নাহি স্থান, দুরন্ত দুর্ভর
ত্যাগ আরো সুকঠিন কঠোর যন্ত্রণা !

একি দুঃখ ? না, না, প্রিয়, দুঃখ করে নাশ,
এ যে বেদনার রসে বাড়ায় পিয়াস ;

জীবন এ ? না, না, ভুল, নিমেষ মাঝারে
শতবার মরিবার যাতনা অপার
জুড়াবার নাহি ঠাঁই ভুবন ভিতরে
সর্ব্বনাশী উগ্র এ যে আশা দুর্নিবার !

মরণ এ ? না, না, প্রিয় এ যে সুধাগার,
মুঞ্জরে সে প্রাণে নব কিসলয় তার !

শ্রীশ্যামোদিনী ঘোষ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

নিউইয়র্ক নগর ও কুকুর।

আমাদের দেশে কুকুর দংশনে বহুসংখ্যক লোক মারা পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুকুর সম্বন্ধে সেরূপ বিশেষ আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। নিউইয়র্ক নগরে যে সমস্ত গৃহপালিত কুকুর রহিয়াছে, তাহাদের মুখে মুখড় দিবার আইন প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতার ন্যায় প্রকাণ্ড সহরের কুকুরে সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, অথবা কুকুর দ্বারা দষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এখানেও কুকুরের মুখে মুখড় দিবার আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু কলিকাতায় কুকুরের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ এবং কতিপয় দেশীয় ব্যক্তি একটা 'কায়দা' ও সভ্যতার অঙ্গ ভাবিয়া কলিকাতায় কুকুর প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কলিকাতার ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহর হইতে কুকুর একবারে বিদূরিত করাই যুক্তি সঙ্গত।

কামান গর্জ্জন।

কোন সৈনিক যদি গোলার পতন স্থানের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে সে সহসা দুইটি শব্দ শুনিতে পাইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে গোলার গতি শব্দের গতি অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর বলিয়া গোলা কামানের মুখ হইতে বহির্গত হইবার সময় যে শব্দ হয়, সেই শব্দ গোলা দূরে পতিত হইবার পরে সৈনিকের কর্ণে প্রবেশ করে। কিন্তু যখন গোলা বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়, তখন আর একটা ঘন ঘোর গর্জ্জন হয়। এই গর্জ্জন বায়ুর সহিত সংঘর্ষণ জনিত। সৈনিক প্রথমে এই গর্জ্জন শ্রবণ করে পরে কামানের মুখে যে শব্দ হয় তাহা শুনিয়া থাকে।

ভবিষ্যত লোক সংখ্যা ও বর্ত্তমান যুদ্ধ।

ডাক্তার লুইস দি পার্কিন সম্প্রতি রয়াল স্যানিটারি ইনস্টিটিউটে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন—তাঁহার

প্রবন্ধের মর্ম—যুদ্ধ এবং সন্তান-জনন সংখ্যার হ্রাস। তিনি দেখাইয়াছেন বর্ত্তমান যুদ্ধে এরূপ হত যে অতি শীঘ্র শেষ হইবে, অথবা সম্পূর্ণ পক্ষের সংখ্যা যুদ্ধশেষে ১০,০০,০০০ সংখ্যার অন্তর হইবে না বরং অধিকতর হইবে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধে হত ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বসমেত মোট ২ ০০ ০ ০ হইবে। দেশের যে সমস্ত লোক গৌরব স্থল, যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য কর্ম্মঠতা, মানসিক তেজ দ্বারাই এতদিন জাতি পরিচিত হইতেছিল, তাহারাই প্রধানতঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হীনচেতা, অপরিণত বুদ্ধি, ভীরু, সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিই জীবিত থাকিয়া যাইতেছে। ইহাতে ভবিষ্যতে যে সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে জাতির দশা কি হইবে কে বলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কালে জন্মসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ফলে ভবিষ্যতে যুদ্ধে ব্যাপৃত জাতি বর্গের অবস্থা কি হইবে তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। অতি প্রাচীনকালে এক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের গৌরবস্থল অধিকাংশ লোকসংখ্যা হত হওয়ায় দেশে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রকোপ এখনও তিরোহিত হয় নাই। এখনও ভারতের প্রাচীন গৌর্য্য বীর্য্য প্রত্যাগত হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহার প্রকোপ কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। ইউরোপের গৌরব রবি ত চিরতরে নষ্টও হইতে পারে।

মক্ষিকা ধ্বংসের উপায়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, নানাবিধ সংক্রামক রোগের বীজ মক্ষিকা দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। তাহেই মক্ষিকা ধ্বংসের জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকায় রীতিমত আয়োজন হইয়া থাকে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে একখণ্ড পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকার রচয়িতা এইচ এস স্মিথ। মক্ষিকার জন্মস্থান, সাধারণতঃ পশ্বাদিগণের মলমূত্র, পচা জান্তব বা উদ্ভিজ পদার্থ ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্য জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য সারস্বরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্মিথ সাহেবের মতে এই সমস্ত দ্রব্যে উপযুক্ত পরিমাণ সোহাগা মিশাইয়া দিলে, অতঃপর মক্ষিকা হইতে ডিম্ব প্রসব করিলে, সেই ডিম্ব হইতে কিছুতেই কীট নির্গত হয় না অথবা হইলে মরিয়া যায়, অথচ ইহাদিগকে অনায়াসে সারস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহাতে উদ্ভিদের কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু সোহাগা যদি জমীতে ক্রমশঃ অনেক সঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহা হইলেও জমীতে উৎপন্ন উদ্ভিদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে কি না, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। সোহাগার মূল্য অত্যধিক নহে। পল্লীগ্রামে পশ্বাদির মলমূত্র যেরূপ ভাবে সঞ্চিত হয়, তাহাতে সেই সমস্ত স্থলে যে মক্ষিকা উৎপত্তির উপযুক্ত স্থল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। অথচ এই মক্ষিকার উপদ্রবেই সময়ে সময়ে সংক্রামক রোগ পল্লী অঞ্চলে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া যায়। পল্লীগ্রামের শিক্ষিত লোকসমূহ ইচ্ছা করিলে এই অল্পব্যয়সাধ্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অনেক রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

সূর্য্যরশ্মি।

আজকাল সহর অঞ্চলে বসবাস কিরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহা কাহারও অবিদিত নাই। একতালা গৃহে রৌদ্র এবং বাতাসের সম্পূর্ণ অভাব। অথচ রৌদ্র জীবন ধারণের জন্য বা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেকে ছুটীর সময় অল্প স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহাদের চর্ম্মের বর্ণ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণতর হইয়া উঠে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যে তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। অনেক আধি ব্যাধি সূর্য্য রশ্মিতে বিনা ঔষধে নিরাকৃত হয়। দিবসের মধ্যে যাহাতে কিছু কাল শরীর সূর্য্যের রশ্মি পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক।

(বিজ্ঞান)

অন্তর্হিত আনন্দ

জীবন সারাদিন সমুদ্রতীরে সূর্য্যকিরণের ক্রীড়া ভূমিতে বসিয়া আছে; মৃদু সমীরণ তাহার কুন্তলের সহিত সমস্তক্ষণই খেলা করিয়াছে। তাহার সুকোমল তরুণ মুখখানির দৃষ্টি জলরাশির অপর পারে; মুখখানির ভাব প্রতীক্ষাব্যঞ্জক, যেন সে কিসের জন্য একাগ্র ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার হৃদয় প্রতীক্ষার ভাবে পূর্ণ হইলেও এই প্রতীক্ষা যে কাহার এবং কিসের জন্য, তাহা সে নিজেও জানিত না।

সারাদিন ধরিয়া সমুদ্রের ঢেউগুলি তীরে ছুটাছুটি করিতেছে, একবার ছুটিয়া বালুকা-ক্রোড়ে পড়িতেছে, আবার তৎক্ষণাৎই সে ক্রোড় ছাড়িয়া সমুদ্র-ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; ক্রীড়াসঙ্গী নানা বর্ণের ঝিনুকগুলিও তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

জীবন, এই সমুদ্রতীরে, চক্ষে সূর্য্যকিরণ লইয়া কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

জীবন দীর্ঘ প্রতীক্ষা বশতঃ ক্লান্ত হইয়া মস্তক নিজ জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া বসিয়া রহিল; অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল কিন্তু এই অবস্থাতেও প্রতীক্ষার ভাব ঘুচিল না।

ইত্যবসরে একখানি তরণী বালুকাতটে ঠেকিল; প্রেম তাহা হইতে তীরে অবতরণ করিল। তাহার পদশব্দে জীবনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রেমের হস্ত জীবনকে স্পর্শ করিল: তাহার হস্ত-স্পর্শে জীবনের হৃদয় খানির ভিতর কি অপূর্ব্ব আলোড়ন ও স্পন্দনই উপস্থিত হইল! মুখ তুলিয়া চাহিবা মাত্র প্রেমের বিশাল ও প্রশান্ত নয়নের সহিত তাহার নেত্রদ্বয়ের মিলন হইল। এই মুহূর্ত্তেই তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, সে বুঝিতে পারিল কাহার শুভ আগমন প্রতীক্ষায় সে এতক্ষণ সমুদ্রতীরে বসিয়াছিল।

প্রেম জীবনকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া নিজ সন্নিকটে টানিয়া লইল।

প্রেম ও জীবনের মিলন হইতে একটি চমৎকার ও সুন্দর পদার্থের জন্ম হইল। নবজাত শিশু "আনন্দ" অপরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ নামে অভিহিত হইল। ইহার স্ফূর্ত্তি, চঞ্চল, চিরক্রীড়াশীল জলের সহিত সূর্য্যকিরণের সম্মিলনজনিত স্ফূর্ত্তিকেও ম্লান করিয়া দিল। গোলাপ কোরকগুলির সূর্য্যের প্রথম চুম্বন লাভের আশায় উৎফুল্লিত বিম্বাধর গুলির আরক্তিম সৌন্দর্য্যও নবজাত "আনন্দের" সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভব মানিল। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রমণীগুলির কি বেশ! ইহার সুন্দর শরীরখানি কি সুন্দর উষ্ণ ও কোমল। কথা বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু অধর প্রান্তের সুমিষ্ট হাস্যটি ভাব প্রকাশে কথাকেও পরাস্ত করিত। সে সূর্য্যকিরণে কি সুন্দর খেলাই করিত।

প্রেম ও জীবনের সুখের সীমা নাই। দুই হৃদয়ের অকথিত ভাষা একই—"এই অতুলনীয় আনন্দকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি সে যাবজ্জীবন আমাদেরই থাকিবে।"

অতঃপর এমন একটা সময় উপস্থিত হইল, যখন তাহাদের "আনন্দ" আর পূর্ব্বের "আনন্দ" রহিল না। দিন, মাস, বর্ষ গণনা দ্বারা এই সময়ের হিসাব দিতে পারি না, কেননা প্রেম ও জীবনকে পৃথিবীর সময়ের সীমায় আবদ্ধ করা যায় না। "আনন্দের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিলেও এখনও সে খেলিত, হাসিত ও তাহার ক্ষুদ্র রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ ফলের রসে অধিকতর আরক্তিম করিত। পরিবর্ত্তনের মধ্যে ইহাই বিশেষ লক্ষিত হইত যে অনেক সময়েই তাহার ক্ষুদ্র হস্তদ্বয় ক্লান্তভাবে পার্শ্বে পড়িয়া থাকিত ও নেত্রদ্বয় উদাসভাবে জল রাশির অপর পারে চাহিয়া থাকিত।

জীবন ও প্রেম এখন আর পরস্পরের চক্ষের দিকে তাকাইতে সাহস করিত না, মুখ ফুটিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না—"আমাদের প্রাণের ধনের কি হইয়াছে?" দুই খানি চিন্তাকুল ও ব্যথিত হৃদয় নিজকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিত—"ইহা কিছুই নহে, আগামী কল্যই সে হাসিয়া উঠিবে, কল্যই হয়ত তাহার হাস্যকলরব আমাদের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিবে।"

কত কল্যই আসিল ও গত হইল কিন্তু শিশু আর

পূর্ব্বতার পুনঃপ্রাপ্ত হইল না। পথ পর্য্যটনকালে তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়াই ক্রীড়ারত হইলেও ক্রমশঃই তাহাকে অধিকতর ক্লান্তিভারাক্রান্ত দেখাইতে লাগিল।

একদিন জীবন ও প্রেম নিদ্রাভঙ্গে আনন্দকে আর তাহাদের পার্শ্বে দেখিতে পাইল না। নিকটেই তৃণাসনে বিষাদ ও করুণাতে বিস্ফারিত নেত্র একটি অপরিচিত ক্ষুদ্র শিশু বসিয়াছিল বটে, কিন্তু দুঃখে ম্রিয়মাণ উভয়ের মধ্যে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। জীবন ও প্রেম পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে "আমাদের আনন্দ আমাদের অজ্ঞাতে আনন্দ সত্যই কি আমরা তোমাকে হারাইলাম? কোনও দিনই কি আর তোমাকে দেখিতে পাইব না?" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিল।

করুণ ও বিষাদ পূর্ণ দৃষ্টি লইয়া ক্ষুদ্র অজ্ঞাত শিশুটি তাহাদের নিকটে আসিয়া স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা ইহাদের উভয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে পরস্পরের সন্নিকটে আনিল এবং তৎপরে ইহাকে মধ্যে রাখিয়া জীবন ও প্রেম পুনরায় তাহাদের গন্তব্যপথ অভিমুখে অগ্রসর হইল। জীবন যখনই শোকে অভিভূত হইয়া চক্ষু নত করিত তখনই শিশুর সুকোমল চক্ষে তাহার নিজ অশ্রুরাশি প্রতিফলিত দেখিত; প্রেম তীব্র যন্ত্রণায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যখনই বলিত, "আমি যে পথক্লিষ্ট ও নিতান্তই শ্রান্ত বোধ করিতেছি আর যে চলিতে পারি না—পথ যে দেখিতে পাই না, সম্মুখে ঘন অন্ধকার—আলোক রাশি বুঝি কেবল পশ্চাতেই" তখনই সে তাহার ক্ষুদ্র রক্তাভ অঙ্গুলী দ্বারা গিরিপার্শ্বে যেখানেই একটু আলোকের রেখা দেখা যাইত, তাহা দেখাইয়া দিত। ইহার বিশাল নয়নদ্বয় সর্ব্বদাই বিষাদ ও চিন্তাতে পূর্ণ থাকিলেও ওষ্ঠপ্রান্ত সর্ব্বদাই মৃদুহাস্যে রঞ্জিত থাকিত।

তীক্ষ্ণধার প্রস্তরে যখনই জীবনের পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইত, শিশু নিজ পরিচ্ছদ দ্বারা ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া সেস্থান চুম্বন করিত। মরুভূমিতে প্রেম যখন মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পড়িত (প্রেম ও সংসারে অনেক সময় মূর্চ্ছিত প্রায় হয়) শিশু তপ্ত বালুকার উপর দিয়া নগ্নপদে ছুটিয়া তাহার নিকট যাইত এবং সেই মরুভূমির মধ্যেও কোথায় কোন্ পাহাড় আছে খুঁজিয়া, সেখানকার কোনও অজ্ঞাতস্থলের ভিতর হইতে জলের সন্ধান করিয়া, সেই জল দ্বারা প্রেমের শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় জলসিক্ত করিত। সে নিজে কখনও তাহাদের ভারস্বরূপ হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহাদের সুবিধা ব্যতীত কোনই অসুবিধা হয় নাই; বস্তুতঃ ইহাকে পার্শ্বে না পাইলে তাহাদের সংসার পথে ভ্রমণ করাই দুরূহ হইত।

যখন তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারাবৃতশিখরযুক্ত অন্ধকার ও দুর্গম গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইল, (প্রেম ও জীবনকে অনেক সময়েই এইরূপ অজ্ঞাত ও ভীষণ পথ দিয়া চলিতে হয়) যেখানকার সকল পদার্থই তুষারাবৃত থাকিয়া তাহাদের তুষার-শীতল নিঃশ্বাসে পত্রযাত্রীদের শরীর অবশ করিয়া দেয়, তখনও এই ক্ষুদ্র শিশু তাহাদের শীতক্লিষ্ট হাতগুলি নিজ উষ্ণ বক্ষোপরি স্থাপন পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল এবং কৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় তাহাদের গন্তব্যপথের দিকে লইয়া গিয়াছিল।

এই স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন সূর্য্যালোক ও পুষ্পের রাজ্যে উপনীত হইল, তখন তাহার কি আহ্লাদ—মুখখানি হাস্যের আভাতে উদ্ভাসিত হইল। হাস্যোজ্জ্বল-মুখে সে কোমল তৃণাসনের উপর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, বৃক্ষের কোটর হইতে মধু আহরণ করিয়া করতলে ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, পদ্মপত্রে পানীয় বারি তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণার্থে আনিয়া দিল; নানাবিধ পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া তাহাদের কণ্ঠে পরাইয়া দিল। তাহার সুমধুর হাস্য-রঞ্জিত মুখ দেখিয়া তাহাকে প্রফুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি অনুমিত হইতেছিল।

ইহার স্পর্শ "আনন্দের" স্পর্শের অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। স্পর্শকালীন অঙ্গুলীসঞ্চালনের মধ্যে ইহার যেন কেমন একটা মধুর স্নেহ-কোমল ভাব ছিল।

এই ভাবে জীবন, প্রেম ও এই শিশুটি অনেক পথ

পর্য্যটন করিল—কখনও বা অন্ধকারের ভিতর দিয়া কখনও আলোকের মধ্য দিয়া—কিন্তু শিশুটির স্থান ছিল উভয়ের মধ্যস্থলে—সে যেন মধ্যস্থলে থাকিয়া উভয়েরই মনে সাহস আনিয়া দিত।

জীবন ও প্রেম অনেক সময়ে তাহাদের প্রথমজাত উজ্জ্বল আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়া দুঃস্বরে বলিত "তাহাকেও যদি আমরা ফিরিয়া পাইতাম।"

সময়ক্রমে তাহারা 'অতীত চিন্তার' আবাসভূমিতে উপস্থিত হইল। "অতীত চিন্তা" নারী এই বর্ষীয়সী রমণীর প্রকৃতিতে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার একখানি হস্ত সে সর্ব্বদাই এক পার্শ্বের জানুর উপর ও অপর হস্ত চিবুকে স্থাপনপূর্ব্বক বসিয়া থাকে। ইহার আর একটু বিশেষত্ব এই যে সে সর্ব্বদাই অতীত হইতে আলোক অপসরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেয়।

জীবন ও প্রেম তাহাকে দেখিবামাত্র সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জ্ঞানময়ি জননি, আমাদের একটী সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিন্। আমাদের প্রথম মিলনকালে, আমরা এক অভিনব সুন্দর ও অত্যুজ্জ্বল পদার্থের অধিকারী হইয়াছিলাম—অশ্রুবিহীন মুখ ও ছায়াশূন্য সূর্য্যালোক আমাদের নিজস্ব ছিল, কোন্ অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমরা ইহাকে হারাইলাম? কোথায় গেলে ও কি করিলে আমরা আবার তাহাকে পাইব, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন!"

সেই বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বলিলেন, "তাহাকে পাইবার জন্য তোমাদের মধ্যস্থিত শিশুটিকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছ কি?"

প্রেম ও জীবন উভয়েই ব্যথিতকণ্ঠে, সংক্ষেপভাবে বলিয়া উঠিল, "অসম্ভব।"

জীবন বলিলেন, "ইহাকে পরিত্যাগ করিব? দুর্গম-পথে, কণ্টকবিদ্ধ হইলে কে তাহার সুকোমল ওষ্ঠদ্বারা আমার সেই কণ্টকবিদ্ধ চোষণপূর্ব্বক আমাকে সুস্থ করিবে? শিরঃপীড়াকালে কে আমার ব্যথিত মস্তকের বেদনা-লাঘব করিবে? কে তাহার স্নেহ সুকোমল করস্পর্শে শিরঃপীড়াজনিত যন্ত্রণাগুলির বেগাধিক্য প্রশমিত করিয়া দিবে? শীত ও অন্ধকারে কে আমার শীতে অবশ হৃদয়কে উষ্ণ করিবে?"

প্রেম বলিল, "তাহাকে পরিত্যাগ অপেক্ষা আমার নিজের মৃত্যুই অধিকতর প্রার্থনীয়। "আনন্দ" ব্যতিরেকেও প্রাণধারণ সম্ভবপর হইয়াছে কিন্তু এই শিশু-বিহীন হইয়া আমি এক দণ্ডও বাঁচিব না।"

তখন সেই বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বলিলেন, "নির্ব্বোধ এবং অন্ধ সন্তানদ্বয়, তোমাদের পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। প্রেম ও জীবনের প্রথম মিলনকালে একটি ছায়াবিহীন উজ্জ্বল পদার্থের জন্ম হয়। যখন পথ বন্ধুর হইতে আরম্ভ হয়, যখন ছায়াদ্বারা অন্ধকারের উৎপত্তি হয়, যখন দিনগুলি কঠোর ও রাত্রিগুলি সুদীর্ঘ ও তুষারশীতল হইতে থাকে, তখনই এই উজ্জ্বল পদার্থের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। জীবন ও প্রেম এই পরিবর্ত্তন প্রথমে লক্ষ্যই করে না, দেখিয়াও দেখিতে চায় না, জানিতে পারিয়াও ইহার অর্থ বুঝিতে চাহে না। অবশেষে একদিন সহসা জাগিয়া উঠিয়া পরিবর্ত্তন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে ও আর্ত্তস্বরে বলে, "হা বিধাতঃ! আমরা আনন্দকে হারাইয়াছি, কোথায় গেলে ও কি করিলে আবার তাহাকে পাইব?"

তাহারা বুঝে না যে ঘর্ষোৎক্ষুন্ন "আনন্দকে" মরুভূমি, হিম ও তুষারের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ অনাহত ও অপরিবর্ত্তিত ভাবে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। তাহারা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না যে তাহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শিশুটিই তাহাদের সেই প্রথম আনন্দ—বয়োপ্রাপ্ত সুতরাং রূপান্তরিত প্রথম আনন্দ। এই যে জীবন ও প্রেমের মধ্যস্থিত, গম্ভীর, কোমল প্রাণ পদার্থটি যাহা অসহনীয় শৈত্যগুণবিশিষ্ট তুষাররাশির মধ্যেও উষ্ণতা আনিয়া দেয়, এবং প্রচণ্ডতম মরুভূমিতেও সাহস দান করে—ইহার নাম সহানুভূতি—ইহা পূর্ণবিকশিত প্রেম।

(ইংরেজী হইতে অনুবাদিত) কুমারী যামিনী সেন।